আনওয়ারুল মিশকাত শরহে

মিশকাতুল মাসাবীহ

আরবি-বাংলা

৪

অনুবাদ ও রচনায়

মাওলানা আহমদ মায়মূন
মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

মাওলানা মাহফূজুর রহমান সিদ্দিকী
উস্তাদ, জামিয়া হোসাইনিয়া আগারগাঁও, ঢাকা

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আনওয়ারুল মিশকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ

অনুবাদ ও সম্পাদনায় ❖ মাওলানা আহমদ মায়মূন
মাওলানা মাহফূজুর রহমান সিদ্দিকী

প্রকাশক ❖ আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা এম. এম.

প্রকাশকাল ❖ ২৫ শা'বান, ১৪৩২ হিজরি
২৮ জুলাই, ২০১১ ইংরেজি
১৩ শ্রাবণ, ১৪১৮ বাংলা

শব্দ বিন্যাস ❖ ইসলামিয়া কম্পিউটার হোম
২৮/এ, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস
প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া ❖ ৫৯৫.০০ [পাঁচশত পঁচানব্বই টাকা মাত্র]

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ
অধ্যায় : হজ

اَلْمَنَاسِكُ শব্দটি اَلنُّسُكُ -এর বহুবচন। শাব্দিক অর্থ হলো- اَلتَّعَبُّدُ বা ইবাদত করা। আর পরিভাষায় হজের যাবতীয় কার্যক্রমকে বলা হয় মানাসিক। আর হজ অর্থ- সংকল্প করা, ইচ্ছা বা অভিপ্রায় ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায় ইহরামের সাথে কিছু কার্যক্রম পালনের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ জিয়ারতের সংকল্প করা। আর ইহরাম অর্থ হচ্ছে- তালবিয়া পাঠ করার সাথে সাথে হজ বা ওমরার নিয়ত করা।

হজ ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ : আবহমান কাল হতেই হজ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। আর ইসলামও একে পাঁচটি রোকনের পঞ্চম রোকন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কুরআন ও হাদীসে এটা ফরজ হওয়ার যেমন প্রমাণ রয়েছে তেমনি মুসলমানদের সর্বসাধারণের এতে ইজমাও রয়েছে। রাসূলে কারীম ﷺ -এর যুগ হতে অদ্যাবধি যুগ যুগ ধরে এটা ফরজ হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এটাকে অস্বীকার করা কুফরি।

হজ হলো যৌগিক ইবাদত : যৌগিক বা সম্মিলিতের অর্থ হলো- আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক ইবাদত। এতে অর্থ ব্যয়, শারীরিক পরিশ্রম ও পরিবার-পরিজনের ভালোবাসা ত্যাগ করায় কিছু দিনের জন্যে বিরাট মানসিক কষ্ট রয়েছে। ধনের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ইহরামের মধ্যে থেকে নিজেকে পরকালমুখী করে রাখতে হয়। এতে ত্যাগ যেমন কঠোর, প্রেমাসক্তি যেমন অধিক, এর পুরস্কারও তেমনি বিরাট ও মহান। তাই হাদীসে বলা হয়েছে- 'কবুল করা হজের পুরস্কার জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়'।

হজের তাৎপর্য : হজের মধ্যে মানুষের আখিরাতের কল্যাণ ছাড়া দুনিয়ারও বহু কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এটা গোটা মুসলিম মিল্লাতের এক বিশ্ব সম্মেলন। এতে সারা বিশ্বের মুসলমানেরা একে অন্যকে চিনতে পারে, অবস্থা জানতে পারে। একে অন্যের সমস্যা বুঝতে এবং এর সমাধান কি তাও চিন্তা করতে পারে। খুলাফায়ে রাশেদীন হজের মৌসুমে গোটা দেশের সাধারণ অবস্থা ও শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে জনসাধারণের সাথে আলোচনা করতেন এবং তাদের কোনো অভাব-অভিযোগ থাকলে তা শুনতেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

সারা দুনিয়ার মুসলমানেরা রক্ত, বর্ণ, ভাষা ও ভৌগোলিক সীমারেখার বিভিন্নতা ভুলে এক কেন্দ্রমুখী হোক এবং পৃথিবীতে একটি শক্তিশালী খেলাফত রাষ্ট্র কায়েম হোক এটাই ইসলামের কাম্য। আর পবিত্র হজ সম্মেলন হলো এর পথ নির্দেশক। হজ যেভাবে রাজা-প্রজা, আরবি-আজমি, আমির-গরিব, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ সকলকে একাকার করে দেয়, এতে বিশ্বসাম্য ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের ভাব ফুটে উঠে, এর নজির আর কোনো কাজে কোনো স্থানে পাওয়া যায় না। আলোচ্য অধ্যায়ে হজের বিভিন্ন বিধিবিধান সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٣٩١ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ اَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَسَكَتَ حَتّٰى قَالَهَا ثَلٰثًا فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلٰى اَنْبِيَائِهِمْ فَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৩৯১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যে ভাষণ দান করলেন। ভাষণে তিনি ইরশাদ করলেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের প্রতি হজ্জ ফরজ করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা হজ্জ করবে। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! এটা কি প্রত্যেক বছরই? রাসূল ﷺ চুপ করে থাকলেন। লোকটি এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করল। অতঃপর নবী করীম ﷺ বললেন, আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তবে অবশ্যই তা তোমাদের জন্যে ফরজ হয়ে যেত, যা পালন করতে তোমরা সমর্থ হতে না। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, যে বিষয়ে আমি তোমাদের কিছু বলিনি সে বিষয়ে সেরূপ থাকতে দাও। কেননা, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তাদের নবীদেরকে বেশি বেশি প্রশ্ন করার কারণে এবং নবীদের সাথে মতবিরোধ করার কারণে তারা ধ্বংস [যোগ্য] হয়েছে। সুতরাং আমি যখন কোনো বিষয়ে নির্দেশ করব তা সাধ্যমতো করবে এবং কোনো বিষয়ে নিষেধ করলে তা পরিত্যাগ করবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعْرِيْفُ الْحَجِّ হজ্জের পরিচিতি :

مَعْنَى الْحَجِّ لُغَةً : اَلْحَجُّ শব্দটিকে দুভাবে পড়া যায়। যেমন– ১. اَلْحَجُّ (بِفَتْحِ الْحَاءِ) . ২. اَلْحِجُّ (بِكَسْرِ الْحَاءِ)

"ح" বর্ণে যবরযোগে اَلْحَجُّ শব্দটি مَصْدَرٌ । যেমন কুরআনে এসেছে– اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ

আর "ح" বর্ণে যেরযোগে اَلْحِجُّ শব্দটি اِسْمٌ । যেমন কুরআনে এসেছে– وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

حَجٌّ -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلْقَصْدُ বা ইচ্ছা করা।

২. اَلْاِرَادَةُ বা সংকল্প করা।

৩. اَلزِّيَارَةُ বা সাক্ষাৎ করা।

৪. اَلْقَصْدُ اِلٰى مُعَظَّمٍ বা মহৎ জিনিসের প্রতি ইচ্ছা করা ইত্যাদি।

৫. اَلنِّهَايَةُ গ্রন্থকারের মতে– اَلْحَجُّ هُوَ الْقَصْدُ اِلٰى كُلِّ شَيْءٍ

৬. نَيْلُ الْاَوْطَارِ গ্রন্থকারের মতে, اَلْاِتْيَانُ مَرَّةً بَعْدَ اُخْرٰى

مَعْنَى الْحَجِّ شَرْعًا :

১. اِحْيَاءُ الْعُلُوْمِ -এর গ্রন্থকার বলেন–

اَلْحَجُّ هُوَ الْقَصْدُ اِلٰى زِيَارَةِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ عَلٰى وَجْهِ التَّعْظِيْمِ بِاَفْعَالٍ مَخْصُوْصَةٍ فِىْ زَمَانٍ مَخْصُوْصٍ -

অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্যাবলির মাধ্যমে পবিত্র কা'বাঘর জিয়ারত করার ইচ্ছা পোষণ করাকে حَجٌّ বলা হয়।

২. 'কামূস' গ্রন্থকার বলেন–

اَلْحَجُّ هُوَ قَصْدُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ لِلتَّقَرُّبِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بِاَفْعَالٍ مَخْصُوْصَةٍ فِىْ زَمَانٍ مَخْصُوْصٍ ـ

৩. কতিপয় আলেম বলেন– اَلْحَجُّ هُوَ قَصْدُ الْبَيْتِ عَلٰى وَجْهِ التَّعْظِيْمِ لِاَدَاءِ الرُّكْنِ الْعَظِيْمِ

৪. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) বলেন– اَلْحَجُّ هُوَ قَصْدُ الْبَيْتِ عَلٰى وَجْهِ التَّعْظِيْمِ

৫. شَرْحُ وِقَايَةْ গ্রন্থকারের মতে– اَلْحَجُّ هُوَ زِيَارَةُ مَكَانٍ مَخْصُوْصٍ فِىْ وَقْتٍ مَخْصُوْصٍ

হজ কখন ফরজ হয়েছে? হজ কখন ফরজ হয়েছে এ ব্যাপারে মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

১. মুহাদ্দিসদের একদল বলেন, হিজরতের পূর্বেই হজ ফরজ হয়েছে। তবে পরিবেশ পরিস্থিতি ইসলামের অনুকূলের ছিল না বিধায় মহানবী ﷺ হজ করেননি।

২. জমহুর মুহাদ্দিসদের অভিমত হলো, হজ হিজরতের পরেই ফরজ হয়েছে। আর এটাই বিশুদ্ধ অভিমত।

৩. عَلَّامَةْ وَاقِدِىْ বলেন, ৫ম হিজরিতে হজ ফরজ হয়েছে। তিনি ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبْ-এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন।

৪. فَتْحُ الْمُلْهِمْ গ্রন্থকারের মতে, ষষ্ঠ হিজরিতে হজ ফরজ হয়েছে।

৫. আল্লামা مَاوَرْدِىْ (র.) বলেন, ৮ম হিজরিতে হজ ফরজ হয়েছে।

৬. ইমাম নববী, কাযী আয়ায ও কুরতুবী (র.) প্রমুখের মতে, ৯ম হিজরি সালের শেষ ভাগে হজ ফরজ হয়েছে।

৭. তানযীমুল আশতাত গ্রন্থকার বলেন, কতিপয় মুহাদ্দিসের মতে, হজ ৭ম হিজরিতে ফরজ হয়েছে। মূলত হজ নবম হিজরিতেই ফরজ হয়েছে। আর তা হলো অত্র আয়াত وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا-এর দ্বারা হজ ফরজ হয়েছে এবং তার দলিল নবম হিজরির শেষ দিকে নাজিল হয়েছে।

হজ কার উপর ওয়াজিব? কারো উপর হজ ওয়াজিব হওয়ার জন্যে ইসলামি শরিয়ত নিম্নলিখিত শর্তাবলি নির্ধারণ করেছে। যেমন–

১. মুসলমান হওয়া। সুতরাং অমুসলিমের উপর হজ ওয়াজিব নয়।

২. স্বাধীন হওয়া। সুতরাং গোলামের উপর হজ ফরজ নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

اَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ وَلَوْ عَشَرَ حُجَجٍ ثُمَّ عُتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْاِسْلَامِ ـ

৩. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। সুতরাং অপ্রাপ্তবয়স্ক বা ছোট শিশুর উপর হজ ফরজ নয়।

৪. জ্ঞান-সম্পন্ন হওয়া। সুতরাং পাগলের উপর হজ ফরজ নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلٰثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتّٰى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يُفِيْقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ ـ

৫. সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া। সুতরাং অসুস্থ ও রুগ্ণ ব্যক্তির উপর হজ ফরজ নয়।

৬. পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় খরচ ব্যতীত হজে রওয়ানা থেকে শুরু করে হজের কাজ সম্পাদনপূর্বক বাড়ি ফেরা পর্যন্ত খরচপত্র বহন করার ক্ষমতা থাকা।

৭. হজের রাস্তা নিরাপদ থাকা। সুতরাং রাস্তা নিরাপদ না থাকলে হজ ফরজ হবে না।

৮. মহিলাদের ক্ষেত্রে একটি বাড়তি শর্ত হচ্ছে হজের সফরে স্বামী বা অন্যকোনো মাহরাম পুরুষ তার সঙ্গে থাকা। কেননা, রাসূল ﷺ বলেছেন– "لَا تَحُجَّنَّ الْمَرْأَةُ اِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ"

হজের প্রকারভেদ : ইসলামি শরিয়তে হজ তিন প্রকার। যথা–

১. হজ্জে ইফরাদ (اَلْحَجُّ الْاِفْرَادُ) ২. হজ্জে তামাত্তু' (اَلْحَجُّ التَّمَتُّعُ) ৩. হজ্জে কিরান (اَلْحَجُّ الْقِرَانُ)

১. হজ্জে ইফরাদ : اِفْرَادٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ– একাকী হওয়া, কোনো শরিক না হওয়া। যেমন কুরআনে এসেছে– رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا আর ইসলামি শরিয়তে হজ্জে ইফরাদ বলা হয়– هُوَ اَنْ يُّهِلَّ مِنَ الْمِيْقَاتِ بِالْحَجِّ فَقَطْ فِىْ اَشْهُرٍ مَعْلُوْمَاتٍ অর্থাৎ নির্দিষ্ট মাসে মীকাত হতে শুধুমাত্র হজের জন্যে ইহরাম বাঁধাকে হজ্জে ইফরাদ বলা হয়।

২. হজ্জে তামাত্তু' : تَمَتُّعٌ শব্দের অর্থ– কোনো বস্তু উপভোগ করা, কোনো বস্তু হতে ফায়দা গ্রহণ করা। যেমন কুরআনে এসেছে– كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا اَنْتُمْ .... الخ

শরিয়তের পরিভাষায় হজ্জে তামাত্তু' হলো, প্রথমে মীকাত থেকে শুধু ওমরার জন্যে ইহরাম বাঁধা। পরে ওমরা পালন করে হালাল হয়ে যাওয়া। আবার يَوْمُ التَّرْوِيَةِ তে ইহরাম বেঁধে হজ পালন করা। যেহেতু এখানে হজ ও ওমরার মাঝে হালাল হয়ে ফায়দা গ্রহণের সুযোগ থাকে, তাই এটাকে حَجٌ تَمَتُّعٌ বলা হয়।

৩. **হজ্জে কিরান :** قِرَانٌ শব্দের অর্থ– দুটি বস্তু একত্রে মিলে থাকা। সেজন্যে সঙ্গীকে قَرِيْنٌ বলা হয়। যেমন কুরআনে এসেছে– نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ

আর হজ্জে কিরান হলো একই ইহরামে হজ এবং ওমরা উভয় সমাধা করা, মাঝে ইহরাম ভঙ্গ না করা।

পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতি হজ ফরজ ছিল কিনা? هَلِ الْحَجُّ كَانَ فَرْضًا عَلَى الْأُمَمِ السَّابِقَةِ؟ উম্মতে মুহাম্মদীর পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর হজ ফরজ ছিল কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

১. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালনী (র.) বলেন, পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর হজ ফরজ ছিল।

দলিল :

١. قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا حَجَّ الْبَيْتَ الخ" ـ

٢. قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "إِنَّ آدَمَ حَجَّ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً مِنَ الْهِنْدِ مَاشِيًا الخ ـ

২. কেউ কেউ বলেন, পূর্ববর্তী উম্মতগণের প্রতি হজ ফরজ ছিল না। আর পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের হজ করার প্রমাণ থাকলেও তা দ্বারা তাদের প্রতি হজ ফরজ হওয়ার কথা প্রমাণ করে না।

৩. অধিকাংশ আলেম বলেন, যদিও পূর্ববর্তী নবী রাসূলদের প্রতি হজ ফরজ ছিল; কিন্তু তাদের উম্মতদের জন্যে তা ফরজ ছিল না।

হজ তাৎক্ষণিকভাবে ফরজ নাকি বিলম্বের অবকাশের সাথে ফরজ : হজ তাৎক্ষণিকভাবেই ফরজ নাকি তা পালনে বিলম্বের অবকাশ আছে এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের বিরোধপূর্ণ মতামত নিম্নরূপ–

১. **ইমামত্রয়ের অভিমত :** ইমাম আবূ হানীফা [এক মতে], মালেক, আহমদ, কারখী ও আবূ ইউসুফ (র.) প্রমুখ বলেন, হজ তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ফরজ। অর্থাৎ ওয়াজিব হওয়ার সাথে সাথে আদায় করা ওয়াজিব।

দলিল :

ক. কুরআন–

١. قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا ـ

٢. أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ـ

খ. হাদীস–

٣. تَعَجَّلُوْا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِيْ مَا يَعْرِضُ لَهُ ـ

٤. حُجُّوْا قَبْلَ أَنْ لَّا تَحُجُّوْا ـ

২. **জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে :** ইমাম শাফেয়ী, মুহাম্মদ, ছাওরী, আওযায়ী ও আবূ হানীফা (র.) বলেন, হজ বিলম্বের অবকাশের সাথে আদায় করা জায়েজ।

কুরআনের দলিল : আল্লাহ তা'আলা বলেন– ١. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ـ ٢. أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ـ

তারা আরো বলেন যে, হজ জীবনে একবার আদায় করা ফরজ। সুতরাং মৃত্যু পর্যন্ত তার শেষ সীমা।

"তাৎক্ষণিকভাবে হজ আদায় ওয়াজিব" এ মতের প্রবক্তাদের দলিলের উত্তর : হাদীস শরীফে তাড়াতাড়ি আদায়ের ব্যাপারে যে নির্দেশ এসেছে তা وُجُوْبٌ -এর জন্যে নয়; বরং মোস্তাহাব বুঝাবার জন্যে।

١. إِنَّهُ إِذَا أَخَّرَ الصَّلٰوةَ إِلٰى اٰخِرِ وَقْتِهَا يَجُوْزُ كَذٰلِكَ الْحَجُّ ـ

٢. فَرِيْضَةُ الْحَجِّ فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ وَأَخَّرَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَلسَّنَةَ الْعَاشِرَةَ ـ

হজের ফরজসমূহ : হজের ফরজ বা রোকন তিনটি। যথা–

১. **ইহরাম বাঁধা :** ইহরাম হলো نِيَّةُ الْحَجِّ مَعَ التَّلْبِيَةِ অর্থাৎ তালবিয়াসহ হজের নিয়ত করা। হজ বা ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মীকাত হতে বা তৎপূর্বে ইহরাম বাঁধা। মূলত ইহরাম বাঁধার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর কতিপয় বৈধ বিষয় হারাম হয়ে যায় বিধায় এটাকে ইহরাম বলে।

২. **আরাফায় অবস্থান :** ৯ জিলহজ তারিখে আরাফার ময়দানে অবস্থান করা। রাসূল ﷺ বলেছেন–
وَقَفْتُ هٰهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ .

৩. **তাওয়াফে যিয়ারত :** ১০ জিলহজ তারিখে বায়তুল্লাহ -এর তওয়াফ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–
وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ .

হজের ওয়াজিবসমূহ : হজের ওয়াজিব পাঁচটি। যথা–

১. **মুযদালিফায় অবস্থান :** আরাফাহ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় মুযদালিফা প্রান্তরে অবস্থান করা।

২. **সাফা-মারওয়ায় সায়ী করা :** মা হাজেরা ও ইসমাঈল (আ.)-এর স্মৃতি বিজড়িত সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে সায়ী করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন– اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ

৩. **কঙ্কর নিক্ষেপ করা :** মিনায় অবস্থিত তিন শয়তানের প্রতিকী স্তম্ভের উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করা। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

৪. **মাথা মুণ্ডন করা :** হলক কিংবা কসর অর্থাৎ মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছোট করা। এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণী–
مُحَلِّقِيْنَ رُؤُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ الخ .

৫. **বিদায়ী তওয়াফ :** বহিরাগতদের জন্যে বিদায়ী তওয়াফ করা। হাদীসে বলা হয়েছে–
مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَكَانَ اٰخِرَ عَهْدِهٖ بِالْبَيْتِ الطَّوَافُ .

উল্লেখ্য যে, ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, মিনায় অবস্থান করাও ওয়াজিবসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ -এর মর্মার্থ : শরিয়ত অনুসারীদের উপর প্রতি বছর হজ ফরজ, না জীবনে একবার ফরজ, একথা কুরআনের আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা না যাওয়ায় হযরত আকরা ইবনে হাবিস (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ হজ কি প্রত্যেক বছর ফরজ না জীবনে একবার ফরজ? এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ থাকলেন। এভাবে আরো তিনবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবারই চুপ থাকলেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি যদি তোমার প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বলতাম, তাহলে তোমাদের উপর প্রত্যেক বছরই হজ ফরজ হয়ে যেত এবং তোমরা বিপদে পড়ে যেতে।

হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী বুঝা যায়, প্রত্যেক বছর হজ করা, না করা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিয়ন্ত্রণে ছিল। যদি তিনি প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বলতেন, তাহলে প্রত্যেক বছরের জন্য হজ ফরজ হয়ে যেত।

অতএব বুঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা সাধারণভাবে হজ ফরজ করেছেন এবং প্রতি বছর ফরজ করা না করা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দায়িত্বে গোপন রেখেছেন, এ কারণেই নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি যদি তোমার প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ-সূচক উত্তর দেই তাহলে তোমাদের উপর প্রত্যেক বছর হজ ফরজ হয়ে যাবে।

অধিকন্তু হাদীসাংশ– لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শর্তহীন বর্ণনাতে প্রশ্ন করে শর্তের খোঁজাখুজি করা মাকরূহ; বরং শর্তহীন বর্ণনার উপর আমল করাই উত্তম। নতুবা নিজেদেরই বিপদে পড়তে হয়। যেমন, বনী ইসরাঈলরা অতিরিক্ত প্রশ্ন করার কারণে বিপদে পতিত হয়েছিল।

অথবা, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা দ্বারা আয়াতে কুরআনী– لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ -এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

নবী করীম ﷺ কখন এ ভাষণ দিয়েছেন? রাসূল ﷺ কখন এ ভাষণ প্রদান করেছিলেন, এ সম্পর্কে দুটি অভিমত পাওয়া যায়। যেমন–

১. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ নবম হিজরি সালে এ ভাষণ দিয়েছিলেন যখন وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ الخ আয়াতটি নাজিল হয়েছিল।

২. কেউ কেউ বলেন, রাসূল ﷺ ৬ষ্ঠ হিজরিতে এ ভাষণটি প্রদান করেছিলেন। কারণ– اَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ আয়াতটি এ বছরই নাজিল হয়েছিল। তবে প্রথম অভিমতটিই অধিক বিশুদ্ধ।

নবী করীম ﷺ হিজরতের পূর্বে কি হজ করেছেন? হ্যাঁ রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের পূর্বে হজ করেছেন। এ ব্যাপারে সকল হাদীস ও ফিকহবিশারদগণ একমত। তবে তিনি কতবার হজ করেছেন, এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো–

ক. হাকিম (র.) ইমাম ছাওরী (র.) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের **পূর্বে** একবার হজ করেছিলেন। খ. তিরমিযী শরীফে হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ হিজরতের পূর্বে দু-বার হজ করেছিলেন। ঘ. ঐতিহাসিক ইবনুল আছীর (র.) লিখেছেন, হিজরতের পূর্বে নবী করীম ﷺ প্রতি বছরই হজ করতেন। ঙ. ইবনুল জাওযী (র.)-এর মতে, নবী করীম ﷺ হিজরতের পূর্বে কতবার হজ করেছেন, তার সংখ্যা অজ্ঞাত।

কোনো বিষয়কে ফরজ বা ওয়াজিব করার অধিকার রাসূলের ছিল কি না? অত্র হাদীসের স্পষ্ট ভাষণ– "আমি যদি হ্যাঁ বলতাম তবে তা ফরজ হয়ে যেত" দ্বারা বুঝা যায় যে কোনো বিষয়কে ফরজ বা ওয়াজিব ইত্যাদি করার অধিকার আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দিয়েছিলেন। সুতরাং কুরআন ব্যতীতও শরিয়ত সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ যে শরিয়তের একটি উৎস এবং অবশ্য পালনীয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এজন্যে ফিকহ ও হাদীসবিদগণ রাসূল ﷺ -কে শারে' বা শরিয়তের প্রবর্তক বলেও উল্লেখ করে থাকেন।

وَعَنْهُ (٢٣٩٢) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩৯২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন আমল শ্রেষ্ঠ? রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন। আবারও জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কি? রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। এবারও জিজ্ঞেস করা হলো, অতঃপর কি? রাসূল ﷺ বললেন, হজ্জে মাবরূর তথা গৃহীত হজ। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কোন আমল সর্বশ্রেষ্ঠ? হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সর্বোত্তম আমল হলো ঈমান, তারপর জিহাদ, এরপর হজ। আবার অন্য হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে সর্বোত্তম আমল সালাত, তারপর পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ করা। সুতরাং হাদীসদ্বয়ের মাঝে বৈপরীত্য বিদ্যমান। হাদীস বিশারদগণ এর সমাধান প্রসঙ্গে বলেন–

১. হাদীসে ব্যবহৃত اَفْضَلُ শব্দটি اِسْمُ تَفْضِيْل -এর সীগাহ। কিন্তু শব্দটি এখানে তার মূল অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। এ আমলটিই সর্বশ্রেষ্ঠ একথা বুঝানো হয়নি; বরং আমলটির মাহাত্ম্য ও ফজিলত বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।

২. রাসূল ﷺ ছিলেন একজন আদর্শ পরামর্শদাতা। কোনো ব্যক্তির চেহারা দেখেই বুঝতে পারতেন, তার মাঝে কিসের শূন্যতা রয়েছে। তাই তিনি অবস্থানুযায়ী ব্যক্তির ঘাটতি থাকা আমলটাকে উত্তম বলছেন, যাতে করে সেই ব্যক্তি উক্ত আমলের প্রতি উৎসাহিত হয়।

৩. অথবা, স্থান-কাল-পাত্রভেদে রাসূল ﷺ পৃথক পৃথক বিষয়কে উত্তম বলেছেন।

৪. রাসূল ﷺ -এর এ ধরনের বর্ণনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, প্রত্যেক বিভাগের উত্তম আমল বর্ণনা করা। যেমন– সালাত বিভাগের উত্তম আমল সময় মতো সালাত আদায় করা ইত্যাদি।

হজ্জে মাবরূর সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : হজ্জে মাবরূর সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণের বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়–

১. ইবনে খালুবিয়া (র.) বলেন– هُوَ حَجٌّ مَقْبُوْلٌ অর্থাৎ হজ্জে মাবরূর হলো মকবুল হজ।

২. ইমাম আহমদ ও হাকিম (র.) হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন– اِطْعَامُ الطَّعَامِ وَاِفْشَاءُ السَّلَامِ অর্থাৎ ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান ও সালামের ব্যাপক প্রচলন যে হজের পর অব্যাহত থাকে, তাই হজ্জে মাবরূর।

৩. মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে বলা হয়েছে– হজ্জে মাবরূর হলো দরিদ্রদের খাদ্য খাওয়ানো এবং উত্তম কথা বলা। কেননা, হাদীসে এসেছে– عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ هُوَ اِطْعَامُ الطَّعَامِ وَطِيْبُ الْكَلَامِ

৪. ইবনে আরবী (র.) বলেন, যে হজের পর কোনো গুনাহের কাজ হয় না, তাকে মাবরূর হজ বলে।

৫. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, মাবরূর হজের নির্দশন হলো, হজের সকল ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ বিশুদ্ধ নিয়তের সাথে আদায় করা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকা।

৬. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, দুনিয়াত্যাগী মনোভাব ও আখিরাত লাভের আগ্রহ প্রবণতাসহ হজ থেকে ফিরতে পারলে তাকে মাবরূর হজ বলে।

৭. ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, যে হজ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ মোতাবেক পালিত হয়েছে, তাই হজ্জে মাবরূর।

৮. কারো মতে, হজ করার পর হজকারী ব্যক্তির নৈতিক অবস্থা যদি পূর্বাবস্থা থেকে ভালো হয়, তবে তাকে মাবরূর হজ বলে।

وَعَنْ ٢٣٩٣ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩৯৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর [সন্তুষ্টির] উদ্দেশ্যে হজ করেছে, নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করেনি বা অশ্লীল কার্যেও লিপ্ত হয়নি, তবে সে হজ হতে নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে; সেদিনের ন্যায় যেদিন তার মাতা তাকে প্রসব করেছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

رَفَثٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلرَّفَثُ শব্দটি মূলত স্ত্রীসহবাস অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তা ছাড়া সহবাসের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী সকল কার্যকলাপই 'রাফাছ'-এর অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য হাদীসে ব্যবহৃত لَمْ يَرْفُثْ-এর মর্মার্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাদীস বিশারদগণ বলেন–

১. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, رَفَثٌ শব্দটি দ্বারা যৌন ক্রিয়া বুঝানো হয়েছে। যেমন কুরআনের ভাষ্য– فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ

২. আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, رَفَثٌ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর দ্বারা সকল প্রকার অশ্লীলতাকে বুঝানো হয়েছে।

৩. হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর মতে, رَفَثٌ শব্দটি ঐসব কথার সাথে বিশেষিত, যা দ্বারা মহিলাগণকে সম্বোধন করা হয় এবং যে কথার বাচনভঙ্গি দ্বারা তার দোষ প্রকাশিত হয়।

৪. ইমাম যুহরী (র.) বলেন, رَفَثٌ দ্বারা সেসব অশ্লীল কথা ও কাজকে বুঝায়, যেগুলো পুরুষেরা মহিলাদের ব্যাপারে প্রয়োগ করে থাকে।

মোটকথা, যৌনাচারসহ অশ্লীল কথা, কাজ ও সকল প্রকার পার্থিব ক্রিয়ার ক্ষেত্রে শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। হাদীসে উক্ত কাজগুলো থেকেই বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে।

رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ-এর মর্মার্থ : رَجَعَ শব্দটি বাবে ضَرَبَ-এর ক্রিয়ামূল اَلرُّجُوْعُ হতে গঠিত, এটি مَاضِيْ-এর ক্রিয়া। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে এর অর্থ– "সে প্রত্যাবর্তন করেছে", "ফিরে এসেছে"। বহিরাগত তথা দূরদূরান্ত হতে আগত হজব্রত পালনকারীদের ক্ষেত্রেই শব্দটি প্রযোজ্য। অর্থাৎ যারা দূরদূরান্ত হতে হজব্রত পালন করার উদ্দেশ্যে এসেছে এবং হজ পালন করতে গিয়ে স্ত্রীসহবাস ও অশ্লীল কার্য হতে বিরত রয়েছে, তারাই সদ্যজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে। কিন্তু যারা মক্কার অধিবাসী, হজ সমাপন করে সেখানেই থেকে গেছে, তারা সদ্যজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হবে কিনা, তা বুঝা যায় না। কেননা, [প্রত্যাবর্তন] শব্দটি তাদের বেলায় প্রযোজ্য হয় না। তাই হাদীসশাস্ত্রবিদগণ অন্য অর্থ করেছেন। তারা বলেন, এখানে رَجَعَ শব্দটি صَارَ [হয়ে গেছে] -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সে সদ্যজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে গেছে। অথবা শব্দটি এখানে فَرَغَ مِنْ اَعْمَالِ الْحَجِّ [হজের কার্যক্রম হতে অবসর হয়েছে]-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সে সদ্যজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে হজের কার্যক্রম হতে অবসর হয়েছে।

وَعَنْهُ ٢٣٩٤ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهٗ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩৯৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, এক ওমরা অপর ওমরা পর্যন্ত সময়ের জন্যে [গুনাহের] কাফফারা স্বরূপ আর মকবুল হজের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ওমরার পরিচিতি :

ওমরার আভিধানিক অর্থ : عُمْرَةٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে عُمَرَاتٌ ও عُمَرٌ। অভিধানে এর নিম্নোক্ত অর্থগুলো বিদ্যমান। যথা– ১. اَلزِّيَارَةُ বা সাক্ষাৎ করা। ২. اَلتَّعْمِيْرُ وَالْبِنَاءُ বা আবাদ ও নির্মাণ করা। ৩. اَلْقَصْدُ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ বা আল্লাহর ঘরের প্রতি সংকল্প করা ও ৪. اَلْاِرَادَةُ বা ইচ্ছা করা ইত্যাদি।

আল-কুরআনেও শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়–

১. وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ـ

২. اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ الخ ـ

ওমরার পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় عُمْرَةٌ-এর সংজ্ঞা হলো–

১. মু'জামুল অসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে– هِيَ نُسُكٌ كَالْحَجِّ لَيْسَ لَهٗ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ وَلَا وُقُوْفٌ بِالْعَرَفَةِ

অর্থাৎ ওমরা হজের মতোই, তবে এর জন্য নির্দিষ্ট সময় এবং আরাফাতে অবস্থান নেই।

২. ফিকহুল ইসলামিতে বলা হয়েছে– اَلْعُمْرَةُ هُوَ قَصْدُ الْكَعْبَةِ لِلنُّسُكِ

৩. উমদাতুল কারী প্রণেতা বলেন– هِيَ طَوَافُ الْبَيْتِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مُحْرِمًا

অর্থাৎ ওমরা হলো বায়তুল হারামের তওয়াফ ও সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে ইহরাম অবস্থায় দৌড়ানো।

ওমরা ফরজ নাকি সুন্নত : ওমরা ফরজ না সুন্নত, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য বিদ্যমান। যেমন–

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী, আহমাদ (র.) প্রমুখ বলেন, হজের মতো ওমরাও জীবনে কমপক্ষে একবার আদায় করা ফরজ।

দলিল : ক. কুরআন– اَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

খ. হাদীস– عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَرِيْضَتَانِ

مَذْهَبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র.)-এর মতে, ওমরা সুন্নত।

দলিল : ١. عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْعُمْرَةِ اَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ لَا وَاَنْ تَعْتَمِرَ اَفْضَلُ ـ (اَلتِّرْمِذِيُّ)

٢. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ اَلْحَجُّ فَرِيْضَةٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ – (اِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ)

বিপরীত মত পোষণকারীদের দলিলের জবাব : দলিলের জবাবে বলা হয় যে, কুরআন মাজীদে اتموا الحج والعمرة لله বলে হজ ও ওমরা পালনের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা মানগত দিক দিয়ে সমান হওয়ার দাবি করে না। তাকে হজের নিকটবর্তী মনে করা হলেও বলতে হবে যে, তা পরিপূর্ণ করার জন্যে বলা হয়েছে।

وَعَنِ ٢٣٩٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عُمْرَةً فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً – (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩৯৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় রমজান মাসের ওমরা [ছওয়াবের দিক দিয়ে] হজের সমান।

–[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهُ (٢٣٩٦) قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ قَالُوا اَلْمُسْلِمُوْنَ فَقَالُوْا مَنْ اَنْتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَرَفَعَتْ اِلَيْهِ اِمْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ اَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৩৯৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ [হজের পথে] রাওহা নামক স্থানে এক আরোহী দলের সাক্ষাৎ পেলেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ দলে কারা? তারা বলল, আমরা মুসলমান। অতঃপর তারা জিজ্ঞেস করল, আপনি কে? রাসূল ﷺ বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল। তখন এক মহিলা তাঁর দিকে একটি শিশুকে উঠিয়ে ধরলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এর কি হজ হবে? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তবে ছওয়াব তোমার হবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শিশুদের হজ সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত :

مَذْهَبُ اِمَامِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ وَجَمْهُوْرِ اَئِمَّةٍ (رح) : আল্লামা নববী বলেন, ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ (র.) ও জমহুরে ওলামায়ে কেরামের মতে, শিশুদের হজ শুদ্ধ।

প্রাপ্তবয়স্কদের হজ পালনে যেসব বিধিবিধান মেনে চলতে হয়, শিশুদের বেলায় সেসব বিধান প্রযোজ্য। তবে ইসলামের ফরজ হজের জন্যে এটা যথেষ্ট হবে না। অর্থাৎ বালেগ হওয়ার পর যদি তার হজ করার মতো সামর্থ্য হয়, তখন তাকে পুনরায় হজ করতে হবে। হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণিত এ হাদীসই শিশুদের হজ শুদ্ধ হওয়ার দলিল।

অবশ্য শিশুদের পক্ষ হতে তার অভিভাবক ইহরাম বাঁধবে এবং তাকেও ইহরামের পোশাক পরাতে হবে এবং যাবতীয় বিধান পালন করাতে হবে।

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ : হানাফীগণ বলেন, শিশুদের ইহরাম বাঁধাই শুদ্ধ নয়। কেননা, তারা এর যোগ্য নয়। সুতরাং হাদীসে বর্ণিত نَعَمْ [হ্যাঁ] অর্থ- তাকে অভ্যাস করানো মাত্র। ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যে কোনো বালকই তার পরিবারের সাথে হজ করুক- অতঃপর যখন সে প্রাপ্তবয়স্ক হবে তখন তার উপর হজ ফরজ হবে, যা সে আদায় করতে হবে। হাকিম তার 'মুস্তাদরাক' কিতাবে বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ বলেছেন, কোনো শিশু দশবার হজ করে থাকলেও বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর ইসলামের ফরজ হজ তাকে আদায় করতে হবে। মোটকথা, শিশুর হজ নফল হিসেবে আদায় হবে এবং যদি নিজে আদায় করার মতো বুদ্ধি-বিবেক না থাকে, তবে তার সব কাজ অভিভাবক আদায় করবে।

وَعَنْهُ (٢٣٩٧) قَالَ اِنَّ اِمْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهٖ فِى الْحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩৯৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাছআম গোত্রের এক মহিলা একবার নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আল্লাহর পক্ষ হতে তার বান্দাদের উপর ফরজ করা হজ আমার অতিবৃদ্ধ পিতার উপরও বর্তেছে, যিনি সওয়ারির উপরেও স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেন না।' সুতরাং আমি কি তার পক্ষ হয়ে হজ করব? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ। আর এটা বিদায় হজের সময়কালীন ঘটনা। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অতিবৃদ্ধের উপর হজ ফরজ কিনা : অতিশয় বৃদ্ধ যে যানবাহনে স্থির হয়ে বসতে পারে না, কিন্তু হজে যাওয়ার মতো সম্পদ রয়েছে, এ ধরনের বৃদ্ধের উপর হজ ওয়াজিব হবে কিনা, সে ব্যাপারে ইসলামি চিন্তাবিদদের অভিমত পেশ করা হলো-

১. رَأْيُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَالصَّاحِبَيْنِ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী ও সাহেবাইনের মতে, এ ধরনের বৃদ্ধের উপর হজ ওয়াজিব। নিজে যেতে না পারলে অন্যকে প্রতিনিধি করে পাঠাবে অথবা وَصِيَّتْ করে যাবে। তাঁদের দলিল হচ্ছে–

اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهٖ فِى الْحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ . (بُخَارِىْ)

হিদায়া গ্রন্থে হযরত হাসান ইবনে যিয়াদ (রা.)-এর বরাত দিয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র.) অনুরূপ একটি মত উল্লেখ করেন। وَهٰذِهٖ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ

২. رَأْيُ الْإِمَامِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জাহেরী অভিমত হচ্ছে, এ ধরনের বৃদ্ধের উপর হজ ফরজ নয়। কেননা, হজ ফরজ হওয়ার জন্যে اِسْتِطَاعَتْ বা ক্ষমতা শর্ত। কিন্তু লোকটির তো اِسْتِطَاعَتْ بَدَنِيَّةْ বা শারীরিক ক্ষমতা নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

বিপরীত মত পোষণকারীদের দলিলের জবাব :

১. ইমাম শাফেয়ী ও সাহেবাইন (র.) যে حَدِيْثُ اِمْرَأَةٍ خَثْعَمٍ-কে দলিল হিসেবে পেশ করেন, তার জবাবে বলা যায়– وَبَابُ التَّطَوُّعِ اَوْسَعُ .

২. অথবা, হাদীসটির মর্ম হচ্ছে– যে সময়ে আমার আব্বার উপর হজ ফরজ হয়েছিল সে সময়ে তিনি قَادِرْ বা সক্ষম ছিলেন। তাই তার সে হজ আদায় করব কি? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ।

পুরুষের পক্ষ হতে নারীর হজ আদায় করার বিধান : মহিলারা পুরুষের প্রতিনিধি হয়ে হজ আদায় করতে পারবে কিনা? এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে–

مَذْهَبُ جُمْهُوْرِ اَئِمَّةِ :

১. জমহুর আয়িম্মায়ে কেরাম বলেন, মহিলারা পুরুষের প্রতিনিধি হয়ে হজ আদায় করলে সহীহ হবে।

দলিল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীস– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِمْرَأَةً خَثْعَمَ حَجِّىْ عَنْ اَبِيْكِ وَاعْتَمِرِىْ

২. হাসান ইবনে হাই (র.)-এর মতে, পুরুষের প্রতিনিধি হয়ে মহিলাগণ হজ আদায় করলে সহীহ হবে না।

আকলি দলিল : মহিলাগণ ইহরাম অবস্থায় এমন পোশাক পরিধান করে যা পুরুষেরা করে না। সুতরাং মহিলাগণ পুরুষের প্রতিনিধি হতে পারেন না।

জমহুরের প্রত্যুত্তর : হাসান ইবনে হাই (র.)-এর যুক্তির উত্তরে জমহুর ওলামায় কেরামগণ বলেন, বিশুদ্ধ হাদীসে স্পষ্ট অনুমোদন থাকার পর এ ধরনের যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

وَعَنْهُ ٢٣٩٨ قَالَ اَتٰى رَجُلٌ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُخْتِىْ نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ وَاِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ اَكُنْتَ قَاضِيَهٗ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضِ دَيْنَ اللّٰهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِالْقَضَاءِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩৯৮. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকটে এসে বলল, আমার বোন হজ করার মানত করেছিলেন; কিন্তু [তা আদায় করার আগেই] তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, যদি তার উপরে কারো দেনা থাকত তুমি তা পরিশোধ করতে কিনা? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল ﷺ বললেন, তবে আল্লাহর দেনা শোধ কর, তা অধিক পরিশোধযোগ্য। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٢٣٩٩ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ اِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اكْتُتِبْتُ فِيْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ امْرَأَتِيْ حَاجَّةً قَالَ اِذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩৯৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো পুরুষ যেন কখনো কোনো মহিলার সাথে নির্জনে না হয় আর কোনো মহিলা যেন তার কোনো মাহরাম সাথি ব্যতীত একাকী ভ্রমণ না করে। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! অমুক অমুক যুদ্ধে আমার নাম লিখিয়ে দিয়েছি আর আমার স্ত্রী হজের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে। রাসূল ﷺ বললেন, যাও, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হজ কর। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মহিলাদের জন্যে হজের সফরে মাহরাম সাথি হওয়া শর্ত কিনা? হজের সফরে মহিলাদের জন্যে মাহরাম সাথি থাকা আবশ্যক কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

১. ইমাম মালিক (র.) বলেন, কোনো মহিলার সঙ্গী-সাথি একদল মহিলা হলে তার পক্ষে হজ অপরিহার্য।

২. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত হলো, নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত কোনো মহিলা সঙ্গী-সাথি হলে তার পক্ষে হজ করা অপরিহার্য। ইমাম আহমদ (র.) হতেও অনুরূপ একটি অভিমত পাওয়া যায়।
এরা নিজেদের মতের সমর্থনে কুরআন মাজীদের আয়াত وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا দ্বারা দলিল পেশ করেন এবং বলেন, উপরিউক্ত আয়াতের বিধানে নারী পুরুষ সবাই শামিল। সুতরাং মহিলাদের পথ-খরচ থাকলে তাদের হজের ক্ষমতা রয়েছে বলে মনে করা হবে।

৩. পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা ও আহমদ (র.)-এর মতে, মহিলাদের সাথে মাহরাম অথবা স্বামী না থাকলে তাদের জন্যে হজ অপরিহার্য নয়। তাঁরা হজ ফরজ হওয়ার জন্যে মাহরাম বা স্বামী সঙ্গী হওয়াকে পূর্বশর্ত মনে করেন এবং নিজেদের মতের অনুকূলে আলোচ্য হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীস ও নিম্নোক্ত হাদীসসমূহকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন।

ক. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, সাবধান! কখনো কোনো মহিলা যেন মাহরাম সঙ্গী ব্যতীত হজ না করে।

খ. রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো মহিলা তিন দিনের পথ অতিক্রম করবে না তার সাথে মাহরাম বা স্বামী ব্যতীত। এছাড়া মাহরাম বা স্বামী-সঙ্গী ব্যতীত তার উপরে বিপর্যয়ের আশঙ্কা আছে। অন্যান্য মহিলা সাথে থাকলে বিপর্যয়ের আরো বেশি সম্ভাবনা থাকে। এ কারণেই কোনো অপরিচিতা অচেনা মহিলার সাথে নির্জনে অবস্থান করা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে যদিও তার সাথে অন্য কোনো মহিলা থাকে।

ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র.)-এর দলিলের জবাব : তাঁরা ইমাম শাফেয়ী (র.) ও মালেক (র.)-এর দলিলের নিম্নরূপ জবাব প্রদান করেছেন–

১. উপরিউক্ত আয়াতের বিধানের অধীনে সেসব মহিলা শামিল নয়, যাদের সাথে স্বামী বা মাহরাম না থাকে। কেননা, মহিলাগণ যাতায়াত ও সফরে অপরের মুখাপেক্ষী। আর তা কেবল স্বামী ও মাহরাম ব্যক্তির সঙ্গেই হতে পারে, অপর কারো সাথে নয়। সুতরাং স্বামী বা মাহরাম ব্যক্তির অবর্তমানে মহিলাদের মধ্যে হজের যোগ্যতাই থাকে না। এ কারণেই উক্ত আয়াতের বিধানে এসব মহিলা শামিল নয়।

২. উপরিউক্ত আয়াতের বিধান যে কয়েকটি শর্ত দ্বারা শর্তায়িত তাতে সব ইমামই ঐকমত্য পোষণ করেন। সুতরাং মহিলাদের বেলায় স্বামী বা মাহরাম ব্যক্তি সাথি হওয়ার শর্ত দ্বারা শর্তায়িত হবে, আর সে শর্ত হাদীস দ্বারা বর্ণিত।

৩. নির্ভরযোগ্য মহিলা সাথি হওয়ার জবাবে বলা হয় যে, এরূপ হলে ফিতনা-ফ্যাসাদের সম্ভাবনা আরো প্রবল থাকে। সুতরাং এ যুক্তিও হাদীসের মোকাবিলায় সবল নয়।
উল্লেখ্য যে, 'মাহরাম' অর্থে এখানে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া চিরতরে হারাম।

وَعَنْ ٢٤٠٠ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ اِسْتَاْذَنْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪০০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম ﷺ -এর কাছে জিহাদে যাওয়ার জন্যে অনুমতি চাইলাম। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের জিহাদ হলো হজ। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٢٤٠١ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُسَافِرُ اِمْرَأَةٌ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اِلَّا وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪০১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো মহিলা তার সাথে মাহরাম ব্যক্তি ব্যতীত একদিন ও একরাতের পথ ভ্রমণ করবে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মাহরাম ব্যতীত মহিলাদের ভ্রমণের হুকুম : হিদায়া গ্রন্থে রয়েছে যে, সফরের মেয়াদ ব্যতীত অর্থাৎ অল্প সময়ের সফরে কোনো মাহরাম ব্যতীত ঘর হতে বের হওয়া মহিলার পক্ষে বৈধ। বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। যেমন–

١ - عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) مَرْفُوْعًا لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ اِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا وَمَحْرَمٌ مِنْهَا ـ

٢ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) مَرْفُوْعًا لَا يَحِلُّ لِاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اِلَّا مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ عَلَيْهَا ـ

٣ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُسَافِرُ اِمْرَأَةٌ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اِلَّا وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ ـ

٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) لَا تُسَافِرُ اِمْرَأَةٌ مَسِيْرَةَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ـ

উল্লিখিত হাদীসসমূহে একদিন, দুদিন বা তিনদিন ইত্যাদি বর্ণনা দ্বারা সংখ্যার সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রচলিত অর্থে সফর বলতে যতটুকু দূরত্বকে বুঝায় মহিলাদের পক্ষে মাহরাম ব্যতীত এতটুকু পথ অতিক্রম করাই নিষিদ্ধ। তবে যেহেতু শরিয়ত নির্ধারকের পক্ষ হতে সফরের নির্দিষ্ট সীমা বর্ণনা করা হয়নি, তাই তা যে কোনো প্রকার দূরত্বকেই কম বা বেশি শামিল করে।

আল-মুনযিরী (র.) বলেন, উল্লিখিত হাদীসসমূহের মধ্যে কোনো প্রকার দ্বন্দ্ব নেই। কেননা, রাসূল ﷺ বিভিন্ন দেশ ও শহরের সামাজিক অবস্থার বিভিন্নতার দিকে লক্ষ্য করে সম্ভবত এরূপ বলেছেন।

وَعَنْ ٢٤٠٢ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ اَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ اَهْلِهِ وَكَذَاكَ وَكَذَاكَ حَتّٰى اَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪০২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনাবাসীদের জন্যে যুল হুলাইফাকে, শাম বা সিরিয়াবাসীদের জন্যে জুহ্ফাকে, নজদবাসীদের জন্যে ক্বারনুল মানাযিলকে এবং ইয়েমেনবাসীদের জন্যে ইয়ালামলামকে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। এ স্থানগুলো– যারা হজ ও ওমরার ইচ্ছা করে, এ সকল স্থানের সে সমস্ত লোকদের জন্যে এবং যারা এসব এলাকার অধিবাসী নয় অথচ এসব স্থান দিয়ে অতিক্রম করে আসে তাদের জন্যে। যারা এসব স্থানের ভেতরে অবস্থানকারী হবে, তাদের ইহরামের স্থান হবে তার গৃহ– এভাবে [ক্রমান্বয়ে নিকটবর্তী লোকেরা নিজ নিজ বাড়ি হতে] এমনকি মক্কাবাসীরা মক্কা হতেই ইহরাম বাঁধবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মীকাতের অর্থ ও তার সংখ্যা : مِيْقَاتٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে مَوَاقِيْتُ ; এর শাব্দিক অর্থ– اَلْمَكَانُ الْمُعَيَّنُ বা নির্ধারিত স্থান।

আর মীকাত-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ওলামায়ে কেরাম বলেন–

هُوَ الْمَكَانُ الَّذِىْ يُحْرِمُ مِنْهُ النَّاسُ لِلْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ الَّذِىْ لَا يَجُوْزُ تَجَاوُزُهُ بِلَا اِحْرَامٍ ـ

অর্থাৎ মীকাত ঐ স্থানকে বলে যেখান থেকে হজ ও ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মানুষ ইহরাম বাঁধে। এতদ্ব্যতীত তা অতিক্রম করা বৈধ নয়।

মীকাতের সংখ্যা ও নাম : হজ ও ওমরা পালনের জন্যে শরিয়ত নির্ধারিত মীকাত মোট পাঁচটি। যথা–

১. **যুল হুলাইফা :** এটা মদিনাবাসী এবং মদিনার পথে আগমনকারী লোকদের জন্য।

২. জুহফা : এটা সিরিয়াবাসী এবং সিরিয়ার পথে আগমনকারী ব্যক্তিদের জন্যে।

৩. **কারনুল মানাযিল :** এটা নজদবাসী এবং এ পথে আগমনকারীদের জন্যে।

৪. **ইয়ালামলাম :** এটা ইয়েমেনবাসী ও পূর্বাঞ্চলীয় লোকদের জন্যে।

৫. **যাতে ইরক :** এটা ইরাকবাসী এবং এ পথে আগমনকারী লোকদের জন্যে। মক্কায় বসবাসকারীদের জন্যে ২টি মীকাত রয়েছে। যথা–

ক. **হিল্ল :** যারা মীকাতের ভিতরে কিন্তু মক্কা নগরীর বাইরে, তাদের জন্যে।

খ. **হারাম :** মক্কায় বসবাসকৃতদের জন্য মীকাত হলো হারাম শরীফ।

ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ : ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করা জায়েজ কিনা এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ আছে।

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَ زُهْرِيِّ وَحَسَنٍ بَصَرِىْ (رحـ) : বাযলুল মাজহূদে আছে– ইমাম শাফেয়ী, যুহরী, হাসান বসরী এবং আহলে জাওয়াহিরদের মতে, যদি হজ ও ওমরার নিয়তে মীকাত অতিক্রম করে মক্কায় পৌছানো হয়, তাহলে ইহরাম ছাড়া যাওয়া জায়েজ নয়। আর যদি ওমরা বা হজ ব্যতীত অন্য কোনো নিয়তে মক্কায় প্রবেশ করে তবে ইহরাম বাঁধার প্রয়োজন নেই।

তাঁদের দলিল : ইমাম শাফেয়ী এবং তাঁর অনুসারীরা নিজ মতামতের পক্ষে নিম্নরূপ দলিল পেশ করেন–

١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ بِهِنَّ (أَىْ هٰذِهِ الْمَوَاقِيْتُ) لَهُنَّ (أَىْ لِاَهْلِ هٰذِهِ الْمَوَاضِعِ) وَلِمَنْ اَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ..... (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ـ

এখানে حَجٌّ ও عُمْرَةٌ-এর قَيْد দ্বারা বুঝা যায়, হজ ও ওমরার জন্যে যে ব্যক্তি না আসবে, তার জন্যে ইহরামের প্রয়োজনীয়তা নেই।

٢- وَفِىْ مُسْلِمٍ وَالنَّسَائِىْ اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَخَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ ـ

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, হুযূর ﷺ মক্কা বিজয়কালে মক্কায় আগমন করেন অথচ ইহরাম বাঁধেননি।

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ وَاَحْمَدُ وَ سُفْيَانَ ثَوْرِىْ وَعَطَاءٍ وَغَيْرِهِمْ : ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থকার বলেন, ইমাম আবূ হানীফা, আহমদ, সুফিয়ান ছাওরী, আতা, লাইছ, মালেক (র.) প্রমুখের মতে اَفَاقِىْ তথা আগন্তুক হজ বা ওমরার নিয়ত করুক বা নাই করুক সকল অবস্থায় ইহরাম বাঁধা জরুরি। ইবনে আব্দুল বার (র.) বলেন– اِنَّ اَكْثَرَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ عَلَى الْقَوْلِ بِالْوَاجِبِ

তাঁদের দলিল : ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর অনুসারীদের দলিল নিম্নরূপ–

١. رَوَى اِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ فِىْ مُصَنَّفِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا يُجَاوِزُ اَحَدُ الْمِيْقَاتَ اِلَّا مُحْرِمًا ـ

٢. رَوَى الشَّافِعِىُّ فِىْ مُسْنَدِهِ عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ اَنَّهُ رَاٰى ابْنَ عَبَّاسٍ (رضـ) يَرُدُّ مَنْ جَاوَزَ الْمِيْقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ هٰكَذَا ـ (رَوَاهُ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ فِىْ مُصَنَّفِهِ)

٣. وَرَوَى اِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِىْ مُسْنَدِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ اِذَا جَاوَزَ الْوَقْتَ اَىِ الْمِيْقَاتَ فَلَمْ يُحْرِمْ حَتّٰى دَخَلَ مَكَّةَ رَجَعَ اِلَى الْوَقْتِ فَاَحْرَمَ ـ

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তাঁর অনুসারীদের দলিলের জবাব :

ক. আলোচ্য হাদীসে যারা হজ বা ওমরা পালনের ইচ্ছা করেনি তাদের প্রতি ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব নয়– এ কথা বলা হয়নি। এটা ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাখ্যা। সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

খ. অথবা বলা যায় যে, এটা রাবীর বক্তব্য মাত্র। অথবা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেই ইহরাম বাঁধার পক্ষে হাদীস রয়েছে।

গ. আলোচ্য হাদীসকে মারফূ' হাদীস বলে মেনে নেওয়া হলেও হানাফীদের পক্ষ হতে উত্থাপিত দলিলের মোকাবিলায় ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাখ্যা (مَفْهُوْمُ مُخَالِفْ) গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

ঘ. মক্কা বিজয়কালে নবী করীম ﷺ বিনা ইহরামে যে প্রবেশ করেছিলেন তা তখনকার সময়ের জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিল। এটা সাধারণ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

এ ক্ষেত্রে স্বয়ং রাসূল ﷺ বলেন–

اِنَّ مَكَّةَ حَرَامٌ لَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِىْ وَلَا بَعْدِىْ اِنَّمَا حَلَّتْ لِىْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حَرَامًا يَعْنِىْ الدُّخُوْلَ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ ـ

বাংলাদেশের অধিবাসী ও মক্কাবাসীদের মীকাত :

مِيْقَاتُ لِاَهْلِ بَنْغَلَادِيْش : রাসূল ﷺ পাঁচটি মীকাত নির্ধারণ করে দিয়ে বললেন– "فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ اَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِنَّ" অর্থাৎ উল্লিখিত স্থানগুলো হচ্ছে ঐ স্থানের অধিবাসীদের মীকাত এবং যারা ঐ স্থান অতিক্রম করে আসে তাদের মীকাত। এ হিসেবে আমাদের বাংলাদেশীদের মীকাত হচ্ছে ইয়ালামলাম। কেননা, আমরা ইয়ালামলামের পথ দিয়ে অতিক্রম করে থাকি।

مِيْقَاتُ اَهْلِ مَكَّةَ : মক্কাবাসীদের হজ ও ওমরার মীকাত নির্ণয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, মক্কাবাসীদের হজ ও ওমরা উভয়ের মীকাত হচ্ছে হেরেম শরীফ।

দলিল : فِىْ حَدِيْثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "حَتّٰى اَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا"

২. ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও অধিকাংশ ফকীহদের মতে, মক্কাবাসীদের হজের মীকাত হচ্ছে হেরেম শরীফ আর ওমরার মীকাত হচ্ছে تَنْعِيْم ও হেরেমের বহির্ভাগ।

তাঁদের দলিল : عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَرَنِىْ اَنْ اَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِىْ مِنَ التَّنْعِيْمِ

لِمَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ -এর ব্যাখ্যা : রাসূল ﷺ -এর বাণী– لِمَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ -এর মর্মার্থ হলো, কেউ যদি হজ কিংবা ওমরা পালনের ইচ্ছা করে, তাহলে তাকে মক্কায় প্রবেশকালে ইহরাম বাঁধতে হবে। এর দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যারা হজ কিংবা ওমরার নিয়ত করবে তারা নির্ধারিত মীকাত হতে ইহরাম বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করবে। আর যাদের হজ কিংবা ওমরা করার ইচ্ছা নেই তারা ইহরাম ছাড়াই মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে। এর উপর ভিত্তি করে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন– مَنْ مَرَّ بِالْمِيْقَاتِ لَا يُرِيْدُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً لَا يَلْزَمُهُ الْاِحْرَامُ لِدُخُوْلِهِ مَكَّةَ

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, হজ কিংবা ওমরার নিয়ত না করলেও কারো জন্য ইহরাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করা জায়েজ হবে না। কারণ, لِمَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ বাক্যটি বর্ণনাকারীর উক্তি, রাসূল ﷺ -এর বাণী নয়। কেননা, রাসূল ﷺ অন্যত্র বলেছেন– لَا يُجَاوِزُ اَحَدُ الْمِيْقَاتَ اِلَّا مُحْرِمًا

মীকাতের পূর্বে ইহরাম বাঁধার হুকুম : মীকাতের পূর্বে ইহরাম বাঁধার বিধান নিয়ে ওলামায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন। যেমন–

১. ইমাম বুখারী ও ইসহাক (র.) বলেন– لَا يَجُوْزُ الْاِحْرَامُ قَبْلَ الْمِيْقَاتِ অর্থাৎ মীকাতের পূর্বে ইহরাম বাঁধা জায়েজ নয়।

দলিল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীস– اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَّتَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ الخ

২. জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন– يَجُوْزُ الْاِحْرَامُ قَبْلَ الْمِيْقَاتِ অর্থাৎ মীকাতের পূর্বে ইহরাম বাঁধা বৈধ।

দলিল : ক. হাদীস–

١. عَمَلُ الصَّحَابَةِ ـ

٢. اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ ـ

খ. **যুক্তি** : রাসূল ﷺ যেসব মীকাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেগুলো ইহরামের সর্বশেষ সীমা। এর অর্থ এই নয় যে, এর পূর্বে ইহরাম বাঁধা জায়েজ নয়।

মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা উত্তম নাকি বাড়ি হতে : মীকাতে পৌঁছে ইহরাম বাঁধা উত্তম না স্বীয় বাসস্থান হতে যাত্রাকালে উত্তম, এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে–

ক. ইমাম মালেক, আহমদ, ইসহাক (র.) প্রমুখের মতে, মীকাত হতে ইহরাম বাঁধা উত্তম।

দলিল : তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস উপস্থাপন করেন–

١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ.

খ. ইমাম আযম (র.) বলেন, যদি কোনো দুর্ঘটনা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে স্বীয় বাসস্থান হতে ইহরাম বাঁধা উত্তম। ইমাম শাফেয়ী ও সুফিয়ান ছাওরী (র.) এ মতই গ্রহণ করেছেন।

দলিল : হযরতইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ ও ইবনে ওমর (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণ মীকাতের পূর্বে ইহরাম বাঁধতেন।

১. উম্মে সালামা বর্ণিত হাদীস– إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ

২. আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হাদীস–

مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

ইমাম মালেক ও আহমাদ (র.) -এর দলিলের জবাব : ইমাম মালেক ও আহমদ (র.) ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীস দ্বারা যে দলিল গ্রহণ করেছেন তার উত্তর এই যে, উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, যুল হুলায়ফা মদীনাবাসীদের ইহরাম বাঁধার শেষ সীমা। এর অর্থ এ নয় যে, যুল-হুলায়ফা হতে ইহরাম বাঁধা উত্তম; বরং উত্তমতার ব্যাপারে তাই গ্রহণযোগ্য যা সাহাবায়ে কেরাম করেছেন, আর সাহাবায়ে কেরাম মীকাতের পূর্বে ইহরাম বেঁধেছেন।

কখন এবং কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন : মক্কা বিজয়ের পূর্বেই নবী করীম ﷺ বুঝতে পেরেছেন যে, অচিরেই মক্কা বিজয় হবে, তখন তিনি এর চতুষ্পার্শ্বে মীকাত বা সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং উক্ত সীমানা বা মীকাতের বাইরে অবস্থানরত যে কোনো লোকের মীকাতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হলে ইহরাম বেঁধে ওমরার নিয়তে প্রবেশ করতে হবে।

ইরাকবাসীদের মীকাত : ইরাকবাসীদের জন্যে ইহরাম বাঁধার মীকাত হচ্ছে 'যাতে ইরক'। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, ইরাকবাসীদের জন্যে মীকাত 'যাতে ইরক'। তবে হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত অন্য এক হাদীসে 'আকীক' নামক স্থানকে ইরাকীদের জন্যে মীকাত নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানা যায়। হাদীস বিশরদগণ এ দু-হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক বলেছেন, 'যাতে ইর্‌ক' হচ্ছে ওয়াজিব মীকাত। আর 'আকীক' হচ্ছে মোস্তাহাব মীকাত। 'যাতে ইরক' বহু দূরে অবস্থিত হওয়ার কারণেই 'আকীক'কে তাদের সুবিধার্থে মোস্তাহাব নিরূপণ করা হয়েছে।

ওমরা ও হজের মধ্যকার পার্থক্য : বিভিন্ন দিক থেকে حَجٌّ এবং عُمْرَةٌ -এর মাঝে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. حَجٌّ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– ইচ্ছা করা, ইরাদা করা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে عُمْرَةٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে জিয়ারত করা। আবার সংকল্প করা অর্থেও এটি ব্যবহৃত হয়।

২. পরিভাষায় হজ বলা হয়–

هُوَ الْقَصْدُ اِلٰى زِيَارَةِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ عَلٰى وَجْهِ التَّعْظِيْمِ بِاَفْعَالٍ مَخْصُوْصَةٍ فِىْ زَمَانٍ مَخْصُوْصٍ -

পক্ষান্তরে ওমরার পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে– اَلْعُمْرَةُ زِيَارَةُ الْكَعْبَةِ وَالطَّوَافِ حَوْلَهَا وَالسَّعْىُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

৩. হজের জন্যে নির্দিষ্ট মাস ও নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, কিন্তু عُمْرَةٌ -এর জন্যে নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই; বরং বছরের যে-কোনো সময় তা আদায় করা যায়।

৪. হজে আরাফার ময়দানে অবস্থান করতে হয়, কিন্তু ওমরাতে আরাফায় যেতে হয় না।

৫. ইমাম মালেক (র.) বলেন, حَجٌّ করা ফরজ, আর عُمْرَةٌ করা সুন্নত।

৬. কেউ বলেন, عُمْرَةٌ -কে ছোট হজ বলা হয় পক্ষান্তরে সাধারণ হজকে বড় হজ বলা হয়।

৭. হজের রোকন তিনটি, পক্ষান্তরে ওমরার রোকন দুটি।

৮. হজ জীবনে মাত্র একবার ফরজ, কিন্তু عُمْرَةٌ একাধিকবার করা যেতে পারে।

৯. হজের ওয়াজিব পাঁচটি, পক্ষান্তরে ওমরার কোনো ওয়াজিব নেই।

وَعَنْ ٢٤٠٣ جَابِرٍ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَهَلُّ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيْقُ الْاٰخَرُ الْجُحْفَةُ وَمَهَلُّ اَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ وَمَهَلُّ اَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ وَمَهَلُّ اَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৪০৩. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মদিনাবাসীদের জন্যে মীকাত হলো 'যুল-হুলাইফা', অন্য পথে [শামের পথে] প্রবেশ করলে 'জুহ্ফা', ইরাকবাসীদের জন্যে মীকাত 'যাতে-ইরক', নজদবাসীদের জন্যে মীকাত 'কার্ন' এবং ইয়েমেনবাসীদের জন্যে মীকাত 'ইয়ালামলাম'। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মদিনাবাসীদের জন্যে ইহরাম বাঁধার উত্তম স্থান : মদিনাবাসীদের ইহ্রাম বাঁধার সর্বোত্তম স্থান কোনটি, এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন–

১. প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আওযায়ী, কাতাদা, আতা (র.) প্রমুখ আলেমদের মতে, সর্বোত্তম স্থান হলো যুল হুলাইফার 'বাইদা' নামক স্থান।

২. প্রসিদ্ধ চার ইমাম তথা ইমাম আযম, শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদ (র.)-এর মতে, যুল-হুলাইফার মসজিদ থেকে ইহরাম বাঁধা সর্বোত্তম। তাঁরা তাঁদের মতের সমর্থনে হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমরের নিম্নোক্ত হাদীস উপস্থাপন করেন–

١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ مَا اَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ اِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِىْ ذِى الْحُلَيْفَةِ -

٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِىْ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ اَحْرَمَ مِنْ مَجْلِسِهٖ فَاَهَلَّ بِالْحَجِّ -

এখানে দ্বিতীয় অভিমতটি অধিক সহীহ ও গ্রহণযোগ্য।

وَعَنْ ٢٤٠٤ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ اِعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ اِلَّا الَّتِىْ كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهٖ عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعِرَّانَةِ حَيْثُ قَسَّمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهٖ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪০৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মোট চারবার ওমরা করেছিলেন। তাঁর হজের সাথে ওমরা ব্যতীত সব কয়টিই জিলকদ মাসে করেছিলেন। এক ওমরা হুদায়বিয়ার সময় জিলকাদ মাসে, আর এক ওমরা 'জিরানা' নামক স্থান হতে যেখানে তিনি হুনায়নের যুদ্ধের গনিমতের মাল বণ্টন করেছিলেন, তাও জিলকদ মাসে, আর অপর ওমরা তাঁর [বিদায়] হজের সাথে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নবী করীম ﷺ কতবার ওমরা করেছেন? রাসূল ﷺ সর্বমোট ক'টি ওমরা করেছেন, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আনাস ও আয়েশা (রা.)-এর মতে, রাসূল ﷺ সর্বমোট চারটি ওমরা করেছেন। যথা–

ক. ৬ষ্ঠ হিজরিতে হুদাইবিয়ার ওমরা। খ. ৭ম হিজরিতে ওমরাতুল কাযা।

গ. ৮ম হিজরিতে ওমরাতুল জি'রানা। ঘ. ১০ম হিজরিতে বিদায় হজের ওমরা।

প্রথম ওমরা ৬ষ্ঠ হিজরিতে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় হয়েছিল। কিন্তু ঐ সময় মক্কার কাফেররা রাসূল ﷺ -কে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল, তখন রাসূল ﷺ সন্ধির ভিত্তিতে সে বছর ফিরে গিয়েছিলেন এবং মনস্থির করেছিলেন যে, আগামী বছর এসে ওমরা সম্পন্ন করবেন। যদিও প্রকৃতপক্ষে ঐ সময় ওমরা পালন করতে পারেননি, কিন্তু তবু তাকেও ওমরার মধ্যে গণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ওমরা ৭ম হিজরির জিলকদ মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যাকে উমরাতুল কাযা বলা হয়। তৃতীয় ওমরা মাকামে জি'রানা হতে এসে আদায় করেছিলেন। তা অষ্টম হিজরির ঘটনা। চতুর্থ ওমরা ১০ম হিজরিতে বিদায় হজের সাথে জিলহজ মাসে আদায় করেছিলেন।

২. হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.)-এর মতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুটি ওমরা করেছেন। যথা– ক. ওমরাতুল কাযা। খ. ওমরাতুল জি'রানা।

উভয় বর্ণনার সমন্বয় এই যে, হযরত বারা (রা.) ঐ ওমরার উল্লেখ করেননি, যা বিদায় হজের সাথে আদায় করা হয়েছে। কারণ তিনি জিলকদ মাসে অনুষ্ঠিত ওমরাসমূহই শুধু গণনা করেছিলেন, যে ওমরা হজের সাথে করেননি। কেননা, ঐ সময় প্রকৃতপক্ষে রাসূল ﷺ সরাসরি ওমরার নিয়তে যথাযথভাবে দু'বারই ওমরা পালন করেছেন।

৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর মতে, তিনটি ওমরা করেছেন। যথা– ক. হুদাইবিয়ার ওমরা। খ. ওমরাতুল কাযা। গ. বিদায়ী হজকালীন ওমরা।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর মাকামে জি'রানায় ওমরার কথা জানা ছিল না বিধায় তিনি তা উল্লেখ করেননি।

উল্লেখ্য যে, নবী করীম ﷺ জিলকদ মাস ব্যতীত ওমরা করতেন না। কারণ, কাফেররা জিলকদ মাসে ওমরা করা নিষিদ্ধ মনে করত। এ ধারণার পূর্ণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তিনি বারবারই জিলকদ মাসে ওমরা করেছেন।

٢٤٠٥ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رضـ) قَالَ اِعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ قَبْلَ اَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

২৪০৫. **অনুবাদ :** হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর [বিদায়] হজের পূর্বে জিলকদ মাসে দু-বার ওমরা করেছিলেন। –[বুখারী]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٤٠٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَامَ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ اَفِىْ كُلِّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَوْ قُلْتُهَا نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوْا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيْعُوْا وَالْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ)

২৪০৬. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপরে হজ ফরজ করেছেন। এটা শুনে হযরত আকরা ইবনে হাবিস দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি প্রত্যেক বছরই? রাসূল ﷺ বললেন, যদি আমি হ্যাঁ বলতাম, তবে তা [প্রত্যেক বছর] ফরজ হয়ে যেত। আর যদি ফরজই হয়ে যেত তবে তোমরা তা সম্পাদন করতে না এবং করতে সমর্থও হতে না। হজ [জীবনে] একবারই [ফরজ]। যে তার বেশি করবে তার জন্যে তা নফল হবে। –[আহমদ, নাসায়ী ও দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ফরজ হজ আদায় করার পর পুনরায় হজ করাকে কোনো কোনো শাফেয়ী মতাবলম্বী ফরজে কিফায়া বলেন। অত্র হাদীস সে কথাকে বাতিল প্রমাণিত করে। কেননা, শরিয়তে এর কোনো নজির নেই। অবশ্য প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর সক্ষম ব্যক্তির পক্ষে হজ করা মোস্তাহাব হওয়ার প্রমাণ আছে; কিন্তু যারা বলে এটা ওয়াজিব, সে কথাও বাতিল। কেননা, এটা ইজমার খেলাফ।

২৪০৭ وَعَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَلَكَ زَادًا وَ رَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ اَنْ يَّمُوْتَ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا وَ ذٰلِكَ اَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَفِيْ اِسْنَادِهٖ مَقَالٌ وَهِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ مَجْهُوْلٌ وَالْحَارِثُ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ)

২৪০৭. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এতটুকু পাথেয় ও বাহনের মালিক হয়েছে যা তাকে আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌছে দেবে, আর সে হজ করবে না, সে ইহুদি বা খ্রিস্টান হয়ে মারা যাক এতে কিছু আসে যায় না। আর এটা এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা বলছেন, 'মানুষের প্রতি আল্লাহর উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহর হজ ফরজ, যার পথের সামর্থ্য আছে।" –[তিরমিযী]

তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব। এর সনদে আপত্তি আছে। এর এক রাবী হিলাল ইবনে আব্দুল্লাহ মাজহূল এবং অপর রাবী হারিছ য'ঈফ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হজ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি সে হজ না করে এবং হজ ফরজ না হওয়ার বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করে তবে এটা হবে কুফরি। আর যদি ফরজ হওয়ার বিশ্বাস পোষণ করে তবে অবহেলা বা গাফলতীর কারণে হজ না করে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে কবীরা গুনাহ হবে। মোটকথা, এ হাদীস হজ পালনের জন্যে কঠোরতম তাগিদবিশেষ। বস্তুত কারো উপরে ফরজ হওয়া সত্ত্বেও জীবনে একবার একে পালন না করে মৃত্যু হওয়ার দ্বারা অস্বীকার করারই পরিচায়ক। যেমন ইহুদি নাসারারা হজকে অস্বীকার করে। সুতরাং এ পর্যায়ে তাদের সাথে মিল রয়েছে। এটা কঠোরতম ধমকি ও বিশেষ সতর্কবাণী।

২৪০৮ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا صَرُوْرَةَ فِي الْاِسْلَامِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৪০৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন। সারূরাহ [সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ না করা] ইসলামে নেই [অর্থাৎ হজ না করা ব্যক্তি পূর্ণ মুসলমান নয়]। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلصَّرُوْرَةُ-**এর অর্থ** : اَلصَّرُّ-এর আভিধানিক অর্থ– বন্ধ করে রাখা, বিরত রাখা, পরিত্যাগ করা ইত্যাদি। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়–

১. কারো মতে, এর অর্থ– সংসার ত্যাগী বৈরাগ্যবাদ তথা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিবাহ বর্জন করা। তখন হাদীসের অর্থ হবে বিবাহ বর্জন করা–বৈরাগ্যবাদ ইসলামে নেই।

২. আবার কেউ বলেন, এর অর্থ– সার্বিক সামর্থ্য ও সম্বল থাকা সত্ত্বেও হজ আদায় না করা। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, হাদীসের প্রকাশ্য অর্থে বুঝা যায় ক্ষমতা ও সম্বল থাকা সত্ত্বেও যে লোক হজ করে না, সে পরিপূর্ণ মুসলমান নয়।

وَعَنْهُ ٢٤٠٩ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُعَجِّلْ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ)

২৪০৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হজ করতে ইচ্ছা করে সে যেন তাড়াতাড়ি করে। –[আবূ দাউদ ও দারিমী]

وَعَنْ ٢٤١٠ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خُبْثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ اِلَّا الْجَنَّةَ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ عُمَرَ اِلٰى قَوْلِهٖ خُبْثَ الْحَدِيْدِ ـ

২৪১০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা হজ ও ওমরা সাথে সাথে সম্পন্ন কর। কেননা, এ দুটি দারিদ্র্য ও পাপ এমনভাবে দূর করে, যেভাবে হাপর লোহা ও সোনা-রুপার ময়লা দূর করে। কবুল হজের ছওয়াব জান্নাত ছাড়া আর নয়। –[তিরমিযী ও নাসায়ী]

আহমদ ও ইবনে মাজাহ হযরত ওমর (রা.) হতে 'লোহার ময়লা' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى قَوْلِهٖ تَابِعُوْا-এর ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লিখিত শব্দটির অর্থ হলো– ওমরা ও হজ উভয়টির নিয়ত করে একই সাথে আদায় কর। এটাকে 'কিরান' বলে। অথবা হজের মাসে প্রথমে ওমরা পরে হজ আদায় কর। এটাকে 'তামাত্তু' বলে। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, ওমরা আগে করলে পরে হজ করবে, বা আগে হজের কাজ সমাধা করলে পরে ওমরা আদায় করবে। অর্থাৎ একই সফরে উভয়টি পর পর আদায় করবে, যেন তার কোনোটি বাদ না পড়ে।

اَلْكِيْرُ পরিচিতি : একে হিন্দীতে বলে ভাট্টি। গরম পানিপূর্ণ পাত্র বা নাইঞ্জাকাপড় পরিষ্কার করার জন্যে এটা ধুপিরা ব্যবহার করে। অথবা কর্মকার বা স্বর্ণকারের এসিড মিশানো পানির পাত্র যাতে লোহা বা সোনা-রুপা পরিষ্কার করা হয়। তবে এটার দ্বারা এখানে কর্মকারের আগুনে তাপ দেওয়ার বায়ুবীয় ঠোংগাকে [হাপর] বুঝানো হয়েছে।

وَعَنْ ٢٤١١ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يُوْجِبُ الْحَجَّ قَالَ اَلزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৪১১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! কিসে হজ ফরজ হয়? তখন রাসূল ﷺ বললেন, পাথেয় ও বাহনে। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

যদিও হজ ফরজ হওয়ার জন্যে আরো কতিপয় শর্ত আছে; কিন্তু স্বাস্থ্য ও পথের সম্বল থাকা অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল শর্ত। সুতরাং মূলকথাটি বলে অন্যান্যগুলো হতে বিরত থেকেছেন। যেমন এক জায়গায় এসেছে যে اَلْحَجُّ الْعَرَفَةُ 'হজ তো আরাফাতের ময়দানে উপস্থিতিই' অর্থাৎ এটা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও আরো অনেক কিছু সম্মিলিত কাজকে হজ বলা হয়।

২৪১২ وَعَنْهُ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا الْحَاجُّ قَالَ الشَّعِثُ التَّفِلُ فَقَامَ اٰخَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْحَجِّ اَفْضَلُ قَالَ الْعَجُّ وَالثَّجُّ فَقَامَ اٰخَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا السَّبِيْلُ قَالَ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ ـ (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَ رُوِىَ ابْنُ مَاجَةَ فِىْ سُنَنِهِ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْفَصْلَ الْاَخِيْرَ)

২৪১২. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল, [ইয়া রাসূলাল্লাহ!] হাজী কে? রাসূল ﷺ বললেন, অগোছালো চুল, সুগন্ধিহীন শরীর। তখন অপর ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! কোন হজ উত্তম? রাসূল ﷺ বললেন, যে হজে লাব্বাইকা বলার সাথে সাথে স্বর উচ্চ করা হয় এবং রক্ত প্রবাহিত করা হয়। অপর ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! [কুরআনে বর্ণিত] সাবীল অর্থ কি? রাসূল ﷺ বললেন, পাথেয় ও বাহন। –[ইমাম বাগবী (র.) শরহুস্ সুন্নাহ-তে এবং ইবনে মাজাহ তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন; তবে তিনি শেষের অংশ বর্ণনা করেননি।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَا الْحَاجُّ -এর ব্যাখ্যা : এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল যে, مَا الْحَاجُّ হজ পালনকারী কে? এখানে مَا الْحَاجُّ -এর অর্থ হলো– مَا صِفَةُ الْحَاجِّ الْكَامِلِ অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ হজ পালনকারীর গুণ বা অবস্থা কি? অথবা এখানে "مَا" বর্ণটি مَنْ -অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন তার অর্থ হবে– مَنِ الْحَاجُّ الْكَامِلُ অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ হজ পালনকারী কে? আল্লামা তীবী (র.) বলেন, مَنْ দ্বারা সাধারণত প্রশ্ন করা হয় কোনো বস্তুর মৌল সত্তা বা তার গুণ সম্পর্কে। তবে এখানে হাজারী গুণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। মহানবী ﷺ উক্ত ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে বললেন– اَلشَّعِثُ التَّفِلُ

اَلشَّعِثُ التَّفِلُ -এর ব্যাখ্যা : اَلشَّعِثُ (بِكَسْرِ الْعَيْنِ) বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যার চুলগুলো ধূলিময় ও এলোমেলো, মোটকথা সৌন্দর্য পরিহারকারী।

اَلتَّفِلُ (بِكَسْرِ الْفَاءِ) অর্থ– থুথু নিক্ষেপকারী। এখানে সুগন্ধিহীন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে।

অর্থাৎ রাসূল ﷺ বললেন, হজ সম্পাদনকারীর অবস্থা হলো এই যে, তার চুলগুলো ধূলিময় থাকবে এবং সে হবে সুগন্ধিহীন। এর অর্থ এ নয় যে, হজ সম্পাদনকারী স্বেচ্ছায় চুলগুলোকে এলোমেলো করে শরীর দুর্গন্ধময় করে রাখবে; বরং এর মর্ম এই যে, ইহরাম অবস্থায় যেহেতু দাড়ি, চুল কাটা-ছাটা কিংবা আঁচড়ানো ও শরীরে তৈল বা সাবান ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ, সুতরাং চুলগুলো এলোমেলো এবং শরীর দুর্গন্ধময় হওয়াই স্বাভাবিক। এরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত আল্লাহ-প্রেমিক।

اَلْعَجُّ وَالثَّجُّ -এর অর্থ : اَلْعَجُّ (بِتَشْدِيْدِ الْجِيْمِ) শব্দটি বাবে ضَرَبَ ও نَصَرَ -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ– স্বর উচ্চ করা। এখানে অর্থ হলো লাব্বাইকা বলার সাথে স্বর উচ্চ করা।

اَلثَّجُّ (بِتَشْدِيْدِ الْجِيْمِ) শব্দটি বাবে نَصَرَ -এর ক্রিয়ামূল। এর আভিধানিক অর্থ– প্রবাহিত করা। এখানে অর্থ– হাদী বা কুরবানির পশুর রক্ত প্রবাহিত করা।

ইহরাম দ্বারা হজের কার্যক্রম শুরু হয় এবং কুরবানি দ্বারা শেষ হয়। সুতরাং এ দুটি উল্লেখ করে হজের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত যাবতীয় কার্যক্রম তথা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মোস্তাহাবকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ রাসূল ﷺ বলেছেন, উত্তম হজ হচ্ছে ঐ হজ যাতে হজের যাবতীয় কার্যক্রম যথারীতি আদায় করা হয়।

وَعَنْ ٢٤١٣ أَبِىْ رَزِيْنِ الْعُقَيْلِيِّ (رضـ) أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أَبِىْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

২৪১৩. অনুবাদ : হযরত আবূ রাযীন ওকাইলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একদা নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা এত বৃদ্ধ যে, তিনি না হজ করতে সমর্থ, না ওমরা করতে। তিনি বাহনেও বসে থাকতে পারেন না। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ ও ওমরা কর। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অন্যের পক্ষ হতে হজ করার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ : অন্যের পক্ষ হতে হজ করা জায়েজ কিনা, এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ إِمَامِ مَالِكٍ (رحـ) :

১. ইমাম মালেক (র.) বলেন, অন্যের পক্ষ থেকে হজ আদায় করা জায়েজ নয়। তবে হজ অনাদায়ী মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে আদায় করা যাবে।

দলিল : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস–

قَالَ رَجُلٌ إِنَّ أُخْتِىْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ فَاقْضِ دَيْنَ اللّٰهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ -

مَذْهَبُ أَبِىْ حَنِيْفَةَ وَشَافِعِىْ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَثَوْرِىْ (رحـ) :

২. ইমাম আবূ হানিফা, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও ছাওরী (র.) প্রমুখের মতে, অন্যের পক্ষ থেকে হজ আদায় করা জায়েজ।

দলিল : ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস– حَدِيْثُ اِمْرَأَةٍ خَثْعَمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِيْهِ "حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ"

৩. হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, অক্ষমতার কারণে হজ করা সম্ভব না হলে প্রতিনিধির মাধ্যমে হজ করানো জায়েজ।

৪. ইমাম মুহাম্মদ ও কাযী আয়ায (র.) বলেন, অন্যের পক্ষ থেকে হজ আদায় করলে তা নিজের পক্ষ থেকে আদায় হবে। যার পক্ষ থেকে করা হয়েছে, সে খরচ বহন করার ছওয়াব লাভ করবে।

৫. হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (র.) বলেন, কোনো অবস্থাতেই হজে প্রতিনিধিত্ব জায়েজ নেই। তিনি এটাকে নামাজ ও রোজার উপর কিয়াস করেছেন।

মোটকথা, অন্যের পক্ষ থেকে হজ আদায় করা জায়েজ। এর উপরই রায় প্রতিষ্ঠিত।

وَعَنْ ٢٤١٤ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ أَخٌ لِىْ أَوْ قَرِيْبٌ لِىْ قَالَ أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ - (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৪১৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, আমি শুবরুমার পক্ষ হতে [হজের উদ্দেশ্যে] হাজির হয়েছি। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, শুবরুমা কে? সে বলল, আমার ভাই অথবা বলল, আমার নিকটাত্মীয়। তখন রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নিজের হজ করেছ কি? সে বলল, না! রাসূল ﷺ বললেন, [প্রথমে] নিজের হজ করবে, অতঃপর শুবরুমার পক্ষ হতে হজ করবে। –[শাফেয়ী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নিজে হজ সম্পাদন না করে অন্যের পক্ষ হতে হজ আদায় করার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ : নিজের উপর অর্পিত হজ আদায় না করে অন্যের প্রতিনিধি হয়ে হজ করা জায়েজ কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ বিদ্যমান। যেমন–

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَ اِسْحَاقَ وَاَوْزَعِيْ (رح) : ইমাম শাফেয়ী (র.), ইসহাক ও আওযায়ী (র.)-এর মতে, নিজের হজ আদায় না করে অন্যের পক্ষে হজ করা জায়েজ নেই।

তাঁদের দলিল :

١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ اَخٌ لِيْ اَوْ قَرِيْبٌ لِيْ قَالَ اَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لَا . قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

٢. وَعَنْهُ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا صَرُوْرَةَ فِي الْاِسْلَامِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

مَذْهَبُ اَئِمَّةٍ ثَلَاثَةٍ : ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতে, নিজের হজ না করেও অন্যের পক্ষে হজ আদায় করা জায়েজ। আহনাফের মতে, মাকরুহের সাথে জায়েজ

তাঁদের দলিল : তাঁরা দলিল হিসেবে حَدِيْثُ اِمْرَأَةٍ خَثْعَمٍ-কে উল্লেখ করেন। কারণ এতে রাসূল ﷺ মহিলাদের নিজের হজের কথা জিজ্ঞেস না করেই বললেন– حُجَّ عَنْ اَبِيْكَ

আইম্মায়ে ছালাছার পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের হাদীসটি মারফূ' না মাওকূফ এতে মুহাদ্দিসগণের মতপার্থক্য রয়েছে। ফলে তা দ্বারা দলিল নেওয়া ঠিক হয়নি।

আর لَا صَرُوْرَةَ فِي الْاِسْلَامِ "হজবিহীন থাকা ইসলামে নেই" হাদীসকে দলিল রূপে পেশ করার জবাবে আবূ উবাইদ ও খাত্তাবী বলেছেন, صَرُوْرَةٌ-এর অর্থ হলো নিঃসঙ্গতা ও বিবাহ পরিহার করা। এটা মু'মিন চরিত্রের পরিপন্থি ও বৈরাগ্য অবলম্বন। সুতরাং তা দ্বারা নিজে হজ করার পূর্বে অপর লোকের পক্ষ হতে হজ করার অবৈধতা প্রমাণ করা যায় না।

অতএব বুঝা যাচ্ছে যে, নিজের হজ সম্পাদন না করেও অন্যের প্রতিনিধিত্ব করে হজ করা যাবে।

হানাফীগণ অত্র হাদীসের বিরোধিতা কিভাবে করেন? আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নিজে হজ আদায় না করে অন্যের পক্ষ থেকে হজ আদায় করা জায়েজ নেই। আহনাফের বক্তব্য হলো, নিজের উপর অর্পিত হজ আদায় না করেও অন্যের পক্ষে হজ করা যাবে। দেখা যাচ্ছে, আহনাফ হাদীসের সরাসরি বিরোধিতা করছেন, যা সঠিক নয়। এ অভিযোগের জবাবে আহনাফ বলেন–

১. উক্ত হযরত শুবরামা (রা.)-এর হাদীস সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচনা রয়েছে। যথা, আল্লামা তাহাবী (র.) বলেন– هٰذَا حَدِيْثٌ مَعْلُوْلٌ আহমদ (র.) বলেন, হাদীস মারফূ' হওয়া ভুল। ইবনে মুনযির (র.) বলেন, হাদীসটি মারফূ' নয়। আর এর বিপরীতে বহু সহীহ হাদীসও রয়েছে। এ জন্যে আহনাফের অবস্থান এ হাদীসের বিপরীতে।

২. অপরদিকে শুবরামা (রা.)-এর হাদীসে অন্যের হজ করার পূর্বে যে নিজের হজ করার নির্দেশ এসেছে তা وُجُوْب-এর জন্যে নয়; বরং তা মোস্তাহাবের জন্যে।

আদ দুররুল মুখতার গ্রন্থকার আল্লামা আইনী (র.) বলেন– اَلْحَجُّ عَنِ الْغَيْرِ قَبْلَ الْحَجِّ عَنْ نَفْسِهِ خِلَافُ اَوْلٰى অর্থাৎ নিজের হজ আদায়ের পূর্বে অন্যের হজ করা উত্তমতার পরিপন্থি। এটাতো হানাফীগণেরই কথা।

وَعَنْهُ ٢٤١٥ قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيْقَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

২৪১৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্বদিকের অধিবাসীদের [ইরাকীদের] জন্যে আকীক [নামক স্থান]-কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। –[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ٢٤١٦ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَّتَ لِاَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

২৪১৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরাকবাসীদের জন্যে যাতে ইরককে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। -[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَلُّ التَّعَارُضِ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ **উভয় হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্বের সমাধান :** এখানে উভয় হাদীসের মধ্যে বাহ্যিকভাবে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয় মূলত উভয়ে মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেননা, প্রথম হাদীসে পূর্বাঞ্চলবাসী দ্বারা ইরাক, জর্দান, সিরিয়া এবং নাজদ ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। এ সমস্ত দেশগুলো মক্কা হতে পূর্ব-উত্তরে অবস্থিত। আর দ্বিতীয় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তাদের মীকাত হতো 'যাতে ইরক'। নবী করীম ﷺ পূর্বাঞ্চলবাসীদের জন্যে একটি মীকাত নির্ধারণ করেছিলেন, পরে হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনামলে যাতায়াত পথ দুটি হওয়ায় উভয়টি মীকাত সাব্যস্ত হয়েছে। অবশ্য 'যাতে ইরক' হতে ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব এবং 'আকীক' হতে মোস্তাহাব ও সতর্কতা। উল্লেখ্য যে, 'আকীক' ও 'যাতে ইরক' পরস্পর সামনাসামনি দুটি স্থানের নাম।

وَعَنْ ٢٤١٧ اُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ اَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى اِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ اَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৪১৭. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি হজ বা ওমরার উদ্দেশ্যে মসজিদে আকসা [বায়তুল মাকদাস] হতে মসজিদে হারাম [বায়তুল্লাহ]-এর দিকে ইহরাম বাঁধবে তার পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে; অথবা তিনি বলেছেন, তার জন্যে জান্নাত অবধারিত হবে। -[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহরাম বাঁধার স্থান যত দূরে হবে ছওয়াবও ততবেশি হবে। আমাদের হানাফীদের মতে মীকাতে পৌছার পূর্বে ইহরাম বাঁধা উত্তম, যদি ইহরাম অবস্থায় এর যাবতীয় বিধিবিধান রক্ষা করে চলা সম্ভব হয়। অন্যথা মীকাত হতেই ইহরাম বাঁধবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মীকাত হতেই ইহরাম বাঁধা উত্তম।

অবশ্য হজের মাসের পূর্বে হজের জন্যে ইহরাম বাঁধা মাকরূহ। বায়তুল মাকদিস হলো একটি উত্তম স্থান, এছাড়া মক্কা মদিনার দিকে যাওয়া হচ্ছে সেই স্থান দুটিও উত্তম। কাজেই গুনাহ মার্জনা হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٤١٨ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ اَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّوْنَ فَلَا يَتَزَوَّدُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ فَاِذَا قَدِمُوْا مَكَّةَ سَاَلُوا النَّاسَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৪১৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়েমেনের অধিবাসীরা হজ করত অথচ পাথেয় সঙ্গে নিত না এবং বলত, আমরা আল্লাহর উপর ভরসাকারী। আর যখন মক্কায় পৌছত লোকের কাছে ভিক্ষা চাইত, তখন আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন "তোমরা পাথেয় সঙ্গে নাও, উত্তম পাথেয় হলো আল্লাহভীতি [অর্থাৎ অপরের কাছে ভিক্ষা না করা]"। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالَى وَتَزَوَّدُوْا-এর অর্থ : পূর্বকালে ইয়েমেনবাসীদের অভ্যাস ছিল যে, হজ করতে যাওয়ার সময় পাথেয় সঙ্গে নিত না। তারা বলত, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করি, অথচ যখন মক্কায় পৌঁছত, তখন লোকদের কাছে ভিক্ষা চাইত। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা নবীর মাধ্যমে তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, تزودوا তোমরা পাথেয় সঙ্গে নাও। অর্থাৎ পানাহারের সামগ্রীসহ সফরের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তু সঙ্গে নাও। অন্যের কাছে পানাহারের সামগ্রী চাওয়া ও মানুষের প্রতি বোঝা হওয়া হতে বিরত থাক। তবে মনে রাখবে যে, পাথেয় অর্জন করতে গিয়ে কোনো অন্যায় আচরণ যেন তোমাদের দ্বারা প্রকাশিত না হয়। কেননা, তাকওয়া বা আল্লাহভীতিই হলো উত্তম পাথেয়।

কারো মতে, এখানে পাথেয় দ্বারা সৎকাজকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, সৎকাজই পরকালীন সফরের একমাত্র সম্বল।

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসে এ কথার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, জীবন নির্বাহের উপায়-অবলম্বন তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ-নির্ভরশীলতার পরিপন্থি নয়; বরং এটাই উত্তম। তবে শুধু আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হয়ে মানসিক অস্থিরতা পরিহার করে কারো কাছে কিছু চাওয়া হতে বিরত থেকে যদি আপন অবস্থায় ঠিক থাকা যায়, তবে এতে কোনো দোষ নেই। আর যদি তাওয়াক্কুলের পথে স্থির না থাকা যায়, তবে এটা হবে সবচেয়ে গর্হিত কাজ, যা মানুষকে সৎপথ হতে বিচ্যুত করে।

২৪১৯ وَعَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيْهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

২৪১৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহিলাদের উপরে কি জিহাদ ফরজ? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তবে তাদের উপর এমন জিহাদ ফরজ যাতে সশস্ত্র যুদ্ধ নেই– তা হজ ও ওমরা। –[ইবনে মাজাহ]

২৪২০ وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ اَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا وَاِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا - (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

২৪২০. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা বাহিলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যাকে সুস্পষ্ট অভাব, অত্যাচারী শাসক বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ব্যাধি হজ হতে বাধা দেয়নি, অথচ সে হজ না করেই মৃত্যুপথে যাত্রা করেছে, সে যদি চায় ইহুদি হয়ে মারা যাক বা খ্রিস্টান হয়ে মারা যাক! –[দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ اَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ : حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ-এর দ্বারা পথের সম্বল ও যানবাহন ইত্যাদির ব্যবস্থা না থাকা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যদি কেউ পথের সম্বলের অভাবে হজ হতে বিরত থাকে তবে এটা দোষের কিছু না। কেননা, হজ ওয়াজিব হওয়ার জন্যে এর ব্যবস্থা থাকা পূর্বশর্ত।

سُلْطَانٌ جَائِرٌ-এর দ্বারা পথের নিরাপত্তা ইত্যাদির কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যদি কোনো অত্যাচারী শাসক বাধা সৃষ্টি করে, কিংবা পথে জান-মালের নিরাপত্তা নেই, ডাকাত-দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয় আছে। এটাও পূর্বশর্ত।

مَرَضٌ حَابِسٌ-এমন রোগ যা কঠিন। মোটকথা, হজ ওয়াজিব হওয়ার জন্যে এটারও পূর্বশর্ত হলো উক্ত ব্যক্তি দৈহিক সুস্থ থাকতে হবে। উল্লিখিত এ তিন কারণে হজ হতে বিরত থাকা বৈধ। কিন্তু এর কোনো একটিও যদি না থাকে তবুও যদি সে হজ না করে মৃত্যুবরণ করে তবে তার মৃত্যু ইহুদি নাসারার মতোই হলো।

وَعَنْ ٢٤٢١ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَلْحَاجُّ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللّٰهِ اِنْ دَعَوْهُ اَجَابَهُمْ وَاِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَ لَهُمْ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

২৪২১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, হজ ও ওমরাকারীগণ আল্লাহর দাওয়াতী মেহমান দল। অতএব, তারা যদি তার কাছে দোয়া করেন তিনি তা কবুল করেন, আর যদি তাঁর কাছে ক্ষমা চান তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। –[ইবনে মাজাহ]

وَعَنْهُ ٢٤٢٢ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَفْدُ اللّٰهِ ثَلٰثَةٌ اَلْغَازِىْ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ - (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

২৪২২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলার মেহমান তিন ব্যক্তি। ইসলামের জন্যে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, হজকারী ও ওমরাকারী। –[নাসায়ী ও বায়হাকী]

ইমাম বায়হাকী (র.) শু'আবুল ঈমানে অত্র হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এখানে ثَلٰثَةٌ শব্দ দ্বারা তিন ব্যক্তি কিংবা তিন সম্প্রদায় উভয়টি উদ্দেশ্য হতে পারে। 'গাজী' এ জন্যে যে, সে নিজের জান ও মাল উভয় জিনিস দ্বারা আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করা বা সমুন্নত রাখার কাজে নিয়োজিত। আর হাজী ও ওমরাকারী সফরের দুঃখ সহ্য করলে শারীরিক ও আর্থিক কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে পরিবার-পরিজনের বিচ্ছেদ-বেদনা ভোগ করে আল্লাহর ঘর ও নবীর জিয়ারতে নিষ্ঠার সাথে বের হয়। তাই মানুষের কাছেও সম্মান এবং আল্লাহর কাছেও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

وَعَنِ ٢٤٢٣ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا لَقِيْتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ وَمُرْهُ اَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَاِنَّهُ مَغْفُوْرٌ لَهُ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

২৪২৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তুমি কোনো হাজীর সাক্ষাৎ পাবে, তাকে সালাম করবে এবং তার সাথে করমর্দন করবে, আর তার গৃহে প্রবেশ করার পূর্বেই তোমার জন্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে অনুরোধ করবে। কেননা, তিনি ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তি। –[আহমাদ]

وَعَنْ ٢٤٢٤ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا اَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِىْ طَرِيْقِهِ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَجْرَ الْغَازِىْ وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

২৪২৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হজ ওমরা বা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হবে আর পথেই মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে গাজী, হাজী ও ওমরাকারীর ছওয়াব লিখবেন।

–[বায়হাকী শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে অত্র হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]

بَابُ الْاِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ
পরিচ্ছেদ : ইহরাম ও তালবিয়াহ

اَلْاِحْرَامُ শব্দটি حَرَامٌ হতে নির্গত। অর্থ হলো কোনো জিনিসকে নিজের উপর হারাম করে নেওয়া। এটা হজের প্রথম কাজ। এর মাধ্যমে হজে গমনকারী ব্যক্তি নিজের উপর স্ত্রীসহবাস, চুল ও নখ কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার, সেলাই করা পোশাক পরিধান করা এবং শিকার করাসহ কতিপয় বিষয়কে হারাম করে। তবে এখানে হজ ও ওমরার নিয়ত করে তালবিয়াহ পাঠ করাকে اِحْرَام বলা হয়।

আর তালবিয়াহ অর্থ– "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা ...."এ দোয়াটি পাঠ করা। হানাফীদের মতে, ইহরামের জন্যে তালবিয়াহ পাঠ করা শর্ত। অতএব, ইহরাম বাঁধার সময় তালবিয়্যাহ পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। আলোচ্য পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٤٢٥ - عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِاِحْرَامِهٖ قَبْلَ اَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهٖ قَبْلَ اَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ بِطِيْبٍ فِيْهِ مِسْكٌ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِىْ مَفَارِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪২৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর ইহরামের জন্যে ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং ইহরাম খোলার জন্যে তার বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফের পূর্বে সুগন্ধি লাগাতাম– তা এমন সুগন্ধি যাতে মেশক থাকত। যেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সীতায় এখনও সুগন্ধির শুভ্রচিহ্ন দেখতে পাচ্ছি অথচ তখন তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইহরামের পূর্বে সুগন্ধি লাগানোর ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ : ইহরাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং ইহরামের পর তার প্রভাব বিদ্যমান থাকার বিষয়ে ইমামগণের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ اِمَامِ مَالِكٍ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) : ইমাম মালেক ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, ইহরাম বাঁধার সময় সুগন্ধি লাগালে এবং ইহরাম বাঁধার পরে তার সুগন্ধি বিদ্যমান থাকলে মাকরূহ হবে। হিদায়া ও আশিয়াতুল লুমআত গ্রন্থকারদ্বয় লিখেছেন, এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও মাযহাব। তাঁরা বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইয়ার হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। ইয়া'লা (রা.) বলেছেন, এক বেদুঈন সহসা রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে পৌঁছল, তার গায়ে ছিল জুব্বা, আর শরীরে ছিল স্থূল সুগন্ধি মাখানো। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি ওমরার ইহরাম বেঁধেছি আর আমার গায়ে এসব রয়েছে। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তোমার শরীরের সুগন্ধি সম্পর্কে কথা হলো যে, তুমি তা তিনবার করে ধুয়ে ফেল, আর জুব্বা সম্পর্কে কথা হলো যে, তা খুলে ফেল। অতঃপর যেভাবে হজ কর সেভাবে তোমরা ওমরাতে কর।

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ وَاَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَحْمَدَ (رحـ) : ইমাম আযম, আহমদ ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে, ইহরাম বাঁধার পূর্বে এমন সুগন্ধি লাগানো যার প্রভাব ইহরাম বাঁধার পরেও বিদ্যমান থাকে তা জায়েজ। তাঁরা আলোচ্য হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। এছাড়া তাঁরা নিজেদের মতের পক্ষে নিম্নলিখিত হাদীসগুলোও পেশ করেন–

ক. হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, আমরা ইহরাম বাঁধার পূর্বে আমাদের মুখমণ্ডলে সুগন্ধি মেশক মাখতাম। অতঃপর আমরা তার সিক্ত রসসহই ইহরাম বাঁধতাম, তা আমাদের মুখমণ্ডলে আর্দ্রতা ছড়াত। তখন আমরা নবী করীম ﷺ -এর সাথেই থাকতাম। তিনি আমাদেরকে নিষেধ করতেন না। –[আবূ দাউদ ও ইবনে আবূ শায়বা]

এ হাদীস ইহরামের পরেও সুগন্ধি বর্তমান থাকার বৈধতার পক্ষে প্রমাণ।

খ. এছাড়া ইহরাম বাঁধার পরে সুগন্ধি লাগানো নিষিদ্ধ। তবে সুগন্ধি অবশিষ্ট থাকাটা সুগন্ধি লাগানো নয়। সুতরাং তা নিষিদ্ধ হবে না।

গ. সাঈদ ইবনে মানসূর (র.) সহীহ সনদে হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন– আমার পিতা যখন ইহরাম বাঁধতেন তখন আমি তাঁর ইহরামের জন্যে মেশকের সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।

বিপরীত মত পোষণকারীদের দলিলের জবাব : প্রথমোক্ত দলের জবাবে বলা হয়েছে–

১. তাঁরা হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইয়ার যে হাদীস নিয়েছেন তাতে ধোয়ার জন্যে এ কারণে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ঐ সুগন্ধিতে জা ফরান ছিল, যা পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ। ইমাম আহমাদ (র.) তাঁর মুসনাদে জা'ফরানের কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন।

২. অথবা, হযরত ইয়া'লা বর্ণিত হাদীস রহিত হয়ে গেছে। কারণ তা ছিল মাকামে জি'রানার ঘটনা। হাদীসে স্পষ্টভাবে মাকামে জি'রানার কথা বলা হয়েছে। এটা অষ্টম হিজরির ব্যাপার। আর হযরত আয়েশা (রা.) রাসূল ﷺ -কে যে সুগন্ধি লাগিয়েছিলেন, তা বিদায় হজকালে দশম হিজরির ঘটনা। সুতরাং হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা ইয়া'লা ইবনে উমাইয়ার হাদীস রহিত হয়ে গেছে। অতএব এটা দ্বারা দলিল গ্রহণ বিশুদ্ধ হবে না।

মুহরিম ব্যক্তির ভুলবশত সুগন্ধি লাগালে তার হুকুম :

১. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ভুলবশত কিংবা অজ্ঞাত কারণে কোনো মুহরিম খোশবু গায়ে লাগালে এবং সাথে সাথে ধুয়ে ফেললে কাফফারা আদায় করতে হবে না।

২. ইমাম মালেক (র.)-ও বলেন, সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে ফেললে কাফফারা লাগবে না। কেননা, নবী করীম ﷺ উক্ত বেদুঈনকে শুধু খোশবুটি ধুয়ে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন, কাফফারা আদায় করার কথা বলেননি। কেননা, সে না জানার কারণে এ কাজ করেছিল

৩. কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ও আহমদ (র.) বলেন, যে কোনো অবস্থাতেই মুহরিম খোশবু লাগালে কাফফারা আদায় করতে হবে। এ ব্যাপারে অজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে ভুলের বা অজ্ঞতার কারণে গুনাহ হবে না।

আর উক্ত বেদুঈনকে কাফফারা আদায়ের কথা না বলার কারণ হলো তখনো এ বিধান বা প্রত্যাদেশ নাজিল হয়নি। "অজ্ঞতার কারণে কাজটি সংঘটিত হয়েছিল বিধায় কাফফারার নির্দেশ দেওয়া হয়নি" এমন কথা বলা ঠিক হবে না।

তওয়াফের অর্থ ও তার সংখ্যা : طَوَافٌ শব্দটি বাবে نَصَرَ -এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ হলো–ঘুরা বা প্রদক্ষিণ করা। শরিয়তের পরিভাষায় বিশেষ পদ্ধতিতে বায়তুল্লাহ শরীফ প্রদক্ষিণ করাকে তওয়াফ বলা হয়। হাজরে আসওয়াদ স্থাপিত কোণ হতে শুরু করে বায়তুল্লাহর চতুষ্পার্শ্বে একবার ঘুরে আসাকে এক 'শওত' বা চক্কর বলা হয়। এরূপ সাত চক্করে হয় এক তওয়াফ। একজন হজ্জ সম্পাদনকারীকে এভাবে তিনবার তওয়াফ করতে হয়। তওয়াফের সংখ্যা মোট ৩টি–

ক. বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছার সাথে সাথে তওয়াফ করা। এ প্রকার তওয়াফকে তওয়াফুল কুদূম (طَوَافُ الْقُدُوْمِ) বলা হয়। এটা বহিরাগতদের জন্যে সুন্নত।

খ. জিলহজ্জের ১০ বা ১১ তারিখ অথবা ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে তওয়াফ করা। এ প্রকার তওয়াফকে তওয়াফুল ইয়াফা বা তাওয়াফুয যিয়ারত (طَوَافُ الْاِفَاضَةِ اَوْ طَوَافُ الزِّيَارَةِ) বলা হয়। এটা ফরজ।

গ. মক্কা হতে বিদায়কালে তওয়াফ করতে হয়। একে তওয়াফুস সদর বা তওয়াফুল বিদা' (طَوَافُ الصَّدْرِ اَوْ طَوَافُ الْوَدَاعِ) বলা হয়। এটা বহিরাগতদের জন্যে ওয়াজিব, মক্কাবাসীদের জন্যে নয়।

وَعَنْ ٢٤٢٦ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُوْلُ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَا يَزِيْدُ عَلٰى هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪২৬. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে চুল জড়ানো অবস্থায় তালবিয়াহ পাঠ করতে শুনেছি। রাসূল ﷺ বলেছেন– "লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলকা; লা শারীকা লাকা" "হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে হাজির হয়েছি, আমি তোমার সমীপে হাজির হয়েছি। আমি তোমার সমীপে হাজির হয়েছি। তোমার কোনো অংশীদার নেই, আমি তোমার সমীপে হাজির হয়েছি। সব প্রশংসা ও অনুগ্রহের দান তোমারই এবং সার্বভৌমত্বও তোমারই। তোমার কোনো অংশীদার নেই।" এ কয়টি কথার বেশি কিছু বলেননি। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُلَبِّدُ -এর অর্থ এবং এর হুকুম সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : مُلَبِّدٌ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل হতে اِسْم فَاعِلٌ -এর সীগাহ। শাব্দিক অর্থ হলো– মাথার চুলকে জড়িয়ে। তবে এর পরিচিতি নিয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে, যথা–

ক. মিশকাত শরীফের হাশিয়াতে বলা হয়েছে–

هُوَ اَنْ يَجْعَلَ الْمُحْرِمُ فِيْ رَأْسِهٖ شَيْئًا مِنْ صَمْغٍ اَوْ غَيْرِهٖ لِيَتَلَبَّدَ شَعْرُهٗ وَيَنْضَمَّ بَعْضُهٗ بِبَعْضٍ دَفْعًا لِلشَّعْثِ .

অর্থাৎ মুহরিম ব্যক্তির মাথায় মেহেদি বা অন্য কিছু রাখা যাতে তার মাথায় ধুলাবালি মিশতে না পারে।

খ. ইবনে মালেক (র.) বলেন, ধুলাবালি, বিষাক্ত কীট, রৌদ্রতাপ ইত্যাদি থেকে মাথা হেফাজতকরণার্থে মেহেদি ও খাতামা [ঔষধী গাছ] মিশ্রিত করে চুল জড়িয়ে রাখাকে تَلْبِيْد বলে। আর مُلَبِّدٌ হলেন, যিনি এ কাজ করেন।

তালবীদ-এর ব্যাপারে ইমামগণের মতামত : মুহরিমের জন্যে তালবীদ জায়েজ কিনা? এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে।

ক. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মুহরিমের জন্যে তালবীদ জায়েজ। এতে ইহরামের কোনো অসুবিধা হবে না।

দলিল : حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُهِلُّ مُلَبِّدًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

খ. ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, ইহরাম অবস্থায় তালবীদ জায়েজ নেই। ইহরাম বাঁধার পর এ ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করলে ইহরাম নষ্ট হয়ে যাবে।

আকলী দলিল : لِاَنَّ التَّلْبِيْدَ تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ অর্থাৎ তালবীদ হলো মাথা ঢেকে রাখারই নামান্তর। আর ইহরাম অবস্থায় মাথা খুলে রাখতে হয়। ঢেকে রাখলে ইহরাম ভঙ্গ হয়ে যায়।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব : তাঁরা হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসের জবাব দেন, উক্ত হাদীসে তালবীদের কথা রয়েছে। সম্ভবত এ তালবীদের দ্বারা আভিধানিক তালবীদ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ চুলকে এমনভাবে একত্র করে রেখ যাতে তা ইতস্তত বিভক্ত হয়ে না যায়, ফলে মুহরিমের অসুবিধা হয়। তাতে কোনো বস্তু চুলে মেখে চুলকে জড়ানো অর্থ নয়।

মাকদাসী (র.) জবাবে বলেন, রাসূল ﷺ যে তালবীদ করেছিলেন তা জায়েজ পদ্ধতির ছিল। তাতে মাথাকে ঢেকে ফেলা হয়নি। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল, হাজী কে? রাসূল ﷺ বললেন, যে ব্যক্তির এলোমেলো কেশ ও দুর্গন্ধ শরীর। اَلشَّعْثُ বলতে এলোমেলো ও ছড়ানো চুলকে বুঝায়। তালবীদ করলে তো চুল ছাড়ানো থাকবে না। এর জবাবে বলা হয়েছে, "شَعْثٌ" শব্দের দ্বারা শাব্দিক অর্থে এলো চুল বুঝানো হয়নি; বরং সৌন্দর্য ও পরিপাটি পরিত্যাগ বুঝিয়েছে। তালবীদ সৌন্দর্যের উপকরণ নয়; বরং চুল এলোমেলো ও ছড়ানো থাকলে যে কষ্ট হয় তা প্রতিরোধ করা।

لَبَّيْكَ শব্দের বিশ্লেষণ ও এর অর্থ : لَبَّيْكَ শব্দটি মূলে কি ছিল এ বিষয়ে এবং এর অর্থ নিয়েও ইমামগণের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

১. সাইবুভীয়া ও তাঁর অনুসারীগণ বলেন, লাব্বাইকা (لَبَّيْكَ) দ্বিবচন। তার দ্বারা অধিক বুঝানো হয়েছে।

২. ভাষাবিদ ইউনুস (র.) বলেছেন, শব্দটি মুফরাদ। لَبَّ শব্দের আলিফ "كَ" সর্বনামের সাথে মিশে থাকাতে "ى" -তে রূপান্তরিত হয়ে لَبَّيْكَ হয়েছে।

৩. ফাররা বলেন, তা মাফঊলে মুতলাক (مَفْعُول مُطْلَقٌ) -এর ভিত্তিতে মানসূব (مَنْصُوْب) হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শব্দটি لَبًّا لَكَ তাকীদের জন্যে দ্বিবচন করা হয়েছে। তাহলে বাক্যাংশ দাঁড়ায়– اِلْبَابًا بَعْدَ اِلْبَابٍ তার দ্বারা অধিক ও প্রবৃদ্ধি বুঝানো উদ্দেশ্য।

এর অর্থ সম্পর্কেও বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়–

১. اِتِّجَاهِىْ وَقَصْدِىْ اِلَيْكَ অর্থাৎ আমার অভিপ্রায় ও ইচ্ছা সবই আপনার প্রতি নিবেদিত।

২. مَحَبَّتِىْ لَكَ তথা আমার প্রেম-ভালোবাসা আপনারই জন্যে।

৩. اِخْلَاصِىْ لَكَ অর্থাৎ আপনারই জন্যে আমার একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা।

৪. اَلَبَّيْتُ يَا رَبِّ بِخِدْمَتِكَ اِلْبَابًا بَعْدَ اِلْبَابٍ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি বারবার আপনার খেদমতে উপস্থিত হচ্ছি।

৫. اَجَبْتُ دَعْوَتَكَ اِجَابَةً بَعْدَ اِجَابَةٍ অর্থাৎ আপনার আহ্বানে আমি একের পর এক সাড়া দিচ্ছি।

৬. এর অর্থ اَنَا مُقِيْمٌ عَلٰى طَاعَتِكَ "আমি আপনার আনুগত্যে দণ্ডায়মান আছি"। আরবি ভাষায় এরূপ তখনই বলা হয় যখন কোনো ভৃত্য তার মনিবের নির্দেশ পালনার্থে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

৭. অথবা, এর অর্থ قُرْبًا مِنْكَ "আমি আপনার নিকটেই আছি"। কেননা, اِلْبَابٌ-এর এক অর্থ নিকটবর্তী হওয়া।

৮. অথবা, এর অর্থ اِجَابَةٌ لَازِمَةٌ "কারো ডাকে বাধ্যতামূলকভাবে সাড়া দেওয়া"। এ শেষ অর্থটি বেশি প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত।

নবী করীম ﷺ -এর তালবিয়াহ পাঠের অতিরিক্ত পড়া জায়েজ আছে কিনা এ বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ : রাসূল ﷺ যে তালবিয়াহ পাঠ করেছিলেন তাতে আরো কিছু শব্দ সংযোজন করে বলা জায়েজ কিনা এ ব্যাপারে ইমামগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ وَاَبِىْ يُوْسُفَ وَطَحَاوِىْ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী, আবূ ইউসুফ, তাহাবী (র.) প্রমুখের মতে, রাসূল ﷺ -এর তালবিয়াহ পাঠের চেয়ে অতিরিক্ত শব্দ যোগে তালবিয়াহ পাঠ করা জায়েজ নেই।

দলিল : হাদীস–

١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) فِيْهِ لَا يَزِيْدُ عَلٰى هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

٢. عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رضـ) اَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ فَقَالَ سَعْدٌ اِنَّهُ لَذُو الْمَعَارِجِ مَا هٰذَا كُنَّا نُلَبِّىْ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ. (الطَّحَاوِىْ)

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَمُحَمَّدٍ وَثَوْرِىْ (رحـ) وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, মুহাম্মদ ও ছাওরী (র.) প্রমুখের মতে, তালবিয়াহ পাঠে রাসূল ﷺ -এর চেয়ে বাড়িয়ে বলা জায়েজ আছে।

দলিল : হাদীস–

١- عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ اَهَلَّ النَّبِىُّ ﷺ فَذَكَرَ التَّلْبِيَةَ قَالَ جَابِرٌ (رضـ) وَالنَّاسُ يَزِيْدُوْنَ ذَا الْمَعَارِجِ وَنَحْوَهُ مِنَ الْكَلَامِ وَالنَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَسْمَعُ فَلَا يَقُوْلُ لَهُمْ شَيْئًا. (اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর তালবিয়া ছিল "لَبَّيْكَ اِلٰهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ" 'লাব্বাইকা ইলাহুল হাক্কি লাব্বাইকা' ..... । – এতেও অতিরিক্ত বলা প্রমাণিত হয়। –[নাসাঈ, ইবনে মাজাহ]

৩. হযরত নাফে' (রা.) হতে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) তালবিয়াতে বাড়িয়ে বলেন– لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ লাব্বাইকা লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা ওয়াল খাইরু বি-ইয়াদাইকা ওয়ার রাগবাউ ইলাইকা ওয়াল আমালু। –[মুসলিম]

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি তালবিয়াহ পাঠকালে বলেন, 'লাব্বাইকা আদাদুল হাসাওয়াত্ তুরাব'।

৫. হাকিম (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি একবার আরাফাতে অবস্থান করেন। যখন নবী করীম ﷺ বললেন, 'লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইকা' তখন রাসূল ﷺ বললেন, إِنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرُ الْاٰخِرَةِ 'ইন্নামাল খাইরু খাইরুল আখিরাতি'। হাকিম (র.) বলেন, এটা সহীহ হাদীস।

৬. মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র.) ইয়াহইয়া ইবনে সীরীন (র.) হতে, তিনি আনাস ইবনে সীরীন (র.) হতে এবং তিনি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– لَبَّيْكَ حَجًّا حَقًّا تَعَبُّدًا وَرِقًّا 'লাব্বাইকা হাজ্জান হাক্কান তা'আব্বুদান ওরাক্কান"। –[দারাকুতনী]

এ হাদীসে একটা আশ্চর্য লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, তাদের তিন ভাই একত্র হয়েছেন। তারা একে অপর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এটা ছাড়া অন্য কোনো হাদীসে এরূপ দেখা যায়নি।

বিপরীত মতপোষণকারীদের দলিলের জবাব :

১. প্রথম দলের ইমামগণ প্রথমত ইবনে ওমরের হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। তাতে হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে 'লা শারীকা লাকা' পর্যন্ত বলতে শুনেছি, তার বেশি বলতে শুনিনি। এ 'না শুনা'-এর দ্বারা প্রমাণ না হওয়া বুঝায় না। বিশেষভাবে যখন স্বয়ং হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতেই অতিরিক্ত বলার প্রমাণ রয়েছে।

২. অথবা জবাব এই যে, 'লা শারীকা লাকা' পর্যন্ত বলাই যথেষ্ট। এটা যথেষ্ট হওয়ার জন্যে সর্বনিম্ন পরিমাণ। এর দ্বারা অতিরিক্ত বলা জায়েজ না হওয়া প্রমাণ হয় না; বরং এর অর্থ এই যে, তা হতে কমাবে না। –[হিদায়া]

৩. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) জবাব দিয়েছেন, হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, তার উপরে যথেষ্টকরণই উত্তম। কেননা, নবী করীম ﷺ সর্বদা এরূপই করতেন।

৪. তাঁদের দ্বিতীয় দলিলে হযরত সা'দ (রা.)-এর হাদীসেও অতিরিক্ত বলা নাজায়েজ প্রমাণিত হয় না।

٢٤٢٧ - وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اَدْخَلَ رِجْلَهُ فِى الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً اَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪২৭. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর পবিত্র পা রিকাবে প্রবেশ করিয়েছিলেন আর তাঁর উষ্ট্রী তাকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন তিনি যুল-হুলাইফা মসজিদের নিকট তালবিয়া পাঠ করেছিলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নবী করীম ﷺ-এর বিদায়ী হজের ইহরামের স্থান সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : বিদায় হজে রওয়ানা হলে নবী করীম ﷺ পথে কোন জায়গায় ইহরাম বেঁধেছিলেন, এ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়।

এক বর্ণনায় দেখা যায় যুল-হুলাইফায় যেখানে তিনি আসরের নামাজ আদায় করেছেন, নামাজের মসল্লায় বসেই ইহরাম বেঁধে তালবিয়াহ পাঠ করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের বর্ণনায় আছে, যখন তিনি নামাজের পর সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে চড়েই ইহরাম বেঁধেছেন। হযরত জাবের (রা.) হতে অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি যুল-হুলাইফা হতে আরো কিছু দূর অগ্রসর হয়ে 'বায়দা' নামক স্থানে ইহরাম বেঁধেছেন। এটাই হলো হাদীসের বিভিন্নতা।

এর সমাধানে বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে এ সকল বর্ণনার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। তবুও বিভিন্নতার কারণ হলো নবী করীম ﷺ -এর একমাত্র হজ। এতে মুসলমানরা হজের কার্যক্রম বা হুকুম-আহকাম হতে ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাই নবী করীম ﷺ মুসলমানদেরকে হজের কার্যক্রম দেখাবার এবং শিক্ষা দেওয়ার জন্যে স্থানে স্থানে পুনঃপুনঃ তালবিয়াহ পাঠ করেছেন। অর্থাৎ

প্রথমে মসল্লায়, পরে সওয়ারিতে আরোহণ করে, পরে বায়দায় পৌঁছে তালবিয়াহ পড়েছেন। অপর দিকে লোকের ছিল অত্যধিক ভিড়। ইতিহাস হতে জানা যায় প্রায় সোয়া লক্ষ মুসলমান সে হজে সমবেত হয়েছিলেন। সুতরাং যে যেখানেই নবী করীম ﷺ -কে তালবিয়াহ পাঠ করতে দেখেছে বা শুনার সুযোগ পেয়েছে সে সেখানের কথাই বলেছে।

অনুরূপভাবে নবী করীম ﷺ -এর হজের প্রকার সম্পর্কেও বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কেউ বলেন, তিনি ছিলেন 'মুফরিদ'। আবার কেউ বলেন, তিনি ছিলেন 'মুতামাত্তি'। আবার এক সম্প্রদায় বলেন, তিনি ছিলেন 'ক্বারিন'। কিন্তু বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য প্রমাণে পাওয়া যায় যে, নবী করীম ﷺ বিদায় হজে 'ক্বারিন' ছিলেন; ফলে সঙ্গীদের মধ্যে যিনি শুনেছেন যে, নবী করীম ﷺ হজ ও ওমরা উভয়টির তালবিয়াহ একসাথে পাঠ করতেন, তখন তিনি বুঝেছেন যে, তিনি তো 'ক্বারিন'। আর যিনি এর ব্যতিক্রম কিছু শুনেছেন, তিনি তার অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আলোচ্য বিষয়টিও অনুরূপ।

وَعَنْ ٢٤٢٨ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৪২৮. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে [হজের উদ্দেশ্যে] বের হলাম, আর হজে উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ করতে থাকলাম [অর্থাৎ জোরে জোরে তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকলাম]। -[মুসলিম]

وَعَنْ ٢٤٢٩ اَنَسٍ (رض) قَالَ كُنْتُ رَدِيْفَ اَبِىْ طَلْحَةَ وَاِنَّهُمْ لَيَصْرُخُوْنَ بِهِمَا جَمِيْعًا اَلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৪২৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সওয়ারিতে আবূ তালহার পেছনে উপবিষ্ট ছিলাম তখন সাহাবীগণ সকলে হজ ও ওমরার জন্যে চিৎকার [তালবিয়াহ পাঠ] করছিলেন। -[বুখারী]

وَعَنْ ٢٤٣٠ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَاَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَاَمَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَ اَمَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ اَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوْا حَتّٰى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪৩০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজের বছর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে [হজের উদ্দেশ্যে] বের হলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ওমরার ইহরাম বাঁধলেন, অপর একজন হজ ও ওমরা উভয়ের ইহরাম বাঁধলেন, আবার কেউ কেউ শুধু হজের ইহরাম বাঁধলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু হজের ইহরাম বাঁধলেন, অতএব যারা শুধু ওমরার জন্যে ইহরাম বেঁধেছিলেন তারা [তওয়াফ ও সায়ীর পর] হালাল হলেন। আর যারা হজ বা একসাথে হজ ও ওমরা উভয়ের ইহরাম বেঁধেছিলেন তারা কুরবানির দিন না আসা পর্যন্ত হালাল হলেন না। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٢٤٣١ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ بَدَأَ فَاَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ اَهَلَّ بِالْحَجِّ - (متفق عليه)

২৪৩১. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজের সাথে ওমরারও উপকারিতা লাভ করেছিলেন [অর্থাৎ তামাত্তু' হজ করেছিলেন]। তিনি এভাবে শুরু করেছিলেন যে, প্রথমে ওমরার জন্যে তালবিয়াহ পাঠ করেছিলেন, অতঃপর হজের জন্যে তালবিয়াহ পাঠ করেছিলেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উত্তম হজ সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : তিন প্রকার হজের মধ্যে কোনটি সর্বোত্তম, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম আহমদ (র.) বলেন, হজ্জে তামাত্তু' উত্তম। তিনি নিম্নোক্ত দলিলসমূহ পেশ করেন–

١. قَوْلُهُ تَعَالٰى "فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ" .

٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

٣. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ .

২. ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.) বলেন, হজ্জে ইফরাদ উত্তম, তারপর তামাত্তু' তারপর ক্বিরান।

তাঁদের দলিলসমূহ :

١. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا .

٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ .

٣. عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ أَفْرَدُوْا بِالْحَجِّ .

৩. ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইসহাক ও ছাওরী (র.) প্রমুখের মতে, হজ্জে ক্বিরান হলো সর্বোত্তম হজ, তারপর তামাত্তু', তারপর ইফরাদ। এটাই অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর অভিমত।

তাঁদের দলিল :

١. قَوْلُهُ تَعَالٰى "أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ" .

٢. عَنْ أَنَسٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ .

٣. عَنْ جَابِرٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ .

٤. عَنْ عُمَرَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِوَادِى الْعَقِيْقِ يَقُوْلُ أَتَانِى اللَّيْلَةَ اٰتٍ مِنْ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ صَلِّ فِىْ هٰذَا الْوَادِ الْمُبَارَكِ رَكْعَتَيْنِ وَقُلْ عُمْرَةً فِىْ حَجَّةٍ .

নবীদের স্বপ্ন ওহী, আর ওহীর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ হতে কিরানের হুকুম দেওয়া হয়েছে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জে ক্বিরানই আদায় করেছিলেন।

٥. عَنِ الصَّبِىِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ عُمَرُ هُدِيْتُ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ . (أَبُوْ دَاوُدَ - نَسَائِىْ)

ক্বিরানকে হযরত ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তাই উত্তম।

٦. عَنْ أَنَسٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ .

উপরিউক্ত হাদীসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজে ক্বিরান হজ আদায় করেছেন, সুতরাং তাই উত্তম।

বিপরীত মতাবলম্বীদের দলিলসমূহের উত্তর : ইমাম আহমদ (র.) হযরত আয়েশা, ইবনে ওমর ও ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বর্ণিত যে সকল হাদীস দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন তার উত্তর এই যে,

ক. হযরত ইবনে ওমর, আয়েশা ও ইমরান (রা.) হতে যেরূপ 'তামাত্তু'-এর হাদীস বর্ণিত আছে, তেমনিভাবে তাঁদের হতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্বিরান হজ পালন করেছেন বলেও সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। সুতরাং তাঁদের হাদীসে যে 'তামাত্তু' শব্দ উল্লেখ রয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য ক্বিরান। কেননা, 'তামাত্তু' শব্দটি ব্যাপক এবং ক্বিরান শব্দটি এর অন্তর্ভুক্ত।

খ. প্রাচীনকালে আরবি ভাষাবিদগণ ক্বিরানকে তামাত্তু' হিসেবেই নামকরণ করতেন।

গ. বর্ণনাকারী রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ বলতে শুনে ধারণা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তামাত্তু' হজ আদায়কারী। অথচ ক্বিরান হজ আদায়কারীর তালবিয়াহও এরূপ।

ঘ. ইমাম তীবী (র.) বলেছেন, যেসব হাদীসে 'তামাত্তু' শব্দ রয়েছে তা আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ওমরা ও হজকে একত্রে মিলিয়ে উভয়টি একই সফরে সম্পাদন করে উপকৃত হওয়া।

ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর দলিলের উত্তরে হানাফীগণ নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেন–

ক. হাফেজ ইবনে কাইয়্যিম (র.) বলেন, হযরত আয়েশা ও ইবনে ওমর (রা.) প্রমুখের বর্ণনায় যে أَفْرَدَ الْحَجَّ বাক্য রয়েছে, তার মর্ম হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ হজের জন্যে স্বতন্ত্রভাবে ইহরাম বেঁধেছিলেন; কিন্তু মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্বিরান হজ আদায়কারী ছিলেন।

খ. অথবা, অর্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজের বিধানগুলো স্বতন্ত্রভাবে পালন করেছেন।

গ. অথবা, অর্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ ফরজ হওয়ার পর শুধুমাত্র একবার হজ পালন করেছেন।

ঘ. হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেছেন, এর অর্থ হজ ও ওমরা একই ইহরামে সম্পন্ন করা।

ঙ. হানাফী মাযহাবের কারো মতে, এর অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জে ইফরাদ শরিয়ত সম্মত বলে সাব্যস্ত করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٤٣٢ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رض) اَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِاِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

২৪৩২. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম ﷺ -কে ইহরাম বাঁধার উদ্দেশ্যে [গোসলের জন্য] কাপড় খুলতে এবং গোসল করতে দেখেছেন। –[তিরমিযী ও দারিমী]

وَعَنْ ٢٤٣٣ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبَّدَ رَأْسَهُ بِالْغِسْلِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৪৩৩. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ আঠালো বস্তু দ্বারা নিজের মাথার চুলকে জড় করেছিলেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হুযূর ﷺ -এর মাথার চুল মোবারক লম্বা তথা বাবরি ছিল। ইহরাম অবস্থায় তা আঁচড়িয়ে বা তৈল মেখে পরিপাটি করে রাখা জায়েজ নেই। আবার অন্য কিছু দ্বারা বাঁধাও যায় না। শুষ্ক ইতস্তত চুল বিভিন্নভাবে অসুবিধা ও কষ্টের কারণ হতে পারে বা তন্মধ্যে উকুন জন্মাতে পারে, তাই আঠালো জাতীয় কোনো বস্তু দ্বারা একে জড়িয়ে রাখা জায়েজ আছে। তবে এতে কোনো প্রকারের রং বা সুগন্ধি থাকতে পারবে না। সুতরাং নবী করীম ﷺ -এর চুলও সুগন্ধিবিহীন আঠালো বস্তু দ্বারা জড়ানো ছিল।

وَعَنْ ٢٤٣٤ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَانِيْ جِبْرَئِيْلُ فَاَمَرَنِيْ اَنْ اٰمُرَ اَصْحَابِيْ اَنْ يَرْفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ بِالْاِهْلَالِ اَوِ التَّلْبِيَةِ - (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

২৪৩৪. অনুবাদ : হযরত খাল্লাদ ইবনে সায়েব তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– হযরত জিবরাঈল (আ.) আমার নিকট আসলেন এবং বললেন, যেন আমি আমার সাথিদেরকে তালবিয়াহ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতে আদেশ করি। –[মালেক, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারিমী]

وَعَنْ ٢٤٣٥ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّيْ اِلَّا لَبّٰى مَنْ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَشِمَالِهٖ مِنْ حَجَرٍ اَوْ شَجَرٍ اَوْ مَدَرٍ حَتّٰى تَنْقَطِعَ الْاَرْضُ مِنْ هٰهُنَا وَهٰهُنَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৪৩৫. অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে কোনো মুসলমান তালবিয়াহ পাঠ করে, তার সাথে তালবিয়াহ পাঠ করে তার ডানে বামে যা কিছু আছে– পাথর, বৃক্ষ অথবা মাটির ঢেলা– এদিকের ও ওদিকের [পূর্ব পশ্চিমের] জমির শেষ সীমা পর্যন্ত। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٢٤٣٦ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْكَعُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ اَهَلَّ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ)

২৪৩৬. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-হুলাইফায় দু-রাকাত নামাজ পড়তেন। অতঃপর যখন তাঁর উষ্ট্রী তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াত যুল-হুলাইফা মসজিদের নিকট তিনি এসব শব্দ দ্বারা তালবিয়াহ পাঠ করতেন– 'লাইব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা ওয়া সা'দাকাইকা ওয়াল খায়রু ফী ইয়াদাইকা লাব্বাইকা ওয়ার রাগ্‌বাউ ইলাইকা ওয়াল আমালু' অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি তোমার সমীপে হাজির হয়েছি, আমি তোমার দরবারে হাজির হয়েছি, আমি হাজির হয়েছি, আমি হাজির হয়েছি, তোমার সমীপে সৌভাগ্য লাভ করেছি। সব কল্যাণ ও মঙ্গল তোমারই হাতে, আমি হাজির হয়েছি, সব কামনা-বাসনা তোমারই দিকে এবং সব আমল তোমারই জন্যে।" –[বুখারী ও মুসলিম। তবে শব্দগুলো মুসলিমের]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইহরাম বাঁধার পূর্বে নামাজ পড়ার হুকুম : ইহরামের পূর্বে গোসল করে ইহরামের কাপড় পরিধান করে দু-রাকাত নামাজ পড়া সুন্নত এবং নামাজের পর তিনবার উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়াহ পড়তে হবে না। সে ফরজ নামাজই ইহরামের জন্য যথেষ্ট।

وَعَنْ ٢٤٣٧ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهٖ سَأَلَ اللّٰهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعْفَاهُ بِرَحْمَتِهٖ مِنَ النَّارِ . (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

২৪৩৭. অনুবাদ : হযরত ওমারা ইবনে খুযাইমা ইবনে সাবিত (রা.) তাঁর পিতা খুযাইমা হতে বর্ণনা করেন। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ যখন তালবিয়াহ পাঠ শেষে অবসর হতেন, তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর সন্তুষ্টি ও জান্নাত প্রার্থনা করতেন এবং তাঁর কাছে তাঁর রহমতের অসিলায় জাহান্নামের আগুন হতে ক্ষমা চাইতেন। –[শাফেয়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তালবিয়াহ প্রসঙ্গে ইমামগণের মতামত : হজে তালবিয়াহ পাঠের হুকুম নিয়ে ইমামগণের মাঝে বিভিন্ন মতামত বিদ্যমান। যেমন–
ক. ইমাম মালেক (র.) বলেন, ইহরাম বাঁধার শুরুতে একবার তালবিয়াহ পাঠ করা ফরজ।

খ. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, ইহরামের বিশুদ্ধতার জন্যে তালবিয়াহ পাঠ করা শর্ত। কারণ ইহরাম শুদ্ধ না হলে হজ হবে না। যেমন– তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত নামাজ শুদ্ধ হয় না।

গ. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, اَلتَّلْبِيَةُ سُنَّةٌ তথা তালবিয়াহ পাঠ করা সুন্নত। তবে তা ছেড়ে দেওয়ার ফলে ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে।

ঘ. অধিকাংশ আহনাফের মতে, اَلتَّلْبِيَةُ وَاجِبٌ অর্থাৎ তালবিয়াহ পাঠ করা ওয়াজিব। তা ছেড়ে দিলে 'দম' দিতে হবে। উল্লেখ্য, পুরুষরা উচ্চৈঃস্বরে এবং মহিলারা নিম্নস্বরে তালবিয়াহ পাঠ করবেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٤٣٨ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا اَرَادَ الْحَجَّ اَذَّنَ فِى النَّاسِ فَاجْتَمَعُوْا فَلَمَّا اَتَى الْبَيْدَاءَ اَحْرَمَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

২৪৩৮. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হজ পালন করতে ইচ্ছা করলেন এটা লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন, তখন জনতা সমবেত হলো। যখন তিনি বায়দা [নামক স্থানে] এসে পৌঁছেন, তখন তিনি [হজের জন্য] ইহরাম বাঁধলেন। –[বুখারী]

وَعَنْ ٢٤٣٩ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَيَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلَكُمْ قَدٍ قَدٍ اِلَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا وَهُمْ يَطُوْفُوْنَ بِالْبَيْتِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৪৩৯. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা তালবিয়াহ পাঠে বলত 'লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা' [আমি তোমার সমীপে হাজির হয়েছি, তোমার কোনো শরিক নেই]– তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, তোমাদের সর্বনাশ হোক, থাম থাম [এখানেই থাম। আর আগে বেড়ো না, কিন্তু তারা আগে বেড়ে বলত] অবশ্য যে শরিক তোমার আছে তুমি তার মালিক এবং তা যে জিনিসের মালিক তারও তুমি মালিক।" আল্লাহর ঘরের তওয়াফ করার সময় তারা এরূপ বলত। –[মুসলিম]

بَابُ قِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ
পরিচ্ছেদ : বিদায় হজের ঘটনা

اَلْوَدَاعُ শব্দটি মাসদার। তবে এটি কোন বাবের মাসদার এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। কিছু সংখ্যকের মতে এটি كَلَامٌ ও سَلَامٌ -এর ওজনে বাবে تَفْعِيْل -এর মাসদার, এমতাবস্থায় وَاوْ -এর উপর যবর হবে। অপর একদলের মতে, এটি قِتَالٌ ও جِهَادٌ -এর ওজনে বাবে مُفَاعَلَة -এর মাসদার। এ অবস্থায় শব্দটির وَاوْ বর্ণে যের হবে। এর শাব্দিক অর্থ হলো– বিদায় গ্রহণ করা, চলে যাওয়া। এ হজে মহানবী ﷺ সকলের নিকট হতে বিদায় নিয়েছিলেন এবং পরবর্তী বছর কারো সাথে সাক্ষাৎ হবে না বলে ভাষণের মাধ্যমে ইঙ্গিতও দিয়েছেন, আর এ কারণেই এ হজকে 'হজ্জাতুল ওয়াদা' নামে অভিহিত করা হয়।

আলোচ্য পরিচ্ছেদে বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীস আলোচিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٤٤٠ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَكَثَ بِالْمَدِيْنَةِ تِسْعَ سِنِيْنَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ اَذَّنَ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ فِى الْعَاشِرَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتّٰى اِذَا اَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ فَاَرْسَلَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَصْنَعُ قَالَ اغْتَسِلِىْ وَاسْتَثْفِرِىْ بِثَوْبٍ وَاَحْرِمِىْ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّٰى اِذَا اسْتَوَتْ بِهٖ نَاقَتُهٗ عَلَى الْبَيْدَاءِ اَهَلَّ بِالتَّوْحِيْدِ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا

২৪৪০. অনুবাদ : হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় নয় বছর অবস্থান করলেন তিনি হজ করেননি। অতঃপর দশম বছরে মানুষের মধ্যে হজের ঘোষণা করালেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বছর হজে যাবেন। সুতরাং বহু লোক মদিনায় আগমন করল। অতঃপর আমরা রাসূল ﷺ -এর সাথে [হজের উদ্দেশ্যে] রওয়ানা হলাম এবং যখন আমরা যুল-হুলাইফায় পৌছলাম তথায় [হযরত আবূ বকর (রা.)-এর স্ত্রী] আসমা বিনতে ওমাইস পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকরকে প্রসব করলেন। তখন তিনি [আসমা] রাসূলল্লাহ ﷺ -এর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি এখন কি করব? রাসূল ﷺ বললেন, তুমি গোসল করবে এবং কাপড়ের টুকরা দ্বারা কষে লেঙ্গুট [প্যান্টি] পরবে। তারপর ইহরাম বাঁধবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে [দু-রাকাত ইহরামের] নামাজ পড়লেন। অতঃপর কাসওয়া উষ্ট্রীতে আরোহণ করলেন। অবশেষে যখন বায়দা নামক স্থানে তাঁকে নিয়ে তাঁর উষ্ট্রী সোজা হয়ে দাঁড়াল তখন তিনি তাওহীদের বাণী সম্বলিত এ তালবিয়াহ পাঠ করলেন– "লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইকা লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা শারীকা লাকা'। হযরত জাবির (রা.) বলেন, আমরা হজ ব্যতীত আর

نَنْوِىْ اِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتّٰى اِذَا
اَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَطَافَ سَبْعًا
فَرَمَلَ ثَلٰثًا وَّمَشٰى اَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ اِلٰى مَقَامِ
اِبْرَاهِيْمَ فَقَرَأَ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ
مُصَلًّى فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الْبَيْتِ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّهُ قَرَأَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ثُمَّ رَجَعَ
اِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ اِلَى
الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ اِنَّ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ اَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ
فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقٰى عَلَيْهِ حَتّٰى رَاَى الْبَيْتَ
فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللّٰهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ لَا اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ
اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ
دَعَا بَيْنَ ذٰلِكَ قَالَ مِثْلَ هٰذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ
نَزَلَ وَمَشٰى اِلَى الْمَرْوَةِ حَتّٰى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ
فِىْ بَطْنِ الْوَادِىْ ثُمَّ سَعٰى حَتّٰى اِذَا صَعِدَتَا
مَشٰى حَتّٰى اَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ
كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتّٰى اِذَا كَانَ اٰخِرُ
طَوَافٍ عَلَى الْمَرْوَةِ نَادٰى وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ
وَالنَّاسُ تَحْتَهُ فَقَالَ لَوْ اَنِّىْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ

কিছুরই নিয়ত করিনি, আমরা ওমরার কথা জানতাম না। যখন আমরা রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাথে বায়তুল্লাহ শরীফে আসলাম তখন তিনি কালোপাথর [হাজারে আসওয়াদ]-কে স্পর্শ করে চুম্বন করলেন এবং বায়তুল্লার চতুর্দিকে সাতবার তওয়াফ করলেন। তাতে তিন পাক জোরে জোরে [রমল] এবং চার পাক স্বাভাবিক হেঁটে হেঁটে প্রদক্ষিণ করলেন। অতঃপর মাকামে ইবরাহীমের দিকে অগ্রসর হলেন এবং কুরআনের আয়াত 'ওয়াত্তাখিযূ মিম্ মাকামি ইবরাহীমা মুসাল্লা' [অর্থাৎ 'এবং তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের স্থানে পরিণত কর'।] পাঠ করলেন। এ সময় রাসূলে করীম ﷺ মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর ও বায়তুল্লাহ্ শরীফের মধ্যখানে রেখে দু-রাকআত নামাজ পড়লেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি তাঁর দু-রাকআত নামাজে সূরা কুল হুয়াল্লাহু ও কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন পাঠ করেছিলেন। অতঃপর তিনি হাজারে আসওয়াদের দিকে ফিরে আসলেন এবং তাকে স্পর্শ করে চুম্বন করলেন। তারপর তিনি দরজা পথে সাফা পর্বতের দিকে বের হয়ে গেলেন। যখন তিনি সাফার নিকটবর্তী হলেন তখন কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন, 'ইন্নাস্ সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন্ শা'আয়িরিল্লাহি' অর্থাৎ "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয় আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত।" এবং বললেন, আল্লাহ তা'আলা যেখান হতে শুরু করেছেন আমিও সেখান হতে শুরু করব। অতএব তিনি সাফা পর্বত হতে শুরু করলেন এবং তার উপরে উঠলেন যাতে বায়তুল্লাহকে দেখতে পেলেন। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ঘোষণা করলেন এবং তাঁর মহিমা বর্ণনা করলেন। আর তিনি বললেন, "আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তাঁরই সার্বভৌমত্ব এবং তাঁরই সমস্ত প্রশংসা, তিনি সব কিছুতেই ক্ষমতাবান।' এক আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সব সম্মিলিত কুফরি শক্তিকে পরাভূত করেছেন।" এর মাঝখানে কিছু দোয়া করলেন। রাসূলে কারীম ﷺ এরূপ তিনবার বললেন। অতঃপর সাফা হতে অবতরণ করলেন এবং মারওয়া অভিমুখে হেঁটে চললেন, যতক্ষণ না তাঁর পবিত্র পদযুগল উপত্যকার মধ্যবর্তী সমতলে না ঠেকল। অতঃপর তিনি দৌড়ালেন যতক্ষণ না চূড়াতে উঠলেন। এবার তিনি হেঁটে চললেন যতক্ষণ মারওয়াতে এসে না পৌঁছলেন। মারওয়াতেও তিনি

أَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْىَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلِعَامِنَا هٰذَا أَمْ لِأَبَدٍ فَشَبَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِى الْأُخْرٰى وَقَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ لَا بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ وَقَدِمَ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ مَاذَا قُلْتَ حِيْنَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُكَ قَالَ فَإِنَّ مَعِىَ الْهَدْىَ فَلَا تَحِلَّ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْىِ الَّذِىْ قَدِمَ بِهِ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِىْ أَتٰى بِهِ النَّبِىُّ ﷺ مِائَةً قَالَ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوْا إِلَّا النَّبِىُّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوْا إِلٰى مِنًى فَأَهَلُّوْا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ النَّبِىُّ ﷺ فَصَلّٰى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيْلًا حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ فَسَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى أَتٰى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ

তেমনই করলেন যেমন করেছিলেন সাফাতে। এমনকি যখন মারওয়াতে শেষ প্রদক্ষিণ সমাপ্ত হলো, তখন তিনি মারওয়াতে থেকেই লোকদেরকে সম্বোধন করলেন আর জনতা তখন তাঁর নিচের দিকে [অপেক্ষমাণ] ছিল। রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, যদি আমি আমার ব্যাপারে আগে তা জানতাম যা পরে জেনেছি তবে আমি কুরবানির পশু সাথে নিয়ে আসতাম না এবং এটাকে [এ কার্যক্রমকে] ওমরায় পরিণত করতাম। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানির পশু সাথে নিয়ে আসেনি তারা যেন ইহরাম খুলে ফেলে এবং এটাকে [কৃত কার্যক্রমকে] ওমরায় পরিণত করে। তখন সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জু'শুম উঠে দাঁড়াল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! এটা কি আমাদের এ বছরের জন্যে নাকি চিরকালের জন্যে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাতের অঙ্গুলিসমূহ অপর হাতের অঙ্গুলিসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দু-বার বললেন, ওমরা হজের মধ্যে প্রবেশ করল। না, বরং তা চিরকালের জন্যে।

এ সময় হযরত আলী (রা.) ইয়েমেন হতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর জন্যে কুরবানির পশু নিয়ে আসলেন। তখন রাসূলে কারীম ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, যখন তুমি তোমার উপরে হজকে আবশ্যক করেছিলে তখন [ইহরাম বাঁধার সময় নিয়তে] কি বলেছিলে? [হজের না ওমরার না উভয়ের নিয়ত করেছিলে?] তিনি বললেন– আমি বলেছি, হে আল্লাহ! আমি সেই ইহরাম বাঁধছি যে ইহরাম তোমার রাসূল বেঁধেছেন। রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, আমার সাথে কুরবানির পশু রয়েছে সুতরাং তুমি ইহরাম খুলো না। রাবী বলেন, যে কুরবানির পশুগুলো হযরত আলী ইয়েমেন হতে নিয়ে এসেছিলেন তা এবং যেগুলো রাসূলে কারীম ﷺ সাথে নিয়ে এসেছিলেন তাতে মোট একশত পশু ছিল। রাবী হযরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ও যাদের সাথে কুরবানির হাদী ছিল তারা ব্যতীত সব মানুষই ইহরাম খুলে হালাল হয়ে গেলেন এবং চুল কাটালেন। অতঃপর যখন তারবিয়্যার দিন [৮ই জিলহজ] আসল তখন তাঁরা সকলেই নতুনভাবে ইহরাম বাঁধলেন এবং মিনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন এবং রাসূলে কারীম ﷺ সওয়ার হয়ে তথায় গেলেন এবং সেখানে জোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের নামাজ পড়লেন। অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত স্বল্প সময় অবস্থান করলেন।

রাসূলে কারীম ﷺ আদেশ করলেন যেন তাঁর জন্যে নামেরায় একটি পশমি তাঁবু খাটানো হয়।

قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ مِنْ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ

অতঃপর তিনি সেদিকে রওয়ানা করলেন। কুরাইশগণ এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ ছিল যে, রাসূল ﷺ মাশ'আরে হারামের নিকট অবস্থান করবেন [নিজের মর্যাদাহানির আশঙ্কায় সাধারণ মানুষের সাথে আরাফাতে অবস্থান করবেন না] কুরাইশরা জাহেলিয়াতের যুগে সাধারণত যেরূপ করত। কিন্তু রাসূলে কারীম ﷺ সম্মুখে অগ্রসর হলেন যতক্ষণ না তিনি আরাফাতে পৌঁছলেন আর নামেরায় তিনি তাঁবু দেখতে পেলেন যা তাঁর জন্য খাটানো হয়েছিল। এরপর তিনি তথায় অবতরণ করলেন এবং অবস্থান করলেন যাবৎ না সূর্য ঢলে পড়ল। তখন তিনি তাঁর কাসওয়া উষ্ট্রীর জন্য আদেশ করলেন, উষ্ট্রী সাজানো হলে রাসূলে কারীম ﷺ বতনে ওয়াদীতে পৌঁছলেন এবং জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, তিনি বললেন– "তোমাদের একের জান ও মাল অপরের প্রতি হারাম যেমন তোমাদের এ দিন, তোমাদের এ মাস তোমাদের এ শহরে হারাম। সাবধান! জাহিলিয়া যুগের যাবতীয় অপকর্ম আমার পদতলে রাখা হলো অর্থাৎ রহিত হলো, জাহিলিয়া যুগের রক্তের দাবি রহিত হলো। আর আমাদের খুনের বদলা খুনের দাবি প্রথমেই রহিত করলাম যা [আমার নিজের বংশের] আয়াশ ইবনে রবী'আ ইবনে হারিছের রক্তের দাবি। যে সা'দ গোত্রের দুধ পানরত ছিল তখন হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। জাহিলিয়া যুগের সুদ মওকূফ হলো। সর্বপ্রথম আমাদের [বংশের] যে সুদ মওকূফ করলাম তা [আমার চাচা] আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের [পাওনা] সুদ। তা সবই মওকূফ করা হলো।"

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং তাদের গুপ্তাঙ্গকে আল্লাহর নামে হালাল করেছ। তাদের উপরে তোমাদের অঙ্গীকার হলো তারা যেন তোমাদের বিছানায় এমন কাউকেও আসতে না দেয়, যাকে তোমরা খারাপ মনে কর। যদি তারা তা করে তবে তোমরা তাদেরকে মৃদু প্রহার করবে। আর তোমাদের উপরে তাদের ন্যায়সঙ্গত অন্ন ও বস্ত্রের অধিকার রয়েছে।"

আমি তোমাদের মধ্যে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা ধরে থাক, তবে আমার তিরোধানের পরে কখনো বিপথগামী হবে না– তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।

আর যখন তোমরা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হবে তখন তোমরা কি বলবে? জনতা বলে উঠল? আমরা সাক্ষ্য দেব যে, আপনি [আল্লাহর বাণী]

اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ حَتّٰى اَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ اِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيْلًا حَتّٰى غَابَ الْقُرْصُ وَاَرْدَفَ اُسَامَةَ وَدَفَعَ حَتّٰى اَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلّٰى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِاَذَانٍ وَاحِدٍ وَاِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِاَذَانٍ وَاِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّٰى اَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتّٰى اَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَاَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ حَتّٰى اَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيْلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيْقَ الْوُسْطَى الَّتِيْ تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى حَتّٰى اَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِيْ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ رَمٰى مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلٰثًا وَّسِتِّيْنَ بَدَنَةً

আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, [আপনার কর্তব্য] যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছেন এবং আমাদের মঙ্গল কামনা করেছেন। তখন তিনি নিজ তর্জনী [শাহাদাত অঙ্গুলি] আকাশের দিকে উঠালেন এবং জনতার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক।" এভাবে তিনবার বললেন।

অতঃপর বিলাল আজান দিলেন এবং ইকামত বললেন। রাসূলে কারীম ﷺ জোহরের নামাজ পড়লেন। তারপর আবারও ইকামত দিয়ে আসর নামাজ পড়লেন। এ দু নামাজের মধ্যে আর কিছু [নফল] পড়লেন না। অতঃপর তিনি উষ্ট্রীর উপর সওয়ার হয়ে [আরাফাতে] অবস্থানস্থলে আসলেন এবং নিজের কাসওয়া উটনীর পিছন দিক [জাবালে রহমতের] পাথরের দিকে আর হাবলুল মুশাতকে সম্মুখে করলেন এবং কিবলামুখী হলেন। তিনি এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন যতক্ষণ না সূর্য অস্তমিত হলো এবং রক্তিমাভা কিছুটা চলে গেল, অবশেষে সূর্যগোলক সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে গেল। অতঃপর তিনি হযরত উসামাকে নিজের পেছনে আরোহণ করালেন এবং পথচলা শুরু করলেন যতক্ষণ না তিনি মুযদালিফায় পৌঁছলেন। এ সময় রাসূল ﷺ তথায় মাগরিব ও ইশা একই আজান ও [পৃথক পৃথক] দু ইকামতে আদায় করলেন। উভয়ের মধ্যখানে কোনো নফল নামাজ পড়লেন না।

অতঃপর তিনি শুয়ে পড়লেন যতক্ষণ না উষার আবির্ভাব হলো। তারপর উষার আলো ফুটে উঠলে তিনি একই আজান ও একই ইকামতে ফজরের নামাজ আদায় করলেন। তারপর তিনি কাসওয়া উষ্ট্রীতে আরোহণ করে চলতে লাগলেন যতক্ষণ না তিনি মাশ্‌আরে হারামে এসে পৌঁছলেন। তথায় তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন, তাঁর মহিমা ঘোষণা করলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কালিমা পাঠ করলেন এবং তাঁর একত্ববাদ প্রচার করলেন। আকাশ খুব ফর্সা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি তথায় অবস্থান করলেন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই তথা হতে যাত্রা করলেন এবং [আপন চাচাতো ভাই] ফজল ইবনে আব্বাসকে নিজের সওয়ারির পেছনে বসালেন এবং বাতনে মুহাস্‌সির নামক স্থানে এসে পৌঁছলেন। এমন সময় উষ্ট্রীকে খানিকটা দৌড়ালেন অতঃপর মধ্যম পথে চললেন যা বড় জামরার দিকে গিয়েছে। পরিশেষে তিনি ঐ জামরায় পৌঁছলেন যে জামরা গাছের নিকট অবস্থিত [অর্থাৎ বড় জামরা] এবং বাতনে ওয়াদী হতে মর্মর দানার মতো সাতটি কাঁকর [পাথরের টুকরা] নিক্ষেপ করলেন– আর প্রত্যেক কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে সাথেই 'আল্লাহু আকবার'

بِيَدِهٖ ثُمَّ اَعْطٰى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَاَشْرَكَهٗ فِىْ هَدْيِهٖ ثُمَّ اَمَرَ مِنْ كُلِّ بُدْنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِىْ قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَاَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَفَاضَ اِلَى الْبَيْتِ فَصَلّٰى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَاَتٰى عَلٰى بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُوْنَ عَلٰى زَمْزَمَ فَقَالَ انْزِعُوْا بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا اَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلٰى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوْهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

বললেন। অতঃপর তথা হতে কুরবানির স্থানের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তেষট্টিটি পশু নিজের হাতে জবাই করলেন।

তারপর হযরত আলী (রা.)-কে বাকি পশুগুলো দিলেন, তিনি সেগুলো কুরবানি করলেন। রাসূল ﷺ হযরত আলীকে নিজের পশুতে শরিক করলেন। তখন তিনি নির্দেশ দিলেন যাতে প্রত্যেক পশুর গোশ্‌ত হতে এক টুকরা নেওয়া হয় এবং একই হাড়িতে পাকানো হয়। সুতরাং তাই করা হলো এবং একই হাড়িতে করে পাকানো হলো। তারা উভয়ে তার গোশ্‌ত খেলেন এবং ঝোল পান করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সওয়ার হলেন এবং বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে রওয়ানা করে মক্কায় গিয়ে জোহর নামাজ পড়লেন। তারপর তিনি [নিজ বংশ] বনী আবদুল মুত্তালিবের নিকট পৌঁছলেন, তারা জমজমের পাড়ে লোকদেরকে পানি পান করাচ্ছিলেন। রাসূল ﷺ বললেন, হে বনী আবদুল মুত্তালিব! তোমরা টান, যদি আমি ভয় না করতাম যে, পানি পান করানোর ব্যাপারে লোক তোমাদের উপরে জয়লাভ করবে তবে আমিও তোমাদের সাথে টানতাম। তখন তারা তাঁকে এক বালতি পানি দিলেন, রাসূল ﷺ তা পান করলেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَكَثَ بِالْمَدِيْنَةِ تِسْعَ سِنِيْنَ لَمْ يَحُجَّ **-এর মর্মার্থ :** হিজরতের পর নবী করীম ﷺ মদিনায় নয় বছর অতিবাহিত করলেন, কিন্তু তিনি হজ করেননি। মক্কা বিজয়ের পূর্বে রাসূল ﷺ -এর হজ না করার কারণ সম্পর্কে অনেকে বলেন, তখন হজ ফরজ ছিল না। যদি ফরজ হয়েও থাকে তবে ঐ সময়ে রাসূল ﷺ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত ছিলেন বিধায় তিনি হজ আদায় করতে পারেননি। অথবা এ জন্যে আদায় করতে পারেননি যে, তখন পর্যন্ত মক্কা জয় করা হয়নি। অষ্টম হিজরিতে যদিও মক্কা বিজিত হয়েছিল; কিন্তু রাসূল ﷺ দেরি করে দশম হিজরিতে হজ করার কারণ সম্পর্কে অনেকে বলেন, ৮ম হিজরিতে হজ ফরজ হয়নি; বরং হজ ফরজ হয়েছিল নবম হিজরিতে এবং ঐ বছরই তিনি হজ করতে আদেশ করেছিলেন। আর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে হজের আমির নিযুক্ত করে মক্কায় পাঠালেন। নিজে হজ করতে এ জন্যে যাননি যে, ঐ সময় মুশরিকরাও হজের জন্যে হাজির হতো। রাসূল ﷺ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মাধ্যমে এ মর্মে নিষেধ করে দিয়েছিলেন যে, "ভবিষ্যতে আর কোনো মুশরিক অথবা উলঙ্গ ব্যক্তি হজে উপস্থিত হবে না।" কিন্তু মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, ৮ম হিজরিতেও হজ ফরজ ছিল, ঐ বছর হযরত আতাব ইবনে উসাইদ লোকদেরকে নিয়ে হজও করেছিলেন; কিন্তু রাসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের পরেও চান্দ্রমাস গণনার মাঝে সংশোধনের জন্যে হজ আদায় করতে দেরি করেছিলেন। কারণ জাহিলিয়া যুগে মুশরিকরা নিজেদের স্বার্থে মাসগুলোকে উলটপালট করেছিল। সুতরাং কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন, যে বছর আত্তাব ইবনে উসাইদ হজ করেছিলেন, তাও জিলকদ মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। হযরত আবূ বকর (রা.) যে নবম হিজরিতে হজ করেছিলেন তা জিলহজে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে মুশরিকদের উপস্থিতির কারণে রাসূল ঐ বছর হজ করেননি। এছাড়া রাসূলের এটাও ইচ্ছা ছিল যে, সকলকে সাথে নিয়ে তিনি হজ করবেন এবং হজের বিধানগুলো শিক্ষা দেবেন, এ জন্যে তিনি দশম হিজরিতে হজ করেছিলেন। কেননা, নবম হিজরি হতে হজ তার প্রকৃত মাস অর্থাৎ জিলহজে প্রত্যাবর্তন করে এসেছিল। এ বিষয়ের প্রতি হাদীসেও ইঙ্গিত রয়েছে। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেছেন, দশম হিজরিতে রাসূল ﷺ -এর সাথে প্রায় নব্বই হাজার লোক অপর এক বর্ণনা মতে একলক্ষ ত্রিশ হাজার লোক হজ করেছিলেন। এত বিশাল সংখ্যক লোক ৯ম হিজরি বা ৮ম হিজরিতে হতো না। তাই রাসূল ﷺ দশম হিজরিতে হজ সম্পাদন করেছেন।

لَسْنَا نَنْوِىْ اِلَّا الْحَجَّ **-এর ব্যাখ্যা :** আমরা হজ ব্যতীত অন্য কিছুর নিয়ত করিনি। এ বাক্যটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে, যা নিম্নরূপ-

১. শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী (র.) বলেছেন, বের হওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল হজ করা। যারা ওমরা করেছিল তাদের ওমরাও হজের অধীনে ছিল। সুতরাং হযরত আয়েশা (রা.) প্রমুখ যে ওমরা করার কথা উল্লেখ করেছেন তাদের বর্ণিত হাদীসের সাথে কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না।

২. অথবা, এর তাৎপর্য হলো, জাহিলিয়া যুগের লোকেরা হজের মাসসমূহে ওমরাকে নিষিদ্ধ মনে করত। ঐ আকীদা অনুসারেই এখানে বলেছেন যে, আমরা হজ ব্যতীত অন্য কিছুর নিয়ত করিনি। পরবর্তী বাক্য "আমরা ওমরার কথা জানতাম না" প্রথম বাক্যের তাকীদ। অর্থাৎ রাসূল ﷺ যে ওমরার নিয়ত করেছেন তা আমরা কতক লোক অবগত ছিলাম না।

৩. আল্লামা হযরত শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.) বলেছেন, এর ব্যাখ্যা হলো, আমরা যে হজের ইহরাম বেঁধেছি তা ছাড়া আর কিছুই জানতাম না। অর্থাৎ আমাদের এটা জানা ছিল না যে, হজের মাসসমূহে হজের ইহরাম বাঁধার ও তালবিয়াহ পাঠের পরে হজকে ভঙ্গ করে ওমরায় পরিণত করা যায়। এমনকি যখন আমরা মক্কায় পৌঁছলাম রাসূল ﷺ আমাদেরকে ওমরা পর্যন্ত হজকে ভঙ্গ করার আদেশ করলেন তখনই আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হলো যে, ইতঃপূর্বে আমরা যা কিছু করে আসছি তা হজ নয়; বরং ওমরা।

فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ **-এর ব্যাখ্যা :** মাকামে ইবরাহীমকে নিজের ও বায়তুল্লাহর মাঝখানে রেখে দু'রাকাত নামাজ পড়া সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

مَذْهَبُ الْاَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ **:** ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে, তওয়াফের পরে এ দু-রাকাত নামাজ সুন্নত। এ বিষয়ে বেদুঈনের হাদীসে হুযূরের সুস্পষ্ট বাণী রয়েছে, "না; বরং এটা নফল।" পাঁচ ওয়াক্ত ব্যতীত সকল নামাজকে তিনি নফল আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং এ দু-রাকাতও নফলের মধ্যে গণ্য হবে।

এছাড়া আবূ আলী (র.) বলেন, যদি এ দু'রাকাত ওয়াজিব হতো তবে তা পরিত্যাগ করলে 'দম' ওয়াজিব হতো। যেমন কঙ্কর নিক্ষেপ ত্যাগ করলে 'দম' ওয়াজিব হয়। যেহেতু তা পরিত্যাগে দম ওয়াজিব হয়নি; সুতরাং বুঝা যায় যে, এ দু-রাকাত নামাজও ওয়াজিব নয়।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَقَوْلُ مَالِكٍ (رح) **:** ইমাম আযমের মতে এবং ইমাম মালেকের এক অভিমত অনুযায়ী তওয়াফের পরে দু-রাকাত নামাজ ওয়াজিব। কেননা, রাসূল ﷺ যখন এ দু-রাকাত নামাজ পড়লেন তখন কুরআনের আয়াত 'ওয়াত্তাখিযূ মিম্ মাক্বামি ইবরাহীমা মুসাল্লা' পাঠ করলেন। সুতরাং যেহেতু এ নামাজ সম্পর্কে আদেশ করা হয়েছে তাই এটা ওয়াজিবই হবে।

হেদায়া গ্রন্থকার রাসূল ﷺ -এর নিম্নোক্ত বাণী উদ্ধৃত করেছেন, "তওয়াফকারী যেন প্রতি সাত তওয়াফের পরে দু-রাকাত নামাজ পড়ে" এ আদেশও ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে দলিল।

প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে প্রথমোক্তদের দলিলের জবাবে বলা হয়েছে যে, বেদুঈনের হাদীস রহিত হয়ে গেছে। এতদ্ব্যতীত তাতে বিতর ইত্যাদির মতো অন্যান্য ওয়াজিব নামাজের কথাও বলা হয়নি। তাহলে ওগুলোও কি ওয়াজিব নয়?

আর তাদের দ্বিতীয় দলিলের জবাবে বলা হয়েছে, আরকান ও তা ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও তা পরিত্যাগ করলে 'দম' ওয়াজিব হয় না। এটাও তদ্রূপই হবে। এতদ্ব্যতীত 'দম'-এর দ্বারা ক্ষতিপূরণ তো ঐ সময়ই হয় যদি ফওত হওয়ার আশঙ্কা হয়; কিন্তু এ নামাজ তো মৃত্যু ব্যতীত ফওত হয় না।

فَبَدَأَ بِالصَّفَاءِ **-এর ব্যাখ্যা :** মহানবী ﷺ সাফা পাহাড় হতেই সায়ী শুরু করলেন। কেননা, পবিত্র কুরআনে সাফার কথা প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে এজন্যে সায়ীও তা হতেই প্রথমে করতে হবে। কেননা, ওয়াও (و) অক্ষরটি যদিও সাধারণত সংযুক্তির জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে; কিন্তু কখনো শরিয়তের কার্যকলাপে তা ক্রম-বিন্যাসেরও কাজ করে।

ইমাম নববী (র) বলেছেন- ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও জমহূর ইমামগণের মতে, সায়ীর জন্য সাফা হতে শুরু করা শর্ত। কেননা, নাসাঈ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- "আল্লাহ যেখান হতে আরম্ভ করেছেন তোমরাও সেখান হতে শুরু কর।"

সায়ী প্রসঙ্গে আল্লামা আইনী (র.) লিখেছেন, সাফা ও মারওয়ায় সায়ী সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতে, সায়ী হজের রোকন, যা না করলে হজ শুদ্ধ হবে না। এটা হযরত ইবনে ওমর ও আয়েশা (রা.) প্রমুখেরও অভিমত। কারণ, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন− তোমরা সায়ী কর! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি সায়ী অবধারিত করেছেন। −[আহমদ ও দারাকুতনী]

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَسُفْيَانَ ثَوْرِيْ وَقَوْلُ مَالِكٍ (رح) : ইমাম আবূ হানীফা (র.), হানাফী ইমামগণ ও সুফিয়ান ছাওরীর মতে এবং ইমাম মালেক (র.)-এর এক অভিমত অনুযায়ী সায়ী রোকন নয়; বরং ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন− فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا এখানে لَا جُنَاحَ শব্দ 'মুবাহ'-এর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। যখন প্রকাশ্য আয়াতে ইবাহাত প্রমাণিত হয়েছে তখন ওয়াজিব হবে না। তবে আমরা ইজমার দলিল অনুসারে একে ওয়াজিব বলে থাকি।

এছাড়া রোকন হওয়ার জন্য অকাট্য দলিলের প্রয়োজন, যা এখানে অনুপস্থিত। তবে হাদীসে যে "اِسْعَوْا" আমরের সীগাহ রয়েছে তা খবরে ওয়াহিদের ভিত্তিতে, তা দ্বারা ওয়াজিবই প্রমাণিত হবে। ইমাম নববী (র.)-এরও একই অভিমত।

جَوَابٌ لَهُمْ : ইমামগণ দলিল হিসেবে যে হাদীস নিয়েছেন তার জবাবে বলা হয়েছে যে, তাদের আনীত হাদীসের সনদে আপত্তি রয়েছে। তা ছাড়া যে كُتِبَ শব্দটি রয়েছে তার দ্বারা রোকন হওয়া প্রমাণিত হবে না। কেননা, অনেক সময় দেখা যায় كُتِبَ শব্দটি মোস্তাহাবের জন্যেও ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কুরআন মাজীদে রয়েছে− كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ : এখানেও كُتِبَ শব্দটি মোস্তাহাবের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত এটা তো খবরে ওয়াহিদ। আর خَبَرُ وَاحِدٍ দ্বারা রোকন প্রমাণিত হবে না; বরং খুব বেশি হলে ওয়াজিব প্রমাণিত হবে।

لَوْ اَنِّىْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ-এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ মক্কায় পৌঁছার পর প্রথমে ওমরা আদায় করেছেন। এরপর সাথিদেরকে বললেন, যারা সাথে কুরবানির পশু আনেনি, যা দশম তারিখে জবাই করবে, তারা হজের ইহরামকে ওমরার ইহরামে পরিবর্তন করে ওমরা সম্পন্ন করবে। তারপর ৮ তারিখের পূর্ব পর্যন্ত হালাল অবস্থায় থাকবে এবং ৮ তারিখে হজের ইহরাম বাঁধবে। আর যারা পশু সঙ্গে এনেছে তারা ওমরা আদায় করে সে ইহরামেই বহাল থাকবে এবং সে ইহরামেই হজ সম্পন্ন করবে, তারপর ইহরাম ভঙ্গ করবে। আমার সঙ্গে কুরবানির পশু আছে তাই আমি ওমরার পর ইহরাম ভাঙ্গতে পারব না। নবী করীম ﷺ -এর এ নির্দেশ সাহাবীগণ বিভিন্ন কারণে মেনে নিতে সংকোচ বোধ করলেন।

প্রথমত নবী করীম ﷺ নিজে ইহরামে থাকবেন, আর সাহাবীগণ ইহরাম ভঙ্গ করবেন। ফলে সর্বকাজে তাঁর অনুসরণ করতে পারবেন না, এটা তাঁদের কাছে পছন্দনীয় ছিল না।

দ্বিতীয়ত সাহাবীগণ বললেন, আমাদের ও আরাফাতের দিনের মাত্র পাঁচ দিন বাকি। সুতরাং এ সংক্ষিপ্ত সময়ে ইহরাম ভঙ্গ করে পার্থিব ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হওয়া সমীচীন মনে করি না।

তৃতীয়ত জাহিলিয়া যুগে হজের মাসগুলোতে ওমরা করাকে লোকেরা− اَفْجَرُ الْفُجُوْرِ বা পাপাচারের মধ্যে জঘন্যতম পাপাচার বলে মনে করত। এ কারণে সাহাবীদের কাছে ওমরা পর্যন্ত হজের ইহরাম ভঙ্গ করার আদেশ মনঃপূত ছিল না। যখন সাহাবীগণ এ আদেশ মেনে নিতে কুণ্ঠাবোধ করলেন, তখনই নবী করীম ﷺ বললেন, এতে আমার করণীয় কিছুই নেই। যদি আমি আগেই জানতাম যে, ইহরাম ভঙ্গ করা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় হবে। আর আমিও ইহরাম ভঙ্গ করতে পারব না, তাহলে আমিও কুরবানির পশু সাথে নিয়ে আসতাম না এবং তোমাদের সাথে ইহরাম ত্যাগ করে ওমরা শেষে হজ করতাম।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (র.) বলেন, জাহিলিয়া যুগের সেই রীতিকে বাতিল করার নিমিত্তে নবী করীম ﷺ উপরিউক্ত আদেশ প্রদান করেছিলেন।

دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ-এর ব্যাখ্যা : ওমরা হজের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এ কথাটির ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইমামগণের বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। যথা−

১. مَذْهَبُ جُمْهُوْرِ اَئِمَّةٍ : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, এর অর্থ হলো, হজের মাসসমূহে ওমরা পালন করা জায়েজ। তা দ্বারা জাহিলিয়া যুগের ঐ ভ্রান্ত ধারণা বাতিল করাই উদ্দেশ্য যে, জাহিলিয়া যুগের লোকেরা হজের মাসে ওমরা করাকে বড় পাপাচার মনে করত। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন− "তারা [অর্থাৎ জাহিলিয়া যুগের লোকেরা] হজের মাসসমূহে ওমরা করাকে দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় পাপাচার বলে মনে করত।"

২. কারো মতে, 'ওমরা হজের মধ্যে প্রবেশ করা' এর অর্থ ওমরার ফরযিয়্যত হজ ফরজ হওয়ার দ্বারা রহিত হয়ে গেল। এখানে প্রশ্ন জাগে যে, ওমরা কখন ফরজ ছিল যে, তার ফরযিয়্যত রহিত হওয়ার প্রশ্ন আসবে?

৩. কেউ বলেন, তার দ্বারা হজ্জে ক্বিরান জায়েজ হওয়া বুঝিয়েছেন। সুতরাং অর্থ হবে কিয়ামত পর্যন্ত ওমরার কার্যাবলি হজের মধ্যে প্রবেশ করল। রাসূল ﷺ -এর এক হাতের অঙ্গুলিসমূহ অপর হাতের অঙ্গুলির মধ্যে প্রবেশ করানো দ্বারা এটাই বুঝা যায়।

৪. আরেকদল বলেন, এর অর্থ ওমরা পর্যন্ত হজ ভঙ্গ করা জায়েজ। যে ব্যক্তি কুরবানির পশু সাথে নিয়ে আসেনি সে ব্যক্তি হজের ইহরামকে ওমরার ইহরামে পরিণত করে ওমরা সম্পন্ন করবে এবং ইহরাম ভঙ্গ করে তখনকার মতো হালাল হয়ে যাবে। তারপর হজের ইহরাম বেঁধে হজ সম্পন্ন করবে। এ ওমরা পর্যন্ত হজ ভঙ্গ করা সম্পর্কে ইমামগণের নিম্নোক্ত মতভেদ রয়েছে−

مَذْهَبُ اَحْمَدَ وَاَهْلِ الظَّوَاهِرِ : ইমাম নববী (র.) বলেছেন, ইমাম আহমদ ও আহলে যাহিরের মতে, এটা শুধু ঐ বছরের ব্যাপারেই খাস নয়; বরং তা কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। সুতরাং যে ব্যক্তি হজের ইহরাম বেঁধে এসেছে অথচ কুরবানির পশু সঙ্গে নিয়ে আসেনি সে ব্যক্তি হজের ইহরামকে ওমরার ইহরামে রূপান্তরিত করতে পারবে। এটাই فَسْخُ الْحَجِّ اِلَى الْعُمْرَةِ অর্থাৎ ওমরা পর্যন্ত হজ ভঙ্গ করা।

১. আলোচ্য হাদীসেই তার প্রমাণ রয়েছে। "হযরত সুরাকা ইবনে মালেক (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি আমাদের এ বছরের জন্যে নাকি চিরকালের জন্য? তখন রাসূল ﷺ নিজের এক হাতের অঙ্গুলিসমূহ অপর হাতের অঙ্গুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দু-বার বললেন, ওমরা হজের মধ্যে প্রবেশ করল। শুধু এ বছরের জন্যে নয়; বরং চিরকালের জন্যে।"

২. সুনান গ্রন্থে হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ সাহাবীগণ সমভিব্যাহারে হজের উদ্দেশ্যে বের হলেন। আমরা হজের জন্যে ইহরাম বাঁধলাম। যখন আমরা মক্কায় পৌঁছলাম, রাসূল ﷺ বললেন, এটাকে তোমরা ওমরায় পরিণত কর। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমরা তো হজে ইহরাম বেঁধেছি, এখন কিভাবে তাকে ওমরায় পরিণত করব? রাসূল ﷺ বললেন, "আমি তোমাদেরকে যা আদেশ করছি তোমরা তাই কর।" এতে বুঝা যাচ্ছে যে, ওমরা শেষে হজ ভঙ্গ না করাতে রাসূল ﷺ অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

৩. সালামা ইবনে সুবাইব ইমাম আহমদ (র.)-কে বললেন, একটি আদেশ ব্যতীত আপনার প্রত্যেকটি আদেশই আমার কাছে পছন্দ হয়েছে। ইমাম আহমদ (র.) জিজ্ঞেস করলেন, তা কি? তখন সালামা বললেন, আপনি 'ওমরা পর্যন্ত হজ ভঙ্গের প্রবক্তা' এটা আমার কাছে পছন্দনীয় নয়। তখন ইমাম আহমদ (র.) বললেন, আমার কাছে এ বিষয়ে এগারোটি সহীহ মারফূ' হাদীস রয়েছে আমি কি ঐগুলো তোমার কথায় ছেড়ে দেব?

مَذْهَبُ جُمْهُوْرِ اَئِمَّةِ : ইমাম আযম, মালেক, শাফেয়ী ও পূর্ববর্তী ও তৎপরবর্তী জমহূর ওলামায়ে কেরামের মতে : হজের ইহরাম বাঁধার পরে তাকে বাতিল করে ওমরার ইহরামে রূপান্তরিত করা জায়েজ নেই। ওমরা পর্যন্ত হজ ভঙ্গ করার আদেশ বিদায় হজের বছরই বলবৎ ছিল। জাহিলিয়া যুগের লোকেরা হজের মাসগুলোতে ওমরা করাকে বড় পাপাচার মনে করত। এ ভ্রান্ত ধারণাকে বাতিল করার জন্যেই শুধু সাহাবীদের জন্যে এ আদেশ সুনির্দিষ্ট ছিল।

তাঁদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ :

১. হযরত আবূ যর (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে, এ তামাত্তু' অর্থাৎ হজের ইহরামকে মধ্যখানে ভঙ্গ করা রাসূল ﷺ -এর সাহাবীদের জন্যে খাস ছিল।

২. অনুরূপভাবে হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমাদের পরে কেউ হজকে ওমরায় পরিণত করবে না। এ অবকাশ শুধু আমাদের অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবীগণের জন্যেই খাস ছিল। −[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

৩. সহীহ সনদে হযরত উসমান (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি একদা তামাত্তু' হজ সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হলেন [অর্থাৎ ওমরা শেষে ইহরাম ভঙ্গ সম্পর্কে] তখন তিনি বললেন, এটা আমাদের জন্যে ছিল; তোমাদের জন্যে নয়। −[আবূ দাউদ]

৪. আবূ দাউদ ও নাসায়ী শরীফে হযরত হারিছ ইবনে বিলাল (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি [বিলাল] বলেন, আমি রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! 'ওমরা পর্যন্ত হজ ভঙ্গ করা' এটা আমাদের জন্যেই নির্দিষ্ট না সাধারণ মানুষের জন্যেও অবধারিত? রাসূল ﷺ বললেন, বরং আমাদের জন্যে সুনির্দিষ্ট। রাবী হারিছ সম্পর্কে যদিও ইমাম আহমদ (র.) আপত্তি করেছেন; কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেছেন, হারিছ একজন ছিকাহ তাবেয়ী ছিলেন।

প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব : ইমাম আহমদ প্রমুখ নিজেদের সমর্থনে সুরাকার হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সেখানে রাসূল ﷺ চিরকালের জন্যে ওমরাকে হজের মধ্যে প্রবেশের কথা বলেছেন। এর জবাবে বলা হয়েছে যে, এর অর্থ– ওমরার কার্যক্রম হজের মাসগুলোতে কিয়ামত পর্যন্ত জায়েজ। তার দ্বারা জাহিলিয়া যুগের ভ্রান্ত ধারণাকে বাতিল করাই উদ্দেশ্য। কারণ তারা হজের মাসে ওমরা করাকে মহাপাপ মনে করত। আর সাহাবীগণও জাহিলি যুগের রীতি অনুসারে হজের মাসে ওমরা করাকে সাংঘাতিক কিছু মনে করতেন। এ ধারণাকে প্রতিহত করে হজের মাসে ওমরা জায়েজ বলে প্রমাণ করার জন্য এ আদেশ প্রদান করা হয়েছে। ওমরা পর্যন্ত হজ ভঙ্গ করা এর অর্থ নয়। স্বয়ং সুরাকা ইবনে মালেকের বর্ণনায় সুস্পষ্ট যে, প্রশ্ন ছিল শুধু ওমরা সম্পর্কে, হজ ভঙ্গ করা সম্পর্কে নয়। কেননা, আছার গ্রন্থে হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি বলেছেন– সুরাকা ইবনে মালেক জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমাদের এ ওমরা সম্পর্কে বলুন, তা কি আমাদের এ বছরের জন্যে না কি চিরকালের জন্যে? তখন রাসূল ﷺ বললেন, চিরকালের জন্যে।

তাঁদের দ্বিতীয় দলিল : যেখানে রাসূল ﷺ -এর অসন্তুষ্ট হওয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে– তার জবাবও এই যে, প্রাচীন ও জাহিলিয়া যুগের বিশ্বাস মতে যখন সাহাবীগণ হজের মাসে ওমরা করতে দ্বিধাবোধ করছিলেন অথচ রাসূল ﷺ জাহিলিয়া যুগের ভ্রান্ত-বিশ্বাসকে বাতিল করতে চাচ্ছিলেন। এ কারণে রাসূল ﷺ -এর অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়েছিল। এভাবে ইমাম আহমদ (র.) বলেছেন, আমার এ এগারোটি হাদীস রয়েছে, এখানেও এর অর্থ– তাদের অন্তরে জাহিলিয়া যুগের যে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল তাকে দূর করে শরিয়তের হুকুম [অর্থাৎ হজের মাসসমূহে ওমরা জায়েজ]-কে বহাল করে দেওয়া।

اَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِاَذَانٍ وَاحِدٍ وَاِقَامَتَيْنِ -এর ব্যাখ্যা : সকল ইমাম এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশাকে একসাথে পড়বেন, তবে এটা পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ اِمَامْ مَالِكْ (رحـ) : ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, দুই আজান ও দুই ইকামতের মাধ্যমে একত্র করতে হবে। অর্থাৎ মাগরিবের জন্যে এক আজান ও এক ইকামত। তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কর্ম দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। ইমাম আহমদ ও বুখারী (র.) লিখেছেন, যখন ইবনে মাসউদ (রা.) মুযদালিফায় দু-নামাজকে একত্র করলেন [জমে তাখীর বা বিলম্বে একত্রিকরণ] তখন আজান ও ইকামত দিতে বললেন এবং মাগরিবের নামাজ তিন রাকাত পড়লেন। অতঃপর সন্ধ্যাকালীন কার্যাবলি সম্পন্ন করলেন। অতঃপর আযান ও ইকামত দেওয়ালেন এবং ইশার নামাজ দু-রাকাত পড়লেন।

مَذْهَبُ اِمَامْ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) : ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এক বিশুদ্ধ অভিমতে, এক আজান ও দুই ইকামত একসাথে করতে হবে। তাঁরা আলোচ্য জাবির (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও হানাফী শাস্ত্রবিদদের মতে, মাগরিবের জন্যে আজান ও ইকামত দিতে হবে, ইশার জন্য আজান ও ইকামত কোনোটাই লাগবে না। অর্থাৎ একই আজান ও একই ইকামতে মাগরিব ও ইশা একসাথে পড়তে হবে। তারা নিচের হাদীসসমূহ দ্বারা দলিল পেশ করেন–

১. হযরত আশ্আছ ইবনে আবুশ্ শা'সা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর সাথে আরাফাত হতে মুযদালিফায় পৌঁছলাম, তখন তিনি এক ব্যক্তিকে আদেশ করলে সে আজান দিল এবং ইকামত বলল। তিনি আমাদেরকে নিয়ে মাগিরব পড়লেন, অতঃপর আমাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, [এবার ইশার] নামাজ। তারপর আমাদের সাথে নিয়ে দু-রাকাত ইশার নামাজ পড়লেন। এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমিও রাসূল ﷺ -এর সাথে এরূপই পড়েছি।

২. হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ মাগরিব ও ইশা একত্রে একই ইকামতে পড়েছেন। –[তাবারানী]

৩. হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর সাথে রওয়ানা করলাম, যখন আমরা 'একত্রিতকরণ' স্থলে পৌঁছলাম তখন তিনি আমাদেরকে মাগরিবের নামাজ পড়ালেন তিন রাকাত এবং ইশা দু-রাকাত একই ইকামতে। হযরত ইবনে ওমর (রা.) যখন অবসর হলেন, বললেন– রাসূল ﷺ এ স্থানে আমাদেরকে সাথে নিয়ে এভাবেই নামাজ পড়েছিলেন।

প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব : ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রমুখের পক্ষ হতে প্রথমোক্তদের জবাব দেওয়া হয়েছে এভাবে, ইমাম মালেক যে হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর কার্য ফে'ল দ্বারা দলিল গ্রহণ করেছেন, তা মারফূ' হাদীসে নয়। যে সমস্ত রেওয়ায়েতসমূহে দু ইকামতের [অর্থাৎ ইশার জন্যেও পৃথক ইকামতের] উল্লেখ রয়েছে, তা ঐ অবস্থার জন্যে যে, কোনো সাহাবী মাগরিব নামাজের পরে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, যেমন উট বসানো, রাত্রির খানা খাওয়া ইত্যাদি। তখন মাগরিব ও ইশার মধ্যে ব্যবধান হয়ে গিয়েছিল। এজন্যেই ইশার নামাজের জন্যে পৃথক ইকামত বলা হয়েছিল। এটার সমর্থন হযরত উসামা (রা.)-এর বর্ণনায় ও ইবনে আবূ শাইবার বর্ণনায় রয়েছে। মোটকথা, যদি দু-নামাজকে একত্রে পড়া হয় তবে এক ইকামতই যথেষ্ট। যদি কোনো ব্যবধান সৃষ্টি হয় তবে পৃথক ইকামত বলতে হবে। সুতরাং দু-হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না।

বিদায় হজের বৈশিষ্ট্যসমূহ : বিদায় হজের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের মাঝে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে যথাক্রমে–

১. বিদায় হজ ছিল তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে স্মরণীয় এক ঐতিহাসিক ইসলামি মহাসম্মেলন।

২. লক্ষাধিক মুসলমানকে সাথে নিয়ে এটা ছিল রাসূল ﷺ -এর জীবনের প্রথম ও শেষ হজ।

৩. রাসূল ﷺ -এর ডাকে সর্বস্তরের মুসলিম এ হজে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে এ হজে উপস্থিতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় সোয়া লক্ষ।

৪. এ হজে রাসূল ﷺ প্রায় সোয়া লক্ষ জনতার সামনে আরাফাতের ময়দানে স্মরণকালের এক ঐতিহাসিক ভাষণ পেশ করেছিলেন, যা বিশ্বের ইতিহাসে চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবে।

৫. এ হজে মুশরিক ও খোদাদ্রোহী কোনো লোককে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি।

৬. "আল্লাহর কালিমা চির উন্নত"– এটা সেদিন অক্ষরে অক্ষরে প্রতিভাত হয়েছিল।

৭. বিদায় হজের ভাষণে রাসূল ﷺ নারীর মর্যাদা, জানমালের নিরাপত্তা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ পেশ করছিলেন, ইতিহাসের পাতায় তা আজীবন অক্ষয় হয়ে থাকবে।

৮. সর্বোপরি সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ -এর বিদায় হজের ভাষণ বিশ্ববাসীর সামনে এক বৈপ্লবিক বিবর্তনের ধারা পেশ করে।

وَعَنْ ٢٤٤١ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ وَمَنْ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَاَهْدٰى فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ مِنْهُمَا . وَفِيْ رِوَايَةٍ فَلَا يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ وَمَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ قَالَتْ فَحِضْتُ وَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمْ اَزَلْ حَائِضًا حَتّٰى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ اُهْلِلْ اِلَّا بِعُمْرَةٍ فَاَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ اَنْ

২৪৪১. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজে রাসূল ﷺ -এর সাথে বের হলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ওমরার জন্যে ইহরাম বাঁধছিল আর কেউ কেউ হজের জন্যে। আমরা যখন মক্কায় পৌঁছলাম তখন রাসূল ﷺ বললেন, যে ওমরার ইহরাম বেঁধেছে আর কুরবানির পশু সাথে নিয়ে আসেনি সে যেন [ওমরা শেষে ইহরাম খুলে] হালাল হয়ে যায়, আর যে ওমরার ইহরাম বেঁধেছে এবং কুরবানির পশু সঙ্গে এনেছে সে যেন ওমরার সাথেই হজের নিয়তে তালবিয়াহ পাঠ করে এবং ইহরাম খুলে হালাল না হয় যতক্ষণ উভয় হতে ইহরাম খুলে হালাল না হয়। অপর বর্ণনায় আছে, সে যেন হালাল না হয়, যতক্ষণ পশু কুরবানি করে অবসর গ্রহণ না করে। আর যে শুধু হজের ইহরাম বেঁধেছে সে যেন তার হজকে পূর্ণ করে।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি ঋতুমতী হয়ে গেলাম, [ওমরার জন্যে] বায়তুল্লাহর তওয়াফ করতে পারলাম না এবং সাফা-মারওয়ার মধ্যে সায়ীও করতে পারলাম না। আমি ঋতুভাব অবস্থায়ই ছিলাম যতক্ষণ

أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِالْحَجِّ وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّي بَعَثَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِي مِنَ التَّنْعِيْمِ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِيْنَ كَانُوْا أَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوْا ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنٰى وَأَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوْا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

না আরাফার দিন হলো। আর আমি ওমরা ছাড়া অন্য কিছুর [হজের] জন্যে ইহরাম বাঁধলাম না। তখন রাসূল ﷺ আমাকে আদেশ করলেন যেন আমি মাথার চুল খুলে দেই ও চিরুনি করি। সুতরাং আমি তাই করলাম এবং আমার হজ সম্পন্ন করলাম। [পরে] তিনি [আমার ভাই] আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকরকে আমার সাথে পাঠালেন এবং আমাকে নির্দেশ দিলেন, যেন আমি আমার [অসমাপ্ত] ওমরার পরিবর্তে 'তানঈম' হতে ওমরা করি।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, যারা ওমরার জন্যে ইহরাম বেঁধেছিল তারা বায়তুল্লাহর তওয়াফ করল এবং সাফা-মারওয়ায় সায়ী করল। তারপর তারা হলাল হয়ে গেল। অতঃপর তারা মিনা হতে প্রত্যাবর্তন করে [হজের জন্যে] তওয়াফ করল আর যারা হজ ও ওমরা একত্র করেছিল [অর্থাৎ একসাথে ইহরাম বেঁধেছিল] তারা একবার মাত্র তওয়াফ করল। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মক্কাবাসীদের জন্য ওমরার মীকাত সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : মক্কার অধিবাসীদের ওমরার মীকাত কোনটি এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। তাহাবী শরীফে আছে, মক্কাবাসীদের জন্যে ওমরার মীকাত নির্দিষ্টভাবে তানঈম নামক স্থানটি। যার সমর্থন আলোচ্য হাদীসেই রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.)-এর উপরিউক্ত হাদীসে জানা যায় রাসূল ﷺ তানয়ীম নামক স্থানকে নির্দিষ্টভাবে মীকাত স্থির করে দিয়েছেন।

مَذْهَبُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَصَاحِبَيْنِ (رح) : ইমাম আ'যম, সাহেবাঈন ও ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রমুখের মতে, মক্কাবাসীদের ওমরার জন্যে মীকাত হিল। হিল-এর যে কোনো স্থান হতেই ওমরার জন্যে ইহরাম বেঁধে আসুক তাতেই চলবে। হিল-এর মধ্যবর্তী তানঈম নামক স্থান এবং অন্যান্য স্থান মীকাত হিসেবে সমান। তাই ইমাম তাহাবী (র.) স্বয়ং হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসই পেশ করেছেন– হযরত আয়েশা বলেছেন, আমার কাছে রাসূল ﷺ উপস্থিত হলেন, আমি কাঁদছিলাম তখন তিনি বললেন, এটা কি? .... হাদীসের শেষ অংশে আছে, রাসূল ﷺ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকরকে হুকুম করলেন এবং বললেন, তোমার বোনকে উঠিয়ে নাও এবং হারাম শরীফের বাইরে নিয়ে যাও– হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! রাসূল ﷺ জি'রানা বা তানঈমের কথা উল্লেখ করেননি– সে যেন ওমরার জন্যে ইহরাম বাঁধে। আমাদের হারাম শরীফ হতে তানঈম নিকটে ছিল আমি তথা হতেই ওমরার জন্যে ইহরাম বাঁধলাম। এ হাদীস হতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ওমরার ইহরামের জন্যে শুধু হিল-এর দিকে গিয়েছিলেন। এর জন্যে কোনো নির্দিষ্ট স্থানের নির্দেশ ছিল না। যেহেতু তানঈম নিকটে ছিল এজন্যে তথা হতেই ইহরাম বেঁধে এসেছিলেন। আর যেহেতু তানঈমের কথা স্পষ্টভাবে হাদীসে বলা হয়েছে এজন্যে সেখান হতে ইহরাম বাঁধা উত্তম। নতুবা হিল-এর সকল জায়গাই সমান।

ক্বিরান হজকারীর তওয়াফ সায়ীর সংখ্যা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : কিরান হজ আদায়কারী কতটি তওয়াফ ও কতটি সায়ী করবে, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, হাসান বসরী (র.) প্রমুখ বলেন, ক্বিরান হজ আদায়কারী একটি তওয়াফ ও একটি সায়ী করবে। তওয়াফগুলো হলো– ক. طَوَافُ قُدُوْمٍ খ. طَوَافٌ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ গ. طَوَافُ الْوِدَاعِ

দলিল :

١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجَّتِهِمْ ـ (ابْنُ مَاجَةَ)

٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ وَاَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَاِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا فِيْ حَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ ـ (دَارَقُطْنِيْ)

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ وَاَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ : ইমাম আবূ হানীফা ও ওলামায়ে আহনাফের (র.) মতে কিরান হজ আদায়কারীকে হজ ও ওমরার জন্যে আলাদাভাবে তওয়াফ ও সায়ী করতে হবে। অর্থাৎ তাকে সর্বমোট দুটি তওয়াফ ও দুটি সায়ী করতে হবে। আর সেগুলো হলো– ১. طَوَافُ قُدُوْمٍ ২. طَوَافُ عُمْرَةٍ ৩. طَوَافُ زِيَارَةٍ ৪. طَوَافُ وِدَاعٍ

তাঁদের দলিল :

١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَطَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَسَعٰى لَهُمَا سَعْيَيْنِ وَقَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ ـ

٢. عَنْ عَلْقَمَةَ (رضـ) قَالَ طَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعُمْرَتِهِ وَلِحَجَّتِهِ طَوَافَيْنِ وَسَعْيَيْنِ ـ

٣. عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ اِذَا اَهْلَلْتَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَطُفْ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَاسْعَ لَهُمَا سَعْيَيْنِ ـ

٤. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضـ) قَالَ قَرَنَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَطَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ ـ (دَارَقُطْنِيْ)

প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব :

১. উপরিউক্ত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসের ভাষা– اِنَّهَا طَافُوْا وَاحِدًا এর অর্থ হলো, রাসূল ﷺ ওমরা ও হজ উভয়ের জন্যে পৃথক পৃথকভাবে এক একবার তাওয়াফ করেছেন।

২. অথবা, এর মর্ম এই যে, রাসূল ﷺ মিনা হতে প্রত্যাবর্তন করে বিদায়ী তওয়াফ এবং হজ ও ওমরার জন্যে এক তওয়াফ করেছেন।

৩. অথবা এর অর্থ– ওমরার তওয়াফ হজের ন্যায় এবং হজের তওয়াফ ওমরার ন্যায়। উভয় তওয়াফের পদ্ধতি একই।

৪. অপর হাদীসে আছে যে, রাসূল ﷺ বিদায় হজে দু-বার তওয়াফ ও দু-বার সায়ী করেছেন। অর্থাৎ একটি তওয়াফে কুদূম অপরটি তওয়াফে ইযাফা।

৫. আল্লামা আইনী (র.) বলেন– طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا لِكُلِّ وَاحِدٍ بِشِبْهِ الْاٰخَرِ

তওয়াফ ও সায়ীর জন্যে শর্ত : আল্লাহর ঘর পবিত্র কা'বা তওয়াফ করার যে সকল শর্ত ইসলামি শরিয়ত নির্ধারণ করেছে, তা হচ্ছে যথাক্রমে–

১. অজু করা। কেননা, রাসূল ﷺ বলেছেন– اَلطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ

২. তাকবীরসহ হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা।

৩. হাতীমে কা'বা-এর বাইরে তওয়াফ করা।

৪. কা'বাকে সাতবার তওয়াফ করা।

৫. প্রথম তিন চক্করে রমল তথা হেলে-দুলে চলা।

৬. মাকামে ইবরাহীমে দু রাকয়াত নামাজ পড়া। কুরআনে কারীমে এসেছে– "وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى"

সায়ীর শর্তাবলি : সায়ীর জন্যে শর্ত সর্বমোট ২টি।

১. হাত উঠিয়ে তাকবীর বলা।

২. সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে সাতবার দৌড়ানো।

ঋতুমতী মহিলাকে বায়তুল্লাহ তওয়াফ করতে নিষেধ করার কারণ : ঋতুমতী মহিলাকে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করতে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু আরাফাতে অবস্থান করতে নিষেধ করা হয়নি। অথচ উভয়টিই হজের রোকন। এর জবাবে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ বলেন–

১. বায়তুল্লাহর তওয়াফ করা নামাজের সমতুল্য। ঋতুমতী মহিলা যেমন নামাজ পড়তে পারে না তেমনি বায়তুল্লাহর তওয়াফও করতে পারবে না, তাই নিষেধ করা হয়েছে। আর আরাফায় অবস্থান সেরূপ নয় বিধায় তা নিষেধ করা হয়নি।

২. 'বায়তুল্লাহ' আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন। আর আল্লাহর নিদর্শনকে সম্মান করা তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত। তাই এর সম্মানে ঋতুমতীকে কা'বা তওয়াফ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৩. 'আরাফায় অবস্থান করা' জিলহজ মাসের নবম তারিখের সাথে খাস। এটা পরে কাজা করার বিধান নেই। তাই ঋতুমতী মহিলাকে আরাফায় অবস্থান করতে নিষেধ করা হয়নি। পক্ষান্তরে বায়তুল্লাহর তওয়াফ হজের অন্যতম রোকন হলেও তা পরে কাজা করার সুযোগ রয়েছে। তাই ঋতুমতী মহিলাকে ঋতুস্রাব চলাকালীন সময়ে তার তওয়াফ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

وَعَنْ ٢٤٤٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْىَ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ فَاَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ اَهَلَّ بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ اَهْدٰى وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ اَهْدٰى فَاِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى يَقْضِىَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ اَهْدٰى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةً اِذَا رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهِ فَطَافَ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ اَوَّلَ شَىْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلٰثَةَ اَطْوَافٍ وَمَشٰى اَرْبَعًا فَرَكَعَ حِيْنَ قَضٰى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَاَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ اَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى قَضٰى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَاَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَاقَ الْهَدْىَ مِنَ النَّاسِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪৪২. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজে হজ্জে তামাত্তু' আদায় করেছেন। আর তিনি যুল-হুলাইফা হতে কুরবানির পশু সাথে নিলেন এবং কাজের শুরুতে ওমরার তালবিয়াহ পাঠ করলেন, এরপর তিনি হজে তালবিয়াহ পাঠ করলেন। আর জনগণও রাসূল ﷺ -এর সাথে হজের সাথে ওমরার উপকারিতা লাভ করল। লোকদের মধ্যে কিছু সংখ্যক কুরবানির পশু নিয়ে এসেছে, আর কিছু সংখ্যক পশু নিয়ে আসেনি। নবী করীম ﷺ যখন মদিনায় আগমন করলেন তখন তিনি লোকদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানির পশু নিয়ে এসেছে, সে যেন এমন বস্তুকে হালাল মনে না করে যা ইহরামের কারণে তার উপর হারাম হয়ে গেছে' যতক্ষণ সে নিজের হজ সম্পন্ন না করে। আর তোমাদের মধ্যে যারা কুবানির পশু নিয়ে আসেনি সে যেন বায়তুল্লাহর তওয়াফ করে এবং সাফা মারওয়ায় সায়ী করে এবং চুল কেটে ইহরাম ভঙ্গ করে। এরপর হজের জন্যে যেন পুনঃ ইহরাম বাঁধে এবং কুরবানির পশু নেয়। আর যে ব্যক্তি কুরবানি দিতে পারল না, তাহলে সে যেন হজের দিনগুলোতে তিনদিন রোজা রাখে এবং বাড়িতে ফিরে আসার পর সাতটি রাখে। অতঃপর রাসূল ﷺ যখন মক্কায় পৌঁছলেন তখন তওয়াফ করলেন। আর সর্বপ্রথম হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন, অতঃপর সজোরে তিনবার তওয়াফ করলেন এবং বারবার স্বাভাবিকভাবে হাঁটলেন। বায়তুল্লাহ তওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমের নিকট দাঁড়িয়ে দু রাকয়াত নামাজ পড়লেন তারপর সালাম ফিরালেন। অতঃপর সেখান থেকে সাফা-মারওয়ায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তারপর সাফা ও মারওয়ায় গিয়ে সাতবার সায়ী করলেন। অতঃপর তিনি সেসব কিছু নিজের উপর হালাল করলেন না যা তিনি হারাম করেছিলেন, যে পর্যন্ত তিনি হজ সম্পন্ন না করলেন কুরবানির দিনে কুরবানির পশু জবাই না করলেন এবং মিনা হতে প্রত্যাবর্তন করে বায়তুল্লাহ তওয়াফ না করলেন, এরপর তিনি যা তাঁর উপর হারাম হয়ে গিয়েছিল তা হতে হালাল হয়ে গিয়েছেন। আর লোকদের মধ্যে যারা কুরবানির পশু সাথে নিয়ে এসেছিল তারাও রাসূল ﷺ যেরূপ করেছিলেন সেরূপ করল। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে যে তামাত্তু' কথাটি বলা হয়েছে তা আভিধানিক অর্থে 'উপকারিতা লাভ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে, রাসূল ﷺ 'ক্বারিন' ছিলেন। সুতরাং রাসূল ﷺ হজের সাথে ওমরা দ্বারাও লাভবান হয়েছিলেন। তবে পরে যে বলা হয়েছে রাসূল ﷺ প্রথমে ওমরার তালবিয়াহ পাঠ করেছেন এবং পরে হজের তালবিয়াহ পাঠ করেছেন এর অর্থ এই যে, তালবিয়া পাঠকালে তিনি আগে বা পরের বাঁধা নিয়মে পাঠ করেননি। কখনো একটি আগে বলেছেন, আবার কখনো আরেকটি।

وَعَنْ ٢٤٤٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ عُمْرَةٌ اِسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْىَ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ فَاِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِى الْحَجِّ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৪৪৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– এটা ওমরা, যা দ্বারা আমরা তামাত্তু করলাম। [অর্থাৎ লাভবান হলাম বা ফায়দা হাসিল করলাম] সুতরাং যার সাথে কুরবানির পশু নেই সে যেন ওমরা শেষ করে পূর্ণ হালাল হয়ে যায়। তবে এ কথা স্মরণ রাখবে যে, কিয়ামত পর্যন্ত [এ দীর্ঘ সময়ের জন্যে] ওমরা হজের মাসে প্রবেশ করল। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَمَتُّعٌ : প্রকাশ থাকে যে, 'তামাত্তু'' এখানে আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ : সে যেন পূর্ণ হালাল হয়ে যায়-এর অর্থ হলো ওমরার জন্যে তওয়াফ ও সায়ী শেষ করে যেন পূর্ণভাব ইহরাম খুলে ফেলে, তার জন্যে ইহরামের নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ এখন হালাল হয়ে গেল। পরে হজের জন্যে নতুনভাবে ইহরাম বাঁধবে।

هٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِىْ .

এ পরিচ্ছেদে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ নেই।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٤٤٤ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) فِىْ نَاسٍ مَعِىْ قَالَ اَهْلَلْنَا اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِى الْحَجَّةِ فَاَمَرَنَا اَنْ نَحِلَّ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ حِلُّوْا وَاَصِيْبُوا النِّسَاءَ . قَالَ عَطَاءٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلٰكِنْ اَحَلَّهُنَّ لَهُمْ فَقُلْنَا لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ اِلَّا خَمْسٌ اَمَرَنَا اَنْ نُفْضِىَ اِلٰى نِسَائِنَا فَنَاْتِىْ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيْرُنَا الْمَنِىَّ قَالَ يَقُوْلُ جَابِرٌ بِيَدِهٖ

২৪৪৪. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত আতা ইবনে আবূ রাবাহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার সাথে কতিপয় লোকের মধ্যে হযরত জাবের (রা.)-কে বলতে শুনেছি– আমরা মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবীগণ শুধুমাত্র হজের ইহরাম বেঁধেছিলাম। আতা বলেন, জাবের (রা.) বলেছেন– রাসূল ﷺ জিলহজের চার তারিখ অতিবাহিত হলে সকালে মক্কায় আসলেন এবং আমাদেরকে ইহরাম ভেঙ্গে হালাল হতে আদেশ করলেন। আতা (র.) হযরত জাবের (রা.)-এর মাধ্যমে বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা হালাল হয়ে যাও এবং স্ত্রীদের সাথে মিল। আতা (র.) আরো বলেন, এতে রাসূল ﷺ তাদেরকে বাধ্য করলেন না; বরং তাদের স্ত্রীদেরকে তাদের জন্যে হালাল [ঘোষণা] করে দিলেন। তখন আমরা বললাম, যখন আমাদের ও আরাফার মাঠে অবস্থানের মধ্যে মাত্র পাঁচ দিন বাকি এমন সময় রাসূল ﷺ আমাদেরকে স্ত্রীদের সাথে মিলতে অনুমতি দিলেন আমরা আরাফাতে উপস্থিত হবো আর আমাদের পুরুষাঙ্গ শুক্র ঝরাবে? আতা (র.) বলেন, হযরত জাবির (রা.) হাত নেড়ে ইঙ্গিতে বললেন, যেন আমি তার হাত নাড়ার ইঙ্গিত

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِينَا فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ فَحِلُّوا فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا . قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ سِعَايَتِهِ فَقَالَ بِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا قَالَ وَأَهْدٰى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَلِعَامِنَا هٰذَا أَمْ لِأَبَدٍ قَالَ لِأَبَدٍ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

এখনো দেখছি। হযরত জাবের (রা.) বলেন, তখন রাসূল ﷺ আমাদের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমরা জান যে, আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহকে অধিক ভয় করি, তোমাদের অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী এবং তোমাদের অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান। আমি যদি কুরবানির পশু সাথে নিয়ে না আসতাম তবে আমিও ইহরাম ভঙ্গ করে হালাল হয়ে যেতাম যেভাবে তোমরা হচ্ছ। আর আমি যদি আমার বিষয়ে পূর্বে বুঝতে পারতাম যা পরে বুঝেছি তাহলে আমি কুরবানির পশু সাথে নিয়ে আনতাম না। সুতরাং তোমরা ইহরাম ভঙ্গ করে হালাল হয়ে যাও। অতঃপর আমরা হালাল হয়ে গেলাম, তাঁর কথা শুনলাম এবং কথামতো কাজ করলাম।

আতা (র.) বলেন, হযরত জাবের (রা.) বলেছেন– এ সময় হযরত আলী তাঁর কর্মস্থল হতে আসলেন। রাসূল ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিসের জন্যে ইহরাম বেঁধেছ? হযরত আলী বললেন, যার জন্যে রাসূল ﷺ ইহরাম বেঁধেছেন। তখন রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন, তবে তুমি কুরবানি কর এবং ইহরাম অবস্থায় থাক। হযরত জাবের (রা.) বলেন, হযরত আলী তাঁর জন্যে কুরবানির পশু সাথে নিয়ে এসেছিলেন।

এ সময় সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জু'শুম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা [হজের সাথে ওমরা করা] আমাদের এ বছরের জন্যে নাকি চিরকালের জন্যে? রাসূল ﷺ বললেন, চিরকালের জন্যে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَهْلَلْنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ -এর ব্যাখ্যা : হযরত জাবের (রা.)-এর এ কথা নবী করীম ﷺ -এর 'ক্বারিন' হওয়ার বিপরীত নয়। কেননা, এখানে হযরত জাবির (রা.) তাঁর নিজের এবং কতিপয় সাথিদের কথাই বলেছেন যে, তাঁরা শুধুমাত্র হজের ইহরাম বেঁধেছিলেন, যা দ্বারা ইফরাদ হজই বুঝায়। এটা সমস্ত সাহাবী কিংবা স্বয়ং নবী করীম ﷺ সম্পর্কে নয়। কেননা, হযরত আয়েশার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– "আমাদের কেউ কেউ হজের এবং কেউ কেউ ওমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন।" বস্তুত লক্ষাধিক লোকের মধ্যে কে কি করেছিল, তা সকলের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। সুতরাং যে যতটুকু দেখেছে সে ততটুকুই বর্ণনা করেছে।

وَعَنْ ٢٤٤٥ عَائِشَةَ (رض) أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ خَمْسٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ فَقُلْتُ مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ قَالَ أَوَ مَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتّٰى أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَحِلَّ كَمَا حَلُّوا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৪৪৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূল ﷺ জিলহজের চার কিংবা পাঁচ তারিখে মক্কায় আগমন করলেন। এ সময় তিনি আমার কাছে আসলেন খুব রাগান্বিত অবস্থায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম– হে আল্লাহর রাসূল! কে আপনাকে রাগান্বিত করল? আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করুন! হুযূর বললেন, তুমি কি জান না, আমি লোকদেরকে একটা বিষয়ে আদেশ করেছি? আর তারা তাতে দ্বিধাবোধ করছে। যদি আমি আমার ব্যাপারে প্রথমে বুঝতাম যা পরে বুঝেছি, তাহলে আমি কখনো কুরবানির পশু সাথে নিয়ে আসতাম না; বরং পরে তা কিনে নিতাম। তারপর আমিও তাদের মতো হালাল হয়ে যেতাম। –[মুসলিম]

بَابُ دُخُوْلِ مَكَّةَ وَالطَّوَافِ
পরিচ্ছেদ : মক্কায় প্রবেশ ও তওয়াফ

اَلطَّوَافُ শব্দের অর্থ হলো اَلدَّوْرَانُ তথা ঘুরা বা প্রদক্ষিণ করা। শরিয়তের পরিভাষায়– دَوْرَانٌ حَوْلَ بَيْتِ اللّٰهِ فِيْ كَيْفِيَّةٍ مَخْصُوْصَةٍ অর্থাৎ নির্দিষ্ট নিয়মে বায়তুল্লাহ শরীফ প্রদক্ষিণ করা।

কা'বা শরীফের যে কোণে হাজরে আসওয়াদ বিদ্যমান আছে সেখান থেকে শুরু করে পুনরায় ঐ কোণে আসাকে এক 'শাওত' বলে, এরূপ সাত শওতে হয় এক তওয়াফ। হজে তিন তওয়াফ করতে হয়, আর তা হলো–

১. প্রথমে মক্কায় পৌঁছে এক তওয়াফ করতে হয়, তাকে বলে طَوَاف قُدُوْم [তওয়াফে কুদূম।] এ তওয়াফ সুন্নত।

২. طَوَاف زِيَارَةٌ : দ্বিতীয়বার মিনা হতে প্রত্যাবর্তন করে তওয়াফে জিয়ারত করতে হয়। এটা ফরজ।

৩. طَوَاف صَدْر اَوِ الْوَدَاعُ : বায়তুল্লাহ হতে বিদায়কালে যে তওয়াফ করা হয় তাকে তওয়াফে সদর বা তওয়াফে বিদা বলা হয়। এটা বহিরাগতদের জন্যে ওয়াজিব।

তবে মক্কায় অবস্থানকালে অন্যান্য নফল ইবাদতের তুলনায় বায়তুল্লাহ তওয়াফই হলো উত্তম ইবাদত। তাই অবসরে মুসলমানরা তওয়াফই করে থাকে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٤٤٦ نَافِعٍ (رحـ) قَالَ اِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ اِلَّا بَاتَ بِذِىْ طُوًى حَتّٰى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ وَيُصَلِّىَ فَيَدْخُلَ مَكَّةَ نَهَارًا وَاِذَا نَفَرَ مِنْهَا مَرَّ بِذِىْ طُوًى وَبَاتَ بِهَا حَتّٰى يُصْبِحَ وَيَذْكُرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪৪৬. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত নাফে' (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) যখন মক্কায় আসতেন তখন তিনি যী-তুয়ায় রাত যাপন করতেন যতক্ষণ না সকাল হতো। তারপর তিনি গোসল করতেন এবং নামাজ পড়তেন। আবার যখন মক্কা হতে রওয়ানা করতেন তখন যী-তুয়ার পথেই অতিক্রম করতেন এবং তথায় রাত যাপন করতেন যতক্ষণ পর্যন্ত সকাল না হতো এবং বলতেন, রাসূল ﷺ এরূপই করতেন।

وَعَنْ ٢٤٤٧ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ اِلٰى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ اَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ اَسْفَلِهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪৪৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন মক্কায় আসলেন তখন তিনি তাঁর উঁচু দিক হতে প্রবেশ করলেন এবং নিচু দিক হতে বের হলেন।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মক্কার উঁচু দিককে বলে– 'সানয়ায়ে কাদা'। মক্কার প্রধান কবরস্থান 'জান্নাতুল বাকী' এদিকেই অবস্থিত। এখানেই যী-তুয়া। আর নিচ দিক হলো– সানয়ায়ে কুদা, বর্তমানে একে 'বাবুশ শাবীকা' বলা হয়।

وَعَنْ ٢٤٤٨ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (رض) قَالَ قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ أَبُوْ بَكْرٍ فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ مِثْلَ ذٰلِكَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪৪৮. অনুবাদ : হযরত ওরওয়া ইবনুয যুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ হজ করলেন, হযরত আয়েশা (রা.) আমাকে বলেছেন, রাসূল ﷺ যখন মক্কায় পৌঁছলেন প্রথমে যে কাজের দ্বারা হজের কাজ শুরু করলেন তা হলো তিনি অজু করলেন। অতঃপর বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করলেন, তবে তাও ওমরা করা ছিল না। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা.) হজ করলেন, তিনিও প্রথম যে কাজ করলেন তা ছিল বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ। তবে তাও ওমরা ছিল না। অতঃপর হযরত ওমর ও তারপর হযরত ওসমান (রা.) এরূপই করেছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করার পর সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কাজই হলো বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করা। ওমরার নিয়তে মক্কায় প্রবেশ করলেও এ তাওয়াফ ওয়াজিব। তবে যারা ওমরা ছাড়া হজের নিয়তে গমন করবে তাদেরও প্রাথমিক কাজ তওয়াফে কুদূম করা। সমাপনকারীদের জন্যে এ তওয়াফে কুদূম সুন্নত।

وَعَنْ ٢٤٤٩ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعٰى ثَلٰثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشٰى أَرْبَعَةً ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪৪৯. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ হজ বা ওমরার জন্যে যখন প্রথম তওয়াফ করতেন, প্রথমে তিন পাক সজোরে চলতেন এবং [পরের] চার পাক স্বাভাবিকভাবে চলতেন। অতঃপর [মাকামে ইবরাহীমের কাছে] দু-রাকাত নামাজ পড়তেন এবং সাফা ও মারওয়ার প্রদক্ষিণ [সায়ী] করতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তওয়াফের পদ্ধতি : তওয়াফ হাজারে আসওয়াদ হতে শুরু করে ডানদিকে বায়তুল্লাহর দরজার দিকে অগ্রসর হবে। এমতাবস্থায় গায়ের পরিধেয় চাদরটি ডান বগলের নিচে এবং বাম কাঁধের উপর রাখবে। তওয়াফকালে হাতীমকে কা'বা শরীফের অংশ হিসেবে তওয়াফের মধ্যে শামিল রেখে সর্বমোট সাত চক্কর তওয়াফ করবে। প্রত্যেক চক্কর হাজারে আসওয়াদ হতে শুরু হয়ে, আবার হাজারে আসওয়াদে এসে শেষ হবে। প্রথম তিন চক্করে 'রমল' করবে। অর্থাৎ বীরের ন্যায় চলে বীরত্ব প্রদর্শন করবে। যখনই হাজারে আসওয়াদের নিকটে পৌঁছবে, তখনই তাকবীর বলে হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করবে। লোকের অধিক ভিড়ের কারণে চুম্বন করা সম্ভব না হলে সে বরাবর দাঁড়িয়ে তাকবীর বলে হাত দ্বারা ইশারা করে নিজ হাত চুম্বন করবে। অতঃপর রুকনে ইয়ামানীকে একইভাবে চুম্বন করবে। সাত চক্কর তওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমের নিকটবর্তী স্থানে অথবা সম্ভবপর স্থানে দু'রাকাত নামাজ আদায় করবে। উল্লেখ্য যে, তওয়াফে জিয়ারত ও তওয়াফে সদরে রমল করতে হবে না।

وَعَنْهُ ٢٤٥٠ قَالَ رَمَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْحَجَرِ اِلَى الْحَجَرِ ثَلٰثًا وَمَشٰى اَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعٰى بِبَطْنِ الْمَسِيْلِ اِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৪৫০. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ হাজারে আসওয়াদ হতে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত তিন পাক রমল [জোর পদক্ষেপ] করেছেন এবং চার পাক স্বাভাবিকভাবে চলেছেন। আর তিনি যখন সাফা-মারওয়ার মধ্যে সায়ী করতেন তখন বাতনুল মুসীলে [নিচু জায়গায়] দাঁড়িয়ে করতেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَطْنُ الْمَسِيْلِ-এর পরিচিতি : সাফা ও মারওয়া- দুটি পাহাড়ের নাম। উক্ত পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে নিচু সমতল একটি জায়গা রয়েছে। ঐ জায়গাটিকে 'বাতনে মুসীল' বলা হয়। জায়গাটিকে সবুজ বর্ণের বাতি দ্বারা উভয় পাহাড়ের দিক হতে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে জায়গাটির নাম দেওয়া হয়েছে مِيْلَيْنِ الْاَخْضَرَيْنِ [মীলাইনিল আখযারাইন]।

وَعَنْ ٢٤٥١ جَابِرٍ (رض) قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ اَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشٰى عَلٰى يَمِيْنِهٖ فَرَمَلَ ثَلٰثًا وَمَشٰى اَرْبَعًا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৪৫১. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ মক্কায় পৌঁছলেন; হাজারে আসওয়াদের কাছে আসলেন এবং তাকে চুম্বন করলেন। অতঃপর ডানদিকে চললেন এবং তিন পাক রমল করলেন ও চার পাক স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চললেন। -[মুসলিম]

وَعَنِ ٢٤٥٢ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ (رح) قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৪৫২. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত যুবাইর ইবনে আরাবী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-কে হাজারে আসওয়াদের চুম্বন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। জবাবে তিনি বললেন, আমি রাসূল ﷺ -কে তা স্পর্শ করতে ও চুম্বন করতে দেখেছি। -[বুখারী]

وَعَنِ ٢٤٥٣ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ لَمْ اَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ اِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪৫৩. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ -কে বায়তুল্লাহ শরীফের ইয়েমেনের দিকের দু-কোণ ব্যতীত অন্যকোনো কোণকে চুম্বন করতে দেখিনি। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ-এর পরিচিতি : 'রোকন' শব্দের অর্থ এখানে প্রান্ত বা কোণ। অর্থাৎ বায়তুল্লাহ শরীফের দু-দেয়ালের বহির্ভাগে মিলিত স্থান। বায়তুল্লাহ শরীফে মোট চারটি কোণ রয়েছে। যথা- ১. হাজারে আসওয়াদ কোণ, এটা পূর্ব-দক্ষিণ কোণ। ২. ইয়েমেনী কোণ। এটা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। ৩. শামী কোণ, এটা পশ্চিম-উত্তর কোণ। ৪. ইরাকী কোণ, এটা উত্তর-পূর্ব কোণ। সাধারণত প্রথম দু-কোণকে 'রোকনে ইয়েমেনী' এবং শেষের দু-কোণকে 'রোকনে শামী' বলা হয়। বর্তমানে শামী কোণ দুটি হাতীমের ভিতরে থাকায় তওয়াফের সময় তা স্পর্শ করা যায় না। কেননা, হাতীমের বাইরে দিয়ে তওয়াফ করতে হয়। হাজারে আসওয়াদ কোণ পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বে ইয়েমেনী কোণকে স্পর্শ করা বা চুমা দেওয়া মোস্তাহাব। নবী করীম ﷺ এরূপই করতেন।

وَعَنْ ٢٤٥٤ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلٰى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪৫৪. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজে রাসূল ﷺ উটের উপর থেকে তওয়াফ করেছেন, মাথা বাঁকা ছড়ি দ্বারা হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করেছেন। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সওয়ার অবস্থায় তওয়াফের হুকুম : সওয়ার অবস্থায় ইহরাম করা জায়েজ আছে কিনা? এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে কিছুটা মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ−

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যার শক্তি-সামর্থ্য আছে, তার পক্ষে পথে হেঁটে তওয়াফ করা ওয়াজিব। কেননা, এতে বিনয়ী ভাব প্রকাশ পায় অধিক। সুতরাং যদি কেউ বিনা ওজরে সওয়ারি অবস্থায়, অথবা কারো কাঁধে-পিঠে চড়ে তওয়াফ করে, তাকে পুনরায় তওয়াফ করতে হবে, অন্যথা অন্যান্য ওয়াজিব তরক করলে যেভাবে 'দম' দিতে হয়, এজন্যেও তাকে 'দম' দিতে হবে।

مَذْهَبُ الْاَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ : ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও শাফেয়ী (র.) বলেন, বিনা ওজরে সওয়ারি অবস্থায় তওয়াফ ও সায়ী করা মাকরূহ। তবে সকলের মতে ওজর বশত সেভাবে তওয়াফ করলে মাকরূহ হবে না। বর্তমানে বৃদ্ধ, পঙ্গু তথা বিভিন্ন প্রকারের অসমর্থ নারী-পুরুষকে খাটে বসিয়ে তওয়াফ করাতে এবং চেয়ারে বসিয়ে সায়ী করানোর বর্তমানে ব্যবস্থা রয়েছে। আর রাসূল ﷺ যে সওয়ারি হতে তওয়াফ করেছিলেন তার কারণ এই ছিল যে−

১. রাসূলের স্বাস্থ্য তখন খুব খারাপ ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসে একথার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, রাসূল ﷺ মক্কায় পৌঁছলেন এ সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন, তাই তিনি আপন বাহনে থেকেই তওয়াফ করলেন। −[আবূ দাউদ]

২. অথবা, কারণ এই ছিল যে, তখন ভিড় ছিল অত্যধিক অথচ সব লোকই রাসূলের হজ সংক্রান্ত কার্যাবলি দেখা ও শেখার জন্য আগ্রহী ছিল। এজন্য রাসূল ﷺ সওয়ারির উপরে থেকে তওয়াফ করেছেন যাতে সকল লোক অথবা বেশি সংখ্যক লোক স্বচক্ষে দেখে শিখতে পারে। এর সমর্থনে হযরত জাবির (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস রয়েছে, তিনি বলেছেন− রাসূল ﷺ লোকদেরকে হজের কার্যাবলি দেখানের জন্যে এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করার জন্যে তিনি সওয়ার হয়ে তওয়াফ করেছেন।

নবী করীম ﷺ উটে চড়ে তওয়াফ করেছেন কেন? নবী করীম ﷺ কেন উটের উপর বসে সওয়ারি অবস্থায় তওয়াফ করেছেন? এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে। আবূ দাউদে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, বিদায় হজের সফরে মক্কায় আসার পর রাসূল ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাই সওয়ারির উপর বসে তওয়াফ করেছেন। তবে প্রকৃত কারণ হলো, একদিকে লোকেরা ইসলামে হজের আহকামাদি সম্পর্কে ছিল অজ্ঞাত। প্রত্যেকে নবী কারীম ﷺ -এর হজ সংক্রান্ত কার্যাবলি দেখা ও শেখার জন্যে ছিল অত্যন্ত আগ্রহী। অপরদিকে ছিল লক্ষাধিক লোকের ভিড়। তখন একে সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রণ করাও ছিল দুরূহ ব্যাপার। তাই তিনি সওয়ারিতে বসে শুধু তওয়াফ নয়; বরং হজের অধিকাংশ কার্যাবলি সম্পাদন করেছেন, যেন লোকেরা সহজেই তাঁর অনুকরণ করতে পারে। এর সমর্থনে হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে− বিদায় হজে নবী করীম ﷺ লোকদেরকে হজের কার্যাবলি দেখানো এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াব দেওয়ার উদ্দেশ্যে সওয়ারিতে বসে তওয়াফ করেছেন।

হারাম শরীফে উট প্রবেশ করানোর হুকুম : বিদায় হজে রাসূল ﷺ উটের উপর থেকে তওয়াফ করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই এখানে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, মসজিদে হারাম এলাকায় পশু প্রবেশ করানো কিভাবে জায়েজ হতে পারে। তাতে একদিকে যেমন স্থানটির পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, অপরদিকে তার কারণে মানুষ বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে।

এর জবাবে হাদীসশাস্ত্রবিদগণ বলেন, বিদায় হজের দিন রাসূল ﷺ যে উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করেছিলেন, তার নাম ছিল 'কাসওয়া'। এ উষ্ট্রী সম্পর্কে রাসূল ﷺ নিজেই বলেছেন, এটা আল্লাহর ইচ্ছায় চলে এবং তাঁর ইচ্ছায়ই বসে পড়ে।

বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ যখন হিজরত করে মদিনায় আসেন তখন অনেকেই রাসূল ﷺ -কে নিজের বাড়িতে রাখার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। রাসূল ﷺ বললেন, কাসওয়া যেখানে বসবে সেখানে আমি অবস্থান করব। পরে কাসওয়া হযরত

আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.)-এর বাড়ির সম্মুখে বসে পড়ল। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.)-ই রাসূল ﷺ -এর খেদমত করার সৌভাগ্য লাভ করলেন।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, ৬ষ্ঠ হিজরিতে রাসূল ﷺ যখন ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কার পথে অগ্রসর হলেন, তখন হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছেই কাসওয়া বসে পড়ল। লোকেরা বহু চেষ্টা করে তাকে উঠাতে পারল না। তখন রাসূল ﷺ বললেন, কাসওয়া আল্লাহর ইচ্ছায় চলে এবং তাঁর ইচ্ছায় বসে পড়ে অথবা যে পশু সম্পর্কে রাসূল ﷺ এ উক্তি করেছিলেন সে উষ্ট্রী দ্বারা মসজিদে হারামের অপবিত্র হওয়া বা তার দ্বারা মানুষের কোনো রকম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে না।

ভক্ষণীয় প্রাণীর প্রস্রাব সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : যেসব পশুর গোশ্‌ত খাওয়া হালাল তার প্রস্রাব পবিত্র না অপবিত্র, এ ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

১. ইমাম মালেক, আহমদ, মুহাম্মদ ইবনে হাসান, যুফার, ইবরাহীম নাখয়ী, কাযী আয়ায ও ইমাম যুহরী (র.) প্রমুখের মতে يَجُوزُ بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ অর্থাৎ যেসব প্রাণীর গোশ্‌ত খাওয়া হালাল, সেসব প্রাণীর প্রস্রাব পবিত্র ও হালাল। তারা তাদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন। যেমন–

দলিল :

١. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ قَدِمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَوْمٌ مِنْ عُكَلٍ اَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوُوا الْمَدِيْنَةَ فَاَمَرَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلِقَاحٍ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَشْرَبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَا الخ .

٢. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا بَاْسَ بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ .

٣. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (مَا اُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَاْسَ بِبَوْلِهِ) .

২. ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী, আবূ ইউসুফ, আবূ ছাওর (র.) প্রমুখ আলেমগণের মতে– لَا يَجُوزُ بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ তাঁরা তাদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন। যেমন–

١. قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِسْتَنْزِهُوا عَنِ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ –

٢. قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا بَيْنَ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِيْنَ .

উপরিউক্ত দলিলের আলোকে প্রমাণিত হলো যে, "بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ" নাজায়েজ ও অপবিত্র।

তবে ঔষধ হিসেবে এ জাতীয় পেশাব পান করা জায়েজ কিনা, এ ব্যাপারেও ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন–

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) "بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ" -কে সাধারণভাবেই পবিত্র বলে থাকেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে "بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ" সাধারণভাবে পান করা জায়েজ নেই। তবে বিশেষ প্রয়োজনে ঔষধ হিসেবে পান করা জায়েজ আছে। যেমন মহানবী ﷺ اَهْلُ عُكَلٍ عُرَيْنَةَ -কে উটের পেশাব পান করার জন্যে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.) কর্তৃক নীতি "اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ" -এর অবলম্বন করেন।

আর ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে "بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ" শুধুমাত্র حَالَةِ اِضْطِرَارِىْ ব্যতীত কোনো অবস্থাতেই পান করা জায়েজ নেই। তবে এ ক্ষেত্রে যদি কোনো অভিজ্ঞ ডাক্তার নিশ্চয়তার সাথে বলেন যে, পেশাব পান করলেই রোগ নিরাময় হবে তাহলে জায়েজ।

٢٤٥٥ - وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلٰى بَعِيْرٍ كُلَّمَا اَتٰى عَلَى الرُّكْنِ اَشَارَ اِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِىْ يَدِهِ وَكَبَّرَ – (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

২৪৫৫. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ উটের উপর থেকে বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করেছেন এবং যখনই তিনি হাজারে আসওয়াদের নিকট পৌঁছাতেন তখনই আপন হাতের কোনো জিনিস দ্বারা ইশারা করতেন এবং তাকবীর বলতেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করার পদ্ধতি : হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করার পদ্ধতি সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ−

১. অধিকাংশ ইমামের মতে, হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করার পদ্ধতি হলো যদি সম্ভব হয় তাহলে হাজারে আসওয়াদকে হাত দ্বারা স্পর্শ করে হাত চুম্বন করবে। যদি এটা সম্ভব না হয় তাহলে অন্যকোনো জিনিস দ্বারা স্পর্শ করে ঐ জিনিসকে চুম্বন করবে। আর যদি এটাও সম্ভব না হয় তাহলে উক্ত পাথরের প্রতি ইঙ্গিত করবে।

২. ইমাম মালেক (র.) এক বর্ণনায় হাত চুম্বন না করার মত প্রকাশ করেছেন।

৩. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করার পদ্ধতি এই যে, যদি সহজ ও শান্তভাবে বিনা কষ্টে পাথরটিকে চুম্বন করা সম্ভব হয়, তাহলে প্রত্যেক চক্করে তিনবার চুম্বন করবে। নিজের উভয় হাতকে পাথরটির উপর রাখবে এবং উভয় হাতের মাঝখানে মুখ রেখে বিনা শব্দে পাথরটিকে চুম্বন করবে। এরূপ সম্ভব না হলে, শুধু হাত দ্বারা পাথরটিকে স্পর্শ করে হাত চুম্বন করবে। যদি এটাও সম্ভব না হয়, তবে লাঠি দ্বারা পাথরটিকে স্পর্শ করে উক্ত লাঠিকে চুম্বন করবে। যদি এটাও সম্ভব না হয়, তাহলে পাথরটিকে সামনে রেখে সেদিক ফিরে দাঁড়াবে এবং হাতের লাঠি পাথরের দিক করে বিসমিল্লাহ, তাকবীর, তাহলীল ও আল্লাহর গুণকীর্তনের সাথে হস্তদ্বয় উপরে উত্তোলন করে পাথরের দিকে ইঙ্গিত করত হস্তদ্বয় চুম্বন করবে। নিয়ত করবে যে, স্বীয় হাত দ্বারা পাথর স্পর্শ করছে।

রোকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের নিকট তাকবীর পড়া : রাসূল ﷺ যখন রোকনে ইয়ামানীতে পৌঁছতেন, তখন বলতেন− بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ; রোকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে বলতেন− رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ এবং যখন হাজারে আসওয়াদের নিকট পৌঁছতেন তখন বলতেন− اَللّٰهُ اَكْبَرُ

وَعَنْ ٢٤٥٦ أَبِى الطُّفَيْلِ (رضـ) قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৪৫৬. অনুবাদ : হযরত আবুত তুফাইল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ -কে বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করতে নিজের সাথে থাকা বাঁকা ছড়ি দ্বারা হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করতে এবং বাঁকা ছড়িটিকে চুম্বন করতে দেখেছি। −[মুসলিম]

وَعَنْ ٢٤٥٧ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَذْكُرُ اِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا اَبْكِىْ فَقَالَ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ ذٰلِكِ شَىْءٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ فَافْعَلِىْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لَا تَطُوْفِىْ بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَطْهُرِىْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪৫৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ -এর সাথে [হজের উদ্দেশ্যে] বের হলাম। আমরা হজ ছাড়া অন্যকিছুর তালবিয়াহ পাঠ করলাম না। অতঃপর যখন আমরা 'সারাফ' নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন আমার ঋতুস্রাব আরম্ভ হয়ে গেল। রাসূল ﷺ আমার কাছে আগমন করলেন। এ সময় আমি কাঁদছিলাম। তখন রাসূল ﷺ বললেন, সম্ভবত তুমি ঋতুমতী হয়ে পড়েছ। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটা এমন একটি জিনিস যা আল্লাহ তা'আলা আদম-কন্যাদের জন্যে নির্ধারণ করেছেন। [সুতরাং দুঃখ করার কি আছে?] সুতরাং তুমি তাই কর যা হাজীগণ করে থাকে তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত বায়তুল্লাহর তওয়াফ করো না। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সারাফ নামক স্থানের ঐতিহাসিক ঘটনা : সারাফ মক্কা হতে দশ মাইল দূরে একটি প্রসিদ্ধ জায়গার নাম। ষষ্ঠ হিজরির অনাদায়ী ওমরা কাজা করার উদ্দেশ্যে সপ্তম হিজরিতে মক্কা যাওয়ার পথে এ সারাফ নামক স্থানেই হযরত মাইমূনার সাথে ইহরাম অবস্থায় রাসূল ﷺ-এর বিবাহ হয় এবং ফেরার পথে এ স্থানেই হালাল অবস্থায় তাঁর বাসর রাত্রিযাপন হয় এবং পরের দিন অলিমা অনুষ্ঠান হয়। হিজরি ৬১ মতান্তরে ৫১ সনে এ স্থানেই হযরত মাইমূনা (রা.) ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তিনি সমাহিত হন। বর্তমানে স্থানটি জিয়ারতগাহ হিসেবে প্রসিদ্ধ।

٢٤٥٨ - **وَعَنْ** اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ بَعَثَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ فِي الْحَجَّةِ الَّتِيْ اَمَّرَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِيْ رَهْطٍ اَمَرَهُ اَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ اَلَا لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوْفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪৫৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজের [এক বছর] পূর্বে যে হজে রাসূল ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.)-কে হজের আমির নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন, সে হজে হযরত আবূ বকর (রা.) কুরবানির দিন এক দল লোকসহ আমাকে লোকদের মধ্যে এ ঘোষণা করতে আদেশ করে পাঠালেন– সাবধান! এ বছরের পর কোনো মুশরিক হজ করতে পারবে না এবং কোনো লোক কখনো উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করতে পারবে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জাহিলিয়া যুগে মুশরিকরা উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহর তওয়াফ করত। তারা বলত– যে পোশাক পরিধান করে বিভিন্ন প্রকারের পাপ কাজ করা হয়েছে, সে পোশাকে আল্লাহর ঘরের তওয়াফ করা উচিত নয়। তাই উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করত।

আবার কারো মতে, তারা বলত– মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় নিষ্পাপ শিশু হিসেবে দুনিয়াতে এসেছে। বায়তুল্লাহ তওয়াফের ফলেও সে নিষ্পাপ শিশু অবস্থায় পৌঁছে যায়। কাজেই তওয়াফের সময় একটি মাসুম শিশুর মতোই উলঙ্গ থাকা উচিত। তাই তারা সে সময় উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করত।

কে কখন আমীরুল হজ ছিলেন : অষ্টম হিজরির রমজান মাসে মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম ﷺ হযরত আত্তাব ইবনে আসীদ (রা.)-কে সেখানের গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং পরে হজের মাস আসলে তাঁকেই আমীরুল হজ রূপে নিয়োগ করেন এবং নবম হিজরিতে হযরত আবূ বকর (রা.)-কে আমীরুল হজ নিযুক্ত করে পাঠান এবং দশম হিজরিতে রাসূল ﷺ নিজেই আমীরুল হজ হয়ে হজ পালন করেন। এটাই তাঁর একমাত্র হজ ও বিদায় হজ।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٤٥٩ - **عَنْ** الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ قَالَ سُئِلَ جَابِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلُهُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

২৪৫৯. অনুবাদ : তাবেয়ী মুহাজিরে মাক্কী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত জাবের (রা.)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফকে দেখে [দোয়া পাঠ করার সময়] আপন দু-হাত উত্তোলন করে। জবাবে তিনি বললেন, আমরা রাসূল ﷺ -এর সাথে হজ করেছি কিন্তু আমরা কখনো এরূপ করতাম না। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কা'বা দর্শনে উভয় হাত উত্তোলন করার হুকুম : আল্লাহর ঘর দর্শনের সাথে সাথে হাত উত্তোলন করে দোয়া করা জায়েজ আছে কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

* আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.) মিরকাতুল মাফাতীহ গ্রন্থে তীবী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন যে, ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, আল্লাহর ঘর দর্শনকালে দোয়া পাঠের সময় হস্ত উত্তোলন করা বৈধ নয়। তিনি উপরিউক্ত মুহাজিরে মক্কী বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন।

* مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِىْ وَاَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ (رح) : পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী, আহমদ, সুফিয়ান ছাওরী (র.) প্রমুখ চিন্তাবিদগণের মতে, আল্লাহর ঘর নজরে পড়ার সময় হস্ত উত্তোলন করা সুন্নত। এসব সুধী নিম্নলিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন–

ক. হযরত ইবনে জুরাইজ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ যখন বায়তুল্লাহকে প্রথম দেখতেন আপন দু-হাত উত্তোলন করতেন এবং বলতেন– হে আল্লাহ! এ ঘরের সম্মান, ইজ্জত ও বুজুর্গি বৃদ্ধি করে দাও .....

খ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ সাত স্থানে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন– নামাজ আরম্ভকালে, বায়তুল্লাহর নিকটে, বায়তুল্লাহ দর্শনে, সাফা ও মারওয়ায়, আরাফাতে, মুযদালিফায় এবং দু জামরায়।

ইমাম মালেক (র.)-এর দলিলের জবাব : ইমাম মালেক (র.)-এর দলিলের জবাবে বলা হয়–

১. যে সমস্ত হাদীস দ্বারা হস্ত উত্তোলনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায়; তা দ্বারা বারবার দর্শনে বারবার হস্ত না উত্তোলনের কথা বুঝানো হয়েছে।

২. অথবা, তা ইহুদিদের ক্রিয়ার সাথে সাদৃশ্য হওয়ার দরুন নিষেধ করা হয়েছিল। যেমন– হযরত জাবের (রা.)-এর অপর এক বর্ণনায় জানা যায়।

৩. অথবা, যেসব হাদীসে হস্ত উত্তোলন না করার কথা রয়েছে তা প্রত্যেকবারের জন্যে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বারবার দর্শনে হস্ত উত্তোলন করা হবে না।

৪. অথবা, এটাও বলা যায় যে, রাসূল ﷺ -এর কাওলী হাদীসের বর্তমানে সাহাবীগণের কথা দলিল হতে পারে না। সুতরাং কাওলী হাদীসের মোকাবিলায় সাহাবীগণের কাওল [বক্তব্য] পরিত্যক্ত হবে।

وَعَنْ ٢٤٦٠ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَاَقْبَلَ اِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ اَتَى الصَّفَا فَعَلَاهُ حَتّٰى يَنْظُرَ اِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللّٰهَ مَا شَاءَ وَيَدْعُوْا - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৪৬০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [হজ ও ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে] আগমন করলেন এবং মক্কায় প্রবেশ করলেন অতঃপর হাজারে আসওয়াদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাকে চুম্বন করলেন। তারপর বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করলেন। অতঃপর সাফা পর্বতে আসলেন এবং তাতে আরোহণ করলেন, যাতে তিনি বায়তুল্লাহকে দেখতে পেলেন। তারপর দু-হাত উত্তোলন করলেন এবং যতটুকু চাইলেন আল্লাহর জিকির ও দোয়া করতে লাগলেন। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٢٤٦١ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلٰوةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُوْنَ فِيْهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيْهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَ ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ جَمَاعَةً وَقَفُوْهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ)

২৪৬১. **অনুবাদ** : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– বায়তুল্লাহর চারদিকে তওয়াফ করা নামাজের মতোই, তবে এতে তোমরা কথাবার্তা বলতে পার। সুতরাং যে এতে কথাবার্তা বলবে ভালো কথা ছাড়া কিছু বলবে না। –[তিরমিযী, নাসাঈ ও দারিমী]

ইমাম তিরমিযী (র.) একদল মুহাদ্দিসের নামোল্লেখ করেছেন যারা এ হাদীসটিকে হযরত ইবনে আব্বাসের উক্তি [মাওকূফ] বলে সাব্যস্ত করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلٰوةِ **-এর মর্মার্থ** : বায়তুল্লাহর চারদিকে তওয়াফ করা নামাজের মতো– এর অর্থ এ নয় যে, নামাজে যেমন কিরাত, রুকূ, সিজদা ইত্যাদি আছে তওয়াফের মধ্যেও এগুলো আছে। তবে শরীর পাক, কাপড় পাক ও সতর ঢাকা যেমনিভাবে নামাজের জন্যে অপরিহার্য, তেমনি তওয়াফের জন্যেও। এদিক দিয়ে তওয়াফ নামাজের সদৃশ।

এ হাদীসের ভিত্তিতে ইমামগণ বলেছেন, পবিত্রতা তওয়াফের জন্যে শর্ত। তবে হানাফীদের মতে শর্ত নয়; বরং উত্তম।

وَعَنْهُ ٢٤٦٢ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِيْ آدَمَ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

২৪৬২. **অনুবাদ** : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– হাজারে আসওয়াদ যখন জান্নাত হতে অবতীর্ণ হয়েছে, তখন তা দুধ হতেও অধিক সাদা ছিল। পরে আদম সন্তানের গুনাহসমূহ তাকে কালো করে দিয়েছে। –[আহমাদ ও তিরমিযী]

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ **কথাটির তাৎপর্য** : এ হাদীসাংশটির ব্যাখ্যা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়।

হাফেজ তুরপুশতি (র.) প্রমুখ বলেছেন, সম্ভবত তার প্রকাশ্য অর্থই গ্রহণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষেই তা জান্নাতি পাথর। জান্নাত হতে তাকে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

শায়খ আবদুল হক (র.) বলেছেন, তাতে ঈমানের পরীক্ষা রয়েছে। কাফেররা তাকে পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করবে। দুর্বল ঈমানদারগণ তাকে বিশ্বাস করতে দ্বিধাবোধ করবে এবং পূর্ণ ঈমানদারগণ নির্দ্বিধায় ও নিঃশর্তে এটাতে স্বীকার করবে। কেননা, তাতে অকাট্য দলিলের বিপরীত কোনো কিছু নেই।

আহলে যায়গগণ [বিকৃত মস্তিষ্ক বা বক্রতা ধারণকারীরা] এ মর্মে বিতর্ক করেছেন যে, জান্নাত চিরস্থায়ী স্থান। সেখানকার কোনো বস্তুতে কোনো প্রকার বিপদ বা পরিবর্তন দেখা দিতে পারে না। অথচ এ পাথরে বিপদ দেখা দিয়েছে। কারামতা মুলাহিদার হাত হতে সে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে তা এখন পর্যন্ত বর্তমান রয়েছে।

এ বিতর্কের জবাব এই যে, চিরস্থায়ী জান্নাতের কোনো বস্তু যখন স্থানান্তরিত হয়ে সেখান হতে এখানে আসে তখন এখানের প্রভাব তাতে প্রতিফলিত হয়। যেমন– হযরত আদম (আ.) সেখান হতে এ পৃথিবীতে আসার পর তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণার উদ্রেক হয়েছিল।

অথবা জান্নাত হতে অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ এই যে, জান্নাতি বস্তুর মতো তাতে বরকত, শ্রেষ্ঠত্ব ও বুজুর্গি রয়েছে। যেমন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– আজওয়া জান্নাতি খেজুর। এখানেও অর্থ এই যে, রাসূলের দোয়ার কল্যাণে আজওয়া খেজুরেও জান্নাতি খেজুরের ন্যায় রোগমুক্তি ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِىْ اٰدَمَ **কথাটির তাৎপর্য :** এ বাক্যটিও তার অন্তর্নিহিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুত এর দ্বারা এ কথার প্রতিই জোর দেওয়া হয়েছে যে, পাপের অশুভ ফল ও প্রতিক্রিয়া এতটুকু পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, পাথরের মধ্যেও এর প্রভাব পড়েছে। সুতরাং পাপী লোকের অন্তরের অবস্থা কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লামা তীবী (র.) বলেছেন– হাদীসটি সাধারণত দৃষ্টান্তমূলক। অর্থাৎ পাথরটির মর্যাদা অত্যধিক এবং তাতে রয়েছে মানুষের পাপ মোচনের ক্ষমতা।

وَعَنْهُ ٢٤٦٣ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْحَجَرِ وَاللّٰهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَهٗ عَيْنَانِ يَبْصُرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهٖ يَشْهَدُ عَلٰى مَنِ اسْتَلَمَهٗ بِحَقٍّ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ)

২৪৬৩. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কে বলেছেন– আল্লাহর কসম! নিশ্চয় কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে উঠাবেন, তখন তার দুটি চোখ হবে যা দ্বারা সে দেখবে; তার একটি জিহ্বা হবে তার দ্বারা সে কথা বলবে এবং যে তাকে ঈমানের সাথে চুম্বন করেছে তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। –[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারিমী]

وَعَنْ ٢٤٦٤ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوْتَتَانِ مِنْ يَاقُوْتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللّٰهُ نُوْرَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُوْرَهُمَا لَاَضَاءَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

২৪৬৪. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছি– হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীম জান্নাতের ইয়াকৃতসমূহের মধ্যে দুটি ইয়াকৃত। এ দুটির জ্যোতি আল্লাহ তা'আলা দূর করে দিয়েছেন। যদি এদের আলো দূর করা না হতো তবে এরা পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের মধ্যে যা কিছু আছে তাকে জ্যোতির্ময় করে দিত। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

'ইয়াকৃত' এক প্রকার মূল্যবান পাথর। যেমন– মুক্তা, শ্বেতপাথর ইত্যাদি। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (র.) বলেছেন– মু'তাযিলাদের ন্যায় এ সকল হাদীসের অপব্যাখ্যা না করে এতে যেভাবে আছে হুবহু সেভাবে অর্থ করাই খাঁটি ঈমানের পরিচায়ক। কেননা, এ সকল বিষয়ের কোনোটিতেই অযৌক্তিকতার কিছুই নেই। বস্তুত গোটা দীন ইসলামটিই হলো দৃঢ় আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তির উপর। এটা অনস্বীকার্য যে, যুক্তির পিছনে পড়লে কোনো সমাধান তো হয় না; বরং আরো অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়।

وَعَنْ ٢٤٦٥ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ (رح) اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَا رَأَيْتُ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُزَاحِمُ

২৪৬৫. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত ওবাইদ ইবনে ওমাইর (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) দু-রোকনের [হাজারে আসওয়াদ ও ইয়ামানী কোনো] উপরে এমনভাবে প্রতিযোগিতা করে ঝাঁপিয়ে পড়তেন যে, আমি রাসূল ﷺ -এর কোনো সাহাবীকে এরূপ প্রতিযোগিতামূলকভাবে তার প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখিনি। হযরত ইবনে ওমর (রা.)

عَلَيْهِ قَالَ إِنْ أَفْعَلْ فَإِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ أُسْبُوْعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرٰى إِلَّا حَطَّ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

বলেন, আমি যদি এরূপ করি [তাতে দোষের কি আছে?] কেননা, আমি রাসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছি– নিশ্চয়ই, এদেরকে স্পর্শ করা গুনাহসমূহের জন্যে কাফফারা স্বরূপ। আমি তাঁকে আরও বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি এ ঘরের সাতবার প্রদক্ষিণ করবে অতঃপর তাকে যথাযথভাবে সম্পন্ন করবে তা দাসমুক্তি সমতুল্য হবে। এটা ছাড়াও তাঁকে বলতে শুনেছি, মানুষ তাতে কোনো এক পা ফেলে দ্বিতীয় পা উঠানোর পূর্বেই বরং আল্লাহ তা'আলা এতে তার একটি গুনাহ মিটিয়ে দেন এবং তার জন্যে একটি ছওয়াব লিপিবদ্ধ করেন। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ أُسْبُوْعًا فَأَحْصَاهُ -এর মর্মার্থ : যে ব্যক্তি যথাযথভাবে এ ঘরের তওয়াফ করেছে, এখানে أُسْبُوْعًا দ্বারা سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ বা সাত চক্কর বুঝানো হয়েছে। আর فَأَحْصَاهُ দ্বারা তওয়াফের ফরজ, ওয়াজিব, মোস্তাহাব তথা যাবতীয় নিয়মকানুন রক্ষা করে আদায় করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কারো মতে, এখানে أُسْبُوْعًا দ্বারা সাতদিন বুঝানো হয়েছে। আর فَأَحْصَاهُ দ্বারা বুঝানো হয়েছে, ধারাবাহিকভাবে পর পর সাতদিন। তবে এ মতটি অন্যান্য বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

وَعَنْ ٢٤٦٦ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৪৬৬. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ -কে দু-রোকনের [হাজারে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানী] মধ্যবর্তী স্থানে এ দোয়া করতে শুনেছি– হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা কর। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, উক্ত দোয়ার শেষে রাসূল ﷺ এ অংশটিও বর্ধিত করেছেন–
وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ -

---

وَعَنْ ٢٤٦٧ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ (رض) قَالَتْ أَخْبَرَتْنِىْ بِنْتُ أَبِىْ تُجْرَاةَ قَالَتْ دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ دَارَ اٰلِ أَبِىْ حُسَيْنٍ نَنْظُرُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَسْعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَرَأَيْتُهُ يَسْعٰى وَإِنَّ مِيْزَرَهُ لَيَدُوْرُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْىِ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِسْعَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْىَ - (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَرَوٰى أَحْمَدُ مَعَ اخْتِلَافٍ)

২৪৬৭. অনুবাদ : হযরত সফিয়া বিনতে শায়বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তুজরার কন্যা আমাকে সংবাদ দিয়ে বলেছে যে, আমি কুরাইশ গোত্রীয় কতিপয় মহিলার সাথে আবূ হোসাইন পরিবারের একটি গৃহে প্রবেশ করলাম যাতে আমরা রাসূল ﷺ -কে দেখতে পাই। তখন রাসূল ﷺ সাফা-মারওয়া সাঈ করছিলেন। আমি তাঁকে সাঈ করতে দেখলাম, আর তাঁর জোর পদক্ষেপের কারণে তাঁর চাদর এদিক-সেদিক দুলছিল। আর তাঁকে এটা বলতে শুনলাম– তোমরা সাঈ কর। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি সাঈকে লিপিবদ্ধ [নির্ধারিত] করে দিয়েছেন। –[বাগবী শরহে সুন্নায় এবং আহমদ কিছু ভিন্নতার সাথে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সাঈর বিধান সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : হজ আদায়ের ক্ষেত্রে সাঈ করা কি, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে কিছুটা মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَاَحْمَدَ (رح) : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.) প্রমুখের মতে, সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করা হজের রোকন তথা ফরজ। সাঈ ব্যতীত হজ সহীহ হবে না।

তাঁরা প্রমাণ হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীস উপস্থাপন করেন–

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِسْعَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْىَ ـ (اَحْمَدُ ، اَلدَّارَقُطْنِىُّ)

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَثَوْرِىْ (رح) : ইমাম আ'যম আবূ হানীফা, সুফিয়ান ছাওরী (র.) ও হানাফী মতাবলম্বীগণ বলেন, সাঈ ওয়াজিব।

তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত দলিল উপস্থাপন করেন–

ক. মহান আল্লাহর বাণী– فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا

উল্লিখিত আয়াতে لَا جُنَاحَ পদটি দ্বারা বৈধতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী– لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ আয়াতে لَا جُنَاحَ দ্বারা বৈধতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং প্রকাশ্য আয়াত দ্বারা বৈধতা প্রমাণিত হয়; ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। তবে ইজমার দলিলের ভিত্তিতে আমরা তাকে ওয়াজিব বলে থাকি।

খ. ফরজ প্রমাণিত হওয়ার জন্যে অকাট্য দলিল (دَلِيْلٌ قَطْعِىٌّ) থাকা প্রয়োজন। আর এখানে তা অনুপস্থিত। কেননা, হাদীসে যে اِسْعَوْا নির্দেশসূচক ক্রিয়া রয়েছে তা খবরে ওয়াহিদ। আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ফরজ প্রমাণিত হয় না। বড় জোর ওয়াজিব সাব্যস্ত হতে পারে।

জবাব : সাঈ ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তাগণ যে হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন, হানাফীদের পক্ষ হতে তার নিম্নরূপ উত্তর দেওয়া হয়েছে–

ক. তাদের উপস্থাপিত হাদীসের সনদ সম্পর্কে হাদীসশাস্ত্রবিদগণ সমালোচনা করেছেন।

খ. كَتَبَ শব্দটি যেমন ফরজ হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয় তেমনি মোস্তাহাব অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, মহান আল্লাহর বাণী– كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ -এর মধ্যে كُتِبَ শব্দটি মোস্তাহাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

গ. তাদের উপস্থাপিত হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ। আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ফরজ সাব্যস্ত হয় না। এতে বুঝা গেল যে, সাঈ করা ওয়াজিব; ফরজ নয়।

وَعَنْ ٢٤٦٨ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ (رض) قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلٰى بَعِيْرٍ لَا ضَرْبٌ وَلَا طَرْدٌ وَلَا اِلَيْكَ اِلَيْكَ ـ (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

২৪৬৮. অনুবাদ : হযরত কুদামা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আম্মার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ -কে উটের পিঠে চড়ে সাফা ও মারওয়ার জন্যে সাঈ করতে দেখেছি তবে কাউকেও মারতে বা হাঁকাতে এবং এদিকে সর, ওদিকে সর– বলতে শুনিনি। –[বাগবী, শরহে সুন্নাহ]

وَعَنْ ٢٤٦٩ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ (رض) قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ اَخْضَرَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ)

২৪৬৯. অনুবাদ : হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইয়াহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ সবুজ চাদর ইযতিবা রূপে গায়ে দিয়ে বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করেছেন। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِضْطِبَاعٌ -এর অর্থ ও তার অবস্থা : 'ইযতিবা' অর্থ– বীর-বাহাদুরিসুলভ চাদর পরিধান করা। এতে চাদরের মধ্যখান ডান বগলের নিচে রেখে চাদরের উভয় প্রান্ত বাম কাঁধের উপরে রাখা। এ অবস্থায় ডান কাঁধ খোলা থাকে। তওয়াফে কুদূমে ইযতিবা করা সুন্নত এবং এ তওয়াফে সাত চক্করেই এভাবে থাকা সুন্নত, যদিও 'রমল' করা মাত্র তিন চক্করেই সুন্নত। তওয়াফে ইফাযা বা জেয়ারতে ইযতিবা করার প্রয়োজন নেই, করলেও ক্ষতি নেই। আমি দেখেছি– সাধারণ লোক হজের ইহরাম বাঁধার সাথে সাথেই ইযতিবা রূপে চাদর পরিধান করে, তা উচিত নয়। কেননা, এরূপে চাদর পরিধান করে নামাজ পড়া মাকরূহ।

٢٤٧٠ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابَهُ اِعْتَمَرُوْا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوْا بِالْبَيْتِ ثَلٰثًا وَجَعَلُوْا اَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ اٰبَاطِهِمْ ثُمَّ قَذَفُوْهَا عَلٰى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرٰى - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৪৭০. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ মাকামে জি'রানা হতে ওমরা করেছেন, তাঁরা বায়তুল্লাহ শরীফের তিন পাক রমল [জোর পদক্ষেপে চলা] করেছেন এবং তাঁদের চাদরসমূহ [ডান] বগলের নিচে দিয়ে অতঃপর তা তাঁদের বাম কাঁধের উপর রেখেছেন। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জি'রানার ঐতিহাসিক ঘটনা : জি'রানা মক্কা হতে সাত-আট কিলোমিটার দূরে হুনাইন ও হাওয়াযিন এলাকায় অবস্থিত একটি জায়গার নাম। ঐতিহাসিক হুনাইনের যুদ্ধের পর এ জায়গাতেই নবী করীম ﷺ যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মাল বণ্টন করেছেন এবং এ স্থান হতেই নবী করীম ﷺ রাতের বেলায় একটি ওমরা আদায় করেছেন। অনেকের কাছে রাসূল ﷺ -এর এ ওমরার কথা অজানা রয়ে গেছে। বর্তমানে এটা 'ওমরায়ে কোবরা' নামে প্রসিদ্ধ।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٤٧١ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ مَا تَرَكْنَا اِسْتِلَامَ هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيْ وَالْحَجَرِ فِيْ شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ نَافِعٌ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهٖ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهٗ وَقَالَ مَا تَرَكْتُهٗ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُهٗ -

২৪৭১. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এ দু-কোণ তথা রোকনে ইয়ামনী ও হাজারে আসওয়াদের কোণকে স্পর্শ করা ছাড়িনি চাই ভিড়ের মধ্যে হোক বা ভিড় ছাড়া [স্বাভাবিক অবস্থায়] হোক, যখন হতে রাসূল ﷺ -কে এ দু-কোণ [রোকন]-কে স্পর্শ করতে দেখেছি। –[বুখারী ও মুসলিম]

বুখারী ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় রয়েছে, হযরত নাফে' (র.) বলেছেন, আমি হযরত ইবনে ওমর (রা.)-কে হাজারে আসওয়াদ আপন হাতে স্পর্শ করতে অতঃপর হাতকে চুম্বন করতে দেখেছি। আর তাঁকে এটা বলতেও শুনেছি– যখন হতে রাসূল ﷺ -কে এটা করতে দেখেছি, তখন হতে আমি এটা কখনও ত্যাগ করিনি।

وَعَنْ ٢٤٧٢ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِنِّيْ أَشْتَكِيْ فَقَالَ طُوْفِيْ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَسْطُوْرٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪৭২. **অনুবাদ :** হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ -এর সমীপে এ অভিযোগ করলাম যে, আমি অসুস্থ। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তবে তুমি মানুষের পিছনে পিছনে সওয়ার অবস্থায় তওয়াফ কর। [আদেশ মতো] আমি তওয়াফ করলাম, তখন রাসূল ﷺ বায়তুল্লাহ শরীফের পার্শ্বে নামাজ পড়ছিলেন আর তাতে সূরা 'তূর' তথা ওয়াততূর ওয়া কিতাবিম মাসতূর' পাঠ করছিলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٢٤٧٣ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ (رض) قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُوْلُ إِنِّيْ لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْلَا أَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ مَا قَبَّلْتُكَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪৭৩. **অনুবাদ :** হযরত আবেস ইবনে রবীয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত ওমর (রা.)-কে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করতে দেখেছি এবং তাকে বলতে শুনেছি– আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র। তুমি কারো উপকার করতে পার না আর ক্ষতি সাধনও করতে পার না। যদি আমি রাসূল ﷺ -কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখতাম, তবে আমি কখনো তোমাকে চুম্বন করতাম না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দ্বন্দ্বের সমাধান : এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে পূর্বে এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– যে ব্যক্তি হাজারে আসওয়াদে চুমা দেবে বা একে স্পর্শ করবে, কিয়ামতের দিন তা তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। সুতরাং যে তা করবে না সে এ কল্যাণ হতে বঞ্চিত থাকবে। ফলকথা, এটা যে লাভ-লোকসান ঘটাতে পারে, তা তো হাদীসের দ্বারাই প্রমাণিত। সুতরাং হযরত ওমরের এ কথার তাৎপর্য কি?

এর জবাবে বলা হয় যে, জাহেলিয়াতের জমানায় মুশরিকরা উক্ত পাথরকে তাদের অন্যান্য দেবতার মতো একটি অন্যতম দেবতা মনে করত। অন্যান্য দেবতার পূজা-অর্চনা না করলে তারা ভক্তের উপর নারাজ হয়ে তার ক্ষতি সাধন করবে এ ধরনের ভ্রান্ত ও কুফরি আকিদা তাদের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। ফলে হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কেও তারা এ ধারণা পোষণ করত। হযরত ওমরের সাথে কিছু নও মুসলিমও সেখানে ছিল। হয়তো তারা ইসলামের পূর্বের আকিদা অনুযায়ী এ ধারণা করতে পারে যে, ইসলামের মধ্যেও জাহেলিয়াতের যুগের ধারণা ও আকিদা অনুযায়ী চুমা দেওয়া হচ্ছে। তাই হযরত ওমর (রা.) পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলেন যে, হে পাথর! তোমাকে জাহেলিয়াতের যুগের সে ধারণা ও আকিদায় চুমা দিচ্ছি না; বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুকরণেই চুম্বন করছি।'

হযরত ওমর (রা.)-এর উক্তির তাৎপর্য : হযরত ওমর (রা.)-এর উক্তির আপাত দৃষ্টিতে দুটি তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়–

১. জাহিলিয়া যুগে মুশরিকরা পাথরকেও দেবতা মনে করে তার পূজা করত। হযরত ওমর (রা.)-এর উক্তি "তুমি কারো উপকার করতে পার না এবং কারো ক্ষতিও করতে পার না" এ জন্যে তিনি একথা বলেছিলেন, যাতে জাহিলিয়া যুগের বিশ্বাস অনুসারে কোনো নতুন মুসলমান এ বিশ্বাস করে না বসে যে, পাথরেরও মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণ করার ক্ষমতা রয়েছে। তাই তাকে স্পর্শ করা হচ্ছে বা চুম্বন করা হচ্ছে। এজন্যেই তিনি বলেছেন যে, তা একটি জড়পদার্থ মাত্র। তার নিজস্ব এমন কোনো শক্তি নেই যা মানুষের উপকার বা ক্ষতি করতে পারে।

২. পাথরকে কেন চুম্বন করছেন তার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি দ্বিতীয় তাৎপর্যটি তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ তিনি রাসূলের অনুকরণেই তা করেছেন। নিঃশর্তে ও প্রশ্নাতীতভাবে রাসূলের অনুকরণ ও অনুসরণই চুম্বনের কারণ। রাসূল ﷺ এ

পাথরকে চুম্বন করেছেন বলেই তিনিও তাকে করেছেন। রাসূল ﷺ কেন করেছেন তা তিনি জানতে চাননি। কারণ, ইসলাম অর্থই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের হেতু জানতে না চেয়ে এবং কারণ অনুসন্ধান না করে তার প্রতি আত্মসমর্পণ করা।

হযরত ওমর (রা.)-এর উক্তির উদ্দেশ্য ছিল এটাই। তাই বলে তিনি জান্নাতের জিনিসকে জান্নাতের ভালোবাসায় ভালোবাসা প্রদর্শনকে অহেতুক মনে করেননি।

وَعَنْ ٢٤٧٤ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وُكِّلَ بِهٖ سَبْعُوْنَ مَلَكًا يَعْنِى الرُّكْنَ الْيَمَانِىَّ فَمَنْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالُوْا اٰمِيْنَ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

২৪৭৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– তার সাথে অর্থাৎ রোকনে ইয়ামানীর সাথে সত্তরজন ফেরেশতাকে মোতায়েন রাখা হয়েছে। সুতরাং যখন কেউ বলে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ইহকাল ও পরকালের ক্ষমা ও কুশল প্রার্থনা করছি। হে প্রভু! তুমি আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর। আর জাহান্নামের আজাব হতে রক্ষা কর। তখন তারা বলে, আমীন [আল্লাহ তুমি কবুল কর]। –[ইবনে মাজাহ]

وَعَنْهُ ٢٤٧٥ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَّلَا يَتَكَلَّمُ اِلَّا بِسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّاٰتٍ وَكُتِبَ لَهٗ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ رُفِعَ لَهٗ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ وَهُوَ فِىْ تِلْكَ الْحَالِ خَاضَ فِى الرَّحْمَةِ بِرِجْلَيْهِ كَخَائِضِ الْمَاءِ بِرِجْلَيْهِ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

২৪৭৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফের সাত পাক তওয়াফ করে এবং 'সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' [অর্থাৎ "আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ ছাড়া কারো উপায় বা শক্তি নেই।"] ব্যতীত কোনো কথা না বলে তার দশটি গুনাহ মুছে দেওয়া হয়, তার জন্যে দশটি নেকী লেখা হয় এবং তার দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি তওয়াফ করবে ও কথা বলবে, সে ব্যক্তি এমন অবস্থায় হবে যেন সে আল্লাহর রহমত রাশিতে আপন পা দ্বারা ঢেউ দিয়েছে যেমন কোনো ব্যক্তি নিজের পদদ্বয় দ্বারা পানিতে ঢেউ দিয়ে থাকে। –[ইবনে মাজাহ]

بَابُ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ
পরিচ্ছেদ : আরাফায় অবস্থান

আরাফাত ইসলামের অসংখ্য স্মৃতি বিজড়িত এক ঐতিহাসিক ময়দান যা তায়েফের পথে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে মুযদালিফার কাছাকাছি অবস্থিত। এর উত্তর প্রান্তে জাবালে রহমত এবং উত্তরপূর্ব প্রান্তে 'জাবালে আরাফাহ' নামক দুটি ছোট ছোট পাহাড় অবস্থিত। এটি আবহমান কাল থেকে মুক্ত আকাশের নিচে বালি-কঙ্করে বিস্তৃর্ণ এক সুবিশাল খোলা মাঠ– দৃষ্টির শেষসীমা পর্যন্ত ধূসর মরুভূমি। বর্তমানে এর চারদিকে চারটি সুউচ্চ খামের উপর সাইন বোর্ডে بِدَايَةُ عَرَفَةَ 'আরাফাহ শুরু' ও نِهَايَةُ عَرَفَةَ 'আরাফাহ শেষ' লিখা রয়েছে। এ আরাফার ময়দানে কিছু সময়ের জন্যে অবস্থান করা হজের অন্যতম রুকন। জিলহজ মাসের নয় তারিখের দ্বিপ্রহর হতে দশম তারিখের সুবহে সাদিক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মুহূর্তকালের জন্যে হলেও এখানে অবস্থান করা ফরজ। তবে নয় তারিখ সূর্য হেলে যাওয়া হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করা সুন্নত। সুর্যাস্তের পূর্বে আরাফার চিহ্নিত সীমানা ত্যাগ করা জায়েজ নেই। এ সুপ্রসিদ্ধ স্থানটির নামকরণের ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়–

১. বর্ণিত আছে যে, জান্নাত হতে বের হয়ে আসার পর হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) একে অপরের সাথে এখানেই সাক্ষাৎ লাভ করেন। এ নতুন করে পরিচয়ের কারণে এর নাম আরাফাহ হয়েছে। এ হিসেবে আরবি মা'রিফাত (مَعْرِفَةٌ) শব্দ হতে এটা অনুসৃত হয়েছে বলে মনে করতে হবে। মা'রিফাত শব্দের অর্থ– জানা, চেনা বা পরিচয় লাভ করা।

২. অথবা, কারো কারো মতে, এ স্থানেই হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে হজের বিধিবিধানসমূহ শিক্ষা প্রদান করে বলেছেন যে, আপনি বুঝেছেন? হযরত ইবরাহীম (আ.) বলেছেন, হ্যাঁ বুঝেছি (عَرَفْتُ)। এজন্য এ স্থানকে আরাফাত বলা হয়।

৩. অথবা, এ স্থানটি অনেক সম্মানিত ও প্রসিদ্ধ। যেন তার পরিচয় দেওয়ার পূর্বেই তা পরিচিত ও প্রসিদ্ধ (مَعْرُوْفٌ)। এজন্যে তাকে আরাফাহ বলা হয়।

৪. কারো মতে, বান্দাগণ এখানে এক বিশেষ ধরনের ইবাদত ও আনুগত্যের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজের পরিচয় দিয়ে থাকে বলেই এ নামকরণ হয়েছে।

৫. কেউ বলেছেন, শব্দটি 'আরফাতুন [عَرْفَةٌ আইনের উপর যবর ও 'রা' এর উপর সাকিন] হতে অনুসৃত। এর অর্থ– সুগন্ধি। যেহেতু মিনাতে পশু জবাই করার কারণে সেখান হতে দুর্গন্ধ বের হয়; তার বিপরীতে এ স্থানকে আরাফাত বলা হয়েছে। কেননা, এখানে ঐ দুর্গন্ধ নেই। দুর্গন্ধের তুলনায় কোনো গন্ধ না থাকলেও তা সুগন্ধতুল্য।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٤٧٦ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ اَنَّهُ سَأَلَ اَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ (رض) وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى اِلٰى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪৭৬. অনুবাদ : তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর ছাকাফী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তারা উভয়ে সকালে মিনা হতে আরাফার দিকে যাচ্ছিলেন। আপনারা এ দিনে রাসূল ﷺ -এর সাথে কিভাবে কাজ করতেন? তখন তিনি বললেন, আমাদের ভিতরে যারা তালবিয়াহ পাঠ করার তালবিয়াহ পাঠ করত; এজন্যে তাকে নিষেধ করা হতো না, আর যারা তাকবীর বলার তাকবীর বলত; এতেও তার প্রতি কোনো আপত্তি করা হতো না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আরাফার দিন তাকবীর বলার হুকুম : সাহেবাইনের মতে, এমন সব ব্যক্তির জন্যে তাকবীর বলা ওয়াজিব যারা হজে শরিক হয়নি। ৯ই জিলহজ ফজরের নামাজের পর হতে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরজ নামাজ শেষে। আর যারা হজে শরিক হয়েছে– তাদের পক্ষে ১০ই জিলহজ রমী তথা কঙ্কর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত 'তালবিয়াহ' বলা সুন্নত। তাকবীরের শব্দগুলো নিম্নরূপ– اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ [আল্লাহু আক্‌বার, আল্লাহু আক্‌বার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্‌বার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ] একে বলা হয় 'তাক্‌বীরে তাশ্‌রীক'। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ৯ই জিলহজ ফজর হতে ১০ তারিখ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরজ নামাজের শেষে একবার তাকবীর বলা ওয়াজিব। তবে ফতোয়া সাহেবাইনের মতের উপরেই। পক্ষান্তরে জমহুরের মতে তা মোস্তাহাব।

তাকবীর কার উপর ওয়াজিব : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, কারো উপর তাকবীর ওয়াজিব হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। যথা– ১. মুকীম হওয়া, ২. আজাদ বা স্বাধীন হওয়া, ৩. পুরুষ হওয়া, ৪. ফরজ নামাজ হওয়া, ৫. নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা এবং ৬. শহরে অবস্থানরত অবস্থায় নামাজ পড়া। তবে সাহেবাইনের মতে, ফরজ নামাজ আদায়কারী প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই তাকবীর বলা ওয়াজিব। জামাতে পড়া আবশ্যক নয়।

وَعَنْ ٢٤٧٧ جَابِرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَحَرْتُ هٰهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوْا فِىْ رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ هٰهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفْتُ هٰهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৪৭৭. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি এ জায়গায় কুরবানির পশু জবাই করেছি, মিনার সম্পূর্ণটাই কুরবানির স্থান। সুতরাং তোমরা তোমাদের বাসায় কুরবানি কর। আমি [আরাফার] ঐ স্থানে অবস্থান করছি– আর আরাফার সম্পূর্ণটাই অবস্থানের জায়গা এবং আমি ঐ জায়গায় অবস্থান করছি– আর মুয্‌দালিফার সম্পূর্ণটাই অবস্থানের স্থান। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٢٤٧٨ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ اَكْثَرَ مِنْ اَنْ يُّعْتِقَ اللّٰهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَاِنَّهُ لَيَدْنُوْا ثُمَّ يُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلٰئِكَةَ فَيَقُوْلُ مَا اَرَادَ هٰؤُلَاءِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৪৭৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূল ﷺ বলেছেন, এমন কোনো দিন নেই যাতে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে জাহান্নাম হতে অধিক মুক্তি দিয়ে থাকেন আরাফার দিন অপেক্ষা। তিনি [সে দিন] বান্দাদের নিকটবর্তী হন অতঃপর তাদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করে বলেন, এসব লোকেরা কি চায়? [যা চায় তাই দেব]। –[মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٤٧٩ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ خَالٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ يَزِيْدُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ كُنَّا فِيْ مَوْقِفٍ لَنَا بِعَرَفَةَ يُبَاعِدُهُ عَمْرٌو مِنْ مَوْقِفِ الْاِمَامِ جِدًّا فَاَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ الْاَنْصَارِيُّ فَقَالَ اِنِّيْ رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْكُمْ يَقُوْلُ لَكُمْ قِفُوْا عَلٰى مَشَاعِرِكُمْ فَاِنَّكُمْ عَلٰى اِرْثٍ مِنْ اِرْثِ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৪৭৯. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান (রা.) তাঁর এক মামা হতে বর্ণনা করেন যাকে ইয়াযীদ ইবনে শাইবান বলা হতো। ইয়াযীদ বলেছেন, আমরা আরাফাতে আমাদের অবস্থানস্থলে ছিলাম। আমরের উক্তি– এটা ইমামের স্থান হতে অনেক দূরে ছিল। হযরত হযরত ইয়াযীদ (রা.) বলেন, এ সময় আমাদের কাছে ইবনে মিরবা' আনসারী এসে বললেন, আমি তোমাদের কাছে রাসূল ﷺ -এর পক্ষ হতে প্রেরিত হয়েছি। রাসূল ﷺ তোমাদেরকে বলছেন, তোমরা তোমাদের ইবাদতগাহেই অবস্থান কর। কেননা, তোমরা তোমাদের প্রপিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের উত্তরাধিকারের উপরেই রয়েছ। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পূর্ণ আরাফাত ময়দানকেই মাওকিফ বা অবস্থানস্থল ঘোষণা করেছেন এবং পরে মহানবী ﷺ ও একে অনুরূপই বহাল রেখেছেন। সুতরাং এর একাংশ অন্যাংশ হতে উত্তম নয়। বস্তুত তারা মহানবী ﷺ হতে দূরে থাকায় তাঁর কাছে যেতে ইচ্ছা করেছিল এবং তিনি যেখানে অবস্থান করেছেন একে নিজেদের অবস্থানস্থল হতে উত্তম মনে করেছিল। তাই হুযূর ﷺ যে প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন, তাঁর কথার অর্থ হলো– ইমাম হতে দূরে থাকার দরুন তোমরা তোমাদের অবস্থানস্থলকে তুচ্ছ মনে করো না। কেননা, ফজিলতের ক্ষেত্রে আরাফাতের সমগ্র এলাকাই এক সমান।

وَعَنْ ٢٤٨٠ جَابِرٍ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيْقٌ وَمَنْحَرٌ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ)

২৪৮০. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, আরাফার সম্পূর্ণ এলাকাই অবস্থানস্থল, মিনার সম্পূর্ণ এলাকাই কুরবানির জায়গা, মুযদালিফার সম্পূর্ণটাই অবস্থানস্থল এবং মক্কার সমস্ত পথই রাস্তা ও কুরবানির স্থান। -[আবূ দাউদ ও দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيْقٌ وَمَنْحَرٌ-এর ব্যাখ্যা : দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী প্রশস্ত পথকে বলা হয়- فِجَاجٌ ফিজাজ। সে যুগে হেরেম শরীফের আশে-পাশে ছোট-বড় বহু পাহাড় ছিল, পরবর্তীতে এর অনেকগুলো কেটে সমতল আবার কোনোটিকে ঢালু এবং কোনো কোনোটিকে সুরঙ্গ পথে পরিণত করা হয়েছে। আবার কোনো কোনোটি অবিকল অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। মহানবী ﷺ 'সানায়ে কাদা' পথে মক্কায় প্রবেশ করেছেন, তাই উক্ত পথে প্রবেশ করা উত্তম। তবুও তিনি পরবর্তীকালে আগত উম্মতের সুবিধার্থে ঘোষণা করেছেন, যে কোনো পথেই প্রবেশ করলে চলবে এবং যে কোনো পথে মক্কা হতে বের হওয়া যাবে। অর্থাৎ সব রাস্তাই প্রবেশ ও বাহির হওয়ার পথ।

অনুরূপভাবে মক্কার শহর সমস্তটাই কুরবানির স্থান। দশম তারিখে হেরেম এলাকার যে কোনো স্থানেই কুরবানি করলে আদায় হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, ওমরার পশু মারওয়ায় এবং হজের পশু মিনায় জবাই করা উত্তম। মোটকথা, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফা ও মুযদালিফা প্রভৃতি স্থানে উম্মতের কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে এ প্রশস্ততার ঘোষণা প্রদান করেছেন।

وَعَنْ ٢٤٨١ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ (رض) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلٰى بَعِيْرٍ قَائِمًا فِى الرِّكَابَيْنِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৪৮১. অনুবাদ : হযরত খালিদ ইবনে হাওদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ -কে উটের পিঠে চড়ে দু-রোকনের [হাজারে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামনী] মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে আরাফার দিন জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে দেখেছি। -[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٢٤٨٢ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَ رَوٰى مَالِكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اِلٰى قَوْلِهٖ لَا شَرِيْكَ لَهٗ)

২৪৮২. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রা.) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, সব দোয়ার শ্রেষ্ঠ দোয়া হলো আরাফার দিনের দোয়া এবং উত্তম বাক্য, যা আমি নিজে পাঠ করেছি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ পাঠ করেছেন তা হলো- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তাঁরই সার্বভৌমত্ব; যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই; তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। -[তিরমিযী]

ইমাম মালেক এ হাদীসটি তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা.) হতে লা-শারীকা লাহু বাক্য পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

خَيْرُ مَا قُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ **-এর মর্মার্থ :** রাসূল ﷺ বলেছেন, সকল দোয়ার শ্রেষ্ঠ দোয়া হলো আরাফার দিনের দোয়া। আর উত্তম দোয়া, যা আমি নিজে পাঠ করেছি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ পাঠ করেছেন তা হলো–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

হাদীসের মধ্যে যদিও দোয়ার উল্লেখ নেই। তবে .... لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ দোয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, আল্লাহর প্রশংসা দোয়ার অর্থই ইঙ্গিত করে।

অথবা, ... لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর জিকির ছওয়াব হাসিল হওয়া ও ছওয়াবের বদৌলতে লক্ষ্যে পৌঁছার দিক দিয়ে দোয়ারই অনুরূপ, তাই দোয়ার স্থলে .... لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ উল্লেখ করা হয়েছে।

অথবা, এটা দ্বারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বান্দার উচিত আল্লাহর জিকিরে লিপ্ত হওয়া এবং তাঁর দান-দাক্ষিণ্য, দয়া ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে দুনিয়া ও আখিরাতের জন্যে কিছু চাওয়া হতে বিরত থাকা। বর্ণিত আছে যে,

مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِىْ عَنْ مَسْأَلَتِىْ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِى السَّائِلِيْنَ -

অথবা, ... لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আরাফার দিনের জন্যে নির্দিষ্ট কোনো দোয়া নেই; বরং নিজের ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো দোয়া করতে পারে।

অথবা, এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দোয়ার পূর্বে আল্লাহর প্রশংসা করা মোস্তাহাব।

وَعَنْ ٢٤٨٣ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ كَرِيْزٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا رَأَى الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيْهِ اَصْغَرُ وَلَا اَدْحَرُ وَلَا اَحْقَرُ وَلَا اَغْيَظُ مِنْهُ فِىْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَمَا ذَاكَ اِلَّا لِمَا يَرٰى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللّٰهِ عَنِ الذُّنُوْبِ الْعِظَامِ اِلَّا مَا رَأٰى يَوْمَ بَدْرٍ فَقِيْلَ مَا رَأٰى يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَاِنَّهُ قَدْ رَأٰى جِبْرَئِيْلَ يَزَعُ الْمَلَائِكَةَ . (رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا وَفِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ)

২৪৮৩. অনুবাদ : হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে কারীয (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, শয়তানকে এত বেশি অপমানিত, এত বেশি লাঞ্ছিত, এত বেশি ঘৃণিত ও এত বেশি ক্ষুব্ধ আরাফার দিন অপেক্ষা আর কোনো দিন দেখা যায় না। তা এ কারণে যে, সে [বান্দাদের প্রতি আল্লাহর] রহমত অবতীর্ণ হতে এবং বড় বড় গুনাহসমূহ মাফ হতে দেখে। তবে এটা বদরের দিন দেখা গিয়েছিল। কেউ জিজ্ঞাসা করল, বদরের দিন কি দেখা গিয়েছিল [ইয়া রাসূলাল্লাহ!] উত্তরে তিনি বললেন, সেদিন সে নিশ্চতরূপে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে ফেরেশতাদেরকে সারিবদ্ধ করতে দেখেছিল। –[মালেক মুরসাল হিসেবে। ইমাম বাগবী শরহে সুন্নায় তবে ভাষা মাসাবীহ-এর।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বদরের দিন কি দেখা গেছে : কুফরি শক্তির মোকাবিলায় বদরের যুদ্ধই ইসলামের প্রথম যুদ্ধ। মুসলমানের সংখ্যা ছিল হাতে গনা মাত্র কয়েকজন। তাও ছিল যুদ্ধাস্ত্রবিহীন। এ পৃথিবীতে ইসলাম টিকে থাকবে নাকি মুছে যাবে, বদরের প্রান্তর ছিল এর ফয়সালার দিন। আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে আসমান হতে নেমে এসেছিল ফেরেশতার দল। এদিকে মুসলমানেরা দুনিয়ার সমস্ত মোহ এবং জীবনের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধের কাতারে দাঁড়িয়ে ছিলেন– আল্লাহর দীনকে রক্ষা করতে। অপর দিকে হযরত জিবরাঈলের নেতৃত্বে নেমে আসল কয়েক শত ফেরেশতা। সেদিন আল্লাহ তা'আলা দীন ইসলামের হেফাজতে যে বিরাট অনুগ্রহ প্রদান করেছিলেন– আরাফার দিনের অনুগ্রহ অপেক্ষা তা ছিল অনেক অনেক বেশি। হাদীসে সেই দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَعَنْ ٢٤٨٤ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ إِنَّ اللّٰهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُوْلُ أُنْظُرُوْا إِلٰى عِبَادِيْ أَتَوْنِيْ شُعْثًا غُبْرًا ضَاجِّيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ يَا رَبِّ فُلَانٌ كَانَ يُرَهِّقُ وَفُلَانٌ وَفُلَانَةٌ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ عَتِيْقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ . (رَوَاهُ شَرْحُ السُّنَّةِ)

২৪৮৪. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন আরাফার দিন হয় আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং হজকারীদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের সম্মুখে গর্ব করেন এবং বলেন, তোমরা আমার বান্দাদের দিকে দেখ, তারা আমার কাছে এলোকেশে, ধুলামলিন বেশে, বহু দূরদূরান্ত হতে, চিৎকার করতে করতে [ফরিয়াদ করতে করতে] হাজির হয়েছে। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী বানিয়েছি, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। তখন ফেরেশতাগণ বলেন, হে প্রতিপালক! অমুককে তো বড় পাপী বলে অভিহিত করা হয়, আর অমুক পুরুষ ও অমুক মহিলাকেও। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, তখন আল্লাহ মহীয়ান ও গরীয়ান বলেন, আমি তা মাফ করে দিলাম। রাসূল ﷺ বলেন, আরাফার দিন অপেক্ষা এমন কোনো দিন নেই যে দিনে এত অধিক লোককে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে। –[বাগবী, শরহে সুন্নায়]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٤٨٥ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِيْنَهَا يَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوْا يُسَمُّوْنَ الْحُمْسَ فَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُوْنَ بِعَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ بِهَا ثُمَّ يُفِيْضُ مِنْهَا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪৮৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলিয়া যুগে কুরাইশগণ ও তাদের ধর্মের অনুসারীগণ [আরাফার দিনে] মুযদালিফায় অবস্থান করত এবং নিজেদেরকে বাহাদুর কুলীন বলে আখ্যায়িত করত। আর সারা আরবের লোকেরা আরাফাতে অবস্থান করত। অতঃপর যখন ইসলামের আবির্ভাব হলো তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে আদেশ করলেন, তিনি যেন আরাফাতে এসে তথায় অবস্থান করেন, এরপর সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, অতঃপর তোমরা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন কর, যেখান থেকে সাধারণ লোক প্রত্যাবর্তন করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَكَانُوْا يُسَمُّوْنَ الْحُمْسَ-এর ব্যাখ্যা : আরবের কুরাইশগণ তথা বনূ কিনানা নিজেদেরকে 'হোম্‌স' বা কুলীন মনে করত। জাহেলিয়াতের যুগে হজের সময় তারা অন্যান্য লোকদের সাথে আরাফার ময়দানে নবম তারিখে অবস্থান করত না। তারা বলত, আমরা সম্ভ্রান্ত ও কুলীন। সাধারণ মানুষের সাথে একত্রে বসা আমাদের জন্যে লজ্জাকর। আমরা তাদের চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদার অধিকারী। তাই তারা মুযদালিফার এক পাহাড়ের টিলায় অবস্থান করত।

অতঃপর ইসলামের আবির্ভাবের যুগেও তাদের সেই অহমিকা বহাল ছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর মাধ্যমে নির্দেশ দিলেন- তোমরাও সকলের সাথে একই ময়দানে অবস্থান কর এবং তথা হতে লোকদের সাথে প্রত্যাবর্তন কর।

'হোম্‌স'-এর আর এক অর্থ হলো- কঠোর অর্থাৎ তারা ছিল নিজেদের ধর্মের উপরে কঠিন ও অবিচল। আবার কেউ কেউ বলেন- 'হোম্‌স' অর্থ আহলুল্লাহ বা আল্লাহর আপনজন। তাই তারা হজের সময় আল্লাহর হেরেম হতে বের হয়ে যাওয়াটা সমীচীন মনে করত না। যদি তাদের কেউ হেরেমের বাইরে যেত, তখন আশ্চর্যের সাথে বলত- هٰذَا مِنَ الْحُمْسِ فَمَا بَالُهُ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ অর্থাৎ এ ব্যক্তি তো কুরাইশী সে হেরেম ছেড়ে বাইরে গেল কেন?

وَعَنْ ٢٤٨٦ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعَا لِأُمَّتِهٖ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ فَأُجِيْبَ أَنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلَا الْمَظَالِمِ فَإِنِّىْ اٰخِذٌ لِلْمَظْلُوْمِ مِنْهُ قَالَ اَىْ رَبِّ إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَ الْمَظْلُوْمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ فَلَمْ يُجَبْ عَشِيَّتَهٗ فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ فَأُجِيْبَ إِلٰى مَا سَأَلَ قَالَ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ فَقَالَ لَهٗ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ بِأَبِىْ أَنْتَ وَأُمِّىْ إِنَّ هٰذِهٖ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيْهَا فَمَا الَّذِىْ أَضْحَكَكَ أَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ قَالَ إِنَّ عَدُوَّ اللّٰهِ إِبْلِيْسَ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدِ اسْتَجَابَ دُعَائِىْ وَغَفَرَ لِأُمَّتِىْ اَخَذَ التُّرَابَ فَجَعَلَ يَحْثُوْهُ عَلٰى رَأْسِهٖ وَيَدْعُوْا بِالْوَيْلِ وَالثُّبُوْرِ فَأَضْحَكَنِىْ مَا رَأَيْتُ مِنْ جَزَعِهٖ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى الْبَيْهَقِىُّ فِىْ كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ نَحْوَهٗ)

২৪৮৬. অনুবাদ : হযরত আব্বাস ইবনে মিরদাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ আরাফার দিন বিকালে আপন উম্মতের [হাজীদের] জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। উত্তর দেওয়া হলো, আমি অত্যাচারী ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দিলাম। কেননা, অত্যাচারিতের পক্ষ হয়ে আমি অত্যাচারীকে পাকড়াও করে হক আদায় করব। রাসূল ﷺ বললেন, হে আমার রব! তুমি যদি ইচ্ছা কর অত্যাচারীকে জান্নাত দান করতে পার এবং অত্যাচারীকে ক্ষমা করতে পার। ঐ দিন বিকালে তাঁর এ প্রার্থনা মঞ্জুর হলো না। অতঃপর মুযদালিফায় রাসূল ﷺ যখন ভোরে উঠেন পুনরায় এ দোয়া করলেন। তখন তিনি যা প্রার্থনা করলেন তা তাঁকে দেওয়া হলো। রাবী আব্বাস বলেন, তখন রাসূল ﷺ হেসে উঠলেন অথবা বলেছেন, তিনি মুচকি হাসলেন। এ সময় হযরত আবূ বকর (রা.) ও ওমর (রা.) রাসূল ﷺ -কে বললেন, আমাদের পিতামাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক! এটা এমন একটি সময়, যে সময় আপনি কখনও হাসতেন না। কিসে আপনাকে হাসাল? আল্লাহ আপনাকে আরও হাসান। রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর শত্রু ইবলিস যখন জানতে পারল যে, আল্লাহ মহীয়ান ও গরীয়ান আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দিয়েছেন তখন সে মাটি নিয়ে নিজের মাথায় ছিটাতে লাগল এবং নিজের ধ্বংস ও দুর্ভাগ্যকে ডাকতে লাগল [অর্থাৎ বলতে লাগল, হায় আমার পোড়া কপাল! হায় দুর্ভাগ্য!] সুতরাং তার যে অস্থিরতা দেখেছি এটাই আমাকে হাসিয়েছে।

-[ইবনে মাজাহ] বায়হাকী (র.) তাঁর 'কিতাবুল বা'ছি ওয়ান নুশূর'-এ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লিখিত হাদীস সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামত : রাসূল ﷺ আরাফায় যে দোয়া করেছেন তাতে অত্যাচারী ব্যতীত সকলের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু মুযদালিফায় যে দোয়া করেছেন তাতে সকল গুনাহই মাফ করার বিষয় বিধৃত হয়েছে। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার হক হোক বান্দার হক হোক সবই মাফ হবে। এ হাদীসকে ইবনে মাজাহ্, তাবারানী, হাকিম, তিরমিযী, আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ, ইবনে জারীর ও বায়হাকী (র.) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। ইবনে জাওযী (র.) অবশ্য বলেছেন, হাদীসিট বিশুদ্ধ নয়। এ মতকে প্রত্যাখ্যান করে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, ইমাম জিয়া এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র.)ও তার কিছু অংশ বর্ণনা করে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। সুতরাং তাঁর মতেও হাদীসটি যথার্থ। এটা অন্য সনদ সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। ফলে এক রেওয়ায়াত অন্য রেওয়ায়াতকে শক্তিশালী করেছে। হাদীসের অর্থ সম্পর্কে তাবারানী (র.) বলেছেন, এটা ঐ অত্যাচারীর সম্পর্কে ধরে নিতে হবে, যে না তওবা করেছে, না পরের হক আদায় করতে অসমর্থ। বায়হাকী বলেছেন, এ হাদীসের অনুকূলে অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। যদি হাদীসটি বিশুদ্ধ হয় তবে তো তা প্রমাণ হিসেবে প্রয়োগ হবে নতুবা আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ -ই এর জন্যে যথেষ্ট।

প্রশ্নের জবাব : এখানে প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই দোয়া হয়েছিল মুযদালিফায় এবং বিদায় হজে। কারণ রাসূল ﷺ তো এর পূর্বে হজ করেননি। আর ইসলামের পূর্বে করলেও হযরত আবূ বকর ও ওমর তখন সাথে ছিলেন না। সুতরাং তাঁরা কিভাবে বললেন যে, "আপনি তো এ সময় কখনও হাসেননি।"

এর জবাবে বলা যায় যে, এটা ছিল দোয়া ও বিনয়ের অবস্থা। তাই এটাতো কাঁদার সময়; হাসার সময় নয়। অর্থাৎ ইতঃপূর্বে তিনি এ অবস্থায় হাসেননি।

بَابُ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ

পরিচ্ছেদ : আরাফাহ ও মুযদালিফা হতে প্রত্যাবর্তন

আলোচ্য পরিচ্ছেদের পরিপূর্ণ বাক্য হলো– اَلدَّفْعُ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ وَمِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلٰى مِنًى অর্থাৎ আরাফাহ হতে মুযদালিফায় এবং মুযদালিফা হতে মিনায় প্রত্যাবর্তন করা। হজের নিয়ম হলো ৯ই জিলহজ সকাল হতে রওয়ানা করে দুপুরের পূর্বে আরাফার ময়দানে পৌঁছে পুরো দিন সেখানে অবস্থান করে সূর্যাস্তের পর আরাফাহ থেকে এসে রাতে মুযদালিফায় অবস্থান করতে হয়। যদি সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফার সীমানা ত্যাগ করে তবে তার উপর দম দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর মাগরিবের নামাজ আরাফার সীমানায় কিংবা পথে কোথাও পড়া জায়েজ নেই; বরং রাত যতটাই হোক না কেন মুযদালিফায় এসে এক আজান ও এক ইকামতে মাগরিব ও ইশা একসাথে পড়বে। এ দুই ফরজ নামাজের মধ্যখানে কোনো সুন্নত বা নফল পড়া যাবে না। সমস্ত উম্মত এ কথার উপর একমত।

মুযদালিফা : এর অপর নাম মুকতাযি'লা। কুরআনে একে مَشْعَرُ الْحَرَامِ বলা হয়েছে। হাদীসে একে جَمْعٌ বলেও উল্লেখ করেছে। মুযদালিফার ভাবার্থ হলো– تَقَرُّبٌ বা নৈকট্য লাভ করা। কথিত আছে যে, হযরত 'আদম' (আ.) আরাফায় হযরত 'হাওয়া'র পরিচয় লাভ করেন এবং মুযদালিফায় তাঁর নিকটে যান এবং সহবাসও করেন। সুবহে সাদিকের পূর্বে মুযদালিফা ত্যাগ করা হানাফী মাযহাব মতে জায়েজ নেই। এখান থেকে ১০ তারিখ ফজরের নামাজ পড়ে মিনায় এসে রমী, কুরবানি ও হলক করতে হয়। মনে রাখতে হবে যে, এ পথগুলো পদব্রজে অতিক্রম করা সুন্নত।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٤٨٧ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (رض) عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسِيْرُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِيْنَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ فَاِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪৮৭. অনুবাদ : হযরত হিশাম ইবনে ওরওয়াহ তাঁর পিতা ওরওয়াহ হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা বলেছেন, একদা হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূল ﷺ বিদায় হজে যখন আরাফার ময়দান হতে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন কিভাবে চলেছিলেন? জবাবে তিনি বললেন, তিনি স্বাভাবিক গতিতে চলতেন আর যখন খোলা জায়গা পেতেন তখন দৌড়ে চলতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنَقٌ ও نَصٌّ -এর অর্থ : اَلْعَنَقُ 'আনাক' অর্থ– ধীরে ও জোরে উভয় গতির মাঝখানে মধ্যম গতিতে চলা। نَصٌّ 'নাস' অর্থ খুব জোরে চলা। অর্থাৎ সম্মুখের মানুষকে ঠেলে আগে যেতে চেষ্টা করতেন না; বরং সকলের সাথে একতালে ও স্বাভাবিকভাবে চলতেন। অবশ্য যখন দেখতেন একটু ফাঁকা রয়েছে, জায়গা খালি; তখন দ্রুত গতিতে চলতেন– যেন সম্মুখে পরবর্তী কাজের দিকে সকাল সকাল পৌঁছা যায়। তবে আজকাল রমী, কুরবানিগাহ্ ইত্যাদিতে হাজীদেরকে রাসূল ﷺ -এর এ সুন্নতের প্রতি তেমন একটা ভ্রুক্ষেপ করতে দেখা যায় না।

وَعَنْ ٢٤٨٨ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيْدًا وَضَرْبًا لِلْاِبِلِ فَاَشَارَ بِسَوْطِهِ اِلَيْهِمْ وَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ فَاِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْاِيْضَاعِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৪৮৮. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি একবার আরাফার দিনে রাসূল ﷺ -এর সাথে আরাফাহ হতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এ সময় রাসূল ﷺ তাঁর পেছনের দিকে উট তাড়ানোর সজোরে হাঁক ও উটকে পিটানোর শব্দ শুনতে পেলেন। তখন তিনি নিজ চাবুক দ্বারা তাদের দিকে ইশারা করে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা শান্তভাবে চল, কেননা দ্রুত উট হাঁকানোর মধ্যেই পুণ্য নেই। [বরং হজের অনুষ্ঠানগুলো ঠিকমতো আদায় করার মধ্যেই পুণ্য।] -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উভয় হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান : আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে, দ্রুত উট হাঁকানোর মধ্যে পুণ্য নেই। অথচ পূর্বোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, খোলা জায়গা পেলেই রাসূল ﷺ দ্রুত গতিতে চলতেন। সুতরাং প্রকাশ্যভাবে উভয় হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়-

উক্ত দ্বন্দ্বের সমাধান এই যে, পুণ্যের কাজে দেরি করা উচিত নয়। কেননা, আল্লাহ বলেছেন- وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ . فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ভালো কাজ করতে গিয়ে কোনো মন্দ কাজ যেন সংঘটিত না হয়। এখানে পিছনের লোকেরা উট হাঁকাতে গিয়ে অন্যান্য লোকদের কষ্ট দিচ্ছিল। তদুপরি ভিড়ের মধ্যে এরূপ চলায় অন্যদের কষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। আর এজন্যেই রাসূল ﷺ দ্রুত গতিতে উট হাঁকাতে নিষেধ করেছেন। তবে দ্রুত গতিতে উট হাঁকাতে যদি তা অন্যের কষ্টের কারণ না হয়, তবে দ্রুত গতিতে চলাই উত্তম। সুতরাং হাদীসদ্বয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

وَعَنْ ٢٤٨٩ اَنَّ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ اِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ اَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ اِلٰى مِنًى فَكِلَاهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّيْ حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪৮৯. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) আরাফাহ হতে মুযদালিফা পর্যন্ত রাসূল ﷺ -এর পিছনে বসেছিলেন। অতঃপর মুযদালিফা হতে মিনা পর্যন্ত রাসূল [আমার ভাই] ফযল ইবনে আব্বাসকে তাঁর পিছনে বসিয়েছিলেন। তারা উভয়েই বলেছেন, রাসূল ﷺ জামরায়ে আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়াহ পাঠ করেছিলেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يُلَبِّيْ حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ -এর ব্যাখ্যা : ইহরাম বাঁধা হতে শুরু করে দশ তারিখ কঙ্কর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়াহ পাঠ করা সুন্নত। প্রথম কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে সাথে তা বন্ধ হয়ে যাবে। আর তালবিয়াহ পাঠ করার প্রয়োজন নেই। দশ তারিখে এক জামরাতেই সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়, তাকে জামরাতুল আকাবাহ বলা হয়।

وَعَنْ ٢٤٩٠ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِاِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلٰى اِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৪৯০. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশাকে একত্রে পড়েছেন। প্রত্যেক নামাজের জন্যে পৃথক পৃথক ইকামত বলেছেন এবং উভয়ের মধ্যে কোনো নফল পড়েননি এবং তাদের পরেও কোনো নফল পড়েননি। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দু ওয়াক্ত নামাজ একত্রে আদায় করা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : দু ওয়াক্ত নামাজ একত্রে আদায় করার দুটি অবস্থা হতে পারে– ক. বাহ্যিক একত্র বা جَمْع صُوْرِىٌّ খ. আসল একত্র বা جَمْع حَقِيْقِىٌّ

ক. جَمْع صُوْرِىٌّ : এক ওয়াক্ত নামাজকে শেষ ওয়াক্তে এবং অন্য ওয়াক্ত নামাজকে প্রথম ওয়াক্তে পড়াকে جَمْع صُوْرِىٌّ বলে। যেমন, জোহরের নামাজ তার শেষ ওয়াক্তে পড়া এবং আসরের নামাজ প্রথম ওয়াক্তে পড়া। অনুরূপভাবে মাগরিবের নামাজকে শেষ ওয়াক্তে পড়া এবং ইশার নামাজকে প্রথম ওয়াক্তে পড়া। বাহ্যিকভাবে যদিও দেখা যায় যে, দুটি নামাজকে একত্র করে পড়া হয়েছে; কিন্তু আসলে তা নয়, বরং দুটি নামাজই তার নির্দিষ্ট সময়ই পড়া হয়েছে। আর এটা সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। কেননা, হাদীসে আছে–

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَيُعَجِّلُ الْعِشَاءَ .

তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন যে, এরূপ অভ্যাস করে নেওয়া মাকরূহ।

খ. جَمْع حَقِيْقِىٌّ : দুটি নামাজকে একত্র করে একই ওয়াক্তে পড়াকে প্রকৃত জমা বলা হয়। যেমন– জোহর ও আসরের নামাজকে একত্রে আসরের সময় পড়া। এমনিভাবে মাগরিব ও ইশাকে একত্রে ইশার সময় পড়া এরূপ একত্র করা বৈধ কিনা এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে–

مَذْهَبُ اِمَامْ مَالِكْ (رحـ) : ইমাম মালেকের মতে সফর যদি এমন হয় যে, দ্রুত গতিতে পথ অতিক্রম করা প্রয়োজন তখন جَمْع حَقِيْقِىٌّ বৈধ।

দলিল : তিনি তাঁর মতের পক্ষে নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন–

١. عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (مُسْلِمٌ)

٢. عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) كَانَ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ اَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ وَيَقُوْلُ ابْنُ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ - (مُسْلِمٌ)

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ وَاَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক, আবূ ছাওর, ইবনুল মুনযির, আতা, মুজাহিদ, তাউস, ইকরামা, ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর প্রমুখের মতে, ভ্রমণে সাধারণভাবেই جَمْعُ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ বৈধ।

দলিল : তাঁরা নিজেদের মতের অনুকূলে নিম্নোক্ত দলিলসমূহ পেশ করেন–

١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا بِالْمَدِيْنَةِ فِىْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ . (مُسْلِمٌ)

٢. عَنْ مُعَاذٍ (رضـ) قَالَ جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكٍ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَصَاحِبَيْنِ وَسُفْيَانَ ثَوْرِىْ (رحـ) وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আযম, সাহেবাইন, সুফিয়ান, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, ইবরাহীম, ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র.) প্রমুখ ব্যক্তিদের মতে جَمْع حَقِيْقِىٌّ বৈধ নয়।

দলিল : তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে আগত দলিলসমূহ পেশ করেন–

١. قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا .

٢. عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اَلْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِرِ .

٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ اَتٰى بَابًا مِنْ اَبْوَابِ الْكَبَائِرِ .

আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে বিরুদ্ধবাদীদের দলিলের উত্তর : ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রতিপক্ষের দলিলের উত্তরে বলেন, ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (র.) প্রমুখ ব্যক্তিগণ যে সমস্ত হাদীসকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন তাতে جَمْع দ্বারা جَمْع صُوْرِىٌّ বুঝানো হয়েছে, যা সকলের মতেই বৈধ। ইমাম তাহাবীও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

وَعَنْ ٢٤٩١ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى صَلٰوةً إِلَّا لِمِيْقَاتِهَا إِلَّا صَلٰوتَيْنِ صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيْقَاتِهَا - (متفق عليه)

২৪৯১. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কখনও রাসূল ﷺ -কে দু-নামাজ ছাড়া কোনো নামাজকে তার নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত পড়তে দেখিনি। তা হলো– তিনি মাগরিব ও ইশা মুযদালিফায় একত্র করে পড়েছেন এবং ঐ দিনই ফজরকে যথাসময়ের [কিছু] পূর্বে পড়েছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِلَّا صَلٰوتَيْنِ صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ -এর ব্যাখ্যা : এখানে প্রশ্ন হয় যে, মুযদালিফায় মাগরিবের নামাজ ইশার ওয়াক্তে পড়া হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ইশার নামাজ তো তার নিজ ওয়াক্তেই আদায় করা হয়েছিল। সুতরাং হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) দুই নামাজ বলতে মাগরিবের সাথে ইশাকে কিভাবে বললেন?

এর জবাবে বলা হয় যে, হাদীসের আসল পাঠ হবে– صَلَّى الْمَغْرِبَ فِىْ وَقْتِ الْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ অর্থাৎ মাগরিবের নামাজ মুযদালিফায় ইশার ওয়াক্তে ইশার সাথে وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ এবং জোহর ও আসর একত্রে জোহরের ওয়াক্তে আরাফায়। সম্ভবত রাবী এ হাদীসটি মুযদালিফায় বর্ণনা করেছেন বিধায় আরাফাতের ঘটনাটি উল্লেখ করেননি। অন্যথা হাদীসের মর্মই ঠিক হবে না, এছাড়া আরাফার আসরের নামাজের কথা বাদই পড়ে যায়। অথচ তথায় তাও নিজ ওয়াক্তের পূর্বেই পড়া হয়েছিল। অথবা, আরাফায় দিনের বেলায় হাজার হাজার মানুষের সম্মুখেই আসরকে জোহরের সাথে জোহরের ওয়াক্তেই আদায় করা হয়েছে, তাই এর কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে মুযদালিফায় মাগরিব যে ইশা'র সাথে পড়া হয়েছে, তা ছিল রাতের বেলায়। সুতরাং এটা অনেকের কাছে জানা নাও থাকতে পারে। তাই শুধু মাগরিবের কথাটি উল্লেখ করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, এ হাদীস অনুসারেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, এ দু জায়গা ব্যতীত অন্য কোনো সফরে এক ওয়াক্তের নামাজ অপর কোনো নামাজের ওয়াক্তে পড়া জায়েজ নেই।

صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيْقَاتِهَا -এর ব্যাখ্যা : অর্থাৎ ঐ দিনই ফজরকে যথাসময়ের পূর্বে পড়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের এ বক্তব্য থেকে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, আর তা হলো আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا অর্থাৎ নিশ্চয় নামাজ মু'মিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফরজ করা হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক নামাজের জন্যে সময় নির্দিষ্ট থাকলেও এ দু-স্থানে তথা আরাফাহ ও মুযদালিফায় দু-নামাজ তথা আসর ও মাগরিবের ওয়াক্তকে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজের জন্যে নির্ধারিত ওয়াক্ত রয়েছে। তবে আরাফাহ ও মুযদালিফায় আসর ও মাগরিবকে তাদের নির্ধারিত সময় ছাড়া পড়া যাবে। অন্য কোনো নামাজ তার নিজ ওয়াক্ত হতে পরিবর্তন করার কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) কিভাবে বললেন যে, রাসূল ﷺ ফজরের নামাজ পড়েছেন সময়ের পূর্বে।

জবাব : উপরিউক্ত প্রশ্নের জবাব এই যে, হাদীসে উল্লিখিত قَبْلَ مِيْقَاتِهَا -এর অর্থ হলো– قَبْلَ مِيْقَاتِهَا الْمُعْتَادِ অর্থাৎ রাসূল ﷺ ঐ দিন ফজরের নামাজ তাঁর সাধারণ অভ্যাসের পূর্বেই আদায় করেছিলেন। তাঁর সাধারণ অভ্যাস ছিল যে, তিনি ফজরের নামাজ إِسْفَارٌ বা ভোরের আলোতে পড়তেন; কিন্তু সেদিন মুযদালিফায় সাধারণ অভ্যাসের পূর্বে অর্থাৎ غَلَسٌ [ভোরের অন্ধকার]-এ পড়েছিলেন। সুতরাং قَبْلَ مِيْقَاتِهَا -এর অর্থ এটা নয় যে, ঐ দিন ফজরের নামাজ সুবহে সাদিকের পূর্বে পড়েছিলেন। কেননা, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে অপর একটি বর্ণনা রয়েছে–

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى الْفَجْرَ بَعْدَ الصُّبْحِ بِالْمُزْدَلِفَةِ.

এ জন্যেই হানাফীরা বলে থাকেন, নবী করীম ﷺ -এর সাধারণ অভ্যাস ছিল উষার আলোতে ফজরের নামাজ পড়া। আর এটাই হলো উত্তম সময়। তবে ঐ দিন উত্তম সময়ের পূর্বেই পড়েছেন।

وَعَنْ ٢٤٩٢ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪৯২. **অনুবাদ** : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আপন পরিবারের যেসব দুর্বল [শিশু মহিলা]-দেরকে মুযদালিফার রাতে সময়ের আগেই [মিনায়] পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমি তাদের অন্যতম ছিলাম। —[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মুযদালিফায় রাতে অবস্থান সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : মুযদালিফায় রাত যাপন করা কি? এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ—

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ (رح) : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র.)-এর মতে, মুযদালিফায় রাতে অবস্থান করা সুন্নত। কেননা, রাসূল ﷺ -এর কাজ দ্বারা তা সাব্যস্ত হয়েছে।

مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ (رح) وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ওলামায়ে আহনাফের মতে, মুযদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব। তা পরিত্যাগ করলে দম দিতে হবে। যেমন হাদীসে এসেছে—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩. ইমাম ইবনে খুযাইমা (র.)-এর মতে, মুযদালিফায় অবস্থান করা হজের একটি রুকন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন—
فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

৪. আলকামাহ, নাখয়ী, শা'বী ও হাসান বসরী (র.) বলেন— مَنْ تَرَكَ الْمَبِيْتَ بِمُزْدَلِفَةَ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ

প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব : যারা মুযদালিফায় অবস্থান করাকে ফরজ বলেন তাদের উপস্থাপিত দলিলের জবাবে বলা যায় যে, উল্লিখিত আয়াতে أَمْرٌ টি অবস্থান সম্পর্কে নয়; বরং জিকির সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে।

وَعَنْ ٢٤٩٣ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ (رض) وَكَانَ رَدِيْفَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِيْنَ دَفَعُوْا عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتّٰى دَخَلَ مُحَسِّرًا وَهُوَ مِنْ مِنًى قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِيْ يُرْمٰى بِهِ الْجَمْرَةُ وَقَالَ لَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُلَبِّيْ حَتّٰى رَمَى الْجَمْرَةَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৪৯৩. **অনুবাদ** : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর ভ্রাতা হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, ফযল (রা.) বলেছেন— তিনি রাসূল ﷺ -এর সওয়ারির পেছনে বসাছিলেন— রাসূল ﷺ আরাফার সন্ধ্যায় এবং মুযদালিফার ভোরে লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা যখন চলবে, শান্তভাবে চলবে। তিনি নিজেও নিজের উষ্ট্রীকে সংযত রেখেছিলেন যতক্ষণ না মিনার অন্তর্গত মুহাস্সির নামক স্থানে পৌঁছেছিলেন। এ সময় রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা কাঁকর নাও যা জামরাতে নিক্ষেপ করা হবে— আঙ্গুল দ্বারা ধরে নিক্ষেপ করা যায় এমন কাঁকর। ফযল (রা.) বলেন, জামরার কাঁকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত রাসূল ﷺ সর্বদা তালবিয়াহ পাঠ করেছিলেন। —[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْخَذَفُ-এর অর্থ : اَلْخَذَفُ শব্দের অর্থ হলো– বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা অথবা বৃদ্ধাঙ্গুলির পেটের উপর রেখে তর্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা নিক্ষেপ করা বা টোকা মারা। অর্থাৎ এটা এত ছোট কাঁকর হতে হবে যা অতি সহজে অঙ্গুলির মাথা দ্বারা নিক্ষেপ করা যেতে পারে। বস্তুত সেখানে জনতার এত অধিক ভিড় জমে যে যা চাক্ষুস না দেখলে কল্পনাও করা যাবে না। সুতরাং কাঁকর যদি ক্ষুদ্র না হয় তবে এর আঘাতে বহু লোক জখমী হবে, এতে সন্দেহ নেই। অনেকে বড় বড় কঙ্কর এমনকি পায়ের সেন্ডেল, জুতা ও ছাতা ইত্যাদি নিক্ষেপ করে মানুষকে কষ্ট দেয়। এটা আবেগে উত্তেজনায় বশীভূত হয়ে নেককাজ করতে গিয়ে অপরাধ করে থাকে, এতে সন্দেহ নেই। তাই ফিকহের কিতাবসমূহে বলা হয়েছে– কাঁকর চনা বুটের পরিমাণ হওয়াই উচিত।

اَلْمُحَسِّرُ-এর পরিচয় : মুহাস্‌সির একটি উপত্যকার নাম। আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, এ স্থানটি মিনার অন্তর্গত। অপর এক হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, তা মুযদালিফার অংশ। কেউ কেউ বলেছেন, তা মুযদালিফার শেষ প্রান্তে অবস্থিত মিনার নিকটবর্তী স্থান। তবে সঠিক কথা হলো, তা মিনা ও মুযদালিফার মধ্যবার্তী স্থানে অবস্থিত।

وَعَنْ ٢٤٩٤ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ اَفَاضَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَاَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ وَاَوْضَعَ فِىْ وَادِىْ مُحَسِّرٍ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَرْمُوْا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذَفِ وَقَالَ لَعَلِّىْ لَا اَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِىْ هٰذَا (لَمْ اَجِدْ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِى الصَّحِيْحَيْنِ اِلَّا فِىْ جَامِعِ التِّرْمِذِىْ مَعَ تَقْدِيْمٍ وَتَاخِيْرٍ) .

২৪৯৪. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন মুযদালিফা হতে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তিনি শান্তশিষ্ট ছিলেন এবং লোকদেরকেও শান্তভাবে চলতে আদেশ করলেন। মুহাস্‌সির উপত্যকায় পৌঁছলে তিনি উটকে কিছুটা দৌড়ালেন এবং লোকদেরকে জামরায় এমন কঙ্কর নিক্ষেপ করতে আদেশ করলেন যা আঙ্গুলি দ্বারা নিক্ষেপ করা যায়। আর বললেন, সম্ভবত আমি আমার এ বছরের পর আর তোমাদেরকে দেখব না। –[গ্রন্থকার লিখেছেন– বুখারী ও মুসলিমে এ হাদীসটি পাইনি, তবে তিরমিযী কিছু আগপিছ করে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَمْ اَجِدْ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِى الصَّحِيْحَيْنِ-এর মর্মার্থ : এটা মূলত মাসাবীহ গ্রন্থকার আল্লামা বাগবী (র.)-এর উপর মিশকাত গ্রন্থকার শায়খ অলিউদ্দীন তাবরিযীর একটি অভিযোগ। আর তা হচ্ছে– মাসাবীহর গ্রন্থকার কিতাবের অগ্রভাগে লিখেছেন যে, প্রত্যেক পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসকে স্থান দেবেন। অথচ আমি অত্র হাদীসটি উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের একটিতেও পাইনি, তবে তিরমিযী শরীফে পেয়েছি। ইমাম তিরমিযী কিছু আগপিছ করে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আগের শব্দ পরে এবং পরের শব্দ আগে বর্ণিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٤٩٥ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ (رض) قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يَدْفَعُوْنَ مِنْ عَرَفَةَ حِيْنَ تَكُوْنُ الشَّمْسُ كَاَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِيْ وُجُوْهِهِمْ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ وَمِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حِيْنَ تَكُوْنُ كَاَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِيْ وُجُوْهِهِمْ وَاِنَّا لَا نَدْفَعُ مِنْ عَرَفَةَ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَنَدْفَعُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ هَدْيُنَا مُخَالِفٌ لِهَدْيِ عَبَدَةِ الْاَوْثَانِ وَالشِّرْكِ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ خَطَبَنَا وَسَاقَهُ نَحْوَهُ)

২৪৯৫. অনুবাদ : মুহাম্মাদ ইবনে কায়স ইবনে মাখ্‌রামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বক্তৃতা করলেন এবং বললেন, জাহিলিয়া যুগের লোকেরা আরাফাহ হতে প্রত্যাবর্তন করত সূর্যাস্তের পূর্বে যখন সূর্য মানুষের চেহারায় মানুষের পাগড়ির মতো দেখাত এবং মুযদালিফা হতে প্রত্যাবর্তন করত সূর্যোদয়ের পরে তাও সূর্য যখন মানুষের চেহারায় মানুষের পাগড়ির মতো দেখাত। আমরা আরাফাহ হতে প্রত্যাবর্তন করব না, যতক্ষণ সূর্য অস্ত না যায় এবং মুযদালিফা হতে প্রত্যাবর্তন করব সূর্যোদয়ের পূর্বে। আমাদের রীতিনীতি পৌত্তলিক ও মুশরিকদের রীতিনীতির বিপরীত। –[বায়হাকী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَاَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ-এর তাৎপর্য : অর্থাৎ সূর্য উদিত হওয়ার সামান্য পরে এবং অস্তমিত হওয়ার সামান্য পূর্বে এর জ্যোতি বা কিরণ সোজাসুজি মানুষের চেহারায় এসে পড়ে, এ সময় যে ব্যক্তি কোনো গিরিপথ বা উপত্যকায় থাকে তখন সূর্যের কিরণে তার চেহারা পাগড়ির পেঁচের ন্যায় দেখায়। মুশরিক পৌত্তলিকরা সূর্যাস্ত ও উদয়ের সামান্য আগে ও পরে আরাফাহ ও মুযদালিফা হতে রওয়ানা দিত, তখন তাদের চেহারায় সূর্যের হালকা কিরণ পড়ত। যা দর্শকের দৃষ্টিতে মনে হতো তা যেন পাগড়ির পেঁচ।

আবার কারো মতে, এখানে عِمَامَةٌ অর্থ পাহাড়ের সুউচ্চ শৃঙ্গ বা টিলা। অর্থাৎ সূর্য উদয় ও অস্তের সময় এর গোল চাক্কির অর্ধেক পরিমাণ যখন উদয় হয় বা অস্ত যায়, তখন এর কিরণ পাহাড়ের টিলায়– পাগড়ির পেঁচের ন্যায় মনে হয়। এখানে সেই সময়কার সূর্যের কিরণের অবস্থাকে মানুষের পাগড়ির সাথে সাদৃশ্য করা হয়েছে।

وَعَنْ ٢٤٩٦ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَدَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ اُغَيْلِمَةَ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلٰى حُمُرَاتٍ فَجَعَلَ يَلْطَخُ اَفْخَاذَنَا وَيَقُوْلُ اُبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৪৯৬. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ [আমাদেরকে] আবদুল মুত্তালিব বংশের বালকদেরকে মুযদালিফার রাতে সময়ের আগেই গাধার উপর চড়িয়ে মিনার দিকে পাঠিয়ে দিলেন। তখন আমাদের রান চাপড়িয়ে বললেন, হে আমার ছোট সন্তানগণ! তোমরা সূর্য উঠার আগে জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করো না। –[আবূ দাঊদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাত্রেই মুযদালিফা ত্যাগ করার হুকুম : ইমাম আবূ হানীফা, ইসহাক ও মালেক তথা অধিকাংশ আলেমের মতে, কোনো শরয়ী ওজর থাকলে মধ্যরাতের পরে মুযদালিফা ত্যাগ করা বৈধ। তবে বিনা ওজরে ত্যাগ করলে দম বা বিনিময় দিতে হবে। উপরোল্লিখিত হাদীসই এর প্রমাণ। কেননা, যাদের ওজর ছিল তারা রাতেই মুযদালিফা ত্যাগ করে আসছিল; কিন্তু রাসূল ﷺ নিজে আসেননি। তিনি ফজরের নামাজ আদায় করে সে স্থান ত্যাগ করেছিলেন।

রাতের বেলায় কাঁকর নিক্ষেপ করার হুকুম : জামরায় কখন কাঁকর নিক্ষেপ করা হবে, এ বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে–

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَطَاوُسَ وَعَطَاءٍ وَشَعْبِيِّ (رح) : ইমাম শাফেয়ী, তাউস, আতা ও শা'বী (র.) বলেন, সুবহে সাদিকের পূর্বে এবং মধ্যরাতের পরে জামরায়ে আকাবায় কাঁকর নিক্ষেপ করা জায়েজ আছে। মুসলিম ও আবূ দাউদে হযরত আসমা (রা.)-এর কথা বিবৃত হয়েছে– إِنَّا رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ ; এতে দেখা যায় রাতেই রমী করা হয়েছে। আবূ দাউদের অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছে, মহানবী ﷺ হযরত উম্মে সালামা (রা.)-কে [তাঁর অসুস্থতার দরুন] রাতেই মিনায় পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি সুবহে সাদিকের পূর্বেই রমী করেছেন। এখানে সুবহে সাদিকের পূর্বে অর্থ– রাতেই।

مَذْهَبُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ (رح) : ইমাম আবূ হানীফা, আহমদ, মালেক ও জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, রাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েজ নেই। তাঁদের মতে সূর্যোদয়ের পরেই রমী করতে হবে। তবে সুবহে সাদিকের পরে এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে রমী করলে জায়েজ হবে; কিন্তু উত্তম নয়। তবে সুবহে সাদিকের পূর্বে রমী করলে তাকে পরে পুনরায় রমী করতে হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত এ হাদীসই তাঁদের দলিল। কেননা, নবী করীম ﷺ তাদেরকে রাতে পাঠিয়ে দিলেও সূর্যোদয়ের পূর্বে রমী করতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব : ইমাম শাফেয়ীর দলিলের জবাবে বলা হয় যে, হযরত আসমা (রা.) রাতে রমী করেননি; বরং অতি প্রত্যুষে রমী করেছেন– তাও সুবহে সাদিকের সংলগ্ন غَلَسْ বা অন্ধকারে। ফলে একে 'রাত'ই বলা হয়েছে। আর হযরত উম্মে সালামা (রা.) **ফজরের নামাজের পূর্বেই রমী করেছেন**– এটাও সুবহে সাদিকের পরে হয়েছে। অথবা হযরত উম্মে সালামা (রা.) বেশি অসুস্থ ছিলেন, তাই তাঁকে রাতেই রমী করার অনুমতি দিয়েছিলেন, এটা তাঁর জন্যে এক বিশেষ ব্যবস্থা মাত্র, যা অন্যের বেলায় প্রযোজ্য হবে না।

وَعَنْ ٢٤٩٧ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ وَكَانَ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِيْ يَكُوْنُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَهَا - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

২৪৯৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানির পূর্ব রাতে রাসূল ﷺ উম্মে সালামা (রা.)-কে [মিনায়] পাঠালেন। তিনি [সালামা] ফজরের পূর্বেই জামরায় পাথর নিক্ষেপ করলেন তারপর চলে গেলেন এবং তাওয়াফে যিয়ারত [তাওয়াফে ইফাযা] করলেন। ঐ দিনটি ছিল এমন একদিন যে দিন রাসূল ﷺ সাধারণত তাঁর ঘরেই থাকতেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাসূল ﷺ নিজ স্ত্রীদের কাছে সমানভাবে থাকার জন্যে দিন বণ্টন করে রেখেছিলেন। ঐ দিন হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর কাছে থাকার পালা ছিল। এজন্যে হযরত উম্মে সালামা (রা.) আগেভাগেই সমস্ত কাজ সেরে রেখেছিলেন যাতে রাসূল ﷺ মুযদালিফা হতে মিনায় আসলে তিনি নির্বিঘ্নে তাঁর খেদমতে নিয়োজিত থাকতে পারেন।

এ হাদীস অনুসারেই ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, রাতে কঙ্কর নিক্ষেপ জায়েজ আছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) অন্য হাদীস অনুসারে বলেন, রাতে কঙ্কর নিক্ষেপ জায়েজ নেই, তবে হযরত উম্মে সালামা (রা.) যা করেছিলেন, তা তাঁর জন্যে একটা বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

وَعَنْ ٢٤٩٨ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ يُلَبِّي الْمُقِيْمُ أَوِ الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ وَ رُوِيَ مَوْقُوْفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ)

২৪৯৮. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কাবাসী মুকীম অথবা ওমরাকারী আগন্তুকগণ তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকবে যে পর্যন্ত হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ না করবে। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُقِيْمُ اَوِ الْمُعْتَمِرُ-এর ব্যাখ্যা : এখানে 'মুকীম' শব্দ দ্বারা সেসব ওমরাকারীকে বুঝানো হয়েছে যারা মক্কার স্থায়ী বাসিন্দা আর মু'তামির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বহিরাগত ওমরাকারীগণ اَوْ এ অব্যয়টি نَوْع বা প্রকার বুঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ স্থানীয় বা বহিরাগত সকল ওমরা আদায়কারী। সকলের জন্য তালবিয়ার বিধান একই, কোনো পার্থক্য নেই।

ওমরাকারীর তালবিয়া কখন বন্ধ হবে? ওমরা আদায়কারীর তালবিয়াহ পাঠ কখন বন্ধ হবে? এতে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে−

ইমাম মালেক (র.)-এর এক মত হলো, মক্কার বাড়িঘর দেখতে গেলে দ্বিতীয় অভিমত হলো। কা'বাঘরের উপরে দৃষ্টি পড়লে সাথে সাথে তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন− একবার তাবেয়ী হযরত আতা (র.)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, ওমরা আদায়কারী যখন হেরেমে প্রবেশ করবে তখনই তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করে দেবে।

ইমাম আবূ হানীফা, আহমদ, শাফেয়ী, ইসহাক ও সুফিয়ান ছাওরী (র.) প্রমুখ বলেন, হাজারে আসওয়াদ চুম্বন বা স্পর্শ করার পর তালবিয়াহ বন্ধ করবে। হযরত ইবনে আব্বাসের এ হাদীসটি এখানে 'মাওকূফ' হিসেবে বর্ণিত হলেও ইমাম তিরমিযী (র.) অপর একটি হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে 'মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে, ওমরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করতেন তখন তালবিয়াহ পাঠ হতে বিরত থাকতেন।

ইমাম মালেক (র.)-এর দলিলের জবাব : ইমাম মালেকের দলিলের জবাবে বলা হয় যে, মারফূ' হাদীসের মোকাবিলায় মাওকূফ হাদীস দলিল হতে পারে না। আর হযরত আতা ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রা.) তাদের উভয়ের হাদীসই বর্ণনা করেছেন। এতদুভয়ের মধ্যে তাঁর কাছে কোনটি পছন্দনীয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীসই আমার নিকট গ্রহণীয়।

হজকারীদের তালবিয়াহ পাঠ কখন সমাপ্ত হবে? হজকারীদের তালবিয়াহ পাঠ কখন সমাপ্ত হবে, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে−

مَذْهَبُ اِمَامِ مَالِكٍ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (رح) : ইমাম মালেক, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব ও হাসান বসরী (র.) প্রমুখের মতে, হজকারীগণ আরাফায় অবস্থান করার সাথে সাথেই তালবিয়াহ বন্ধ করবে। তাঁরা হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। তিনি বলেছেন, আমি আরাফার দিন সন্ধ্যায় রাসূল ﷺ -এর বাহনে তাঁর পিছনে ছিলাম, তখন তিনি তাকবীর ও তাহলীলের বেশি কিছু বলতেন না। -[তাহাবী]। যখন আরাফায় তাকবীর [আল্লাহু আকবার] ও তাহলীল [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] হতে বেশি কিছু বলতেন না− এতে বুঝা যায় যে, তিনি তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করে দিতেন।

مَذْهَبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَصَاحِبَيْنِ وَالشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ (رح) : ইমাম আ'যম, সাহেবাইন, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক, সুফিয়ান ছাওরী, আতা, তাউস ও জমহূর আলেমগণের মতে, জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করা যাবে না। তাঁরা বুখারী (র.) বর্ণিত নিম্নলিখিত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন− হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উসামা (রা.) আরাফাহ হতে মুযদালিফা পর্যন্ত রাসূল ﷺ -এর সওয়ারিতে তাঁর পিছনে ছিলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ মুযদালিফা হতে মিনা প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ফযল ইবনে আব্বাস (রা.)-কে আপন সওয়ারির

পিছনে সওয়ার করালেন। তাঁরা উভয়েই বলেছেন, রাসূল ﷺ জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর মারা পর্যন্ত তালবিয়াহ পাঠ করেছিলেন।

* আবার দ্বিতীয় দল অর্থাৎ জমহূর ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.) প্রমুখের মতে, জামরায় নিক্ষেপ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করা যাবে না। তাঁদের দলিল, ফযল ইবনে আব্বাস (রা.) হতে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মাধ্যমে ইবনে খুযাইমা (রা.) বর্ণনা করেন, ফযল (রা.) বলেছেন– "আমি রাসূল ﷺ -এর সাথে আরাফাহ হতে রওয়ানা করলাম, রাসূল ﷺ জামরাতুল আকাবার কঙ্কর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকলেন এবং প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে সাথে তাকবীর বলছিলেন। আর শেষ কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে সাথে তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করে দিলেন।"

অপরদিকে ইমাম আ'যম, শাফেয়ী ও ছাওরী (র.) প্রমুখের মতে– জামরায় প্রথম কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে সাথেই তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করে দিতে হবে। তাঁরা বায়হাকী বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন। আবূ ওয়ায়েল হযরত আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি [আবদুল্লাহ] বলেছেন– আমি রাসূলে কারীম ﷺ -কে প্রত্যক্ষ করেছি, তিনি জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপণ [আরম্ভ করা] পর্যন্ত তালবিয়াহ পাঠ করেছিলেন।

ইমাম মালেক (র.) প্রমুখের দলিলের জবাব : ইমাম মালেক (র.) প্রমুখ তাঁদের মতের সপক্ষে দলিল হিসেবে রাসূল ﷺ -এর যে হাদীস– "তখন তিনি তাকবীর ও তাহলীলের বেশি কিছু বলতেন না" পেশ করেছেন তার জবাবে বলা হয়েছে যে, এ না-বোধকটি তালবিয়াহ পাঠের উপর আরোপিত হয় না; বরং এর অর্থ তাকবীর ও তাহলীলের বেশি বাড়িয়ে কিছু বলতেন না। এর অর্থ এই নয় যে, রাসূল ﷺ তালবিয়াকে বাড়িয়ে বলতেন না। কেননা, কোনো জিনিসের বর্ধিতকরণ সমজাতীয় জিনিসের উপরেই হয়ে থাকে।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.) যে ইবনে খুযাইমার হাদীসকে দলিল গ্রহণ করেছেন, [অর্থাৎ অতঃপর শেষ কঙ্কর নিক্ষেপণের সাথে সাথে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করলেন] তার জবাবে বলা হয়েছে যে, ইমাম বায়হাকী (র.) বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব। ফযল ইবনে আব্বাসের অপর বর্ণনায় এটা পাওয়া যায় না এবং এটা অন্য কোনো সাহাবী হতে প্রমাণিত হয় না। রাসূল ﷺ কঙ্কর নিক্ষেপ করার সময় তালবিয়াহ পাঠ করেছিলেন সুতরাং সকল সাহাবীর মোকাবিলায় একমাত্র ফযল ইবনে আব্বাসের উপলব্ধিটি দলিল হতে পারে না।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٤٩٩ - يَعْقُوْبَ بْنِ عَاصِمِ ابْنِ عُرْوَةَ (رض) أَنَّهُ سَمِعَ الشَّرِيْدَ يَقُوْلُ أَفَضْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا مَسَّتْ قَدَمَاهُ الْأَرْضَ حَتّٰى أَتٰى جَمْعًا - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

২৪৯৯. অনুবাদ : তাবেয়ী ইয়াকূব ইবনে আসিম ইবনে ওরওয়া হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত শারীদ [ইবনে সুয়াইদ]-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূল ﷺ -এর সাথে [আরাফাহ হতে] রওয়ানা করলাম, রাসূলের পদদ্বয় ভূমি স্পর্শ করল না যতক্ষণ তিনি মুযদালিফায় না পৌঁছলেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَا مَسَّتْ قَدَمَاهُ الْأَرْضَ -এর মর্মার্থ : "তাঁর পদদ্বয় ভূমি স্পর্শ করেনি।" অত্র বাক্যটির মর্মার্থ হলো, রাসূল ﷺ আরাফাত হতে মুযদালিফা পর্যন্ত উষ্ট্রীতে আরোহণ করে সফর করেছেন, পথে কোথাও বিশ্রামের জন্যে অবতরণ করেননি। তবে অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি এক পাহাড়ের পাদদেশে প্রস্রাব করার জন্যে অবতরণ করেছিলেন এবং সেখানে অজুও

করেছিলেন। এর উত্তর এই যে, সম্ভবত তিনি আরাফাহ ত্যাগ করার পূর্বেই তা করেছিলেন। অতঃপর সওয়ারিতে আরোহণ করেছেন এবং পরে আর অবতরণ করেননি। অথবা অবতরণ করলেও তা বিশ্রামের জন্যে ছিল না; বরং তা ছিল মানবীয় প্রয়োজন পূরণ (قَضَاءُ حَاجَاتٍ) -এর নিমিত্তে। আর এটা বর্ণনাকারীর উদ্দেশ্যে বহির্ভূত।

٢٥٠٠ - وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ (رحـ) قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوْسُفَ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ سَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ كَيْفَ نَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ سَالِمٌ إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلٰوةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ صَدَقَ اِنَّهُمْ كَانُوْا يَجْمَعُوْنَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ فَقُلْتُ لِسَالِمٍ اَفَعَلَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَالِمٌ وَهَلْ يَتَّبِعُوْنَ ذٰلِكَ اِلَّا سُنَّتَهُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৫০০. অনুবাদ : তাবেয়ী ইবনে শিহাব যুহরী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে সালিম [ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর] বলেছেন, যে বছর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো, সে [আমার পিতা] আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করল, আরাফার দিনে আমরা অবস্থানগাহে কিরূপে কার্য সম্পাদন করব? তখন [পিতার জবাবের অপেক্ষা না করে] সালিমই বললেন, আপনি যদি সুন্নতের অনুসরণ করতে চান তবে আরাফার দিনে শীঘ্র একত্রকরণ (جَمْعُ تَقْدِيْمٍ) করবেন। তখন [আমার পিতা] আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বললেন, সে [সালিম] সঠিক বলেছে, সুন্নত অনুসারে সাহাবীগণ জোহর ও আসর একত্রে পড়তেন। রাবী ইবনে শিহাব বলেন, আমি সালিমকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল ﷺ কি এটা করেছেন? তখন সালিম বললেন, তারা এ ব্যাপারে রাসূলের সুন্নত ছাড়া অন্য কোনো কিছুর অনুসরণ করতেন না। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইবনে যুবায়ের (রা.) ও হাজ্জাজের মধ্যকার যুদ্ধের ঘটনা : হযরত ইমাম হুসাইন (রা.)-এর শাহাদতের পর হযরত আয়েশা (রা.)-এর ভগ্নি হযরত আসমার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ৬৪ হিজরিতে খেলাফতের দাবি করেন। হিজাজ ও ইরানের লোকেরা তাঁর হাতে বায়'আত করে। ৭৩ হিজরিতে উমাইয়া বংশীয় সিরিয়ার গভর্নর আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে জালিম হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে মক্কার দিকে অভিযানে নিয়োজিত করে। মক্কায় উভয় দলে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। অবশেষে হযরত ইবনে যুবাইর হাজ্জাজের হাতে শহীদ হন। অতঃপর আবদুল মালেক হাজ্জাজকে সেই বৎসর আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করে। সেই সময়েই হাজ্জাজ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-কে আরাফার মাসআলা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আলোচ্য হাদীসে এ ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আরাফায় জোহর-আসর একত্রকরণকে বলা হয় جَمْعُ تَقْدِيْمٍ এবং মুযদালিফায় মাগরিব-ইশা একত্রকরণকে বলা হয় جَمْعُ تَاخِيْرٍ ; কারণ আরাফায় 'আসর'-কে আগে এবং মুযদালিফায় 'মাগরিব'-কে পরে আদায় করা হয়।

بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ
পরিচ্ছেদ : কঙ্কর নিক্ষেপ

বর্ণিত আছে যে, হযরত আদম (আ.) পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হবার পর বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে যখন এ মিনাতে আসলেন তখন শয়তান পুনঃ তাঁকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করল; কিন্তু তিনি তাকে চিনতে পেরে পাথর নিক্ষেপ করে তাড়িয়ে দেন। এমনিভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)ও স্বীয় পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানি করতে এখানে আনয়ন করার পথে ইবলিস এসে তাকে এ কাজ হতে ফিরাতে চেষ্টা করল; কিন্তু তিনি শয়তানকে পাথর নিক্ষেপে তৎক্ষণাৎ তাড়িয়ে দেন।

যে যে স্থানে শয়তানকে পাথর মারা হয়েছিল সে সে স্থানকে চিহ্নিত করার জন্যে পরবর্তীকালে তথায় পাথরের স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে। এক সময় খোলা আকাশের নিচে সেই স্তম্ভগুলো দণ্ডায়মান থাকলেও বর্তমানে তাতে অনেক দূর হতে লম্বা ছাদ বিশিষ্ট শেড্ নির্মাণ করা হয়েছে। এতে একদিকে প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ হতে রক্ষা পাওয়া যায়। অপরদিকে উপরে ছাদ হতে কঙ্কর নিক্ষেপ করা যায়, এতে মানুষের চাপও কম হয়। উক্ত চিহ্নিত স্তম্ভকে বলা হয় 'জামরা'। হজে এসব জাম্‌রায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব।

* জাম্‌রা মোট ৩টি। উলা, উস্‌তা ও আকাবা তথা প্রথম, মধ্যবর্তী ও শেষ জাম্‌রা। আকাবাকে 'জামরায়ে কুব্‌রা'ও বলে। মক্কার দিক হতে প্রথম জামরা মসজিদে খায়েফের কাছে। তারপর উস্‌তা ও পরে আকাবা। সব কয়টি কাছাকাছি। প্রত্যেক হাজীকে মুযদালিফা হতে ন্যূনতম ৪৯ খানা এবং উর্ধ্বে ৭০ খানা কঙ্কর সংগ্রহ করে সাথে নিতে হয়। ১০ তারিখে কেবলমাত্র 'জামরায়ে আকাবা'য় ৭ খানা কঙ্কর নিক্ষেপ করবে এবং ১১ ও ১২ তারিখে তিন জামরার প্রত্যেক জামরায় ৭ খানা করে $৭ \times ৩ \times ২ = ৪২$ খানা কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। যদি ১৩ তারিখেও কঙ্কর মারার ইচ্ছা থাকে তখন তৃতীয় দিনের জন্য ২১ খানা কঙ্কর সাথে আনতে হবে। তবে ১৩ তারিখে কংকর মারা বা না মারার মধ্যে এখতিয়ার আছে। তাই সাধারণত ১২ তারিখ পর্যন্তই রমী করা হয়।

উল্লেখ্য, ১০ তারিখে জামরায়ে আকাবায় যে কঙ্কর মারা হয় এর সময় হলো সূর্যোদয়ের পর হতে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত। আর ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে রমী করতে হয় দ্বিপ্রহরের পরে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٥٠١ جَابِرٍ (رض) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِيْ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُوْلُ لِتَاْخُذُوْا مَنَاسِكَكُمْ فَاِنِّيْ لَا اَدْرِيْ لَعَلِّيْ لَا اَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِيْ هٰذِهٖ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৫০১. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ -কে কুরবানির দিন আপন সওয়ারি থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। আর তিনি বলেছেন– তোমরা হজের বিধিবিধান শিখে নাও। কেননা, আমি জানি না, সম্ভবত আমার এ হজের পরে আমি আর হজ করতে পারব না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সওয়ারি হতে কংকর নিক্ষেপ করা উত্তম নাকি পদব্রজে? সওয়ারিতে থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করা উত্তম নাকি পায়ে হেঁটে করা উত্তম, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে–

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (رح) : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মুযদালিফা হতে যে ব্যক্তি যেভাবে মিনায় পৌঁছেছে, সে সেই অবস্থায়ই রমী করবে। দশম তারিখের রমীতে এটাই উত্তম। কেননা, নবী করীম ﷺ সওয়ারি অবস্থায় সেদিন রমী করেছেন। আর ১১ ও ১২ তারিখে পায়ে হেঁটে আবার ১৩ তারিখে সওয়ারি অবস্থায় রমী করা উত্তম ও রাসূলের অনুসরণ।

مَذْهَبُ اِمَامِ اَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ (رح) : ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.) বলেন, কুরবানির দিন পায়ে হেঁটে নিক্ষেপ করাই উত্তম। ইবনে হুমাম (র.) বলেন, ইবরাহীম ইবনে জারাহ হতে কথিত আছে যে, একদা তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-কে দেখতে যান। তখন তিনি [আবূ ইউসুফ] চোখ খুললেন এবং জিজ্ঞেস করলেন– সওয়ার অবস্থায় কঙ্কর নিক্ষেপ উত্তম নাকি পদব্রজে? তখন তিনি নিজেই বললেন, যে নিক্ষেপণের পরে আর নিক্ষেপণ নেই, তাও সওয়ার অবস্থায়ই উত্তম। আমি তাঁর কাছ থেকে উঠে বাড়ির দরজায় না পৌঁছতেই তাঁর মৃত্যুর কারণে পরিবারের লোকজনের কান্নাকাটি শুনতে পেলাম। এরূপ মুমূর্ষু অবস্থায়ও তাঁর জ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহ দেখে আমি বিস্মিত হলাম।

ফতওয়ায়ে কাযীখানে আছে– ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মাদ (র.) বলেছেন, সকল নিক্ষেপণই [রমী] সওয়ার অবস্থায় উত্তম। কেননা, রাসূল ﷺ সকল রমীই সওয়ার অবস্থায় করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

مَذْهَبُ اَبِيْ يُوْسُفَ (رح) : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) রাসূলের সওয়ার হওয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন যে, এতে তাঁর লোকজনকে দেখাবার ও শিখাবার উদ্দেশ্য ছিল। সওয়ারির উপর থাকাতে সকলেই রাসূলের কার্যাবলি দেখতে পাচ্ছিলেন। 'বাহর' ও 'কানয' এ গ্রন্থকারদ্বয় ইমাম আবূ ইউসুফের মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা, পায়ে হেঁটে নিক্ষেপ করাতে বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করা হয়। সুতরাং পায়ে হেঁটে নিচে থেকে কঙ্কর নিক্ষেপণই উত্তম। এতে অন্যদের কষ্ট হয় না, কারণ তখনকার দিনে অধিকাংশ মুসলমানই পায়ে হেঁটে সকল জায়গায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন। তবে যদি কেউ সওয়ার হয়ে নিক্ষেপ করে তবে তার গুনাহ হবে না।

٢٥٠٢ - وَعَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৫০২. অনুবাদ : উক্ত হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ -কে জামরায় খযফের [অঙ্গুলি স্পর্শে নিক্ষেপ করা যায়] কঙ্করের মতো কঙ্কর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। –[মুসলিম]

٢٥٠٣ - وَعَنْهُ قَالَ رَمٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَاَمَّا بَعْدَ ذٰلِكَ فَاِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫০৩. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ কুরবানির দিন সকালে জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন; কিন্তু পরবর্তী দিনগুলোতে যখন সূর্য ঢলে পড়েছিল তখন নিক্ষেপ করেছিলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "وَبَعْدَ ذٰلِكَ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ" -এর ব্যাখ্যা : ফিকহের কিতাবসমূহেও এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনের রমী সূর্য ঢলে পড়ার পর আদায় করবে। তবে কেউ যদি চতুর্থ দিন অর্থাৎ তেরো তারিখেও রমী করতে চায়, সেও পরে রমী করবে। তবে ইমাম আ'যম (র.) বলেন, তেরো তারিখের রমী দ্বিপ্রহরের পূর্বে সকালে করা বৈধ আছে। সাহেবাইন (র.) বলেন, দুপুরের পূর্বে রমী করা জায়েজ নেই।

যদি কোনো হাজী ১২ তারিখের পর আর রমী করার ইচ্ছা না রাখে তবে তাকে সে দিনের সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনা ত্যাগ করতে হবে। যদি ১২ তারিখ মিনায় থাকা অবস্থায় সূর্য অস্ত যায়, তাহলে ১৩ তারিখ রমী করতে হবে। অন্যথা 'দম' দেওয়া ওয়াজিব হবে। ইবনে হুমাম (র.) বলেন, অত্র হাদীস হতে বুঝা যায়, ১১ ও ১২ তারিখে দ্বিপ্রহরের পূর্বে রমী করার সময়ই হয় না।

وَعَنْ ٢٥٠٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّهُ اِنْتَهٰى اِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهٖ وَمِنٰى عَنْ يَمِيْنِهٖ وَ رَمٰى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَمٰى الَّذِىْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫০৪. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি যখন জামরাতুল কুবরা বা বড় জামরার নিকট পৌঁছলেন, তখন বায়তুল্লাহ শরীফকে বামে মিনাকে তাঁর ডানে রাখলেন এবং সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন আর প্রত্যেক কঙ্করের সাথেই আল্লাহু আকবর বললেন। অতঃপর বললেন, এরূপই কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন সে ব্যক্তি, যার উপর সূরা বাকারা অবতীর্ণ করা হয়েছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

যার উপরে সূরা বাকারা নাজিল করা হয়েছে : পুরো কুরআনই তো এক ব্যক্তি তথা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপরই নাজিল করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এখানে 'সূরা বাকারা'-কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার বৈশিষ্ট্য কি? এর উত্তরে বলা হয় যে, ইবনে মাসউদ এ কথাটি প্রথমে বলেছেন। আর সূরা বাকারায়– وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ আয়াতটি উল্লেখ আছে। আর রমীও সে দিনগুলোতে করা হয়। এ কারণেই সূরা বাকারাকে নির্দিষ্ট করেছেন। অথবা, হজের অধিকাংশ মানসিক ও বিষয়াদি সূরা বাকারায় আলোচনা করা হয়েছে, তাই তার কথা নির্দিষ্ট করেছেন।

قَوْلُهٗ رَمٰى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ **-এর মর্মার্থ :** উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক জামরায় ৭ টুকরা কঙ্কর সাতবারে নিক্ষেপ করতে হবে। যদি সাত টুকরা একবারেই নিক্ষেপ করা হয় তখন এটাকে একটিই গণনা করা হবে। আর প্রত্যেক বার কঙ্কর নিক্ষেপের সময় এ দোয়া পড়ার বিধান রয়েছে– بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، رَجْمًا لِّلشَّيْطَانِ وَ رِضًاءً لِّلرَّحْمٰنِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا وَّ ذَنْبًا مَّغْفُوْرًا আর যদি সবটা পড়া সম্ভব না হয়, তখন শুধু بسم الله الله اكبر বলে নিক্ষেপ করবে।

وَعَنْ ٢٥٠٥ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِسْتِجْمَارُ تَوٌّ وَ رَمْىُ الْجِمَارِ تَوٌّ وَالسَّعْىُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوٌّ وَالطَّوَافُ تَوٌّ وَاِذَا اسْتَجْمَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৫০৫. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– ইস্তিনজার ঢিলা গ্রহণ বেজোড়, [হজে] কঙ্কর নিক্ষেপণ বেজোড়, সাফা-মারওয়ায় সাঈ করা বেজোড়, তওয়াফও বেজোড়। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি সুগন্ধি ধোঁয়া গ্রহণ করে সে যেন বেজোড় বার নেয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَاِذَا اسْتَجْمَرَ اَحَدُكُمْ **-এর ব্যাখ্যা :** এখানে পাঁচটি জিনিসে বেজোড় ব্যবহার করার নির্দেশ রয়েছে। কিছু সংখ্যক আলেম শেষ বাক্য اِسْتَجْمَرَ দ্বারা ঢিলা-কুলুখের অর্থই নিয়েছেন, এটা সঠিক অর্থ নয়। কেননা, প্রথমে যে اَلْاِسْتِجْمَارُ বলা হয়েছে তার অর্থও ঢিলা-কুলুখ। ফলে একই হাদীসে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয়ে যায়। তাই শেষের اِسْتِجْمَارٌ -এর অর্থ হবে– وَضْعُ الْعُوْدِ عَلٰى جَمْرَةِ النَّارِ অর্থাৎ ধূপ, চন্দন ইত্যাদি আগুনের জ্বলন্ত কয়লার উপর রেখে তার ধোঁয়া হতে সুগন্ধি লওয়া। মোটকথা, অত্র হাদীস দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, এখানে উল্লিখিত এবং অপর যে সকল কাজ বেজোড় করা যেতে পারে, কিংবা হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে তা বেজোড় করাই মোস্তাহাব।

উল্লেখ্য যে, অত্র হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন– মলমূত্র ত্যাগের পর বেজোড় ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করা সুন্নত। সংখ্যায় তিন [৩] হওয়া সুন্নত নয়। যদিও কোনো কোনো হাদীসে সংখ্যা তিন [৩] হওয়ায় কথা উল্লেখ আছে। কেননা, প্রয়োজনে পাঁচ, সাতটি ব্যবহার করতে হবে এবং নিষ্প্রয়োজনে একটিই যথেষ্ট।

اَلْفَصْلُ الثَّانِیْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٥٠٦ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ (رضـ) قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلٰى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ لَيْسَ ضَرْبٌ وَلَا طَرْدٌ وَلَيْسَ قِيْلَ اِلَيْكَ اِلَيْكَ - (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

২৫০৬. **অনুবাদ :** হযরত কুদামা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আম্মার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন– আমি নবী করীম ﷺ -কে কুরবানির দিন সাহবা [লাল সাদা মিশ্রিত] রংয়ের উষ্ট্রীর পিঠে আরোহণ করে জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। তথায় না ছিল প্রহার, না ছিল হাঁকানো এবং না বলা হয়েছে 'সরে যাও সরে যাও'।

–[শাফেয়ী, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

صَهْبَاءُ -এর অর্থ : صَهْبَاءُ সাহবা এমন উটকে বলেন যা লাল ও সাদা বর্ণে মিশ্রিত। অবশ্য খায়বরের নিকট একটি জায়গার নামও সাহবা; তবে এখানে নবী করীম ﷺ -এর উষ্ট্রীকে বুঝানো হয়েছে।

وَعَنْ ٢٥٠٧ عَائِشَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ رَمْىُ الْجِمَارِ وَالسَّعْىُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِاِقَامَةِ ذِكْرِ اللّٰهِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

২৫০৭. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) রাসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপণ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈকে আল্লাহর জিকির প্রতিষ্ঠার জন্য শরিয়তে প্রবর্তন করা হয়েছে। –[তিরমিযী ও দারিমী]

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ذِكْرُ اللّٰهِ -এর তাৎপর্য : বাহ্যিক দৃষ্টিতে কঙ্কর মারা ও সাফা-মারওয়ায় দৌড়াদৌড়ি করা ইবাদত বলে মনে না হলেও তাতে আল্লাহর জিকির রয়েছে। কারণ, যার রহস্য বোধগম্য হয় না তাও একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে করাটা কোনো ছোট ইবাদত নয়; উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

আর সব পবিত্র স্থানে হজকারীগণ সদা আল্লাহকে স্মরণ করে থাকেন, কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় কিনা এ জন্যে ভয়ে ভয়ে থাকেন। বিশেষভাবে জিকির শব্দটি এজন্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর দ্বারা বুঝা যায়, সকল ইবাদতের মূল লক্ষ্য আল্লাহকে স্মরণ করা।

* আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এ মিনাতে যখন হযরত আদম (আ.) উপস্থিত হন, তখন শয়তান তাঁর কাছে আসে। তিনি পাথর মারলে সে দ্রুত পলায়ন করে। আরও বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর আদেশ পালনার্থে তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈলকে জবাই করতে মনস্থ করলেন, তখন শয়তান এসে জামরায়ে উলার কাছে তাঁকে ফিরাতে চেষ্টা করে। তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) শয়তানকে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলে শয়তান পালিয়ে যায়। অভিশপ্ত শয়তান অন্যত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করে, তখন তিনি শয়তানকে বিতাড়িত করেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রী বিবি হাজেরাকে ধোঁকা দিতে সচেষ্ট হলে তিনিও কঙ্কর নিক্ষেপ করেন। তিন জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করলে হযরত আদম, ইবরাহীম, ইসমাঈল (আ.) ও হাজেরার অনুসরণ করা হয়ে যায়। তিন দিন তিন জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপণের এটাও অন্যতম কারণ।

এ কঙ্কর নিক্ষেপণের সময় তাঁদের ত্যাগ, আল্লাহর আদেশ পালনের দৃষ্টান্ত, শয়তান ও প্রবৃত্তির ধোঁকাকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর বন্দেগিতে অবিচল থাকার মহান দৃষ্টান্তগুলো হাজীদের মনে উদ্ভাসিত হয়। এ কারণেই বলা যায় যে, এগুলোই আল্লাহর জিকিরকে প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

অনুরূপভাবে সাফা-মারওয়ায় সায়ী। এর পটভূমিও রোমাঞ্চকর। জনমানবশূন্য মরুভূমি দুগ্ধপোষ্য শিশু ও মা হাজেরাকে এক পর্যায়ে নির্বাসনে রেখে সিরিয়া চলে আসতে উদ্যত হন হযরত ইবরাহীম (আ.)। তখন হাজেরা জিজ্ঞাসা করেন এ নির্বাসন কি তাঁর নিজের ইচ্ছায় নাকি আল্লাহর নির্দেশে? হযরত ইবরাহীম (আ.) জবাব দিলেন, আল্লাহর আদেশে। হযরত হাজেরা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিলেন নির্বাসন জীবন। নিঃসংকোচে মাথা পেতে দিলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফয়সালার নিচে। সম্মুখে হাজারো বিপর্যয়, বিপদ আসন্ন, তবুও নিজের জন্য নয়; বরং দুশ্চিন্তায় পড়লেন শিশু ইসমাঈলের জন্যে। কিভাবে বাঁচানো যাবে এই নবজাতককে। সে পানির পিপাসায় কাতর। বর্তমান বায়তুল্লাহ শরীফের এক পার্শ্বে মুক্ত আকাশের নিচে তপ্ত বালি আর কঙ্করের উপর শিশুকে রেখে পানির খোঁজে বের হলেন মা-হাজেরা। নিকেটই দাঁড়িয়ে আছে দু-পাহাড় সাফা ও মারওয়া। একবার সাফায় উঠে দিগন্তের দিকে তাকান কোথাও জন-মানবের তথা পানির নিদর্শন মিলে কিনা? কিন্তু হতাশা হয়ে নেমে আসেন সাফা হতে। এবার দৌড়িয়ে উঠেন মারওয়ায়। এখানের অবস্থাও একই। কিন্তু আশা ছাড়েননি, হতাশ হননি আল্লাহর রহমত হতে। পাগলিনীর মতো সাতবার ছুটাছুটি করলেন পাহাড়দ্বয়ের মাঝে। এতক্ষণে কলিজার টুকরা নবজাত শিশু বেঁচে আছে কিনা ছুটে আসলেন তার কাছে। দেখলেন এক অবাক কাণ্ড। শিশুর পায়ের নিচের বালি-কঙ্কর সিক্ত করে বের হয়ে আসছে পানির ধারা। এবার তিনি সংরক্ষণ করতে লাগলেন পানির প্রবাহ। আর মুখে বলতে থাকলেন 'যম্যম্'। এ প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ বলেছেন– আল্লাহ ইসমাঈলের মায়ের প্রতি অনুগ্রহ করুক। যদি তিনি সেদিন এ পানি আঁটকিয়ে না ফেলতেন তবে তা সারা পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়ে পড়ত। সাফা-মারওয়ায় সায়ী করার সময় একজন হাজীর সম্মুখে ভেসে উঠে মা হাজেরার ত্যাগ ও ধৈর্যের অপূর্ব চিত্র, ঈমানের দৃঢ়তা ও আল্লাহর রহমতের প্রতীক্ষায় অবিচল থাকার এক মহান দৃষ্টান্ত। বস্তুত তারাই আল্লাহর অনুগ্রহ ও পুরস্কার লাভের অধিকারী হয়, যারা অর্জন করতে সক্ষম হয় অনুরূপ ঈমানের দৃঢ়তা।

وَعَنْهَا ٢٥٠٨ قَالَتْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَا نَبْنِيْ لَكَ بِنَاءً يُظِلُّكَ بِمِنًى قَالَ لَا مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

২৫০৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা [সাহাবীগণ] আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার জন্যে মিনায় একটি বাড়ি বানাব না যা সর্বদা আপনাকে ছায়াদান করবে? রাসূল ﷺ বললেন– না! মিনা সে ব্যক্তিরই উট বসানোর জায়গা [তাঁবু স্থাপনের স্থান] যে প্রথম সেখানে পৌঁছবে। –[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মিনায় বাড়ি নির্মাণ করতে নিষেধ করার কারণ : নবী করীম ﷺ -এর জন্যে মিনায় বাড়ি নির্মাণ করতে নিষেধ করার বিভিন্ন কারণ হতে পারে। যথা–

১. বস্তুত ইবাদতের জায়গার কোনো একটি অংশ নিজের জন্যে নির্ধারণ করা ঠিক নয়। তাই হুযূর ﷺ তথায় ঘর বানাতে নিষেধ করেছেন।

২. যদি তিনি তথায় ঘর বানাতেন, তবে তাঁর অনুকরণে আরো অনেকেই ঘর-বাড়ি নির্মাণ করতে থাকবে। তখন তা আর [হজের] মানাসিকের স্থান না হয়ে শহর বা বস্তিতে পরিণত হতো, ফলে বহিরাগত সাধারণ মানুষের জন্যে বিরাট অসুবিধার কারণ হয়ে পড়ত।

৩. ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধ-অভিযানের মাধ্যমে মক্কা জয় করেন। বিজয়ের পর তিনি মিনাসহ সমস্ত হেরেমের জমিনকে মুসলমান জনসাধারণের জন্যে ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। এ কারণেই তিনি তথায় নিজের জন্যে বাড়ি তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٥٠٩ نَافِعٍ (رح) قَالَ اِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ وُقُوْفًا طَوِيْلًا يُكَبِّرُ اللّٰهَ وَيُسَبِّحُهُ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُو اللّٰهَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ . (رَوَاهُ مَالِكٌ)

২৫০৯. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত নাফে' (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) প্রথম দু জামরার নিকট দীর্ঘ সময় অবস্থান করতেন এবং আল্লাহর মহীমা ঘোষণা করতেন, তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতেন ও প্রশংসা করতেন, কিন্তু জামরাতুল আকাবার কাছে অবস্থান করতেন না। –[মালেক]

بَابُ الْهَدْيِ
পরিচ্ছেদ : কুরবানির পশু প্রেরণ

শরিয়তের পরিভাষায় জিলহজ মাসের দশম তারিখে হেরেম এলাকায় কুরবানির জন্যে যে পশু প্রেরণ করা হয় তাকে 'হাদী' বলা হয়। জাহিলিয়া যুগে মুশরিকরাও হজ এবং ওমরা পালন করত এবং মক্কার হেরেম এলাকায় পশু কুরবানি করত। আর যারা মক্কায় হাজির হতে পারত না, তারা নিজেদের পক্ষ হতে পশু পাঠিয়ে দিত। আর এসব পশু পথে যাতে চোর-ডাকাত কর্তৃক লুণ্ঠিত না হয় এজন্যে তারা দুটি চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করে দিত।

১. পশুর কুঁজের এক পার্শ্বে আঘাত করে রক্ত বের করে দিত।

২. এবং গলায় চামড়া বা জুতার মালা পরিয়ে দিত।

পবিত্র ইসলামও এ প্রথাকে বহাল রেখেছে। কেননা, জাতি-ধর্ম-বর্ণ, উঁচু-নিচু, ভালো-মন্দ নির্বিশেষে সকলেই এ চিহ্ন দেখলে হাদীর পশু বলে সমীহ করত। কেউ তার ক্ষতি সাধন বা তাতে আরোহণ করত না। হারিয়ে গেলে ফেরত পাওয়া যেত। পথিমধ্যে অচল হবার পর জবাই করলে ধনীরা তার গোশ্‌ত খেত না। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এ বিষয়ে ইরশাদ হয়েছে—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ . (اَلْمَائِدَةُ - ٢)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনরাজির, সম্মানিত মাসসমূহের, কুরবানির জন্যে পাঠানো পশুসমূহের এবং গলায় মালা পরানো পশুসমূহের অবমাননা করো না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ৬ষ্ঠ হিজরিতে ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কার পথে রওয়ানা হয়েছিলেন। সাথে নিয়ে ছিলেন ৬০টি উট। কিন্তু হুদায়বিয়া হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসলেন। পরবর্তী বৎসর তা কাজা করতে গেলেন, এবার সঙ্গে নিলেন ৭০টি হাদী। নবম হিজরিতে নিজে না গেলেও 'আমীরুল হজ' হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সাথে কুরবানির পশু পাঠিয়েছিলেন। আর দশম হিজরির বিদায় হজে তিনি সর্বমোট একশতটি পশু তথা উট কুরবানি করেছিলেন। আলোচ্য পরিচ্ছেদে اَلْهَدْيُ-এর প্রসঙ্গীয় বিভিন্ন হাদীস আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٥١٠. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلظُّهْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهٖ فَاَشْعَرَهَا فِىْ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْاَيْمَنِ وَسَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهٗ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهٖ عَلَى الْبَيْدَاءِ اَهَلَّ بِالْحَجِّ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৫১০. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যুল-হুলাইফায় জোহরের নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর নিজের হাদীর উট আনলেন এবং তার কুঁজের ডানদিকে ফেঁড়ে দিলেন ও তা হতে নির্গত রক্ত মুছে দিলেন এবং তাতে দুটি জুতার মালা পরিয়ে দিলেন। অতঃপর নিজের বাহনে আরোহণ করলেন। অতঃপর বায়দাতে যখন তাকে নিয়ে বাহন সোজা হয়ে দাঁড়াল, রাসূল ﷺ হজের জন্যে লাব্বাইকা পাঠ করলেন। —[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِشْعَارٌ-এর আভিধানিক অর্থ : اِشْعَارٌ শব্দটি বাবে اِفْعَالٌ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো–اَلْاِعْلَامُ বা জানানো।

اِشْعَارٌ-এর পারিভাষিক অর্থ : মিশকাত শরীফের হাশিয়াতে বলা হয়েছে–

اَلْاِشْعَارُ هُوَ اَنْ يَشُقَّ اَحَدُ سِنَامَي الْبَدَنِ حَتّٰى يَسِيْلَ دَمُهَا .

অর্থাৎ اِشْعَارٌ হলো উটের কুঁজের স্থানে কিছুটা ক্ষত করে রক্ত প্রবাহিত করা, যাতে বুঝা যায় তা কুরবানির পশু এবং অন্যান্য উট থেকে তাকে পৃথক করা যায়। আর তা জবাই করা হলে যাতে গরিবরা তার গোশ্ত খেয়ে উপকৃত হতে পারে।

ইশ'আর সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : ইশ'আরের হুকুম নিয়ে ইমামগণের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো–

১. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, জমহুর ইমামগণের মতে– اَلْاِشْعَارُ سُنَّةٌ অর্থাৎ জমহুর ওলামায়ে কেরামের নিকট ইশ'আর সুন্নত।

দলিল : عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدِيْ ثُمَّ قَلَّدَهَا وَاَشْعَرَهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

তাঁদের দ্বিতীয় দলিল হলো ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত অত্র হাদীস।

২. ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন– اَلْاِشْعَارُ بِدْعَةٌ مَكْرُوْهَةٌ لِاَنَّهُ مُثْلَةٌ وَتَعْذِيْبُ الْحَيَوَانِ অর্থাৎ اِشْعَارٌ হলো বিদআতে মাকরূহ, কেননা তা মুসলার মতো। আর তা দ্বারা জন্তুকে কষ্ট দেওয়া হয়।

দলিল : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ خَطِيْبًا اِلَّا نَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ -

৩. আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন– فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ اَحْسَنَ অর্থাৎ যারা ইশ'আর সুন্দরভাবে করতে পারে তাদের জন্যে মোস্তাহাব।

তবে ইমাম তাহাবী ও শেখ আবূ মানসূর মাতুরিদী (র.) বলেছেন যে, ইমাম আ'যম (র.) স্বয়ং ইশ'আর কার্যটির এবং তা সুন্নত হওয়ার বিরোধী নন। এ ব্যাপারে প্রকাশ্য হাদীস রয়েছে। অতএব তিনি একে অস্বীকার করতে পারেন না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ইমাম আ'যমের যুগের লোকেরা ইশ'আরে বাড়াবাড়ি করত। এত বেশি ক্ষত করে ফেলত যে, হিজাজে প্রচণ্ড গরমে উট মরে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিত। এজন্যে তিনি ঐসব সাধারণ লোকের জন্যে মাকরূহ হওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন যারা ইশ'আরের সীমা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। তবে যারা ইশ'আরের সীমা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল অর্থাৎ যারা শুধু চামড়া কাটত; মাংস কাটত না, তিনি তাদের জন্যে ইশ'আর করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেননি। ইমাম কারমানী (র.)ও এ অভিমতই সমর্থন করেছেন। ইবনে হুমাম (র.) বলেছেন, যারা ইশ'আর উত্তমভাবে করে তাদের জন্যে এটা মোস্তাহাব।

যারা ঢালাওভাবে ইশ'আর করাকে সুন্নত বলার পক্ষপাতি তাদের জবাবে ইমাম তুরপুশতী (র.) বলেছেন, রাসূল ﷺ যে হাদীর পশু নিয়েছিলেন তার সংখ্যা ছিল ছত্রিশ অথবা সাঁইত্রিশটি। তন্মধ্যে শুধু একটিকেই ইশ'আর করেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে। এখন মুজতাহিদ মাত্রই অনুভব করতে পারেন যে, রাসূল ﷺ শুধু একটি পশুকেই ইশ'আর করে অন্যগুলোকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এর কারণ এই ছিল যে, তিনি ইশ'আর না করাকেই ভালো মনে করেছিলেন। শুধু প্রয়োজনের তাগিদে ন্যূনতম সংখ্যা একটিতে ইশ'আর করে পশুর পূর্ণ পালটিকে হাদীর পশু বলে চিহ্নিত করেছেন। আর বিশেষভাবে এ ইশ'আর পরিত্যাগ-প্রবণতা রাসূল ﷺ -এর জীবনের শেষ কার্যগুলোর অন্যতম। আর ইশ'আর করাতে বুদনার কষ্ট হয়ে থাকে। অথচ অন্যান্য কওলী হাদীসে রাসূল ﷺ পশুকে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন।

সুতরাং ইশ'আরের কার্যক্রমে সুন্নত হওয়ার নিয়ম-কানুন অনুসৃত হবে না।

وَعَنْ ٢٥١١ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ اَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً اِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫১১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে একপাল ছাগল-ভেড়া হাদীরূপে পাঠালেন এবং এগুলোর গলায় জুতার মালা পরিয়ে দিলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কালাদাহ-এর পরিচয় ও এ সম্পর্কে মতভেদ : তাকলীদ (تَقْلِيْد) অর্থ– গলায় রশি ঝুলানো। যেমন– কোনো ইমামের তাকলীদ করা মানে তার এমনভাবে অনুসরণ করা যেন গলায় দড়ি লাগানো হয়েছে। এখানে এর অর্থ হলো, কুরবানির জন্যে যে পশু প্রেরণ করা হয়, তাকে চিহ্নিত করার জন্যে তার গলায় জুতা কিংবা চামড়া ইত্যাদির মালা পরিয়ে দেওয়া।

ইমামগণের মতভেদ : ইমাম শাফেয়ী, ইসহাক ও আহমদ (র.) প্রমুখ বলেন, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা এ জাতীয় ছোট ছোট পশুর গলায় কালাদাহ পরানো সুন্নত। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত অত্র হাদীসই তার প্রমাণ।

ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র.) বলেন, এগুলোর গলায় কিছুই পরানো উচিত নয়। আর এটা সুন্নতও নয়। কেননা, হুযূর ﷺ একবারই তো হজ করেছেন তথা 'বিদায় হজ'। অথচ তখন তিনি ছাগল-ভেড়া সঙ্গে আনেননি। সুতরাং এ সকল প্রাণীতে কালাদাহ পরানোর বর্ণনাটি প্রমাণিত নয়। সুতরাং হানাফী মাযহাব মতে যে সকল জানোয়ার বুদনাতে পরিণত হয়, তাতে কালাদাহ পরানো হবে। অথচ ছাগল-ভেড়া ইত্যাদি বুদনার অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রকাশ থাকে যে, যে পশুতে সাতভাগ কুরবানি করা যায় তাকে 'বুদনা' বলা হয়। এছাড়া ইমাম শাফেয়ীর পেশকৃত হাদীস মা'রূফ নয় বলে তা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

কালাদাহ কি জিনিসের হবে : কালাদাহ কি জিনিসের হবে, এ বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, কালাদাহ অবশ্যই চামড়ার জিনিস হতে হবে। তাঁর মতের সমর্থনে বিভিন্ন হাদীস রয়েছে। হানাফীদের মতে, কালাদাহ চামড়ার হওয়া শর্ত নয়। তবে গাছের বাকল বা ঐ জাতীয় জিনিস দিয়ে কালাদাহ বানালেও জায়েজ হবে। কেননা, এগুলো দ্বারাও কালাদাহর উদ্দেশ্য সফল হয়।

وَعَنْ ٢٥١٢ جَابِرٍ (رض) قَالَ ذَبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৫১২. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানির দিন [মিনায়] হযরত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষ হতে একটি গরু জবাই করেছিলেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হযরত আয়েশার পক্ষ হতে এ কুরবানি ছিল 'দমে শোকর'। অর্থাৎ তিনি মদিনা হতে ওমরার ইহরাম বেঁধে আসার পথেই ঋতুমতী হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি ওমরার ইহরাম ভঙ্গ করেননি; বরং "ওমরা হজের মধ্যে প্রবেশ করেছে"– হুযূর ﷺ -এর এ ঘোষণা অনুযায়ী হযরত আয়েশা ওমরাকে হজের সাথে একত্র করে উক্ত হজকে 'হজ্জে কিরানে' পরিণত করে নিজেই কারিন হজ আদায়কারিণীতে পরিণত হয়েছিলেন। অতএব, হজ সম্পন্ন হওয়ার পর নবী করীম ﷺ তাঁর পক্ষ হতে একটি কুরবানি দিয়েছেন। কারিন হাজীর এ অতিরিক্ত কুরবানিকে বলা হয় 'দমে শোকর'।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, এটা ছিল 'দমে জিনায়েত'। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর বিবিদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.) ছাড়া সকলেই ছিলেন 'তামাত্তু হজ' আদায়কারিণী। হযরত আয়েশা (রা.) ঋতুমতী হওয়ায় ওমরার ইহরাম ভঙ্গ করে ইফরাদ হজের নিয়ত করে মুফরিদ হজ আদায়কারিণীতে পরিণত হয়েছিলেন। হজ সম্পন্ন করার পর তিনি স্বীয় ভ্রাতা আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকরের সহায়তায় সেই পরিত্যক্ত ওমরাটি কাজা করেছেন। ফলে ওমরা ত্যাগ করার কারণে যে ত্রুটি হয়েছিল তা পূরণার্থে নবী করীম ﷺ পৃথকভাবে তাঁর পক্ষ হতে একটি গরু কুরবানি দিয়েছেন। সুতরাং অন্যান্য বিবিদের কুরবানি আর হযরত আয়েশার কুরবানি একই ধরনের ছিল না। মূলকথা প্রত্যেক কারিন হাজীকে ন্যূনতম দুটি কুরবানি এবং মুফরিদ হাজীকে একটি কুরবানি দিতে হয়। আর 'দমে জিনায়েত' হচ্ছে নির্ধারিত কুরবানির অতিরিক্ত।

وَعَنْهُ ٢٥١٣ قَالَ نَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً فِيْ حَجَّتِهِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৫১৩. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নিজ হজে তার বিবিদের পক্ষ হতে একটি গরু কুরবানি করেছিলেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

نَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً -এর ব্যাখ্যা : এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, একটি গরু সাতজনের পক্ষ হতে কুরবানি করা যায়, আর রাসূল ﷺ -এর বিবি ছিলেন নয়জন। সুতরাং একটি গরু সকলের পক্ষ হতে কুরবানি করা কিভাবে বৈধ হলো? হাদীসশাস্ত্রবিদগণ উক্ত প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর প্রদান করেছেন। যথা–

১. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এখানে কুরবানি করা দ্বারা কুরবানির অনুমতি চাওয়া উদ্দেশ্য। কেননা, অপরের পক্ষ হতে কুরবানি করা তার অনুমতি ব্যতিরেকে বৈধ নয়।
২. কারো মতে, এটা ছিল নফল কুরবানি। যেমন অন্য হাদীসে আছে, নবী করীম ﷺ সমস্ত উম্মতের পক্ষ হতে একটি পশু কুরবানি করেছেন। উপরিউক্ত হাদীসে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, এটা ছিল নফল কুরবানি। কেননা, মুসাফিরের উপর কুরবানি ওয়াজিব নয়। অথচ রাসূল ﷺ তখন মুসাফির অবস্থায় ছিলেন।
৩. আল্লামা যুরকানী (র.) বলেছেন, এখানে بَقَرَةً শব্দ দ্বারা গরু জাতিকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ উট, ছাগল, ভেড়া এর কোনো জাতি হতে জবাই করেননি; বরং শুধু গরু জাতি হতে জবাই করেছেন। সুতরাং এখানে একটি গরু জবাই করা অর্থ নয়।

অন্যের পক্ষ হতে কুরবানি : অপরের পক্ষ থেকে কুরবানি করতে হলে তার জন্যে অনুমতি নিতে হবে; নতুবা কুরবানি জায়েজ হবে না। নবী করীম ﷺ স্ত্রীদের পক্ষ হতে নফল কুরবানি করেছিলেন, তাই অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। অথবা নবী করীম ﷺ পূর্বেই অনুমতি নিয়েছিলেন।

وَعَنْ ٢٥١٤ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدِيْ ثُمَّ قَلَّدَهَا وَاَشْعَرَهَا وَاَهْدَاهَا فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ اُحِلَّ لَهٗ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫১৪. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দু-হাতে আমি নবী করীম ﷺ-এর বুদনার মালা তৈরি করেছি। অতঃপর তিনি তা ওদের গলায় পরিয়েছেন, এতে ইশ'আর করেছেন এবং হাদীরূপে [বায়তুল্লায়] পাঠিয়েছেন। এতে তার উপরে কোনো কিছু হারাম হয়নি, যা তাঁর জন্যে হালাল করা হয়েছিল। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কুরবানির জন্তু পাঠানোর পর মুহরিম হওয়া সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : কুরবানির জন্তু মক্কায় পাঠানোর পর কোনো ব্যক্তি মুহরিম হবে কিনা, এ সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

مَذْهَبُ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ وَعَطَاءٍ وَابْنِ سِيْرِيْنَ (رحـ) وَغَيْرِهِمْ : ইবরাহীম নাখয়ী, আতা, ইবনে সীরীন, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, ওমর ও আলী (রা.) প্রমুখের মতে যদি কোনো ব্যক্তি কুরবানির জন্তু মক্কায় পাঠিয়ে দিয়ে নিজে বাড়িতে অবস্থান করে, তবে তার উপর ঐ সমস্ত জিনিস বা কাজকর্ম হারাম হয়ে যাবে, যা একজন মুহরিমের জন্যে হারাম। অর্থাৎ কুরবানির জন্তু প্রেরণের কারণে সে মুহরিম হয়ে যাবে।

مَذْهَبُ اَئِمَّةٍ اَرْبَعَةٍ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম চতুষ্টয়, মিশরের সমস্ত ফকীহ, ইবনে মাসউদ, আয়েশা, আনাস, ইবনে যুবায়ের (রা.) প্রমুখ সাহাবী ও বহুসংখ্যক তাবিয়ীর মতে শুধু কুরবানির জন্তু প্রেরণের দরুন কোনো ব্যক্তি মুহরিম হয় না; বরং সে পূর্ববৎ হালাল থেকে যাবে।

তাঁরা নিজেদের মতের পক্ষে নিম্নোক্ত দলিল উপস্থাপন করেন–
ক. হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত উপরিউক্ত হাদীস।
খ. হযরত আয়েশা (রা.) হতে অপর একটি বর্ণনা রয়েছে–

قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَهْدِيْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَاَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهٖ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ . (مُسْلِمٌ)

প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব : প্রথমোক্ত মতের অনুসারীদের উত্তরে বলা হয় যে, সহীহ হাদীসের মোকাবিলায় কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়।

وَعَنْهَا ٢٥١٥ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِيْ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِيْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫১৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার কাছে থাকা তুলা দ্বারা হাদীর মালা বানিয়েছি অতঃপর রাসূল ﷺ তা আমার পিতার সাথে [মক্কায়] পাঠিয়েছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এখানে পরপর বর্ণিত এ হাদীস দুটির ঘটনা একই। সুতরাং এটাই বুঝতে হবে যে, 'ইশ'আর' অর্থাৎ কুঁজের পার্শ্বে চিরার ঘটনাটি ৯ম হিজরির, যা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সাথে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু দশম হিজরির বিদায় হজে তিনি 'ইশ'আর' করেছেন বলে পরিষ্কার ভাষায় কোথাও উল্লেখ নেই। তখন শুধু 'কালাদাহ' পরিয়েছেন। এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, 'ইশ'আর' করা মাকরূহ। কেবল মালা পরিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট।

হাদী প্রেরণকারী মুহরিম হয় কিনা, এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ : ইবনুল মুনযির (র.) বলেছেন, ইবরাহীম নাখয়ী, আতা, ইবনে সীরীন (র.) এবং ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, ওমর ও আলী (রা.)-এর মতে, যদি কোনো ব্যক্তি মক্কায় হাদীর পশু প্রেরণ করে নিজে সাথে না যায় এবং নিজের বাড়িতেই মুকীম থাকে, তবে তার উপর ঐ সমস্ত জিনিস হারাম হয়ে যায়, যা একজন মুহরিমের জন্য হারাম। কেননা, যে ব্যক্তি নিজে হাদীর পশু নিয়ে যায় তার উপর যেমনি হারাম হয় তেমনি প্রেরণকারীর উপরেও হারাম হবে।

مَذْهَبُ اَئِمَّةِ اَرْبَعَة : চার ইমাম, মিশরের সকল ফিকহবিদ, ইবনে মাসঊদ, আয়েশা, আনাস, ইবনে যুবাইর (রা.) প্রমুখ এবং অন্যান্য সাহাবী ও তাবেঈনের মতে, এ হাদী প্রেরণের কারণে প্রেরণকারী মুহরিম হবে না; বরং সে হালালই থাকবে। যেমন–

১. হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ -এর কুরবানির পশুর মালা আমি আমার নিজ হাতে তৈরি করেছি, অতঃপর তিনি তা তাদের গলায় পরিয়েছেন এবং তাদের কুঁজ চিরে দিয়েছেন, তৎপর তাদেরকে হাদীরূপে পাঠিয়েছেন; কিন্তু তাতে তাঁর উপরে কোনো জিনিস হারাম হয়নি; যা তাঁর জন্যে পূর্বে হালাল ছিল। –[বুখারী ও মুসলিম]

২. হযরত আয়েশা (রা.)-এর অপর হাদীসে আছে। তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ মদিনা হতে [মক্কার দিকে] হাদী প্রেরণ করতেন তখন আমি তাঁর হাদীর মালা তৈরি করতাম। তারপর মুহরিমগণ যে সমস্ত জিনিস পরিহার করেন তিনি তা পরিহার করতেন না।

প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব : চার ইমাম প্রমুখের পক্ষ হতে প্রথমোক্তদের জবাবে বলা হয়েছে যে, এ ধরনের বহু সহীহ ও সুস্পষ্ট হাদীসের মোকাবিলায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখের অনুমান নির্ভরযোগ্য হবে না। সম্ভবত তিনিও মত পরিবর্তন করে থাকবেন।

وَعَنْ ٢٥١٦ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلًا يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِى الثَّانِيَةِ اَوِ الثَّالِثَةِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫১৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন একটি হাদীর উষ্ট্রী চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এতে রাসূল ﷺ বললেন, তাতে চড়ে যাও। তখন লোকটি বলল, এটি তো বুদনা [হাদী]। রাসূল ﷺ বললেন, তাতে সওয়ার হও। এবারও লোকটি বলল, এটি যে বুদনা। রাসূল ﷺ দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারে বললেন, আরে হতভাগা সওয়ার হও। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বুদনার পিঠে সওয়ার হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ : 'বুদনা' তথা হাদীর পিঠে সওয়ার হওয়া সম্পর্কে ইমামগণের নিম্নোক্ত মতভেদ রয়েছে–

مَذْهَبُ اِمَامِ اَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ وَعُرْوَةَ (رح) : ইমাম আহমদ, ইসহাক, ওরওয়া ইবনে যুবাইর ও আহলে জাওয়াহেরদের মতে, যে কোনো হাদী, চাই তা ওয়াজিব হাদী হোক কিংবা নফল, যে কোনো অবস্থাতে প্রয়োজনে বা বিনা প্রয়োজনে সওয়ার হওয়া জায়েজ আছে। আলোচ্য হাদীসই তাঁদের দলিল। একদা হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনিও এ সম্পর্কে বললেন– হাদীতে সওয়ার হওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই। তিনি বলেছেন– একদা নবী করীম ﷺ একদল পথযাত্রী লোকদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন– তাদের সাথে হাদী ছিল। অথচ তাদের কেউই তাতে সওয়ার হয়নি। তখন নবী করীম ﷺ তাদেরকে তাতে চড়বার জন্যে আদেশ করেছেন।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِىْ وَمَالِكٍ (رح) : ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী ও মালেকসহ অধিকাংশ ফকীহদের মতে, বিনা প্রয়োজনে হাদীতে সওয়ার হওয়া মাকরূহ। কিন্তু যদি সে পথিমধ্যে ঠেকে পড়ে, অন্যকোনো সওয়ারিও নেই, তখন তাতে সওয়ার হওয়া জায়েজ আছে। তাঁরা বলেন– হাদী হলো সম্মানিত, তাতে সওয়ার হওয়া কিংবা মাল-সামান বহন করা, অনুরূপভাবে যে গরু-মহিষ কুরবানির জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যায় তাতেও সওয়ার হওয়া, মাল বহন করা কিংবা হাল গাড়ি ইত্যাদি টানার কাজে ব্যবাহার করা সম্মানের বিপরীত। তবে হ্যাঁ একান্ত ঠেকায় পড়লে তখন এসব কাজ জায়েজ আছে।

প্রথমোক্ত ইমামগণের দলিলের জবাবে বলা হয় যে, হাদীর মালিকের কাছে তার অবস্থা জানতে না চাইলেও তিনি লোকটির অবস্থা দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, লোকটি একেবারে সমস্যায় পড়েছে। তবুও সে তাতে সওয়ার হচ্ছে না। তাই রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি তাতে সওয়ার হয়ে যাও।

২৫১৭ وَعَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ سُئِلَ عَنْ رُكُوْبِ الْهَدْيِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِرْكَبْهَا بِالْمَعْرُوْفِ اِذَا اُلْجِئْتَ اِلَيْهَا حَتّٰى تَجِدَ ظَهْرًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৫১৭. অনুবাদ : তাবেয়ী আবূ যুবাইর (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)-কে হাদীর পশুতে সওয়ার হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়ার কথা শুনেছি। তখন তিনি বলেছেন– আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি "তাতে ন্যায়সঙ্গতভাবে সওয়ার হও, যখন তুমি তার প্রতি ঠেকে পড়, যতক্ষণ না অন্য সওয়ারি পাও।" –[মুসলিম]

২৫১৮ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِتَّةَ عَشَرَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ وَاَمَّرَهُ فِيْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَصْنَعُ بِمَا اُبْدِعَ عَلَىَّ مِنْهَا قَالَ اِنْحَرْهَا ثُمَّ اصْبَغْ نَعْلَيْهَا فِىْ دَمِهَا ثُمَّ اجْعَلْهَا عَلٰى صَفْحَتِهَا وَلَا تَاْكُلْ مِنْهَا اَنْتَ وَلَا اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ رُفْقَتِكَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৫১৮. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির সাথে ষোলোটি হাদীর উষ্ট্রী [মক্কায়] পাঠালেন এবং তাকে সেগুলোর তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব দিলেন। লোকটি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি তার কোনো একটি উষ্ট্রী পথ চলতে অপারগ হয় তবে কি করব? উত্তরে তিনি বললেন, তাকে জবাই করবে, অতঃপর তার মালার পাদুকাদ্বয় রক্তে রঞ্জিত করবে, অতঃপর তার কুঁজের একপার্শ্বে রাখবে, আর তুমি ও তোমার সাথিদের কেউ তা হতে খাবে না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বুদনার উষ্ট্রী পথে মারা যাওয়ার উপক্রম হলে কি করা হবে? :

مَذْهَبُ الْأَحْنَافِ وَمَالِكٍ وَجُمْهُوْرِ اَئِمَّةٍ (رح) : হানাফী, মালেক ও জমহুরের মতে, যদি বুদনা পথিমধ্যে মারা যাওয়ার উপক্রম হয় আর যদি তার কুঁজ ফাড়া হয়, তবে তাকে জবাই করে তার নাল [পাদুকা] তার রক্তে রঞ্জিত করে তার একটিকে কুঁজের এক পার্শ্বে লাগিয়ে দেবে, যাতে তাকে হাদীর জন্তু বলে বুঝা যায়। হাদীর মালিক নিজে তার গোশ্‌ত খাবে না এবং অপর কোনো ধনী লোকও খাবে না। তারা আলোচ্য হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসই দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন। নফল হাদীর মালিকের পক্ষে তার পরিবর্তে আরেকটি হাদী দেওয়া আবশ্যক হবে না। কেননা, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে এ জন্তুটিকেই কুরবানি [আল্লাহর উদ্দেশ্যে ত্যাগ] করা হয়েছে, আর তা বিনষ্ট হয়ে গেছে।

আর যদি ওয়াজিব হাদী পথে বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হয় এবং তাকে জবাই করা হয় তবে হানাফী, মালেকী ও জমহূর ইমামের মতে তা হতে তার মালিক ও অন্যান্য বিত্তশালী ব্যক্তিগণও খেতে পারবে। কেননা, যখন তা হাদীর মালিকের উপর ওয়াজিব হয়েছিল, তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সুতরাং পশুবিশেষকে আর নির্দিষ্টকরণ রইল না। যেহেতু এর পরিবর্তে তাকে আরেকটি দিতে হবে, সেহেতু এ জন্তুটিরও সে তার অন্যান্য মালের মতোই মালিক রয়ে গেল।

وَعَنْ ٢٥١٩ جَابِرٍ (رض) قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৫১৯. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর সাতজনের পক্ষ হতে একটি বুদনা [উষ্ট্রী] এবং সাতজনের পক্ষ হতে একটি গরু জবাই করেছি। -[মুসলিম]

وَعَنْ ٢٥٢٠ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّهُ اَتٰى عَلٰى رَجُلٍ قَدْ اَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫২০. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একবার তিনি এক ব্যক্তির নিকট আসলেন। যে তার বুদনাকে নহর করার জন্যে বসিয়েছে। তখন তিনি বললেন, তাকে দাঁড় করাও এবং পা বেঁধে নহর কর। এটাই মুহাম্মাদ ﷺ -এর সুন্নত। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নহর ও জবাইয়ের মধ্যে পার্থক্য : উটের বাম পা বেঁধে দাঁড়ানো অবস্থায় তার বুকে ছুরি বসিয়ে দেওয়াকে নহর বলা হয়। উট হালাল করার জন্যে এটাই সুন্নত। আর ছাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদির বাম পাঁজরের উপরে কিবলামুখী শুইয়ে গলায় ছুরি চালিয়ে হালাল করাকে জবাই বলে। এসব পশু জবাই করাই সুন্নত।

وَعَنْ ٢٥٢١ عَلِيٍّ (رض) قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَقُوْمَ عَلٰى بُدْنِهٖ وَاَنْ اَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُوْدِهَا وَاَجِلَّتِهَا وَاَنْ لَا اُعْطِىَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيْهِ مِنْ عِنْدِنَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫২১. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর বুদনার দেখাশুনা করতে, তার গোশ্‌ত, চামড়া এবং ঝুল [গরিবদেরকে] দান করতে আদেশ করেছেন এবং তা হতে সবাইকে কিছু না দিতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা তাকে [কসাইকে] আমাদের পক্ষ হতে দেব। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

جُلّ-এর পরিচয় : হাদীসের শব্দ أَجِلَّةٌ হচ্ছে جُلّ -এর বহুবচন; جُلّ [জুল] হলো উটের গায়ের কাপড় বা তার পিঠের উপরের গদী, যাতে আরোহণকারী বসে। মোটকথা, কুরবানির পশুর সাথে যা কিছু আছে, সবকিছু সদকা করে দিতে হয়। আর বিক্রয় করলেও তার মূল্য সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। আমাদের সমাজে সাধারণত কুরবানির চামড়া বিক্রয় করা হয়। সুতরাং এর মূল্য ফকির, মিসকিনকে সদকা করে দিতে হবে।

وَعَنْ ٢٥٢٢ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ كُنَّا لَا نَاْكُلُ مِنْ لُحُوْمِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلٰثٍ فَرَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا فَاَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫২২. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমাদের কুরবানির উটের গোশ্‌ত তিন দিনের বেশি খেতাম না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ [এ ব্যাপারে] আমাদের অনুমতি দিলেন এবং বললেন, তোমরা [যতদিন ইচ্ছা] খাও এবং সঞ্চয় করে রাখ। সুতরাং আমরা খেলাম এবং ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় করে রাখলাম। −[বুখারী ও মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

عَنْ ٢٥٢٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَهْدٰى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِيْ هَدَايَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَمَلًا كَانَ لِاَبِيْ جَهْلٍ فِيْ رَأْسِهٖ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ مِنْ ذَهَبٍ يَغِيْظُ بِذٰلِكَ الْمُشْرِكِيْنَ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ)

২৫২৩. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী কারীম ﷺ হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর মক্কায় কুরবানির পশু পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কুরবানির পশুসমূহের মধ্যে আবূ জাহিলের একটি উটও ছিল। তার নাকে রুপার নথ বা বলয় ছিল। অপর বর্ণনায় আছে, সোনার বলয় ছিল। এটি দ্বারা রাসূল ﷺ মুশরিকদের মনে ক্ষোভের উদ্রেক করতে চেয়েছিলেন। −[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় হিজরিতে বদর যুদ্ধে কুরাইশ নেতা আবূ জাহল মুসলমানদের হাতে নিহত হলে মুসলমানরা এই উটটি গনিমত হিসেবে লাভ করে এবং তা রাসূল ﷺ -এর ভাগে পড়ে।

وَعَنْ ٢٥٢٤ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ (رضـ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ قَالَ انْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِيْ دَمِهَا ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا فَيَاْكُلُوْنَهَا - (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ نَاجِيَةَ الْاَسْلَمِيِّ)

২৫২৪. অনুবাদ : হযরত নাজিয়া খুযাঈ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে কুরবানির উট পথে অচল হয়ে পড়বে তার কি করব? তিনি বললেন, তাকে নহর করে ফেলবে, অতঃপর তার নাল [জুতা] তার রক্তে ডুবিয়ে [তার পার্শ্বের উপর রেখে] দেবে। অতঃপর তাকে মানুষের মাঝে রেখে যাবে। [গরীব] লোকেরা তাকে খেয়ে নেবে। −[মালেক, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ]

আবূ দাউদ ও দারিমী (র.) নাজিয়া আসলামী হতে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

৬ষ্ঠ হিজরিতে নবী করীম ﷺ যখন ওমরার নিয়তে মক্কা যাবার ইচ্ছা করেছিলেন, তখন এ ব্যক্তিকে নিজের কয়েকটি কুরবানির পশু দিয়ে পূর্বেই রওয়ানা করে দিয়েছিলেন। এ হাদীস হতে বুঝা যায় যে, পথে নহর করা উট অন্যান্য মৃত জানোয়ারের মতো লোকালয়ের বাইরে কিংবা মরুভূমিতে ফেলে দেওয়া বা মাটিতে পুঁতে ফেলা উচিত নয়। কেননা, নহরকৃত পশুর গোশ্‌ত খাওয়া হালাল। কাজেই একে এমন স্থানে ফেলে যাওয়া উচিত, যেখানে লোকেরা দেখতে পাবে এবং হাদীর জানোয়ার বুঝতে পেরে তার গোশ্‌ত খাবে। মোটকথা, হালাল জিনিস নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়।

وَعَنْ ٢٥٢٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُرْطٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَعْظَمَ الْاَيَّامِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ قَالَ ثَوْرٌ وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِىْ قَالَ وَقُرِّبَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَدَنَاتٌ خَمْسٌ اَوْ سِتٌّ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ اِلَيْهِ بِاَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ قَالَ فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا قَالَ فَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيَّةٍ لَمْ اَفْهَمْهَا فَقُلْتُ مَا قَالَ قَالَ قَالَ مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَ ذُكِرَ حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ فِىْ بَابِ الْاُضْحِيَّةِ)

২৫২৫. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কুর্‌ত (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন— নিশ্চয়, মহান দিনসমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট কুরবানির দিনই একটি মহান দিন। অতঃপর 'কার্‌র'-এর দিন। ছাওর বলেন, তা কুরবানির দ্বিতীয় দিন। রাবী আবদুল্লাহ বলেন, [ঐ দিন] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট পাঁচটি অথবা ছয়টি উট আনা হলো। আর উটগুলো নিজেদেরকে রাসূল ﷺ -এর নিকট এ মর্মে পেশ করতে লাগল যে, রাসূল ﷺ কোনটিকে আগে কুরবানি করবেন। রাবী বলেন, যখন উটের পাঁজর জমিনে লুটিয়ে পড়ল, তখন রাসূল ﷺ নিম্নস্বরে একটা কথা বললেন যা আমি বুঝতে পারলাম না। [একজনকে] জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি বললেন? সে বলল, তিনি বলেছেন, যার ইচ্ছা একে কেটে নিতে পারে। —[আবূ দাঊদ]

এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস ও জাবের (রা.) বর্ণিত দুটি হাদীস বাবুল উযহিয়া বা কুরবানির পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কুরবানির পশুগুলো স্বেচ্ছায় কুরবানি হতে প্রতিযোগিতা করছিল। এটা ছিল নবী করীম ﷺ -এর আরেকটি অন্যতম মু'জিযা। কুরবানির পশুগুলো নির্বোধ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর নবীর পবিত্র হাতে নিজের জান উৎসর্গ করে ধন্য হতে আকাঙ্ক্ষী ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তাই উটগুলো নিজেদেরকে আল্লাহর নবীর কাছে প্রতিযোগিতা করে পেশ করতে লাগল। প্রত্যেক উট চেয়েছিল, আমি আগে কুরবান হই। বর্তমানেও রাসূলের সুন্নত অক্ষুণ্ন রয়েছে। মিনার কুরবানগাহে দেখা যায়, গরু, ছাগল, দুম্বা ইত্যাদিকে কুরবানি করার সময় এক দুজন লোক একে স্বাভাবিকভাবে শোয়ায়ে জবাই করতেও বেগ পেতে হয় না; খুব সহজেই জবাই করা যায়। দুম্বা-ছাগল তো একজনেই যথেষ্ট।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٥٢٦ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ضَحّٰى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِيْ بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِىَ قَالَ كُلُوْا وَاَطْعِمُوْا وَادَّخِرُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جُهْدٌ فَاَرَدْتُّ اَنْ تُعِيْنُوْا فِيْهِمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫২৬. অনুবাদ : হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানি করে, তৃতীয় দিন অতিবাহিত হওয়ার পরের ভোরেও যেন তার ঘরে তার [কুরবানির গোশ্‌তের] কিছু না থাকে। এরপর যখন পরবর্তী বছর আসল সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমরা গত বছর যেভাবে করেছি এ বছরও কি সেভাবে করব? রাসূল ﷺ বললেন, [না।] নিজেরা খাও, অন্যকে খাওয়াও এবং [ইচ্ছা করলে] সঞ্চয় করে রেখ। কেননা, ঐ বছর লোক [অভাব-অনটনে] কষ্টের মধ্যে ছিল। আর আমি চেয়েছিলাম যে, তোমরা তাদের সাহায্য করবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কুরবানির গোশ্‌ত তিন দিনের বেশি রাখার হুকুম : প্রথম সময়ে কুরবানির গোশ্‌ত তিন দিনের বেশি রাখা নিষেধ ছিল। এখানে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর জবাব অত্র হাদীসে স্পষ্টভাবে কারণসহ বর্ণিত হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, অত্র হাদীস পূর্বোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা স্বরূপ। অর্থাৎ অভাবের দিনে গরিব লোকেরা কুরবানি করতে সামর্থ্য ছিল না। ফলে বিত্তবান লোকেরা তিন দিনের অতিরিক্ত আহার্য গোশ্‌ত গরিবদের মধ্যে বণ্টন করতে বাধ্য হয়েছে। পরে যখন আল্লাহ তা'আলা মানুষের অভাব দূর করে দিয়েছেন, অধিকাংশ লোকেই স্বয়ং কুরবানি করতে সক্ষম হয়েছে, তখন নিষেধের বিধান রহিত হয়ে গেছে এবং অদ্যাবধি অনুমতির বিধান বিদ্যমান আছে এবং তা চিরকাল থাকবে।

কুরবানির পশুর গোশ্‌ত খাওয়া : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, হজ আদায়কারী নফল হজের কুরবানি ও তামাত্তু এবং কিরান সর্বপ্রকারের হাদীর গোশ্‌ত খেতে পারবে। কেননা, এগুলো হলো– لَحْمُ النُّسُكِ অর্থাৎ কুরবানির পশুর গোশ্‌ত। নবী করীম ﷺ এ জাতীয় কুরবানির পশুর গোশ্‌ত, শুরুয়া ইত্যাদি ভক্ষণ করেছেন। কিন্তু যে পশু دِمَاءُ الْكَفَّارَةِ وَالْجِنَايَتِ অর্থাৎ হজের ত্রুটি পূরণের জন্যে যে পশু জবাই করা হয় তার গোশ্‌ত খাওয়া জায়েজ নেই। নাজিয়াতুল খোযায়ী (রা.)-এর হাদীসে সেই হাদীর গোশ্‌ত গরিবদের জন্যে রেখে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

وَعَنْ ٢٥٢٧ نُبَيْشَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُوْمِهَا اَنْ تَاْكُلُوْهَا فَوْقَ ثَلٰثٍ لِكَىْ تَسَعَكُمْ جَاءَ اللّٰهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوْا وَادَّخِرُوْا وَاتَّجِرُوْا اَلَا وَاِنَّ هٰذِهِ الْاَيَّامَ اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَ ذِكْرِ اللّٰهِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৫২৭. অনুবাদ : হযরত নুবাইশা হুজালী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, [গত বছর] আমি তোমাদেরকে কুরবানির গোশ্‌ত তিন দিনের বেশি খেতে নিষেধ করেছিলাম। যাতে তোমাদের মধ্যে সচ্ছলতা আসে। এ বছর আল্লাহ তা'আলা সচ্ছলতা দান করেছেন। কাজেই তোমরা তা নিজেরা খাও, সঞ্চয় কর এবং [তা দান করে] পুণ্য অর্জন কর। তবে মনে রেখো, এ দিনগুলো হলো পানাহার ও আল্লাহকে স্মরণের দিন। –[আবূ দাউদ]

بَابُ الْحَلْقِ
পরিচ্ছেদ : মস্তক মুণ্ডণ

حَلْقٌ শব্দের অর্থ হলো– মাথার চুল মুড়িয়ে ফেলা। এটা হজ ও ওমরার একটি অংশ। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُؤُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ তবে ওমরায়ও মাথা মুণ্ডন করতে হয় সায়ী শেষ করার পর মারওয়ায়, আর হজে হলক করতে হয় দশ তারিখে কুরবানি করার পর। মিনায় হজে ইফরাদকারীর মাথা মুড়ানো উত্তম। তামাত্তু' হজকারীর জন্যে ওমরা শেষে মাথা ছাটানো এবং হজের পরে মুড়ানো উত্তম. কিন্তু কিরান হজকারী ওমরার পর মাথা মুড়ানো বা ছাটানো কিছুই করতে পারবে না। কেননা, সে দশ তারিখের পূর্বে হালালই হতে পারবে না। আলোচ্য পরিচ্ছেদে এ প্রসঙ্গীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

২৫২৮ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَلَقَ رَأْسَهٗ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَاُنَاسٌ مِنْ اَصْحَابِهٖ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫২৮. অনুবাদ : হযত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজে আপন শির মোবারক মুণ্ডন করেছিলেন এবং তাঁর কতক সাহাবীও মাথা মুণ্ডন করেছিলেন। আর সাহাবীদের কেউ কেউ চুল কেটে ছোট করেছিলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সম্পূর্ণ মাথা মুড়ানো হবে নাকি আংশিক এ বিষয়ে মতভেদ : মাথার কি পরিমাণ চুল মুড়ানো হবে, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ اِمَامِ اَحْمَدَ وَمَالِكٍ (رح) : ইমাম মালেক ও আহমদের মতে, সম্পূর্ণ মস্তক মুণ্ডন করা ওয়াজিব। কারণ, নবী করীম ﷺ তাঁর সম্পূর্ণ মাথা মুণ্ডন করেছিলেন এবং বলেছেন, তোমরা আমার কাছ থেকে হজে তোমাদের করণীয় বিধানগুলো শিখে নাও।

مَذْهَبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِيِّ (رح) وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আ'যম ও শাফেয়ী (র.) প্রমুখের মতে, রাসূল ﷺ -এর অনুকরণে সম্পূর্ণ মাথা মুণ্ডন করা মোস্তাহাব ও উত্তম। তবে মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করা ওয়াজিব। তাঁদের দলিল হলো–

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বলেছেন– قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ অর্থাৎ আমি নবী কারীম ﷺ -এর মাথার চুল কেটেছি। –[বুখারী ও মুসলিম] এখানে مِنْ অব্যয়টি (تَبْعِيْضِيَّةٌ) বা অংশবিশেষ অর্থে।

২. হযরত আতা হতে বর্ণিত আছে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বলেছেন, তিনি [ছাঁটার উদ্দেশ্যে] নবী করীম ﷺ -এর চুলের কিনারায় ধরেছেন। এটা দ্বারাও মাথার কিছু অংশের চুল কাটা প্রমাণিত হয়, সম্পূর্ণ অংশের চুল কাটা প্রমাণিত হয় না।

আবার এ কিছু অংশ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, কমপক্ষে চুলের এক-তৃতীয়াংশ মুণ্ডন করা ওয়াজিব। আর ইমাম আ'যম (র.) বলেছেন, মাথার এক-চতুর্থাংশ মুণ্ডন করাই যথেষ্ট। যেমন– অজুতে মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসাহ করা ওয়াজিব।

প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব : হানাফী মতাবলম্বীদের পক্ষ হতে বলা হয়েছে যে, যেহেতু সম্পূর্ণ মাথা মুণ্ডন ও মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন উভয়বিধ হাদীসই বর্তমান রয়েছে, এ উভয়বিধ হাদীসের দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্যে উত্তম ফয়সালা হলো, সম্পূর্ণ মাথা মুণ্ডন করা উত্তম এবং আংশিক মুণ্ডন করা ওয়াজিব। এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে উভয়বিধ হাদীসের উপরেই আমল করা হয়।

চুল ছাঁটানো বা মুড়ানোর মধ্যে কোনটি উত্তম : সমস্ত ইমামগণের ঐকমত্য যে, চুল ছাঁটা অপেক্ষা মুড়িয়ে ফেলা উত্তম। কেননা, অপর এক হাদীস আছে, নবী করীম ﷺ হজ্জে চুল মুণ্ডনকারীদের জন্যে দু-তিন বার কল্যাণের দোয়া করেছেন। সাহাবীগণ চুল ছাঁটাইকারীদের জন্যে দোয়া করতে অনুরোধ করলেও তিনি শেষবারেই ছাঁটাইকারীদের জন্যে দোয়া করেছেন। অবশ্য উভয়টি জায়েজ।

আল্লামা ইবনে হাজার (র.) বলেন, চুল মুণ্ডন করার মধ্যে বন্দেগি তথা বিনয়ের বহিঃপ্রকাশই বেশি পরিলক্ষিত হয়। আর চুল ছাঁটার মধ্যে কিছু না কিছু সৌন্দর্য তথা বিলাসিতা প্রকাশ পায়। তাই মাথা মুণ্ডন করাই উত্তম।

وَعَنْ ٢٥٢٩ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ لِيْ مُعَاوِيَةُ إِنِّيْ قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫২৯. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আমাকে বলেছেন– মারওয়ার নিকটে আমি কাঁচি দিয়ে নবী করীম ﷺ -এর মাথার চুল ছেঁটেছি। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর উক্তিতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান : অত্র হাদীসে একাধিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। যথা– প্রথম সমস্যা হলো হযরত মুয়াবিয়া (রা.) যে মহানবী ﷺ -এর চুল ছেঁটেছেন, তা কি হজের শেষে নাকি ওমরার শেষে? যদি বলা হয় হজের শেষে, তাহলে এ কথাটি সঠিক হবে না। কেননা, হজের শেষে চুল ছাঁটা বা মুড়ানো হয় দশ তারিখে মিনায়, মারওয়াতে কখনো হয় না। অথচ নবী ﷺ হিজরতের পর একবারই হজ করেছেন। হাদীসে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, তিনি হজ শেষে মিনাতে মাথার চুল মুণ্ডন করেছেন, ছাঁটেননি বা কাটেননি। সুতরাং বলতে হবে যে, তা নিশ্চয় যে কোনো ওমরার ঘটনা।

দ্বিতীয় সমস্যা হলো, নবী করীম ﷺ তো একাধিকবার ওমরা পালন করেছেন। সুতরাং এটা কোন ওমরার ঘটনা? যদি ধরে নেওয়া হয় যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ের ওমরা, তাহলে এ কথাটিও সঠিক নয় তিন কারণে–

১. হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্র লেখার পর নবী করীম ﷺ সেখানেই মাথার চুল মুড়িয়ে হালাল হয়েছেন।
২. তিনি তো সে সফরে মক্কায় প্রবেশই করেননি। সুতরাং মারওয়ার কাছে চুল ছাঁটানোর প্রশ্নই উঠে না।
৩. হুদায়বিয়ার সন্ধি হয়েছে ৬ষ্ঠ হিজরিতে আর ঐতিহাসিকদের নির্ভরযোগ্য তথ্য হতে জানা যায় যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছেন ৮ম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের সময়। কাজেই হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ইসলাম গ্রহণের দু বৎসর পূর্বে নবী করীম ﷺ -এর মাথার চুল ছুটেছেন, এটা একটি অবান্তর কথা।

তৃতীয় সমস্যা হলো, একে ওমরাতুল কাজার ঘটনাও বলা যায় না। কেননা, নবী করীম ﷺ তা পালন করেছেন ৭ম হিজরিতে, অথচ হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি।

চতুর্থ সমস্যা হলো, একে 'ওমরায়ে জি'রানা' এর ঘটনাও বলা যায় না। কেননা, জি'রানা হতে নবী করীম ﷺ যে ওমরা আদায় করেছেন তা ৮ম হিজরির মক্কা বিজয়ের পর জিলকদ মাসে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু কোনো কোনো সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) নবী করীম ﷺ -এর চুল ছেঁটেছেন হজের পরে ওমরার পরে নয়। অপর দিকে ইমাম নাসায়ী (র.) সহীহ সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন যে, চুল ছাঁটার ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল জিলহজ মাসের দশ তারিখে মিনায় বিদায় হজের সময়।

পঞ্চম সমস্যা হলো, চুল ছাঁটার এ ঘটনাটি নবী করীম ﷺ -এর বিদায় হজের সাথে যে ওমরা আদায় করেছেন সে সময়ের কথাও বলা যায় না। কেননা, নবী করীম ﷺ স্বয়ং এবং তাঁর সঙ্গী কতিপয় লোকের সাথে কুরবানির হাদী তথা পশু ছিল। অথচ যারা কিরান হজের ইহরাম বাঁধে তারা এবং যার সাথে হাদী থাকে সে ওমরা শেষে চুল ছেঁটে হালাল হতে পারে না।

মোটকথা, হযরত মুয়াবিয়ার উক্ত চুল ছাঁটার কথাটি উপরিউক্ত আলোচনা হতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, কোনো অবস্থাতেই এর সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায় না। তাই আল্লামা নববী বলেছেন– নবী করীম ﷺ 'জি'রানা' নামক স্থান হতে যে ওমরা আদায় করেছিলেন– তা সে ওমরার ঘটনাই হবে। কিন্তু এ কথার পরও ঐ প্রশ্নটি থেকে যায়, যা ইমাম নাসায়ী (র.) হজের ঘটনায় বলেছেন এবং আমরা পিছনে ৪র্থ সমস্যার অধীনে তা বর্ণনা করেছি।

এ প্রসঙ্গে ইমাম তুরপুশ্তী বলেছেন– মূলত এটা জি'রানা হতে আদায়কৃত সেই 'ওমরার ঘটনাই'। তবে ঊর্ধ্বতন কোনো বর্ণনাকারী ভুলবশত একে হজের ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। ফলে ইমাম তুরপুশ্তী (র.)-এর এ কথাটি মেনে নিলে হযরত মুয়াবিয়ার উক্তিটির ব্যাপারে আর কোনো সমস্যাই বিদ্যমান থাকে না।

وَعَنْ ٢٥٣٠ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৩০. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজে ইরশাদ করেছেন, হে আল্লাহ! তুমি মস্তক মুণ্ডনকারীদের প্রতি রহম কর। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যারা মাথা ছেঁটেছেন তাদের প্রতিও! রাসূল ﷺ বললেন, হে আল্লাহ! তুমি মস্তক মুণ্ডনকারীদের প্রতি রহম কর। এবারও সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ছাঁটাইকারীদের প্রতিও! রাসূল ﷺ তৃতীয়বারে বললেন, মাথা ছাঁটাইকারীদের প্রতিও। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَالْمُقَصِّرِيْنَ-এর مَعْطُوْف عَلَيْهِ নির্ণয় : اَلْمُقَصِّرِيْنَ কে- اَلْمُحَلِّقِيْنَ -এর উপর আতফ করা হয়েছে। সুতরাং তার مَعْطُوْف عَلَيْهِ হলো اَلْمُحَلِّقِيْنَ ; নাহশাস্ত্রের পরিভাষায় এ প্রকার আতফকে عَطْف تَلْقِيْنِىْ বলা হয়। সূরা বাকারার ১২৬ নং আয়াতে উল্লিখিত قَالَ وَمَنْ كَفَرَ -এর মধ্যে مَنْ كَفَرَ -এর আতফও এ প্রকার আতফের অন্তর্ভুক্ত।

মস্তক মুণ্ডনকারীদের মর্যাদা : মাথা মুণ্ডনকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ .

অত্র আয়াত ও উল্লিখিত হাদীস হতে বুঝা যায় যে, মস্তক মুণ্ডনকারীদের মর্যাদা বেশি। কেননা, আয়াতে মস্তক মুণ্ডনকারীদের কথাই আগে বলা হয়েছে। হাদীসটিতে দেখা যায় যে, নবী করীম ﷺ প্রথম দু'বারই মস্তক মুণ্ডনকারীদের জন্যে দোয়া করেছেন। পরে সাহাবায়ে কেরামের অনুরোধে তৃতীয়বার মস্তক ছাঁটাইকারীদেরকেও দোয়ার মধ্যে শামিল করলেন। অতএব, বুঝা গেল যে, মস্তক মুণ্ডনকারীদের মর্যাদা বেশি।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, মস্তক মুণ্ডন করার মধ্যে একদিকে যেমন ইবাদতের বাস্তব নিদর্শন ও বিনয়ীভাব ফুটে উঠে, নিজেকে দীন-হীনভাবে প্রকাশ করা হয়, অপর দিকে নিয়তের বিশুদ্ধতা প্রকাশ পায়। সুতরাং এসব কারণে মস্তক ছাঁটাই অপেক্ষা মুণ্ডন করাই উত্তম।

وَعَنْ ٢٥٣١ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَدَّتِهٖ اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَا لِلْمُحَلِّقِيْنَ ثَلٰثًا وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ مَرَّةً وَاحِدَةً - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৫৩১. **অনুবাদ :** হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে হুসাইন তাঁর দাদী হতে বর্ণনা করেন। তাঁর দাদী বলেছেন- তিনি রাসূল ﷺ -কে বিদায় হজে মস্তক মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার এবং চুল ছাঁটাইকারীদের জন্য মাত্র একবার দোয়া করতে শুনেছেন। -[মুসলিম]

وَعَنْ ٢٥٣٢ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَتٰى مِنًى فَاَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ اَتٰى مَنْزِلَهٗ بِمِنًى وَنَحَرَ نُسُكَهٗ ثُمَّ دَعَا بِالْحَلَّاقِ وَنَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْاَيْمَنَ فَحَلَقَهٗ ثُمَّ دَعَا اَبَا طَلْحَةَ الْاَنْصَارِىَّ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ ثُمَّ نَاوَلَ الشِّقَّ الْاَيْسَرَ فَقَالَ اِحْلِقْ فَحَلَقَهٗ فَاَعْطَاهُ اَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ اِقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৩২. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ মিনাতে এসে প্রথমে জামরাতে গেলেন এবং তাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর মিনাস্থ নিজের অবস্থানগাহে আসলেন এবং নিজের হাদী নহর করলেন। অতঃপর নাপিত ডাকালেন এবং নাপিতকে নিজের মাথার ডানদিক বাড়িয়ে দিলেন। সে তা মুড়াল। অতঃপর আবূ তালহা আনসারীকে ডেকে তা [কেশগুচ্ছ] দিলেন। তারপর [নাপিতের দিকে] মাথার বামদিক বাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, মুড়াও। সে তা মুড়াল। এটিও তিনি আবূ তালহাকে দিলেন এবং বললেন, এটি লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দাও। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হলক, নহর ও রমীর মধ্যে তারতীব আবশ্যক কিনা? মাথা মুণ্ডন, কুরবানি ও কঙ্কর নিক্ষেপ করার মধ্যে তারতীব বা ধারাবাহিকতা আবশ্যক কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ বিদ্যমান। যেমন–

১. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে, এগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা আবশ্যক। তবে সেটা ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নত। তাই ধারাবাহিকতা ব্যাহত হলে দম দিতে হবে না।

দলিল :

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ اِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২. ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র.)-এর মতে, এগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা আবশ্যক তথা ওয়াজিব। তাই ধারাবাহিকতা ব্যাহত হলে দম দিতে হবে।

দলিল : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ حَجِّهٖ اَوْ اَخَّرَهٗ فَلْيُهْرِقْهُ لِذٰلِكَ دَمًا –

প্রত্যুত্তর : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর দলিলের প্রত্যুত্তরে ওলামায়ে আহনাফ বলেন–

ক. এখানে لَا حَرَجَ -এর অর্থ হচ্ছে لَا اِثْمَ তথা কোনো গুনাহ হবে না, তবে কাফফারা দিয়ে দিতে হবে।

খ. অথবা, উক্ত হাদীসটি রাসূল ﷺ -এর বিদায় হজের সাথে খাস। প্রথম হজ বিধায় সাহাবীদের ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে উদারতা প্রদর্শন করা হয়েছে। পরবর্তীতে এ শিথিলতা রহিত হয়ে গেছে।

হাদীসটি হতে উদ্ভাবিত মাসআলাসমূহ : আলোচ্য হাদীস হতে নিম্নলিখিত মাসআলা নির্গত হয়–

১. মস্তক মুণ্ডন করতেও ডানদিক হতে আরম্ভ করা মোস্তাহাব।

২. মানুষের চুল ও লোম পাক।

৩. কল্যাণ লাভের জন্যে রাসূল ﷺ -এর চুল সংরক্ষণ করা বৈধ।

وَعَنْ ٢٥٣٣ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ اَنْ يُّحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ اَنْ يَّطُوْفَ بِالْبَيْتِ بِطِيْبٍ فِيْهِ مِسْكٌ – (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৩৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং কুরবানির দিন বায়তুল্লাহ শরীফ তওয়াফের পূর্বে কস্তূরী মিশ্রিত সুগন্ধি লাগাতাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মুহরিমের সুগন্ধি ব্যবহারের হুকুম : ইহরাম অবস্থায় কোনো প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েজ নেই। এটাই সকল ইমামগণের ঐকমত্য, তবে দশ তারিখে মাথা মুড়ানোর পর সেলাইকৃত পোশাক এবং সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহার করা জায়েজ। তবে এরপর হজের সর্বশেষ রোকন 'তওয়াফে ইফাযা' আদায় করতে হবে। সুতরাং উক্ত তওয়াফের পূর্বে স্ত্রীসহবাস করা ব্যতীত খোশবু ইত্যাদি লাগানো জায়েজ। ফলে এ তওয়াফের পরে স্ত্রী ব্যবহারসহ সবকিছু হালাল হয়ে যায় এবং পূর্ণ ইহরাম খোলা হয়।

وَعَنْ ٢٥٣٤ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৫৩৪. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানির দিন তওয়াফে ইফাযা [তওয়াফে জিয়ারত] করেছেন। অতঃপর মিনায় ফিরে এসে জোহরের নামাজ পড়েছেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসদ্বয়ের দ্বন্দ্বের নিরসন : বক্ষ্যমাণ হাদীসগ্রন্থে হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত হাদীস হতে জানা যায় যে, নবী করীম ﷺ দশ তারিখে তওয়াফে ইফাযা শেষ করে মিনায় এসে জোহরের নামাজ পড়েছেন। পক্ষান্তরে মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসে আছে যে, রাসূল ﷺ কুরবানির দিন মক্কায়ই জোহর নামাজ পড়েছেন। মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত হাদীসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তারা ইবনে ওমর বর্ণিত হাদীসের উত্তরে বলেন, সম্ভবত মিনায় সাহাবীগণ নবী করীম ﷺ -এর অপেক্ষায় নামাজ দেরিতে পড়েছিলেন এবং মিনায় পৌঁছে রাসূল ﷺ জামাত দেখতে পেয়েছিলেন এবং জামাতের ছওয়াবের জন্যে তাতে শরিক হয়েছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.) এ শরিক হওয়াকেই জোহর নামাজ পড়েছেন বলে বর্ণনা করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٥٣٥ - عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ (رض) قَالَا نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

২৫৩৫. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) ও আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেছেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদেরকে মাথা মুড়াতে নিষেধ করেছেন। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মহিলাদের মস্তক মুণ্ডনের বিধান : কোনো প্রয়োজন ব্যতীত মহিলাদের মস্তক মুণ্ডন হারাম। চাই তা ইহরাম হতে হালাল হওয়ার জন্যে হোক বা অন্য কোনো সময়। কেননা, মহিলাদের মস্তক মুণ্ডন হলো আকৃতি বিকৃত করার সমতুল্য। যেমন পুরুষের দাড়ি মুণ্ডন আকৃতির বিকৃতি। আর আকৃতি বিকৃতকরণ হারাম। সুতরাং মহিলাদের মস্তক মুণ্ডন হারাম।

٢٥٣٦ - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ اِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيْرُ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ)

২৫৩৬. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– মহিলাদের জন্যে মাথা মুণ্ডন নেই, তবে মহিলাদের জন্য আছে চুল ছাঁটান। –[আবূ দাউদ, তিরমিযী ও দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মহিলাদের চুল ছাঁটার হুকুম : ইহরাম হতে হালাল হওয়ার জন্যে মহিলাদের মাথার চুল কি পরিমাণ ছাঁটতে হবে, এ সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, ন্যূনতম তিনগাছি চুল ছাঁটাই ইহরাম খোলার জন্য যথেষ্ট হবে। হানাফীদের মতে, পুরুষ বা নারী উভয়ের জন্যে চুলের অগ্রভাগ হতে অঙ্গুলির এক কর পরিমাণ ছাঁটতে হবে এবং মাথার এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ ছাঁটানো ওয়াজিব।

ইমাম মালেক (র.) বলেন, সম্পূর্ণ মাথার চুল ছাঁটানো ওয়াজিব। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) এ অভিমতই গ্রহণ করেছেন এবং একেই তিনি সঠিক অভিমত বলে দাবি করেছেন।

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ .

এ পরিচ্ছেদে তৃতীয় অনুচ্ছেদ নেই।

بَابُ (اَلتَّقْدِيْمِ وَالتَّاخِيْرِ فِيْ بَعْضِ اُمُوْرِ الْحَجِّ)

পরিচ্ছেদ : হজের কার্যক্রমে অগ্রপশ্চাৎ করা

হজের ফরজ কার্যাবলির মধ্যে তারতীব বা ক্রমধারা রক্ষা করা ফরজ। আর সে কাজগুলো হলো ইহরাম বাঁধা, আরাফায় অবস্থান করা এবং তওয়াফে ইফাযা করা। এগুলো পূর্বাপরকরণে হজ আদায় হবে না। আর হজের ওয়াজিবগুলোর ক্রমধারা রক্ষা করা ওয়াজিব। আর সেগুলো হলো, পাথর নিক্ষেপ করা, কুরবানি করা, মাথা মুণ্ডানো ইত্যাদি। হানাফীদের মতে এগুলো আগ পিছকরণে কাফফারা স্বরূপ দম দিতে হবে। আর কেউ অবজ্ঞাবশত পূর্বাপর করলে পাপ হবে না, তবে দম দিতে হবে।

গ্রন্থকার এ কোনো নামকরণ না করার কারণ হিসেবে আল্লামা ইবনে হাজার (র.) বলেছেন, حَلْقٌ তথা মাথা মুড়ানো হজের ওয়াজিবসমূহের মধ্যে একটি কাজ। এ পরিচ্ছেদেও তেমন ধরনের ওয়াজিবসমূহ আগ পিছ হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। তাই ভিন্নভাবে এর নামকরণের প্রয়োজন হয়নি। যদিও অন্যান্য গ্রন্থে এমন একটি নামকরণ করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٥٣٧ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَفَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُوْنَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ اَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ فَقَالَ اِذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ لَمْ اَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ فَقَالَ اِرْمِ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا اُخِّرَ اِلَّا قَالَ اِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ اِرْمِ وَلَا حَرَجَ وَاَتَاهُ اٰخَرُ فَقَالَ اَفَضْتُ اِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ اِرْمِ وَلَا حَرَجَ -

২৫৩৭. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, বিদায় হজে রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় এসে লোকজনের সম্মুখে দাঁড়ালেন, যাতে লোকেরা তাঁর কাছে [হজের বিধি-বিধান] জিজ্ঞেস করতে পারে। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, হুযুর! আমি না জেনে কুরবানির পূর্বে মাথা মুণ্ডন করেছি। হুযূর বললেন, এতে তোমার কোনো পাপ হয়নি, এখন কুরবানি কর। আরেক ব্যক্তি এসে বলল, হুযূর! আমি না জেনে কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বেই কুরবানি করেছি। তখন হুযূর ﷺ বললেন, এতে পাপ হয়নি, এখন কঙ্কর নিক্ষেপ কর। অতঃপর নবী কারীম ﷺ কোনো কাজ আগে করা হয়েছে বা পরে করা হয়েছে বলে জিজ্ঞেস করা হলেই তিনি বলতেন, তাতে কোনো পাপ হয়নি; এখন তা কর। –[বুখারী ও মুসলিম]

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে যে, এক ব্যক্তি হুযূরের কাছে এসে বলল, হুযূর! আমি কঙ্কর নিক্ষেপ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করেছি। হুযূর বললেন, তাতে কোনো গুনাহ হয়নি, এখন কঙ্কর নিক্ষেপ কর। অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে বলল, হুযূর! আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফে ইফাযা করেছি। হুযূর ﷺ বললেন, তাতে কোনো পাপ হয়নি, এখন কঙ্কর নিক্ষেপ কর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কুরবানির দিনে হজের কার্যাবলির ধারাবাহিকতা রক্ষা করার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ : দশই জিলহজ কুরবানির দিনে সর্বসম্মতিক্রমে হজের চারটি কাজ রয়েছে, যা প্রত্যেক হাজীকে করতে হয়। আর সে কাজগুলো হলো– ১. জামরায়ে আকাবায় রমী করা। ২. কুরবানি করা। ৩. মাথা মুণ্ডন করা ও ৪. তওয়াফে ইফাযা করা। এ কাজগুলোর ক্রমবিন্যাস সম্পর্কে সকল ইমামের ঐকমত্য রয়েছে। তবে এ কাজগুলো তারতীব বা ক্রমানুসারে আদায় করা সুন্নত নাকি ওয়াজিব, এ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, সাহেবাইন (র.) ও আহলে হাদীসসহ জমহুরে ওলামায়ে কেরামের মতে, উল্লিখিত কাজগুলো তারতীব বা ক্রমানুসারে সম্পাদন করা 'সুন্নত'। সুতরাং তারতীবের বরখেলাফ তথা আগপিছ হয়ে গেলে 'দম' ওয়াজিব হবে না। তাঁদের দলিল হলো, আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত حَرَجٌ 'হারাজ' শব্দের অর্থ– পাপ, দোষ, আপত্তি ও ক্ষতি ইত্যাদি। আর নবী করীম ﷺ যখন এ জাতীয় উলট-পালট কাজের জওয়াবে لَا حَرَجَ অর্থাৎ কোনো দোষ হয়নি বলে ঘোষণা দিয়েছেন, এতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, এরূপ কাজে যেমন পাপ হবে না, তেমনি 'দম'ও আদায় করা ওয়াজিব নয়।

ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও ইবরাহীম নাখয়ী (র.) বলেন, উল্লিখিত কাজগুলোর মধ্যে তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব। ব্যতিক্রম করলে কোনো গুনাহ হবে না ঠিকই, তবে 'দম' ওয়াজিব হবে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে এ কথাটি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে যে, প্রশ্নকারী ব্যক্তিদ্বয় "আমি না জেনে এরূপ করেছি" বলে গুনাহ হয়েছে মনে করে নিজের কৃত অপরাধের জন্যে ক্ষমা চেয়েছেন। এর প্রেক্ষিতে নবী করীম ﷺ বলেছেন, لَا حَرَجَ অর্থাৎ এতে তোমার কোনো গুনাহ হয়নি। কিন্তু এ ভুল বা অজ্ঞতার দরুন দম বা কাফফারা দিতে হবে কিনা, তা বুঝা যায়নি। তবে ইবনে আবূ শাইবাহ (র.) তাঁর 'মুসান্নিফ' গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে নিম্নোক্ত সহীহ হাদীসটির বর্ণনা করেছেন–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ حَجِّهِ أَوْ أَخَّرَ فَلْيُهْرِقْ الخ ـ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজের কোনো কার্যক্রম আগ-পিছ করে ফেলে সে যেন অবশ্যই একটি দম কুরবানি করে। এ হাদীস হতে বুঝা যায় যে, لَا حَرَجَ শব্দ দ্বারা শুধু গুনাহ না হওয়ার কথাই বলা হয়েছে, ফিদইয়া বা দমের কথা রহিত করা হয়নি। ইমাম তাহাবী ও ইবনে হুমামসহ অনেকেই এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

لَا حَرَجَ -এর অর্থ :

১. এখানে لَا حَرَجَ -এর অর্থ হচ্ছে لَا إِثْمَ অর্থাৎ কোনো গুনাহ হবে না এবং পরকালে এর জন্যে পাকড়াও হবে না। তবে কাফফারা দিয়ে দিতে হবে।
২. অথবা, হাদীসটি রাসূল ﷺ -এর বিদায় হজের সাথে খাস। সেটি সাহাবীদের জন্যে প্রথম হজ ছিল বিধায় অজ্ঞতাবশত তাঁদের ধারাবাহিকতা লঙ্ঘিত হয়েছিল। তাই রাসূল ﷺ উদারতা প্রদর্শন করেছেন। পরবর্তীতে এ শিথিলতা রহিত হয়ে গেছে।

কঙ্কর নিক্ষেপের পদ্ধতি : কঙ্কর নিক্ষেপের পদ্ধতি নিম্নরূপ–

১. জিলহজ মাসের দশম তারিখে মিনা প্রান্তরে পৌঁছে প্রথম বারের মতো সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। প্রথমে তালবিয়াহ পাঠ করবে। প্রথম কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে সাথেই তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করে পরবর্তী প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলতে হবে।
২. অতঃপর জিলহজ মাসের একাদশ ও দ্বাদশ তারিখে তিনটি জামরাতে সাতটি করে মোট একুশটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে।

وَعَنْ ٢٥٣٨ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَيَقُوْلُ لَا حَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لَا حَرَجَ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৫৩৮. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানির দিন মিনাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে [বিভিন্ন] প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হতো, তখন তিনি বলতেন– এতে কোনো পাপ হবে না। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, হুযূর! আমি সন্ধ্যার পর কঙ্কর নিক্ষেপ করেছি। তিনি বললেন, তাতে কোনো পাপ হবে না। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপের সময় সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : জিলহজের দশম তারিখে আকাবায় যে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয় তা কোন সময় নিক্ষেপ করতে হয় এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, নয় তারিখ দিবাগত মধ্যরাতের পর হতে দশ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত কঙ্কর নিক্ষেপ করা বৈধ। দশ তারিখ দিবাগত রাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করা মাকরূহ।

مَذْهَبُ أَبِي حَنِيْفَةَ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, দশ তারিখ সুবহে সাদিক হতে সেদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত কঙ্কর নিক্ষেপ বৈধ। সুবহে সাদিকের পূর্বে নিক্ষেপ করা মাকরূহ এবং দ্বিপ্রহরের পূর্বে নিক্ষেপ করা মোস্তাহাব।

শাইখুল ইসলাম (র.) স্বীয় গ্রন্থ "মাবসূত" -এ উল্লেখ করেছেন যে, দশ তারিখ সুবহে সাদিকের পর হতে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়টি মাকরূহ সহকারে বৈধ সময়। সূর্যাস্তের পর হতে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত মোস্তাহাব সময়। দ্বিপ্রহরের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বৈধ সময়। আর রাত মাকরূহসহ বৈধ সময়।

উল্লিখিত হাদীসে সন্ধ্যার পর কঙ্কর নিক্ষেপ করার ব্যাপারে রাসূল ﷺ যে বলেছেন, 'কোনো পাপ হবে না' তা হজের প্রাথমিক সময়ের ঘটনা। নতুবা এটি সুন্নতের বিপরীত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٥٣٩ عَلِيٍّ (رض) قَالَ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَفَضْتُ قَبْلَ اَنْ اَحْلِقَ قَالَ اِحْلِقْ اَوْ قَصِّرْ وَلَا حَرَجَ وَجَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِىَ قَالَ اِرْمِ وَلَا حَرَجَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

২৫৩৯. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর [রাসূলের] কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি মাথা মুণ্ডনের আগে তওয়াফে ইফাজা করেছি। তিনি বললেন, তাতে কোনো পাপ হয়নি, এখন মাথা মুড়াও বা চুল ছাঁট। আরেক ব্যক্তি এসে বলল, [ইয়া রাসূলাল্লাহ!] কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বেই আমি পশু কুরবানী করেছি। রাসূল ﷺ বললেন– তাতে গুনাহ্ হয়নি, এখন কঙ্কর নিক্ষেপ কর। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَلَا حَرَجَ -এর **অর্থ :** ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) বলেন, এ শব্দের দ্বারা গুনাহ ও কাফফারা উভয়টিকেই রহিত করা হয়েছে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র.) বলেন, এখানে শুধু গুনাহকেই রহিত করা হয়েছে। আর তাও এ কারণে যে, তৎপূর্বে হজের বিধিবিধান সম্পর্কে সাহাবীরা তথা মুসলমানরা অবগত ছিলেন না। সুতরাং এ ধরনের ভুল-ত্রুটি প্রথম অবস্থায় সংঘটিত হওয়াটা স্বাভাবিক। তাই তো তিনি তখনই বলেছিলেন– তোমরা আমার নিকট হতে হজের বিধানসমূহ শিখে নাও, কেননা এটাও তোমাদের দীনের অংশ। অবশ্য এ একটি কথা থেকে যায় যে, প্রশ্নকারীদেরকে নবী করীম ﷺ "দম দিতে হবে" এ কথাটি তখনই বলে দিলেন না কেন? এর জবাবে বলা হয় যে, ভুল-ত্রুটির জন্যে যে ফিদইয়া বা কাফফারা আদায় করতে হয় তা পূর্ব হতেই সকলে অবগত ছিলেন। তাই তা বলার আদৌ প্রয়োজন ছিল না। ফলে গুনাহ যে হবে না, শুধু তাই বলে দিয়েছেন। –[তা'লীক ও আইনী]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٥٤٠ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ (رض) قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَاْتُوْنَهُ فَمَنْ قَائِلٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَعَيْتُ قَبْلَ اَنْ اَطُوْفَ اَوْ اَخَّرْتُ شَيْئًا اَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُوْلُ لَا حَرَجَ اِلَّا عَلٰى رَجُلٍ اِقْتَرَضَ عِرْضَ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَذٰلِكَ الَّذِىْ حَرِجَ وَهَلَكَ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৫৪০. অনুবাদ : হযরত উসামা ইবনে শারীক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হজের উদ্দেশ্যে বের হলাম, তখন লোকজন তাঁর কাছে এসে বলত, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তওয়াফের পূর্বে সাঈ করেছি, অথবা বলত, আমি কোনো কাজ দেরিতে করেছি অথবা অগ্রিম করেছি। তখন রাসূল ﷺ বলতেন, এতে কোনো পাপ হবে না। তবে যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানের সম্মানহানি করেছে, সে বড় গুনাহের কাজ করেছে এবং ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়েছে। –[আবূ দাউদ]

بَابُ خُطْبَةِ يَوْمِ النَّحْرِ وَ رَمْيِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ وَالتَّوْدِيْعِ

পরিচ্ছেদ : কুরবানির দিনের ভাষণ, আইয়্যামে তাশরীকে কঙ্কর নিক্ষেপ ও তওয়াফে বিদা

اَلْخُطْبَةُ : خُطْبَةٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে خُطَبَاتٌ ; এর শাব্দিক অর্থ– ভাষণ, বক্তৃতা, নসিহত। তবে خاء বর্ণের নিচে যের দিয়ে পড়া হলে এর অর্থ হবে– বিয়ের পয়গাম বা প্রস্তাব।

শরিয়তের পরিভাষায় জুমার নামাজের পূর্বে এবং ঈদের নামাজের পরে যে ভাষণ বা বক্তৃতা দেওয়া হয়, তাকে "খুতবা" বলে। তবে এখানে শব্দটি আভিধানিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

اَلتَّشْرِيْقُ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل -এর ক্রিয়ামূল। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। যেমন– পূর্বমুখি হওয়া, সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট হওয়া, গোশত টুকরা টুকরা করে রৌদ্রে শুকানো। ঈদুল আযহার পরবর্তী তিন দিনকে اَيَّامُ التَّشْرِيْق বলা হয়। কেননা, আরবের লোকেরা ঐ দিনগুলোতে কুরবানির গোশ্ত শুকিয়ে সঞ্চয় করে রাখত।

رَمْيٌ শব্দটি বাবে ضَرَبَ -এর ক্রিয়ামূল। এর অর্থ– নিক্ষেপ করা। তবে رَمْي দ্বারা কুরবানির দিনসমূহে জামরাত্রয়ে কঙ্কর নিক্ষেপের কথা বুঝানো হয়েছে।

اَلتَّوْدِيْعُ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل -এর ক্রিয়ামূল। এর অর্থ– ছড়িয়ে দেওয়া, বিদায় করা। তবে এখানে তা দ্বারা বিদায়ী তওয়াফকে বুঝানো হয়েছে। বিদায়ী তওয়াফ বহিরাগত হাজীদের জন্যে ওয়াজিব।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٥٤١ أَبِيْ بَكْرَةَ (رض) قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ اِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ اَلسَّنَةُ اِثْنَىْ عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلٰثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَ رَجَبُ مُضَرَ الَّذِىْ بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ وَقَالَ اَىُّ شَهْرٍ هٰذَا قُلْنَا اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهٗ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهٖ قَالَ اَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ اَىُّ بَلَدٍ هٰذَا قُلْنَا اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا

২৫৪১. অনুবাদ : হযরত আবূ বাকরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানির দিন নবী করীম ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করলেন, তিনি বললেন– জমানা আবার সেই অবস্থার দিকেই ঘুরে আসছে [তার সে তারিখের ক্রম অনুযায়ী] যে দিন আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। বছর বারো মাসে, তন্মধ্যে চার মাস হারাম বা সম্মানিত। পর পর তিন মাস একসাথে তথা জিলকদ, জিলহজ ও মহররম এবং চতুর্থ মাস মুযার গোত্রের রজব মাস যা জমাদিউস সানী ও শা'বান মাসের মধ্যবর্তী। রাসূল ﷺ বললেন, এটি কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। রাসূল ﷺ কতক্ষণ চুপ রইলেন, যাতে আমরা ভাবলাম তিনি এর নাম ছাড়া অন্য কোনো নামকরণ করবেন। তারপর রাসূল ﷺ বললেন, এটি কি জিলহজ মাস নয়? আমরা বললাম, জি হ্যাঁ। তারপর রাসূল ﷺ বললেন, এটি কোন শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। রাসূল ﷺ কতক্ষণ চুপ রইলেন যাতে আমরা ভাবলাম যে, তিনি এর নাম ছাড়া অন্য কোনো

أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَ الْبَلْدَةَ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قُلْنَا اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ اَعْمَالِكُمْ اَلَا فَلَا تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى مِنْ سَامِعٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

নামকরণ করবেন। তারপর বললেন, এটি কি [মক্কা] শহর নয়? আমরা বললাম, জি হ্যাঁ। তারপর রাসূল ﷺ বললেন, এটি কোন দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি কতক্ষণ চুপ রইলেন, যাতে আমরা মনে করলাম যে, তিনি এর নাম ছাড়া অন্য কোনো নামকরণ করবেন। অতঃপর বললেন— এটি কি কুরবানির দিন নয়? আমরা বললাম, জি হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সম্মান পরস্পরের প্রতি হারাম বা পবিত্র— যেমন তোমাদের এ দিন, এ শহর এবং এ মাস হারাম বা পবিত্র।

তোমরা শীঘ্রই তোমাদের প্রভুর সাথে মিলিত হবে তখন তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞেস করবেন। সাবধান! আমার [ইন্তেকালের] পর তোমরা বিপথগামী হয়ো না, একে অপরে প্রাণ বধ করো না। সতর্ক হও! আমি কি তোমাদেরকে [আল্লাহর নির্দেশ] পৌঁছিয়ে দিয়েছি? সাহাবীগণ বললেন, জি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন রাসূল ﷺ বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। [আরো বললেন,] প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে [এ নির্দেশ] পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, এমন অনেক ব্যক্তি যাকে [পরে] পৌঁছিয়ে দেওয়া হয় সে মূল শ্রোতা হতে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষণাবেক্ষণকারী হয়ে থাকে। —[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসাংশটির অর্থ হচ্ছে— জমানা আবার সে অবস্থার দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছে তার সে তারিখের বা মাসের ক্রম অনুযায়ী যে দিন বা মাসে আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহ ও জমিনসমূহকে সৃষ্টি করেছেন। জমানা বা যুগ বছরে এবং বছর মাসে বিভক্ত। এ বিভক্তি তার প্রকৃত গণনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে, যা আল্লাহ তা'আলা আসমান-জমিন সৃষ্টির দিন নির্ধারণ করেছিলেন।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, প্রত্যেক বছর বারো মাসে এবং প্রত্যেক মাস উনত্রিশ বা ত্রিশ দিনের হিসেবে আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছিলেন। জাহিলিয়া যুগের লোকেরা এটাকে পরিবর্তন করে ফেলেছিল। তারা কোনো বছরকে বারো মাসে আর কোনো বছরকে তেরো মাসে হিসাব করত। হজকে এক মাস হতে অপর মাসেও সরিয়ে দিত। যে মাসকে তারা প্রবৃদ্ধি করত তাকে তারা 'বাল্‌গা' বলত এবং ঐ বছরটি তেরো মাসে হিসাব করত।

অপর দিকে হারাম মাসসমূহে আরবগণ লুটতরাজ ও যুদ্ধবিগ্রহ করত না; কিন্তু যুদ্ধ চলাকালে হারাম মাস এসে গেলে তাকে হালাল করে তার স্থলে পরের মাসকে হারাম করত। এভাবে মহররমকে সফরে পিছিয়ে দিয়ে মহররমকে ফাও মাস হিসেবে হালাল করত এবং সফরকে মহররম নাম দিয়ে হারাম করত। এভাবে উলট-পালট হতে হতে ঘটনাক্রমে কয়েক বছর যাবৎ বছরের আরম্ভ ও হজ ঠিক সময়েই হতে থাকে। এর প্রতিই ইঙ্গিত করে রাসূল ﷺ বলেছেন— জমানা ঘুরে এসেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজের বছর যে হজ করেছিলেন সেটি ঐ বছর ছিল যাতে জিলহজ মাস নিজের স্থানে এসে গিয়েছিল। রাসূলের কথার অপর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার এটাই বিধান যে, জিলহজ মাস সর্বদা এ সময়ই থাকবে। সুতরাং তোমরা তার রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং হজ সর্বদা এ মাসেই করতে থাকবে। জাহিলিয়া যুগের লোকদের মতো এক মাসকে অপর মাস দ্বারা বদলাবে না।

সমস্যার সমাধান : নবী করীম ﷺ -এর বিদায় হজ্জে তথা দশম হিজরিতেই যদি জিলহজ মাস বৎসর ঘুরে নিজের স্থানে এসে থাকে, তাহলে প্রশ্ন জাগে, এর পূর্বে ৮ম হিজরিতে মক্কার শাসক হযরত আত্তাব ইবনে আসীদ (রা.)-এর এবং ৯ম হিজরিতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নেতৃত্বে নবী করীম ﷺ -এর নির্দেশে যে হজ পালিত হয়েছে তবে সেগুলো কি জিলহজ মাসে আদায় করা হয়নি? অথচ সমস্ত ইমামের ঐকমত্য যে জিলহজ মাসের নির্দিষ্ট তারিখ ব্যতীত হজ হয় না।

এর জবাবে বলা হয় যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন– اِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ অর্থাৎ 'জমানা ঘুরে এসেছে।' কয়েক বৎসরে এক জমানা বা যুগ হয়। সুতরাং পূর্ববর্তী সে দু বৎসরও উক্ত জমানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায়, সেই দু বৎসরের হজও জিলহজ মাসে আদায় করা হয়েছে। যদি শুধু বিদায় হজের বৎসরের কথাই বলা নবী করীম ﷺ -এর উদ্দেশ্য হতো তাহলে اَلزَّمَانَ শব্দটি না বলে عَامٌ অথবা اَلسَّنَةُ ইত্যাদি শব্দ বলতেন। অতএব, দৃঢ়তার সাথে বলা যায় নবী করীম ﷺ -এর কথা উক্ত প্রশ্নের বিপরীত নয়।

হারাম মাস ও তার বিধান : হারাম মাস চারটি– জিলকদ, জিলহজ, মহররম ও রজব। ইসলামের পূর্ব হতেই উক্ত চার মাসকে হারাম বা সম্মানিত মাস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এ বিধান বহাল ছিল। ফলে যুদ্ধবিগ্রহ, হানাহানি ও কাটাকাটি করা নিষিদ্ধ ছিল। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত আতা ইবনে আবূ রেবাহ (র.) বলেন, উক্ত বিধান বর্তমানেও বহাল আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

কিন্তু জমহুরে ওলামায়ে কেরামের মতে, হারাম মাসসমূহের বিধান মক্কা বিজয়ের পর রহিত হয়ে গেছে। তাঁরা বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। অথচ এখানে কোনো মাসকে নির্দিষ্ট করে বাদ রাখা হয়নি। এর প্রমাণে আরো বলা যায় যে, নবী করীম ﷺ তায়েফ অবরোধ ও হুনাইনের যুদ্ধ অভিযান শাওয়াল ও জিলকদ মাসেই করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন– মহররমের শুরু হতে এক টানা চল্লিশ দিন তায়েফ অবরোধ ছিল। সুতরাং বলা যায় যে, বর্তমানে উক্ত বিধান বহাল নেই।

হজের খুতবা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : হযরত আবূ বাকরা (রা.) বর্ণিত হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) বলেছেন, কুরবানির দিন খুতবা দান সুন্নত। ইমাম নববী (র.) বলেছেন, শাফেয়ী মাযহাবের মতে হজে চার খুতবা– ১. ৭ই জিলহজে মক্কায় কা'বা গৃহের নিকটে ২. আরাফার দিন আরাফার মাঠে ৩. কুরবানির দিনের খুতবা এবং ৪. নফরের দিনে অর্থাৎ বিদায়কালীন খুতবা– এটা আইয়্যামে তাশরীকের দ্বিতীয় দিনে প্রদান করা হয়।

ইবনে কুদামা (র.) বলেছেন যে, ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, কুরবানির দিনে কোনো খুতবা নেই।

হানাফী মাযহাব মতে, হজে মোট তিনটি খুতবাই শরিয়তসম্মত। যথা– ১. জিলহজের ৭ম তারিখের খুতবা ২. আরাফার মাঠের খুতবা এবং ৩. ১১ই জিলহজে মিনায় খুতবা। –[আইনী]

মুযার গোত্রের রজব মাস : রজব মাস সম্পর্কে মুযার গোত্রের লোকেরা ছিল একান্তই স্পর্শকাতর। তুলনামূলক এ মাসটিকে তারা খুব বেশি সম্মান করত। এ কারণেই উক্ত মাসটিকে তাদের সাথে সংযোজন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ ضُلَّالًا -এর মর্মার্থ : কোনো কোনো রেওয়ায়াতে ضُلَّالًا -এর স্থলে كُفَّارًا বর্ণিত হয়েছে। পূর্ণ বাক্যটির অর্থ হলো, উল্লিখিত কাজ তিনটি হারাম। এতদসত্ত্বেও যদি কেউ এ কাজগুলো করে সে নিশ্চিত কাফেরদের সদৃশ কাজ করল। ফলে সে বিপথগামী বা কাফের হয়ে গেল। এ কাজগুলোকে জেনে করলে তো নিশ্চিত কাফের হবে।

قَوْلُهُ اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ -এর মর্মার্থ : আল্লাহর সমস্ত নবীই নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। নিজ নিজ উম্মতের কাছে আল্লাহর বিধান পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, এতদসত্ত্বেও কোনো কোনো নবীর উম্মত বিশেষ করে হযরত নূহ (আ.)-এর উম্মত কিয়ামতের দিন নিজেদের নবীর বিরুদ্ধে 'তাবলীগে দীন' তথা হেদায়েতের বাণী না পৌঁছানোর অভিযোগ তুলবে। কুরআনেও এ কথা উল্লেখ আছে। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মদীও যেন নিজেদের নবীর বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ উত্থাপনের অবকাশ না পায়, তাই নবী করীম ﷺ আল্লাহকে সাক্ষী রেখে উম্মত হতে এর স্বীকৃতি আদায় করেছেন। অবশ্য কোনো কোনো রেওয়ায়াতে اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ এ বাক্যটি তিনবার বর্ণিত হয়েছে।

وَعَنْ ٢٥٤٢ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ (رض) مَتٰى أَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ اِذَا رَمٰى اِمَامُكَ فَارْمِهِ فَاَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةَ فَقَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَاِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৫৪২. অনুবাদ : তাবেয়ী ওবরাহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কোন দিন কঙ্কর নিক্ষেপ করব? তিনি বললেন, যখন তোমার ইমাম নিক্ষেপ করবে তখন তুমিও নিক্ষেপ করবে। আমি তাকে পুনঃ একই মাসআলা জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, আমরা অপেক্ষা করতে থাকতাম, যখন সূর্য ঢলে পড়ত, তখন কঙ্কর নিক্ষেপ করতাম। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এখানে ইমাম বলতে কঙ্কর নিক্ষেপের সময় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে; কোনো এক মনীষীর উক্তি- مَنْ تَبِعَ عَالِمًا لَقِيَ اللّٰهَ سَالِمًا [যে ব্যক্তি কোনো আলেমের অনুসরণ করবে নিরাপদেই সে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করবে] এ কথার সমর্থন করে।

আল্লামা ইবনে হাজার আল-আসকালানী (র.) বলেন, এখানে ইমাম দ্বারা ইমাম আ'যম আবূ হানীফাই উদ্দেশ্য, যদি তিনি হজে উপস্থিত হন। অন্যথা আমীরে হজই উদ্দেশ্য।

وَعَنْ ٢٥٤٣ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّهُ كَانَ يَرْمِيْ جَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلٰى اِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتّٰى يُسْهِلَ فَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ طَوِيْلًا وَيَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطٰى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمٰى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَاْخُذُ بِذَاتِ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُوْمُ طَوِيْلًا ثُمَّ يَرْمِيْ جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْلُ هٰكَذَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৫৪৩. অনুবাদ : হযরত সালেম (র.) [তাঁর পিতা] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি নিকটবর্তী জামরায় [অর্থাৎ প্রথম জামরায়] সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন এবং প্রত্যেক কঙ্কর নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। অতঃপর কিছু সামনে অগ্রসর হয়ে নরম মাটিতে যেতেন এবং তথায় কিবলার দিকে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ দু'হাত তুলে দোয়া করতেন। তারপর মধ্যম জামরায় সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন। যখনই কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। অতঃপর বামদিকে কিছুটা অগ্রসর হয়ে নরম মাটিতে পৌঁছাতেন এবং কিবলামুখী দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ দু'হাত তুলে দোয়া করতেন। তারপর বাতনে ওয়াদী [খালি নিচু জমি] হতে জামরায়ে আকাবায় সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন, প্রত্যেক কঙ্কর নিক্ষেপটি কালে 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। কিন্তু এর নিকট দাঁড়াতেন না; বরং [গন্তব্যস্থলের দিকে] চলে যেতেন এবং বলতেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَانَ يَرْمِيْ جَمْرَةَ الدُّنْيَا-এর ব্যাখ্যা : এখানে دُنْيَا মূলত اَدْنٰى হতে অনুসৃত। অর্থ- নিকটতম। প্রকৃত ব্যাপার হলো নবী করীম ﷺ মিনায় 'মসজিদে খাইফের' নিকটেই অবস্থান করেছেন। প্রথম জামরার স্থান তাঁর অবস্থান জায়গা হতে অতি নিকটেই ছিল। তাই উক্ত জামরাকে 'জামরায়ে দুনিয়া' বলা হয়েছে। কঙ্কর নিক্ষেপ করার তারতীব বা ক্রমিকও অনুরূপ। যথা- প্রথম জামরা, তারপর দ্বিতীয় বা মধ্যম, অতঃপর তৃতীয় আকাবায়।

وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا اَىْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ **-এর মর্মার্থ :** 'তিনি জামরায়ে আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে এর নিকট দাঁড়াতেন না; বরং গন্তব্যস্থলের দিকে চলে যেতেন।' এখানে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, প্রথম জামরা ও মধ্য জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করার পর তিনি সেখানে দাঁড়াতেন ও দোয়া করতেন; কিন্তু জামরায় আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করার পর অবস্থান না করে তাড়াতাড়ি চলে যেতেন কেন?

এর জবাব হলো, এখানে জামরায়ে আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ দ্বারা যদি প্রথম দিন তথা দশম তারিখের কঙ্কর নিক্ষেপ উদ্দেশ্য হয়, তবে ঐ দিন তো শুধু এ জামরাতেই কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়, সুতরাং প্রথম ও মধ্যম জামরায় দাঁড়ানো বা না দাঁড়ানোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আর জামরায়ে আকাবায় ঐ দিন অবস্থান না করার কারণ তো স্পষ্ট। কেননা, ঐ দিন বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। যেমন– কুরবানি করা, মস্তক মুণ্ডানো ও মক্কায় গিয়ে তওয়াফে ইফাযা সম্পাদন করা ইত্যাদি।

আর যদি পরবর্তী দু'দিন তথা এগারো ও বারো তারিখের কঙ্কর নিক্ষেপ উদ্দেশ্য হয়, তবে এর উত্তর এই যে, প্রথম ও মধ্যম জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপস্থলের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে দোয়া করার সুযোগ ছিল। তাই উক্ত দু'জামরার কাছে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দোয়া করেছেন। কিন্তু তৃতীয় জামরা তথা জামরায়ে আকাবার পার্শ্বে দাঁড়াবার কোনো জায়গা ছিল না। তদুপরি অবস্থানকারী ব্যক্তিদের খুব বেশি ভিড় জমেছিল। তাই সেখানে দাঁড়িয়ে যদি দোয়া ও অবস্থান করতেন, তবে অন্যান্য লোকের চলাচলে বিঘ্ন ঘটত। আর এ কারণেই তিনি জামরায়ে আকাবায় দোয়া ও অবস্থান করা হতে বিরত রয়েছেন।

কঙ্কর নিক্ষেপে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা : কঙ্কর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সুন্নত। অর্থাৎ সর্বপ্রথম প্রথম জামরায় অতঃপর মধ্যম জামরায় এবং সর্বশেষে আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। এর ব্যতিক্রম করলে দম বা বিনিময় দিতে হবে না।

وَعَنْ ٢٥٤٤ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِىَ مِنًى مِنْ اَجْلِ سِقَايَتِهِ فَاَذِنَ لَهُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৪৪. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.) লোকদেরকে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে মিনার রাতগুলো মক্কায় যাপন করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন। রাসূল ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মিনার রাতসমূহ মক্কায় যাপন সম্পর্কে মতভেদ : আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলোতে মিনায় রাত যাপন সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ جُمْهُوْرِ اَئِمَّةٍ : জমহুর ইমামগণের মতে, মিনায় রাত যাপন ওয়াজিব। তারা অত্র হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করে বলেন, যদি মিনায় রাত যাপন ওয়াজিব না হতো তবে মক্কায় রাত যাপনের জন্যে হযরত আব্বাস (রা.) অনুমতি চাইতেন না। যখন অনুমতি চেয়েছেন তখন বুঝা যায় যে, এটা ওয়াজিব ছিল। নতুবা সুন্নত পরিত্যাগের জন্য অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন ছিল না।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) : ইমাম আ'যম (র.)-এর মতে, মিনায় রাত যাপন সুন্নত। ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ (র.)-এর এক অভিমত এরূপ। তাঁরাও আলোচ্য হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। যদি মিনায় রাত যাপন ওয়াজিব হতো তবে নিশ্চয় রাসূল ﷺ মিনা ত্যাগ করতে অনুমতি দিতেন না। অনুমতি দেওয়াতেই বুঝা গেল যে, এটা সুন্নত ছিল।

জমহূর ওলামায়ে কেরাম যে বলেছেন সুন্নতের জন্যে অনুমতির প্রয়োজন নেই, অতএব তা ওয়াজিব হবে। এ যুক্তির জবাবে বলা হয়েছে, সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে সুন্নতের বিপরীত কোনো কার্য করা অসম্ভব ও কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল। বিশেষভাবে মিনায় রাত যাপন ত্যাগ করার কারণে নবী করীম ﷺ -এর খেদমত হতে বঞ্চিত হচ্ছেন, সুন্নত ত্যাগের এ ত্রুটি হতে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে হযরত আব্বাস (রা.)-এর অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। এতে সুন্নত না হওয়া প্রমাণিত হয় না।

হিদায়া গ্রন্থে আছে যে, যদি কেউ মিনা ব্যতীত অন্য কোথায়ও রাত যাপন করে এবং কঙ্কর নিক্ষেপে উপস্থিত থাকে তবে তার উপরে কোনো 'দম' ওয়াজিব হবে না। তবে নবী করীম ﷺ -এর কার্য অনুসরণ না করার কারণে এটা মাকরূহ। হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনকালে কেউ মিনায় রাত যাপন ত্যাগ করলে তাকে শাস্তি দিতেন। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, পানি পান করানোর প্রয়োজনে বা যুক্তিসঙ্গত কোনো ওজরে মিনায় রাত যাপন ত্যাগ করা জায়েজ।

কুরাইশদের বিভিন্ন শাখা হাজীদের খেদমতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করত। বনী হাশিমের দায়িত্ব ছিল যমযম কূপ হতে হাজীকে পানি পান করানো। আর এ দায়িত্ব অর্পিত ছিল হযরত আব্বাস (রা.)-এর উপর। তাই তিনি মিনা ত্যাগের অনুমতি চেয়েছেন। আর ওজরের কারণেই তাঁকে সুন্নতের বরখেলাপ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

দু'রমী [কঙ্কর নিক্ষেপ] একত্রিকরণ : যদি কেউ মিনায় রাত্রি যাপন করে চলে আসতে ইচ্ছা করে তবে দু'দিনের রমী একদিনেই সমাধা করতে চাইলে এর দুটি অবস্থা রয়েছে।

১. কুরবানির দিনে শুধু জামরায়ে আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ [রমী] করে তার পরদিন ১১ই জিলহজ্জ তারিখে একাদশ ও দ্বাদশ এ দু'দিনের রমী একত্র করে মিনা হতে চলে আসবে। এটাকে جَمْع تَقْدِيْم বা অগ্রে একত্রিকরণ বলা হয়। এটা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ নেই। কেননা, কোনো ব্যক্তি তার উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হওয়ার পূর্বেই তা কাজা করতে পারে না। যখনই তার উপরে কিছু ওয়াজিব হয় এবং সে তা হারায় তবেই কাজার প্রশ্ন আসে।

২. ১১ ও ১২ই জিলহজ দু'দিনের নির্ধারিত রমী ১২ তারিখে একত্রে করবে। এটাকে جَمْع تَاخِيْر বা বিলম্বে একত্রিকরণ বলা হয়। এটা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ।

দ্বিতীয় নফরের দিন অর্থাৎ জিলহজের ১৩ তারিখে যদি মিনায় অবস্থান করে তবে সে দিনও রমী করতে হবে। আর যদি ১২ তারিখে জমে' তাখীর করে চলে আসে তবে ১৩ তারিখের রমী আবশ্যক হবে না।

হযরত আব্বাস (রা.)-এর মক্কায় রাত যাপন করার কারণ : কুরাইশদের বিভিন্ন শাখা গোত্র হাজীদের বিভিন্ন খেদমতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করত। বনূ হাশিমের দায়িত্ব ছিল হাজীদেরকে যমযমের পানি পান করানো। আর এ দায়িত্ব অর্পিত ছিল হযরত আব্বাস (রা.)-এঁর উপর। তাই তিনি মিনা ত্যাগের অনুমতি চেয়েছিলেন। ফলে এ ওজরের কারণে তাঁকে সুন্নতের বরখেলাফ কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, নবী করীম ﷺ যে গোত্রের যাকে যে কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন, পরবর্তীকালে তা বংশানুক্রমে তাদের মধ্যেই সীমিত ছিল। যে কোনো জালিম শাসকও এতে হস্তক্ষেপ করেনি। অবশ্য বর্তমানে সেই কাজগুলো সৌদী সরকারের নিয়ন্ত্রণে।

২৫৪৫ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقٰى فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلٰى أُمِّكَ فَاْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا فَقَالَ اسْقِنِيْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُوْنَ أَيْدِيَهُمْ فِيْهِ قَالَ اسْقِنِيْ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ أَتٰى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُوْنَ وَيَعْمَلُوْنَ فِيْهَا فَقَالَ اعْمَلُوْا فَإِنَّكُمْ عَلٰى عَمَلٍ صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوْا لَنَزَلْتُ حَتّٰى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلٰى هٰذِهٖ وَأَشَارَ إِلٰى عَاتِقِهٖ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৫৪৫. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি পান করানো বিভাগে আসলেন এবং পানি পান করতে চাইলেন। তখন [আমার পিতা] হযরত আব্বাস (রা.) [আমার ভাইকে] বললেন, ফযল! তোমার মায়ের কাছে যাও এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্যে তার কাছ হতে খাবার পানি এনে দাও। রাসূল ﷺ বললেন, আমাকে [এখান হতেই] পান করান। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা এতে হাত দেয়। রাসূল ﷺ বললেন– [তবু] আমাকে [এখান হতেই] পান করান। তখন তিনি এটা হতেই পান করলেন। অতঃপর যমযম কূপের কাছে আসলেন। এ সময় তারা লোকদেরকে পানি পান করাচ্ছিল এবং এতে খুব পরিশ্রম করছিল। তখন তিনি [রাসূল ﷺ] বললেন, কাজ করে যাও। কেননা, তোমরা নেক কাজে আছ। অতঃপর বললেন, [আমার দেখাদেখি লোকজন যদি] তোমাদেরকে পরাস্ত করে দেওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তবে নিশ্চয় আমি সওয়ারি হতে অবতরণ করতাম এবং আমি নিজেই এর উপর বালতির রশি নিতাম। [রাবী বলেন,] এটা বলে রাসূল ﷺ নিজ কাঁধের দিকে ইঙ্গিত করলেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

যমযমের পানি পান করার হুকুম : যমযমের পানি পান করা যে কোনো অবস্থাতেই মোস্তাহাব, বিশেষভাবে তওয়াফুল ইফাযার পর। তবে এ পানি দাঁড়িয়ে পান করাই উত্তম। যমযম কূপটি পর্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে ছিল। যথা– ১. কুসাঈ ইবনে কিলাব ২. আবদু মানাফ ইবনে কুসাঈ ৩. হাশিম ইবনে আবদু মানাফ ৪. আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ৫. হযরত আব্বাস (রা.) ৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ৭. হযরত আলী ইবনে আবদুল্লাহ (র.)। অতঃপর এ ধারা পর্যায়ক্রমে তাঁর বংশের মধ্যেই চলে এসেছে।

وَعَنْ ٢٥٤٦ أَنَسٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৫৪৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামাজ পড়লেন। অতঃপর বাতনে মুহাস্‌সাবে সামান্য ঘুমালেন। তারপর সওয়ারিতে চড়ে বায়তুল্লাহর দিকে রওয়ানা করলেন এবং এর [বিদায়ী] তওয়াফ করলেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মুহাসসাব নামক স্থানে অবতরণ সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : মুহাস্‌সাব, আবতাহ, বাতহা ও খাইফে বনী কিনানা। এ সবগুলো একই জায়গার বিভিন্ন নাম। তবে মুহাস্‌সাব বলতে এখানে মক্কা ও মিনার মধ্যখানে একটি জায়গা যা মক্কার কবরস্থান সংলগ্ন কঙ্করাকীর্ণ স্থান। মিনা হতে সর্বশেষ আসা-যাওয়ার পথে উক্ত স্থানে অবতরণ করা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.), হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়ের (রা.) ও হযরত আয়েশা (রা.) প্রমুখের মতে, মুহাস্‌সাবে অবতরণ করা সুন্নত। অর্থাৎ হজ কার্যক্রমের কোনো কাজই এখানে নেই; বরং কিছুটা আরাম করার জন্যে রাসূল ﷺ এখানে অবতরণ করেছিলেন। যেমন– সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন– মুহাস্‌সাবে [হজের করণীয়] কিছুই নেই। তবে এটা একটি মনযিল মাত্র, যেখানে নবী করীম ﷺ নিজের প্রস্থানের সুবিধার জন্যে অবতরণ করেছিলেন।

হাফেজ তাকীউদ্দীন মানযারী (র.) বলেছেন যে, জমহুর আলিম ও ইমামের মতে, মুহাস্‌সাবে অবতরণ করা সুন্নত। যেমন–

১. সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ যখন মিনা হতে প্রস্থান করতে ইচ্ছা করলেন, বললেন– আমরা ইনশাআল্লাহ আগামীকাল খায়ফে বনী কিনানায় [অর্থাৎ মুহাস্‌সাবে] অবতরণ করব।

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও ওমর (রা.) প্রমুখ মুহাস্‌সাবে অবতরণ করতেন।

৩. মুসলিম শরীফে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) মুহাস্‌সাবে অবতরণকে সুন্নত মনে করতেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত আয়েশা (রা.) প্রমুখ যে মুহাস্‌সাবে অবতরণকে সুন্নত হওয়া অস্বীকার করেছেন এর অর্থ হলো, তা ত্যাগ করলে 'দম' আবশ্যক হবে না। কিন্তু যেহেতু রাসূল ﷺ হতে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত যে, তিনি মুহাস্‌সাবে অবতরণ করেছিলেন। যদিও তা হজের নির্ধারিত কার্যক্রম ও ইবাদত হিসেবে গণ্য না হয় তবুও নবী করীম ﷺ -এর অনুসরণ-অনুকরণ হিসেবে তা উত্তম ও সুন্নত। যেহেতু খুলাফায়ে রাশেদীনের কার্যক্রমও এরূপই ছিল। অর্থাৎ তাঁরাও মুহাস্‌সাবে অবতরণ করতেন। সুতরাং এটা নিঃসন্দেহে সুন্নত।

وَعَنْ ٢٥٤٧ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ (رضـ) قُلْتُ اَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى قَالَ فَاَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْاَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ اُمَرَاؤُكَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৪৭. অনুবাদ : তাবিয়ী আবদুল আযীয ইবনে রুফাই হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে এ বিষয় সম্পর্কে বলুন, যা আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে জেনেছেন আর তা হলো তিনি তারবিয়ার দিন [৮ই জিলহজ] কোথায় জোহরের নামাজ পড়েছিলেন? আনাস বললেন, মিনায়। [রাবী আবদুল আযীয] জিজ্ঞেস করলেন, নফরের দিন [১৩ জিলহজ] কোথায় আসরের নামাজ পড়েছিলেন? তিনি বললেন, আবতাহে। অতঃপর তিনি [আনাস] বললেন, তোমার আমিরগণ যেভাবে করেন তুমিও সেভাবেই করবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِفْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ اُمَرَاؤُكَ-এর মর্মার্থ : হযরত আনাস (রা.) বললেন, তোমার আমিরগণ যেভাবে করবেন তুমিও সেভাবে করবে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে তোমরা আমিরদের অনুসরণ করবে; কোনো অবস্থাতেই তাদের বিরোধিতা করবে না। তারা যদি অবতরণ করেন, তবে তোমরাও করবে। আর তারা যদি অবতরণ পরিহার করেন, তবে তোমরাও পরিহার করবে। কেননা, তুমি যদি আমিরদের কাজের বিরোধিতা কর, তবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। হাদীসের উল্লিখিত অংশ দ্বারা বুঝা যায়, আবতাহ [মুহাসসাব]-এ অবতরণ বা অবস্থান করা হজের অংশ নয়।

وَعَنْ ٢٥٤٨ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ نُزُوْلُ الْاَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ اِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَنَّهُ كَانَ اَسْمَحَ لِخُرُوْجِهِ اِذَا خَرَجَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৪৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবতাহে অবতরণ সুন্নত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এজন্যে তথায় অবতরণ করতেন যে, যখন তিনি বের হতেন এটা তাঁর পক্ষে সুবিধাজনক হতো। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, "এখানে অবতরণ করা সুন্নত নয়"। এ সুন্নত অর্থ– সুন্নতে মুয়াক্কাদা বা হজের অংশ নয়। অন্যথা নবী করীম ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীন তথায় অবস্থান করতেন। এ হিসেবে সুন্নত। আর এখানে বের হতেন মানে মিনা হতে মক্কার পথে অথবা মক্কা হতে মদিনার পথে যখন বের হতেন, তখন এ পথে গমন করতেন।

وَعَنْهَا ٢٥٤٩ قَالَتْ اَحْرَمْتُ مِنَ التَّنْعِيْمِ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْتُ فَقَضَيْتُ عُمْرَتِيْ وَانْتَظَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْاَبْطَحِ حَتّٰى فَرَغْتُ فَاَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيْلِ فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ هٰذَا الْحَدِيْثُ مَا وَجَدْتُهُ بِرِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ بَلْ بِرِوَايَةِ اَبِيْ دَاوُدَ مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِيْرٍ فِيْ اٰخِرِهِ -

২৫৪৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তানয়ীম হতে ওমরার ইহরাম বাঁধলাম এবং মক্কায় প্রবেশ করে আমার কাজা ওমরা সমাধা করলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জন্যে আবতাহে অপেক্ষা করতে থাকলেন যতক্ষণ পর্যন্ত আমি [ওমরা সম্পন্ন করে] অবসর না হলাম। তারপর তিনি লোকদেরকে [মদিনার উদ্দেশ্যে] রওয়ানা করতে আদেশ করলেন এবং নিজে মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন এবং বায়তুল্লায় পৌঁছে ফজরের পূর্বেই [বিদায়ী] তওয়াফ করলেন। অতঃপর মদিনার দিকে যাত্রা করলেন।

[মিশকাত গ্রন্থকার বলেন, আমি এ হাদীসকে বুখারী ও মুসলিমে পাইনি; বরং শেষভাগে বর্ণনার সামান্য আবূ দাউদে পেয়েছি।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তানঈম হতে আয়েশার ওমরা : বিদায় হজের সময় মক্কায় প্রবেশের পূর্বেই হযরত আয়েশা (রা.) ঋতুমতী হয়েছিলেন। ফলে ওমরার সব কাজ তিনি আদায় করতে পারেননি। হজ শেষে তিনি নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশে তাঁর ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকরকে সাথে নিয়ে তানঈম হতে ইহরাম বেঁধে এসে বাকি কাজগুলো আদায় করেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথি-সঙ্গীদের নিয়ে হারামের বাইরে মুহাস্সাবে তাঁদের আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন।

وَعَنْ ٢٥٥٠ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُوْنَ فِىْ كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَنْفِرَنَّ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ اٰخِرُ عَهْدِهٖ بِالْبَيْتِ اِلَّا اَنَّهٗ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৫০. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [হজ শেষে] লোক চতুর্দিকে চলে যেতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের কেউই শেষবারের মতো বায়তুল্লাহ শরীফের সাথে সাক্ষাৎ না করে প্রস্থান করবে না। তবে এটা ঋতুমতীদের হতে বাদ দেওয়া হলো [অর্থাৎ ঋতুমতী মহিলাকে বিদায়ী তওয়াফ হতে বিরত থাকার অনুমতি দিলেন]। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তওয়াফে বিদার হুকুম : জমহুরে ওলামায়ে কেরামের মতে, অত্র হাদীসের প্রেক্ষিতে বহিরাগত হাজীদের জন্যে বিদায়ী তওয়াফ করা ওয়াজিব। এটা না করলে 'দম' দিতে হবে। কিন্তু ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.) বলেন, কারো জন্যে ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নত। আর এটা ঋতুমতী মহিলাদের জন্য ওয়াজিব নয়, যাতে দম দিতে হবে।

وَعَنْ ٢٥٥١ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَقَالَتْ مَا اَرَانِىْ اِلَّا حَابِسَتَكُمْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ عَقْرٰى حَلْقٰى اَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قِيْلَ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِىْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৫১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নফরের রাতেই বিবি সফিয়্যা ঋতুমতী হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, আমার মনে হয় আমি আপনাদেরকে আটকে ফেলেছি। [এটা শুনে] নবী করীম ﷺ বললেন− ধ্বংস হোক, নিপাত যাক। সেকি কুরবানির দিন তওয়াফ [ইফাযা] করেছে? বলা হলো, হ্যাঁ। রাসূল ﷺ বললেন, তাহলে রওয়ানা হও। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَلْقٰى ও عَقْرٰى -এর বিশ্লেষণ : حَلْقٰى ও عَقْرٰى শব্দ দু'টি فَعْلٰى ওজনে তানবীন ব্যতীত বর্ণিত হয়েছে। প্রকাশ্যে তা عَقْرًا وَحَلْقًا উভয়ই তানবীনযোগে পূর্ণ বাক্যটি নিম্নরূপ− عَقَرَهَا اللّٰهُ عَقْرًا وَحَلَقَهَا اللّٰهُ حَلْقًا

عَقْرٌ অর্থ− আহত বা ক্ষত করা, হত্যা করা, ধ্বংস হওয়া এবং حَلْقٌ অর্থ− কোনো কিছু কণ্ঠনালীতে প্রবেশ করা। আপাত দৃষ্টিতে শব্দটিতে অভিশাপ বুঝা যায়। কিন্তু এখানে অভিশাপ উদ্দেশ্য নয়; বরং আরবগণের এ ধরনের কিছু বাকধারা কথায় মাধুর্য সৃষ্টির জন্য বলার অভ্যাস প্রচলিত ছিল।

আসমায়ী (র.) বলেছেন, শব্দ দুটি বিস্ময় প্রকাশের জন্যে ব্যবহৃত হয়।

কেউ কেউ বলেছেন, শব্দ দুটি মহিলাদের বিশেষণ। অর্থাৎ আরবদের বিশ্বাস মতে− "মহিলারা জাতির গলগ্রহ এবং ধ্বংস ও পতনের কারণ"। বিশেষ করে শব্দ দুটি আকস্মিক বিপদের সময় বলা হতো। নবী করীম ﷺ-এর দ্বারা আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বিপদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ সফিয়্যার কারণে আমরা অসুবিধায় পড়েছি।

বিদায়ী তওয়াফ সম্পর্কে মতভেদ : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র.)-এর মতে, বিদায়ী তওয়াফ সুন্নত। কেননা, তওয়াফুল বিদা ও তওয়াফে কুদূম বহিরাগত হাজীরাই করে থাকেন; মক্কাবাসীগণ করেন না। হজের ওয়াজিব আমলগুলোর ব্যাপারে মক্কার অধিবাসী হোক বা বহিরাগত হোক, সকলে সমান। এ ক্ষেত্রে যেহেতু ব্যবধান হয়ে গিয়েছে যে, বিদায়ী তওয়াফ বহিরাগতদেরকে করতে হয়। এতে বুঝা গেল যে, এ তওয়াফ সুন্নত।

ইমাম আযম ও আহমদ (র.)-এর মতে, বিদায়ী তওয়াফ মক্কাবাসী ও ঋতুমতী মহিলারা ব্যতীত সকলের উপর ওয়াজিব; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এ বায়তুল্লাহ শরীফের হজ করবে সে যেন বায়তুল্লাহর শেষ তওয়াফ করে, ঋতুমতী মহিলাদেরকে এ ব্যাপারে অবকাশ দেওয়া হলো। -[বুখারী ও মুসলিম]

ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র.) প্রমুখের যুক্তির জবাবে বলা হয় যে, সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ হাদীস হতে যখন বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব প্রমাণিত হয়েছে, তখন এর মোকাবিলায় কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٥٥٢ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اَيُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوْا يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اَلَا لَا يَجْنِيْ جَانٍ عَلٰى نَفْسِهٖ اَلَا لَا يَجْنِيْ جَانٍ عَلٰى وَلَدِهٖ وَلَا مَوْلُوْدٌ عَلٰى وَالِدِهٖ اَلَا وَاِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ اَيِسَ اَنْ يُعْبَدَ فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اَبَدًا وَلٰكِنْ سَتَكُوْنُ لَهٗ طَاعَةٌ فِيْمَا تَحْتَقِرُوْنَ مِنْ اَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضٰى بِهٖ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهٗ)

২৫৫২. **অনুবাদ :** হযরত আমর ইবনে আহওয়াস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি, বিদায় হজে রাসূলাল্লাহ ﷺ বলেছেন– হে লোক সকল! এটা কোনদিন? তারা বললেন, এটা বড় হজের দিন। তখন তিনি বললেন, আমাদের একের জান-মাল ও ইজ্জত অপরের জন্যে তেমনি হারাম বা পবিত্র যেমন তোমাদের এ দিন তোমাদের এ শহরে পবিত্র। সাবধান! কোনো অপরাধী যেন নিজের উপর জুলুম না করে। সাবধান! কোনো অপরাধী যেন নিজের পুত্রের প্রতি এবং কোনো পুত্র যেন নিজের পিতার প্রতি জুলুম না করে। সাবধান! শয়তান এ মর্মে চিরতরে নিরাশ হয়েছে যে, তোমাদের এ শহরে কখনো তার পূজা করা হবে; কিন্তু তোমরা যে সমস্ত কাজ তুচ্ছ মনে কর সে সমস্ত কাজের মাধ্যমে তার তাঁবেদারী হবে, আর তাতে সে খুশিও হবে। -[ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী]

ইমাম তিরমিযী (র.) এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ **-এর ব্যাখ্যা :** এখানে 'হজ্জে আকবার' দ্বারা ফরজ হজকে বুঝানো হয়েছে। আর হজ্জে আসগার বা ছোট হজ হলো– ওমরা।

আমাদের সমাজে এ কথাটি সর্বত্র প্রচলিত আছে যে, "জুমার দিন হজ হলে তাকে হজ্জে আকবার বলা হয় এবং তাতে ৭০ [সত্তর] হজের সওয়াব পাওয়া যায়।" এ প্রসঙ্গে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (র.) বলেছেন– এ কথাটি ভিত্তিহীন এবং সত্তর হজের ছওয়াবের কথার সমর্থনে যে হাদীসটির কথা বলা হয় তা মাওযূ' বা বানোয়াট। তবে জুমার দিন হজ হলে যে অধিক ছওয়াব পাওয়া যাবে, তাতে সন্দেহ নেই। মহানবী ﷺ -এর বিদায় হজও জুমার দিন হয়েছিল। অবশ্য মোল্লা আলী কারী (র.) প্রচলিত কথাটিকে এমনিতে বাদ দিতে চান না। এ সম্পর্কে তিনি একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাও রচনা করেছেন।

لَا يَجْنِيْ جَانٍ عَلٰى نَفْسِهٖ **-এর মর্মার্থ :** "কোনো অপরাধী যেন নিজের উপর জুলুম না করে।" এ উক্তিটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে। যথা–

ক. তোমরা পরস্পর কথা কাটাকাটি করো না।

খ. তোমরা অন্যাকে হত্যা করে কিসাসস্বরূপ নিজে নিহত হওয়ার কারণ হয়ো না। এখানে لَا يَجْنِيْ শব্দটি আকৃতিগতভাবে "নফী" হলেও অর্থগতভাবে "নাহী"। যেমন, আল্লাহর বাণী– لَا يَمَسُّهٗ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ -এর মধ্যে নফীটি "নাহী"-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

لَا يَجْنِىْ جَانٍ عَلٰى وَلَدِهٖ وَلَا مَوْلُوْدٌ عَلٰى وَالِدِهٖ -এর মর্মার্থ : কোনো অপরাধী যেন নিজের পুত্রের উপর এবং কোনো পুত্র যেন নিজের পিতার উপর জুলুম না করে। উক্তিটির বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। যেমন–

ক. এখানে মূলত পিতাকে পুত্রের উপর এবং পুত্রকে পিতার উপর জুলুম বা অন্যায় আচরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে এখানে বিশেষভাবে পিতা-পুত্রের কথা উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পিতার প্রতি পুত্রের অন্যায় আচরণ এবং পুত্রের প্রতি পিতার অন্যায় আচরণ সবচেয়ে ঘৃণিত কাজ।

খ. অথবা, উল্লিখিত বাক্যটি لَا يَجْنِىْ جَانٍ عَلٰى نَفْسِهٖ -এর তাকীদস্বরূপ নেওয়া হয়েছে। কেননা, তখনকার দিনে আরবদের অভ্যাস ছিল যে, কোনো ব্যক্তির অপরাধে তার নিকট আত্মীয়দের কারো উপর জুলুম করা হতো। তবে এখানে পিতা ও পুত্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পিতার অপরাধে পুত্রের উপর বা পুত্রের অপরাধে পিতার উপরই যখন জুলুম করা যাবে না, তখন অন্যের বেলায় তো মোটেই করা যাবে না।

وَعَنْ ٢٥٥٣ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ (رض) قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى حِيْنَ ارْتَفَعَ الضُّحٰى عَلٰى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ وَعَلِيٌّ يُعَبِّرُ عَنْهُ وَالنَّاسُ بَيْنَ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৫৫৩. অনুবাদ : হযরত রাফি' ইবনে আমর মুযানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সকালের সূর্য উপরে উঠেছিল তখন মিনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে লাল খচ্চরে আরোহণ করে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে দেখলাম এবং হযরত আলী (রা.) তা তাঁর পক্ষ হতে [উচ্চৈঃস্বরে] ব্যাখ্যা করছিলেন। আর তখন লোকদের কেউ কেউ দাঁড়ানো ও কেউ কেউ বসা ছিল। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٢٥٥٤ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ اِلَى اللَّيْلِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৫৫৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তওয়াফে জিয়ারত কুরবানির দিন রাত পর্যন্ত দেরি করেছেন। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তওয়াফে জিয়ারত সম্পর্কে দু হাদীসের দ্বন্দ্ব নিরসন : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী করীম ﷺ দশ তারিখের তওয়াফে জিয়ারত বা ইফাযা সে দিনের শেষের রাতেই করেছেন। অথচ অন্যান্য সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি উক্ত তওয়াফ সেদিন জোহরের পূর্বেই আদায় করেছেন এবং মিনায় ফিরে এসে জোহরের নামাজ পড়েছেন। অবশ্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, জোহর মক্কায় পড়েছেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, তিনি তওয়াফ দ্বিপ্রহরের পূর্বেই সমাধা করেছেন।

এর জবাবে বলা যায় যে, আলোচ্য হাদীসটি সহীহ নয়। কেননা, এর অন্যতম রাবী আবূ যুবাইর মুহাদ্দেসীনদের কাছে মুদাল্লিস হিসেবে প্রসিদ্ধ। সুতরাং তার বর্ণিত (مُعَنْعَنْ) হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। অথবা হাদীসে বর্ণিত "রাত পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছেন", এর মানে হলো– রাত পর্যন্ত পিছিয়ে আদায় করাকে জায়েজ করেছেন। অবশ্য উক্ত তওয়াফ দশ তারিখ জোহরের পূর্বে আদায় করা সুন্নত।

وَعَنْ ٢٥٥٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِى السَّبْعِ الَّذِىْ اَفَاضَ فِيْهِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৫৫৫. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ তওয়াফে ইফাযার [তওয়াফে জিয়ারতের] সাত চক্কর 'রমল' [জোর কদমে চলা] করেননি। –[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

যে তওয়াফের পরে সায়ী নেই সে তওয়াফের পরে রমল নেই। উল্লিখিত হাদীস হতে প্রমাণিত হয় যে, তাওয়াফে ইফাযার পরে রমল না থাকার কারণে মহানবী ﷺ এ তাওয়াফে রমল করেননি।

وَعَنْ ٢٥٥٦ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا رَمٰى اَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهٗ كُلُّ شَىْءٍ اِلَّا النِّسَاءَ - (رَوَاهُ فِى شَرْحِ السُّنَّةِ وَقَالَ اِسْنَادُهٗ ضَعِيْفٌ وَفِىْ رِوَايَةِ اَحْمَدَ وَالنَّسَائِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهٗ كُلُّ شَىْءٍ اِلَّا النِّسَاءَ)

২৫৫৬. **অনুবাদ** : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– যখন তোমাদের কেউ জামরায়ে আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ [সম্পন্ন] করবে তার জন্যে স্ত্রী ছাড়া সবকিছু হালাল হয়ে যাবে। [ইমাম বাগবী এটা "শরহুস সুন্নায়" বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এর সনদ দুর্বল।

আহমদ ও নাসায়ী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, যখন সে জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করল তার জন্যে স্ত্রী সহবাস ব্যতীত সকল কিছু হালাল হয়ে গেল।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীসে যদিও বলা হয়েছে যে, কঙ্কর নিক্ষেপের পর স্ত্রীসহবাস ব্যতীত অন্যান্য সব কিছু হালাল হয়ে যায়, মূলত তা সঠিক নয়; বরং অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'মাথা মুড়ানো হলে'। অতএব হানাফী মাযহাব মতে, মাথা মুড়ানোর পূর্বে হালাল হবে না। বর্ণিত হাদীসটি রাবী সংক্ষেপ করেছেন।

وَعَنْهَا ٢٥٥٧ قَالَتْ اَفَاضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اٰخِرِ يَوْمِهٖ حِيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِىَ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ يَرْمِى الْجَمْرَةَ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الْاُوْلٰى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيْلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِى الثَّالِثَةَ فَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৫৫৭. **অনুবাদ** : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [কুরবানির] দিনের শেষার্ধে জোহরের নামাজ পড়ে তওয়াফে জিয়ারত [ইফাযা] করলেন। অতঃপর মিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তথায় তাশরীকের দিনগুলো অবস্থান করলেন। এ সময় তিনি জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন যখন সূর্য হেলে পড়ত, আর প্রত্যেক জামরায় সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন এবং প্রত্যেক কঙ্কর মারার সাথে সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলতেন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় জামরার নিকট দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন এবং আল্লাহর কাছে অনুনয়-বিনয় করতেন; কিন্তু তৃতীয় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে তথায় অপেক্ষা করতেন না। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী করীম ﷺ মিনায় জোহরের নামাজের পরে শেষ বেলায় তওয়াফে ইফাযা করার উদ্দেশ্যে মক্কায় গিয়েছেন। অথচ অন্যান্য সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি জোহরের পূর্বেই দশ তারিখে তওয়াফে ইফাযা সম্পাদন করেছেন। সুতরাং ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্য যে, এটা দশ তারিখের তওয়াফ নয়; বরং আইয়ামে তাশরীকের অন্য কোনো দিন হবে। তবে অধিকাংশের অভিমত হলো এটা আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিন, যে দিন তিনি মিনায় জোহরের নামাজ পড়ে বিবিদের সাথে মিনার অবস্থান ত্যাগ করে শেষ বেলায় মক্কায় এসেছেন।

وَعَنْ ٢٥٥٨ اَبِى الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِرِعَاءِ الْاِبِلِ فِى الْبَيْتُوْتَةِ اَنْ يَرْمُوْا يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَجْمَعُوْا رَمْىَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَيَرْمُوْهُ فِىْ اَحَدِهِمَا - (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ)

২৫৫৮. **অনুবাদ** : হযরত আবুল বাদ্দাহ তাঁর পিতা আসিম ইবনে আদী (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ উট চালকদেরকে মিনায় রাত যাপন না করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং কুরবানির দিন [ঠিকমতো জামরাতুল আকাবায়] কঙ্কর নিক্ষেপ করতে, তারপর কুরবানির দিনের পরে দু'দিনের কঙ্কর একত্র করে দু'দিনের একদিনে নিক্ষেপ করতে [অনুমতি দিয়েছিলেন]।

–[মালেক, নাসায়ী ও তিরমিযী]

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, হাদীসটি সহীহ।

بَابُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
পরিচ্ছেদ : যা হতে মুহরিম বেঁচে থাকবে

হজ বা ওমরা পালনকারী ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার সাথে সাথে মুহরিমের উপর এক ধরনের পোশাক ব্যতীত অন্যান্য পোশাক-পরিচ্ছদ এবং কিছু নির্দিষ্ট কাজকর্ম হারাম হয়ে যায়। একে শরিয়তের পরিভাষায় মামনূআতে ইহরাম বা মাহযূরাতে ইহরাম বলে। বিশেষ করে মুহরিমের পক্ষে সেলাইকৃত কাপড় ও রঙিন পোশাক পরিধান করা নিষেধ। আলোচ্য পরিচ্ছেদে মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় কোন কাজ করতে পারবে না এবং কোন কাজ হতে বেঁচে চলতে হবে, এ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٥٥٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا يَلْبِسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ لَا تَلْبِسُوا الْقَمِيْصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ اِلَّا اَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَيَلْبِسُ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبِسُوْا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَ زَادَ الْبُخَارِيُّ فِيْ رِوَايَةٍ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبِسُ الْقُفَّازَيْنِ.

২৫৫৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল, মুহরিম ব্যক্তি কোন ধরনের পোশাক পরিধান করবে? রাসূল ﷺ বললেন, জামা পরবে না, পাগড়ি বাঁধবে না, পাজামা পরবে না, টুপি পরবে না, মোজা পরবে না, তবে যদি কারো জুতা না জোটে সে যেন মোজা পরে এবং পায়ের গোড়ালির নিচ হতে মোজাদ্বয় কেটে ফেলে এবং তোমরা এমন কোনো কাপড় পরিধান করবে না, যাতে জাফরানের রং এবং ওর্সের রং রয়েছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

ইমাম বুখারী (র.) তাঁর বর্ণনায় বর্ধিত করেছেন– "এবং ইহরামকারিণী মহিলা বোরকা পরবে না এবং দাস্তানাও পরবে না।"

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَ زَادَ الْبُخَارِيُّ فِيْ رِوَايَةٍ : আর ইমাম বুখারী তাঁর বর্ণনায় এটাও বর্ধিত করেছেন যে, وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ইহরামকারিণী মহিলা বোরকা পরবে না وَلَا تَلْبِسُ الْقُفَّازَيْنِ এবং হাত মোজাদ্বয়ও পরবে না।

প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যকার অসামঞ্জস্যের সমাধান : রাসূল ﷺ -কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! মুহরিম ব্যক্তি কোন ধরনের পোশাক পরিধান করবে? রাসূল ﷺ উত্তরে সেসব পোশাকের কথা উল্লেখ করলেন, যেগুলো মুহরিম ব্যক্তি পরিধান করতে পারবে না। সুতরাং রাসূল ﷺ প্রশ্নানুযায়ী উত্তর না দেওয়ার কারণ কি? এ ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা পেশ করেছেন–

১. বৈধ পরিধেয় পোশাকের সংখ্যা অজস্র বা অগণিত, তাই রাসূল ﷺ উত্তরকে সংক্ষিপ্ত করার জন্যে শুধুমাত্র যেগুলো নিষিদ্ধ সেগুলোর কথা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এটা তাঁর বিরাট বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

২. রাসূল ﷺ -এর উত্তর দ্বারা যদিও প্রত্যক্ষভাবে নিষিদ্ধ কাপড়ের তালিকা পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে পরোক্ষভাবে অনুমোদিত কাপড়ের তালিকাও রয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, হাদীসে বর্ণিত কাপড়গুলো ব্যতীত অন্যগুলো মুহরিমের জন্যে পরা বৈধ।

৩. অথবা, এ ধরনের উত্তরদানের মধ্যে আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রের উন্নত ভাষণ প্রক্রিয়া সমর্থিত হয়। আল্লাহ তা'আলাও পবিত্র কুরআন মাজীদে এ ধরনের উত্তর পরিবেশন করেছেন।

৪. অথবা, রাসূল ﷺ "اَلْاِجَابَةُ عَلٰى اُسْلُوْبِ الْحَكِيْمِ" হিসেবে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আল্লাহর কালামেও এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

৫. অথবা, প্রশ্নকারীর প্রশ্নের মাঝে একটি "لَا" উহ্য রয়েছে। মূল বাক্য হবে এভাবে– "اِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ" সুতরাং প্রশ্নানুযায়ী উত্তর দেওয়া হয়েছে।

৬. অথবা, এরূপ উত্তর দিয়ে রাসূল ﷺ একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, প্রশ্নকারীর উচিত ছিল এভাবে প্রশ্ন করা "مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ" হে আল্লাহর রাসূল! মুহরিম ব্যক্তি কোন ধরনের কাপড় পরতে পারবে না?

اَلْبَرَانِسُ শব্দের তাহকীক : اَلْبَرَانِسُ শব্দটি اَلْبُرْنُسُ-এর বহুবচন। অভিধানে এর অর্থ ব্যক্ত করা হয়েছে–

১. قَلَنْسُوَةٌ عَظِيْمَةٌ বা বড় টুপি।

২. قَلَنْسُوَةٌ طَوِيْلَةٌ বা লম্বা টুপি।

৩. هُوَ كُلُّ ثَوْبٍ رَأْسُهُ مِنْهُ يَلْتَزِقُ বা এমন কাপড় যা দ্বারা মাথা ঢেকে রাখা যায়।

৪. কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে اَلْمِغْفَرُ বা হেলমেট।

৫. কেউ বলেন, بُرْنُسٌ হচ্ছে–

هُوَ ثَوْبٌ مَشْهُوْرٌ يُجْلَبُ مِنْ بِلَادِ الشَّامِ يَلْبَسُ فِى الْمَطَرِ يَسْتُرُ سَائِرَ الْبَدَنِ مَعَ الرَّأْسِ وَالْعُنُقِ ـ

অর্থাৎ সিরিয়া থেকে আমদানিকৃত এক ধরনের প্রসিদ্ধ কাপড় যা বর্ষাকালে পরিধান করা হয় এবং তা মাথা ও ঘাড়সহ পুরো শরীরকে ঢেকে রাখে।

মূলত আলোচ্য হাদীসে اَلْبَرَانِسُ দ্বারা এমন কাপড়কে বুঝানো হয়েছে, যা দ্বারা মাথা আবৃত করে রাখা হয়। কেননা, ইহরাম অবস্থায় এরূপ আবৃত করে রাখা নিষিদ্ধ।

জামা খোলা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : যদি কোনো লোক জামা পরিহিত অবস্থায় ইহরাম বেঁধে ফেলে, তাহলে কিভাবে তার জামা খুলতে হবে, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র.) বলেন– يَنْزِعُ الْقَمِيْصَ مِنْ جِهَةِ الرَّأْسِ অর্থাৎ মাথার দিক থেকে জামা টেনে বের করা যাবে। এতে কোনো অসুবিধা নেই।

দলিল :

عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ (رض) قَالَ رَأَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَعْرَابِيًّا قَدْ اَحْرَمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَاَمَرَهُ اَنْ يَنْزِعَهَا وَفِىْ بَعْضِ الطُّرُقِ عَلَيْهِ قَمِيْصٌ كَمَا فِى الْمُوَطَّا ـ

২. ইমাম শা'বী, নাখয়ী, হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনে যুবাইর (র.) প্রমুখের মতে لَا يَجُوْزُ نَزْعُ الْقَمِيْصِ مِنَ الْاَعْلٰى অর্থাৎ পরিহিত জামা মাথার উপর দিক থেকে খোলা বৈধ হবে না।

আকলী দলিল : ইহরাম অবস্থায় মাথা ঢেকে রাখা নিষিদ্ধ। সুতরাং জামা উপরের দিক থেকে খুলতে গেলে মাথা ঢেকে যাবে। ফলে মাথা ঢাকার অপরাধে আবার দম দিতে হবে। তাই জামা ফেড়ে বের করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, হাদীসের বিপরীতে যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় জমহুরের অভিমতই গ্রহণযোগ্য।

আস্তিন জাতীয় কাপড় পরার বিধান : اَلْقُفَّازَيْنِ শব্দের অর্থ হলো– আস্তিন জাতীয় কাপড়, যা পরলে হাতের তালু ও আঙ্গুল ঢেকে যায়। পুরুষদের জন্যে এ জাতীয় বস্ত্র পরিধান করা ইমামগণের ঐকমত্যে হারাম। তবে মহিলারা পরতে পারবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের জন্যে আস্তিন জাতীয় কাপড় পরিধান করা জায়েজ নয়।

দলিল : হাদীস– اِنَّ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رض) كَانَ يُلْبِسُ بَنَاتِهِ الْقُفَّازَيْنِ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, ইবনে আবী ওয়াক্কাস তার মেয়েদেরকে ইহরাম অবস্থায় قُفَّازَيْنِ পরাতেন।

তাদের প্রত্যুত্তরে আহনাফ বলেন–

ক. ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে নেহীটি মানদূবের জন্যে।

খ. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেন, নেহী বা নিষেধাজ্ঞা কখনো মাকরুহের জন্যও ব্যবহার হয়ে থাকে।

وَعَنْ ٢٥٦٠ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُوْلُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا لَبِسَ سَرَاوِيْلَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৬০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ভাষণ দিতে শুনেছি তিনি বলেছেন, যদি মুহরিম জুতা না পায় তবে মোজা পরবে আর যদি সে ইজার [সেলাইবিহীন লুঙ্গি] না পায় তবে পাজামা পরবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সেলাইবিহীন কাপড়ের পরিবর্তে পাজামা পরিধানের হুকুম : সারাবীল (سَرَاوِيْل) -কে হিন্দি ভাষায় সেলোয়ার বলা হয়। সেলোয়ার শব্দটি বর্তমানে বাংলায়ও প্রচলিত। সারাবীল মূলত একটি ইরানী বস্ত্র। রাসূল সারাবীল ক্রয় করেছিলেন বলে প্রমাণ আছে; কিন্তু পরিধান করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি সেলাইবিহীন ইজার না থাকে তবে সেলোয়ার পরা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ। যেমন– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি ইজার [সেলাইবিহীন লুঙ্গি] না পাওয়া যায় তবে সেলোয়ার পরবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে এবং ইমাম মালেকের এক অভিমত অনুযায়ী সেলোয়ারকে ফাড়লে একটা বিপর্যয় ও সম্পদ বিনষ্টকরণ হয়। কিন্তু হানাফী মতে এবং ইমাম মালেকের মতে, যদি ইজার না থাকে তবে সেলোয়ার বা পাজামা ফেড়ে পরবে। কারণ, হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে মোজা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তা যেন পায়ের গোড়ালির নিচ দিয়ে কেটে ফেলা হয়। পাজামাও এর অনুরূপ। সুতরাং হুকুমের দিক দিয়ে সমান হওয়ার কারণে একটি দৃষ্টান্তকে অপরটির সাথে মিলিয়ে মোজার মতো পাজামাকেও ফেড়ে পরিধান করা যাবে। কিন্তু ফাড়লে যদি সতর ঢাকা না যায় তবে না ফেড়ে পরাই ওয়াজিব। না ফেড়ে মোজা বা পাজামা পরলে একটি 'দম' ওয়াজিব হবে। সুতরাং ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, ইজার না থাকলে ফাড়ন ব্যতীতই পাজামা পরা জায়েজ আছে তবে এতে 'দম' ওয়াজিব হবে।

وَعَنْ ٢٥٦١ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ (رضـ) قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْجِعِرَّانَةِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوْقِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَهٰذِهٖ عَلَيَّ فَقَالَ أَمَّا الطِّيْبُ الَّذِيْ بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِيْ عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِيْ حَجِّكَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৬১. অনুবাদ : হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জি'রানাতে নবী করীম ﷺ -এর নিকটে ছিলাম। এ সময় তাঁর কাছে এক বেদুঈন লোক আসল। তার পরনে ছিল জুব্বা আর গায়ে ছিল উৎকট খালূকের সুগন্ধি মাখানো। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ওমরার জন্যে ইহরাম বেঁধেছি আর আমার পরনে এসব রয়েছে। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তোমার গায়ে যে সুগন্ধি আছে তা তুমি তিনবার করে ধুয়ে ফেলবে। আর জুব্বা সম্পর্কে কথা এই যে, তা খুলে ফেলবে। তারপর যেভাবে তুমি তোমার হজে কর সেভাবে ওমরায়ও কর। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জামা বা জুব্বা খোলা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : যদি কোনো ব্যক্তি জামা-জুব্বা ইত্যাদি পরিহিত অবস্থায় ইহরাম বেঁধে ফেলে পরে তা কিভাবে খুলতে হবে, এ সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে।

ইমাম শা'বী, নাখয়ী, হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনে যুবাইর (র.) প্রমুখ তাবেয়ীগণ বলেন, এটা মাথার উপর দিক হতে খোলা হবে না; বরং তা ছিঁড়ে খুলতে হবে। কেননা, ঐভাবে খুললে মাথা ঢাকা পড়বে, ফলে দম দিতে হবে।

কিন্তু চার ইমামের মতে, এটা মাথার দিক হতে টেনে খোলার নির্দেশ দিয়েছেন। মূলত হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ বেদুঈনকে উপর দিক হতে টেনে খোলার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসে نَزْعٌ শব্দ রয়েছে, যার অর্থ টেনে খোলা। প্রতিপক্ষের অভিমতের জবাবে বলা হয় যে, সহীহ হাদীসের মোকাবিলায় কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়।

وَعَنْ ٢٥٦٢ عُثْمَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৫৬২. অনুবাদ : হযরত উসমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করবে না, বিবাহ দেবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও করবে না। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٢٥٦٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৬৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ বিবি মায়মূনাকে ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দুটি হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সমাধান : হযরত উসমান (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করা জায়েজ নেই। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ নিজেই ইহরাম অবস্থায় মায়মূনাকে বিবাহ করেছিলেন। সুতরাং উভয় হাদীসের মাঝে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে। দ্বন্দ্বের সমাধানে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা পেশ করেছেন–

১. হযরত উসমান (রা.)-এর হাদীসে لَا يَنْكِحُ শব্দটি نَهْيٌ-এর অর্থে নয়; বরং এটা اَخْبَارٌ-এর অর্থে। আর نَهْيٌ-এর অর্থে হলেও তা হবে نَهْيٌ تَنْزِيْهِيٌّ

২. হযরত উসমান (রা.)-এর হাদীসটি নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীসের সমপর্যায়ের হবে না। কেননা, উসমানের হাদীসটি একটি মাত্র সনদে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে।

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস رَاجِحٌ আর হযরত উসমান (রা.)-এর হাদীস مَرْجُوْحٌ; কেননা, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস হযরত আয়েশা ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)ও বর্ণনা করেছেন।

৪. অথবা, হযরত উসমান (রা.)-এর হাদীস দ্বারা مَكْرُوْهٌ تَنْزِيْهِيٌّ আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস দ্বারা مُطْلَقٌ جَوَازٌ-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মুহরিম ব্যক্তির বিবাহ করা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : ইহরাম অবস্থায় মুহরিম ব্যক্তির জন্যে বিয়ে করা জায়েজ কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতে, ইহরাম অবস্থায় মুহরিম ব্যক্তির জন্যে বিয়ে করা ও বিয়ে দেওয়া কোনোটিই জায়েজ নেই।

তাঁদের দলিল :

١- عَنْ عُثْمَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ -

٢ - عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ (رض) قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنٰى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَكُنْتُ اَنَا الرَّسُوْلُ بَيْنَهُمَا -

২. ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদের মতে, ইহরাম অবস্থায় মুহরিম ব্যক্তির জন্যে বিয়ে করা জায়েজ। তবে তা উত্তমতার পরিপন্থি এবং এ সময় সংগম করা হারাম।

রাসূল ﷺ হযরত মায়মূনাকে بَيَانُ جَوَازٍ-এর জন্যে ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করেছিলেন।

তাঁদের দলিল :

١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব :

ক. প্রথমোক্ত দল [ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র.) প্রমুখ] যে প্রথম দলিলে হযরত উসমান (রা.)-এর হাদীস নিয়েছেন [অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করবে না, বিবাহ দেবে না ......] এর জবাবে বলা হয়েছে যে, ১. এতে ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। বিশেষভাবে যখন তা আখবারের সীগায় বর্ণিত হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, বিবাহ করা, বিবাহ দেওয়া এবং বিবাহের প্রস্তাব করা এগুলো ইহরামকারীর অবস্থার বিপরীত। কেননা, সে ইহরাম বেঁধে আল্লাহর প্রেমে পাগলপারা থাকবে, এরূপ

প্রেমে নিমগ্ন থেকে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকলে এটা মূল উদ্দেশ্যকে দুর্বল করবে। এজন্যেই রাসূল ﷺ বিবাহ করা বা দেওয়া এ জাতীয় কাজ হতে আগ্রহ কমানোর জন্যে তা বলেছেন। যেহেতু এ জাতীয় চর্চা কামোত্তেজনাকে বৃদ্ধি করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে বিবাহকে হারাম করা উদ্দেশ্য ছিল না। যদি لَا يَنْكِحُ -এর নফীকে 'নাহী'র জন্যে ধরে নেওয়া হয় তবে উভয় হাদীসের দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্যে এটাকে নাহী তানযীহী [অর্থাৎ এটা না করা ভালো] ধরা হবে। ২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস যে স্তরের, হযরত উসমান (রা.)-এর হাদীসটি সে স্তরের নয়। কেননা, হযরত উসমানের হাদীসের ভিত্তি নাবিতা ইবনে ওহাবের উপর নির্ভরশীল। যদি তিনি ছিকাহ রাবীও হন তবু তিনি একা বর্ণনা করেছেন। অপর দিকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অনেক সম্মানিত তাবিয়ী বর্ণনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ জাবির ইবনে যায়েদ, আতা, তাউস, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, মুজাহিদ, ইকরিমা প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। ইবনে আরাবী (র.) বলেছেন যে, ইমাম বুখারী হযরত উসমান (রা.)-এর হাদীসকে য'ঈফ এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

খ. তারা যে হযরত আবূ রাফে' (রা.)-এর হাদীস নিয়েছেন এর নিম্নলিখিত জবাব প্রদান করা হয়েছে– ১. এ হাদীসটি মুযতারিব ও মুখতালিফ। ইমাম তিরমিযী (র.) এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন, এটা রবীয়া হতে মাতারুল ওররাফ এবং মাতারুল ওররাফ হতে হাম্মাদ ইবনে যায়েদ বর্ণনা করেছেন। এ সনদসূত্র ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে এটা বর্ণিত হয়েছে বলে আমরা জানি না। ইমাম মালেক (র.) বর্ণনা করেন যে, এটা সুলাইমান হতে রবীয়াহ বর্ণনা করেছেন, তবে মালেক (র.) এটাকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে এ হাদীসই রবীয়াহ হতে সুলাইমান ইবনে বিলাল মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ২. এ হাদীসের অন্যতম রাবী মাতারুল ওররাফ সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী (র.) বলেছেন যে, সে সবল নয়। ইমাম আহমাদ বলেছেন, তার স্মরণশক্তিতে ত্রুটি আছে।

গ. প্রথমোক্ত দল যে হযরত ইয়াযীদ ইবনে আসম-এর হাদীস নিয়েছেন এর জবাবে বলা হয়েছে যে,

১. এতে মতভেদ আছে। কোনো কোনো বর্ণনায় ইয়াযীদের পরে মায়মূনার কথা রয়েছে, আবার কোনো কোনো বর্ণনায় মায়মূনার উল্লেখ ছাড়াই মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র.)-ও ইয়াযীদের হাদীসকে বর্ণনা করে বলেছেন যে, হাদীসটি গরীব।

২. অথবা, আবূ রাফে' ও ইয়াযীদের হাদীসে যে وَهُوَ حَلَالٌ 'তিনি হালাল ছিলেন' শব্দ রয়েছে এর অর্থ এই যে, বিবাহ ইহরাম অবস্থায়ই হয়েছিল, তবে এর প্রকাশ হালাল অবস্থায় হয়েছিল। এ অর্থ বেশি কাছাকাছি এজন্য যে, বিবাহের প্রকাশ সাধারণত অলিমা বা বৌভাতের দিনেই হয়ে থাকে। রাসূল ﷺ -এর বিবাহের অলিমা হালাল অবস্থায় হয়েছিল।

৩. অথবা, উভয়ের হাদীসে বিবাহ কথাটি রূপক হিসেবে বিবাহের সূত্রপাতকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বিবাহের প্রাথমিক কথাবার্তা হালাল অবস্থায় আরম্ভ হয়েছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে, মহানবী ﷺ ইহরাম অবস্থায়ই হযরত মাইমূনা (রা.)-কে বিবাহ করেছিলেন, তবে এটা রাসূলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। তাই উম্মতের জন্যে ইহরাম অবস্থায় বিবাহ না করাই উত্তম।

وَعَنْ ٢٥٦٤ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ اِبْنِ اُخْتِ مَيْمُوْنَةَ عَنْ مَيْمُوْنَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ. قَالَ الشَّيْخُ الْاِمَامُ مُحْيِ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَالْاَكْثَرُوْنَ عَلٰى اَنَّهُ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَظَهَرَ اَمْرُ تَزْوِيْجِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ بَنٰى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ بِسَرِفَ فِيْ طَرِيْقِ مَكَّةَ)

২৫৬৪. অনুবাদ : মাইমূনার ভাগিনা হযরত ইয়াযীদ ইবনে আসম মাইমূনা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন [ইহরাম অবস্থায় নয়]। –[মুসলিম]

ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগবী (র.) বলেছেন, অধিকাংশের মতে রাসূল ﷺ তাঁকে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছেন। তবে বিবাহের কার্যকলাপ প্রকাশ পেয়েছে ইহরাম অবস্থায়, অতঃপর মক্কার পথে সারিফ নামক স্থানে হালাল অবস্থায় মধুরাত্রি যাপন করেছেন।

وَعَنْ ٢٥٦٥ اَبِىْ اَيُّوْبَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৬৫. অনুবাদ : হযরত আবূ আইয়্যুব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ ইহরাম অবস্থায় আপন মাথা ধুইতেন। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ক. রাসূল ﷺ -এর চুল ছিল বাবরি, তাই মাঝে মাঝে তা ধোয়া আবশ্যক হতো। এটা হতে বুঝা যায় যে, ইহরাম অবস্থায় প্রয়োজনে মাথা ধোয়াতে কোনো ক্ষতি নেই।

খ. মাথা এরূপ আলতোভাবে ধৌত করতে হবে যাতে চুল না উঠে।

গ. ইহরাম অবস্থায় গোসল করতে পাপ নেই, তবে না করাই উত্তম। কারণ, ইহরাম অবস্থায় প্রেমাসক্ত পাগলের বেশ ধারণ করাই ভালো।

وَعَنْ ٢٥٦٦ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اِحْتَجَمَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৬৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন। −[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٢٥٦٧ عُثْمَانَ (رض) حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الرَّجُلِ اِذَا اشْتَكٰى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبْرِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৫৬৭. অনুবাদ : হযরত উসমান (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে সে ব্যক্তি সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় চোখে ব্যথা অনুভব করবে সে ব্যক্তি মুসাব্বির দ্বারা চক্ষুদ্বয়ে পট্টি [ব্যান্ডেজ] বাঁধবে। −[মুসলিম]

وَعَنْ ٢٥٦٨ اُمِّ الْحُصَيْنِ (رض) قَالَتْ رَأَيْتُ اُسَامَةَ وَبِلَالًا وَاَحَدُهُمَا اٰخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْاٰخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৫৬৮. অনুবাদ : হযরত উম্মুল হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসামা ও বিলাল দুজনের একজনকে দেখলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উষ্ট্রীর লাগাম ধরা অবস্থায় আছে অপরজন আপন কাপড় উপরে ধরে রৌদ্র হতে তাকে ছায়া দিচ্ছে [এ অবস্থা চলতে থাকল] যাবৎ না তিনি জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আরাফাহ ও মিনায় তাঁবু খাটিয়ে ছায়া গ্রহণ করার বৈধতা অত্র হাদীস হতেই গ্রহণ করা হয়েছে। মোটকথা, মুহরিম ছায়া গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যাতে মুখমণ্ডলে ও মাথার সাথে কাপড় না লাগে বা তাকে ঢেকে না ফেলে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

وَعَنْ ٢٥٦٩ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ بِهٖ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يُوْقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ تَتَهَافَتُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَقَالَ اَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَاَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ وَالْفَرَقُ ثَلٰثَةُ اَصْعٍ اَوْ صُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اُنْسُكْ نَسِيْكَةً . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৬৯. অনুবাদ : হযরত কা'ব ইবনে ওজরাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ মক্কা প্রবেশের পূর্বে হুদায়বিয়ায় তাঁর নিকট দিয়ে গমন করলেন। তখন তিনি [কা'ব] ইহরাম অবস্থায় ছিলেন এবং একটি হাঁড়ির নিচে আগুন ধরাচ্ছিলেন। আর উকুন তার মুখমণ্ডলে গড়িয়ে পড়ছিল। এটা দেখে রাসূল ﷺ বললেন, তোমার পোকা কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল ﷺ বললেন, তবে তুমি তোমার মাথা মুড়িয়ে ফেল এবং ছয়জন নিঃস্বকে এক 'ফরখ' খাদ্য খাওয়াও; এক ফরখ তিন সা' সমতুল্য। অথবা তিন দিন রোজা রাখ কিংবা একটি পশু জবাই কর। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْفَرَقُ-এর অর্থ : فَرَقٌ একটি পরিমাণবিশেষ। এক فَرَقٌ তিন 'সা'-এর সমতুল্য আর এক 'সা' পোনে চার সেরের সমতুল্য।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٥٧٠ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى النِّسَاءَ فِىْ اِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذٰلِكَ مَا اَحَبَّتْ مِنْ اَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرٍ اَوْ خَزٍّ اَوْ حُلِيٍّ اَوْ سَرَاوِيْلَ اَوْ قَمِيْصٍ اَوْ خُفٍّ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৫৭০. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদেরকে তাদের ইহরামে দাস্তানা ও বোরকা পরতে এবং যে কাপড় ওর্স ও জাফরানে রঞ্জিত তা পরতে নিষেধ করেছেন। এরপর তারা যে কোনো রংয়ের কাপড় পছন্দ করে পরতে পারে, কুসুমী হোক বা রেশমী অথবা যে কোনো অলঙ্কার, পাজামা, জামা কিংবা মোজা। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ওর্স ও জাফরান রংয়ে রঞ্জিত এবং কুসুম লাল রংয়ের কাপড় ব্যবহার সংক্রান্ত মতভেদ :

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَوْزَاعِىْ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা ও আওযায়ী (র.) বলেছেন, ওর্সের চাষ শুধু ইয়েমেনেই হয়ে থাকে। এটা জর্দা বা হলুদ রংয়ের একপ্রকার ঘাসবিশেষ। শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ বলেছেন যে, যদি কাপড়ে ওরসের পানি লাগে কিন্তু এর সুগন্ধি না থাকে তবে এটা পরিধান করা মুহরিমের জন্যে নিষিদ্ধ নয়। আইনী (র.) বলেছেন, এটাই হানাফী মত যে, ওর্স ও জাফরান রংয়ের কাপড় ধোয়ার পরে যদি সুগন্ধি না ছড়ানো থাকে তবে মুহরিমের জন্যে এটা ব্যবহার করা জায়েজ। সাঈদ ইবনে যুবাইর (র.), আতা, হাসান, তাউস, কাতাদাহ, নাখয়ী, ছাওরী, আহমাদ ইসহাক (র.) প্রমুখও এ মতেরই অনুসারী ছিলেন। তাহাবী (র.) হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ওর্স ও জাফরান রংয়ে রঞ্জিত কাপড় ইহরামে পরিধান করো না। তবে যদি এটা ধোয়া হয় কোনো ক্ষতি নেই।

অপর এক গ্রন্থে আছে যে, আসফার একপ্রকারের লাল রং। আসফার রং দ্বারা রঞ্জিত কাপড়কে মুআসফার বলা হয়। ইহরাম অবস্থায় এ ধরনের কাপড় ব্যবহার সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে–

مَذْهَبُ الشَّافِعِىْ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, ইহরাম অবস্থায় মুআসফার পরিধান জায়েজ আছে। যেমন– হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি মুআসফার কাপড় ইহরাম অবস্থায় পরিধান করেছেন।

হানাফী মাযহাব মতে, মুআসফার কাপড় ইহরাম অবস্থায় পরা যাবে না। হিদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে, "মুহরিম ওর্স, জাফরান ও আসফারে রঞ্জিত কাপড় পরবে না।" যেমন– হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত তালহা (রা.) ইহরাম অবস্থায় মুআসফার পরিধান করলে হযরত ওমর (রা.) একে অস্বীকার করেন, তালহা (রা.) এতে নিজের ঠেকার কথা ব্যক্ত করেন। তখন হযরত ওমর (রা.) বলেন, "তোমরা হলে নেতা, লোক তোমাদের অনুসরণ করবে।" এ হাদীসে হযরত ওমর (রা.)-এর অস্বীকার এবং তালহা (রা.)-এর ওজর পেশ করা হতে বুঝা যায় যে, মুআসফার ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ।

এছাড়া মুআসফারও ওরস ও জাফরানের মতো সুগন্ধি। সুতরাং এটা নিষিদ্ধ হবে।

প্রথমোক্ত দলের দলিলের জবাবে বলা হয়েছে যে, অন্যত্র হযরত আয়েশা নিজেই এটা নিন্দনীয় বলে উল্লেখ করেছেন। এটা ছাড়াও তিনি নিজে মুআসফার পরিধান করেননি; বরং মুআসফার রংয়ের কাপড় পরেছিলেন।

وَعَنْ ٢٥٧١ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّوْنَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُحْرِمَاتٍ فَاِذَا جَاوَزُوْا بِنَا سَدَلَتْ اِحْدٰنَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلٰى وَجْهِهَا فَاِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَاهُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَلِابْنِ مَاجَةَ مَعْنَاهُ)

২৫৭১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরোহী দল আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করত আর তখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। যখন তারা আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করত তখন আমাদের প্রত্যেকেই আপন মাথার চাদর মুখমণ্ডলের উপর লটকিয়ে দিত। আর যখন তারা আমাদেরকে অতিক্রম করে চলে যেত আমরা তা খুলে দিতাম। -[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইহরাম অবস্থায় মহিলাগণ বোরকা পরিধান করতে পারে। এতে কোনো দোষ নেই। অবশ্য মুখমণ্ডল খোলা রাখবে। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে পরপুরুষকে চেহারা দেখানো মহিলাদের পক্ষে জায়েজ নেই। তবে ইহরাম অবস্থায় এমনভাবে মুখ ঢাকতে হবে যাতে কাপড় চর্মে না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

وَعَنْ ٢٥٧٢ اِبْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ الْمُقَتَّتِ يَعْنِيْ غَيْرَ الْمُطَيَّبِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

২৫৭২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধিহীন তেল লাগাতেন। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মুহরিমের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার : যদি কোনো মুহরিম একটি পূর্ণ অঙ্গে সুগন্ধি লাগায়, তবে সমস্ত ইমামের ঐকমত্যে তাকে একটি 'দম' দিতে হবে। আর যদি কোনো অঙ্গের অধিকাংশ স্থানে লাগায় তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দম দিতে হবে আর সাহেবাইনের মতে দম দিতে হবে না; বরং সদকা দিতে হবে। আর ওজরবশত লাগালে সকলের ঐকমত্যে কিছুই দিতে হবে না। মহানবী ﷺ যে তেল ব্যবহার করতেন তা ওজরবশত ছিল।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٥٧٣ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ (رض) وَجَدَ الْقَرَّ فَقَالَ اَلْقِ عَلَيَّ ثَوْبًا يَا نَافِعُ فَاَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا فَقَالَ تُلْقِيْ عَلَيَّ هٰذَا وَقَدْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৫৭৩. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত নাফে' (র.) হতে বর্ণিত আছে [এক সময়] হযরত ইবনে ওমর (রা.) শীত অনুভব করলেন, তিনি বললেন, নাফে' আমার গায়ের উপর একটি কাপড় দাও। তখন আমি তাঁর গায়ের উপরে একটি ওভার কোট রেখে দিলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি আমার গায়ে এটা দিলে অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহরিমকে এটা পরতে নিষেধ করেছেন। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মুহরিমের সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করার বিধান : ইহরাম অবস্থায় সেলাইকৃত কাপড় যেমন- কামিস, জামা, পাজামা, কাবা, টুপি ও মোজা ইত্যাদি পরিধান করা হারাম। উল্লেখ্য যে, কাপড় পরিধান করা অর্থ- সাধারণ প্রচলিত নিয়মে পরিধান করা। যদি সাধারণ নিয়মে পরিধান না করে শরীরে জড়িয়ে রাখা হয়, তবে এতে কোনো দোষ নেই।

আর হযরত ওমর (রা.)-এর অভিমত ছিল, সাধারণভাবে সেলাইকৃত কাপড় পরিহার করা। অথবা তিনি অধিক সতর্কতার জন্যে এরূপ করেছেন।

وَعَنْ ٢٥٧٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ (رض) قَالَ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلُحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيْقِ مَكَّةَ فِيْ وَسَطِ رَأْسِهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৭৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুজাইনা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম অবস্থায় মক্কার পথে 'লুহা-জামাল' নামক স্থানে আপন মাথার মাঝখানে শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মুহরিমের শিঙ্গা লাগানো : ইহরাম অবস্থায় মাথা বা শরীরের অন্য কোনো অঙ্গের কেশ নষ্ট করা নিষিদ্ধ। শিঙ্গা লাগালে উক্ত স্থানের কেশ অবশ্যই নষ্ট করতে হয়। সুতরাং মুহরিম ব্যক্তি শিঙ্গা লাগাতে পারবে না। সম্ভবত রাসূল ﷺ কোনো ওজরের কারণে এটা করেছিলেন।

بْنٌ ও اِبْنٌ-এর ব্যবহার : যদি দু ইসমের মধ্যে পিতা ও পুত্রের সম্পর্ক হয় তবে সেখানে بْنٌ ব্যবহৃত হয়। যেমন- عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ ، عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ কিন্তু শব্দটি যদি বাক্যের শুরুতে আসে তবে পিতা-পুত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও اِبْنٌ ব্যবহৃত হবে। যেমন- اِبْنُ عَبَّاسٍ ইত্যাদি।

আর যদি দু ইসমের মধ্যে পিতা ও পুত্রের সম্পর্ক না হয়; বরং দ্বিতীয় শব্দের সম্পর্ক আরো পেছনের সাথে হয়। তবে সেখানে اِبْنٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন- عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَالِكٍ ابْنُ بُحَيْنَةَ এখানে مَالِكٌ ও بُحَيْنَةَ-এর মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক নয়।

وَعَنْ ٢٥٧٥ أَنَسٍ (رض) قَالَ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلٰى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

২৫৭৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম অবস্থায় ব্যথার কারণে তাঁর পায়ের পাতার উপর শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন। -[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

وَعَنْ ٢٥٧٦ اَبِيْ رَافِعٍ (رض) قَالَ تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنٰى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَكُنْتُ اَنَا الرَّسُوْلُ بَيْنَهُمَا - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

২৫৭৬. অনুবাদ : হযরত আবূ রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত বিবি মাইমূনাকে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন এবং হালাল অবস্থায়ই তাঁর সাথে মধু রাত্রি যাপন করেছিলেন। আর আমিই ছিলাম উভয়ের মধ্যে বার্তাবাহক। -[আহমদ ও তিরমিযী]

তিরমিযী (র.) বলেছেন- এ হাদীসটি হাসান।

بَابُ الْمُحْرِمِ يَجْتَنِبُ الصَّيْدَ

পরিচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তির শিকার করা হতে বিরত থাকা

সকল ইমাম এ কথার উপর একমত যে, মুহরিম ব্যক্তি শিকার করতে পারবে না। যেমনি মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا . (اَلْمَائِدَةُ) অর্থাৎ তোমাদের উপর স্থলভাগে শিকার করা হারাম করা হয়েছে যে পর্যন্ত তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাক, তবে জলভাগে শিকার করাতে কোনো বাধা নেই। নিম্নে এ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٥٧٧ - عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ (رض) أَنَّهُ أَهْدٰى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْاَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَاٰى مَا فِيْ وَجْهِهِ قَالَ اِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ اِلَّا اَنَّا حُرُمٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৭৭. **অনুবাদ :** হযরত সা'ব ইবনে জাছামাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একটি বন্যগাধা [শিকার] হাদিয়া দিলেন। এ সময় তিনি [রাসূল] আবওয়া অথবা ওয়াদ্দানে ছিলেন। তিনি গাধাটি ফেরত দিলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ যখন তার চেহারার ভাব [অর্থাৎ দুঃখিত হওয়ার নিদর্শন] লক্ষ্য করলেন, তখন বললেন, এটা আমি তোমাকে ফেরত দিতাম না, যেহেতু আমি মুহরিম এ জন্য দিলাম। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মুহরিম ব্যক্তি ইহরামবিহীন ব্যক্তির শিকারের গোশ্ত খাওয়া জায়েজ কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ : মুহরিম ব্যক্তির পক্ষে যে শিকার করা জায়েজ নয় এতে সকল ইমাম একমত। কিন্তু অন্য কোনো ইহরামবিহীন ব্যক্তির শিকারকৃত জন্তুর গোশ্ত খেতে পারে কিনা, এ বিষয়ে ইসলামি আইনবিদদের বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। যথা–

১. হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, সুফিয়ান ছাওরী, লাইস, ইসহাক (র.) প্রমুখ মনীষীগণের মতে, শিকারকৃত জন্তুর গোশ্ত আহার করা হারাম। এ শিকারে মুহরিম ব্যক্তির কোনোরূপ সহায়তা থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায়ই আহার করা নাজায়েজ ও হারাম। তারা উপরিউক্ত সা'ব ইবনে জাছামাহ (রা.) বর্ণিত হাদীসকে নিজেদের মতের ভিত্তি মনে করেন। যেহেতু উপরিউক্ত হাদীসে নবী করীম ﷺ -এর আহার না করার কারণ হলো তার মুহরিম হওয়া। সুতরাং মুহরিম ব্যক্তির পক্ষে কোনো অবস্থায়ই শিকারকৃত জন্তুর গোশত খাওয়া জায়েজ হবে না।

২. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে, শিকারি ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার পূর্বে যদি তার জন্যে শিকার করে তবে তার পক্ষে এটা আহার করতে ক্ষতি নেই; কিন্তু ইহরাম বাঁধার পর তার জন্য শিকার করলে এটা আহার করা তার পক্ষে জায়েজ হবে না।

৩. ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.) -এর মতে, মুহরিমের জন্যে শিকারকৃত জন্তুর গোশ্ত আহার করা বৈধ। চাই এটা মুহরিমের জন্যে শিকার করা হোক বা না করা হোক। তবে শর্ত এই যে, মুহরিম ব্যক্তি নিজে শিকার করতে পারবে না এবং শিকার কাজে কোনোরূপ সহায়তাও করতে পারবে না। তাঁরা হযরত কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসকে নিজেদের মতের অনুকূলে দলিলরূপে পেশ করেন। -[আইনী]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.) তাঁর উস্তাদ শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান (র.) হতে বর্ণনা করেন যে, স্বাভাবিকভাবেই এ কথা প্রমাণ হয়েছে যে, বন্যগাধা বিশাল দেহবিশিষ্ট জন্তু, এর গোশ্তও প্রচুর। নিশ্চয় শিকারি কেবলমাত্র নিজের জন্যেই এটা শিকার করেননি। বিশেষভাবে হযরত আবূ কাতাদা (রা.) ঐ সময় সফরে ছিলেন আর তাঁর সাথিরা সকলেই মুহরিম ছিল, এতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি মুহরিম সাথিদেরকে খাওয়ায় শরিক করার জন্যেই শিকার করেছিলেন। আর অন্য বর্ণনা মতে জানাও যায় যে, কাতাদার কতক শিকার করা মুহরিম সাথিদের মনের ইচ্ছাও ছিল।

وَعَنْ ٢٥٧٨ أَبِىْ قَتَادَةَ (رضـ) أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَخَلَّفَ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَوْا حِمَارًا وَحْشِيًّا قَبْلَ أَنْ يَّرَاهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ تَرَكُوْهُ حَتّٰى رَاٰهُ أَبُوْ قَتَادَةَ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ فَسَأَلَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوْهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا فَتَنَاوَلَهُ فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَعَقَرَهُ ثُمَّ أَكَلَ فَأَكَلُوْا فَنَدِمُوْا فَلَمَّا أَدْرَكُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَأَلُوْهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ قَالُوْا مَعَنَا رِجْلُهُ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَكَلَهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا فَلَمَّا أَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوْا لَا قَالَ فَكُلُوْا مَا بَقِىَ مِنْ لَحْمِهَا ـ

২৫৭৮. অনুবাদ : হযরত আবূ কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি [হিজরি ৬ষ্ঠ সনে] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে [ওমরার উদ্দেশ্যে] বের হলেন এবং পথে তার কিছু সঙ্গীসাথীসহ পেছনে পড়ে গেলেন। তারা সকলেই মুহরিম ছিলেন; কিন্তু আবূ কাতাদাহ তখনও মুহরিম ছিলেন না। তাঁরা একটি বন্যগাধা দেখলেন আবূ কাতাদার দেখার পূর্বেই। তারা গাধাটিকে দেখতে পেয়ে আবূ কাতাদাকে ছেড়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেলেন। এদিকে আবূ কাতাদাও গাধাটিকে দেখে ফেললেন। তখন তিনি স্বীয় ঘোড়ার চাবুকটি দিতে বললেন। তারা দিতে অস্বীকার করলেন, অবশেষে তিনি নিজেই এটা নিলেন এবং গাধাটির প্রতি আক্রমণ করে তাকে আহত করলেন। অতঃপর তিনি এর গোশ্ত খেলেন এবং তারা [সঙ্গীগণও] খেলেন; কিন্তু সঙ্গীগণ এজন্যে অনুতপ্ত হলেন। অতঃপর যখন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে গিয়ে মিলিত হলেন, তাঁকে [এ শিকারকৃত গাধার গোশ্ত খাওয়া সম্পর্কে] জিজ্ঞেস করলেন। তিনি [রাসূল ﷺ] বললেন, তোমাদের সাথে এর কিছু আছে কি? তাঁরা বললেন, আমাদের সাথে এর [রন্ধনকৃত] একটি পা আছে। অতঃপর নবী করীম ﷺ তা গ্রহণ করলেন এবং খেলেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

বুখারী ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে, যখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসলেন, রাসূল ﷺ তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন- তোমাদের কেউ কি তাকে বন্য-গাধাটিকে আক্রমণ করতে বলেছিলে অথবা এর প্রতি ইঙ্গিত করেছিলে? তাঁরা বললেন, জি-না। তখন রাসূল ﷺ বললেন, এর গোশত যা অবশিষ্ট আছে তোমরা খাও।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দুটি হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান : সা'ব ইবনে জাছামার হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, শিকারকৃত পশুর গোশ্ত কোনো মুহরিম ব্যক্তির পক্ষে খাওয়া জায়েজ নেই। কেননা, নবী করীম ﷺ মুহরিম হওয়ার কারণে ইবনে জাছামার হাদিয়া ফেরৎ দিয়েছেন। অথচ আবূ কাতাদার হাদীসে দেখা যায় নবী করীম ﷺ ইহরাম অবস্থায় শিকারকৃত পশুর গোশ্ত স্বয়ং খেয়েছেন এবং অন্যান্য মুহরিমদেরকেও খেতে অনুমতি দিয়েছেন। ফলে উভয় হাদীস পরস্পর বিপরীত সাব্যস্ত হয়েছে। উভয়ের মধ্যকার এ বৈপরীত্যের সমাধান নিম্নরূপ-

১. হযরত আবূ কাতাদা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি মুহরিম নয় এমন ব্যক্তির শিকারকৃত জন্তুর গোশ্ত মুহরিম ব্যক্তিকে হাদিয়া প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর ইবনে জাছামাহ (রা.) বর্ণিত হাদীসটি মুহরিমকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে শিকার করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ কারণেই নবী করীম ﷺ এটা গ্রহণ করেননি।

২. অথবা, এটাও বলা যায় যে, নবী করীম ﷺ গাধাটি গ্রহণ না করার কারণ হলো এটা জীবিত ছিল। আর আবূ কাতাদা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে নবী করীম ﷺ -কে সেই গোশ্ত প্রদান করা হয়েছে যা মুহরিমের উদ্দেশ্যে শিকার করা হয়নি।

৩. অথবা, এটাও হতে পারে যে, হযরত আবূ কাতাদা (রা.) বর্ণিত হাদীসে শিকারিকে মুহরিম ব্যক্তি কোনোরূপ সাহায্য বা ইঙ্গিত করেছিল তাই তিনি এটা গ্রহণ করেছেন, আর ইবনে জাছামাহ বর্ণিত হাদীসে মুহরিম ব্যক্তির সাহায্য ও ইঙ্গিত থাকার কারণেই তিনি এটা গ্রহণ করেননি। অতএব বুঝা যায় যে, উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

كَيْفَ جَاوَزَ اَبُوْ قَتَادَةَ الْمِيْقَاتَ بِلَا اِحْرَامٍ؟ হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) ইহরাম ব্যতীত কিভাবে মীকাত অতিক্রম করলেন? ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) কিভাবে এ বিধানের ব্যতিক্রম করেছিলেন, এর উত্তরে নিম্নোক্ত জবাব পেশ করা যায়–

১. হতে পারে হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট মক্কা শরীফ যাওয়ার নিয়তে আসেননি; বরং নিজের কোনো বিশেষ প্রয়োজনে এসেছিলেন। ঘটনাক্রমে পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে মীকাতের অভ্যন্তরে সাক্ষাৎ হয়ে গিয়েছিল।

২. এটাও বলা চলে যে, আবূ কাতাদার এ ঘটনা বিদায় হজের পূর্বেকার ঘটনা, সে সময় মীকাতসমূহ চিহ্নিত হয়নি।

وَعَنْ ٢٥٧٩ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِى الْحَرَمِ وَالْاِحْرَامِ اَلْفَارَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৭৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে হারামে এবং ইহরাম অবস্থায় পাঁচটি প্রাণীকে হত্যা করে তার কোনো গুনাহ হয় না– ইঁদুর, কাক, চিল, বিচ্ছু ও হিংস্র কুকুর। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٢٥٨٠ عَائِشَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْاَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْحُدَيَّا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৮০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, পাঁচটি অনিষ্টকারী প্রাণী আছে। ঐ গুলোকে হিল্ ও হারাম যে কোনো স্থানেই মারা যেতে পারে– সাপ, দাঁড় [সাদা কালো] কাক, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর ও চিল। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসে উল্লিখিত পাঁচটি ব্যতীত অন্যান্য অনিষ্টকারী প্রাণী সম্পর্কে মতভেদ : স্থলজ প্রাণী শিকার করা মুহরিমের পক্ষে হারাম। তবে পাঁচটি প্রাণীকে এ বিধানের আওতা হতে বাদ দেওয়া হয়েছে। যদিও পাঁচটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে হত্যার বিধানের ব্যাপারে পাঁচ সংখ্যাটি সুনির্দিষ্ট নয়। কারণ, অধিকাংশের মতেই পাঁচ সংখ্যাটি দলিল নয়। যদি দলিল হয়ও তবুও এ পাঁচের সাথে হত্যার বৈধতা সুনির্দিষ্ট হবে না। কেননা, রাসূল ﷺ প্রথমত শুধু পাঁচটির কথা বলেছিলেন, আবার এটাও বলেছেন যে, এ পাঁচের বাইরে অন্য কিছু প্রাণীও এ পাঁচের সাথে যোগ হবে। হযরত আয়েশা (রা.)-এর অধিকাংশ বর্ণনায় যদিও পাঁচটির কথা রয়েছে, আবার কোনো কোনো বর্ণনা সূত্রে ছয়টির কথাও আছে। যেমন– আবূ আওয়ানা 'মুসতাখরাজ' নামক গ্রন্থে [ইবনে ওমর বর্ণিত হাদীসে পাঁচটির উপরে] 'সাপ' কথাটি বৃদ্ধি করেছেন। শায়বানের বর্ণনা সূত্রে এর সমর্থন রয়েছে। আবূ দাউদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীসেও ছয়টি উল্লেখ আছে, তবে পূর্বোক্ত হাদীসের পাঁচটি ঠিক রেখেও এতে নতুন একটির নাম রয়েছে। তাহলে মোট সাতটি হয়ে যায়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস অনুসারে ইবনে খুযায়মা ও ইবনে মুনযির চিতাবাঘ সহ মোট দুটি যোগ করেছেন। ফলে প্রাণীর সংখ্যা হয়েছে মোট নয়টি। সুতরাং প্রাণী হত্যা বৈধ হওয়ার বিধান শুধু পাঁচটির উপরই বর্তায় না।

হিদায়া গ্রন্থকার লিখেছেন যে, উল্লিখিত পাঁচটি প্রাণী অনিষ্টকারী। এর টীকায় লিখিত হয়েছে যে, এ পাঁচটি ব্যতীত আর যত প্রাণীর মধ্যে এ অনিষ্টকারিতা রয়েছে, সেগুলোও এ বিধানের শামিল হবে। সেগুলোকে হত্যা করাও জায়েজ হবে।

আশেয়া গ্রন্থে আছে যে, বিষাক্ত ও অনিষ্টকারী যে কোনো প্রাণী মুহরিমের পক্ষে হত্যা করা জায়েজ। এ ব্যাপারে সকল আলেমের ঐকমত্য রয়েছে। তা চাই হিল -এ হোক চাই হারামে।

বাযলুল মাজহূদ গ্রন্থে আছে, হিংস্র কুকুরের বিধানে ঐ সমস্ত হিংস্র জন্তুও শামিল হবে যেগুলো মানুষের উপর আক্রমণ করে এবং প্রথমেই চড়াও হয়। যেমন– বাঘ, চিতাবাঘ, গণ্ডার ইত্যাদি।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে যে সাপ ও বিচ্ছু হত্যার বৈধতা রয়েছে এ সম্পর্কে শো'বা আবূ ওমর হাম্মাদ ইবনে আবূ সুলাইমান ও হাকাম হতে বর্ণনা করেন যে, এ দু মনীষীর মতে, মুহরিম সাপ ও বিচ্ছু হত্যা করবে না। কেননা, এটা মাটির

গর্তে পালিয়ে থাকে। কিন্তু আবূ ওমর (রা.) লিখেছেন যে, জমহূরের মতে, মুহরিম সাপ ও বিচ্ছু হত্যা করতে পারে। কারণ হযরত আয়েশা এবং হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীসে সাপ ও বিচ্ছুর কথা স্পষ্ট রয়েছে। সুতরাং সহীহ ও সুস্পষ্ট হাদীস বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কিয়াস কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

কাকের প্রকারভেদ : ফত্হুল বারী গ্রন্থে আছে যে, কাক পাঁচ প্রকার–

১. 'আক'আক (عَقْعَقٌ) –এটা একপ্রকার সাদা পাখি। এর গায়ে কালো ও সাদার মিশ্রণ রয়েছে।

২. আবকা (اَبْقَعْ) – যে কাকের পিঠ ও পেট সাদা।

৩. গাদাফ (غَدَافٌ) –এটাকেও আরবি ভাষাবিদগণ আবকাই বলেন। এটাকে غُرَابُ الْبَيْنِ বা দলত্যাগী কাকও বলে। কথিত আছে যে, যখন নূহ (আ.) এটাকে পৃথিবীর খোঁজখবর নেওয়ার জন্যে পাঠিয়েছিলেন, সে মৃত জীবজন্তু পেয়ে তা খাওয়ার ধান্ধায় থেকে হযরত হযরত নূহ (আ.) হতে পৃথক হয়ে গিয়েছিল।

৪. আ'সাম (اَعْصَمْ) –এটা এক ধরনের কাক যার পা, ডানা অথবা পেট সাদা কিংবা লাল।

৫. যাগ (زَاغٌ) –এটাকে ফসলের কাকও বলা হয়। অর্থাৎ এটা ছোট জাতের কাক। এরা শস্যকণা ইত্যাদি খেয়ে থাকে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন যে, হাদীসে যে কাক মারা জায়েজ বলা হয়েছে তা 'গাদাফ' ও 'আবকা' জাতের কাক। কেননা, এরা মৃত জন্তু ভক্ষণ করে। সাধারণত যারা মৃত জন্তু খায় এরাই মানুষকে প্রথমত অনিষ্ট করে থাকে।

হিংস্র কুকুর হত্যার হুকুম : ইমাম নববী (র.) বলেছেন, ইহরাম অবস্থায় হোক বা হালাল অবস্থায়, হিলে হোক বা হারামে হিংস্র কুকর হত্যা করা জায়েজ, এ ব্যাপারে ইমামগণ একমত। তবে এর ব্যাখ্যায় কিছুটা মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক (র.) স্বীয় গ্রন্থ মুয়াত্তায় লিখেছেন যে, হিংস্র কুকুর বলতে ঐ কুকুরকেই বুঝাবে যা মানুষকে আহত করে, মানুষের প্রতি আক্রমণ করে। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও সুফিয়ান ছাওরী (র.) প্রমুখ বলেছেন, এর দ্বারা প্রত্যেক ঐ কুকুরকে বুঝাবে যা অশ্বারোহীকে পরাজিত করে। ইমাম আ'যম, আওযায়ী, হাসান (র.) প্রমুখ হতে কাযী আয়ায (র.) বর্ণনা করেছেন, এটা প্রচলিত কুকুরই; তবে এটা নেকড়ে বাঘের সাথে মেলামেশা করে।

সাপ ও বিচ্ছু হত্যার বিধান : ইমাম শো'বা ও আবূ ওমর এ দুজন মনীষী বলেন, হাম্মাদ ইবনে আবূ সুলাইমান ও হাকাম (র.) বলেছেন, সাপ ও বিচ্ছু মানুষ দেখলে পলায়ন করে। কাজেই মুহরিম এ প্রাণী দু'টিকে হত্যা করা জায়েজ নেই।

কিন্তু জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, এ প্রাণী দু'টিকে হত্যা করা যে মুহরিমের পক্ষে জায়েজ, তা সহীহ হাদীসে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। কাজেই হাদীসের মুকাবিলায় কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়।

ইঁদুর মারার হুকুম : একমাত্র ইবরাহীম নাখয়ী মুহরিমকে ইঁদুর মারতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু ইবনে মুন্যির বলেছেন যে, জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে মুহরিমের পক্ষে ইঁদুর মারা জায়েজ। তাঁরা হযরত আয়েশা ও ইবনে ওমর (রা.) -এর হাদীস থেকে দলিল গ্রহণ করেছেন। অবশেষে ইবরাহীম নাখয়ী (র.)-এর অভিমত সহীহ্ হাদীস ও জমহুর ওলামায়ে কেরামের বিপরীত হওয়াতে শায্ হয়েছে। পাঁচ প্রকারের ইঁদুর যথা– জারাদা, খলা, ফারাতুল ইব্ল, ফারাতুল মিস্ক ও ফারাতুল গায়ত সবই খাওয়া হারাম এবং ইহরাম অবস্থায় মারা জায়েজ।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٥٨١ - عَنْ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ فِى الْاِحْرَامِ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيْدُوْهُ اَوْ يُصَادُ لَكُمْ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

২৫৮১. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শিকারের গোশ্ত তোমাদের জন্যে ইহরামেও হালাল, যতক্ষণ না তোমরা নিজেরা শিকার কর অথবা তোমাদের উদ্দেশ্যে শিকার করা হয়।

—[আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَوْ يُصَادُ لَكُمْ-এর ব্যাখ্যা : হাদীসটির বাহ্যিক অর্থে বুঝা যায় যে, কোনো অমুহরিম ব্যক্তি মুহরিমের উদ্দেশ্যে শিকার করলে তার গোশ্‌ত খাওয়া মুহরিমের জন্যে হালাল নয়। অথচ পূর্বে হযরত আবূ কাতাদা (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এমন শিকারের গোশ্‌ত মুহরিম খেতে পারবে। এর উত্তরে হানাফীগণ বলেন, يُصَادُ لَكُمْ-এর অন্তর্নিহিত অর্থ হলো, মুহরিমের নির্দেশে অথবা ইঙ্গিত-ইশারায় যে জন্তু শিকার করা হয় তাকেই তোমাদের জন্য শিকার করা বলা হয়ে থাকে। অন্যথায় কোনো ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামতো শিকার করে অন্যকে এর কিছু গোশ্‌ত হাদিয়া দিলে 'তোমাদের জন্যে শিকার করা হয়েছে' বলা যায় না। তাই হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন, এখানে لَكُمْ-এর লাম মালিকানা প্রকাশের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং أَوْ ইসতিছনা বা إِلَّا أَنْ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২৫৮২ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

২৫৮২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, টিড্ডি সমুদ্রের শিকারের অন্তর্গত। –[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

'ফাতহুল ওয়াদুদ' গ্রন্থে লিখিত হয়েছে যে, টিড্ডি মাছ হতে জন্ম লাভ করে। কেউ কেউ বলেছেন, মাছ যখন নাক ঝাড়ে তখন একপ্রকার সূক্ষ্ম কীট নাক হতে বের হয় এবং সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথে তা তীরে নিক্ষিপ্ত হয় ঐ কীটগুলো স্থলভাগ হতে খাদ্য গ্রহণ করে বড় হয় এবং স্থলেই বাস করে। এজন্য অধিকাংশের মতে টিড্ডি স্থলজ প্রাণী। কাজেই এটাকে হত্যা করা যায় না হত্যা করলে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। এটা হযরত ওমর (রা.), হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), ইমাম আ'যম, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, আতা (র.) প্রমুখেরও মাযহাব।

কিছু সংখ্যকের মতে, হাদীসের অর্থ হচ্ছে সমুদ্রের জীব শিকার যেরূপ মুহরিমের জন্যে জায়েজ, সেরূপ টিড্ডি শিকারও জায়েজ এর অর্থ এই নয় যে, এটা সামুদ্রিক জীব।

মুহরিমের টিড্ডি হত্যা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী, কা'ব আহবার ও উরওয়াহ ইবনে যুবাইর (রা.)-এর মতে, মুহরিম টিড্ডি মারতে পারে, এজন্যে তাকে কোনো 'দম' বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তাঁদের মতের অনুকূলে নিম্নলিখিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস রয়েছে– টিড্ডি সামুদ্রিক শিকার, সকল সামুদ্রিক শিকারই মুহরিমের জন্যে হালাল। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমাদের [মুহরিমদের] জন্যে সমুদ্রের শিকার হালাল করা হলো। সুতরাং টিড্ডিও মুহরিমের জন্যে হালাল হবে।

আল্লামা আইনী (র.) বলেছেন, সঠিক কথা এই যে, টিড্ডি স্থলজ শিকার। অনুরূপভাবে আল্লামা দারিমী (র.) স্বীয় গ্রন্থ 'হায়াতুল হায়ওয়ানে' লিখেছেন, 'টিড্ডি স্থলজ প্রাণী; জলজ নয়'।

ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, শাফেয়ী (র.), হযরত ওমর, ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখের মতে টিড্ডি স্থলজ প্রাণী। সুতরাং তা মারলে 'দম' আদায় করতে হবে। একবার হযরত কা'ব আহবার ইহরাম অবস্থায় দুটি টিড্ডি ভুলবশত ধরেছিলেন। পরে ইহরামের কথা স্মরণ হলে তাদেরকে ছেড়ে দিলেন এবং কাফফারায় দুটি দিরহাম আদায় করে দিয়েছেন। হযরত ওমর (রা.)-কে ঘটনাটি অবগত করলে তিনি বললেন, তুমি উত্তম কাজই করেছ। এ ঘটনা হতে বুঝা যায়, হযরত ওমর (রা.)ও ক্ষতিপূরণ আদায় করাকে আবশ্যক মনে করেছেন। আর হযরত ওমরের এ উক্তিটি বহু সাহাবীর সম্মুখে হয়েছিল বিধায় একে ইজমাও বলা চলে।

প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব : প্রথমোক্ত দল হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এর জবাবে বলা হয়েছে যে, ঐ হাদীসে আবূ মাহযাম রাবী য'ঈফ। শো'বা প্রমুখ এবং জারাহ্ ও তা'দীলের ইমামগণ একে য'ঈফ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবূ দাউদ হাম্মাদ মাইমূন হতে, মাইমূন আবূ রাফে' হতে, আবূ রাফে' হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করছেন। এ হাদীস সম্পর্কে আইনী (র.) বলেছেন, এটা সন্দেহজনক ব্যাপার। কেননা, কোনো কোনো হাদীসে এটাকে কা'বের উক্তি বলে বলা হয়েছে, অর্থাৎ আবূ রাফে' (রা.) হতে.......। বায়হাকী প্রমুখও মাইমূনকে অজ্ঞাত পরিচয় রাবী বলে বর্ণনা করেছেন। তাহলে এ য'ঈফ হাদীসসমূহের মোকাবিলায় হযরত ওমর (রা.)-এর ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত উক্তি বেশি নির্ভরযোগ্য হবে। কারণ, তিনি সকল সাহাবীর সম্মুখেই ক্ষতিপূরণ আবশ্যক বলে ব্যক্ত করেছেন।

অথবা জবাব এই যে, রাসূল ﷺ -এর উক্তি "টিডি সমুদ্রের শিকারের অন্তর্গত" দ্বারা মুহরিমের পক্ষে টিডি হত্যা বৈধ প্রমাণ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর অর্থ এই যে, সামুদ্রিক শিকারের মতো টিডিকেও জবাই করা ব্যতীত খাওয়া জায়েজ। যেমন বর্ণিত হয়েছে– أُحِلَّتْ لَنَا الْمَيْتَتَانِ وَالدَّمَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ "আমাদের জন্য দুটি মৃতপ্রাণী ও দুটি রক্ত খাওয়া হালাল করা হয়েছে মাছ ও টিডি আর কলিজা ও প্লীহা।"

وَعَنْ ٢٥٨٣ أَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِيْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৫৮৩. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ইহরামকারী হিংস্র জন্তু হত্যা করতে পারে। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٢٥٨٤ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ (رضـ) قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الضَّبُعِ اَصَيْدٌ هِىَ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ اَيُؤْكَلُ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

২৫৮৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবূ আম্মার [তাবিয়ী] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-কে বিজু [ধারাল নখ ও দাঁতবিশিষ্ট বেজি, কাঠবিড়ালী, মরু অঞ্চলের প্রাণী] সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি শিকার? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, এটা কি খাওয়া যায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। –[তিরমিযী, নাসায়ী, শাফেয়ী। তিরমিযী (র.) বলেছেন, এটা হাসান সহীহ হাদীস।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلضَّبُعُ [দাবউ] কি? اَلضَّبُعُ [দাবউ] উর্দুতে এর অর্থ– 'বিজ্জু'। আমাদের এলাকায় বলে 'খোর-গোদনী'। এটা ধারাল দাঁত ও লম্বা নখবিশিষ্ট হিংস্র জন্তু। বেজি, নেউল ও উদ্‌শিয়াল ইত্যাদির ন্যায় মাটিতে গর্ত করে থাকে। এর চরিত্র সম্পর্কে কথিত আছে যে, এটা একটি অদ্ভুত প্রকৃতির প্রাণী। এটা এক বৎসর স্ত্রী থাকে আবার পরের বৎসর পুরুষ হয়ে যায় এবং পরবর্তী বৎসর স্ত্রীতে রূপান্তরিত হয়। এরা কবর খুঁড়ে মৃত লাশ খায় এবং তা ছিন্নভিন্ন করে ফেলে।

দাবউ খাওয়া সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : ضَبُعٌ বা বিজ্জু খাওয়া জায়েজ কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর মতে বিজ্জু বা ষণ্ডা খাওয়া জায়েজ। তাঁদের দলিল হলো আব্দুর রহমান ইবনে আবী আম্মার বর্ণিত অত্র হাদীসটি।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَجُمْهُوْرِ اَئِمَّةٍ (رحـ) : ইমাম আ'যম, ইমাম মালেক (র.) ও জমহুরের মতে, বিজ্জু খাওয়া হারাম। যেমন–

১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রতিটি ধারাল নখবিশিষ্ট হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম [নাসায়ী প্রমুখ]।
২. হযরত আবূ ছা'লাবা (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিংস্র জন্তুদের মধ্যে ধারাল নখবিশিষ্ট জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন। এটা মশহুর হাদীস। বিজ্জুও হিংস্র নখবিশিষ্ট জন্তু।
৩. আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثُ 'তোমাদের পক্ষে অপবিত্র জন্তু হারাম করা হলো।' বিজ্জুও একটি অপবিত্র জীব। কেননা, এরা কবর খুদে মৃত ভক্ষণ করে।
৪. হযরত খুযায়মা (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি বলেছেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিজ্জু খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, কেউ কি বিজ্জু খায়? এ প্রশ্নবোধকটি নেতিবাচক। অর্থাৎ প্রশ্নের মধ্যেই নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব : হযরত জাবের বর্ণিত হাদীসের জবাবে বলা যায় যে, হযরত জাবের (রা.) একে হালাল ও শিকার ধারণা করে স্বীয় ইজতেহাদ দ্বারাই প্রশ্নকারীর জবাবে হ্যাঁ বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ হতে শুনে বলেননি। তিনি ধারণা

করেছেন বিজু যখন শিকার, কাজেই তা খাওয়াও হালাল হবে। অথচ প্রকৃত কথা এরূপ নয়। কেননা, বাঘ, সিংহ, গণ্ডার প্রভৃতি জন্তুও তো শিকার, অথচ এগুলো খাওয়া হারাম।

এছাড়া 'ধারাল নখবিশিষ্ট প্রাণী খাওয়া হারাম' এ হাদীসটি মাশহুর। পক্ষান্তরে জাবেরের হাদীসটি একদিকে যেমন মাশহুর নয়, অপরদিকে এর সনদের মধ্যে বিতর্কিত রাবীও আছেন। কাজেই জাবেরের বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। পরিশেষে মূলনীতি অনুসারে হারাম ও হালালের মধ্যে পরস্পর বিরোধ হাদীস আসলে হারামকেই প্রাধান্য দিতে হয়। কাজেই বিজু খাওয়া যে হারাম তাই প্রমাণিত হলো।

وَعَنْ ٢٥٨٥ جَابِرٍ (رض) قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الضَّبُعِ قَالَ هُوَ صَيْدٌ وَيَجْعَلُ فِيْهِ كَبْشًا اِذَا اَصَابَهُ الْمُحْرِمُ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

২৫৮৫. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিজু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম [এটা শিকারের অন্তর্ভুক্ত কিনা]। তিনি বলেন, এটা শিকার। যখন মুহরিম এটা শিকার করবে এর ক্ষতিপূরণে একটি দুম্বা দেবে। –[আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

টীকা : ইমাম নাসায়ী (রা.) বলেছেন, হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই য'ঈফ।

وَعَنْ ٢٥٨٦ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزِيٍّ (رض) قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْلِ الضَّبُعِ قَالَ اَوَ يَاكُلُ الضَّبُعَ اَحَدٌ وَسَأَلْتُهُ عَنْ اَكْلِ الذِّئْبِ قَالَ اَوَ يَاكُلُ الذِّئْبَ اَحَدٌ فِيْهِ خَيْرٌ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ)

২৫৮৬. অনুবাদ : হযরত খুযায়মা ইবনে জাযী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিজু খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। রাসূল ﷺ বললেন, কেউ কি বিজু খায়? আর আমি তাঁকে নেকড়ে বাঘ খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, নেকড়ে বাঘকে কি কোনো ভালো লোক খেতে পারে? –[তিরমিযী। তিরমিযী (র.) বলেন, এর সনদ সবল নয়।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ব্যাখ্যা : নেকড়ে বাঘ খাওয়া সব ইমামের মতে হারাম। কেননা, এটি হিংস্র প্রাণী। উল্লিখিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উত্তরে নিষেধাজ্ঞা নিহিত রয়েছে। এখানে যে اِسْتِفْهَامْ রয়েছে তা اِسْتِفْهَام اِنْكَارِيْ

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٥٨٧ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ (رض) قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَاُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنْ اَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَافَقَ مَنْ اَكَلَهُ قَالَ فَاَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৫৮৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে উসমান তায়মী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা [আমার চাচা] তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহর সাথে সকলেই ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। এ সময় তাঁকে একটি পাখি উপঢৌকন দেওয়া হলো। তখন তালহা (রা.) নিদ্রিত ছিলেন। আমাদের কেউ কেউ তা হতে খেলেন আর কেউ কেউ বিরত থাকলেন [সংযম অবলম্বন করলেন]। যখন তালহা (রা.) জাগলেন, যারা খেলেন তাদের পক্ষাবলম্বন করলেন এবং বললেন, আমরা এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে খেয়েছি। —[মুসলিম]

بَابُ الْاِحْصَارِ وَفَوْتِ الْحَجِّ
পরিচ্ছেদ : বাধাপ্রাপ্ত হওয়া এবং হজ ফওত হওয়া

اِحْصَارٌ শব্দটি বাবে اِفْعَالٌ -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে– বাধা দেওয়া, ঘিরে ফেলা। শরিয়তের পরিভাষায় হজ বা ওমরা হতে বাধা দেওয়া বা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া, যেমন কোনো ব্যক্তি হজ বা ওমরার ইহরাম বাঁধল; কিন্তু সে অনুযায়ী তাকে কাজ করতে দেওয়া হয়নি। যেমনি পবিত্র কুরআনে এসেছে– فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ الخ অর্থাৎ যখন তোমরা অবরুদ্ধ বা বাধাপ্রাপ্ত হবে তখন তোমাদের পক্ষে যা সহজ হয় কুরবানি কর। –[বাকারা : ১৯৬] আলোচ্য পরিচ্ছেদে এ প্রসঙ্গীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٥٨٨ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَدْ اُحْصِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتّٰى اِعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৫৮৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [ওমরায়] বাধাপ্রাপ্ত হলেন, তখন আপন মাথা মুড়িয়ে ফেললেন, স্ত্রীদের সাথে সহবাস করলেন এবং হাদীর পশু নহর করলেন, অবশেষে পরবর্তী বছর [এর কাজা স্বরূপ] ওমরা করলেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বাধা অপসারিত হওয়ার পর হজ ও ওমরার কাজা : আলোচ্য হাদীসের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি করলে বুঝা যায় যে, প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয়ে গেলে হজ ও ওমরা উভয়টি কাজা করতে হবে। অবশ্য এখানে এ কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন ধরনের ইহরাম বেঁধেছে? শুধু হজের, না শুধু ওমরার, নাকি উভয়টির?

যদি শুধু হজের ইহরাম বেঁধে থাকে এবং বাধা অপসারিত হওয়ার পর হজের সময়ও বাকি থাকে আর ঐ বছরই তার হজ করার ইচ্ছাও থাকে তবে ইহরাম বেঁধে হজ আদায় করবে। সে কাজার নিয়ত করবে না এবং তার প্রতি কোনো ওমরাও ওয়াজিব হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁর 'মাবসূত' গ্রন্থে এরূপই উল্লেখ করেছেন।

যদি বছর পার হয়ে গিয়ে থাকে তবে যে ইহরাম বেঁধেছিল তার প্রতি হজ ও ওমরা উভয়টি আবশ্যক হবে। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ (রা.) হতে এরূপই বর্ণিত আছে।

আর যে মুহরিম শুধু ওমরার ইহরাম বেঁধেছে তার জন্যে ওমরা কাজা করা ওয়াজিব। আর কারিনের প্রতি এক হজ ও দু ওমরা ওয়াজিব। প্রথম ওমরা কিরান হজের অংশ। হজ্জে ইফরাদ বা কিরানে অতিরিক্ত একটি ওমরা এ জন্যে ওয়াজিব হবে যে, এটা সে ব্যক্তির মতো হয়েছে যার হজ নষ্ট হয়েছে।

ওমরার নিয়তকারী মুহসির হয় কিনা? ইমাম মালেক, ইবনে সীরীন (র.) ও জাহেরিয়াদের অভিমত হলো, ওমরার নিয়তকারী বাধাপ্রাপ্ত হলে তাকে 'মুহসার' বলা যাবে না। তথা তার ক্ষেত্রে اِحْصَارٌ 'ইহসার' শব্দটি প্রযোজ্য নয়। কারণ, ওমরার জন্যে কোনো মাস বা সময় নির্দিষ্ট নেই; বরং বৎসরের যে কোনো সময়ই তা আদায় করতে পারে। কাজেই সে বাধাপ্রাপ্ত হলেও কোনো ক্ষতি নেই।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-সহ জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, ওমরার ক্ষেত্রেও ইহসারের বিধান প্রযোজ্য হবে। হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণিত ৬ষ্ঠ হিজরিতে নবী করীম ﷺ কুরাইশ কর্তৃক হুদায়বিয়ায় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন ওমরার সফরে। অথচ ইহসারের বিধান সংবলিত আয়াত তখনই নাজিল হয়েছে। কাজেই বুঝা যায় যে, ওমরায়ও ইহসার প্রযোজ্য হবে।

اَلْاِخْتِلَافُ فِىْ تَعْيِيْنِ مَقَامِ ذَبْحِ الْهَدْيِ بَعْدَ الْاِحْصَارِ বাধাপ্রাপ্তির পরে হাদীর জন্তু জবাইয়ের স্থান সম্পর্কে মতভেদ : বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পরে যে হাদী জবাই করার বিধান রয়েছে ঐ জবাইয়ের স্থান সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম

শাফিয়ী (র.)-এর মতে, হাদীর জন্তু জবাই করার জন্যে হারাম সুনির্দিষ্ট নয়; বরং যে স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে ঐ স্থানেই জবাই করতে পারে, চাই তা হিলই হোক না কেন। কাযী বায়যাবী (র.) এটাকেই অধিকাংশ ইমামের মত বলে জানিয়েছেন এবং বলেছেন– আল্লাহর বাণী "যা তোমাদের জন্য সহজ হয় কুরবানির পশু" এর অর্থ যদি মুহরিম বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং হালাল হতে ইচ্ছা করে তবে হাদীর পশু-উষ্ট্রী, গাভী, বকরি যা তার পক্ষেসহজ হয়, যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে সেখানেই জবাই করে হালাল হয়ে যাবে। এর দলিল এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ার বছর হুদায়বিয়াতেই হাদীর পশু জবাই করেছিলেন– ঐ স্থানটি ছিল হিল। –[বায়যাবী] হুদায়বিয়ার [যা হিল্লে অবস্থিত] যখন হাদী জবাই করেছেন তখন বুঝা যায় যে, হাদী জবাই করার জন্য হারাম হওয়া শর্ত নয়।

কিন্তু ইমাম আ'যমের মতে, বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পরে যখন হালাল হওয়া জায়েজ তখন বাধাপ্রাপ্ত ইহরামকারীকে বলা হবে যে, একটি হাদী প্রেরণ কর, যাকে হারামে জবাই করা হবে এবং যার মারফতে হাদী পাঠানো হবে তার সাথে জবাইয়ের দিন-ক্ষণও স্থির করে দেবে, যখন সেদিন হবে এবং বাধাপ্রাপ্ত মুহরিম অনুমান করবে যে, এখন তার প্রেরিত হাদী জবাই করা হয়েছে তবে সে হালাল হয়ে যাবে। হাদী জবাই করার জন্য হানাফী মতে যে হারামই সুনির্দিষ্ট এর অনুকূলে স্বয়ং শাফেয়ী মতাবলম্বী বায়যাবী (র.) দলিল প্রদান করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী– لَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ অর্থাৎ তোমরা যতক্ষণ না জান যে, প্রেরিত হাদী হারামের যেখানে নহর করা ওয়াজিব সেখানে পৌঁছেছে অর্থাৎ বায়তুল আতীকে পৌঁছেছে [এবং জবাই বা নহর হয়েছে] ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের মাথা মুড়িও না।

এতদ্ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার বাণী– هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ এতেও বুঝা যায় যে, জবাইয়ের স্থান হারামেই। কেননা, বাধাপ্রাপ্তির স্থান যা হিল্লে– যদি তা জবাইয়ের স্থান হতো তবে وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ বলতেন না। কারণ বাধাপ্রাপ্তির স্থান অর্থাৎ হিল্লে তো পৌঁছেছে শুধু হারামেই পৌঁছেনি, যাকে مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ কথা দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। –[আবূ বকর রাযী]

ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রমুখ বলেছেন, হুদায়বিয়া হিল্লে (حِلٌّ) অবস্থিত। মহানবী ﷺ তথায়ই হাদী জবাই করেছিলেন। এর জবাব হলো– মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান ইবনে হাকাম হতে বর্ণিত আছে যে, হুদায়বিয়ার কিছু অংশ হিল্লে এবং কিছু অংশ হারামে। সুতরাং হুদায়বিয়ায় হাদী জবাই করলেই যে হিল্লে জবাই করা হয়েছিল এমন কথা বলা যায় না। হুদায়বিয়া মক্কার নিকটবর্তী একটি গ্রাম। এ গ্রামের অধিকাংশ এলাকাই হারামের অন্তর্ভুক্ত। –[তা'লীক, হিদায়া ও বায়যাবী]

٢٥٨٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُوْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ هَدَايَاهُ فَحَلَقَ وَقَصَّرَ اَصْحَابُهٗ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৫৮৯. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে [ওমরার উদ্দেশ্যে] বের হলাম আর কুরাইশের কাফেররা [হুদায়বিয়াতে] তাঁর ও বায়তুল্লাহ শরীফের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াল। তখন নবী করীম ﷺ তথায় আপন হাদীর পশু নহর করলেন, মাথা মুড়ালেন এবং তাঁর সাহাবীগণ চুল কেটে ছোট করলেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইহসার গণ্য হবার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ : কিভাবে বাধাপ্রাপ্ত ইহসার হিসেবে পরিগণিত হবে এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَاَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ وَلَيْثِ بْنِ سَعْدٍ (رحـ) : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও লাইস ইবনে সা'দ (র.)-এর মতে শুধু শত্রু কর্তৃক বাধাকেই ইহসার বলা হবে। তাঁদের মতে– ইহসার শত্রুর সাথে সুনির্দিষ্ট। এটা হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর অভিমত। তাঁদের দলিলগুলো নিম্নরূপ–

১. আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ অর্থাৎ যখন তোমরা অবরুদ্ধ বা বাধাপ্রাপ্ত হবে তখন তোমাদের পক্ষে যা সহজ হয় কুরবানি কর। –[বাকারা : ১৯৬] কেননা, রাসূল ﷺ ৬ষ্ঠ হিজরিতে ওমরার নিয়তে বের হয়ে শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন এবং হুদায়বিয়া হতে ফিরে আসেন। ঐ সময়ই এ আয়াত নাজিল হয়। সুতরাং ইহসারও শত্রু কর্তৃকই হবে।

২. আবার আয়াতের শেষাংশে আছে– فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ اَلْاٰيَةَ সুতরাং নিরাপত্তাও শত্রু হতেই হয়ে থাকে; রোগ হতে নয়। কাজেই ইহসারও শত্রু হতেই হবে।

৩. এতদ্ব্যতীত হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, উভয়ে বলেছেন– শত্রু ছাড়া কোনো তরফ হতে 'বাধা' হয় না।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَصَاحِبَيْنِ وَجَعْفَرٍ وَثَوْرِيِّ (رح) وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আবূ হানীফা, সাহেবাইন, জা'ফর, ছাওরী, ইবরাহীম নাখয়ী ও আতা (র.)-এর মতে, যা কিছুই মুহরিমকে ইহরাম অবস্থায় করণীয় হতে বাধা দেয় তা সবই ইহসারের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং শত্রু, রোগ-ব্যাধি, বন্দী হওয়া, পথ খরচ বিনষ্ট হওয়া, সমুদ্র পথে মনে শান্তি না থাকা ইত্যাদি সবকিছু দ্বারাই বাধাপ্রাপ্তি হতে পারে। তাঁদের দলিল নিম্নরূপ–

ইহসারের আয়াতে ইহসার শব্দটি আম বা সাধারণ। অর্থাৎ শত্রু কর্তৃক বাধা, রোগ-ব্যাধির বাধা অথবা যে কোনো প্রকার বাধা হতে পারে। বাদায়ে' গ্রন্থকার বলেন, কুরআনে 'হাসার' (حَصْر) শব্দটিই নেওয়া হয়নি যা শত্রুর পক্ষ হতে হয়ে থাকে; বরং ইহসার (اِحْصَار) শব্দ নেওয়া হয়েছে যা রোগ-ব্যাধির কারণেও হয়ে থাকে। আরবি অভিধান বিশেষজ্ঞ ফাররা, ইবনে সাক্কিত, আবূ ওবায়দা, কাসাঈ, আখফাশ প্রমুখও এ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। আয়াতটি নাজিলের কারণ শত্রুর বাধা হওয়া সত্ত্বেও 'হাসর' শব্দটি নেওয়া হয়নি– যা শত্রুর সাথে সম্পৃক্ত; বরং 'ইহসার' শব্দটি নেওয়া হয়েছে যা রোগ-ব্যাধির সাথে সম্পৃক্ত। এতে বুঝা যায় যে, একই আদেশ দ্বারা রোগব্যাধি সংক্রান্ত বাধাকেই শামিল করার উদ্দেশ্য রয়েছে।

* হাজ্জাজ ইবনে আমর আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যার পা ভেঙ্গে গিয়েছে অথবা খোঁড়া হয়ে গিয়েছে সে হালাল হয়ে যাবে; তার প্রতি আর একবার হজ করা আবশ্যক হবে। রাবী বলেন, এটা আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও আবূ হুরায়রাকে বললাম, তাঁরা বললেন, তিনি সত্য বলেছেন।

*** হাজ্জাজ ইবনে আমর হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার পা ভেঙ্গে গিয়েছে, অথবা যে খোঁড়া হয়ে গিয়েছে, কিংবা অসুখে পড়েছে সে হালাল হয়ে গিয়েছে। –[আবূ দাঊদ]**

যদি কোনো অঙ্গ ভেঙ্গে যায়, লেংড়া হয়ে যায় অথবা অসুস্থ হয়ে পড়ে তাকে হালাল হতে বলেছেন, অর্থাৎ কোনো 'দম' ছাড়াই সে হালাল হয়ে যাবে। উপরিউক্ত বর্ণনা হতে ইহসার প্রমাণিত হয়। যেহেতু অধিকাংশ রেওয়ায়েতে 'অথবা অসুখে পড়েছে' কথাটি নেই এজন্যে মাসাবীহের গ্রন্থকার এটাকে য'ঈফ বলেছেন নতুবা ইমাম তিরমিযী (র.) এটাকে হাসান বলেছেন।

প্রতিপক্ষের **দলিলের জবাব** : ইমাম মালেক, শাফেয়ী প্রমুখ ইহসারের আয়াত সম্পর্কে বলেছেন যে, এটা নাজিলের কারণ শত্রুর সাথে সম্পর্কিত। এর জবাব হলো– উসূলের সূত্র এই যে, শব্দের সাধারণত্ব অনুসারে এর উপর হুকুম অর্পিত হবে; সুনির্দিষ্ট শানে নুযূলের উপরে নয়। যদিও শানে নুযূল খাস হয়, তবু হুকুম আম হয়ে সকল প্রকার বাধাই ইহসারের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন হানাফী মতাবলম্বীদের প্রথম দলিল তথা ইহসারের আয়াতে বলা হয়েছে।

* তাঁদের দ্বিতীয় দলিলে বলা হয়েছে যে, আমান বা নিরাপত্তা শুধু শত্রু হতেই হয়ে থাকে। এর জবাব হলো, আমান রোগ-ব্যাধিতেও ব্যবহৃত। যেমন রাসূলের বাণী– اَلزُّكَامُ اَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ কফই কুষ্ঠরোগের আমান বা নিরাপত্তা। এখানে আমান শব্দটি দ্বারা বিশেষভাবে শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়া হতে আমান হওয়াই বুঝায়নি। যদি ইহসার শত্রুর সাথে সুনির্দিষ্ট হয়– যেমন শাফেয়ীগণ মনে করেন তবে রোগ-ব্যাধির কারণে ইহসারকেও এর অন্তর্ভুক্ত করবে। কেননা, হালাল হয়ে যাওয়া ক্ষতি এড়ানোর জন্যেই হয়ে থাকে, আর রোগ-ব্যাধি অবস্থায়ও ক্ষতি প্রমাণিত হয়। এজন্যে অবরুদ্ধ বা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হালাল হতে পারে।

তৃতীয় দলিলে হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমরের কথা নিয়েছেন, "শত্রুর বাধা ছাড়া কোনো তরফ হতে বাধা হয় না" এর অর্থ এই যে, শত্রু কর্তৃক বাধাই ইহসারের সবচেয়ে বড় কারণ। এর অর্থ এ নয় যে, তা ব্যতীত বাধার আর কোনো কারণ নেই। –[আইনী, তা'লীক, ফাত্হ, বা'ল]

وَعَنْ ٢٥٩٠ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ (رض) قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ اَنْ يَحْلِقَ وَاَمَرَ اَصْحَابَهُ بِذٰلِكَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৫৯০. অনুবাদ : হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা মুড়ানোর পূর্বে পশু জবাই করেছেন এবং তাঁর সহচরগণকে এর আদেশ করেছেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অত্র পরিচ্ছেদের প্রথম হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহরাম হতে হালাল হওয়ার জন্যে রাসূল ﷺ প্রথমে মস্তক মুণ্ডন করেছেন এবং শেষে কুরবানি করেছেন। বস্তুত শরিয়তের বিধান এর বিপরীত যা অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায়। অর্থাৎ প্রথমে কুরবানি এবং শেষে মস্তক মুণ্ডন। এর জবাবে বলা হয় যে, এ হাদীসে এটি تَرْتِيْب বা ক্রম বর্ণনার জন্যে নয়; বরং সমষ্টি বর্ণনা করার জন্যে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) নবী করীম ﷺ -এর কাজের সমষ্টি বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ মহানবী ﷺ এসব কাজ করে হালাল হয়েছিলেন। তিনি কোনটি আগে বা কোনটি পরে করেছিলেন? তা বর্ণনা করা এখানে উদ্দেশ্য নয়।

وَعَنْ ٢٥٩١ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّهُ قَالَ اَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ حُبِسَ اَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا فَيُهْدِيْ اَوْ يَصُوْمُ اِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৫৯১. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের জন্যে কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত যথেষ্ট নয়? যদি তোমাদের কাউকেও হজ হতে [আরাফায় অবস্থান হতে] আবদ্ধ রাখা হয় তবে সে বায়তুল্লাহর তওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সায়ী করবে। অতঃপর প্রত্যেক বস্তু হতে হালাল হয়ে যাবে, যাবৎ না আগামী বছর হজ করে। [সায়ীর পর] সে হাদীর পশু জবাই করবে অথবা যদি হাদীর পশু না জুটে তাহলে রোজা রাখবে। -[বুখারী]

وَعَنْ ٢٥٩٢ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكِ اَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا اَجِدُنِيْ اِلَّا وَجْعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِّيْ وَاشْتَرِطِيْ وَقُوْلِيْ اَللّٰهُمَّ مَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৯২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ [তাঁর চাচাতো বোন] যুবাআ বিনতে যুবায়রের কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে বললেন, সম্ভবত তুমি হজ করতে ইচ্ছে করেছ? তিনি বলেন, [হ্যাঁ, তবে] আল্লাহর কসম! আমি নিজেকে কখনো রোগী ছাড়া পাই না। তখন রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি হজের নিয়ত কর এবং শর্তারোপ করে বল যে, হে আল্লাহ! তুমি অমাকে যেখানেই আবদ্ধ করবে আমি সেখানেই হালাল হয়ে যাব। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হজে শর্তারোপ সম্পর্কে মতভেদ : যে স্থানে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব অথবা হজ সম্পন্ন করতে অপারগ হয়ে যাব, সেখানে আমি হালাল হয়ে যাব। ইহরাম বাঁধার সময় এ ধরনের শর্তারোপ শরিয়ত সম্মত কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে-

* জাহিরিয়া সম্প্রদায় বলেন, এরূপ শর্ত আরোপ করা ওয়াজিব। তাঁরা অত্র হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন।

তিরমিযী (র.) ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (র.) হতে বর্ণনা করেন যে, যদি হজকারী শর্তারোপ করে তবে ইহরাম হতে বের হয়ে হালাল হওয়া জায়েজ। তিনি বলেন, এ শর্তারোপ জমহুর সাহাবী ও তাবেয়ী হতে বর্ণিত হয়েছে।

مَذْهَبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ (رحـ) وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আ'যম, মালেক ও তাবেঈনদের কারো কারো মতে, হজে শর্তারোপ করা জায়েজ নেই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি হজে শর্তারোপকে অস্বীকার করেছেন। যেমন তাঁর উক্তি- "তোমাদের জন্যে কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত যথেষ্ট নয়? যখন তোমাদের কাউকেও হজ হতে আবদ্ধ রাখা হয় সে বায়তুল্লাহর তওয়াফ ও সাফা মারওয়ায় সায়ী করবে। অতঃপর হালাল হয়ে যাবে যাবৎ না আগামী বছর হজ করে। [সায়ীর পর] সে হাদীর পশু জবাই করবে অথবা হাদীর পশু না জুটলে রোজা রাখবে।" -[বুখারী] অর্থাৎ যখন হজ হতে বাধাপ্রাপ্ত হবে তখন ওমরা সম্পন্ন করবে এবং আগামী বছর হজ কাজা করবে।

প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব : হযরত যুবাআ (রা.)-এর হাদীসে শর্ত আরোপের উল্লেখ রয়েছে এর জবাব হলো, শর্তারোপের আদেশ যুবাআর জন্যে সুনির্দিষ্ট ছিল। আর এটা বিশেষ ঘটনার সাথে খাস ছিল। এটা তার প্রতিও সকল সময়ের জন্যে আম [ব্যাপক] আদেশ ছিল। এর প্রমাণ পরবর্তী বর্ণনায় রয়েছে। যাতে শর্তারোপ ব্যতীতই হালাল হওয়ার বিধান রয়েছে।

অথবা জবাব এই যে, রাসূল ﷺ জুবাআকে সন্তুষ্ট করার জন্যে এবং তাঁর মনের শান্তির জন্যে শর্ত আরোপের আদেশ করেছিলেন যা প্রকৃত বিধান ছিল না; বরং প্রকৃত বিধান এটাই যা হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। –[আইনী, ফাত্হ, বাজ্ল, তা'লীক]

রোগের কারণে ইহসার হবে কিনা : শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ব্যতীত রোগ বা অন্যকোনো কারণে ইহরাম অবস্থায় পথে বাধাপ্রাপ্ত হলে তা اِحْصَارٌ বা প্রতিবন্ধক বলে গণ্য করা যাবে কিনা? এ সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ আছে।

ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (র.) প্রমুখ বলেন, শুধুমাত্র শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়াকেই শরিয়তের বিধানে 'ইহসার' বলা হয়। সুতরাং এ একটি মাত্র কারণই 'ইহসার'-এর উপর প্রযোজ্য হয়।

তাঁদের দলিল : আল্লাহর কালামে আছে– فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ এখানে اَمِنْتُمْ অর্থ নিরাপত্তা লাভ করা। আর তা শত্রু হতেই হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে রোগ বা অন্যকোনো প্রতিবন্ধকতা হতে নিরাপদ হওয়াকে اَمَانٌ বলা হয় না। এছাড়া হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, হজ ও ওমরার ইহরামে পথে শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়াকেই শরিয়তে ইহসার বা বাধা বলে।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَصَاحِبَيْنِ وَ زُفَرَ وَثَوْرِىْ (رحـ) وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আবূ হানীফা, সাহেবাইন, জা'ফর, ছাওরী, ইবরাহীম নাখয়ী ও আতা (র.) প্রমুখ বলেন, ইহরাম অবস্থায় মুহরিমকে তার করণীয় কাজ হতে বাধা দেয়, এমন সমস্ত কারণই ইহসারের অন্তর্ভুক্ত। চাই তা শত্রুর দরুন হোক কিংবা রোগ ইত্যাদির কারণে হোক। যেমন– বন্দী হওয়া, পথ খরচ বিনষ্ট হওয়া, যানবাহন অচল হওয়া ইত্যাদি। মূলত ইহসার শব্দটি আম। অভিধানবিদগণ বলেন, কুরআনে (حَصْر) হাসার শব্দ বলা হয়নি; বরং বলা হয়েছে (اِحْصَارٌ) ইহসার। যদি হাসার বলা হতো, তবে শুধু শত্রু কর্তৃক বাধা হওয়া বুঝাত। সুতরাং ইহসার অর্থের তাৎপর্য হলো, যে কোনোভাবে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। এখানে যুবাআ বিনতে যুবাইরের হাদীসের শব্দ حَبَسْتَنِىْ [হাবাস্তানী] শব্দ হতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, রোগ-ব্যাধিও প্রতিবন্ধকতার কারণ হতে পারে।

আবূ দাউদে হাজ্জাজ ইবনে আমর আনসারীর হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যার পা ভেঙ্গে গেছে বা খোঁড়া হয়ে গেছে বা রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, সে হালাল হয়ে গেছে। তার উপর আরেক বার হজ করা ওয়াজিব। হযরত ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরায়রাকে উক্ত কথাটি জানানো হলে তাঁরা উভয়েই বললেন, হাজ্জাজের বর্ণনাটি সত্য।

প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব : তাঁদের দলিলের জবাবে বলা হয় যে, اَمَانٌ শব্দটি শুধু শত্রু হতে নিরাপদ থাকার প্রসঙ্গ নয়; বরং রোগ-ব্যাধি হতে নিরাপদ থাকার প্রসঙ্গেও ব্যবহৃত হয়, যেমন– اَلزُّكَامُ اَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ নবী করীম ﷺ বলেছেন, কফ-কাশিই কুষ্ট রোগের আমান বা নিরাপদ।

অথবা, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) যে বলেছেন, 'শত্রু দ্বারাই ইহসার হয়'। এর অর্থ হলো– বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে এটাও অন্যতম বড় কারণ। অন্যথা এর অর্থ এই নয় যে, এটা ব্যতীত ইহসারের জন্যে কোনো কারণ নেই।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٥٩٣ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ اَصْحَابَهُ اَنْ يُّبَدِّلُوْا الْهَدْىَ الَّذِىْ نَحَرُوْا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِىْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৫৯৩. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে হুদায়বিয়ার বছর তারা যে হাদী নহর করেছিলেন [পরের বছর] কাজা ওমরায় এর পরিবর্তে অন্য হাদী নহর করতে আদেশ করেছিলেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হারামের বাইরে হাদী কুরবানি করার বিধান : হাদীর পশু কুরবানি করার স্থান সম্পর্কে অত্র হাদীসটি ইমাম আ'যমের অনুকূলে অন্যতম দলিল। তিনি বলেন, হাদীর পশু হারামেই কুরবানি করতে হবে। অন্যত্র করলে তা পুনরায় করতে হবে। হুদায়বিয়ার কতক অংশ হিল্লে এবং বাকিটা হারামের অন্তর্গত। এটা মক্কার নিকটবর্তী স্থান। রাসূল ﷺ এবং কোনো কোনো সাহাবী হারাম অংশেই তাদের হাদী নহর করেছিলেন, আর কেউ কেউ করেছিলেন হিল্ল অংশে। যারা হিল্ল অংশে করেছিলেন তাদেরকেই কুরবানি দোহরাতে বলা হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, হজ ও ওমরাকারীদের হাদী হারামের সীমার মধ্যেই নহর করা ওয়াজিব, বাইরে করলে পুনরায় করতে হবে।

وَعَنْ ٢٥٩٤ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَزَادَ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ رِوَايَةٍ أُخْرٰى أَوْ مَرِضَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَفِي الْمَصَابِيْحِ ضَعِيْفٌ)

২৫৯৪. অনুবাদ : হযরত হাজ্জাজ ইবনে আমর আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যার হাঁড় ভেঙ্গে গিয়েছে, অথবা যে খোঁড়া হয়ে গিয়েছে, সে হালাল হয়ে যাবে। আগামী বছর তার প্রতি হজ আবশ্যক।

–[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারিমী]

কিন্তু আবূ দাউদ অপর এক বর্ণনায় এ অংশটুকু বর্ধিত করেছেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "…. অথবা রোগাক্রান্ত হয়েছে।" ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, হাদীসটি হাসান; কিন্তু ইমাম বাগবী (র.) মাসাবীহ গ্রন্থে বলেন, এটা যঈফ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আল্লামা তুরপুশতী (র.) বলেছেন, আল্লামা বাগবী (র.) 'শরহে মা'আনিল আছার' গ্রন্থে এ হাদীসেরই সমর্থনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, রোগ ইত্যাদির কারণে হজ কিংবা ওমরায় বাধাপ্রাপ্ত হলে তা ধর্তব্য হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত এটাই।

وَعَنْ ٢٥٩٥ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيْلِيِّ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ أَيَّامُ مِنًى ثَلٰثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

২৫৯৫. অনুবাদ : হযরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়া'মুর দুআইলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি– আরাফাহ-ই হজ। যে মুযদালিফার রাতেই [৯ জিলহজ] সুবহে সাদিকের পূর্বে আরাফায় অবস্থান পেয়েছে, সে হজ পেয়েছে। মিনায় অবস্থানের সময় হলো তিন দিন। যে দু'দিনেই তাড়াতাড়ি করে প্রস্থান করবে তার গুনাহ হবে না, আর যে [তিন দিন পূর্ণ করে] দেরি করবে তারও গুনাহ হবে না।

–[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারিমী।

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মিনায় অবস্থানকাল তিনদিন অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ই জিলহজ। একে আইয়্যামে তাশরীক বলে। ১১ ও ১২ এ দু'দিন রমী করার পর তথায় অবস্থান করা জায়েজ, আর তিনদিন পর্যন্ত অবস্থান করা সুন্নত। নবী করীম ﷺ তিন দিনই অবস্থান করেছেন। দু'দিনে সেরে আসলে কোনো গুনাহ হবে না এবং তিন দিনের বেশি অপেক্ষা করলেও গুনাহ হবে না। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২০৩ নং আয়াতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

هٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ

[এ পরিচ্ছেদে তৃতীয় অনুচ্ছেদ নেই]

بَابُ حَرَمِ مَكَّةَ حَرَسَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى

পরিচ্ছেদ : মক্কার হেরেমে হারাম কার্যাবলির বর্ণনা [আল্লাহ একে রক্ষা করুন]

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কা'বা শরীফের চতুর্দিকে নির্দিষ্ট কিছু স্থানকে সম্মানিত করেছেন একে হারাম বা হেরেম শরীফ বলা হয়, এতে এমন কিছু কাজ নিষিদ্ধ, যা এর বাইরে নিষিদ্ধ নয়। যেমন– লড়াই করা, মশা-মাছি হত্যা করা, শিকার করা, সেখানকার গাছপালা কাটা ইত্যাদি। এ হারামের চতুর্দিকের দূরত্ব সমান নয়; বিশেষ করে তানঈমের দূরত্ব সর্বাপেক্ষা কম। বর্তমানে পাকা স্তম্ভ দ্বারা এর সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে। আলোচ্য পরিচ্ছেদে এ প্রসঙ্গীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٥٩٦ - عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَاِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيْهِ لِاَحَدٍ قَبْلِىْ وَلَمْ يَحِلَّ لِىْ اِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ اِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَلَا يُخْتَلٰى خَلَاهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلَّا الْاِذْخِرَ فَاِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوْتِهِمْ فَقَالَ اِلَّا الْاِذْخِرَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا اِلَّا مُنْشِدٌ .

২৫৯৬. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন ইরশাদ করেছেন– এখন আর হিজরত নেই তবে আছে জিহাদ ও সংকল্প। সুতরাং যখন তোমাদের জিহাদের জন্যে বের হতে বলা হবে, বের হয়ে পড়বে। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন পুনরায় বললেন, এ শহরকে আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত করেছেন সেদিন হতে, যেদিন তিনি আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন, এটা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত করার কারণেই সম্মানিত থাকবে। এ শহরে আমার পূর্বেও কারো জন্য যুদ্ধবিগ্রহ হালাল ছিল না এবং আমার জন্যেও একদিনের কিছু সময় ব্যতীত হালাল নয়। এটা হারাম [সম্মানিত] কিয়ামত পর্যন্ত। আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সম্মানিত [হারাম] করার কারণে এর কাঁটাদার গাছও কাটা যাবে না, এতে শিকার হাঁকানো চলবে না, এর মাটিতে পড়ে থাকা জিনিস কেউ উঠাতে পারবে না, ঘোষণাকারী ব্যতীত। আর এর ঘাসও কাটা যাবে না। তখন [আমার পিতা] হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, হে আল্লার রাসূল! ইযখার ব্যতীত? কেননা, এটা তাদের কর্মকারদের জন্যে এবং ঘরের জন্যে বিশেষ প্রয়োজন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ, ইযখার ব্যতীত।

–[বুখারী ও মুসলিম]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনায় আছে, এর গাছ কাটা যাবে না এবং এর পথে পড়া বস্তু ঘোষণাকারী ব্যতীত উঠাতে পারবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হিজরতের পরিচিতি, তার প্রকারভেদ ও হুকুম :

هِجْرَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ : هِجْرَةٌ শব্দটি বাবে نَصَرَ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-

১. اَلتَّرْكُ বা ত্যাগ করা। যেমন কুরআনের বাণী- وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ

২. قَطْعُ الصِّلَةِ বা সম্পর্কচ্ছেদ করা। যেমন মহানবীর বাণী- لَا يَنْبَغِىْ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ

৩. বাবে مُفَاعَلَةٌ থেকে আসলে এর অর্থ হবে- تَرْكُ الْوَطَنِ বা দেশ ত্যাগ করা।

هِجْرَةٌ-এর পারিভাষিক অর্থ : ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় হিজরতের সংজ্ঞা হলো-

১. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর ভাষায়- هُوَ تَرْكُ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যা নিষেধ করেছেন, তা পরিত্যাগ করাই হিজরত।

২. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ গ্রন্থে বলা হয়েছে- هِىَ الْخُرُوْجُ مِنْ اَرْضٍ اِلٰى اُخْرٰى অর্থাৎ একস্থান হতে অন্যস্থানে গমন করাকে হিজরত বলে।

৩. আল্লামা আইনী (র.) বলেন- هِىَ مُفَارَقَةُ دَارِ الْكُفْرِ اِلٰى دَارِ الْاِسْلَامِ خَوْفَ الْفِتْنَةِ وَطَلَبَ اِقَامَةِ الدِّيْنِ

৪. আল্লামা খাত্তাবী (র.)-এর মতে- هِىَ الْخُرُوْجُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِلْقِتَالِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مُخْلِصِيْنَ صَابِرِيْنَ مُحْتَسِبِيْنَ

৫. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.)-এর মতে- تَرْكُ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ وَالْاِبْعَادُ عَنْهُ মহান রাব্বুল আলামীনের নিষেধকৃত বিষয়বস্তু হতে দূরে থাকার নামই হিজরত।

هِجْرَةٌ-এর প্রকারভেদ : প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ আল্লামা আইনী (র.) বলেন, ওলামায়ে কেরাম হিজরতকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন-

১. আবিসিনিয়ায় হিজরত।
২. মক্কা হতে মদিনায় হিজরত।
৩. রাসূল ﷺ-এর আহ্বানে বিভিন্ন গোত্রসমূহের হিজরত।
৪. ইসলাম গ্রহণকারী মক্কাবাসীদের হিজরত।
৫. আল্লাহর নিষেধ হতে বেঁচে থাকার হিজরত।

এ ছাড়া আরো কয়েক প্রকার হিজরত রয়েছে। যেমন-

١. اَلْهِجْرَةُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ اِلٰى دَارِ الْاِسْلَامِ.
٢. اَلْهِجْرَةُ مِنْ دَارِ الْخَوْفِ اِلٰى دَارِ الْاَمْنِ.
٣. اَلْهِجْرَةُ مِنْ بِلَادٍ اِلٰى اُخْرٰى عِنْدَ ظُهُوْرِ الْفِتَنِ.

হিজরতের বিধান : ইসলামি চিন্তাবিদগণ হিজরতের বিধান আলোচনায় নিম্নোক্ত মতামত পোষণ করেন-

১. اَلْهِجْرَةُ الْمُسْتَحَبَّةُ : বায়তুল্লাহ, বায়তুল মুকাদ্দাস, মসজিদে নববী জিয়ারত এবং বিদ্যা অর্জনের জন্যে হিজরত করা মোস্তাহাব।

২. اَلْهِجْرَةُ الْفَرِيْضَةُ اَوِ الْوَاجِبَةُ : কোনো দেশের মুসলমান যদি স্বীয় ধর্মকর্ম পালনে সক্ষম না হয় এবং তাদের উপর অধর্মীয় কাজ চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন সে ভূমি থেকে হিজরত করা ওয়াজিব। কেননা ইরশাদ হয়েছে-

اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا.

৩. اَلْهِجْرَةُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ : দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে হিজরত করা ফরযে কিফায়া। যেমন আল্লাহর বাণী-

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ .... اَلْاٰيَةُ.

জিহাদের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ :

আভিধানিক অর্থ : جِهَادٌ শব্দটি فِعَالٌ-এর ওযনে বাবে مُفَاعَلَةٌ-এর ক্রিয়ামূল। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে এর অর্থ- চেষ্টা করা, সাধনা করা, কোনো উদ্দেশ্য লাভের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। যেমন আল্লাহ বলেছেন- جَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় সর্বশক্তি নিয়োগ কর।

শরয়ী অর্থ : শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহর মনোনীত ও সত্য দীনকে পৃথিবীর বুকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হওয়াকে জিহাদ বলে।

আল্লামা ইবনু হুমাম (র.) জিহাদের সংজ্ঞা প্রদানে বলেছেন– وَدَعْوَتُهُمْ إِلَى الدِّيْنِ الْحَقِّ وَقِتَالُهُمْ إِنْ لَمْ يَقْبَلُوْا অর্থাৎ অমুসলিমদেরকে সত্য দীনের পথে আহ্বান করা এবং আহ্বানে সাড়া না দিলে তাদেরকে হত্যা করাই হচ্ছে জিহাদ।

জিহাদের হুকুম : জিহাদ ফরজ কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে কিছুটা মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে আলোচনা করা গেল–

১. অধিকাংশ ইমামের অভিমত হলো, জিহাদ ফরজ। তাঁরা নিজেদের মতের অনুকূলে নিম্নোক্ত দলিল উপস্থাপন করেন–

কুরআনের দলিল :

১. اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُ.

২. وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ.

৩. يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ.

৪. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ.

৫. قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً.

৬. اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا.

হাদীসের দলিল :

১. اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.

২. اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَعَدْلُ عَادِلٍ.

২. সুফিয়ান ছাওরী (র.)-এর মতে, **জিহাদ ফরজ নয়; বরং মোস্তাহাব**। তিনি জিহাদ সম্পর্কীয় আয়াতে যে اَمْرٌ বা নির্দেশসূচক শব্দ রয়েছে একে মোস্তাহাবের মান দিয়েছেন।

অতঃপর যাদের মতে, জিহাদ ফরজ, তাদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, জিহাদ ফরযে আইন না ফরযে কিফায়া–

ক. হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.)-এর মতে, জিহাদ সর্বাবস্থায় ফরযে আইন। তিনি উপরে বর্ণিত আয়াতসমূহকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন।

খ. অধিকাংশ ইসলামি চিন্তাবিদের মতে, যদি অমুসলিম কর্তৃক মুসলিমদের ধর্ম ও রাজ্যের উপর আগ্রাসন হয় এবং ইসলামের পক্ষ হতে জিহাদে গমনের জন্যে সাধারণ ডাক দেওয়া হয়, তখন জিহাদ করা ফরযে আইন। আর যদি এরূপ পরিস্থিতি না হয়, তবে জিহাদ ফরযে কিফায়া।

দুটি হাদীসের দ্বন্দ্বের সমাধান : আলোচ্য হাদীসে দেখা যায় যে, আল্লাহ তা'আলাই মক্কাকে হারাম বা সম্মানিত করেছেন। অথচ অন্য আরেক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-ই একে হারাম ঘোষণা করেছেন। যেমন– হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত মুসলিমের রেওয়ায়েতে– قَالَ (ع) اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ ..... وَاَنَا حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ حَرَامًا অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) মক্কাকে সম্মানিত করেছেন এবং একে হারাম ঘোষণা করেছেন। আর আমি মদিনাকে হারাম বা সম্মানিত বলে ঘোষণা করলাম। মোটকথা, উভয় হাদীসে পরস্পর বিরোধ দেখা যায়।

এর সমাধানে বলা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই মক্কাকে হারাম বা সম্মানিত ঘোষণা করেছেন– নিজের খেয়াল-খুশি মতো নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেদিন আসমান-জমিনকে সৃষ্টি করেছেন, সেদিনই এ সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, আবহমান কাল হতে মক্কা হারাম থাকবে। আর হযরত ইবরাহীম (আ.)-ই মানুষের কাছে সর্বপ্রথম ঘোষণা করবেন। ফলে আল্লাহ হলেন সাব্যস্তকারী আর হযরত ইবরাহীম (আ.) হলেন ঘোষণাকারী। সুতরাং উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

অথবা, আল্লাহ হারাম করেছেন, এর অর্থ হলো– মক্কার সম্মান সে সমস্ত বিষয়ের মধ্যে নয় যা মুশরিকরা জাহিলিয়া যুগে সাব্যস্ত করেছিল; বরং এর সম্মান আল্লাহর পক্ষ হতে হয়েছে। পরবর্তীকালে হযরত ইবরাহীম (আ.) বায়তুল্লাহকে পুনঃ নির্মাণ করে এর হৃত সম্মানের কথা ঘোষণা করেছেন, যা তার পূর্ববর্তীকালে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আর ইতিহাসও সাক্ষ্য যে, সর্বকালে সকল নবীই মক্কার সম্মানের কথা নিজ নিজ উম্মতকে বলে গেছেন।

মক্কার হারাম শরীফের সীমানা : আযরাকী (র.)-এর ভাষ্য মতে, হারাম শরীফের সীমানা বা চৌহদ্দি নিম্নরূপ–

মক্কা	হতে	মদিনার	দিকে	তিন	মাইল	পর্যন্ত
"	"	ইয়েমেনের	"	সাত	"	"
"	"	তায়েফের	"	এগারো	"	"
"	"	ইরাকের	"	দশ	"	"
"	"	জা'রানার	"	পাঁচ	"	"
"	"	জিদ্দার	"	দশ	"	"

উক্ত সীমানা বা চৌহদ্দির অভ্যন্তরস্থ পবিত্র স্থানকে হারাম শরীফ বলে।

হারাম শরীফের কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ কাটা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : হারাম শরীফের মধ্যকার কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ কাটা বৈধ কিনা এ বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে।

কতিপয় শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের মতে, যে সকল কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের কাঁটা স্বভাবত কষ্টদায়ক বা বিষাক্ত সেগুলো কেটে ফেলা বৈধ। জমহূর আইম্মায়ে কেরামের মতে لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ হাদীসাংশ অনুযায়ী কোনো বৃক্ষ কাটা বৈধ নয়।

বৃক্ষ দু প্রকার : একপ্রকার হলো যা মানুষের চেষ্টায় জন্মে। দ্বিতীয় স্বাভাবিকভাবে মানুষের চেষ্টা ছাড়াই জন্মে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, প্রথম প্রকারের বৃক্ষ কাটা বৈধ। জমহূরের মতে বৈধ নয়।

দ্বিতীয় প্রকারের বৃক্ষ সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, ফিকহশাস্ত্রবিদদের মতে, এ শ্রেণির বৃক্ষলতা সম্পর্কেই হাদীসের নিষেধাজ্ঞা। যদি কেউ এটা কেটে ফেলে, তবে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সুতরাং যদি বৃক্ষ বড় হয়, তবে একটা গাভী এবং ছোট হলে একটা বকরি ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ইমাম আ'যমের মতে উক্ত বৃক্ষের মূল্য নির্ধারণ করে ঐ মূল্যের একটি পশু হাদিয়াস্বরূপ দিতে হবে।

ইমাম মালেক (র.) বলেছেন, কোনো বিনিময়ে কাজ হবে না, সে ব্যক্তি গুনাহগারই হয়ে থাকবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তিদ্বয়ের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সমাধান : রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! আমি মদিনা শহরকে সম্মানিত করলাম, যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.) মক্কাকে সম্মানিত করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, মক্কাকে হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্মানিত ঘোষণা করেছেন অথচ আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলাই এ শহরকে আদিকাল হতে সম্মানিত করে রেখেছেন। আপাত দৃষ্টিতে উভয় বর্ণনার মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। উক্ত দ্বন্দ্বের নিরসনে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত জবাব দিয়েছেন।

ক. হযরত ইবরাহীম (আ.) মক্কা নগরীকে আল্লাহ তা'আলার আদেশেই সম্মানিত ঘোষণা করেছিলেন। নিজের উদ্ভূত গবেষণার দ্বারা নয়। সুতরাং যেদিন আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন ঐ দিন হতেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) শীঘ্রই মক্কা নগরীকে সম্মানিত ঘোষণা করবেন।

খ. অথবা, পবিত্র মক্কা নগরীর সম্মান ও মর্যাদা মানব সমাজে সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রকাশ করেছেন, এর পূর্বেও এটা আল্লাহ তা'আলার কাছে সম্মানিত ছিল, তবে এটা মানুষের জন্যে ছিল না।

মক্কা কি শক্তি প্রয়োগে নাকি সন্ধিতে বিজয় হয়েছে?

আমার জন্য কিছু সময় হালাল ছিল : মক্কা যুদ্ধ করা আমার জন্যে কিছু সময় হালাল করা হয়েছে। এ বাক্য হতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মক্কা শক্তি প্রয়োগেই জয় করা হয়েছে, সন্ধি দ্বারা নয়। আর শক্তি দ্বারা বিজিত ভূমির মালিক হয় ইসলামি সরকার তথা রাষ্ট্র। নবী করীম ﷺ রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে এর মালিক হয়ে পরে মুসলমানদের জন্যে ওয়াকফ করে দিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর মতে ওয়াকফকৃত ভূমি ক্রয়বিক্রয় জায়েজ নেই। অথচ পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, সেখানের ভূমি ক্রয়বিক্রয় হয়েছে অবলীলাক্রমে।

এ সমস্যার সমাধানে বলা হয় যে, মক্কার হেরেম ভূমি সম্পর্কে ইমাম আ'যমের উক্ত অভিমতটি প্রযোজ্য নয়, বরং তা 'গায়রে-হেরেম' সম্পর্কে প্রযোজ্য। কেননা, নবী করীম ﷺ -এর মক্কা বিজয়ের দিনের ঘোষণা مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ فَهُوَ اٰمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ اَبِىْ سُفْيَانَ فَهُوَ اٰمِنٌ অর্থাৎ যে নিজ ঘরে অথবা আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে আবূ

সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। পরিশেষে তিনি বলেছেন, হেরেম সবটাই নিরাপদ। আর নিরাপদ মানে জান-মাল সবকিছু হতে নিরাপদ। কাজেই তথাকার ভূমির মালিকানাস্বত্ব রহিত হয়নি। তাই পরবর্তীতে তা ক্রয়বিক্রয় হতে কোনো অসুবিধা নেই।

মক্কাভূমি ক্রয়বিক্রয় করা বা কেরায়া দেওয়া সম্পর্কে মতভেদ : মক্কাভূমি ক্রয়বিক্রয় করা বা ভাড়ায় দেওয়া বৈধ কিনা, এ সম্পর্কে ইমামগণের নিম্নোক্ত মতভেদ রয়েছে–

১. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, আবূ ইউসুফ ও তাউস প্রমুখ ইমামের মতে, মক্কাভূমি ক্রয়বিক্রয় করা বা বাড়িঘর ভাড়ায় দেওয়া বৈধ। কেননা, মক্কা সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে। রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধের প্রতি উৎসুক ছিলেন না। তবে ঘটনাচক্রে খালিদের সাথে রাস্তায় প্রতিরোধ সৃষ্টি হওয়ায় ২৭/২৮ জন কাফের নিহত হয়েছিল। এটা ছাড়া অন্য কোনো ঘটনা ঘটেনি। তাই মক্কা সন্ধির মাধ্যমেই বিজিত হয়েছিল। সুতরাং মক্কাভূমি সেখানের বাসিন্দাদের মালিকানায় থেকে গেল। অতএব, এটা ক্রয়বিক্রয় বৈধ হবে।

২. ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, মুহাম্মাদ, মুজাহিদ, সুফিয়ান ও আতা (র.) প্রমুখের মতে মক্কাভূমি ক্রয়বিক্রয় বা বাড়িঘর ভাড়ায় দেওয়া বৈধ নয়। মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– لَا يَحِلُّ بَيْعُ بُيُوْتِ مَكَّةَ وَلَا إِجَارَتُهَا . (بَيْهَقِيْ)

প্রথম পক্ষের বক্তব্যের উত্তর : তাঁরা বলেন যে, মক্কা সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে, এটা ঠিক নয়; বরং মক্কা শক্তি প্রয়োগেই জয় করা হয়েছে। মহানবী ﷺ -এর নির্দেশ বা অনুমতিতে যুদ্ধও সংঘটিত হয়েছিল। রাসূল ﷺ -এর বাণী– لَمْ يَحِلَّ لِيْ إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার এবং শক্তি প্রয়োগে মক্কা বিজয় করার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আর শক্তি দ্বারা বিজিত ভূমির মালিক হয় রাষ্ট্র। নবী করীম ﷺ রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে এর মালিক হয়ে পরে মুসলমানদের মধ্যে ওয়াকফ করে দিয়েছেন। আর ওয়াকফকৃত বস্তু ক্রয়বিক্রয় বৈধ নয়। সুতরাং মক্কার ভূমি ক্রয়বিক্রয় বৈধ নয়। (كَمَا فِي الْعَيْنِ ٥٩/ج٤ وَالتَّعْلِيْقِ ٢١٨/ج٣)

وَعَنْ ٢٥٩٧ جَابِرٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ اَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৫৯৭. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কারও পক্ষে মক্কাতে অস্ত্র বহন করা হালাল নয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হারাম শরীফে অস্ত্রবহনের হুকুম : হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, কোনো অবস্থাতেই হেরেমে অস্ত্রসহ প্রবেশ করা জায়েজ নেই। আলোচ্য হাদীসই এর সমর্থন করে। হযরত ইবনে ওমরও নিষেধ করতেন। কেননা, এতে সব সময় মানুষের ভিড় লেগে থাকে। ফলে অন্য লোকের গায়ে আঘাত লাগতে পারে। কিন্তু জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, প্রয়োজনে অস্ত্র নিয়ে যাওয়া জায়েজ আছে। যেমন– ওমরাতুল কাজার সময় স্বয়ং নবী করীম ﷺ যুদ্ধের পূর্ণ সাজে সজ্জিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেছেন।

وَعَنْ ٢٥٩٨ اَنَسٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلٰى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ وَقَالَ اِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اُقْتُلْهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৯৮. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন তাঁর মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ ছিল। যখন তিনি তা খুললেন, এক ব্যক্তি এসে বলল, ইবনে খাতাল কা'বা শরীফের গিলাফের সাথে ঝুলে রয়েছে। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তাকে হত্যা কর। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হারামের বাইরে হত্যা করে হারামে প্রবেশ করলে এর 'হদ' কার্যকরী করা সম্পর্কে মতভেদ : ইবনে জাওযী (র.) বলেন, এ ব্যাপারে ইমামগণ ঐকমত্য যে, কেউ হারামের মধ্যেই কাউকে হত্যা করলে হারামের মধ্যে তার হত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা জায়েজ হবে। তবে যদি কেউ হারামের বাইরে কাউকে হত্যা করে হারামে প্রবেশ করে আশ্রয় গ্রহণ করে এ অবস্থায় ইমামগণের মতভেদ রয়েছে– ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.) বর্ণনা করেছেন যে, হারামে 'হদ' কার্যকরী করা সাধারণত জায়েজ, চাই সে হারামে হত্যা করুক বা হারামের বাইরে হিলে হত্যা করে হারামে প্রবেশ করুক। সকল অবস্থায় হারামে 'হদ' কার্যকরী করা যাবে।

হারামে হত্যার শাস্তি হারামে প্রদান করা তো ইমামগণের ঐকমত্যেই জায়েজ। কিন্তু হারামের বাইরে হিল্লে হত্যা করার পর হারামে প্রবেশ করা সত্ত্বেও হদ জায়েজ হবে। এর অনুকূলে তাঁরা হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীসকে দলিল হিসেবে নিয়েছেন যাতে ইবনে খাতালকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আল্লামা তীবী (র.) বলেছেন যে, ইবনে খাতাল ইসলাম গ্রহণ করে পরে মুরতাদ হয়েছিল এবং একজন মুসলমানকে হত্যা করেছিল আর দুটি বাঁদি দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে কুৎসা রটনা করাচ্ছিল। রাসূল ﷺ কিসাস হিসেবে ইবনে খাতালকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেছেন, হারামের মধ্যে 'হদ' কার্যকরী করা যাবে না, তবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) যেভাবে কাজ করেছিলেন সেভাবে হারামে প্রবেশকারী হন্তাকে বিভিন্ন কৌশলে হারামের বাইরে বের হয়ে আসতে বাধ্য করতে হবে।

ইমাম আযম (র.)-এর মতে, হিল্লে হত্যা করার পর যে ব্যক্তি হারামে প্রবেশ করেছে তার প্রতি হারামে 'হদ' কার্যকরী করা যাবে না। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এ শহরকে আল্লাহ তা'আলা সেদিন হতেই সম্মানিত করেছেন যেদিন আসমানসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন। এটা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সম্মানিত করার কারণে সম্মানিত থাকবে –[বুখারী ও মুসলিম]। বরং ইমাম আ'যম (র.) বলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের খুশিতে হারামের বাইরে না আসবে তাকে হারামে হত্যা করা যাবে না। তবে তার সাথে বৈঠক ও কথাবার্তা বন্ধ করবে এবং নানাবিধ উপদেশ প্রদান করবে যাতে সে বের হয়ে আসে। যথা– ইবনে আবূ শায়বা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন– যে ব্যক্তি 'হদ' প্রয়োগযোগ্য কার্য করে হারামে প্রবেশ করেছে তার সাথে কেউ বসবে না, তাকে কেউ কিছু পৌঁছাবে না। অর্থাৎ আদান-প্রদান করবে না।

তারা যে ইবনে খাতালের হত্যার ঘটনা ব্যক্ত করেছেন তার জবাব এই যে, তাকে কিসাস হিসেবে হত্যা করা হয়নি যাতে হারামে 'হদ' কার্যকরী করা জায়েজ বলে প্রমাণিত হবে; বরং সে ইসলাম গ্রহণ করার পরে মুরতাদ হয়েছিল এজন্যে তাকে হত্যা করা হয়েছে। যেহেতু কিসাসের শর্তাবলি যেমন– তলব করা, অভিযোগ পেশ ও সাক্ষ্য গ্রহণ ইত্যাদি অনুপস্থিত তাই এতে বুঝা যায় যে, কিসাসের ভিত্তিতে তাকে হত্যা করা হয়নি।

অথবা, জবাব এই যে, যদি হত্যা কিসাস হিসেবেও হয় তবে ঐ সময়টি রাসূল ﷺ -এর জন্যে বিশেষ সময় ছিল, যে সময়টি রাসূল ﷺ -এর জন্যে হারামে হত্যা করা জায়েজ করা হয়েছিল। যেমন রাসূল ﷺ স্বয়ং বলেছেন, আমার জন্যে দিনের কিছু সময় [হারামে যুদ্ধ বা হত্যা] হালাল করা হয়েছে। –[আইনী, ফাত্হ, তা'লীক]

মক্কায় প্রবেশকারীর ইহরাম শর্ত কিনা? ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হজ কিংবা ওমরার নিয়ত ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ তথা মীকাত অতিক্রম করতে ইহরাম বাঁধা শর্ত নয়। যেমন অত্র হাদীসে উল্লেখ রয়েছে– নবী করীম ﷺ শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় প্রবেশ করেছেন। অথচ ইহরামে মাথা খোলা রাখা শর্ত। আর তিনি এ অবস্থায় এ কারণেই প্রবেশ করেছিলেন যে, তখন তাঁর প্রবেশ হজ কিংবা ওমরার উদ্দেশ্যে ছিল না; বরং মক্কা জয় করাই ছিল উদ্দেশ্য।

* ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, অপর অন্যান্য হাদীসের ভাষ্যে দেখা যায় মক্কায় প্রবেশ করতে ইহরাম বাঁধা শর্ত। তবে মক্কা বিজয়ের সময়ের ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। যেমন, তিনি স্বয়ং বলেছেন– মক্কার 'হুরমত' এক দিনের কিছু সময়ের জন্য আমার উপর হতে তুলে নেওয়া হয়েছে পরে আবার তার হুরমত পূর্ববৎ বহাল করা হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত অবিকল অবস্থায় থাকবে। সুতরাং মক্কা বিজয় সময়ের অবস্থা দ্বারা দলিল গ্রহণ করা ঠিক হবে না।

ইবনে খাতালের পরিচয় : ইবনে খাতালের পরিচয় তেমন একটা জানা যায় না। তবে সে ছিল একজন কবি, ইসলাম গ্রহণ করে পরে সে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং ইসলাম ও রাসূলুল্লাহর দুর্নাম ও কুৎসা সংবলিত কবিতা রচনা করেছিল। এছাড়া তার সম্পর্কে এ কথাটিও আছে যে, সে ইসলাম গ্রহণ করার পর এক ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল। এ দু কারণে সে মৃত্যুদণ্ডের উপযোগী হয়েছিল। একটি মুরতাদ হওয়া এবং অপরটি কিসাস, তাই নবী করীম ﷺ তাকে অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

وَعَنْ ٢٥٩٩ جَابِرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৫৯৯. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন ইহরাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন তখন তাঁর মাথায় ছিল কালো পাগড়ি। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাসূল ﷺ-এর মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ ছিল নাকি পাগড়ি ছিল, এ দ্বন্দ্বের সমাধান : আলোচ্য হাদীসে বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ -এর মাথায় পাগড়ি ছিল; কিন্তু পূর্ববর্তী হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূল ﷺ -এর মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ ছিল। উভয় হাদীসের ভাষ্যে বাহ্যত দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে। কাযী আয়ায (র.) এ দ্বন্দ্বের সমাধানে বলেছেন যে, প্রথমে রাসূল ﷺ শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় মক্কা প্রবেশ করেছিলেন। পরে তিনি শিরস্ত্রাণ রেখে পাগড়ি বেঁধেছিলেন। কেননা, অন্য বর্ণনা হতে এর সমর্থন পাওয়া যায়, যেমন- যখন তিনি জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করলেন, তখন তাঁর মাথায় ছিল কালো পাগড়ি। কারণ, এ ভাষণ তিনি কা'বাগৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে দিয়েছিলেন, এটা ছিল মক্কায় প্রবেশের কিছু সময় পরের ঘটনা।

وَعَنْ ٢٦٠٠ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْزُوْا جَيْشُ الْكَعْبَةِ فَاِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ وَفِيْهِمْ اَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُوْنَ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬০০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- [আখিরী জমানায়] কা'বাগৃহ ধ্বংস করার জন্যে এক বিরাট বাহিনী রওয়ানা হবে। যখন তারা এক সমতল মাঠে এসে পৌঁছবে, তখন তাদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সকলকে জমিনে ধসিয়ে দেওয়া হবে। রাবী হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিভাবে তাদের প্রথম হতে শেষ সকলকে জমিনে ধসিয়ে দেওয়া হবে অথচ তাদের মধ্যে এমন সাধারণ লোকও থাকবে যারা [দুরভিসন্ধিতে] ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত নয়। রাসূল ﷺ বললেন, তাদের প্রথম-শেষ সকলকেই জমিনে ধসিয়ে দেওয়া হবে অতঃপর তাদের নিয়ত অনুসারেই [কিয়ামতের দিন] উঠানো হবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীস হতে এ সত্যটি ফুটে উঠেছে যে, যে কোনো বাতিল ও তাগুতী শক্তির তৎপরতা গোটা সমাজে এর অকল্যাণ প্রভাব বিস্তার করে। খোদায়ী বিধান অনুসারে এ কথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, অচিরেই একে ধ্বংস করে দেওয়া হবে, কারণ বাতিল বেশিদিন জমিনে টিকে থাকতে পারে না। আপাত দৃষ্টিতে যারা শান্তিপ্রিয়, নীরবদর্শক ও নিরপরাধ তারাও অপরাধীদের সাথে ধ্বংস হওয়ার যোগ্য, তারাও অপরাধীদের মধ্যে শামিল। কারণ, তারা বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি, শক্তি প্রয়োগ করেনি কিংবা সংশোধনের জন্যে জিহাদ-সংগ্রাম করেনি। যার ফলে বাতিল নির্বিঘ্নে পাপাচারের শীর্ষে আরোহণ করতে পেরেছে। কাজেই নীরব দর্শকগণও অপরাধী হিসেবে বিধ্বস্ত হবে এবং পরকালেও জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। তাদেরকে তাদের নিয়ত অনুসারে উঠানো হবে, এ বাক্য দ্বারা জবাবদিহির সম্মুখীন হওয়ার প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে।

وَعَنْ ٢٦٠١ أَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبْشَةِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬০১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– [শেষ জমানায়] আবিসিনিয়ার এক ছোট নলাবিশিষ্ট [খোদাদ্রোহী] ব্যক্তি কা'বা গৃহকে ধ্বংস করবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٢٦٠٢ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَاَنِّىْ بِهٖ اَسْوَدَ اَفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

২৬০২. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন– আমি যেন কা'বা ধ্বংসকারী সেই কালো ভেঙ্গুর লোকটিকে দেখছি সে কা'বার এক একটি করে পাথর খসিয়ে ফেলছে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

'কালো ভেঙ্গুর' এ অর্থের মূলে রয়েছে اَفْحَجُ 'আফহাজ্জ' যার পায়ের মধ্যভাগ বরাবর কোল, বাঁকা ও ফারাগ, নলাদ্বয় বাঁধা ও কুঁজা, তবে এখানে 'কালো ভেঙ্গুর' বলতে এক কুৎসিৎ গড়নের ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। মোটকথা, কিয়ামতের অতিনিকটবর্তী সময়ে মক্কার হুরমত তুলে নেওয়া হবে তখন এ ধরনের নিকৃষ্ট ব্যক্তির দ্বারাই এর ধ্বংস সাধিত হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٦٠٣ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ (رضـ) قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِحْتِكَارُ الطَّعَامِ فِى الْحَرَمِ اِلْحَادٌ فِيْهِ – (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৬০৩. অনুবাদ : হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– হারাম শরীফে মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য জমা করে রাখা হলো ইলহাদ। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইহতিকার হলো মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মালামাল বিশেষভাবে খাদ্যশস্য সহজলভ্য সময়ে ক্রয় করে মজুদ করে রাখা। ইহতিকার সকল স্থানেই হারাম কিন্তু মক্কার হারামে এটা গুরুতররূপে হারাম। যাকে ইলহাদ রূপে প্রকাশ করা হয়েছে। ইল্হাদ অর্থ সত্য হতে সরে অসত্য ও হারামের প্রতি ঝুঁকে পড়া, ধর্ম বিমুখতা, হারামের পবিত্র স্থানে নিষিদ্ধ কাজ করা। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইলহাদের কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন– مَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

وَعَنْ ٢٦٠٤ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَكَّةَ مَا اَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَاَحَبَّكِ اِلَىَّ وَلَوْلَا اَنَّ قَوْمِىْ اَخْرَجُوْنِىْ مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ – (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ اِسْنَادًا)

২৬০৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার মক্কাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, সকল শহর হতে তুমি কইতনা উত্তম শহর! তুমি আমার কত প্রিয়! যদি আমার কওম আমাকে তোমা হতে বিতাড়িত না করত তবে আমি কখনো তোমায় ছেড়ে অন্য কোথাও বাস করতাম না। –[তিরমিযী]

তিনি বলেছেন, এটা হাসান সহীহ ও গরীব হাদীস।

وَعَنْ ٢٦٠٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ حَمْرَاءَ (رض) قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاقِفًا عَلَى الْحَزْوَرَةِ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنَّكِ لَخَيْرُ اَرْضِ اللّٰهِ وَاَحَبُّ اَرْضِ اللّٰهِ اِلَى اللّٰهِ وَلَوْلَا اَنِّىْ اُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৬০৫. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে হামরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হাযওয়ারায় দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেছি, তিনি বলেছেন– [হে মক্কা!] আল্লাহর কসম! তুমিই আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠ জমিন এবং [তুমিই] আল্লাহর নিকট আল্লাহর জমিনের প্রিয়তর জমিন। যদি আমি তোমা হতে বহিষ্কৃত না হতাম তবে কখনো বের হয়ে যেতাম না। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মক্কা ও মদিনা-এর মধ্যে কোনটি উত্তম : পর পর হাদীস দুটি হতে বুঝা যায় যে মক্কাই সবচেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন জমিন। তবে মদিনার রওযা মোবারকের যে মাটিসমষ্টি নবী করীম ﷺ -এর পবিত্র দেহকে জড়িয়ে আছে, তা মক্কা হতেও শ্রেষ্ঠ, এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত।

উল্লেখ্য যে, এ সমস্ত পবিত্র স্থানে নেক কাজের ছওয়াব যেমন বেশি, বদ কাজের পাপও অধিক। সুতরাং যারা একান্ত সংযমশীল নয় এবং যার পক্ষে গুনাহ হতে বেঁচে থাকার মতো দৃঢ় মনোবল নেই, কিংবা মক্কা-মদিনার আদব রক্ষা করে চলার হিম্মত নেই, তাদের পক্ষে তথায় বসবাস করা উচিত নয়। কেননা, একে লাভের চাইতে ক্ষতি হবে বেশি। ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র.)-এর মতে উপরিউক্ত ব্যক্তির জন্যে মক্কা-মদিনার পবিত্র ভূমিতে অবস্থান ও বসবাস করা মাকরূহ।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٦٠٦ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْعَدَوِىِّ (رض) اَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْثَ اِلَى مَكَّةَ اِئْذَنْ لِىْ اَيُّهَا الْاَمِيْرُ اُحَدِّثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِىْ وَاَبْصَرَتْهُ عَيْنَاىَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللّٰهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يَّسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً فَاِنْ اَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا

২৬০৬. অনুবাদ : হযরত আবূ শুরাইহ আদাবী হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আমর ইবনে সাঈদকে বললেন, সে সময় আমির মক্কার দিকে [হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে] সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন– "হে আমীর! আমাকে অনুমতি দিন, আমি আপনাকে একটি কথা বলব যা রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন সকালে ভাষণ দানকালে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন– যা আমার দু-কান শুনেছে, অন্তর সংরক্ষণ করেছে এবং আমার দু-চোখ দেখেছে। যখন তিনি কথা বলতে শুরু করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ তা'আলা মক্কাকে সম্মানিত [হারাম] করেছেন, কোনো মানুষ একে হারাম করেনি। সুতরাং যে আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং পরকালে বিশ্বাস করে এমন কোনো ব্যক্তির পক্ষে তাতে রক্তপাত করা এবং তাতে বৃক্ষ ছেদন করা হালাল হবে না। যদি কেউ এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুদ্ধের অজুহাত দেখিয়ে অনুমতি আছে মনে

فَقُوْلُوْا لَهُ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُوْلِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِيْ فِيْهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيْلَ لِأَبِيْ شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو قَالَ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذٰلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيْذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِي الْبُخَارِيِّ الْخَرْبَةُ الْجِنَايَةُ.

করে, তবে তোমরা তাকে বলবে– আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে অনুমতি দিয়েছিলেন, তোমাদেরকে অনুমতি দেননি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে দিনের কিছু সময়ের জন্যে তাতে [যুদ্ধের] অনুমতি দিয়েছিলেন। আজ আবার তার পবিত্রতা পুনরায় ফিরে এসেছে যেমন ছিল তা গতকাল। প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন আমার এ কথা অনুপস্থিত ব্যক্তিকে পৌঁছিয়ে দেয়। তখন আবূ শুরাইহ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, এটা শুনে আমর আপনাকে কি বললেন? তিনি বলেন, আমর বললেন, হে আবূ শুরাইহ! এ ব্যাপারে আমি আপনার অপেক্ষা অধিক অবগত। হারাম শরীফ কোনো পাপীকে আশ্রয় দেয় না, খুন করে পলাতককে আশ্রয় দেয় না এবং কোনো অপরাধ করে ফেরারীকেও আশ্রয় দেয় না। –[বুখারী ও মুসলিম]

বুখারীতে আছে বিশ্বাসঘাতকতামূলক অপরাধ করে পলায়নকারীকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ঐতিহাসিক পটভূমি : কারবালা প্রান্তরে ইয়াযীদের সৈন্যবাহিনীর হাতে হযরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের পর হযরত আবূ বকর (রা.)-এর দৌহিত্র [হযরত আসমা বিনতে আবূ বকরের পুত্র] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) খেলাফতের দাবি করেন। মক্কা, মদিনা, ইরান, ইরাক ও ইয়েমেন প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা তাঁকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং তাঁর হাতে বায়'আত হয়। হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর হতে উমাইয়ারা অপরের খেলাফত মেনে নিতে অস্বীকার করে। এরই প্রেক্ষিতে সর্বপ্রথম হযরত মুয়াবিয়া খেলাফতের দাবি করেন। পরববর্তীকালে ইবনে যুবাইরের দাবির ফলে উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান ৭৩ হিজরিতে এ আমর ইবনে সাঈদের নেতৃত্বে ইবনে যুবাইরের বিরুদ্ধে মক্কায় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। পরিশেষে আমরের সৈন্যবাহিনীর হাতে ইবনে যুবাইর শহীদ হন। আলোচ্য হাদীসে সে সময়ের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

٢٦٠٧ - وَعَنْ عَيَّاشِ بْنِ أَبِيْ رَبِيْعَةَ الْمَخْزُوْمِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَزَالُ هٰذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَظَّمُوْا هٰذِهِ الْحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِيْمِهَا فَإِذَا ضَيَّعُوْا ذٰلِكَ هَلَكُوْا - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

২৬০৭. অনুবাদ : হযরত আইয়্যাশ ইবনে আবূ রাবীয়া মাখযূমী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– এ উম্মত সর্বদা কল্যাণের সাথে থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এ হারামের যথাযথ সম্মান করবে। আর যখন তারা এটা বিনষ্ট করবে ধ্বংস হয়ে যাবে। –[ইবনে মাজাহ]

بَابُ حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ حَرَسَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى

পরিচ্ছেদ : মদিনার হেরেমে হারাম কার্যাবলির বর্ণনা [আল্লাহ্ একে রক্ষা করুন]

পৃথিবীতে সবচেয়ে সম্মানী স্থান হলো তিনটি। এগুলো হলো মক্কা শরীফ, মদিনা শরীফ এবং বায়তুল মুকাদ্দাস। এর মধ্যে সবচেয়ে সম্মানী হলো মক্কা শরীফ, তারপর মদিনা শরীফ। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে মক্কার হেরেমে হারাম কার্যবলি সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে, আর অত্র অধ্যায়ে মদিনার হারাম সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٦٠٨ - عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلَّا الْقُرْاٰنَ وَمَا فِىْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلٰى ثَوْرٍ فَمَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ وَالٰى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا مَنِ ادَّعٰى إِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ اَوْ تَوَلّٰى غَيْرَ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ -

২৬০৮. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআন এবং এ পুস্তিকায় যা আছে তা ব্যতীত আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছ থেকে আর কিছু লিখে রাখিনি। তিনি বলেন, [এ পুস্তিকায় আছে] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মদিনা সম্মানিত 'আইর' হতে 'ছওর'-এর মধ্যবর্তী স্থান। যে এর মধ্যে কোনো খারাপ প্রথা চালু করবে অথবা কোনো খারাপ প্রথা সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেবে, তার উপর আল্লাহর ফেরেশতাদের ও সকল মানুষের অভিসম্পাত। তার ফরজ বা নফল কোনোটাই গ্রহণ করা হবে না।

সকল মুসলমানের দায়িত্ব এক। তাদের ক্ষুদ্র দায়িত্ব পালনে চেষ্টা করবে। অতএব যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দায়িত্ব পালন না করবে তার উপর আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত। তার ফরজ বা নফল কোনোটাই গ্রহণ করা হবে না। যে ব্যক্তি নিজের মনিবের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো কাওমকে মনিব বলে গ্রহণ করবে তার উপরেও আল্লাহর ফেরেশতাদের এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত। তার কোনো ফরজ বা নফল কিছুই গৃহীত হবে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

তাদের অপর বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে গ্রহণ করবে এবং যে ক্রীতদাস নিজের মনিব ছাড়া অপরকে মনিব বলে গ্রহণ করবে তার উপর আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত। তার কোনো ফরজ বা নফল কিছুই গ্রহণ করা হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মদিনার হারাম সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ :

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ وَ اِسْحَاقَ (رحـ) : মদিনা শরীফের হারাম সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর মতে, মক্কা শরীফের মতো মদিনা শরীফেরও হারাম আছে। মদিনাতেও গাছ কাটা, শিকার করা জায়েজ নেই। তবে যদি কেউ এমনটি করে তাতে দম দিতে হবে না।

তাঁদের দলিল–

১. হযরত আলী (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মদিনা হারাম [সম্মানিত] আইর হতে ছওর পর্যন্ত।' –[বুখারী ও মুসলিম] "আইর" ও "ছওর" দুটি পর্বতের নাম।

২. হযরত সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি মদিনার দু প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম করছি এর বৃক্ষ ছেদন করা যাবে না এবং এর শিকার বধ করা চলবে না। –[মুসলিম]

৩. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) মক্কাকে সম্মানিত করে একে হারাম করেছেন, আর আমি মদিনাকে হারাম করেছি। –[মুসলিম]

এ ধরনের হাদীসসমূহে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মদিনাও মক্কার মতোই হারাম।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَثَوْرِىْ وَابْنِ مُبَارَكْ (رحـ) : ইমাম আ'যম, সাহেবাইন, সুফিয়ান ছাওরী ও ইবনে মুবারক (র.) প্রমুখের মতে, মক্কার জন্যে যেমন হারাম রয়েছে, মদিনার জন্যে তেমন হারাম নেই। মদিনায় শিকার বধ করা কিংবা গাছ কর্তন করা হারাম নয়; বরং মাকরূহ। –[মিরকাত]

তাঁরা নিম্নলিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন–

১. মুসলিম শরীফে আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "পশুর খোরাক ব্যতীত মদিনার গাছের পাতা ঝাড়া যাবে না"। অথচ মক্কার হারামে কোনো অবস্থায়ই গাছের পাতা ঝাড়া জায়েজ নেই। এতে বুঝা যায় যে, মক্কার মতো মদিনায় হারাম নেই।

২: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেছেন, নবী করীম ﷺ এক সদাচারী ব্যক্তি ছিলেন। আমার এক ভাই ছিল তাকে আবূ ওমায়ের বলা হতো, তাঁর একটি ছোট বুলবুলি ছিল। একবার নবী করীম ﷺ এসে আবূ ওমায়রকে চিন্তিত দেখলেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আবূ ওমাইরের কি হয়েছে? বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার বুলবুলিটি মরে গিয়েছে। তখন নবী করীম ﷺ ছন্দাকারে বললেন– يَا اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ রাবী বলেন, সে এটা নিয়ে খেলা করত। –[মুসলিম, তাহাবী ও নাসায়ী]

ইমাম তাহাবী (র.) বলেছেন, এটা মদিনার ঘটনা। যদি মদিনাতে শিকারের বিধান মক্কায় শিকারের বিধানের অনুরূপ হতো, তবে রাসূল ﷺ বুলবুলির ব্যাপারে বাধা দিতেন এবং তাকে এটা নিয়ে খেলার অনুমতি দিতেন না, যা মক্কাতে কখনো সম্ভব নয়। ইমাম তুরপুশতী (র.) বলেছেন, যদি এটা হারামই হতো তবে মহানবী ﷺ এতে কখনও নিশ্চুপ থাকতেন না।

ইমাম মালেক, শাফেয়ী (র.) প্রমুখের উত্থাপিত যে সমস্ত হাদীসে মদিনাকে হারাম বলে বর্ণনা রয়েছে এটা দ্বারা মদিনায় শিকার করা হারাম বা গাছ কাটা হারাম অর্থ নয়; বরং মদিনার সাথে তাদের ভালোবাসা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে মদিনার সৌন্দর্য বহাল রাখাই এর মূল। যেমন– হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, তাঁকে মদিনার বৃক্ষ কর্তন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাবে একে মদিনার সৌন্দর্য বলে উল্লেখ করেছেন।

অথবা, জবাব এই যে, রাসূল ﷺ যে اُحَرِّمُ বলেছেন তা تَحْرِيْمٌ শব্দ হতে অনুসৃত নয়; বরং حُرْمَةٌ হতে অনুসৃত। তাহলে অর্থ হবে "আমি মদিনাকে সম্মানিত করলাম"। এর দ্বারা মদিনার মর্যাদা প্রমাণিত হয়। হানাফীগণ মদিনাকে চরম পর্যায়ের সম্মানিত স্থান বলে মনে করেন। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা একে হালাল রেখেছেন, এর উপরে বাড়াবাড়ি করে তাকে হারাম বলা যায় না। আর যেহেতু হাদীসসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, এজন্যে এর সমাধান দেওয়া যায় যে, যে সমস্ত হাদীসে اُحَرِّمُ ইত্যাদির উল্লেখ আছে ঐ সমস্ত স্থানে সম্মান বা মর্যাদা অর্থে বুঝা যাবে এবং যে সমস্ত হাদীসে শিকার বন্ধ করা, বৃক্ষ ছেদন করা ইত্যাদির উল্লেখ আছে ঐ সমস্ত স্থানে হারাম না হওয়া বুঝিয়েছে। –[আইনী, ফাত্হ, বাযল, তা'লীক]

হাদীসের ব্যাখ্যা : 'আইর' মদিনার এক প্রান্তে অবস্থিত একটি পর্বত বিশেষ। 'ছাওর' এটা মক্কার 'ছওর' পর্বত নয়; বরং এটি মদিনায় ওহুদ পর্বতের নিকট একটি ছোট পর্বত। 'মুসলমানদের প্রতিশ্রুতি এক।' এর অর্থ হলো তাদের যে কেউ প্রতিশ্রুতি দান করলেই সকলের পক্ষে তা পালনীয় হয়ে যায়। অতীতের মুসলমানরা এটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। তাই আমাদেরকেও এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া উচিত। 'অসৎ লোককে আশ্রয় দেওয়া' এর মানে হলো জাহিলিয়া যুগে আরবের এক গোত্র অন্য গোত্রের সাথে ভালো-মন্দে বন্ধুত্ব স্থাপন করত; কিন্তু ইসলাম অসৎ ও মন্দ বন্ধুত্বকে রহিত করে দিয়েছে। তবে সৎ ও ভালো লোকের সাথে যে বন্ধুত্ব ও মৈত্রীত্ব স্থাপন করা উচিত, এর নজির আমরা নবী করীম ﷺ -এর মদিনার জীবন হতে গ্রহণ করতে পারি।

٢٦٠٩ - وَعَنْ سَعْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِيْنَةِ اَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا اَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا وَقَالَ الْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ لَا يَدَعُهَا اَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا اِلَّا اَبْدَلَ اللّٰهُ فِيْهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَثْبُتُ اَحَدٌ عَلٰى لَاْوَائِهَا وَجُهْدِهَا اِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا اَوْ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৬০৯. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াককাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি মদিনার দু-সীমানার মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম ঘোষণা করছি– এর গাছ কাটা যাবে না এবং এর শিকার বধ করা যাবে না। তিনি আরো বলেন, মদীনা তাদের জন্যে কল্যাণকর স্থান, যদি তারা বুঝে। যে ব্যক্তি বিরাগভাজন হয়ে মদিনা ত্যাগ করবে তার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা তা হতে উত্তম ব্যক্তিকে তথায় স্থান দেবেন। আর যে ব্যক্তি এর অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যের সাথে টিকে থাকবে আমি তার জন্যে কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী ও সাক্ষী হব। –[মুসলিম

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا اَوْ شَهِيْدًا -এর ব্যাখ্যা : কেউ কেউ বলেন যে, হাদীসে উল্লিখিত او বর্ণটি সন্দেহের স্থলে বলা হয়েছে। বর্ণনাকারীরা সন্দেহ ছিল যে, রাসূল ﷺ شَفِيْعًا বলেছেন নাকি شَهِيْدًا বলেছেন; কিন্তু এটা ঠিক নয়। কেননা, বহুসংখ্যক সাহাবী اَوْ সহকারেই বর্ণনা করেছেন। আর বহুসংখ্যক সাহাবীর একটি সন্দেহের উপর মতৈক্য হওয়া জ্ঞান বহির্ভূত ব্যাপার। সুতরাং এখানে اَوْ বর্ণটি বিভক্তিসূচক।

এমতাবস্থায় বাক্যটির অর্থ হবে– كُنْتُ شَفِيْعًا لِلْعَاصِ شَهِيْدًا لِلْمُطِيْعِ অর্থাৎ আমি অপরাধীর জন্যে হব সুপারিশকারী এবং অনুগতের জন্যে হব সাক্ষী। অথবা অর্থ হবে এরূপ– شَهِيْدًا لِمَنْ مَاتَ فِىْ زَمَانِهٖ شَفِيْعًا لِمَنْ مَاتَ بَعْدَهٗ অর্থাৎ এ যুগে মৃত্যুবরণকারীদের জন্যে হব সাক্ষী এবং পরবর্তী যুগে মৃত্যুবরণকারীদের জন্যে হব সুপারিশকারী।

কেউ কেউ বলেন, এখানে اَوْ বর্ণটি و অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অবস্থায় বাক্যটির অর্থ হবে– كُنْتُ شَفِيْعًا وَشَهِيْدًا অর্থাৎ আমি সুপারিশকারী ও সাক্ষী হবো।

وَعَنْ ٢٦١٠ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَصْبِرُ عَلٰى لَاْوَاءِ الْمَدِيْنَةِ وَشِدَّتِهَا اَحَدٌ مِنْ اُمَّتِىْ اِلَّا كُنْتُ لَهٗ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৬১০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের যে কোনো ব্যক্তি মদিনার অভাব-অনটন ও দুঃখকষ্টে ধৈর্যধারণ করবে, আমি তার জন্যে কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী হবো। -[মুসলিম]

وَعَنْهُ ٢٦١١ قَالَ كَانَ النَّاسُ اِذَا رَاَوْا اَوَّلَ الثَّمَرَةِ جَاءُوْا بِهٖ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاِذَا اَخَذَهٗ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مُدِّنَا اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ عَبْدُكَ وَخَلِيْلُكَ وَنَبِيُّكَ وَاِنِّىْ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَاِنَّهٗ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَاَنَا اَدْعُوْكَ لِلْمَدِيْنَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهٖ مَعَهٗ ثُمَّ قَالَ يَدْعُوْ اَصْغَرَ وَلِيْدٍ لَهٗ فَيُعْطِيْهِ ذٰلِكَ الثَّمَرَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৬১১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা যখন গাছের প্রথম ফলটি দেখত তখন নবী করীম ﷺ -এর কাছে নিয়ে আসত। যখন তিনি তা গ্রহণ করতেন, তখন বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ফলে বরকত দাও, আমাদের এ শহরে বরকত দাও। আমাদের পালি বা পাল্লায় বরকত দাও, আমাদের সেরিতে বরকত দাও। হে আল্লাহ! নিশ্চয় হযরত ইবরাহীম (আ.) তোমার বান্দা, তোমার বন্ধু ও তোমার নবী। আর আমিও তোমার বান্দা ও নবী। তিনি তোমার কাছে মক্কার জন্য দোয়া করেছেন আর আমি তোমার কাছে মদিনার জন্যে দোয়া করছি- যেরূপ দোয়া তিনি তোমার নিকট মক্কার জন্যে করেছেন। রাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, অতঃপর রাসূল ﷺ আপন পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ বালককে ডাকতেন এবং তাকে ঐ ফল প্রদান করতেন। -[মুসলিম]

وَعَنْ ٢٦١٢ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَامًا وَاِنِّىْ حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَازِمَيْهَا اَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيْهَا دَمٌ وَلَا يُحْمَلَ فِيْهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ وَلَا تُخْبَطَ فِيْهَا شَجَرَةٌ اِلَّا لِعَلَفٍ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৬১২. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খদুরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) মক্কাকে সম্মানিত করেছেন এবং এটাকে হারাম ঘোষণা করেছেন, আর আমি মদিনাকে এর দু-সীমার মধ্যবর্তী স্থলকে যথাযোগ্য সম্মানে সম্মানিত করলাম। এতে রক্তপাত করা যাবে না, এতে যুদ্ধের অস্ত্র বহন করে নেওয়া যাবে না এবং পশুর খাদ্য ব্যতীত এতে বৃক্ষের পাতা ঝরানো যাবে না। -[মুসলিম]

وَعَنْ ٢٦١٣ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ (رض) اَنَّ سَعْدًا رَكِبَ اِلٰى قَصْرِهٖ بِالْعَقِيْقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا اَوْ يَخْبِطُهٗ فَسَلَبَهٗ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهٗ اَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوْهُ اَنْ يَرُدَّ عَلٰى غُلَامِهِمْ اَوْ عَلَيْهِمْ مَا اَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ اَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبٰى اَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৬১৩. **অনুবাদ :** হযরত আমির ইবনে সা'দ [তাবিয়ী] হতে বর্ণিত আছে [তাঁর পিতা] সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) আকীকস্থ তাঁর প্রাসাদের দিকে সওয়ারিতে চড়ে যাচ্ছিলেন। তখন [পথিমধ্যে] দেখলেন এক ক্রীতদাস মদিনার একটি গাছ কাটছে অথবা এর পাতা ঝরাচ্ছে [রাবীর সন্দেহ]। এতে তিনি তার কাপড়চোপড় ও অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিলেন। সা'দ যখন মদিনায় ফিরে আসলেন, ক্রীতদাসের মালিক তাঁর কাছে আসল এবং তাদের ক্রীতদাসের নিকট হতে যা কিছু কেড়ে নিয়েছেন তা তাদেরকে অথবা তাদের ক্রীতদাসকে [রাবীর সন্দেহ] ফিরে দিতে অনুরোধ করল। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে জিনিস আমাকে দান করেছেন তা আমি ফিরিয়ে দেওয়া হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আর তিনি এটা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করলেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দিনার গাছ কাটলে তার বিধান : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.) বলেন, মদিনায় শিকার করলে বা বৃক্ষ কাটলে অথবা এর পাতা ছিঁড়লে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছুই আদায় করতে হবে না, তবে এ কাজটি হারাম হবে। কোনো কোনো আলেম বলেন, মক্কার বিধান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, কাজটি হারাম হবে না। হানাফী মাযহাব মতে, কাজটি হারাম নয়; বরং মাকরূহ হবে।

হযরত সা'দের উক্তির তাৎপর্য : আলোচ্য হাদীসের ভাষ্যে এবং হযরত সা'দের কাজ ও উক্তি হতে বুঝা যায়, যারা এরূপ কাজ করে মদিনার সম্মান নষ্ট করবে তাদের প্রতি অনুরূপ ব্যবহার করার অনুমতি রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রদান করেছেন এবং তার জামাকাপড় ও অস্ত্রশস্ত্র গনিমতের মাল হিসেবে ভোগ করা জায়েজ, ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

وَعَنْ ٢٦١٤ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وُعِكَ اَبُوْ بَكْرٍ وَبِلَالٌ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهٗ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬১৪. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় আগমন করলেন, [আমার পিতা] হযরত আবূ বকর (রা.) ও বিলাল (রা.) ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হলেন। তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আসলাম এবং এ খবর দিলাম। রাসূল ﷺ বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের কাছে মদিনাকে প্রিয় কর যেরূপ মক্কা আমাদের নিকট প্রিয় অথবা তা হতেও বেশি। একে স্বাস্থ্যকর কর এবং এর পালি বা পাল্লায় ও সেরিতে আমাদের জন্যে বরকত দাও এবং এর জ্বরকে জুহ্ফাতে স্থানান্তরিত করে দাও। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মদিনার জন্য দোয়া করার কারণ : রাসূল ﷺ -এর কাছে হযরত আবূ বকর (রা.) ও হযরত বিলাল (রা.) -এর জ্বরের খবর পৌঁছলে তিনি 'মদিনাকে আমাদের কাছে প্রিয় কর' এ দোয়া করেছিলেন। প্রশ্ন হতে পারে যে, রাসূল ﷺ কেন এরূপ দোয়া করছিলেন। এর উত্তরে বলা হয় প্রকৃত ব্যাপার এই যে, হযরত আবূ বকর ও হযরত বিলাল (রা.) জ্বরের আতিশয্যে প্রলাপ করে মনের গভীরে লুপ্ত কিছু কথা বলেছেন যাতে মক্কার প্রশংসা গাঁথা ছিল। সে ছন্দে মক্কার দুটি পাহাড়, স্বাস্থ্যকর

আবহাওয়া, সুপেয় পানি, মনোরম পাহাড় ও বাগ-বাগিচা, ফসলের ক্ষেতের প্রাণ শীতলকারী সমীরণের প্রশংসা করেছিলেন যা ছিল তাদের কাছে নিজেদের পুত্র-কন্যা সমতুল্য প্রিয়। তাদের প্রলাপের এ কথাগুলো বিবি আয়শা (রা.) রাসূল ﷺ -কে বলেছিলেন। বস্তুত মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা প্রত্যেক মানুষেরই সহজাত ভালোবাসা। এ পটভূমিতেই রাসূল ﷺ ঐ দোয়া করেছিলেন।

ছন্দগুলো এই ছিল। হযরত আবূ বকর (রা.) বলেছেন– كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِيْ اَهْلِهِ * وَالْمَوْتُ اَدْنٰى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

বেলাল (রা.) বলেছেন– اَلَا لَيْتَ شِعْرِيْ هَلْ اَبِيْتَنَّ لَيْلَةً * بِوَادٍ وَحَوْلِيْ اِذْخِرٌ وَجَلِيْلُ

وَهَلْ اَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ * وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِيْ شَامَةٌ وَطَفِيْلُ

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই তার পরিবার-পরিজনদের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী। কে আছ এমন আমাকে বলে দিতে পার যে, আমি কি তথায় [মক্কায়] আর একটি রাতও যাপন করতে পারব? যেখানে আমার চারদিকে ইযখির ও জালীল ঘাস থাকবে। আহা! আমি কি আর একদিনও মুজান্না কূপের পানি পান করতে পারব? আহা! আর কখনো কি আমার সম্মুখে শামা ও তাফীল পাহাড়দ্বয় ভেসে উঠবে, যেখানে আমি খেলাধুলা করতাম বা মেষ-দুম্বা চরাতাম।

দোয়ার ফলাফল : উল্লেখ্য যে, রাসূল ﷺ -এর উপরিউক্ত দোয়া কবুল হয়েছিল। খাত্তাবী (রা.) বলেন, তখন জুহফায় ইহুদিদের বসবাস ছিল। জ্বরের এ মহামারী জুহফায় স্থানান্তরিত হয়ে গেল। এমনকি যে জুহফার পানি পান করত সেও ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হতো। জুহফার বাতাসে পাখি উড়লেও এর গায়ে জ্বর হতো। –[মিরকাত]

وَعَنْ ٢٦١٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) فِيْ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَدِيْنَةِ رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى نَزَلَتْ مَهْيَعَةَ فَتَاَوَّلْتُهَا اَنَّ وَبَاءَ الْمَدِيْنَةِ نُقِلَ اِلٰى مَهْيَعَةَ وَهِيَ الْجُحْفَةُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৬১৫. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি মদিনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এক স্বপ্নের বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আমি দেখলাম এক এলোমেলো চুলবিশিষ্ট কালো মহিলা মদিনা হতে বের হয়ে গেল এবং মাহইয়াহ নামক স্থানে অবতরণ করল। তখন আমি এর তা'বীর করলাম যে, মদিনার মহামারী মাহইয়ায় স্থানান্তরিত হলো, আর এটা [মাহইয়াহ] হলো জুহ্ফা। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

টীকা : উল্লেখ্য যে, মহানবী ﷺ -এর দোয়ার বরকতে মদিনার যাবতীয় রোগ-ব্যাধি ও মহামারী একটি কুৎসিৎ মহিলার আকৃতি ধারণ করে মদিনা হতে চিরদিনের জন্য চলে গেছে, তবে সাধারণ জ্বরতাপ ইত্যাদি হয়ে থাকে।

وَعَنْ ٢٦١٦ سُفْيَانَ بْنِ اَبِيْ زُهَيْرٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَاْتِيْ قَوْمٌ يَبُسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِاَهْلِيْهِمْ وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ وَيُفْتَحُ الشَّامُ فَيَاْتِيْ قَوْمٌ يَبُسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِاَهْلِيْهِمْ وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ وَيُفْتَحُ

২৬১৬. **অনুবাদ :** হযরত সুফিয়ান ইবনে আবূ যুহাইর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ইয়েমেন বিজিত হবে এবং সেখানে [মদিনার] একদল লোক [স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে] চলে যাবে এবং সাথে তাদের পরিবার-পরিজন ও অনুসারীদেরও নিয়ে যাবে। অথচ মদিনাই তাদের জন্যে উত্তম, যদি তারা জানত। এভাবে সিরিয়া বিজিত হবে এবং সেখানেও একদল লোক চলে যাবে এবং তাদের পরিবার-পরিজন ও অনুসারীদের সাথে নিয়ে যাবে। অথচ মদিনাই তাদের জন্যে উত্তম ছিল, যদি তারা

الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

জানত। অনুরূপভাবে ইরাক বিজিত হবে এবং একদল লোক তথায় চলে যাবে এবং তাদের পরিবার-পরিজন ও অনুসারীদের সাথে নিয়ে যাবে। অথচ মদিনাই ছিল তাদের জন্যে উত্তম স্থান, যদি তারা জানত।

وَعَنْ ٢٦١٧ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرٰى يَقُولُونَ يَثْرِبَ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬১৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি এমন এক গ্রামে হিজরতের জন্যে আদিষ্ট হলাম, যে গ্রাম অন্যান্য গ্রামসমূহকে গ্রাস করবে। লোকেরা এটাকে ইয়াছরিব বলে। এটা হলো মদিনা। এটা মানুষকে খাঁটি করে। যেরূপ কর্মকারের হাপর ময়লা ঝেড়ে লোহাকে খাঁটি করে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ-**এর মর্মার্থ** : মদিনাকে কর্মকারের হাপরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, মদিনার কষ্ট দেখে মন্দ লোক মদিনা ত্যাগ করে এবং ভালো লোক কষ্ট সহ্য করে টিকে থাকে। অথবা মদিনা হলো ইসলামি সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। এটা ইসলামি আদর্শ ও খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র। এখানের শিক্ষায় একটি অসভ্য জাতিও সুসভ্য জাতিতে পরিণত হয়। মদিনা মানুষের দোষত্রুটি দূর করে একজন শত দোষ-ত্রুটিসম্পন্ন ব্যক্তিকেও খাঁটি মানুষে পরিণত করে।

قَوْلُهُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرٰى-**এর মর্মার্থ** : "মদীনা অন্যান্য গ্রামসমূহকে গ্রাস করবে" এর অর্থ হলো, অন্যান্য এলাকা মদিনার কাছে পরাভূত হবে। বাস্তবে হয়েছিল তাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায়ই প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ বর্গমাইল এলাকা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শাসনাধীনে এসেছিলও এবং মদিনার প্রশাসনের অধীনে সুখী-সমৃদ্ধ হয়েছিল। বিজিত এলাকায় মদিনার কুরআন হাদীস অনুসৃত শিক্ষার প্রভাব বিস্তার করেছিল। খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে অর্ধেক পৃথিবী মুসলমানদের করতলগত হয়েছিল এবং সাথে সাথে ইসলামি সভ্যতাও বিস্তার করেছিল। আর এসব কিছুর প্রাণকেন্দ্র ছিল মদিনা।

وَعَنْ ٢٦١٨ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللّٰهَ سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৬১৮. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি আল্লাহ তা'আলা মদিনার নাম রেখেছেন 'তা-বা' [পবিত্র]। -[মুসলিম]

وَعَنْ ٢٦١٩ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبٰى ثُمَّ جَاءَهُ

২৬১৯. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে 'বায়'আত' করল, অতঃপর বেদুইনকে মদিনার জ্বরে পেল। তখন সেই নবী করীম ﷺ -এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! তুমি আমার বায়'আত বাতিল করে দাও। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ অস্বীকার করলেন। অতঃপর সে আবারও তাঁর নিকট এসে বলল, আমার বায়'আত বাতিল করে দাও। রাসূল ﷺ অস্বীকার করলেন। সে পুনরায় এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আমার বায়'আত

فَقَالَ اَقِلْنِىْ بَيْعَتِىْ فَاَبٰى فَخَرَجَ الْاَعْرَابِىُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِىْ خَبَثَهَا وَتُنَصِّعُ طَيِّبَهَا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

বাতিল করে দাও। এবারও রাসূল ﷺ অস্বীকার করলেন। তখন বেদুইন লোকটি বের হয়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মদিনা হলো কর্মকারের হাপরের মতো, যে এর ময়লাকে দূর করে দেয় এবং এর উত্তম অংশকে বিশুদ্ধ করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٢٦٢٠ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَنْفِىَ الْمَدِيْنَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৬২০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মদিনা এর খারাপ লোকদেরকে বিশুদ্ধ না করবে, যেভাবে কর্মকারের হাপর লোহাকে খাদ হতে বিশুদ্ধ করে। –[মুসলিম]

وَعَنْهُ ٢٦٢١ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلَا الدَّجَّالُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬২১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মদিনার দরজাসমূহে ফেরেশতাগণ [পাহারায় মোতায়েন] রয়েছেন। সুতরাং এতে মহামারী প্রবেশ করতে পারবে না, দাজ্জালও না। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٢٦٢٢ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ اِلَّا سَيَطَاهُ الدَّجَّالُ اِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ لَيْسَ نَقْبٌ مِنْ اَنْقَابِهَا اِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّيْنَ يَحْرُسُوْنَهَا فَيَنْزِلُ السَّبْخَةَ فَتَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ بِاَهْلِهَا ثَلٰثَ رَجَفَاتٍ فَيَخْرُجُ اِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬২২. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মক্কা ও মদিনা ব্যতীত এমন কোনো শহর নেই যা দাজ্জালের পদার্পণে বিপর্যস্ত হবে না। মক্কা মদিনার এমন কোনো দরজা নেই, যাতে ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ হয়ে পাহারা দিচ্ছেন না। সুতরাং দাজ্জাল সাব্‌খায় অবতরণ করবে। তখন মদিনা স্বীয় অধিবাসীদেরসহ তিনবার কেঁপে উঠবে আর সকল কাফের ও মুনাফিক মদিনা ছেড়ে দাজ্জালের দিকে চলে যাবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আরেকবার মদিনা প্রমাণ করবে যে, তা কর্মকারের হাপরের মতো। বস্তুত মদিনা ঈমানদারদের জন্যে পুণ্যভূমি। মদিনা হতে বেঈমানদেরকে বিতাড়িত করে একে কলুষমুক্ত করা হবে। আর তা এভাবে হবে যে, মদিনা প্রকম্পিত হওয়ার সাথে সাথে বেঈমানরা একে নিরপত্তাবিহীন ধারণা করে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দাজ্জালের ফিতনায় পতিত হবে।

وَعَنْ ٢٦٢٣ سَعْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَكِيْدُ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَحَدٌ اِلَّا اِنْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬২৩. অনুবাদ : হযরত সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কেউই মদিনাবাসীদের ব্যাপারে দুরভিসন্ধি করবে সে গলে যাবে যেভাবে লবণ পানিতে গলে যায়। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٢٦٢٤ - أَنَسٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِيْنَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৬২৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ যখন কোনো সফর হতে আগমন করতেন এবং মদিনার প্রাচীর দেখতেন তখন আপন আরোহণের উটকে তাড়া করতেন আর যদি ঘোড়া বা খচ্চরের পিঠে থাকতেন তবে মদিনার প্রেমের উচ্ছ্বাসে ওকে নাড়া দিতেন। –[বুখারী]

وَعَنْهُ ٢٦٢٥ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اَللّٰهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّيْ أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬২৫. অনুবাদ : উক্ত হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার উহুদ পাহাড় নবী করীম ﷺ -এর নজরে পড়ল, তখন তিনি বললেন, এ পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে আর আমরাও একে ভালোবাসি। হে আল্লাহ! ইব্‌রাহীম (আ.) মক্কাকে সম্মানিত করেছেন আর আমি মদিনার দু-সীমানার মধ্যবর্তী স্থলকে সম্মানিত করলাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٢٦٢٦ - سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৬২৬. অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, উহুদ এমন একটি পাহাড় যা আমাদেরকে ভালোবাসে, আর আমরাও তাকে ভালোবাসি। –[বুখারী]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٦٢٧ - سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِيْ وَقَّاصٍ (رض) أَخَذَ رَجُلًا يَصِيْدُ فِيْ حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ الَّذِيْ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ فَجَاءَ مَوَالِيْهِ فَكَلَّمُوْهُ فِيْهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَرَّمَ هٰذَا الْحَرَمَ وَقَالَ مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيْدُ فِيْهِ فَلْيَسْلُبْهُ فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

২৬২৭. অনুবাদ : সুলাইমান ইবনে আবী আব্দুল্লাহ তাবিয়ী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.)-কে দেখলাম এক ব্যক্তিকে ধরে তার কাপড়চোপড় কেড়ে নিলেন, সে মদিনার হারামে শিকার করছিল, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ হারাম করে দিয়েছেন। অতঃপর তার অভিভাবকগণ এসে তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ হারামকে হারাম [সম্মানিত] ঘোষণা করেছেন এবং বলেছেন, যে ব্যক্তি এতে শিকারে রত কোনো ব্যক্তিকে ধরবে সে যেন তার সবকিছু কেড়ে নেয়। সুতরাং আমি তোমাদেরকে এমন খাদ্য ফিরিয়ে দিতে পারি না যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে খেতে দিয়েছেন। তবে হ্যাঁ, যদি তোমরা চাও, তবে তোমাদেরকে এর মূল্য দিতে পারি। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) ও কতিপয় সাহাবী মদিনার হেরেমকে মক্কার হেরেমের মতোই মনে করতেন। সুতরাং নবী করীম ﷺ -এর নিষেধাজ্ঞাকে 'তাহরীমী' মনে করতেন। পক্ষান্তরে হযরত আয়েশা, ইবনে মাসউদ ও ইবনে ওমর (রা.) প্রমুখ মদিনার হেরেমকে মক্কার হেরেমের মতো মনে করতেন না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)ও এদের অনুসারী। তাঁরা নবী করীম ﷺ -এর নিষেধ বাণীকে 'তানযীহ' মনে করতেন। নতুবা নবী করীম ﷺ -এর নিষেধ বাণী থাকা সত্ত্বেও সাহাবীদের পক্ষে এর বরখেলাফ করার চিন্তাও করা যায় না।

বস্তুত মদিনার হেরেম-মক্কার হেরেমের মতো নয়। কেননা, অত্র হাদীসে দেখা যায় মদিনার হেরেমে অপরাধকারীর অপরাধের দণ্ডস্বরূপ তার কাপড়চোপড় ইত্যাদি গনিমতের মালের ন্যায় কেড়ে নেওয়া হয়েছে, যা তিনি ফিরিয়ে দিতেও অস্বীকার করলেন। অথচ সকলের ঐকমত্য যে, মক্কার হেরেমে অপরাধীর কাজের দণ্ড হিসেবে তার কাপড়চোপড় কেড়ে নেওয়ার কোনো বিধান নেই। কাজেই বলতে হবে যে, উভয়টির হেরেম হওয়ার বিধান এক সমান নয়।

قَوْلُهُ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ -এর অর্থ : হযরত সা'দ (রা.) তার মূল্য দিতে চেয়েছিলেন দু' কারণে। প্রথম কারণ হলো, অনুগ্রহ বা মেহেরবানী স্বরূপ। দ্বিতীয় কারণ হলো, মদিনার হেরেমে অপরাধকারীর কাপড়চোপড় কেড়ে নেওয়া জায়েজ হওয়ার মধ্যে সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ ছিল। তাই মূল্য ফেরত দিতে চেয়েছিলেন সাবধানতা বশত।

وَعَنْ ٢٦٢٨ صَالِحٍ مَوْلَى لِسَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا (رض) وَجَدَ عَبِيْدًا مِنْ عَبِيْدِ الْمَدِيْنَةِ يَقْطَعُوْنَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِيْنَةِ فَاَخَذَ مَتَاعَهُمْ وَقَالَ يَعْنِى لِمَوَالِيْهِمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى أَنْ يُّقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِيْنَةِ شَيْئٌ وَقَالَ مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ اَخَذَهُ سَلَبُهُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৬২৮. অনুবাদ : তাবেয়ী সালেহ [তাওয়ামার মুক্ত করা দাস] হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াককাসের এক মুক্ত করা দাস হতে বর্ণনা করেন, একদা হযরত সা'দ মদিনার কতক দাসকে মদিনার কোনো গাছ কাটতে দেখে তাদের মালামাল কেড়ে নিলেন এবং [তা ফেরত চাইলে] তাদের মনিবদেরকে বললেন, আমি রাসূল ﷺ -কে মদিনার কোনো গাছ কাটতে নিষেধ করতে শুনেছি। রাসূল ﷺ বলেছেন– যে এর কোনো গাছ কাটবে, তাকে যে ধরতে পারবে, সে তার জামাকাপড় কেড়ে নেবে। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٢٦٢٩ الزُّبَيْرِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ صَيْدَوَجٍّ وَعِضَاهَهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لِلّٰهِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ مُحِيَ السُّنَّةِ وَجٌّ ذَكَرُوْا اَنَّهَا مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ اَنَّهُ بَدَلَ اَنَّهَا)

২৬২৯. অনুবাদ : হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ওয়াজ্জের শিকার করা ও এর কাটাদার গাছ কর্তন করা হারাম। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে হারাম করা। –[আবূ দাউদ। মহীউস সুন্নাহ (র.) বলেন, ওয়াজ্জ হলো তায়েফের একটি স্থান আর খাত্তাবী (র.) اَنَّهَا -এর স্থলে اَنَّهُ বলেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ওয়াজ্জের পরিচয় : এটা তায়েফের একটি বনাঞ্চল। হুনাইনের যুদ্ধের সময় মুসলিম সৈন্যরা নিজেদের ও পশুদের খাদ্য সংরক্ষণের জন্যে তায়েফের 'ওয়াজ্জ' বনাঞ্চলের পাখি শিকার করা ও কাঁটাযুক্ত বাবলা গাছ কাটা সাময়িকভাবে অন্যদের জন্যে হারাম করা হয়েছিল। অবশ্য পরে সেই বিধান রহিত হয়ে যায়।

وَعَنْ ٢٦٣٠ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَاِنِّىْ اَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوْتُ بِهَا - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ اِسْنَادًا)

২৬৩০. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে মদিনাতে ইন্তেকাল করতে সমর্থ হয়, সে যেন মদিনাতেই ইন্তেকাল করে। কেননা, যে এতে ইন্তেকাল করবে আমি তার জন্যে নিশ্চয় সুপারিশ করব। –[আহমদ ও তিরমিযী]

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, এটা সনদ অনুসারে হাসান ও গরীব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মক্কা ও মদিনার উত্তমতা সম্পর্কে মতভেদ : মক্কা বেশি সম্মানিত, নাকি মদিনা এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে নিম্নোক্ত মতভেদ রয়েছে–

ইমাম মালেক (র.) ও মদিনার আলেমগণের অভিমত : তাঁদের মতে, মদিনা শরীফের মর্যাদা মক্কা মুকাররামা হতেও বেশি। তাঁরা নিম্নলিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন–

১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– "আমি এমন একটি গ্রামে হিজরত করতে আদিষ্ট হয়েছি যা অন্যান্য গ্রামসমূহকে গ্রাস করবে।" এর তাৎপর্য এই যে, মদিনার অধিবাসীগণ অন্যান্য শহরের উপর জয়লাভ করবে। গ্রাস করা কথাটি জয়লাভের প্রতিই ইঙ্গিতবহ। ইমাম নববী (র.) বলেছেন যে, 'গ্রাস করা' অর্থ মদিনা প্রথমে ইসলামি ফৌজের কেন্দ্র হবে। পরে মদিনা হতেই অভিযান চালিয়ে সকল এলাকাকে জয় করা হবে।
অথবা, এর অর্থ এই যে, মদিনার সম্মানের কাছে অন্যান্য শহরের সম্মান ম্লান হয়ে যাবে। মাহ্লাব বলেছেন যে, মদিনার কারণেই সকল শহর ও জনপদ এমনকি স্বয়ং মক্কা মুকাররামাও ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করেছে। সুতরাং মদিনাই অধিক সম্মানিত।

২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন– কর্মকারের হাপর যেমন লোহার ময়লা দূর করে এটাও [মদিনা] তদ্রূপ মানুষকে কলুষমুক্ত করে। –[বুখারী ও মুসলিম] এ বৈশিষ্ট্য শুধু মদিনার জন্যে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং মদিনাই অধিকতর সম্মানিত।

৩. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– হযরত ইবরাহীম (আ.) মক্কাকে সম্মানিত ঘোষণা করেছেন আর আমি মদিনাকে সম্মানিত ঘোষণা করলাম। –[মুসলিম]

৪. যেহেতু রাসূল ﷺ নবীকুল সর্দার, এজন্যে তিনি কর্তৃক সম্মানিত ঘোষিত স্থান হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক সম্মানিত ঘোষিত মক্কা হতেও শ্রেষ্ঠ হবে।

৫. অনুরূপভাবে এ মদিনাতেই সৃষ্টির সেরা, নবীকুল শিরোমণি, আখেরী নবী কবরস্থ হয়েছেন সুতরাং এটা কা'বা হতেও শ্রেষ্ঠ।

ইমাম আ'যম, শাফেয়ী, আহমদ, জমহূর সাহাবী ও তাবেইনদের অভিমত : তাঁদের মতে, মক্কা মুকাররামা সকল শহর এমনকি মদিনা মুনাওয়ারা হতেও শ্রেষ্ঠ।

তাঁদের দলিল :

১. আল্লাহ তা'আলার বাণী– مَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا অর্থাৎ, যে এ শহরে প্রবেশ করবে নিরাপত্তা লাভ করবে। এতে বুঝা যায় মক্কায় 'হদ' কার্যকরী করা জায়েজ নেই। অথচ মদিনাতে 'হদ' কার্যকরী করা জায়েজ নেই বলে কেউ মত প্রকাশ করেননি। সুতরাং মক্কাই শ্রেষ্ঠ।

২. ইবনে রুশদ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা মক্কাকে নামাজের কিবলা ও হজের কা'বা নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ পবিত্র কালামে বলেছেন– اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ; সুতরাং মক্কাই অধিক সম্মানিত।

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আদী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে দেখলাম, হাযওয়ারায় দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! নিশ্চয় তুমি আল্লাহর জমিনের মধ্যে উত্তম, আল্লাহর জমিনের মধ্যে তুমিই আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। যদি না আমার কওম আমাকে বহিষ্কার করত আমি কখনো বের হতাম না। –[তিরমিযী]

তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন। এখানেও রাসূল ﷺ কসমের সাথে জোর দিয়ে বলেছেন যে, মক্কা আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রিয়তর ও শ্রেষ্ঠতর জমিন।

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কাকে লক্ষ্য করে বললেন, কি উত্তম শহর তুমি! তুমি আমার কত প্রিয়! যদি আমার কওম আমাকে তোমার থেকে বিতাড়িত না করত, তবে আমি কখনও তোমায় ছাড়া অন্যত্র বসবাস করতাম না! –[তিরমিযী]

৫. নামাজ অধ্যায়ের অনেক হাদীসে প্রমাণ হয় যে, মদিনার নামাজের তুলনায় মক্কার নামাজে বহুগুণ [পঞ্চাশগুণ মতান্তরে আরও অধিক] বেশি পুণ্য লাভ হয়। এটাও মক্কার শ্রেষ্ঠত্বের আর একটি প্রমাণ।

প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব : প্রথমোক্ত দল [ইমাম মালেক (র.) প্রমুখ] তাঁদের উপস্থাপিত প্রথম দলিল تَأْكُلُ الْقُرٰى [গ্রামসমূহকে গ্রাস করবে] দ্বারা মদিনাকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের স্থান বলেছেন, এটা কৃত্রিম শ্রেষ্ঠত্ব, এর দ্বারা মৌলিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হয় না। তাঁদের দ্বিতীয় দলিলে تَنْفِى النَّاسَ [মানুষকে কলুষমুক্ত করেছেন] এর জবাব এই যে, কুরআনের আয়াতে আছে– مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ এর দ্বারা মদিনায় মুনাফিকদের মতো কুটিল চরিত্রের লোকদের উপস্থিতি প্রমাণ হয়। আবার রাসূল ﷺ -এর পরে মদিনাতেই হযরত আলী, হযরত ইবনে মাসউদ, হযরত মুয়ায (রা.) প্রমুখের মতো পূত-পবিত্র চরিত্রের লোকের আবির্ভাবও হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, লোকদেরকে কলুষমুক্ত করার হুকুম সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সুনির্দিষ্ট যুগের সাথে সম্পর্কিত ছিল; সর্বকাল ও সর্বযুগের নয়।

তাঁদের তৃতীয় দলিলে মদীনায় বলা হয়েছে, মদিনা নবীকুল সর্দার কর্তৃক সম্মানিত শহর সুতরাং এটা মক্কা হতে শ্রেষ্ঠ হবে, যা হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক সম্মানিত করা হয়েছে। আর রাসূল ﷺ নিজের জবানীতে বলেছেন "আল্লাহ তা'আলা-ই মক্কাকে সম্মানিত করেছেন তাকে কোনো মানুষ সম্মানিত করেনি।" হযরত ইবরাহীম (আ.) শুধু তা ঘোষণা করেছেন মাত্র। সুতরাং আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত হওয়ার কারণে তা মদিনা হতে শ্রেষ্ঠ।

তাঁদের চতুর্থ দলিলে মদীনায় রাসূল ﷺ -এর সমাহিত হওয়ার কথা রয়েছে– এর জবাব এই যে, এখানে সামগ্রিকভাবে মক্কা ও মদিনার শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনা হয়েছে, কোনো নির্দিষ্ট স্থানবিশেষের কথা নয়। যে স্থানের পবিত্র মাটি রাসূল ﷺ -এর পবিত্র দেহকে ধারণ করে রেখেছে তা সর্বসম্মতিক্রমে সকল স্থান হতে শ্রেষ্ঠ– এমনকি কা'বা, আরশ ও কুরসী হতেও শ্রেষ্ঠ।

তাজ ফাকেহী ও আরো অনেকে বলেছেন, 'জমিন' হলো আসমান হতে শ্রেষ্ঠ। কারণ নবীগণ জমিনকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন, জমিন হতেই নবীগণকে সৃষ্টি করা হয়েছে আবার এতেই সমাহিত করা হয়েছে। ইমাম নববী (র.) বলেছেন– জমহূরের মতে আসমানই শ্রেষ্ঠ। কারণ আসমানেই খোদার নৈকট্য লাভকারী প্রিয়জনদের অবস্থানস্থল। আবার আল্লামা নববী (র.) আলেমদের মতপার্থক্যের সমাধান প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আসমান সামগ্রিকভাবে জমিন হতে শ্রেষ্ঠ। তবে যে জমিন নবী-রাসূলদের পবিত্র দেহ ধারণ করে আছে এটা আসমান হতেও শ্রেষ্ঠ। –[আইনী, ফাতহ]

وَعَنْ ٢٦٣١ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰخِرُ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْاِسْلَامِ خَرَابًا الْمَدِيْنَةُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

২৬৩১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [কিয়ামতের পূর্বে] ইসলামি জনপদসমূহের মধ্যে সর্বশেষে বিনষ্ট হবে মদিনা। –[তিরমিযী]

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এটা হাসান গরীব হাদীস।

وَعَنْ ٢٦٣٢ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰى اِلَىَّ اَىَّ هٰؤُلَاءِ الثَّلٰثَةِ نَزَلْتَ فَهِىَ دَارُ هِجْرَتِكَ الْمَدِيْنَةِ اَوِ الْبَحْرَيْنِ اَوْ قِنَّسْرِيْنَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

২৬৩২. অনুবাদ : হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলেন, এ তিনটি স্থানের মধ্যে যেটিতেই আপনি অবতরণ করবেন সেটিই হবে আপনার হিজরতস্থল– মদিনা, বাহরাইন অথবা কিন্নাসরীন। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

টীকা : বাহরাইন হলো বসরা ও আম্মানের মধ্যবর্তী স্থান, অথবা ইয়েমেনের একটি প্রসিদ্ধ শহর। আবার কারো কারো মতে, ওমান সাগরের ভিতরের একটি দ্বীপ। আর কিন্নাসরীন সিরিয়ার একটি শহর।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٦٣٣ اَبِىْ بَكْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ عَلٰى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৬৩৩. অনুবাদ : হযরত আবূ বাকরা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন– মদিনায় কানা দাজ্জালের ভীতি কখনো পৌঁছবে না। সে সময় মদিনার সাতটি দরজা থাকবে এবং প্রত্যেক দরজায় দুজন করে ফেরেশতা [প্রহরায়] থাকবেন। –[বুখারী]

وَعَنْ ٢٦٣٤ اَنَسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَىْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৩৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ দোয়া করেছেন– হে আল্লাহ! তুমি মক্কায় যে বরকত দান করেছ মদিনায় এর দ্বিগুণ বরকত দান কর। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٢٦٣٥ رَجُلٍ مِنْ اٰلِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ زَارَنِىْ مُتَعَمِّدًا كَانَ فِىْ جِوَارِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ سَكَنَ الْمَدِيْنَةَ وَصَبَرَ عَلٰى بَلَائِهَا كُنْتُ لَهٗ شَهِيْدًا وَشَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ مَاتَ فِىْ اَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللّٰهُ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

২৬৩৫. অনুবাদ : খাত্তাব পরিবারের এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এসে [কেবল আমার জিয়ারতের উদ্দেশ্যেই] আমার জিয়ারত করবে কিয়ামতের দিন সে আমার পার্শ্বে থাকবে। যে মদিনাতে বসতি স্থাপন করবে এবং মদিনার মসিবতে ধৈর্যধারণ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্যে সাক্ষী ও সুপারিশকারী হবো। আর যে দু-হারাম শরীফের কোনো একটিতে মৃত্যুবরণ করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে নিরাপত্তা বা 'আমান'প্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে উঠাবেন।

وَعَنْ ٢٦٣٦ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) مَرْفُوْعًا مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِىْ بَعْدَ مَوْتِىْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِىْ فِىْ حَيَاتِىْ رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ -

২৬৩৬. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) 'মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ করবে অতঃপর আমার ইন্তেকালের পরে আমার কবর জিয়ারত করবে সে ঐ ব্যক্তির মতোই হবে যে আমার জীবদ্দশায় আমার জিয়ারত করেছে। –[উপরিউক্ত হাদীসদ্বয় বায়হাকী শুয়াবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হজ ও জিয়ারতের মধ্যে কোনটি আগে : হাদীসের ভাষ্য ও শরিয়তের বিধান অনুযায়ী বুঝা যায় যে, প্রথমে হজ্জ তারপর জিয়ারত করাই উত্তম। কেননা, 'হজ আদায় করা' ফরজ এবং 'জিয়ারত করা' সুন্নত, সুতরাং ফরজ সুন্নতের আগেই হবে। কিন্তু হযরত হাসান বসরী (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যদি উক্ত হজটি ফরজ হয়, তবে আগে হজ্জ করবে পরে জিয়ারত করবে। অবশ্যই এটা উত্তম। কিন্তু এ অবস্থায় জিয়ারত আগে করলেও জায়েজ আছে। এতে কোনো দোষ হবে না। আর যদি হজটি নফল হয়, তখন যেটিই পূর্বে করবে সহীহ হবে। অর্থাৎ এটা তাদের অভিরুচি।

উল্লেখ্য যে, মদিনায় পৌঁছার পর প্রথমে মসজিদে নববীতে تَحِيَّةُ الْمَسْجِد [তাহিয়্যাতুল মাসজিদ] দু-রাকআত নামাজ আদায় করবে, তারপর রওজার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সালাত ও সালাম পেশ করবে।

وَعَنْ ٢٦٣٧ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ جَالِسًا وَقَبْرٌ يُحْفَرُ بِالْمَدِيْنَةِ فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ فَقَالَ بِئْسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِئْسَمَا قُلْتَ قَالَ الرَّجُلُ إِنِّيْ لَمْ أُرِدْ هٰذَا إِنَّمَا أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا مِثْلَ الْقَتْلِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ بُقْعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُوْنَ قَبْرِيْ بِهَا مِنْهَا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ. (رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا)

২৬৩৭. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বসেছিলেন। এ সময় মদিনাতে একটি কবর খনন করা হচ্ছিল। তখন এক ব্যক্তি কবরে উঁকি দিয়ে বলল, মু'মিনের জন্য কি মন্দস্থান এটা। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি খারাপ কথাই না বললে! লোকটি বলল, আমি এ উদ্দেশ্যে এটা বলিনি; বরং আমার কথার উদ্দেশ্য হলো– আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া। [সে কেন আল্লাহর রাস্তায় বিদেশে শহীদ না হয়ে মদিনায় মৃত্যুবরণ করল এবং কবরস্থ হতে চলল?] তখন রাসূল ﷺ বললেন, অবশ্য আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার সমতুল্য আর কিছুই নেই। তবে স্মরণ রেখ, আল্লাহর জমিনে এমন কোনো স্থান নেই, যাতে আমার সমাধি হওয়া মদিনা অপেক্ষা আমার নিকট অধিক প্রিয় হতে পারে। এ কথা তিনি তিনবার বললেন। –[ইমাম মালেক (র.) হাদীসটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।]

وَعَنْ ٢٦٣٨ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (رض) سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِوَادِي الْعَقِيْقِ يَقُوْلُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ اٰتٍ مِنْ رَبِّيْ فَقَالَ صَلِّ فِيْ هٰذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِيْ حَجَّةٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَقُلْ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৬৩৮. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে [হজের সফরে] আকীক উপত্যকায় বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, এ রাতে আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আমার কাছে এক আগন্তুক এসে বলেন, এ বরকতময় উপত্যকায় আপনি নামাজ পড়ুন এবং বলুন হজের মধ্যেই ওমরা। [অর্থাৎ তাকে ওমরাসহ এক হজ গণ্য করুন।] অপর এক বর্ণনায় আছে ওমরা ও হজ বলুন। –[বুখারী]

اَلْبَيْعُ-এর আভিধানিক অর্থ : بَيْع শব্দটি বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার। শব্দটি اَلْاَضْدَادِ اَسْمَاءُ বা বিপরীতার্থকবোধক শব্দের অন্তর্ভুক্ত। বেচাকেনা উভয় অর্থের জন্যই শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

بَيْع-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. مُطْلَقُ الْمُبَادَلَةِ বা নিছক বিনিময়। ২. مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ বা এক বস্তুর বিনিময়ে অন্য বস্তু দেওয়া। বাংলা ভাষায় بَيْع-এর অর্থ হচ্ছে বিক্রি করা। বিক্রেতাকে بَائِعٌ এবং বিক্রীত-দ্রব্যকে مَبِيْع, ক্রেতাকে مُشْتَرِیْ এবং মুদ্রা বা মূল্যকে ثَمَنٌ বলা হয়।

اَلْبَيْعُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় بَيْع-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

১. জমহুর ফুকাহার মতে- اَلْبَيْعُ هُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِيْ عَلٰى طَرِيْقِ التِّجَارَةِ

অর্থাৎ পরস্পর সন্তুষ্টচিত্তে ব্যবসা-পদ্ধতিতে মালকে মাল দ্বারা বিনিময় করা।

২. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ অভিধান গ্রন্থকারের মতে- هُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ الْمُتَقَوَّمِ بِالْمَالِ الْمُتَقَوَّمِ

অর্থাৎ পরস্পর অর্থকরী মালের বিনিময়কে بَيْع বলা হয়।

وَجْهُ التَّسْمِيَةِ [নামকরণের কারণ] : بَيْع শব্দটি بَاعَ يَبِيْعُ থেকে নির্গত। যার অর্থ হলো- উভয় হাতের প্রশস্তকরণের পরিমাণ। যেহেতু ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই দেওয়া-নেওয়ার জন্য হস্ত প্রসারিত করে, এজন্য এটাকে بَيْع বলা হয়। অথবা এটা بَايَعَ يُبَايِعُ مُبَايَعَةً বাবে مُفَاعَلَة থেকে নির্গত, যার অর্থ হলো- হাতের উপর হাত রাখা। ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যেও যেহেতু হাতের সাথে হাত মিলানোর নিয়ম ছিল, এজন্য এর নামকরণ করা হয়েছে بَيْع -

مَشْرُوْعِيَّةُ الْبَيْعِ [ক্রয়বিক্রয় বৈধতার প্রমাণ] : কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা ক্রয়বিক্রয়ের বিধান প্রমাণিত। যেমন-

কুরআন :

١. وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ـ
٢. وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ـ
٣. اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ـ
٤. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ـ

হাদীস :

١. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ ـ
٢. قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ اِنَّ بَيْعَكُمْ هٰذَا ـ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْكِذْبُ فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ ـ
٣. سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ؟ فَقَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهٖ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ ـ

ইজমা : সকল উম্মতের এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, ক্রয়বিক্রয় করা শরিয়তসম্মত।

مَوْضُوْعُ الْبَيْعِ [بَيْع-এর মূল বিষয়বস্তু] : بَيْع-এর مَوْضُوْع হচ্ছে- مَالٌ مُتَقَوَّمٌ وَمَقْدُوْرُ التَّسْلِيْمِ অর্থাৎ এমন মূল্যযোগ্য সম্পদ, যা হস্তান্তর করা যায়। তাই মদ, শূকর ইত্যাদি بَيْع-এর مَوْضُوْع হওয়া সঠিক হবে না। কেননা এগুলো ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে مَالٌ مُتَقَوَّمٌ বা অর্থকরী সম্পদ নয়।

رُكْنُ الْبَيْعِ [بيع -এর মূলনীতি] : بَيْع -এর رُكْن বা মূলনীতি দুটি- ১. اَلْإِيْجَابُ বা প্রস্তাব, ২. اَلْقَبُوْلُ বা গ্রহণ।
কারো মতে, بَيْع -এর رُكْن তিনটি- ১. اَلصِّيْغَةُ তথা إِيْجَابُ ও قَبُوْل ২. اَلْعَاقِدَيْنِ তথা ক্রেতা ও বিক্রেতা ৩. اَلْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِ তথা مَبِيْع ও ثَمَنْ -

حُكْمُ الْبَيْعِ [بَيْع -এর হুকুম] : بَيْع -এর حُكْم হচ্ছে-

ثُبُوْتُ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِىْ فِى الْمَبِيْعِ وَلِلْبَائِعِ فِى الثَّمَنِ إِذَا كَانَ تَامًّا وَعِنْدَ الْإِجَازَةِ إِذَا كَانَ مَوْقُوْفًا .

অর্থাৎ বিক্রীত বস্তুতে ক্রেতার মালিকানা এবং মূল্যের মধ্যে বিক্রেতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া যদি ক্রয়বিক্রয় تام বা পরিপূর্ণ হয়। আর بَيْع مَوْقُوْف তথা স্থগিত বেচাকেনার সময় অনুমতির উপর নির্ভর করে পরস্পরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

اَقْسَامُ الْبَيْعِ [ক্রয়বিক্রয়ের প্রকারভেদ] : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে بَيْع -এর প্রকারভেদ নিম্নরূপ-

ক. عَقْد بَيْع বা সংঘটিত হওয়া না হওয়ার দিক থেকে بَيْع চার প্রকার :

১. بَيْع نَافِذْ বা কার্যকরী ক্রয়বিক্রয় এমন بَيْع -কে বলা হয়, যাতে উভয় পক্ষের নিকটই সম্পদ থাকে এবং ক্রেতা-বিক্রেতা عَاقِلْ হয় এবং তা তাৎক্ষণিক মালিকানার উপকারিতা দেয়। এর অপর নাম بَيْع صَحِيْح -

২. بَيْع مَوْقُوْف : যে ক্রয়বিক্রয়ে কোনো ব্যক্তি অন্যের মালকে তার অনুমতি ব্যতিরেকে বিক্রয় করে, সেটাকে بَيْع مَوْقُوْف বলে। এর হুকুম হলো এ ধরনের بَيْع আসল মালিকের অনুমতি সাপেক্ষে সংঘটিত হবে।

৩. بَيْع فَاسِدْ যা মৌলিকভাবে বৈধ; কিন্তু গুণগতভাবে অবৈধ।

৪. بَيْع بَاطِلْ : এমন بَيْع যা মৌলিক ও গুণগত উভয় দিক থেকে অবৈধ। بَيْع بَاطِلْ ও بَيْع فَاسِدْ -এর বিস্তারিত আলোচনা بَابُ الْمَنْهِىْ عَنْهَا مِنَ الْبُيُوْعِ -এর মধ্যে আসবে ইনশাআল্লাহ।

খ. مَبِيْع বা বিক্রীত বস্তু হিসেবে بَيْع চার প্রকার :

১. بَيْع مُقَايَضَة : যাতে مَبِيْعও মাল হবে এবং ثَمَنْও মাল হবে। যেমন- ফসলের বিনিময়ে কাপড় ক্রয়বিক্রয়।

২. بَيْع صَرْف বা মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রার ক্রয়বিক্রয়। যেমন- ডলারের বিনিময়ে টাকা।

৩. بَيْع سَلَمْ : অগ্রীম মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে ক্রয়বিক্রয়কে بَيْع سَلَمْ বলা হয়।

৪. بَيْع مُطْلَقْ **বা সাধারণ ক্রয়বিক্রয়** : যাতে কোনো দ্রব্য মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়।

গ. ثَمَنْ অর্থাৎ মূল্য হিসেবে بَيْع চার প্রকার।

১. بَيْع مُرَابَحَة বা লাভজনক ক্রয়বিক্রয়।

২. بَيْع تَوْلِيَة বা ক্রয়মূল্যে ক্রয়বিক্রয়।

৩. بَيْع وَضِيْعَة বা ক্রয়মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে ক্রয়বিক্রয়।

৪. بَيْع مُسَاوَة বা ক্রয়মূল্যের প্রতি লক্ষ্য না করে যে কোনো মূল্যে বিক্রয় করা।

ঘ. এ ছাড়াও আরো কয়েক প্রকার بَيْع রয়েছে। যেমন-

১. بَيْعُ بِشَرْطِ الرُّؤْيَةِ ২. بَيْعُ إِقَالَة ৩. بَيْع مُوَازَنَة ৪. بَيْع شَرْطِ الْخِيَارِ ৫. بَيْعُ مُجَازَفَة ৬. بَيْع مُزَارَعَة ৭. بَيْع مُزَايَدَة ৮. بَيْعُ بِشَرْطِ الْبَرَائَةِ ৯. بَيْع مُخَابَرَة ১০. بَيْع مُسَاقَاة ১১. بَيْع مُكَايَلَة

ঙ. জাহিলি যুগের بَيْع গুলো নিম্নরূপ- ইসলাম এগুলোকে অনুমোদন করে না।

১. بَيْعُ تَلَقِّى الْجَلَبِ ২. بَيْعُ الْحَصَاةِ ৩. بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِىْ ৪. بَيْعُ السَّوْمِ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ ৫. بَيْع غَرَرْ ৬. بَيْع مُلَامَسَة ৭. بَيْع مُنَابَذَة ৮. بَيْع مُزَابَنَة ৯. بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ ১০. بَيْعُ الْعَرَايَا ১১. بَيْع مُحَاقَلَة ১২. بَيْعُ الْعُرْبُوْن ১৩. بَيْعُ الْمُعَاوَمَةِ وَالسِّنِيْن ১৪. بَيْعُ النِّتَاجِ ১৫. بَيْعُ النَّجَشِ -

بَابُ الْكَسْبِ وَطَلَبِ الْحَلَالِ
পরিচ্ছেদ : উপার্জন করা এবং হালাল রোজগারের উপায় অবলম্বন করা

'উপার্জন' ও 'হালাল অন্বেষণ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদি তথা ভাত, কাপড়, বাসস্থানের চাহিদা পূরণের জন্য বৈধ বা হালাল পন্থায় অর্থ উপার্জনের পেশা অবলম্বন করা। এ অধ্যায়ে হালাল উপার্জনের ফজিলত সম্পর্কিত হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে এবং কি ধরনের পেশা অবলম্বন করা উত্তম এবং কোনটা খারাপ, এর বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٦٣٩ - عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَاِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৬৩৯. অনুবাদ : হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কারো জন্য নিজ হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম আহার বা খাদ্য আর নেই। আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহিস্সালাম নিজ হাতের কামাই খেতেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত দাউদ (আ.) ছিলেন একজন মহিমান্বিত ও সম্মানিত নবী। নবুয়তীর পাশাপাশি আল্লাহ তাঁকে রাজত্বও দান করেছিলেন। বর্ণিত আছে যে, স্বীয় রাজত্বে তিনি প্রজা সাধারণের নিকট নিজের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে বেড়াতেন। কোনো অচেনা ব্যক্তি দেখলে তাকে জিজ্ঞেস করতেন, বলেতো দাউদ কেমন লোক? তাঁর স্বভাব-চরিত্র কেমন? তাঁর সম্পর্কে তোমার মতামত কি? একদিন আল্লাহ তাঁকে পরীক্ষা করার নিমিত্ত মানব বেশে একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে দিলেন। পথিমধ্যে তাকে পেয়েও তিনি অভ্যাসগতভাবে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। ফেরেশতা বললেন, তিনি তো লোক হিসেবে মন্দ নয়, তবে তিনি বাইতুল মাল তথা রাজস্ব-ভাণ্ডার থেকে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। একথা শ্রবণ মাত্রই তাঁর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে লাগল। তৎক্ষণাৎ আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে জাতীয় কোষাগার থেকে ভক্ষণ করা হতে মুক্তি দান কর! এমন একটি কর্ম শিখিয়ে দাও, যা দ্বারা আমি জীবিকা নির্বাহ করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করে তাঁকে এমন একটা বিদ্যা শিক্ষা দিলেন এবং তাঁর মধ্যে এমন বিশেষ গুণ দান করলেন যে, তাঁর হাতের স্পর্শে লোহা বিগলিত হয়ে যেত। যার দ্বারা তিনি লৌহবর্ম নির্মাণ করতেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি দৈনিক একটি লৌহবর্ম নির্মাণ করতেন, যা ৬০০০ দিরহামে বিক্রি হতো। তন্মধ্যে ২০০০ দিরহাম পরিবার ও পরিবারস্থদের জন্য ব্যয় করতেন। অবশিষ্ট ৪০০০ দিরহাম বনী ইসরাঈলের অনাথ, এতিম ও দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন।

মোটকথা, হুজুর ﷺ উপরিউক্ত বাক্যের মাধ্যমে বললেন, উপার্জন করা নবীগণের পেশা ও সুন্নত। সুতরাং তোমরাও তাঁদের পন্থা অবলম্বন কর।

تَوْضِيْحُ قَوْلِهِ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ [নবীজীর বাণী– يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ -এর ব্যাখ্যা] : এ বাক্য দ্বারা নবী করীম ﷺ সকলকে স্বহস্তে উপার্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর এতে অনেক উপকারিতাও রয়েছে। যেমন এর দ্বারা নিজে উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি অন্যকেও উপকৃত করা সম্ভব হয় এবং কর্মে নিযুক্ত থাকার কারণে অশ্লীলতা ও অনর্থক কাজ হতে বিরত থাকা যায়, দম্ভ ও অহংকারীর খারাবি থেকে নিজেকে মুক্ত করা যায়, সর্বোপরি ভিক্ষাবৃত্তি পরিহার করে নিজেকে সম্মানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়ে মর্যাদার জীবনযাপন করা সম্ভব হয়। –[মেরকাত খ. ৬, পৃ. ৩২]

وَعَنْ ٢٦٤٠ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا وَقَالَ تَعَالٰى يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৬৪০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা পাক-পবিত্র; তিনি একমাত্র পাক-পবিত্র বস্তুকেই কবুল করেন। [এবং সর্বক্ষেত্রে পাক-পবিত্রতার আদেশই তিনি করেছেন। এ সম্পর্কে] আল্লাহ রাসূলগণকে সেই আদেশ করেছেন– يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا "হে রাসূলগণ! আপনারা পাক-পবিত্র হালাল খাদ্য খাবেন এবং নেক আমল করতে থাকবেন।"

মুমিনগণকে লক্ষ্য করেও আল্লাহ তা'আলা তদ্রূপই বলেছেন– يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ "হে মু'মিনগণ! আমার দেওয়া পাক-পবিত্র হালাল রিজিক হতে খাও।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উল্লেখ করলেন– এক ব্যক্তি দূরদূরান্তের সফর করছে [মুসাফিরের দোয়া সাধারণত বেশি কবুল হয় এবং] তার মাথার চুল এলোমেলো, শরীরে ধূলিবালি। [অর্থাৎ করুণ অবস্থা– যার দোয়া সহজে কবুল হয়।] এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি উভয় হস্ত আসমানের দিকে উঠিয়ে কাতর স্বরে হে প্রভু! হে প্রভু!! বলে ডাকছে। কিন্তু তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম [অর্থাৎ সবই হারাম উপায়ে উপার্জিত] এবং সেই হারামই সে খেয়ে থাকে। এই ব্যক্তির দোয়া কিরূপে গৃহীত হতে পারে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَجْهُ عَدَمِ قَبُوْلِ الدُّعَاءِ [দোয়া কবুল না হওয়ার কারণ] : ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অনেকেরই দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হচ্ছে না। তখন সে আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু প্রকৃত কারণ কি, তা খতিয়ে দেখা হয় না। নবী করীম ﷺ বলেন, তোমাদের দোয়া কবুল না হওয়ার কারণ হলো হারাম ও অবৈধ পন্থায় উপার্জিত অর্থে জীবিকা নির্বাহ করা। আরো সুস্পষ্ট করে উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন– এক ব্যক্তি হজ অথবা ইবাদতের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ সফরে বের হয় এবং সে সেখানে পৌঁছতেও সক্ষম হয়, সেখানে পৌঁছে সে এমতাবস্থায় দোয়ার জন্য হস্ত উত্তোলন করে যে, দীর্ঘ সফরের কারণে তার চুল এলোমেলো, সমগ্র দেহ ধূলিমলিন, এমতাবস্থায় সে বিনয় ও কাতরতার সাথে কায়মনোবাক্যে দোয়া করেই চলেছে। কিন্তু তার দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হচ্ছে না। অথচ এ অবস্থার দোয়া কবুল হওয়া উচিত। কেননা, একেতো সে আবেদ এবং সফররত আর সফরকারীর দোয়া কবুলযোগ্য। তদুপরি সে এমন স্থানে গিয়ে দোয়া করছে, যেখানকার দোয়া কবুল করা হয়। মোটকথা দোয়া কবুল হওয়ার সকল বাহ্যিক উপকরণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তার দোয়া কেন কবুল হচ্ছে না? নবী করীম ﷺ -এর দৃষ্টিতে এর কারণ হলো হারাম পন্থায় জীবিকা নির্বাহ করা। সে কথাই বলা হয়েছে তার আহার্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম– এমতাবস্থায় তার দোয়া কিভাবে কবুল হবে? বুঝা গেল যে, দোয়া কবুল হওয়ার জন্য হালালভাবে জীবনযাপন করা অপরিহার্য। এজন্যই বলা হয়েছে দোয়ার দুটি ডানা আছে, "একটি হলো হালাল ভক্ষণ, অপরটি হলো সত্যবাদিতা।"

–[মেরকাত খ. ৬, পৃ. ৩৫]

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَلطَّيِّبَاتُ : একবচনে طَيِّبٌ অর্থ– হালাল বস্তু, সুস্বাদু নিয়ামতরাজি।

يُطِيْلُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ اِثْبَات فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِطَالَةُ অর্থ– দীর্ঘ করা, প্রলম্বিত করা।

اَشْعَثُ : একবচন, বহুবচনে شُعْثٌ এর مُؤَنَّثٌ হলো شَعْثَاءُ অর্থ– এলোমেলো চুলবিশিষ্ট।

اَغْبَرُ : এটি একবচন, বহুবচনে غُبْرٌ অর্থ– ধূলিমলিন।

مَطْعَمٌ : এখানে م টি হলো مَصْدَرِيَّة যা اِسْم مَفْعُوْل-এর অর্থে ব্যবহৃত হবে। অর্থ– আহার্য, খাবার, খাদ্য।
مَشْرَبٌ : এখানেও م টি مَصْدَرِيَّه যা اِسْم مَفْعُوْل-এর জন্য ব্যবহৃত। অর্থ– পানীয়।
مَلْبَسٌ : এখানেও م টি مَصْدَرِيَّة যা اِسْم مَفْعُوْل-এর জন্য ব্যবহৃত। অর্থ– পোশাক-পরিচ্ছদ।

وَعَنْهُ ٢٦٤١ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৬৪১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মানুষের সম্মুখে এমন এক যুগ আসবে যে, কেউই পরোয়া করবে না– কি উপায়ে মাল উপার্জন করল; হারাম উপায়ে নাকি হালাল উপায়ে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে যখন বিশ্বব্যাপী অনেক অনিষ্ট ছড়িয়ে পড়বে, তন্মধ্যে একটি হলো লোকেরা হালাল-হারামের তারতম্য ছেড়ে দেবে। যে যেই সম্পদ পাবে, তা যেভাবেই অর্জিত হোক না কেন, হালাল-হারামের তারতম্য না করেই তা কুক্ষিগত করা শুরু করে দেবে। কে একথা অস্বীকার করতে পারবে যে, হুজুর ﷺ -এর এই ভবিষ্যদ্বাণী আজকের যুগে পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না? কয়জন লোক এমন খুঁজে পাওয়া যাবে, যারা হারাম-হালালের মধ্যে তারতম্য করে থাকে? সুতরাং বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা অপরিহার্য। –[মাযাহেরে হক জাদীদ, খ. ৩, পৃ. ৪৩১]

وَعَنِ ٢٦٤٢ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِيْ يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৪২. **সরল অনুবাদ** : হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট, আর উভয়ের মধ্যে অনেক সন্দেহজনক বিষয় বা বস্তু রয়েছে। যেগুলো [হালালের অন্তর্ভুক্ত নাকি হারামের অন্তর্ভুক্ত, সে] সম্পর্কে অনেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সন্দেহের বস্তুকে পরিহার করে চলবে, তার দীন এবং আবরু-ইজ্জত, মান-সম্মান পাক-সাফ থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহের কাজে লিপ্ত হবে, সে অচিরেই হারামেও লিপ্ত হয়ে পড়বে। [ফলে তার দীন এবং মান-সম্মান কলুষিত হবে।] যেমন– যে রাখাল তার পশুপালকে নিষিদ্ধ এলাকার সীমার নিকটে চরাবে, খুব সম্ভব তার পশু নিষিদ্ধ এলাকার ভিতরেও মুখ ঢুকিয়ে দেবে।

তোমরা স্মরণ রেখ, প্রত্যেক বাদশাই নিজ পশুপালের চারণভূমি [নিষিদ্ধ এলাকা] বানিয়ে রাখেন। তদ্রূপ [সকল বাদশাহর বাদশাহ] আল্লাহ তা'আলার চারণভূমি তাঁর হারাম বস্তুসমূহকে নির্ধারিত করে রেখেছেন। [ঐ সবের সীমার ধারে নিজ নফসকে যে ব্যক্তি যেতে দেবে, অচিরেই সে হারামেও লিপ্ত হয়ে যাবে। হারামের সীমার নিকটে বলতে সন্দেহের বস্তুই উদ্দেশ্য।]

তোমরা আরো স্মরণ রেখ, মানবদেহের ভেতরে একটি মাংসপিণ্ড আছে, যা সঠিক থাকলে সমগ্র দেহই সঠিক থাকে। আর এর বিকৃতি ঘটলে সমগ্র দেহেরই বিকৃতি ঘটে। সেই মাংসপিণ্ডটি হলো [জ্ঞানের আধার] অন্তঃকরণ। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ الخ-এর ব্যাখ্যা : হাদীসের এ অংশের অর্থ হলো, কিছু বিষয় রয়েছে, যার হালাল হওয়ার মর্মার্থ সুস্পষ্ট। যেমন– পানাহার, বিবাহ-শাদি, সদুপদেশ ইত্যাদি। আবার কিছু জিনিস এমন রয়েছে, যার হারাম হওয়াটা সুস্পষ্ট। যেমন– মদ, শূকরের মাংস, মৃত প্রাণী, জেনা-ব্যভিচার, সুদ-ঘুষ, গিবত-শেকায়েত, পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত ইত্যাদি। আবার কিছু জিনিস এমন রয়েছে, যার মর্মার্থ উদ্‌ঘাটন করা এবং হালাল-হারাম নির্ণয় করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। সকলের পক্ষে এর রহস্য উদ্‌ঘাটন সম্ভবপর হয় না। তবে মুষ্টিমেয় ওলামায়ে কেরাম ইজতেহাদের মাধ্যমে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন।

সন্দেহপূর্ণ বস্তু সম্পর্কে বিভিন্ন মাযহাবের মতামত : সন্দেহপূর্ণ জিনিস সম্পর্কে তিনটি মতামত রয়েছে– ১. এ রকম জিনিসকে হালালও মনে করবে না, আবার হারামও মনে করবে না; বরং এর ব্যবহার হতে বিরত থাকাই শ্রেয়। ২. এটাকে হারাম মনে করবে। ৩. এটাকে মুবাহ মনে করবে। উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তির নিকট কিছু টাকা রয়েছে, যার কিছু টাকা হালাল ও কিছু টাকা হারাম। এমতাবস্থায় সমুদয় টাকাই তার জন্য সন্দেহপূর্ণ হয়ে গেল। সুতরাং সেই সমুদয় টাকা ব্যবহার না করাই তার জন্য উত্তম।

দৃষ্টান্ত : হুজুর ﷺ সন্দেহপূর্ণ জিনিস থেকে বাঁচার একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, প্রত্যেক বাদশাহদের একটি চারণভূমি বা নিষিদ্ধ এলাকা থাকে। রাখালের উচিত হলো তার ছাগপালকে ঐ নিষিদ্ধ এলাকা থেকে দূরে রাখা। কেননা, তার নিকটবর্তী এলাকায় ছাগল চরাতে গেলে সেই নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। যার ফলে সে-ই দোষী সাব্যস্ত হবে।

তদ্রূপভাবে আল্লাহ তা'আলারও একটি নিষিদ্ধ এলাকা রয়েছে, আর তা হলো হারাম বস্তু। সুতরাং ঐ নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করবে না। অর্থাৎ হারাম বস্তু ভক্ষণ করবে না। আর এর উপায় হলো সন্দেহপূর্ণ জিনিস থেকে বেঁচে থাকা। কেননা সন্দেহপূর্ণ জিনিসে নিপতিত হলে হারামে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এ প্রসঙ্গে শায়খ আলী মুত্তাকী (র.) 'জরুরি, মুবাহ, মাকরূহ, হারাম, কুফ্‌র' এ পাঁচটি স্তর নির্ণয় করে বলেছেন, মানুষ অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের সকল দিকের প্রয়োজন মেটানোর পরিমাণ জীবনযাপনে তুষ্ট থাকে, যার দ্বারা তার অস্তিত্ব ও সম্মান বজায় থাকতে পারবে। কিন্তু যখনই সে এ পরিমাণকে অতিক্রম করার চেষ্টা করবে, তখনই সে মুবাহ এর মধ্যে প্রবেশ করবে। আর মুবাহ এর উপর তুষ্ট না থেকে সামনে অতিক্রম করলে সে মাকরূহ এর সীমায় প্রবেশ করবে। এমনকি লোভ-লালসা তাকে মাকরূহের গণ্ডি থেকে বের করে হারামের সীমানায় প্রবেশ করিয়ে দেবে, যার ফলশ্রুতিতে তার পরবর্তী পদক্ষেপ কুফরির সীমায় পৌঁছে যায়। (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ)

নবীজীর বাণী– اَلَا اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً-এর ব্যাখ্যা : সবশেষে নবী করীম ﷺ আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেছেন– মানবদেহে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যার নাম হলো কল্‌ব বা অন্তর। যা মানবদেহের বাদশাতুল্য, আর অন্য সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হলো প্রজাতুল্য। যদি সেই মাংসপিণ্ড নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ বিভিন্ন পাপের দরুন নষ্ট হয়ে পড়ে, তখন এর প্রভাবে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি তা ঠিক থাকে, ভালো থাকে, তাহলে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গও ভালো থাকবে। সুতরাং অন্তরকে শুদ্ধ করা, গুনাহমুক্ত রাখা এবং আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসা দ্বারা সজীব রাখা সকলের জন্যই অপরিহার্য।

فَضْلُ هٰذَا الْحَدِيْثِ [এ হাদীসের বৈশিষ্ট্য] : এ হাদীসের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সকল ওলামায়ে কেরাম একমত। তারা বলেছেন– যে তিনটি হাদীস ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু, তন্মধ্যে এটি একটি। অন্য দুটি হলো– اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ এবং مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ কেনেনা এগুলোতে ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ : رَاعِىْ এটি একবচন, বহুবচনে رُعَاةٌ অর্থ– রাখাল।

اَلْحِمٰى : সংরক্ষিত স্থান, নিষিদ্ধ এলাকা। এমন চারণভূমি, যাতে অন্যের বিচরণের অনুমতি থাকে না।

يَرْتَعُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে فَتَحَ মাসদার اَلرَّتْعُ অর্থ– বিচরণ করা।

اَلْقَلْبُ : এটি একবচন, বহুবচনে قُلُوْبٌ। অর্থ– হৃৎপিণ্ড, অন্তর, হৃদয়। বাবে ضَرَبَ -এর মাসদার অর্থ– উল্টানো, ঘুরানো, ফিরানো। মানুষের অন্তরও যেহেতু সব সময় পরিবর্তন হতে থাকে, এজন্য এর নাম قَلْب রাখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন– قَدْ سُمِّيَ الْقَلْبُ قَلْبًا مِنْ تَقَلُّبِهٖ * فَاحْذَرْ عَلَى الْقَلْبِ مِنْ قَلْبٍ وَتَحْوِيْلٍ

আবার কেউ বলেছেন– وَمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ كَلْبًا اِلَّا اَنَّهٗ يَتَقَلَّبُ

وَعَنْ ٢٦٤٣ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيْثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৬৪৩. অনুবাদ : হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কুকুর বিক্রয়ের মূল্য ঘৃণিত বস্তু, ব্যভিচারের বিনিময়ও অতি জঘন্য, রক্তমোক্ষণ ব্যবসাও জঘন্য। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কুকুর বিক্রয়লব্ধ অর্থের বৈধতার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ : কুকুর বিক্রয়লব্ধ অর্থ জায়েজ-নাজায়েজ হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে, কুকুর চাই শিকারি হোক বা না হোক, তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ হারাম।

ইমাম মালেক (র.)-এর একটি মতও এরূপ। ১. তাঁদের দলিল–

١. عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২. অপর হাদীসে রয়েছে– ٢. ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيْثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ : ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট কুকুর ও হিংস্র প্রাণী বিক্রয়লব্ধ টাকা বৈধ।

তাঁদের দলিল নিম্নরূপ– ١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ

٢. وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ نَهٰى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَكَسْبِ الْفَحْلِ وَعَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ اِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ - (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

জবাব : হানাফীগণ তাঁদের উত্তরে বলেন,

১. ইমাম ত্বাহাবী (র.) বলেন, এ হুকুম ইসলামের প্রাথমিক যুগের জন্য ছিল, যখন কুকুরকে হত্যার নির্দেশ ছিল। পরবর্তীতে মানুষের প্রয়োজনের কারণে তা রহিত করা হয়েছে।

২. এখানে خَبِيْثٌ শব্দের অর্থ হারাম নয়; মাকরূহ। কেননা এ خَبِيْث শব্দটি এমন স্থানেও ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহ। যেমন– كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ

৩. نَهِيْ বা নিষেধ সংক্রান্ত হাদীস হলো كَلْبٌ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهٖ -এর জন্য আর جَوَازٌ বা বৈধতার হাদীস হলো كَلْبٌ مُنْتَفَعٌ بِهٖ -এর জন্য। এভাবে উভয় হাদীসের উপরই আমল হয়ে যাবে এবং উভয় ধরনের হাদীসের দ্বন্দ্বেরও সমাধান হয়ে যাবে।

مَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيْثٌ : পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জিত টাকা অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত উম্মতেরও ঐকমত্য রয়েছে। কেননা, তা হারাম পন্থায় উপার্জিত হয়েছে। আর যেহেতু এ পারিশ্রমিকটাও যৌনাঙ্গের বিনিময়ে নেওয়া হয়, এজন্য এখানে مَهْر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

مَذَاهِبُ فِيْ كَسْبِ الْحَجَّامِ **[শিঙ্গা লাগানোর পারিশ্রমিক বৈধতার ব্যাপারে মতভেদ] :** শিঙ্গা লাগানোর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা যাবে কিনা, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

مَذْهَبُ الْاَحْمَدِ (رحـ) : ইমাম আহমদ (র.)-এর নিকট জায়েজ নয়। তাঁর দলিল– كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ

তাঁর মতে, এখানে خَبِيْث শব্দটি হারাম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

مَذْهَبُ الْجُمْهُوْرِ : জমহুরের নিকট শিঙ্গা লাগানোর পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ। তাঁদের দলিল নিম্নরূপ-

١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ الْأَجْرَةَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

যদি বৈধ না হতো, তাহলে হুজুর ﷺ তাকে পারিশ্রমিক দিতেন না। কেননা, হারাম যেমন গ্রহণ অবৈধ, তেমনি কাউকে দেওয়াও অবৈধ

٢- وَلِأَنَّهُ إِسْتِيْجَارٌ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُوْمٍ وَأَجْرٍ مَعْلُوْمٍ فَيَقَعُ جَائِزًا -

জবাব : তাঁর দলিলের উত্তরে জমহুর বলেন-

১. এখানে বিভিন্ন قَرِيْنَةٌ -এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, خَبِيْثٌ শব্দটি হারামের অর্থে নয়; বরং مَكْرُوْهٌ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস দ্বারা নিষেধ সংক্রান্ত সকল হাদীসই মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ : خَبِيْثٌ এটি একবচন, বহুবচনে خُبُثٌ ـ خُبَثَاءُ। অর্থ- মন্দ, খারাপ, হারাম, নাপাক, মাকরূহ।

مَهْرٌ : বহুবচন مُهُوْرٌ অর্থ- দেনমোহর, বিনিময়, পারিশ্রমিক।

اَلْبَغِيُّ : একবচন, বহুবচনে بَغَايَا অর্থ- পতিতা, বেশ্যা।

حَجَّامٌ : যে শিঙ্গা লাগায়। বহুবচনে حَجَّامُوْنَ -

وَعَنْ ٢٦٤٤ أَبِيْ مَسْعُوْدِ نِ الْأَنْصَارِيِّ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৪৪. অনুবাদ. হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন- কুকুর বিক্রয়ের মূল্য হতে, ব্যভিচারের বিনিময় হতে এবং গণক-ঠাকুরের ভেট হতে। [বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : ভাগ্য যাচাই বা শুভ-অশুভ গণনার উদ্দেশ্যে গণক বা জ্যোতিষীদের নিকট যাওয়া হারাম। তাদের গণনার প্রতি বিশ্বাস করা 'শিরকী' গুনাহ। তাদেরকে কোনো প্রকার ভেট দেওয়া হারাম এবং ঐ বস্তু ব্যবহার করাও হারাম।

টীকা : حُلْوَانٌ : এটি একবচন, বহুবচনে حَلْوَانَاتٌ অর্থ- মিষ্টি, বখশিশ, ভেট। আরবদের পরিভাষায় শব্দটি গণকদের বখশিশ বা পারিশ্রমিককেই বোঝায়। চাই তা মিষ্টি হোক বা না হোক।

اَلْكَاهِنُ : একবচন, বহুবচনে كُهَّانٌ অর্থ- গণক, জ্যোতিষী। আরবে তৎকালীন যুগে অনেক ধরনের গণক ছিল। এক ধরনের গণক ছিল, যারা বলত যে, যা ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে, এমন বিষয় সম্পর্কেও তারা জ্ঞান রাখে এবং তারা দাবি করত যে, তাদের অনুগত অনেক জিন আছে। তারা তাদের নিকট এসব সংবাদ সরবরাহ করে। আবার কেউ দাবি করত, তারা নিজেদের বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা এসব জিনিস জানতে পারে। আবার কেউ দাবি করত যে, বিভিন্ন উপকরণাদি দ্বারা তারা এসব কিছু জানতে পারে। যেমন- চুরির স্থানে গিয়ে চোর সম্পর্কে। তবে ইসলামে এর কোনোটিরই বৈধতা নেই।

وَعَنْ ٢٦٤٥ أَبِيْ جُحَيْفَةَ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৬৪৫. অনুবাদ : হযরত আবূ জোহায়ফা (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ নিষেধ করেছেন- রক্তমোক্ষণ কার্যের বিনিময় হতে, কুকুর বিক্রয়ের মূল্য হতে, ব্যভিচার বা জেনার বিনিময় হতে এবং তিনি লানত করেছেন সুদ গ্রহীতার প্রতি ও সুদদাতার প্রতি। তিনি আরও লানত করেছেন ঐ ব্যক্তির প্রতি, যে দেহের কোনো অংশে নাম বা চিত্র ইত্যাদি উৎকীর্ণ করে এবং যে উৎকীর্ণ করায়। এতদ্ভিন্ন ছবি অঙ্কনকারীর প্রতিও তিনি লানত করেছেন। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَسْئَلَةُ بَيْعِ الدَّمِ [রক্ত ক্রয়বিক্রয়ের মাসআলা] : মানবদেহের রক্ত ক্রয়বিক্রয় অবৈধ। কারণ রক্ত অপবিত্র, তাছাড়া মানবদেহ হলো সম্মানিত বস্তু, যা বেচাকেনা করলে তার অসম্মান করা হয়। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচানোর জন্য যদি কারো শরীরে রক্ত দিতে হয়, সেক্ষেত্রে মাসআলা হলো রক্ত ক্রয় করা জায়েজ হবে, তবে বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। অর্থাৎ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অপারগ অবস্থায় ক্রয় করলে এর গুনাহ হবে না, কিন্তু যে বিক্রয় করবে, তার জন্য ঐ বিক্রয়লব্ধ অর্থ হালাল হবে না। সুতরাং সামর্থ্যবানদের উচিত বিনিময় ছাড়াই রক্ত দেওয়া।

صُوْرَةُ الْوَشْمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْمُصَوِّرِ [উৎকীর্ণ করার পদ্ধতি] : তৎকালীন আরবের জাহিলি যুগে এবং সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশের এক শ্রেণির যুবক দেহের যে কোনো অংশে সুই দ্বারা ছিদ্র করে ভিতরে এক জাতীয় রং প্রবেশ করিয়ে বিভিন্ন চিত্র অঙ্কন করে। যে এই কাজ করে, তাকে اَلْوَاشِمَةُ এবং যে করায়, তাকে اَلْمُسْتَوْشِمَةُ বলে। এহেন কাজকে শরিয়ত কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। রাসূল ﷺ এদের জন্য অভিসম্পাত করেছেন।

وَجْهُ النَّهْىِ عَنْ ذٰلِكَ [নিষেধাজ্ঞার কারণ] : এ ধরনের কাজ নিষেধ হওয়ার কারণ হলো, এটি হলো অজ্ঞ-মূর্খ ও বিধর্মীদের কাজ। তাছাড়া এটা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করার নামান্তর, যা কারো জন্যই বৈধ নয়। এহেন কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। যদি কেউ এ কাজ করে, তাহলে সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে তা মিটিয়ে ফেলা উচিত।

প্রাণীর ছবি অংকন করাও শরিয়তে বৈধ নয়। তবে প্রাণী ব্যতীত বৃক্ষ, মনোরম দৃশ্য, বিল্ডিং ইত্যাদির ছবি অংকন করা জায়েজ আছে। রাষ্ট্রীয় আইন রক্ষার্থে যথা– হজ, ব্যাংক একাউন্ট ইত্যাদির ক্ষেত্রে ছবি তোলা জায়েজ হবে। এর জন্য ঐ ব্যক্তির গুনাহ হবে না। এ পাপের দায়িত্ব সরকার বহন করবে। যারা ছবি অংকন পেশা গ্রহণ করেছে, তাদের জন্য রাসূল ﷺ অভিসম্পাত করেছেন এবং কিয়ামতে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَلْوَاشِمَةُ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلْوَشْمُ অর্থ– উৎকীর্ণকারিণী, দেহের যে কোনো অংশে চর্মের নিচে আলপনা অঙ্কন করা।

اَلْمُسْتَوْشِمَةُ : উৎকীর্ণ করার জন্য আহ্বানকারিণী।

اَلْمُصَوِّرُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাবে تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّصْوِيْرُ অর্থ– চিত্রাঙ্কনকারী।

وَعَنْ ٢٦٤٦ جَابِرٍ (رض) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ تُطْلٰى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذٰلِكَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ إِنَّ اللّٰهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا أَجْمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৪৬. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের বৎসর মক্কায় অবস্থানকালে বলেছেন– আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল হারাম করে দিয়েছেন– মদ বিক্রি করা, মৃত জীব বিক্রি করা, শূকর বিক্রি করা এবং কোনো প্রকার মূর্তি বিক্রি করা। রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞেস করা হলো– মৃত জীবের চর্বি নৌকায় লাগানো হয়, বিভিন্ন চর্ম-বস্তুতে লাগানো হয় এবং লোকেরা তা দ্বারা প্রদীপ জ্বালিয়ে থাকে, [অর্থাৎ মৃতের চর্বি কার্যোপযোগী উপকারী বস্তু] তা বিক্রয় সম্পর্কে আপনার কি সিদ্ধান্ত? রাসূল ﷺ বললেন, এটাও বিক্রি করা যাবে না, এটাও হারাম। তৎসঙ্গে তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের ধ্বংস করুন; তাদের জন্য যখন [হালাল জবাইকৃত জীবেরও] চর্বি আল্লাহ তা'আলা হারাম করলেন, তখন তারা সেটাকেগলিয়ে বিক্রি করল এবং এর মূল্য ভোগ করল। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মদ, মৃত জন্তু, শূকর ও মূর্তি ক্রয়বিক্রয়ের হুকুম :

اَلْخَمْرُ [মদ] : মদ বিক্রয় করা যাবে কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, মদ পান করা যেহেতু হারাম, এটা বেচাকেনাও হারাম, এমনকি এর মূল্য ভোগ করাও হারাম। তাঁদের দলিল হচ্ছে–

* قَالَ الرَّسُوْلُ ﷺ فَمَنْ اَدْرَكَتْهُ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبُ وَلَا يَبِيْعُ وَقَالَ اَيْضًا اِنَّ الَّذِيْ حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا -

* عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلٰى قَوْمٍ اَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ -

২. ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে মাদকদ্রব্যের ব্যবসা হালাল, তবে উপকার গ্রহণ হালাল নয়।

৩. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মুদ্রার বিনিময়ে মদ বিক্রি করা বাতিলযোগ্য। তবে যদি কোন সম্পদের বিনিময়ে হয়, তাহলে ঐ ক্রয়বিক্রয় ফাসেদ হবে। ফলে বিক্রেতা বিনিময়ে দেওয়া সম্পদের মালিক হবে। যেমন– কাপড়ের বিনিময়ে মদ বিক্রি করা।

اَلْمَيْتَةُ [মৃত জন্তু] : যা শরিয়ত সমর্থিত পন্থায় জবাই করা ব্যতীত স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে, তা-ই হলো এখানে উদ্দেশ্য। মৃতের গোশ্তের ব্যাপারে সকলেই একমত যে, তা খাওয়া, বিক্রি করা, উপকৃত হওয়া সবকিছুই হারাম। অবশ্য মাছ এবং টিড্ডি এর ব্যতিক্রম। কিন্তু গোশ্ত ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ। যেমন– পশম, হাড়, শিং, খুর ইত্যাদি যার মধ্যে প্রাণ প্রবেশ করে না, সেগুলো সম্পর্কে ইখতিলাফ রয়েছে।

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মালেক (র.)-এর নিকট এ জিনিসগুলো মৃত্যুর কারণে অপবিত্র হয় না। সুতরাং এগুলোর বেচাকেনা ও এগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়েজ আছে। তাঁদের দলিল–

١. قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ -

উক্ত আয়াত এগুলোর দ্বারা উপকৃত হওয়ার বৈধতার প্রমাণ করে।

٢. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْتَشِطُ مِنْ عَاجٍ - (بَيْهَقِيْ)

[عَاجٌ হলো হাতির দাঁত।]

٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ : اِنَّمَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا فَاَمَّا الْجِلْدُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوْفُ فَلَا بَأْسَ بِهِ - (دَارَقُطْنِيْ)

২. ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, মূর্তির সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা উপকৃত হওয়া অবৈধ। তাঁদের দলিল–

* قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ -

জবাব : তাঁদের দলিলের উত্তর হলো, উক্ত হাদীসের ব্যাপকতাকে আমাদের হাদীসের দ্বারা خَاصّ করা হয়েছে, অথবা এ হাদীস দ্বারা উক্ত হুকুমকে মানসূখ করা হয়েছে।

اَلْخِنْزِيْرُ [শূকর] : শূকর ও এর সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং ক্রয়বিক্রয় সবই নিষিদ্ধ। তবে হানাফী ইমামগণ কোনো এককালে এর পশম জুতা সেলাইয়ের কাজে ব্যবহারের অনুমতি দিতেন। কেননা এতদ্ব্যতীত উক্ত কাজ হতে পারত না। আর ফায়দা হলো– اَلضُّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ সুতরাং তা ক্রয় করা ব্যতীত পাওয়া না গেলে ক্রয় করারও অনুমতি ছিল। কিন্তু মুসলমান বিক্রেতার জন্য তার মূল্য হারাম ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে যখন শূকরের পশমের বিকল্প তৈরি হয়েছে, তখন এর ব্যবহারও নাজায়েজ হয়ে গেছে। যেমন আল্লামা মাকদাসী (র.) বলেন–

اِسْتَغْنَوْا عَنْهُ اَيْ فَلَا يَجُوْزُ اِسْتِعْمَالُهُ لِزَوَالِ الضَّرُوْرَةِ الْبَاعِثَةِ الْحُكْمِ بِالطَّهَارَةِ - (رَدُّ الْمُحْتَارِ)

اَصْنَامٌ [মূর্তি] : মূর্তি বিক্রয় সর্বসম্মতিক্রমে অবৈধ, যদিও তা স্বর্ণ বা রৌপ্যের নির্মিত হোক। অবশ্য যদি তা ভেঙ্গে ভাঙ্গা অংশ দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়, তাহলে কিছু হানাফী ও শাফেয়ীদের নিকট এর বিক্রয় বৈধ হবে।

মৃত প্রাণীর চর্বি বিক্রয়ের হুকুম : মৃত প্রাণীর চর্বি দ্বারা তিনভাবে উপকৃত হওয়ার কথা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে- ১. নৌকায় প্রলেপ দেওয়া, ২. চর্মে মালিশ করা, ৩. প্রদীপ জ্বালানো। সাহাবায়ে কেরাম হুজুর ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, মৃতের চর্বি দ্বারা এ তিনভাবে উপকৃত হওয়া যায়। তাহলে কি এর বিক্রয় জায়েজ হবে? এর উত্তরে হুজুর ﷺ বললেন- لَا هُوَ حَرَامٌ এখানে هُوَ যমীরের مَرْجِعْ সম্পর্কে ইখতিলাফ আছে। অধিকাংশ শাফেয়ীদের মতে এর مَرْجِعْ হলো بَيْع - সুতরাং মৃতের চর্বি দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়েজ হবে, কিন্তু তা বিক্রি করা জায়েজ হবে না।

অপরদিকে হানাফী ও জমহুরের মতে هو যমীরের مرجع হলো انتفاع بها। তদুপরি ইবনে মাজাহ-এর এক বর্ণনায় لا هن حَرَامٌ রয়েছে। সেক্ষেত্রে هُنَّ দ্বারা চর্বি উদ্দেশ্য হওয়াই বাস্তব। সুতরাং মৃতের চর্বি দ্বারা কোনোভাবেই উপকৃত জায়েজ হবে না। -[ফতহুল মুলহিম]

শব্দ-বিশ্লেষণ :

شُحُوْمٌ : এটি বহুবচন, একবচনে شَحْمٌ অর্থ- চর্বি।

تُطْلَى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مُضَارِعْ مجهول মাসদার اَلطَّلَاءُ অর্থ- চর্বি মালিশ করা।

اَلسُّفُنُ : এটি বহুবচন, একবচনে سَفِيْنَةٌ অর্থ- নৌকা।

يُدْهَنُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাবে اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِدْهَانُ অর্থ- তেল মালিশ করা।

يَسْتَصْبِحُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِصْبَاحُ অর্থ- প্রদীপ জ্বালানো।

وَعَنْ ٢٦٤٧ عُمَرَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৪৭. **অনুবাদ :** হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- আল্লাহ ইহুদিদের সর্বনাশ করুন; [হালাল জীবেরও] চর্বি তাদের জন্য হারাম করা হয়েছিল। তারা ঐরূপ চর্বি গলিয়ে বিক্রয় করেছে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** উক্ত হাদীসে ইহুদি জাতির একটি নির্লজ্জ ধূর্ততার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হলো, যখন তাদের জন্য মৃত প্রাণীর চর্বি হারাম করা হয়েছিল, তখন তারা একটি প্রতারণার আশ্রয় নিল। অর্থাৎ চর্বি বিগলিত করে বিক্রি করত এবং এর মূল্য দ্বারা উপকৃত হতো আর তারা বলত, আমরা চর্বি খাই না; বরং চর্বির মূল্য দ্বারা উপকৃত হই। এটা অবৈধ হবে না। তাদের ধূর্ততা ও শঠতার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ বলেন, এ কারণেই আল্লাহর অভিসম্পাত তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। সুতরাং আল্লাহর হুকুমের সাথে প্রতারণা করা অভিসম্পাতেরই কারণ।

وَعَنْ ٢٦٤٨ جَابِرٍ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৬৪৮. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন- কুকুর বিক্রয়ের মূল্য হতে এবং বিড়াল বিক্রয়ের মূল্য হতে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ **[বিড়াল বিক্রয়লব্ধ অর্থের হুকুম] :** বিড়াল বিক্রি করে এর বিনিময় গ্রহণ জায়েজ আছে কিনা; এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতামত নিম্নরূপ-

১. ইমাম তাউছ ও মুজাহিদ (র.) -এর মতে, বিড়াল ক্রয়বিক্রয় ও এর মূল্য গ্রহণ জায়েজ নেই। তাঁদের দলিল-

* عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ -

২. জমহুরের মতে, উপকারী বিড়াল ক্রয়-বিক্রয় করে এর মূল্য গ্রহণ করা জায়েজ। এতদ্ব্যতীত অন্য বিড়াল বেচাকেনা জায়েজ নেই এবং এর বিনিময় গ্রহণ অবৈধ। তাঁদের দলিল হলো, তাঁরা বিড়ালকে كلب نافع -এর উপর কিয়াস করেন।

জবাব : তাঁদের দলিলের উত্তর হলো, এটা ইসলামের প্রথম যুগের ঘটনা, পরে রহিত হয়ে গেছে। অথবা نهى টা تنزيه -এর জন্য; হারামের জন্য নয়।

শব্দ-বিশ্লেষণ : سِنَّوْرٌ : এটি একবচন, বহুবচনে سَنَانِيْرُ অর্থ- বিড়াল।

وَعَنْ ٢٦٤٩ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ حَجَمَ اَبُوْ طَيْبَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَاَمَرَ اَهْلَهُ اَنْ يُخَفِّفُوْا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৪৯. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আবূ তায়বা নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শিঙ্গা লাগিয়েছিল, রাসূল ﷺ তাকে এক সা' [পৌনে চার সের] খোরমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তার মালিক পক্ষকে বলে দিলেন, তার উপর ধার্যকৃত উপার্জনের পরিমাণ হ্রাস করে দিতে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** তৎকালীন আরবদের নিয়ম ছিল যে, তারা তাদের দাস-দাসীদেরকে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করে দিত এবং তাদের উপার্জন থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মালিকরা নিত এবং বাকি অংশ তাদের থেকে যেত। আবূ তায়রা একজন ক্রীতদাস ছিল। সে হুজুরের সেবা করার ফলে হুজুর তার উপর অত্যধিক সন্তুষ্ট হলেন এবং তার মালিকদেরকে বলে দিলেন, যেন আবূ তায়বার উপার্জন থেকে পূর্বের তুলনায় কম নেওয়া হয়।

এ হাদীসের শিক্ষণীয় বিষয়াবলি : এ হাদীস থেকে কতগুলো জিনিস জানা গেল- ১. শিঙ্গা লাগানো একটি বৈধ পেশা। ২. শিঙ্গা লাগানোর পারিশ্রমিক দেওয়া বৈধ। ৩. চিকিৎসা গ্রহণ করা এবং ডাক্তারের ফি দেওয়া বৈধ। ৪. দাসকে কর্মে নিযুক্ত করে উপার্জন করানো। ৫. তার উপার্জন থেকে নিজেও কিছু নেওয়া। ৬. ঋণদাতা বা হকদারের নিকট সুযোগ প্রদানের সুপারিশ করা- এসবই বৈধ।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٦٥٠ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَاِنَّ اَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ) وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيِّ اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَاِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ -

২৬৫০. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন- নিজ উপার্জনের আহার সর্বোত্তম আহার। অবশ্য তোমাদের সন্তানও নিজ উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। -[তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ اَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ **-এর তাৎপর্য :** সন্তানকে 'উপার্জন' বলার কারণ হলো তারা পিতামাতার দৈহিক মিলনের ফল। এই হাদীসে এ কথার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, পিতামাতা যখন কর্মক্ষম না থাকবেন, তখন সন্তানের উপার্জন ভোগ করা তাদের জন্য বৈধ। অবশ্য পিতামাতা যদি উপার্জনে সক্ষম হন, তাহলে তাদের সন্তানের উপর বোঝা না হওয়াই শ্রেয়। তবে সন্তান যদি চায় যে, পিতামাতা তার সাথেই থাকুক, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।

আল্লামা ত্বীবী (র.) বলেন– পিতামাতা যদি অক্ষম হন, তাহলে তাদের জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করার দায়দায়িত্ব বহন করা সন্তানের জন্য ওয়াজিব।

وَعَنْ ٢٦٥١ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ اِلَّا كَانَ زَادَهُ اِلَى النَّارِ ـ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلٰكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ اِنَّ الْخَبِيْثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيْثَ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَكَذَا فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

২৬৫১. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– কোনো বান্দা হারাম পন্থায় উপার্জিত অর্থ দান করলে তা কবুল হবে না। [নিজ কাজে] ব্যয় করলে তাতে বরকত হবে না। আর ঐ ধন-সম্পদ উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেলে তার জন্য জাহান্নামের পুঁজি হবে। আল্লাহ তা'আলা মন্দের দ্বারা মন্দ নির্মূল করেন না, তবে ভালো দ্বারা মন্দ নির্মূল করেন। খারাপ খারাপকে বিদূরিত করতে পারে না। –[আহমদ ও শরহুস্ সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ الخ -এর ব্যাখ্যা] : এটি একটি পৃথক বাক্য, যা পূর্বের বাক্যের কারণ স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। এর তাৎপর্য হলো হারাম মাল দ্বারা দান-সদকা করলে তা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং হারাম মাল হতে দান করাও একটি গুনাহ। ওলামায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন, হারাম মাল হতে দান করে সওয়াবের প্রত্যাশা করা কুফরি সমতুল্য। কোনো ফকির যদি জানতে পারে যে, তাকে যে মাল দেওয়া হয়েছে তা হারাম মাল হতে দেওয়া হয়েছে এবং সে যদি এর বিনিময়ে তার জন্য দোয়া করে, তাহলেও এ কাজ কুফরি সমতুল্য।

"وَلٰكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ" : হাদীসের এ অংশের তাৎপর্য হলো, মানুষের গুনাহ হ্রাস বা মাফ হয় সৎকাজের দ্বারা। উদাহরণস্বরূপ হালাল মাল থেকে দান করা একটি সৎকাজ। যদি কোনো ব্যক্তি স্বীয় হালাল সম্পদ হতে দান করে, তাহলে সে সওয়াবও পাবে, আবার তার গুনাহও ক্ষমা করা হবে। এ কথা দ্বারা কুরআনের আয়াত– اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ -এর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। –[মেরকাত খ. ৬, পৃ. ৪২]

শব্দ-বিশ্লেষণ : لَا يَمْحُوْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ نَفِىْ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلْمَحْوُ অর্থ– নিশ্চিহ্ন/ নির্মূল করে না।

لَا يَتْرُكُهُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ نَفِىْ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلتَّرْكُ অর্থ– সে রেখে যায় না।

وَعَنْ ٢٦٥٢ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ اَوْلٰى بِهِ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

২৬৫২. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে দেহের গোশত হারাম মালে গঠিত, তা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। হারাম মালে গঠিত দেহের জন্য দোজখই সমীচীন। –[আহমদ, দারেমী ও বায়হাকী– শোআবুল ঈমান]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

যেহেতু সহীহ হাদীসে রয়েছে- مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ তাই এ হাদীসের সাথে এর দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে- দ্বন্দ্বের সমানধান নিম্নরূপ-

دُخُوْلُ النَّارِ] اَلْمُرَادُ بِدُخُوْلِ النَّارِ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য] : 'হারাম মাল দ্বারা হৃষ্টপুষ্ট হওয়া দেহ জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' কথাটির কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে-

* প্রথমবারেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না; বরং অন্যায় ও গুনাহের শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে প্রবেশ করবে।

* অথবা, এমন ব্যক্তি জান্নাতের উচ্চস্তরে পৌঁছুতে পারবে না।

* অথবা, হারামকে যদি হালাল মনে করে ভক্ষণ করে থাকে, তাহলে বাস্তবিকই তার ঈমান থাকে না। এজন্য সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাবে।

* অথবা, এখানে হারাম মাল ভক্ষণের ব্যাপারে কঠোর নিন্দা এবং ভীতি প্রদর্শন উদ্দেশ্য।

শব্দ-বিশ্লেষণ : نَبَتَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلنَّبَاتُ অর্থ- সাজানো, হৃষ্টপুষ্ট হওয়া, বেড়ে উঠা।

اَلسُّحْتُ : এটি একবচন, বহুবচনে اَسْحَاتٌ অর্থ- হারাম বস্তু।

وَعَنْ ٢٦٥٣ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (رض) قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلٰى مَا لَا يُرِيْبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِيْنَةٌ وَإِنَّ الْكِذْبَ رِيْبَةٌ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى الدَّارِمِيُّ اَلْفَصْلَ الْاَوَّلَ)

২৬৫৩. অনুবাদ : হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই বাণীটি আমি ভালোভাবে স্মরণ রেখেছি যে, যে কাজে মনে খটকা লাগে, সে কাজ পরিহার করে খটকাহীন কাজ অবলম্বন কর। সত্য ও শুদ্ধের ক্ষেত্রে দ্বিধার সৃষ্টি হয় না, মিথ্যা ও অশুদ্ধের ক্ষেত্রেই দ্বিধার সৃষ্টি হয়। -[আহমদ, তিরমিযী ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلٰى مَا لَا يُرِيْبُكَ **এ কথার অর্থ কি?** রাসূল ﷺ -এর বাণীর উদ্দেশ্য হলো, তোমরা সন্দেহে নিপতিত হওয়া থেকে বিরত থাক। আর যা তোমাকে সন্দেহে নিপতিত করে, তা হতেও নিজেকে রক্ষা কর। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যদি কোনো কথা বা কাজের বেলায় ঐ কাজটির হালাল-হারাম হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তোমরা তা হতে বিরত থেকে এমন কথা বা কাজ কর, যা সন্দেহমুক্ত। কেননা মানুষের অন্তঃকরণ কখনো কাউকে কুপথে পরিচালিত করে না। সুতরাং কোনো ব্যাপারে তার সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, সেটা ভ্রান্তিপূর্ণ ও অসত্য। আবার কোনো জিনিসের হালাল-হারামের ব্যাপারে অন্তরের সংশয়মুক্ত হওয়া এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, কাজটি সঠিক ও সত্য। মোটকথা একজন মুমিন যে কাজ করবে, তা হতে হবে ত্রুটিমুক্ত, সম্পূর্ণরূপে সংশয়মুক্ত, যাতে দ্বিধাদ্বন্দ্বের লেশমাত্রও অবশিষ্ট থাকবে না। -[মেরকাত খ. ৬, পৃ. ৪৩]

শব্দ-বিশ্লেষণ : يُرِيْبُكَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلرَّيْبُ অর্থ- সন্দেহে নিপতিত করা।

رِيْبَةٌ : সন্দেহ, সংশয়।

وَعَنْ ٢٦٥٤ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا وَابِصَةُ جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَقَالَ اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلٰثًا اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ)

২৬৫৪. **অনুবাদ :** হযরত ওয়াবেসা ইবনে মা'বাদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একদা [তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলে] রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন– হে ওয়াবেসা! তুমি এসেছ ভালো ও মন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য। আমি আরজ করলাম, হ্যাঁ, তাই। রাবী বলেন, তখন হযরত ﷺ স্বীয় হস্তকে মুষ্টিবদ্ধ করে [আঘাতস্বরূপ] তাঁর বক্ষে মারলেন এবং বললেন, তোমার মনকে জিজ্ঞেস কর, তোমার অন্তরকে জিজ্ঞেস কর। এ কথা তিনবার বলার পর বললেন, ভালো ও নেক কাজে মন স্থির থাকবে, অন্তর শান্ত ও দ্বিধামুক্ত থাকবে। মন্দ ও গুনাহের কাজে খট্‌কা লাগবে, অন্তরে দ্বিধা-সংশয় সৃষ্টি হবে; যদিও জনগণ সেটির পক্ষে মত প্রকাশ করে। –[আহমদ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হুযূর ﷺ وَابِصَةَ-এর আগমনের উদ্দেশ্য কিভাবে জানতে পারলেন? বস্তুত এটি ছিল হুজুর ﷺ -এর মু'জিযা, যা আল্লাহ পাক তাঁর অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন। নতুবা হুজুর ﷺ গায়েবের খবর জানেন না। গায়েবের মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। যেমন আল্লাহ বলেছেন– وَعِنْدَهُ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ তবে আল্লাহ যদি বিশেষ ক্ষেত্রে নবীকে জানিয়ে দেন, একমাত্র সেগুলো জানেন। –[মেরকাত খ. ৬, পৃ. ৪৪]

وَجْهُ الضَّرْبِ عَلَى الصَّدْرِ [বক্ষে আঘাত করার কারণ] : صَدْرَهُ -এর ضَمِيْر ـه -এর مَرْجِعْ কেউ বলেছেন– وَابِصَه -এর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ হুজুরের বরকতময় হাতের নির্মল ছোঁয়ায় যেন তার বক্ষ হুজুরের কথা অনুধাবন করার যোগ্যতা অর্জন করে। আবার কেউ বলেছেন ـه যমীরের مَرْجِعْ হুজুর ﷺ -এর দিকেই ফিরেছে। তখন অর্থ হবে অন্তরের স্থান নির্ণয় করা এবং এ কথা বুঝানো যে, এই অন্তরের কাছে জিজ্ঞেস কর।

قَوْلُهُ اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ-এর মর্মার্থ : এ বাক্যে নবী করীম ﷺ ভালো ও মন্দের পরিচয় জানার একটি স্পষ্ট নিদর্শন বর্ণনা করেছেন, যাকে প্রতিটি সৎলোক স্বীয় কাজকর্মের ভালোমন্দ পরখ করার কষ্টি পাথর হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। যে কাজ ও কথায় অন্তর প্রশান্তিবোধ করে, বুঝতে হবে যে, এ কাজটি সঠিক। আর যে কাজ ও কথায় অন্তরে সংশয় সৃষ্টি হয়, বুঝতে হবে যে, সে কাজটি সঠিক নয়। হাদীসের মর্মার্থ হলো প্রতিটি কথা ও কাজের জন্য তোমার অন্তরের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস কর যে, এটা ভালো কি মন্দ? যে ব্যাপারে অন্তরের প্রশান্তি অনুভব করবে; কোনো প্রকার সংশয় থাকবে না, সেটিকে ভালো বলেই মনে করবে। আর যে ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হবে, তাকে মন্দ বলেই মনে করবে, যদিও লোকেরা সেটিকে ভালোই বলুক না কেন। উদাহরণস্বরূপ কারো সম্পর্কে তোমার জানা আছে যে, তার নিকট হালাল মালও আছে আবার হারাম মালও আছে এবং ঐ ব্যক্তি স্বীয় মাল থেকে তোমাকে দিতে চায়। সেক্ষেত্রে তুমি যদি পূর্ণ আস্থাশীল হতে পার যে, সে যে মাল তোমাকে দিচ্ছে, তা তার হালাল উপার্জন থেকেই দিচ্ছে, তাহলে তুমি তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পার। আর যদি হারাম উপার্জন থেকে দেওয়ার সংশয় সৃষ্টি হয়, তাহলে তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে; যদিও কোনো মুফতি সাহেব ফতোয়া দেন যে, এটা গ্রহণ তোমার জন্য বৈধ। কেননা ফতোয়া এক জিনিস আর تَقْوٰى ভিন্ন জিনিস। তাকওয়ার উপর আমল করা ফতোয়ার উপর আমল করার চেয়ে উত্তম। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, অন্তরের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করার যে কথা বলা হয়েছে, তা ঐ সমস্ত সৎব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যাদের অন্তর কুপ্রবৃত্তির পঙ্কিলতামুক্ত ও সম্পূর্ণরূপে আল্লাহভীতির অলংকার দ্বারা সজ্জিত। কেননা তাদের অন্তর তো একমাত্র সৎকাজের দিকেই আকৃষ্ট হয় এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকে। কিন্তু অসৎ

লোকেরা তো কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় পরিচালিত হয়, ভালোমন্দের বাছবিচার তাদের থাকে না। এমতাবস্থায় তাদের অন্তরের ফতোয়া অনুযায়ী সঠিক পথ নির্দেশনা পাওয়া কোনোভাবেই সম্ভবপর নয়।

এখানে আরো একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, অন্তরের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করতে হবে ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে, যেখানে শরিয়তের কোনো সুস্পষ্ট বিধান না থাকে। শরিয়তের সুস্পষ্ট বিধান সংবলিত বিষয়ের জন্য একথা প্রযোজ্য নয়। সুতরাং কোনো বিষয় সংক্রান্ত দুই আয়াতের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হলে হাদীস দ্বারা এর সমাধান করতে হবে, আর দুই হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে ওলামা ও মুজতাহিদগণের কথা অনুযায়ী আমল করতে হবে। আর আলেমগণের মতের মধ্যেও দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তখন নিজের অন্তরের আশ্রয় গ্রহণ করবে এবং উপরিউক্ত মতামতগুলোর যেটি সঠিক বিবেচিত হয়, সেটির উপর আমল করবে। -[মেরকাত, মাজাহেরে হক, তানজীম, পৃ. ৪৪, ১১৮, ৪৪২]

শব্দ-বিশ্লেষণ :

إِسْتَفْتِ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ أَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাবে اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِفْتَاءُ অর্থ- ফতোয়া তলব করা, মাসআলা জিজ্ঞেস করা, اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ - তুমি তোমার অন্তরের কাছে জিজ্ঞেস কর।

اِطْمَأَنَّتْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাবে اِفْعِيْلَالٌ মাসদার اِطْمِئْنَانٌ অর্থ- প্রশান্তি লাভ করা, স্বস্তি লাভ করা। اِطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ সেটা দ্বারা অন্তর স্থির থাকে।

وَعَنْ ٢٦٥٥ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ بَأْسٌ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৬৫৫. অনুবাদ : হযরত আতিয়্যা সা'দী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- কোনো বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মোত্তাকী-পরহেজগারের শ্রেণিভুক্ত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে গুনাহের কাজ হতে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে [এরূপ] গুনাহহীন কাজকেও এড়িয়ে না চলে [যাতে গুনাহর সূত্রপাত হওয়ার আশঙ্কা আছে]। -[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَرَاتِبُ التَّقْوٰى [তাক্বওয়ার স্তর] : ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, তাক্বওয়ার তিনটি স্তর রয়েছে-

اَلْاَوَّلُ : اَلتَّقْوٰى عَنِ الْعَذَابِ الْمُخَلَّدِ بِالتَّبَرِّىْ مِنَ الشِّرْكِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى ـ

প্রথমত শিরক থেকে মুক্ত থেকে চিরস্থায়ী শাস্তি থেকে নিস্তার লাভ করা। وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى কুরআনের এ আয়াত দ্বারা এ প্রকারই উদ্দেশ্য।

اَلثَّانِىْ : اَلتَّجَنُّبُ عَنْ كُلِّ مَا يُؤْثَمُ مِنْ فِعْلٍ اَوْ تَرْكٍ حَتَّى الصَّغَائِرِ عِنْدَ قَوْمٍ وَهُوَ الْمُتَعَارِفُ بِالتَّقْوٰى فِى الشَّرْعِ وَالْمَعْنٰى بِقَوْلِهٖ وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا ـ

দ্বিতীয়ত সকল প্রকারের সগীরা গুনাহ থেকেও বেঁচে থাকা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, শরিয়তের পরিভাষায় যে مُتَّقِىْ বুঝায়, তা দ্বারা এ প্রকারই উদ্দেশ্য। এ প্রকারের সমর্থনে রয়েছে কুরআনের এ আয়াতে- وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى الخ

وَالثَّالِثَةُ : اَنْ يَّتَنَزَّهَ عَمَّا يَشْغُلُ سِرَّهٗ عَنِ الْحَقِّ وَيَتَبَتَّلُ بِشَرَاشِرِهٖ اِلَى اللّٰهِ وَهِىَ التَّقْوٰى الْحَقِيْقَةُ الْمَطْلُوْبَةُ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ ـ

তৃতীয়ত সকল বিষয়েই পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা এমনকি অনেক মুবাহ জিনিস থেকে বেঁচে থাকা, গাইরুল্লাহর প্রতি মন না লাগানো এবং গাইরুল্লাহ থেকে সকল চিন্তা-চেতনা ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহর প্রতিই নিবিষ্ট থাকা। কুরআনের আয়াত- اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ দ্বারা তাকওয়ার এ স্তরই উদ্দেশ্য। -[মেরকাত খ. ৬, পৃ. ৪৫]

خُلَاصَةُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের সারমর্ম] : কোনো মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুত্তাকী হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে হারাম, মাকরূহ বা সন্দেহযুক্ত বিষয়ে পতিত হওয়ার ভয়ে মুবাহ জিনিসকেও বর্জন করতে না পারবে। যেমন সে যদি অবিবাহিত হয়, তাহলে প্রবৃত্তির প্রাবল্য ও ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে উদরপূর্তি করে ভক্ষণ না করা। পারফিউম ব্যবহার না করা। কেননা এ সমস্ত জিনিস দ্বারা কমোদ্দীপনা ও উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। মোটকথা হারাম, মাকরূহ ও সন্দেহপূর্ণ জিনিস বর্জনের পাশাপাশি কতক মুবাহ জিনিস থেকেও বিরত থাকা হচ্ছে পরহেজগারি ও তাকওয়ার চূড়ান্ত স্তর।

শব্দ-বিশ্লেষণ : مُتَّقِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر اِسْم فَاعِل বহছ ضَرَبَ বাবে اَلْوِقَايَةُ মাসদার মূলবর্ণ (و - ق - ى) অর্থ– আল্লাহভীরু, মুত্তাকী, পরহেজগার। শরিয়তের পরিভাষায় مُتَّقِىْ বলা হয় ঐ সমস্ত মহৎপ্রাণ ব্যক্তিকে, যারা নিজেকে এমন জিনিস থেকে দূরে রাখে, যা অবলম্বন করা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ।

وَعَنْ ٢٦٥٦ أَنَسٍ (رض) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَاٰكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِىْ لَهَا وَالْمُشْتَرٰى لَهٗ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৬৫৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদ-সংশ্লিষ্ট দশজনের প্রতি লানত করেছেন– ১. যে মদ তৈরি করে, ২. যে মদ তৈরির নির্দেশ দেয়, ৩. যে মদ পান করে, ৪. যে মদ বহন করে, ৫. যার জন্য মদ বহন করা হয়, ৬. যে মদ পান করায়, ৭. যে মদ বিক্রি করে, ৮. যে এর মূল্য ভোগ করে, ৯. যে মদ ক্রয় করে, ১০. যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنٰى عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَائِعَهَا [عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَائِعَهَا -এর অর্থ] : মদ নিংড়ানোকারী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– ঐ ব্যক্তি যে মদ তৈরির জন্য আঙ্গুর থেকে রস সংগ্রহ করে, চাই নিজে পান করার জন্য হোক বা অন্যের জন্য হোক। তদ্রূপভাবে মদ অন্যকে দিয়ে যে তৈরি করায়, নিজের জন্য হোক বা অন্যের জন্য হোক। তেমনিভাবে যদি কোনো সরকার মদ সরবরাহের লাইসেন্স দেয়, সকলেই নবী করীম ﷺ -এর অভিসম্পাতের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

বিক্রেতার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে নিজে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বিক্রি করে, বা অন্যের কর্মচারী হিসেবে বিক্রি করে, অথবা মদ প্রস্তুতকারক কোম্পানির নিকট মদ তৈরির সরঞ্জাম বিক্রি করত তা হতে উপার্জিত অর্থভোগ করে, সেও উক্ত অভিশাপপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

টীকা :

عَاصِرٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ اِسْم فَاعِلْ বহছ ضَرَبَ বাবে عَصْرٌ মাসদার অর্থ– নিংড়ানোকারী।

مُعْتَصِرٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ اِسْم فَاعِلْ বহছ اِفْتِعَالْ বাবে اَلْاِعْتِصَارُ মাসদার অর্থ– অন্যকে নিংড়াতে বলা। অন্যলোক দ্বারা নিংড়ানোকারী।

شَارِبٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ اِسْم فَاعِلْ বহছ سَمِعَ বাবে اَلشُّرْبُ মাসদার অর্থ– পানকারী।

سَاقِىْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ اِسْم فَاعِلْ বহছ ضَرَبَ বাবে اَلسَّقْىُ মাসদার অর্থ– মদ বা পানীয় পরিবেশনকারী।

وَعَنْ ٢٦٥٧ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৬৫৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলার লানত মদের উপর, মদ পানকারীর উপর, যে মদ পান করায় তার উপর, মদ বিক্রেতার উপর, মদ ক্রেতার উপর, মদ প্রস্তুতকারীর উপর, মদের ফরমায়েশদাতার উপর, মদ বহনকারীর উপর এবং যার জন্য মদ বহন করা হয় তার উপর। –[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"لَعَنَ اللّٰهُ الْخَمْرَ" **বাক্যের অর্থ :** "মদের উপর আল্লাহর অভিশাপ" কথাটির অর্থ হলো মদ যেহেতু সকল পাপকর্মের মূল, এজন্য এর প্রতি মানুষের ঘৃণা সৃষ্টি ও অনিহা বৃদ্ধির জন্যই একথা বলা হয়েছে।

অথবা এর অর্থ হলো মদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভোগকারী। -[মেরকাত খ. ৬, পৃ. ৪৬]

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَلْخَمْرُ : এটি একবচন, বহুবচনে خُمُوْرٌ -

اَلْخَمْرُ-**এর আভিধানিক অর্থ :** خَمْرٌ -এর শাব্দিক অর্থ হলো- اَلسِّتْرُ লুকানো, গোপন করা। خَمْر পান করার দ্বারা যেহেতু মানুষের জ্ঞান লোপ পায়, এজন্য এর নাম রাখা হয়েছে خَمْر বা মদ।

وَعَنْ ٢٦٥٨ مُحَيِّصَةَ (رضـ) اَنَّهُ اِسْتَأْذَنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اُجْرَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ فَلَمْ يَزَلْ يَسْتَأْذِنُهُ حَتّٰى قَالَ اِعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَاَطْعِمْهُ رَقِيْقَكَ - (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ) .

২৬৫৮. **অনুবাদ :** হযরত মোহাইয়াস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট রক্তমোক্ষণ কার্যের পারিশ্রমিক ভোগ করার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নিষেধ করলেন; তিনি বারবার অনুমতি চাইতে লাগলেন। অবশেষে রাসূল ﷺ বললেন, ঐ আয় তোমার পানি বহনের উট এবং তোমার গোলামের খাদ্যের জন্য ব্যয় কর। -[মুয়াত্তা মালেক, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : শিঙ্গা লাগানোর বিনিময় গ্রহণ জায়েজ হওয়া সত্ত্বেও হুজুর ﷺ এ সাহাবীকে বলেছেন যে, তুমি শিঙ্গা লাগানোর বিনিময় নিজে ভক্ষণ করবে না; বরং তোমার পশুপালের খাবার ও ক্রীতদাসদের খাবার সরবরাহ বাবদ ব্যয় করবে। বুঝা গেল এর বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ, কিন্তু মাকরূহে তানযিহী। কেননা, জায়েজ না হলে তার পশু বা ক্রীতদাসের জন্য ব্যবহার করাও জায়েজ হতো না।

টীকা : اِعْلِفْ : সীগাহ اَمر حَاضِر مَعْرُوْف বহছ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلْعَلَفُ অর্থ- পশুর খাবার, ঘাস।

نَاضِحٌ : এটি একবচন, বহুবচনে نَوَاضِحُ অর্থ- পানি বহনকারী উষ্ট্রী।

رَقِيْقٌ : এটি একবচন, বহুবচনে اَرِقَّاءُ অর্থ- ক্রীতদাস, দাস।

وَعَنْ ٢٦٥٩ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الزَّمَّارَةِ. (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

২৬৫৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন- কুকুর বিক্রয়ের মূল্য হতে এবং গানের কামাই হতে। -[শরহুস সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

টীকা : اَلزَّمَّارَةُ : এটি একবচন, বহুবচনে زَمَامِيْر অর্থ- বাঁশি, গান, গায়িকা। আবার কেউ বলেছেন, এ শব্দটি زَمْر থেকে নির্গত হয়েছে; যার অর্থ হলো চক্ষু দ্বারা ইশারা করা। অসতী নারীরা যেহেতু পুরুষদেরকে চোখের ইশারায় আসক্ত করে, এজন্য এখানে অসতী নারীর জন্য زَمَّارَةٌ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।

وَعَنْ ٢٦٦٠ - اَبِيْ اُمَامَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَبِيْعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوْهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوْهُنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ وَفِيْ مِثْلِ هٰذَا اُنْزِلَتْ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَعَلِيُّ بْنُ يَزِيْدَ الرَّاوِيْ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ جَابِرٍ نَهٰى عَنْ اَكْلِ الْهِرِّ فِيْ بَابِ مَا يَحِلُّ اَكْلُهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

২৬৬০. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা গায়িকা ক্রয়বিক্রয় করো না; এর মূল্য হারাম। তাদেরকে গান শিক্ষাও দিয়ো না। এ শ্রেণির কার্য যারা করে, তাদের সম্পর্কেই পবিত্র কুরআনের এ আয়াত নাজিল হয়েছে– وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ "এক শ্রেণির লোক আছে, যারা রং-তামাশার গাঁথা [তথা গান] ক্রয় করে [তাদের জন্য লাঞ্ছনাময় আজাব রয়েছে]।" –[আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ" **বাক্যের অর্থ** : 'এদের মূল্য হারাম' এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কোনো আলেম বলেছেন, গায়িকা বাঁদিদের বিক্রি করা জায়েজ নয়। তবে জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে তাদের বিক্রি করা জায়েজ। এ হাদীসটি দুর্বল হওয়ার কারণে দলিল হওয়ার যোগ্যতা না রাখলেও এর ব্যাখ্যা এই যে, তাদের গানের বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ হারাম।

شَانُ نُزُوْلِ الْاٰيَةِ **[আয়াতের প্রেক্ষাপট]** : নজর ইবনে হারেছ নামক এক ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে গায়িকাদের ক্রয় করত যে, তাদের দ্বারা মানুষকে বিপথগামী করবে। তার সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

আবার কেউ বলেছেন, উক্ত ব্যক্তি অনারবদের লিখিত কিছু গল্পের বই ক্রয় করেছিল। যার কাল্পনিক ও মিথ্যা কিসসা-কাহিনী সে মানুষকে শুনাত এবং বলত, মুহাম্মদ ﷺ তো তোমাদেরকে আদ, ছামূদ জাতীয় ঘটনা শোনায়। আমি তোমাদেরকে রুস্তম, ইস্কান্দর এবং রাজা-বাদশাদের গল্প শুনাব। তার নিন্দা স্বরূপ এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَلْقَيْنَاتُ : এটি বহুবচন, একবচনে قَيْنَةٌ অর্থ– গায়িকা, বাঁদি।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٦٦١ - عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

২৬৬১. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– অন্যান্য ফরজের সঙ্গে হালাল কামাইয়ের ব্যবস্থাগ্রহণও একটি ফরজ। –[বায়হাকী-শোআবুল ঈমান]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : পার্থিব জগতের চাহিদা মেটানোর জন্য, পরিবারস্থদের জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করা এবং এর জন্য অর্থ উপার্জন করাও একটি ফরজ কাজ। তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নির্ধারিত ফরজ। যেমন– নামাজ, রোজা ইত্যাদির স্তর সর্বাগ্রে। আল্লাহর সেই মহান হুকুমগুলো পালন করার পর অর্থোপার্জন করা ফরজ।

এ সংক্রান্ত ফেকহী মাসআলা হলো এই যে, উপার্জন করা ঐ ব্যক্তির জন্য ফরজ যে তার নিজের জন্য এবং পরিবারস্থদের ভরণপোষণের জন্য উপার্জনের মুখাপেক্ষী হয়, কিন্তু যাদের জীবিকা নির্বাহ করা অন্যের উপর ওয়াজিব যেমন– স্ত্রীর জন্য স্বামী, তাদের উপর উপার্জন করা ফরজ নয়।

"كَسْبُ الْحَلَالِ" দ্বারা উদ্দেশ্য : হালাল উপার্জন দ্বারা এমন উপার্জন উদ্দেশ্য, যা হারাম না হওয়াটা অবধারিত। সুতরাং এক্ষেত্রে সন্দেহযুক্ত জিনিসও হালালের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, সন্দেহযুক্ত জিনিস বর্জন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল শুধুমাত্র সতর্কতা অবলম্বনের জন্য।

وَعَنْ ٢٦٦٢ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أُجْرَةِ كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُمْ مُصَوِّرُوْنَ وَأَنَّهُمْ إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ مِنْ عَمَلِ أَيْدِيْهِمْ . (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

২৬৬২. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তাঁর নিকট কুরআন শরীফ লিখার মজুরি বা পারিশ্রমিক নেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এতে কোনো দোষ নেই; তারা তো [কুরআনের] অক্ষরসমূহের নকশা অঙ্কন করে নিজ হাতের কামাই খেয়ে থাকে। [অর্থাৎ আল্লাহর কালামের বিনিময় গ্রহণ যে নিষিদ্ধ, উল্লিখিত মজুরি ও পারিশ্রমিক এর আওতাভুক্ত নয়।] –[রাযীন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কুরআন তিলাওয়াত করে এর পারিশ্রমিক নেওয়া অবৈধ, হারাম। এ কারণে প্রশ্নকারীর মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো যে, কুরআন লিখে এর পারিশ্রমিক বৈধ হবে কিনা? তাই তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট প্রশ্ন করলেন। সুতরাং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর উত্তর দিলেন এভাবে যে, কাতেবের কাজ হলো কাগজের উপর শব্দের চিত্রাঙ্কন করা এবং এটা তার পেশা, তাই সে তার পেশার ক্ষেত্রে চাই কুরআন লিখুক বা অন্যকোন কিছু লিখুক, এটা তার জন্য হালাল হবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ : مُصْحَفٌ : এটি একবচন, বহুবচনে مَصَاحِفُ অর্থ– পবিত্র গ্রন্থ, কুরআন।

مُصَوِّرُوْنَ : এটি বহুবচন, একবচনে مُصَوِّرٌ অর্থ– অঙ্কনকারী, চিত্রাঙ্কনকারী।

وَعَنْ ٢٦٦٣ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رض) قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهٖ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

২৬৬৩. অনুবাদ : হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রা.) বলেন, একদা জিজ্ঞাসা করা হলো ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন প্রকার উপার্জন উত্তম? রাসূল ﷺ বললেন– হাতের কাজ এবং হালাল ব্যবসার উপার্জন। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ [সর্বোত্তম উপার্জন কোনটি?] : এর উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, যে পেশায় নিজের হাতের পরিশ্রম করতে হয়, যেমন লেখালেখি, চাষাবাদ ইত্যাদি। আর যারা হস্তপোযুগী পেশা অবলম্বন করতে সক্ষম না হয়, তারা এমন ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা হালাল উপার্জন করবে, যার মধ্যে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা বিদ্যমান থাকে, এমন ব্যবসাও হালাল উপার্জনের মাধ্যম।

وَعَنْ ٢٦٦٤ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ (رضـ) قَالَ كَانَتْ لِمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ جَارِيَةٌ تَبِيْعُ اللَّبَنَ وَيَقْبِضُ الْمِقْدَامُ ثَمَنَهُ فَقِيْلَ لَهُ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَتَبِيْعُ اللَّبَنَ وَتَقْبِضُ الثَّمَنَ فَقَالَ نَعَمْ وَمَا بَأْسَ بِذٰلِكَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيْهِ اِلَّا الدِّيْنَارُ وَالدِّرْهَمُ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

২৬৬৪. অনুবাদ : হযরত আবূ বকর ইবনে আবী মারইয়াম (রা.) হতে বর্ণিত আছে, হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব (রা.)-এর একটি দাসী ছিল– সে দুধ বিক্রি করত এবং মিকদাম (রা.) এর মূল্য গ্রহণ করতেন। তাঁকে কেউ বলল, সুবহানাল্লাহ! আপনি দুধ বিক্রি করে পয়সা নিয়ে থাকেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ– এতে কোনো দোষ নেই। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি– লোকদের সম্মুখে এমন যুগ আসবে, যখন [হারাম হতে বাঁচার জন্য] টাকা-পয়সা ব্যতিরেকে কোনো উপায় থাকবে না। [সুতরাং হালাল পথে টাকা-পয়সা সঞ্চয়ের গুরুত্ব আছে।] –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ ثَمَنِ اللَّبَنِ [দুধের মূল্যের হুকুম] : লোকেরা হযরত মিকদাম ইবনে মাদীকারিবকে ভর্ৎসনার উদ্দেশ্যে বলল, আপনার বাঁদি দুধ বিক্রি করে আর আপনি এর মূল্য গ্রহণ করেন, এটা কেমন কথা? দুধ তো ফকির-মিসকিন, দরিদ্র ও আত্মীয়স্বজনদের মাঝে বণ্টন করাই উত্তম। দুধ বিক্রয়ের মূল্য গ্রহণ আপনার ন্যায় মহান ব্যক্তিত্বের জন্য শোভনীয় নয়। এর উত্তরে তিনি বললেন, এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, এটা তেমন কোনো ব্যাপার নয়, যার দ্বারা শরিয়তের কোনো বিধান লঙ্ঘন হচ্ছে। এটা না হারাম, আর না মাকরূহ। তাছাড়া এটাতো আমি লালসার বশবর্তী হয়ে করছি না; বরং জীবনযাপনের প্রয়োজনের তাকিদেই এরূপ করছি। বর্ণিত আছে, সাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে আলোচনা করতেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরিশ্রম দ্বারা এমন পরিমাণ অর্থ অবশ্যই উপার্জন করবে, যার দ্বারা সম্মানের সাথে জীবনযাপন করা সম্ভব হয়। স্মরণ রেখ, এমন একটি যুগ আসবে, যখন মুখাপেক্ষী ও রিক্তহস্ত ব্যক্তিরাই সর্বপ্রথম তাদের দীন ও ঈমান ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে।

وَعَنْ ٢٦٦٥ نَافِعٍ (رضـ) قَالَ كُنْتُ اُجَهِّزُ اِلَى الشَّامِ وَاِلَى مِصْرَ فَجَهَّزْتُ اِلَى الْعِرَاقِ فَاَتَيْتُ اِلَى اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ كُنْتُ اُجَهِّزُ اِلَى الشَّامِ فَجَهَّزْتُ اِلَى الْعِرَاقِ فَقَالَتْ لَا تَفْعَلْ مَا لَكَ وَلِمَتْجَرِكَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَبَّبَ اللّٰهُ لِاَحَدِكُمْ رِزْقًا مِنْ وَجْهٍ فَلَا يَدَعْهُ حَتّٰى يَتَغَيَّرَ لَهُ اَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৬৬৫. অনুবাদ : হযরত নাফে' (রা.) বলেন, আমি সিরিয়া এবং মিসরে ব্যবসার মাল চালান দিতাম। একবার আমি ইরাকে মাল চালান দিলাম। অতঃপর উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট এসে বললাম, আমি তো সিরিয়ায় মাল চালান দিতাম, এবার ইরাকে মাল চালান দিয়েছি। তিনি বললেন, এরূপ করবে না; তোমার পুরাতন ব্যবসাস্থলে কি হয়েছে? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি– তোমাদের কারো রিজিক আল্লাহ তা'আলা এক সূত্রে দিতে থাকলে যতক্ষণ পর্যন্ত তা অচল বা অসুবিধাজনক না হয়ে যায়, সেটাকে ত্যাগ করতে নেই। –[আহমদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নবী করীম ﷺ -এর ইরশাদের উদ্দেশ্য হলো যদি কারো জীবিকা উপার্জনের বৈধ ব্যবস্থা থাকে। যেমন– বিদেশে মাল রপ্তানি করে জীবিকা উপার্জন হয়, তাহলে সেই মাধ্যমকে বিনা কারণে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। তবে যদি কোনো বিশেষ সমস্যা সৃষ্টি হয়, যার দ্বারা সেটা ছেড়ে দেওয়াই অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। যেমন– ব্যবসায় ক্ষতি হতে লাগল, লাভ বন্ধ হয়ে যায় অথবা মূলধনই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, সেক্ষেত্রে তা ছেড়ে দিলে কোনো অসুবিধা নেই। আল্লামা ত্বীবী (র.) বলেন, এ হাদীসে এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, যারা বৈধভাবে কোনো জিনিস অর্জন করে, সেটাকে নিয়ামত মনে করে এর উপর তাদের অটল থাকা উচিত; বিনা কারণে সেটা বর্জন করে অন্যদিকে ধাবিত না হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শব্দ-বিশ্লেষণ : أُجَهِّزُ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ إِثْبَاتْ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّجْهِيْزُ অর্থ– তৈরি করা, সরবরাহ করা।

مَتْجَرٌ : এটি একবচন, বহুবচনে مَتَاجِرُ অর্থ– ব্যবসাকেন্দ্র।

سَبَّبَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ إِثْبَاتْ فِعْل مَاضِيْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাবে تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْبِيْبُ অর্থ– উপকরণ হওয়া।

يَتَنَكَّرُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ إِثْبَاتْ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّنَكُّرُ অর্থ- ভালো অবস্থার পরিবর্তন হয়ে খারাপ হওয়া, অবস্থার পরিবর্তন, অসুবিধাজনক হওয়া।

وَعَنْ ٢٦٦٦ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ لِأَبِيْ بَكْرٍ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ تَدْرِيْ مَا هٰذَا فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَمَا هُوَ قَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكَهَانَةَ إِلَّا أَنِّيْ خَدَعْتُهُ فَلَقِيَنِيْ فَأَعْطَانِيْ بِذٰلِكَ فَهٰذَا الَّذِيْ أَكَلْتَ مِنْهُ قَالَتْ فَأَدْخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِيْ بَطْنِهِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৬৬৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবূ বকর (রা.)-এর একটি গোলাম ছিল; সে তাঁর জন্য রোজগার করত এবং তিনি তার উপার্জন খেতেন। একদা সে কোনো বস্তু নিয়ে এলে হযরত আবূ বকর (রা.) তা খেলেন। গোলাম তাঁকে বলল, আপনি কি জানেন– এটা কিভাবে উপার্জিত? হযরত আবূ বকর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিভাবে উপার্জিত? সে বলল, ইসলাম-পূর্ব সময়ে আমি এক ব্যক্তির জন্য [গণক-ঠাকুরের ন্যায়] গণনা করেছিলাম, অথচ আমি গণনার কাজও জানতাম না। আমি গণনার ভান করে ঐ ব্যক্তিকে ঠকিয়ে দিয়েছিলাম মাত্র। ঐ ব্যক্তির সঙ্গে অদ্য আমার সাক্ষাৎ হলে সে আমাকে সেই গণনাকার্যের বিনিময়ে এই বস্তু দান করেছে। আর আপনি তাই খেয়েছেন।

এ কথা শুনামাত্র হযরত আবূ বকর (রা.) গলার ভিতরে আঙ্গুল ঢুকিয়ে পেটের সমুদয় বস্তু বমন করে ফেলে দিলেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এটা ছিল হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ধর্মীয় সতর্কতা এবং পরিপূর্ণ তাকওয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি যখনই জানতে পারলেন তাঁর উদরে এমন জিনিস প্রবেশ করেছে, যা হারাম পন্থায় অর্জন হয়েছে, তৎক্ষণাৎ তিনি তা বমি করে ফেলে দিলেন। তিনি বমি করে শুধু ঐ জিনিসই ফেলে দেওয়ার উপর সন্তুষ্ট হননি; বরং ঐ জিনিসের সাথে পেটে আরো যা ছিল, তাও বের করে ফেলা জরুরি মনে করলেন। কেননা, সেগুলোও তো হারাম জিনিসের সাথে মিশ্রিত হয়েছে। হযরত আবূ বকরের এ আচরণ থেকে ইমাম শাফেয়ী (র.) একটি মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো হারাম জিনিস ভক্ষণ করে, চাই জেনে করুক বা অজ্ঞতাবশত, অতঃপর সে জানতে পারে যে, তা হারাম ছিল, সেটা পেট থেকে বের করে ফেলা আবশ্যক।

শব্দ-বিশ্লেষণ : تَكَهَّنْتُ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাবে تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّكَهُّنْ অর্থ– ভবিষ্যদ্বাণী করা, ভাগ্য গণনা করা।

اَلْكَهَانَةُ : মাসদার, বাবে فَتَحَ - نَصَرَ অর্থ– গণকের পেশা, ভাগ্য গণনা করা।

قَاءَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلْقَيْئُ অর্থ– বমি করা।

২৬৬৭. وَعَنْ أَبِىْ بَكْرٍ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِىَ بِالْحَرَامِ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

২৬৬৭. **অনুবাদ** : হযরত আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– **যেই দেহ** হারাম দ্বারা প্রতিপালিত, তা বেহেশতে প্রবেশ করবে না। –[বায়হাকী : শোআবুল ঈমান]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ **[দুই হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্ব]** : "مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ" যে ব্যক্তি ঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে– এ জাতীয় সহীহ হাদীসের সাথে এ হাদীসের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এর উত্তরে আমরা বলব–

دَفْعُ التَّعَارُضِ **[দ্বন্দ্বের অবসান]** : এখানে জান্নাতে প্রবেশ দ্বারা دُخُوْلُ اُوْلٰى বা প্রথমবারেই প্রবেশ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হারাম খাদ্য দ্বারা লালিত-পালিত ব্যক্তি প্রথমবারেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। অথবা এখানে হারাম খাদ্য ভক্ষণের কুপরিণতি এবং এর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি ও কঠোরতা বুঝানো হয়েছে। অথবা, হারাম মালকে যদি হালাল মনে করে ভক্ষণ করে থাকে, তাহলে তার ঈমানই থাকবে না। সুতরাং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ : غُذِىَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مُطْلَقْ مَجْهُوْل বাবে نَصَرَ মাসদার اَلْغَذْوُ অর্থ– প্রতিপালিত হওয়া।

২৬৬৮. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ مَنِ اشْتَرٰى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيْهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهٗ صَلٰوةً مَادَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَدْخَلَ اِصْبَعَيْهِ فِىْ اُذُنَيْهِ وَقَالَ صُمَّتَا اِنْ لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ ﷺ سَمِعْتُهٗ يَقُوْلُهٗ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَقَالَ اِسْنَادُهٗ ضَعِيْفٌ)

২৬৬৮. **অনুবাদ** : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি দশ মুদ্রায় একটি কাপড় ক্রয় করেছে, যার মধ্যে একটি মুদ্রা হারাম ছিল। যতক্ষণ ঐ কাপড়টি তার পরনে থাকবে, ততক্ষণ **পর্যন্ত** আল্লাহ তা'আলা তার নামাজ কবুল করবেন না।

হযরত ইবনে ওমর (রা.) এ বিবরণদানের পর তাঁর উভয় কর্ণে আঙ্গুল দিয়ে বললেন, আমার কর্ণদ্বয় বধির হয়ে যাবে, যদি এ বর্ণনা আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনে না থাকি। –[আহমদ, বায়হাকী : শোআবুল ঈমান]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهٗ صَلٰوةً" **বাক্যের ব্যাখ্যা** : "আল্লাহ তা'আলা তার নামাজ কবুল করবেন না" এর অর্থ হলো সে নামাজের পরিপূর্ণ ছওয়াব পাবে না। তবে তার নামাজ হয়ে যাবে এবং নামাজের فَرْضِيَّةْ আদায় হয়ে যাবে। যেমন– কেউ যদি অন্যায়ভাবে দখলকৃত জমিতে নামাজ আদায় করে। এতে তার নামাজ সহীহ বলে গণ্য হবে। কেননা নামাজ সঠিক হওয়া না হওয়ার সম্পর্ক হলো এর رُكْن ও شَرْط -এর সাথে। আর তাকওয়াটা নামাজের رُكْن বা শর্ত কোনটিই নয়। আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'ত এ মত পোষণ করেন।

بَابُ الْمُسَاهَلَةِ فِى الْمُعَامَلَةِ
পরিচ্ছেদ : ক্রয়বিক্রয় ও লেনদেনের ব্যাপারে সহনশীলতা

পারস্পরিক লেনদেন ও ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোমলতা ও সহনশীলতা রক্ষা করা সামাজিক সম্পর্ক জোরদার ও পারস্পরিক সহমর্মিতা প্রদর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে অতীব জরুরি। এ পরিচ্ছেদে সে সম্পর্কিত হাদীসসমূহ চয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٦٦٩ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا اشْتَرٰى وَاِذَا اقْتَضٰى - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৬৬৯. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [দোয়ারূপে] বলেছেন– আল্লাহ রহম করুন ঐ ব্যক্তির প্রতি, যে সহনশীল হয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, ক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং প্রাপ্য আদায়ের জন্য তাগাদা করার ক্ষেত্রে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** যারা ক্রয়বিক্রয় ও প্রাপ্য ওয়াশিলের ক্ষেত্রে সহনশীল ও সহানুভূতিশীল হয়, তাদের জন্য রাসূল ﷺ বলেছেন– رَحِمَ اللّٰهُ আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন! সেক্ষেত্রে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রাসূলের দোয়া পাওয়ার জন্য আমাদেরকে এ ব্যাপারে সচেষ্ট ও সচেতন হওয়া আবশ্যক।

وَعَنْ ٢٦٧٠ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوْحَهٗ فَقِيْلَ لَهٗ هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ قَالَ مَا اَعْلَمُ قِيْلَ لَهٗ اُنْظُرْ قَالَ مَا اَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ اَنِّىْ كُنْتُ اُبَايِعُ النَّاسَ فِى الدُّنْيَا وَاُجَازِيْهِمْ فَاُنْظِرُ الْمُوْسِرَ وَاَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَاَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ نَحْوَهٗ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَاَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ فَقَالَ اللّٰهُ اَنَا اَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوْا عَنْ عَبْدِىْ .

২৬৭০. **অনুবাদ :** হযরত হোযায়ফা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের এক ব্যক্তির নিকট মালাকুল মউত রূহ কবজ করার জন্য উপস্থিত হলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোনো বিশেষ নেক আমল করেছ কি? সে বলল, আমার স্মরণ নেই। বলা হলো, চিন্তা কর। অতঃপর সে বলল, ঐরূপ কোনো কাজই স্মরণে আসে না একটি কাজ ব্যতীত। আর সেটি হচ্ছে দুনিয়ার জীবনে আমি লোকদের সঙ্গে ব্যবসা করতাম। ব্যবসার ক্ষেত্রে আমি লোকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতাম। আমার খাতক ধনী হলেও আমি তাকে সময় দান করতাম, আর খাতক যদি গরীব হতো, তবে আমি তাকে আমার প্রাপ্য মাফ করে দিতাম। এই আমলের বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে বেহেশত দান করেছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

মুসলিমের এক বর্ণনায় সাহাবী ওকবা ইবনে আমের (রা.) এবং আবূ মাসউদ আনসারী (রা.) হতে উক্ত বিবরণ বর্ণিত আছে। এতে উল্লেখ আছে– ঐ ব্যক্তির উক্তির উপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, সহানুভূতি প্রদর্শনে আমি তোমার অপেক্ষা অগ্রণী। [এই বলে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে আদেশ করলেন,] আমার এই বান্দার প্রতি তোমরা ক্ষমা ও সহানুভূতি প্রকাশ কর!

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কোন ফেরেশতা এসেছিলেন? এ ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক মতামত হলো হযরত আযরাঈল (আ.)-ই তার রূহ কবজ করার জন্য এসেছিলেন। অথবা বলা যায় যে, হযরত আযরাঈল (আ.)-এর সহকারী কোনো ফেরেশতা এসেছিলেন। তবে সঠিক কথা হলো হযরত আযরাঈল (আ.)-ই এসেছিলেন। কেননা, রূহ কবজ করা সংক্রান্ত সর্বাধিক সঠিক কথা হলো যে, তিনিই এ কাজ করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী প্রণিধানযোগ্য–

قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ

সুতরাং হযরত আযরাঈল (আ.) রূহ কবজ করে সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের রূহ রহমতের ফেরেশতাদের সোপর্দ করে দেন। আর যারা অসৎ ও পাপিষ্ঠ ব্যক্তি, তাদের রূহ আজাবের ফেরেশতাদের নিকট অর্পণ করে দেন। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, "মালাকুল মাউত" [চাই আযরাঈল হোক বা অন্য কেউ] হলেন রূহ কবজ করার একটি বাহ্যিক মাধ্যম মাত্র। নতুবা বস্তুত রূহ কবজকারী ও মৃত্যুদানকারী তো হলেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। যেমনটি তিনি অন্যত্র বলেছেন– اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا আল্লাহ অন্তরসমূহের মৃত্যু দান করেন, তাদের মৃত্যুর সময়।

فَقِيْلَ لَهُ : তার কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো, এখানে জিজ্ঞাসাকারী কে? এ প্রসঙ্গে দুটি মত পাওয়া যায়, একটি হলো স্বয়ং আল্লাহ তাআলা, অপরটি হলো ফেরেশতারা। প্রশ্ন কখন করা হয়েছিল? এ প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট কথা হলো রূহ কবজ করার পূর্বেই প্রশ্ন করা হয়েছিল, আবার কেউ বলেছেন, মৃত্যুর পর কবরে করা হয়েছিল। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, মূলত কেয়ামতের দিন এ প্রশ্ন করা হবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَتَجَاوَزُ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে تَفَاعُلْ মাসদার اَلتَّجَاوُزُ অর্থ– ক্ষমা করা, আমি– ক্ষমা করি।

اَلْمُعْسِرُ : অর্থ– অসচ্ছল, দরিদ্র।

اُنْظِرُ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِنْظَارُ অর্থ– সুযোগ দেওয়া, ছাড় দেওয়া।

وَعَنْ ٢٦٧١ اَبِىْ قَتَادَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِى الْبَيْعِ فَاِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৬৭১. অনুবাদ : হযরত আবূ কাতাদা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– ব্যবসার মধ্যে অধিক কসম খাওয়া হতে সতর্ক থেক। এর দ্বারা মাল বেশি বিক্রি হয়, কিন্তু বরকত বিনষ্ট হয়ে যায়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে অধিক কসম খাওয়ার দ্বারা সাময়িকভাবে লাভবান হওয়া যায়, কসমের কারণে লোকেরা অধিক ক্রয় করবে। কিন্তু পরিণতিতে তা ব্যবসার বরকত বিনষ্ট করে দেয়। কেননা যে ব্যক্তির অধিক কসম খাওয়ার অভ্যাস গড়ে উঠবে, তার থেকে মিথ্যা কসমও প্রকাশ হতে থাকবে। যার ফলশ্রুতিতে বাতেনীভাবে তার ব্যবসা হতে বরকত উঠে যাবে, তাছাড়া এ কারণে এক পর্যায়ে লোকেরা তার সাথে লেনদেন কমিয়ে দেবে অথবা তার মাল ধ্বংস হয়ে যাবে বা অনর্থ স্থানে ব্যয় করে ফেলবে।

وَعَنْ ٢٦٧٢ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৭২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন– অধিক কসম খাওয়ায় মালের কাটতি বাড়ে, তবে বরকত দূর করে দেয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمَنْفَقَةُ : সীগাহ وَاحِدْ বহছ اِسْم ظَرْف বাবে نَصَرَ، سَمِعَ মাসদার اَلنَّفَقُ অর্থ– প্রচলন বৃদ্ধির কারণ।

اَلْمَمْحَقَةُ : সীগাহ وَاحِدْ বহছ اِسْم ظَرْف বাবে فَتَحَ মাসদার اَلْمَحْقُ অর্থ– অকল্যাণের কারণ, বেবরকতির কারণ।

وَعَنْ ٢٦٧٣ اَبِىْ ذَرٍ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلٰثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ قَالَ اَبُوْ ذَرٍ خَابُوْا وَخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৬৭৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ যর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একদা নবী করীম ﷺ বললেন– তিন প্রকার মানুষ আছে, যাদের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে কোনো কথা বলবেন না, তাদের প্রতি রহমতের [করুণার] দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদেরকে [গুনাহ মাফ করে] পাক-সাফ করবেন না। আর তাদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব নির্ধারিত রয়েছে। হযরত আবূ যর (রা.) এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, তাদের জন্য তো অধঃপতন ও ধ্বংস– ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কারা? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ১. যে ব্যক্তি পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গিঁটের নিচে পৌঁছায়, ২. যে ব্যক্তি উপকারের খোঁটা দেয়, ৩. আর যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম দ্বারা নিজের মাল চালু করার চেষ্টা করে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُسْبِلُ ও اَلْمَنَّانُ-এর বিশ্লেষণ : اَلْمُسْبِلُ তথা লুঙ্গি বা পাজামা ঝুলিয়ে পরিধানকারীর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ ব্যক্তি, যে অহংকারী গর্ববশত পরিধেয় বস্ত্র টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরে। সুতরাং কেউ যদি অহংকারবশত জামাও সেই পরিমাণ ঝুলিয়ে পরে, সেও এর মধ্যে শামিল হবে।

اَلْمَنَّانُ : দ্বারা উদ্দেশ্য কারো প্রতি কোনো প্রকার অনুগ্রহ করে খোঁটা দেওয়া বা মানুষের সম্মুখে বলে তাকে লজ্জিত করা। এ ধরনের কাজের দ্বারা সে ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

"اَلْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ" দ্বারা উদ্দেশ্য : 'মিথ্যা কসম খেয়ে মালের কাটতি বৃদ্ধিকারী' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন ব্যবসায়ী যে অধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বা ব্যবসা বৃদ্ধির আশায় মিথ্যা কসম খায়। যেমন 'এ জিনিসটি ৯০ টাকায় আমার কেনা।' উপরিউক্ত তিন প্রকার ব্যক্তির উপর আল্লাহর ক্রোধের কথা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এহেন জঘন্য কাজ থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَلْمُسْبِلُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْبَالُ অর্থ– ঝুলানো, কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরা।

اَلْمَنَّانُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم مُبَالَغَة বাবে نَصَرَ মাসদার اَلْمَنُّ ، اَلْمِنَّةُ অর্থ– অনুগ্রহ করে খোঁটা দেওয়া।

اَلْمُنَفِّقُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাবে تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّنْفِيْقُ অর্থ– চালু করা, বিক্রয়ের জন্য বাজারে মাল আনা।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٦٧٤ أَبِيْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

২৬৭৪. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– সত্যবাদী, আমানতদার ব্যবসায়ী [কিয়ামত দিবসে] নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের দলে থাকবে। –[তিরমিযী, দারেমী ও দারাকুতনী। ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) এ হাদীসকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** যে ব্যবসায়ী সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা ও আমানতদারির গুণে গুণান্বিত হবে, সে হাশরের ময়দানে নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে উত্থিত হবে, তারা কেয়ামতের ভয়াবহতা ও বিভীষিকার সময় এ তিন শ্রেণির লোক যেভাবে আল্লাহর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় পাবে, অদ্রূপ তারাও আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের ছায়ায় স্থান পাবে।

অথবা বলা যায় যে, এরা জান্নাতে ঐ তিন শ্রেণির লোকেরা সান্নিধ্যের সৌভাগ্য অর্জন করবে। নবীগণের সান্নিধ্যের কারণ হলো তাদের আনুগত্য। সিদ্দীকীনগণের সান্নিধ্যের কারণ হলো তাদের বিশেষ গুণে গুণান্বিত হওয়া, আর শহীদগণের সান্নিধ্যের কারণ হলো, তারা এদের সততা ও আমানতদারি গুণের সাক্ষী হবেন। –[মেরকাত খ. ৬, পৃ. ৫৩]

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَلتَّاجِرُ : এটি একবচন, বহুবচনে تُجَّارٌ অর্থ– ব্যবসায়ী।

اَلصَّدُوْقُ : সীগাহ وَاحِدٌ বহছ اِسْم مُبَالَغَة বাবে نَصَرَ মাসদার اَلصِّدْقُ অর্থ– অধিক সত্যবাদী, সর্বদা সত্য কথা বলে যে।

اَلْأَمِيْنُ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر বহছ اِسْم مُبَالَغَة বাবে كَرُمَ মাসদার اَلْأَمَانَةُ অর্থ– অধিক আমানতদার।

وَعَنْ ٢٦٧٥ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ غَرَزَةَ (رض) قَالَ كُنَّا نُسَمّٰى فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ السَّمَاسِرَةُ فَمَرَّ بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ فَشَوِّبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৬৭৫. অনুবাদ : হযরত কায়স ইবনে আবী গারাযা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে [প্রথম দিকে] আমাদের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে 'সামাসেরাহ' [দালাল সম্প্রদায়] বলে আখ্যায়িত করা হতো। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় উক্ত নাম অপেক্ষা সুন্দর ও উত্তম নামে আমাদের আখ্যায়িত করলেন। তিনি বললেন, "হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়" [ব্যবসায়ীগণ!] ব্যবসাকার্যে অনর্থক কথা এবং নিষ্প্রয়োজন কসম করা হয়ে থাকে। [যা গুনাহে পরিগণিত। এর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ] তোমরা ব্যবসা করার সঙ্গে সদকা-দান-খয়রাতও বিশেষভাবে কর। –[আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আগেকার যুগে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে سِمْسَارٌ বা 'দালাল' বলা হতো। অতঃপর হুজুর ﷺ তাদেরকে এর চেয়ে উত্তম ও সুন্দর অর্থাৎ, تُجَّارٌ বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নামে আখ্যায়িত করেন। এ নামটি উত্তম হওয়ার কারণ হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা ক্রয়বিক্রয়ের কাজকে কুরআনের মধ্যে প্রশংসাসূচক শব্দ تِجَارَةٌ বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা বলেন– يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

অপর আয়াতে বলা হয়েছে– تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

আরেক আয়াতে রয়েছে– تِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ এ আয়াতগুলোতে تِجَارَةٌ বা ব্যবসা শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে।

مَعْنٰى قَوْلِهِ فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ [فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ বাক্যের অর্থ] : ব্যবসাকে দান-সদকা-এর সাথে মিলিত রাখ। কথাটির অর্থ হলো– ব্যবসায়িক জীবনে সাধারণত অনর্থক কথাবার্তা ও মিথ্যা কসম খাওয়ার ন্যায় জঘন্য কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে। আর এ কাজগুলো মহান রাব্বুল আলামীনের ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য তোমরা এর কাফফারা স্বরূপ তোমাদের মাল থেকে দান-সদকা করতে থাক। কেননা, দান-সদকা দ্বারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ দূরীভূত হয়।

وَعَنْ ٢٦٧٦ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ (رض) عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التُّجَّارُ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فُجَّارًا اِلَّا مَنِ اتَّقٰى وَبَرَّ وَصَدَقَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنِ الْبَرَاءِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

২৬৭৬. **অনুবাদ** : হযরত ওবায়দ ইবনে রেফাআ (রা.) তাঁর পিতার মাধ্যমে নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন– ব্যবসায়ীগণ কিয়ামত দিবসে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে ফাসেক-ফাজের-বদকারদলরূপে। অবশ্য যেসব ব্যবসায়ী মুত্তাকী-পরহেজগার হন, নেককার হন এবং সত্যবাদী হন তাঁরা ঐরূপ হবেন না। –[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী] বায়হাকী এ হাদীসকে হযরত বারা (রা.) হতে শোআবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ।

بَابُ الْخِيَارِ
পরিচ্ছেদ : ক্রয়বিক্রয়ে এখতিয়ার থাকা

اَلْخِيَارُ-এর আভিধানিক অর্থ : خِيَارٌ শব্দটি فِعَالٌ-এর ওজনে اِخْتِيَارٌ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ- ইচ্ছা, অধিকার। দুটি বস্তু বা বিষয়ের একটিকে নির্বাচন করা।

اَلْخِيَارُ-এর পারিভাষিক অর্থ : শরিয়তের পরিভাষায় خِيَارٌ বলা হয়-

اَلْخِيَارُ هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْاَمْرَيْنِ فِى الْبَيْعِ اَىِ الْفَسْخِ وَالْاِمْضَاءِ.

অর্থাৎ বেচাকেনার মধ্যে দুদিকের ভালো ও কল্যাণকর দিক অন্বেষণ করাকে খেয়ার বলে। দুদিক বলতে ক্রয়বিক্রয় বহাল রাখা ও না রাখাকে বুঝানো হয়েছে।

ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে এ خِيَارٌ বা অধিকারের অনেকগুলো প্রকার রয়েছে; যা ফিকহশাস্ত্রের কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা হয়ে থাকে। তথাপি এখানে সেগুলোর নাম ও সংজ্ঞা উল্লেখ করা জরুরি মনে করছি।

[اَقْسَامُ الْخِيَارِ] خِيَارٌ-এর প্রকারভেদ] : ক্রয়বিক্রয়ে خِيَارٌ মোট ৬ প্রকার :

১. خِيَار قَبُوْل তথা গ্রহণ ও বর্জনের অধিকার।
২. خِيَار مَجْلِسْ তথা মজলিস বা স্থানের অধিকার।
৩. خِيَار رُؤْيَةٌ তথা দেখার অবকাশের অধিকার।
৪. خِيَار شَرْط তথা শর্তের অধিকার।
৫. خِيَار عَيْب তথা দোষ সংক্রান্ত অধিকার।
৬. خِيَار تَعْيِيْنٌ তথা নির্দিষ্ট করার অধিকার।

* **خِيَار قَبُوْل :** عَاقِدَيْن তথা ক্রেতা-বিক্রেতার যে কোনো একজনের প্রস্তাবের পর অপরজনের সে প্রস্তাবকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের অধিকারকে خِيَار قَبُوْل বলে। যেমন- اِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ اَىْ بِخِيَارِ الْقَبُوْلِ

* **خِيَار مَجْلِسْ :** اِيْجَابْ ও قَبُوْل তথা প্রস্তাব ও গ্রহণের পর ক্রেতা-বিক্রেতার উক্ত مَجْلِسْ বা বৈঠক ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ক্রয়বিক্রয় চুক্তিকে বহাল রাখা বা ভঙ্গ করার যে অধিকার থাকে, সেটাকে خِيَار مَجْلِسْ বলে। বৈঠক ত্যাগ করার পর আর কোনো প্রকার অধিকার কারো থাকে না। এ প্রকার সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা পরে আসছে।

* **خِيَار شَرْط :** عَقْد بَيْع চূড়ান্ত হওয়ার পর ক্রেতা-বিক্রেতার বা উভয়ের উক্ত بَيْع-কে বহাল রাখা বা ভঙ্গ করার নির্দিষ্ট সময়ের যে শর্তারোপ করা হয়, সেটাকে خِيَار شَرْط বলে। এর হুকুম হলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে بَيْع ভঙ্গ করলে ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি ভঙ্গ না করে বা নীরব থাকে, তাহলে সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে কার্যকর হয়ে যাবে।

[اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ اَوْقَاتِ خِيَارِ الشَّرْطِ] خِيَار شَرْط-এর সময়সীমা সম্পর্কে মতভেদ] : খেয়ারে শর্ত এর বৈধতা সম্পর্কে জমহুরদের মতৈক্য রয়েছে। তবে সময়সীমা সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে।

১. হযরত আবূ হানীফা ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে, এর সময়সীমা হলো তিনদিন, এর অধিক নয়।
২. ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, عَاقِدَيْن যতদিনের সময় নির্দিষ্ট করবে, ততদিনই এর সময়সীমা।
৩. ইমাম মালেকের মতে, مَبِيْع-এর বিভিন্নতার কারণে সময়সীমাও বিভিন্ন হবে। জমি-জমার ক্ষেত্রে ৩৬ দিন, দাস-দাসীর ক্ষেত্রে ১০ দিন, মালের ক্ষেত্রে ৫ দিন ও প্রাণীর ক্ষেত্রে ৩ দিন।

দলিল : ইমাম মালেক (র.) বলেন, خِيَار شَرْط বৈধ হয়েছে চিন্তাভাবনা করার জন্য। সুতরাং بَيْع-এর বিভিন্নতার কারণে এর চিন্তার সময়সীমাও বিভিন্ন হবে। সকল জিনিসের জন্য একই সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হেকমতের পরিপন্থি।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন, خِيَارُ شَرْطٍ হচ্ছে مُتَعَاقِدَيْنِ-এর হক। তারা সন্তুষ্টচিত্তে যতদিন নির্দিষ্ট করবে, সেটিই প্রযোজ্য হবে।
ইমাম আবূ হানীফা ও শাফেয়ী (র.) বলেন, خِيَارُ شَرْطٍ হলো قِيَاسٌ-এর পরিপন্থি; কিন্তু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর সেসব হাদীসগুলোতে ৩ দিনের কথাই বলা হয়েছে। সুতরাং উসূল হলো যদি কোনো মাসআলা خِلَافَ قِيَاسٍ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাহলে সেটাকে সেখানেই সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। خِيَارُ شَرْطٍ-এর সময়সীমা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ–

১. عَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّ رَجُلًا اِشْتَرٰى مِنْ رَجُلٍ بَعِيْرًا وَاشْتَرَطَ الْخِيَارَ اَرْبَعَةَ اَيَّامٍ. فَاَبْطَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَيْعَ وَقَالَ اَلْخِيَارُ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ . (مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ)

২. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْخِيَارُ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ -

৩. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِحِبَّانِ بْنِ مُنْقِذٍ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ وَلِيَ الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ -

خِيَارُ رُؤْيَةٍ : কোনো জিনিস না দেখে ক্রয় করার পর দেখে ঐ বস্তু সম্পূর্ণ মূল্যে গ্রহণ করা ও ফেরতদানের অধিকারকে خِيَارُ رُؤْيَةٍ বলে। এর বৈধতার প্রমাণ হাদীসে রয়েছে– مَنِ اشْتَرٰى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ اِذَا رَاٰهُ

خِيَارُ عَيْبٍ : ক্রয় করে নেওয়ার পর পণ্যে কোনো আপত্তিকর দোষত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সে ব্যাপারে ক্রেতার যে خِيَارٌ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেটাকে خِيَارُ عَيْبٍ বলে।

خِيَارُ تَعْيِيْنٍ : অনেকগুলো জিনিস হতে কিছু রাখা ও কিছু ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে ক্রেতার যে অধিকার, সেটাকে خِيَارُ تَعْيِيْنٍ বলে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٦٧٧ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلٰى صَاحِبِهٖ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا اِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ اِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهٖ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ يَكُوْنُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَاِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ يَخْتَارَا وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ اَوْ يَقُوْلُ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهٖ اِخْتَرْ بَدَلَ اَوْ يَخْتَارَا -

২৬৭৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ থাকে একজন অপরজনের ক্রয় বা বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করার, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পৃথক না হয়ে যায়। তবে খেয়ারের শর্তে ক্রয়বিক্রয় ব্যতিরেকে [বুখারী ও মুসলিম] মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে যখন ক্রয়বিক্রয় সাব্যস্ত করে, তখন তাদের প্রত্যেকের জন্যই উক্ত ক্রয়বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা একে অপর থেকে পৃথক হয়ে না যায়। কিংবা তাদের ক্রয়বিক্রয় খেয়ারের শর্তে হবে। আর যদি তাদের ক্রয়বিক্রয় খেয়ারের শর্তে হয়। সে ক্ষেত্রে পৃথক হওয়ার পূর্বেই ক্রয়বিক্রয় ওয়াজিব [বাধ্যতামূলক] হয়ে যাবে। [অর্থাৎ প্রত্যাখ্যানের অবকাশ থাকবে না।]
তিরমিযীর বর্ণনায় আছে– ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্য অবকাশ থাকে [প্রত্যাখ্যান করার], যতক্ষণ পর্যন্ত একে অপর হতে পৃথক না হয় বা গ্রহণ করার কথা না বলে দেয়। বুখারী ও মুসলিম উভয়ের বর্ণনায় "কিংবা গ্রহণ করার কথা বলে দেয়" বাক্যের পরিবর্তে রয়েছে– বা একজন অপরজনকে বলে, গ্রহণ কর [অপরজন বলে, গ্রহণ করলাম]।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এখানে خِيَارٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে خِيَارٌ দ্বারা কি উদ্দেশ্য, সে ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে–

১. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে, আলোচ্য হাদীসে خِيَارٌ দ্বারা خِيَارُ مَجْلِسٍ উদ্দেশ্য।

২. ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র.) বলেন, এখানে خِيَارُ قَبُوْلٍ দ্বারা خِيَارُ قَبُوْلٍ উদ্দেশ্য।

* [تَعْرِيْف خِيَارُ مَجْلِسٍ] خِيَارُ مَجْلِسٍ-এর সংজ্ঞা : - هُوَ التَّخْيِيْرُ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ

অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদনের পর বৈঠক ত্যাগ করার পূর্বে ক্রয়বিক্রয়কে বহাল রাখা ও ভঙ্গ করার যে অধিকার থাকে, সেটাকে خِيَارُ مَجْلِسٍ বলা হয়।

আবার কেউ বলেন– هُوَ الْخِيَارُ فَسْخُ الْعَقْدِ بَعْدَ تَمَامِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِالْأَبْدَانِ

الْاِخْتِلَافُ فِيْ ثُبُوْتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ : ক্রয়বিক্রয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য خِيَارُ مَجْلِسٍ-এর অস্তিত্ব আছে কিনা, এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, বুখারী ও জমহুরের মতে, عَاقِدَيْنِ-এর জন্য خِيَارُ مَجْلِسٍ থাকবে। অর্থাৎ إِيْجَابٌ ও قَبُوْلٌ-এর পরে বৈঠক থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বে সেই بَيْعٌ ভঙ্গ করার অধিকার থাকবে।

* তাদের দলিল :

١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلٰى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا .

তারা এখানে "مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا"-এর মধ্যে পৃথক দ্বারা শারীরিকভাবে পৃথক হওয়া বুঝিয়েছেন।

* ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও ইবরাহীম নখয়ী (র.) প্রমুখ ওলামায়ে কেরামের মতে, خِيَارُ مَجْلِسٍ বলতে কোনো خِيَارٌ নেই। তারা তাদের মতের সপক্ষে নিম্নোক্ত দলিলগুলো পেশ করেন :

١. قَوْلُهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ -

عَقْدٌ হলো إِيْجَابٌ ও قَبُوْلٌ-এর নাম, যা পূর্ণ করতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু خِيَارُ مَجْلِسٍ সাব্যস্ত করা হলে তা পূর্ণ করা সম্ভব হয় না।

٢. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ -

এখানে "تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ" বা সন্তুষ্টচিত্তে ব্যবসা إِيْجَابٌ ও قَبُوْلٌ দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায় এবং সেই পণ্য ব্যবহার তার জন্য বৈধ হয়ে যায়। সুতরাং কারো জন্য এ অধিকার থাকবে না যে, সে অন্যের সন্তুষ্টি ব্যতীত তা ভঙ্গ করবে।

٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَا يَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يُّفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ اَنْ يَّسْتَقِيْلَ .

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلَائِلِ الْمُخَالِفِيْنَ : তাদের দলিল ইবনে ওমরের হাদীসের জবাবে হানাফী ও মালেকীগণ বলেন–

১. تَفَرُّقٌ **তথা পৃথক হওয়া দু প্রকার :**

এক. تَفَرُّقٌ بِالْاَبْدَانِ বা শারীরিকভাবে পৃথক হওয়া।

দুই. تَفَرُّقٌ بِالْاَقْوَالِ বা উক্তিগতভাবে পৃথক হওয়া। এখানে تَفَرُّقٌ بِالْاَقْوَالِ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ একজনের إِيْجَابٌ বলার পর অপরজনের قَبُوْلٌ বলার অধিকার আছে, যাকে خِيَارُ قَبُوْلٍ বলা হয়। তদ্রূপ إِيْجَابٌ বা প্রস্তাবকারীর প্রস্তাব ফেরত নেওয়ারও অধিকার আছে, প্রস্তাব কবুল করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। সুতরাং إِيْجَابٌ-এর পর قَبُوْلٌ-এর আগ পর্যন্ত بَائِعٌ ও مُشْتَرِيْ উভয়েরই অধিকার রয়েছে। قَبُوْلٌ বলে ফেলার পর আর خِيَارٌ থাকবে না।

আর تَفَرُّقْ দ্বারা تَفَرُّقْ بِالْاَقْوَالِ হওয়ার অসংখ্য প্রমাণ কুরআন-হাদীসে রয়েছে। যেমন–

* وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ـ
* وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ـ

এ সকল ক্ষেত্রে تَفَرُّقْ দ্বারা تَفَرُّقْ بِالْاَقْوَالِ-ই উদ্দেশ্য; تَفَرُّقْ بِالْاَبْدَانِ নয়।

২. উক্ত হাদীসে تَفَرُّقْ بِالْاَبْدَانِ-ই উদ্দেশ্য; কিন্তু خِيَارٌ দ্বারা خِيَارُ قَبُوْلٍ উদ্দেশ্য, خِيَارُ مَجْلِسْ নয়। অর্থাৎ একজনের اِيْجَابْ-এর পর تَفَرُّقْ بِالْاَبْدَانِ-এর পূর্বে অপরের কবুল করা না করার অধিকার আছে। تَفَرُّقْ بِالْاَبْدَانِ হওয়ার সাথে সাথে সেই اِيْجَابْ বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং অপরজনের জন্য ঐ اِيْجَابْ-এর قَبُوْل করার আর অধিকার থাকবে না; বরং নতুন করে اِيْجَابْ বলতে হবে।

৩. অথবা আমরা বলব যে, এখানে تَفَرُّقْ শব্দটি بَدَنْ ও قَوْل উভয় দিক থেকে পৃথক হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। এর ফায়দা হচ্ছে اِذَا جَاءَ الْاِحْتِمَالُ بَطَلَ الْاِسْتِدْلَالُ তাই হাদীসটি এককভাবে خِيَارُ مَجْلِسْ-এর অস্তিত্বের উপর দলিল দেওয়া সঙ্গত নয়।

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَلْمُتَبَايِعَانِ : সীগাহ تَثْنِيَةُ مُذَكَّرْ বহছ اِسْمُ فَاعِلْ বাবে تَفَاعُلْ মাসদার اَلتَّبَايُعُ অর্থ– ক্রেতা-বিক্রেতা, ক্রয়-বিক্রয়কারী।

لَمْ يَتَفَرَّقَا : সীগাহ تَثْنِيَةُ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ نَفْيُ جَحْدْ بِلَمْ دَرْ فِعْلِ مُسْتَقْبِلْ مَعْرُوْفْ বাবে تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّفْرِيْقُ অর্থ– তারা দুজন পৃথক হবে না।

وَعَنْ ٢٦٧٨ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৭৮. অনুবাদ : হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ থাকবে [ক্রয়বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার], যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের একজন অপরজন হতে পৃথক না হয়ে যায়। [ক্রয়বিক্রয় সাব্যস্ত কালে] তারা যদি সততা অবলম্বন করে এবং উভয়ে নিজ নিজ বস্তুর [তথা বিক্রীত-বস্তু এবং এর মূল্যের] দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেয়, তবে তাদের ক্রয়বিক্রয়ে বরকত দান করা হবে। আর যদি তারা দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে এবং মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তবে তাদের ক্রয়বিক্রয়ে বরকত মুছে দেওয়া হবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٢٦٧٩ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنِّيْ اُخْدَعُ فِي الْبُيُوْعِ فَقَالَ اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوْلُهُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৭৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকট আরজ করল, আমি ক্রয়বিক্রয় করলে ঠকে যাই; [অথচ ক্রয়বিক্রয় হতে আমি নিজেকে বারণ করতে পারি না।] নবী করীম ﷺ তাকে বললেন, ক্রয়বিক্রয়কালে তুমি বলে দেবে, ধোঁকা দেবেন না। [আমার অবকাশ থাকল ক্রয় বা বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার।] সে মতে ঐ ব্যক্তি ক্রয় বা বিক্রয় করতে হলে ঐরূপ বলে দিত। [এতে তার তৃতীয় প্রকারের অবকাশ লাভ হতো।] –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসে উল্লিখিত সে লোকটি কে ছিল? তার নাম সম্পর্কে দু ধরনের মতামত পাওয়া যায়– ১. حِبَّانُ بْنُ مُنْقِذِ بْنِ عَمْرٍو الْاَنْصَارِىُّ ২. কেউ বলেছে, লোকটি হলো হেব্বানের পিতা অর্থাৎ مُنْقِذُ بْنُ عَمْرٍو তার বয়স হয়েছিল ১৩০ বৎসর। হুজুর ﷺ-এর সাথে কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। শত্রুর পাথরের আঘাতে তার মাথা ও জিহ্বা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। এ কারণে তার কথায় একটু জড়তা ছিল। لَا خِلَابَةَ শব্দকে কখনো لَا خِيَانَةَ - لَا خِيَابَةَ ইত্যাদি বলে ফেলত।

"لَا خِلَابَةَ" -এর ব্যাখ্যা : এ বাক্যের অনেকগুলো মতামত রয়েছে। আল্লামা তুরপুশতী (র.) বলেন, হুজুর ﷺ তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যখন তুমি কারো সাথে বেচাকেনা কর, তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলবে যে, দেখ ভাই! আমার বেচাকেনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই। সুতরাং তুমি এমন কোনো কাজ করবে না, যা দ্বারা আমি প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হই। ইসলামে কোনো প্রতারণা নেই। অনুগ্রহপূর্বক আমার সাথে প্রতারণা করবে না।

প্রতারিত ব্যক্তির অধিকারের হুকুম : যদি কোনো ব্যক্তি পণ্যের মূল্য না জানে এবং এ কারণে বেচাকেনায় প্রতারিত হয়, তার بَيْع ভঙ্গ করার অধিকারকে خِيَارُ غَبْنٍ বলে। এ ব্যাপারে ইমামদের মতামত হলো–

১. ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, যদি সীমাতিরিক্ত প্রতারণা হয়, তাহলে সে ভঙ্গ করার অধিকার পাবে এবং এর সময়সীমা ৩ দিন। তাঁর দলিল উপরিউক্ত হাদীস।

২. ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী (র.) ও অধিকাংশ মালেকীগণের নিকট প্রতারণার কারণে ভঙ্গ করার কোনো অধিকার থাকবে না। কেননা তারা পরস্পরের সন্তুষ্টচিত্তে নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয়বিক্রয় করেছে এবং তারা উভয়েই জ্ঞানসম্পন্ন। সুতরাং কোনো একজনের بَيْع ভঙ্গ করার একক অধিকার থাকবে না। কেননা এখানে تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا হয়েছে।

এ হাদীসের জবাব : ১. এ হুকুম একমাত্র حِبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ-এর জন্যই নির্দিষ্ট; সকল উম্মতের জন্য নয়।

২. এখানে তাকে যে خِيَارٌ দেওয়া হয়েছিল, তা خِيَارُ مَغْبُوْنٍ ছিল না; বরং خِيَارُ شَرْطٍ ছিল। কেননা, বিভিন্ন বর্ণনায় তিন দিনের শর্ত আরোপিত হয়েছে।

পরবর্তী হানাফীগণের ফতোয়া : পরবর্তী ও সমকালীন হানাফীগণের এ ব্যাপারে ফতোয়া হলো, যদি বিক্রেতা প্রতারণা করার কারণে প্রতারিত হয় এবং তা غَبْنٍ فَاحِشٍ বা সীমাতিরিক্ত হয়, সেক্ষেত্রে তার خِيَارُ غَبْنٍ থাকবে। আর যদি বিক্রেতা প্রতারণা না করে; কিন্তু ক্রেতা নিজেই প্রতারিত হয়, তাহলে خِيَارُ غَبْنٍ থাকবে না। –[আল-আশবাহ ওন্নাযায়ের]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٦٨٠ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهٗ اَنْ يُّفَارِقَ صَاحِبَهٗ خَشْيَةَ اَنْ يَّسْتَقِيْلَهٗ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

২৬৮০. **অনুবাদ :** হযরত আমর ইবনে শোআয়েব (র.) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ থাকবে [প্রত্যাখ্যান করার], যতক্ষণ পর্যন্ত তারা একে অপর হতে পৃথক না হয়ে যায়; অবশ্য যদি গ্রহণ করার কথাও হয়ে থাকে, ক্রেতা ও বিক্রেতা কারো জন্য সঙ্গত নয় যে, অপরজন হতে দ্রুত পৃথক হয়ে যাবে শুধু এই ভয়ে যে, সে ক্রয়বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করে নাকি। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দ-বিশ্লেষণ : يَسْتَقِيْلُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْفْ বাবে اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِقَالَةُ
অর্থ– ক্রয়বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করতে বলা।

وَعَنْ ٢٦٨١ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَتَفَرَّقَنَّ اِثْنَانِ اِلَّا عَنْ تَرَاضٍ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৬৮১. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন– ক্রেতা-বিক্রেতা তাদের উভয়ের সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে [ক্রয়-বিক্রয়কে বাধ্যতামূলক করার উদ্দেশ্যে] পৃথক হয়ে যাবে না। –[আবূ দাউদ]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٦٨٢ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَيَّرَ اَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْبَيْعِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ)

২৬৮২ .**অনুবাদ** : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বেদুইনকে বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পরেও [সৌজন্যমূলকভাবে তা প্রত্যাখ্যান করার] অবকাশ দিয়েছেন। –[তিরমিযী; ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ, গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : ক্রেতা-বিক্রেতা ব্যবসায়িক লেনদেন চূড়ান্ত করার পর ততক্ষণ পর্যন্ত একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মূল্য পরিশোধ ও পণ্য প্রদান সন্তুষ্টচিত্তে না হয়। কেননা, এতদ্ভিন্ন কারো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; যা শরিয়তে নিষিদ্ধ।

অথবা এর অর্থ হলো পৃথক হওয়ার সময় একজন অপরজনকে বলবে যে, ভাই! এখন তো তোমার কোনো আপত্তি নেই। এই লেনদেনে তুমি সন্তুষ্ট আছ তো? এরপর যদি দ্বিতীয় পক্ষ بَيْعٌ ভঙ্গ করতে চায়, তাহলে ভঙ্গ করে দেবে নতুবা সেখান থেকে উঠে চলে যাবে। উল্লেখ্য যে, এ নিষেধাজ্ঞাটা হলো مَكْرُوْهْ تَنْزِيْهِىْ -এর জন্য; হারামের জন্য নয়। কেননা, এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, একে অপরের অনুমতি ব্যতিরেকেও উঠে যাওয়া বৈধ।

সুদ একটি অর্থনৈতিক অভিশাপ। এর ধ্বংসযজ্ঞতা সর্বদাই দরিদ্রের রক্ত পুঁজিবাদীদের রঞ্জিত করেছে এবং তাদের অস্তিত্বের দ্বারা পুঁজিবাদীদের আরাম-আয়েশের খোরাক জুগিয়েছে। এহেন অভিশপ্ত কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন– فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

অর্থাৎ সুতরাং যদি তোমরা সুদ খাওয়া হতে বিরত না হও, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রেখ।

আর রাসূল ﷺ বলেছেন– دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَّثَلَاثِيْنَ زَنْيَةً

অর্থাৎ এক দিরহাম পরিমাণ সুদ খাওয়া ৩৬ বার ব্যভিচার হতে জঘন্য।

এ পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কিত হাদীস উল্লিখিত হবে এবং প্রাসঙ্গিকভাবে এর বিধিবিধান আলোচিত হবে। কিন্তু এতদ্সংক্রান্ত কিছু মৌলিক তথ্য আমরা প্রারম্ভেই আলোচনা করা জরুরি মনে করি।

مَعْنَى الرِّبٰوا لُغَةً রিবা-এর আভিধানিক অর্থ] : اَلرِّبٰوا শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– اَلْفَضْلُ وَالزِّيَادَةُ তথা আধিক্য ও অতিরিক্ততা। যেমন বলা হয়– رَبَى الشَّئُ اِذَا زَادَ পবিত্র কুরআনে এ শব্দটির প্রয়োগ রয়েছে–

* وَمَا اٰتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ .

* يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ .

مَعْنَى الرِّبٰوا شَرْعًا [সুদের শরয়ী সংজ্ঞা] : رِبٰوا বা সুদের অনেকগুলো সংজ্ঞা রয়েছে–

১. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) বলেন– فَضْلُ مَالٍ بِلَا عِوَضٍ فِيْ مُعَاوَضَةِ مَالٍ بِمَالٍ

২. مُعْجَمُ الْفِقْهِ গ্রন্থকার বলেন– هُوَ فَضْلٌ خَالٍ عَنْ عِوَضٍ

৩. ইবনুল আছীর বলেন– هُوَ الزِّيَادَةُ عَلٰى اَصْلِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ

অর্থাৎ কোনো প্রকার চুক্তি ছাড়াই মূল মালের অতিরিক্ত অংশকে رِبٰى বলে।

اَقْسَامُ الرِّبٰوا وَاَحْكَامُهُ [সুদের প্রকারভেদ ও হুকুমসমূহ] : ফুকাহায়ে কেরাম رِبٰى-কে ৫ ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন–

(١) رِبَاءُ قَرْضٍ (٢) رِبَاءُ رِهْنٍ (٣) رِبَاءُ شِرْكَةٍ (٤) رِبَاءُ نَسِيْئَةٍ (٥) رِبَاءُ فَضْلٍ -

رِبَاءُ قَرْضٍ : ঋণদাতা ঋণগ্রহীতা থেকে শর্তসাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের পরে মূল মাল থেকে অধিক পরিমাণ গ্রহণ করাকে رِبَاءُ قَرْضٍ বলে। সাম্প্রতিককালে সুদের যে প্রচলন রয়েছে, তা এ প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের সুদ গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে হারাম, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

رِبَاءُ رِهْنٍ : আর্থিক বিনিময়বিহীন এমন উপকারিতা, যা বন্ধকদাতা হতে বা বন্ধকি সম্পত্তি হতে বন্ধকগ্রহীতা অর্জন করে থাকে। যেমন– এক ব্যক্তি তার কোনো সম্পদ অন্য এক ব্যক্তির নিকট বন্ধক রেখে তার থেকে কিছু টাকা ঋণ নিল। এখন দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ সম্পদ [যেমন– ঘর হলে তাতে বসবাস করে, তা] হতে উপকৃত হলো অথবা ঋণ দেওয়া অর্থ হতে অতিরিক্ত নিল। এ প্রকারও সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

رِبَاءُ شِرَاكَةٍ : কোনো যৌথ কারবারে এক অংশীদার অপর অংশীদারের লভ্যাংশ নির্দিষ্ট করে দিয়ে সকল প্রকারের লাভ বা ক্ষতি নিজে গ্রহণ করা। এ প্রকারগুলো হারাম।

رِبَاءُ نَسِيْئَةٍ : দুই জিনিসের পারস্পরিক লেনদেন বা ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে বাকি করা। সে বাকি থেকে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হোক বা না হোক। যেমন– এক ব্যক্তি অপরজনকে ১ মন চাউল দিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি তার পরিবর্তে তাকে এক মন চাউলই দিল; কিন্তু ১ মাস পরে দিল। এটি رِبَاءُ قَرْضٍ-এর প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত।

رِبَاءُ فَضْلٍ : দুই জিনিসের পারস্পরিক হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে হাতে হাতে লেনদেন করা। যেমন– এক মন চাউলের বিনিময়ে সোয়া মন চাউল দিল।

بَيَانُ عِلَّةِ الرِّبٰوا [সুদ হারাম হওয়ার কারণসমূহ] : সুদ হারাম হওয়ার عِلَّتْ বা কারণ নিরূপণে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম আবূ হানীফা, সুফিয়ান ছাওরী ও ইমাম যুহরী (র.)-এর মতে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে عِلَّتْ হলো وَزْنٌ مَعَ الْجِنْسِ বা সমশ্রেণি হওয়া ও ওজনীয় হওয়া এবং বাকি চারটির মধ্যে قَدْرٌ مَعَ الْجِنْسِ বা كَيْلٌ مَعَ الْجِنْسِ -

২. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে عِلَّتْ হচ্ছে– ثَمَنِيَّةٌ مَعَ اِتِّحَادِ الْجِنْسِ আর অন্য চারটির মধ্যে عِلَّتْ হচ্ছে طُعْمِيَّةٌ مَعَ اِتِّحَادِ الْجِنْسِ অর্থাৎ খাদ্যবস্তু হওয়া ও সমশ্রেণির হওয়া।

৩. ইমাম মালেক (র.) বলেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে عِلَّةٌ হলো ثَمَنِيَّةٌ مَعَ اِتِّحَادِ الْجِنْسِ আর যব, আটা, গম ও লবণের মধ্যে عِلَّتُ الرِّبٰوا হচ্ছে اَلْاِدِّخَارُ مَعَ اِتِّحَادِ الْجِنْسِ -

৪. ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে عِلَّتْ হলো ثَمَنِيَّةٌ مَعَ اِتِّحَادِ الْجِنْسِ মূল্য এক হওয়া ও সমজাতীয় হওয়া, আর বাকি চারটির মধ্যে طُعْمِيَّةٌ وَقَدْرِيَّةٌ مَعَ اِتِّحَادِ الْجِنْسِ -

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرِّبٰوا [بَيْع ও رِبٰوا-এর মধ্যে পার্থক্য] :

* ক্রয়বিক্রয় হালাল আর সুদ হারাম; যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا - يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ .

* بَيْع-এর মধ্যে যে মুনাফা হয়, তা অনির্দিষ্ট আর رِبٰوا-এর মধ্যে যে বৃদ্ধি হয়, এর পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়ে থাকে।

* رِبٰوا-এর মধ্যে ঘাটতির সম্ভাবনা নেই। পক্ষান্তরে بَيْع-এর মধ্যে ঘাটতি বা লোকসানের সম্ভাবনা থাকে।

* مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِىْ-কে بَيْع বলা হয়। আর رِبٰوا বলা হয় فَضْلُ مَالٍ بِغَيْرِ عِوَضٍ বা বিনিময়হীন অতিরিক্ত মালকে।

* সুদ দ্বারা গরিবের শোষণ করা হয়। কিন্তু بَيْع-এর মধ্যে গরিবের শোষণ হয় না।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٦٨٣ جَابِرٍ (رض) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهٗ وَكَاتِبَهٗ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৬৮৩. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লানত [অভিশাপ] করেছেন– যে সুদ খায়, যে সুদ দেয়, যে সুদের দলিল লেখে এবং যে দুজন লোক সুদের সাক্ষী হয় তাদের প্রতি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এটাও বলেছেন যে, [গুনাহগার সাব্যস্ত হওয়ার] দিক থেকে তারা সকলেই সমান। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সুদের দলিল লেখক ও সাক্ষীদের উপর অভিসম্পাতের কারণ হলো তারা একটি হারাম ও অবৈধ কাজের সহায়ক হয়েছে। এজন্য তাদের উপর লানতের কথা বলা হয়েছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ : مُوْكِلٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْمُ فَاعِلْ বাবে اِفْعَالْ মাসদার اَلْمُوَاكَلَةُ অর্থ– খাওয়ানো, সুদদাতা।

وَعَنْ ٢٦٨٤ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَاِذَا اخْتَلَفَتْ هٰذِهِ الْاَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৬৮৪. অনুবাদ : হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে, রৌপ্য রৌপ্যের বিনিময়ে, গম গমের বিনিময়ে, যব যবের বিনিময়ে, খেজুর খেজুরের বিনিময়ে, লবণ লবণের বিনিময়ে আদান-প্রদান করা হলে সমান-সমান ও সমপরিমাণ হতে হবে এবং উভয় দিক হতে হাতে হাতে আদান-প্রদান হতে হবে। অবশ্য এসব বস্তুর বিনিময় যদি এক জাতীয় বস্তু না হয়ে অপর জাতীয় বস্তুর সাথে হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে তোমরা পরিমাণ যা ইচ্ছা নির্ধারিত করতে পার– যদি উভয়পক্ষ হতে হাতে হাতে আদান-প্রদান অনুষ্ঠিত হয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** এটাই সেই মৌলিক হাদীস, যা দ্বারা رِبُوا -এর অর্থকে ব্যাপক করে ক্রয়বিক্রয় ও লেনদেনের কিছু বিষয়কে সুদ সাব্যস্ত করা হয়েছে। হাদীসের উদ্দেশ্য হলো এখানে যে ছয়টি বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে, যদি সেগুলোর মাঝে পারস্পরিক লেনদেন করা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে লেনদেন সমপরিমাণে এবং হাতে হাতে হতে হবে।

"سَوَاءً بِسَوَاءٍ" **বাক্যের অর্থ :** "সমানে সমান" হওয়ার অর্থ হলো যদি কোনো ব্যক্তি তার পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের বিনিময় হিসাবে দেয়, তাহলে বিক্রেতা ঐ পরিমাণ পণ্যই নেবে, যে পরিমাণ সে দিয়েছে।

"يَدًا بِيَدٍ" **বাক্যের অর্থ :** "হাতে হাতে" কথাটির অর্থ হলো একই জাতীয় জিনিসের লেনদেনের সিদ্ধান্ত যে বৈঠকে চূড়ান্ত হয়েছে, সেই বৈঠকেই উভয় পক্ষ একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই যার যার প্রাপ্য আদায় করে নেবে। এমন যেন না হয় যে, এক পক্ষ নগদ দিয়ে দিল আর অপর পক্ষ বাকি দেওয়ার অঙ্গীকার করল, যদি এ রকম হয়, তাহলে তা সুদের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যাবে।

হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি বস্তু ব্যতীত অন্যান্য বস্তুতে সুদের হুকুম আরোপিত হবে কিনা? নবী করীম ﷺ যে সমস্ত জিনিসের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে হ্রাস-বৃদ্ধি করলে সুদের হুকুম আরোপ করেছেন, সেগুলো ছয়টি যথা– স্বর্ণ, রৌপ্য, গম, যব, খেজুর ও লবণ বলে উল্লেখ করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, ঐ ছয়টি বস্তু ব্যতীত অন্য বস্তুর মধ্যে সুদের হুকুম অতিক্রম করবে কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতামত নিম্নরূপ–

১. مَذْهَبُ اَهْلِ الظَّاهِرِ : আহলে জাহেরের মতে, সুদ এ ছয়টি জিনিসের মধ্যেই সীমিত থাকবে। অন্য বস্তুর প্রতি এ হুকুম অতিক্রম করবে না। তাই এ ছয়টি বস্তু ছাড়া অন্যান্য বস্তু সমজাতীয় হলেও হ্রাস-বৃদ্ধি করে ক্রয়বিক্রয় জায়েজ হবে।

২. مَذْهَبُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে, সুদ এ ছয়টি বস্তুতে সীমাবদ্ধ নয়। হুজুর ﷺ এ ছয়টি বস্তুকে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন। তাই عِلَّةٌ পাওয়া গেলে এতদ্ভিন্ন অন্য বস্তুর মধ্যেও সুদের বিধান অতিক্রম করবে। সুতরাং একমন চাউলের পরিবর্তে দু-মন বিক্রি করলে তা সুদ হিসেবে পরিগণিত হবে। তারা বলেন–

اَلرِّبَوِيَّاتُ الْمَذْكُوْرَةُ فِى الْحَدِيْثِ سِتٌّ وَلٰكِنْ لَا يَخْتَصُّ بِهَا وَاِنَّمَا ذُكِرَتْ لِيُقَاسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ .

وَعَنْ ٢٦٨٥ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ اَوْ اِسْتَزَادَ فَقَدْ اَرْبَى الْاٰخِذُ وَالْمُعْطِىْ فِيْهِ سَوَاءٌ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৬৮৫. অনুবাদ : হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে, রৌপ্য রৌপ্যের বিনিময়ে, গম গমের বিনিময়ে, যব যবের বিনিময়ে, খেজুর খেজুরের বিনিময়ে, লবণ লবণের বিনিময়ে লেনদেন করা হলে সে ক্ষেত্রে পরিমাণের সমতা এবং উপস্থিত আদান-প্রদান করতে হবে। আর সমজাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে যে ব্যক্তি বেশি দেবে বা বেশি গ্রহণ করবে, সে সুদ লেনদেনকারী সাব্যস্ত হবে; সেই ক্ষেত্রে গ্রহীতা ও দাতা উভয়ই [গুনাহগার হওয়ায়] সমান সাব্যস্ত হবে।] -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** [আর বিভিন্ন জাতীয় বস্তুর বিনিময়ে উভয় পক্ষ হতে উপস্থিত আদান-প্রদান ও নগদ লেনদেনের আবশ্যক শুধুমাত্র ঐ ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রে বিনিময়ের বস্তুদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন জাতের হলেও শরিয়তের দৃষ্টিতে মাপ-প্রণালীতে এক শ্রেণিভুক্ত। যথা- গম, যব, খেজুর; এসব ভিন্ন ভিন্ন জাতের, কিন্তু মাপ-প্রণালীতে শরিয়তের নিকট সবগুলোই এক শ্রেণিভুক্ত তথা ধামার মাপ শ্রেণিভুক্ত; যথা- নিক্তির মাপ শ্রেণিভুক্ত। সুতরাং গম যবের বা খেজুরের সাথে, যব খেজুরের সাথে এবং স্বর্ণ রূপার সাথে বিনিময়ে করা হলে সে ক্ষেত্রে পরিমাণে সমতার প্রয়োজন নেই। কিন্তু উভয় পক্ষ হতে উপস্থিত আদান-প্রদান ও নগদ লেনদেন হতে হবে। নতুবা সুদী লেনদেনে পরিগণিত হয়ে তা হারাম সাব্যস্ত হবে। হ্যাঁ স্বর্ণ বা রূপার সাথে গম, যব কিংবা খেজুরর বিনিময় হলে সে ক্ষেত্রে পরিমাণে সমতারও প্রয়োজন নেই এবং উভয় পক্ষের নগদ লেনদেনেরও প্রয়োজন নেই।

وَعَنْهُ ٢٦٨٦ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلَا تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلَا تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ)

২৬৮৬. অনুবাদ : হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে পরিমাণের সমতা ব্যতিরেকে বিক্রি করো না, একদিকে অপরদিক অপেক্ষা বেশি করো না। রৌপ্য রৌপ্যের বিনিময়ে পরিমাণের সমতা ব্যতিরেকে বিক্রি করো না; একদিকে অপর দিক অপেক্ষা বেশি করো না। আর উল্লিখিত বস্তুদ্বয়ে বাকির বিনিময় নগদের সাথে করো না। -[বুখারী ও মুসলিম]

অপর এক বর্ণনায় আছে- স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য- উভয় দিকের বস্তু ওজন করা ব্যতিরেকে বিক্রি করো না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ **-এর ব্যাখ্যা :** "তোমরা কোনোটাকে কোনোটার মধ্যে কমবেশি করো না" এ শব্দের ব্যবহার হুজুর ﷺ -এর ভাষা-লালিত্যের পরিচায়ক। কেননা, এখানে হুজুরের উদ্দেশ্য হ্রাস-বৃদ্ধি উভয়টাই নিষেধ করা। অর্থাৎ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রোপ্য ক্রয়বিক্রয়ের সময় কমবেশি করবে না; বরং সমান সমান করবে।

قَوْلُهُ لَا تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ -এর ব্যাখ্যা : نَاجِزٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নগদ আর غَائِبٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বাকি। সুদ সংক্রান্ত মালের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে যে, عَقْد -এর সময় তা কবজা করা জরুরি নাকি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট করাই যথেষ্ট।

১. হানাফীগণের নিকট শুধুমাত্র নির্দিষ্ট করাই যথেষ্ট। মজলিসেই কবজা করা জরুরি নয়। কিন্তু দিরহাম-দিনার ইত্যাদি সেগুলো ثَمَنٌ -এর অন্তর্ভুক্ত, যা নির্দিষ্ট করার দ্বারাও নির্দিষ্ট হয় না, কবজা করা ব্যতীত। সুতরাং সেগুলোর ক্ষেত্রে মজলিসেই কবজা করা জরুরি।

২. اَئِمَّةٌ ثَلَاثَةٌ -এর মতে সকল সুদ সংক্রান্ত মালের ক্ষেত্রে মজলিসেই কবজা করা জরুরি।

দলিল : তাঁদের দলিল হলো হাদীসের মধ্যে يَدًا بِيَدٍ বলা হয়েছে। আর يَدًا بِيَدٍ দ্বারা কবজা করা বুঝে আসে। কেননা, হাত হলো কবজা করার যন্ত্র।

হানাফীদের দলিল : এ সম্পর্কিত তিন ধরনের হাদীস বর্ণিত হয়েছে–

১. غَائِبٌ بِنَاجِزٍ অর্থাৎ بَيْعٌ ও ثَمَنٌ -এর মধ্য থেকে একটি উপস্থিত ও অপরটি অনুপস্থিত, এ রকম বেচাকেনা করো না; বরং উভয়টি উপস্থিত থাকা জরুরি। আর উপস্থিত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নির্দিষ্ট হওয়া, কবজা করা নয়।

২. عَيْنًا بِعَيْنٍ অর্থাৎ নির্দিষ্টকে নির্দিষ্টের পরিবর্তে বিক্রয় কর। এর দ্বারাও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, কবজা করা নয়।

৩. يَدًا بِيَدٍ উপরের উভয় বর্ণনায় যেহেতু নির্দিষ্ট করা বুঝে আসল, সুতরাং يَدًا بِيَدٍ দ্বারা নির্দিষ্ট করাই উদ্দেশ্য হলে তিন প্রকারের বর্ণনাই এক হয়ে যায়। يَدًا بِيَدٍ দ্বারা যদিও কবজার দিকে ইঙ্গিত হয়, কিন্তু নির্দিষ্ট করাও উদ্দেশ্য নেওয়া যায়। কেননা, হাত যে রকম কবজা করার যন্ত্র, তদ্রূপ তা ইশারা ও নির্দিষ্ট করারও যন্ত্র।

শব্দ-বিশ্লেষণ : لَا تُشِفُّوْا : সীগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ বহছ نَهْيٌ حَاضِرٌ مَعْرُوْفٌ বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِشْفَافُ অর্থ– প্রাধান্য দেওয়া, অতিরিক্ত করা। شَفٌّ শব্দটি বিপরীতার্থক অর্থের জন্যও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ হ্রাস-বৃদ্ধি, কম-বেশি। এখানে সে অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

نَاجِزٌ : অর্থ– উপস্থিত, নগদ।

وَعَنْ ٢٦٨٧ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৬৮৭. অনুবাদ : হযরত মা'মার ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনতাম, খাদ্যবস্তুর সাথে খাদ্যবস্তুর বিনিময়ে পরিমাণের সমতা হতে হবে। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٢٦٨٨ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًوا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْوَرَقُ بِالْوَرَقِ رِبًوا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًوا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًوا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًوا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৮৮. অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণের সাথে যদি উভয়পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয়, তবে তা সুদী বিনিময় হবে। রূপার বিনিময় রূপার সাথে যদি উভয়পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয়, তবে তা সুদী লেনদেন হবে। গমের বিনিময় গমের সাথে যদি উভয়পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয়, তবে তা সুদী লেনদেন হবে। যবের বিনিময় যবের সাথে যদি উভয়পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয়, তবে তা সুদী লেনদেন হবে। খেজুরের বিনিময় খেজুরের সাথে যদি উভয়পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয়, তবে তা সুদী লেনদেন হবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সমজাতীয় জিনিসের মধ্যে পরস্পরকে বিনিময়ের তিনটি অবস্থা হতে পারে–

১. উভয়টাই مَوْزُوْنٌ হবে বা مَكِيْلٌ - ২. উভয়টাই নগদ হবে বা বাকি হবে। ৩. একটি নগদ এবং অপরটি বাকি। এর মধ্যে প্রথম অবস্থা অনুযায়ী লেনদেন জায়েজ হবে। তবে শর্ত হলো সমান-সমান হতে হবে এবং উভয়টাই নগদ হতে হবে। আর পরবর্তী দুই অবস্থা অর্থাৎ উভয়টাই বাকি বা একটি বাকিতে লেনদেন জায়েজ হবে না। যদিও পরিমাপ ও পরিমাণ সমান-সমান হোক না কেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ : هَاءَ وَهَاءَ : هَاءَ এটি اِسْمُ فِعْلٍ অর্থ– خُذْ নাও, লও। অর্থাৎ উভয়ের মধ্য হতে একজন বলবে– خُذْ هٰذَا দ্বিতীয়জনও বলবে– خُذْ هٰذَا অথবা এর অর্থ হবে– خُذْ وَاَعْطِ - هَاءَ ব্যবহার হয় مُذَكَّرٌ-এর জন্য, هَاءِ - مُؤَنَّثٌ-এর জন্য, هَاءُمَا - تَثْنِيَةٌ مُذَكَّرٌ ও تَثْنِيَةٌ مُؤَنَّثٌ-এর জন্য এবং هَاؤُمْ - جَمْعُ مُذَكَّرٍ-এর জন্য, هَاؤُنَّ - جَمْعُ مُؤَنَّثٍ-এর জন্য।

وَرِقٌ : এটি একবচন, বহুবচনে أَوْرَاقٌ অর্থ– রৌপ্য-মুদ্রা।

وَعَنْ ٢٦٨٩ أَبِىْ سَعِيْدٍ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضــ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلٰى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا قَالَ لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا وَقَالَ فِى الْمِيْزَانِ مِثْلَ ذٰلِكَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৮৯. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে 'খায়বর' এলাকায় চাকরি দিলেন। ঐ ব্যক্তি তথা হতে খুব ভালো খেজুর নিয়ে আসল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, খায়বরের সব খেজুরই কি এরূপ উত্তম হয়? ঐ ব্যক্তি বলল, না– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এরূপ এক সা' [প্রায় চার সেরী ধামা] খেজুর [মন্দ] দুই সা' খেজুরের বিনিময়ে গ্রহণ করে থাকি। কিংবা ভালো দুই সা' মন্দ তিন সা'-এর বিনিময়ে গ্রহণ করে থাকি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এরূপ বিনিময় করো না; বরং মন্দ খেজুর [দুই সা' বা তিন সা'] মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি কর; অতঃপর ঐ মুদ্রা দ্বারা ভালো খেজুর ক্রয় কর। রাসূলুল্লাহ ﷺ এটাও বললেন, বাটখারায় ওজন করা বস্তুনিচয় সম্পর্কেও এ বিধানই [যে, এক জাতীয় বস্তুদ্বয়ে বিনিময় হলে বস্তুদ্বয়ে ভালোমন্দের বিরাট ব্যবধান থাকলেও ঐ বস্তুদ্বয়ের সরাসরি বিনিময়ে কমবেশি করা যাবে না; করলে তা সুদী লেনদেনে গণ্য হয়ে হারাম হবে। ভালোমন্দের পার্থক্য করতে হলে ঐ বস্তুদ্বয়ে সরাসরি বিনিময় না করে উপরোল্লিখিত নিয়মে মুদ্রার দ্বারা ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যমে বিনিময় করবে, তাতে ভালোমন্দের ব্যবধানও হবে এবং জায়েজও হবে]। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[تَوْضِيْحُ وَقَالَ فِى الْمِيْزَانِ مِثْلَ ذٰلِكَ] : وَقَالَ فِى الْمِيْزَانِ مِثْلَ ذٰلِكَ-এর ব্যাখ্যা হাদীসের এ অংশের উদ্দেশ্য হলো যেভাবে খেজুরও পরিমাপে লেনদেন হয় এবং এমন জিনিসের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে, তদ্রূপ ঐ জিনিসেরও একই হুকুম, যা ওজন করে লেনদেন করা হয়। যেমন– স্বর্ণ-রৌপ্যকেও যদি সমজাতীয় জিনিস দ্বারা বিনিময় করতে হয় আর তা যদি একটি উত্তম হয় ও অন্যটি নিম্নমানের হয়, তাহলে তখনো ভালোটাকে কম দিয়ে এবং খারাপটাকে বেশি দিয়ে ক্রয়বিক্রয় জায়েজ হবে না; বরং সেক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় কাজ করতে হবে। অর্থাৎ খারাপ জিনিসটাকে টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করে ফেলবে এবং সেই টাকা দ্বারা ভালো জিনিস ক্রয় করে নেবে।

ইমাম নববী (র.) বলেন, عِلَّةُ الرِّبَا সম্পর্কে এটি হানাফীদের দলিল। কেননা এ হাদীসে رِبٰوا-এর কারণ বলা হয়েছে كَيْل এবং وَزْن-কে তার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বুঝা গেল যে, عِلَّةُ الرِّبَا হলো كَيْل ও وزن ; طَعَام ও نَقْد নয়। যদি সেটা عِلَّةٌ হতো, তাহলে হুজুর ﷺ বলতেন– وَفِي النَّقْدِ مِثْلُ ذٰلِكَ –[মেরকাত খ. ৬, পৃ. ৬২]

শব্দ-বিশ্লেষণ : إِسْتَعْمَلَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ إِثْبَاتْ فِعْل مَاضِى مُطْلَقْ مَعْرُوفْ বাবে إِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِعْمَالُ অর্থ– কর্মচারী নিয়োগ করা।

جَنِيْبٌ : نَوْعٌ جَيِّدٌ مِنْ أَنْوَاعِ التَّمْرِ উন্নত জাতের খেজুর।

اَلْجَمْعُ : تَمْرٌ رَدِيٌّ أَوْ تَمْرٌ مُخْتَلَطٌ مِنْ أَنْوَاعٍ تَفْرِقَةٍ وَلَيْسَ مَرْغُوْبًا فِيْهِ
নিম্নমানের খেজুর বা বিভিন্ন জাতের মিশ্রিত খেজুর, যাতে মানুষের আগ্রহ কম থাকে।

وَعَنْ ٢٦٩٠ أَبِى سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَيْنَ هٰذَا قَالَ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبٰوا عَيْنُ الرِّبٰوا لَا تَفْعَلْ وَلٰكِنْ إِذَا أَرَدْتَّ أَنْ تَشْتَرِىَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ اٰخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهٖ – (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৯০. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত বেলাল (রা.) নবী করীম ﷺ -এর নিকট 'বর্নী' [একপ্রকার খেজুর] নিয়ে আসলেন। নবী করীম ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এ প্রকার খেজুর কোথা হতে পেলে? তিনি বললেন, আমার নিকট মন্দ খেজুর ছিল; আমি এর দুই সা' [প্রায় আট সের] এই খেজুর এক সা' [প্রায় চার সের]-এর বিনিময়ে বিক্রয় করেছি।

এতদ্‌শ্রবণে নবী করীম ﷺ বললেন– ওহ্! এটা তো প্রকৃত সুদি লেনদেন হয়েছে। এটা তো সুদী লেনদেন হয়েছে। এরূপ করো না; বরং তুমি এটা [তথা মন্দ খেজুর পরিমাণে বেশি দিয়ে কম পরিমাণে উত্তম খেজুর লাভ] করতে চাইলে [মুদ্রার বিনিময়ে] মন্দ খেজুর ভিন্নভাবে বিক্রয় করবে; অতঃপর [সেই মুদ্রায়] উত্তম খেজুর ক্রয় করবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٢٦٩١ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيْدُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِعْنِيْهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ وَلَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدَهُ حَتّٰى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ أَوْ حُرٌّ – (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৬৯১. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন ক্রীতদাস [কোনো এলাকা হতে মদিনায়] পৌঁছল এবং সে [নবীজীর সাহচর্যে থাকার উদ্দেশ্যে] হিজরত করে সর্বদার জন্য মদিনায় অবস্থান অবলম্বন করবে এই অঙ্গীকারের উপর নবী করীম ﷺ -এর হস্তে বায়'আত গ্রহণ করল। তার ক্রীতদাস হওয়া নবীজীর নিকট প্রকাশ পায়নি! [নতুবা মনিবের কাজ ছেড়ে মদিনায় অবস্থান করার দীক্ষা গ্রহণের বিষয়টি নবী করীম ﷺ মঞ্জুর করতেন না।]

ইতোমধ্যে ঐ ক্রীতদাসের মনিব রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলো এবং তাকে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করল। [মদিনায় অবস্থান করার দীক্ষা যেহেতু নবী করীম ﷺ মঞ্জুর করেছিলেন, তাই তিনি তা রক্ষা করার চেষ্টা করলেন।] নবী করীম ﷺ মনিবকে অনুরোধ করলেন, ক্রীতদাসটি আমার নিকট বিক্রি করে দাও! সেমতে তিনি তাকে দুটি হাবশী ক্রীতদাসের বিনিময়ে ক্রয় করে নিলেন। [এভাবে তার মদিনায় অবস্থানের ব্যবস্থা করে মঞ্জুরকৃত দীক্ষা গ্রহণের বিষয়টি রক্ষা করলেন। এটা নবীজির অমায়িকতার একটি দৃষ্টান্ত।]

এ ঘটনার পর নবী করীম ﷺ কারো ঐরূপ বায়'আত গ্রহণের আবেদন মঞ্জুর করতেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে জিজ্ঞেস না করে নিতেন– সে ক্রীতদাস না মুক্ত। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

প্রাণীকে প্রাণীর বিনিময়ে বিক্রয় করা যাবে কিনা? প্রাণীর বিনিময়ে প্রাণী ক্রয়বিক্রয় করা يَدًا بِيَدٍ হলে জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে সকলের মতৈক্য রয়েছে। কিন্তু نَسِيْئَةً বা বাকির সুরতে মতানৈক্য রয়েছে।

১. ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, জায়েজ আছে।

তাঁদের দলিল : তাঁদের নিকট عِلَّةُ الرِّبَا হলো ثَمَنِيَّةٌ وَمَطْعُوْمِيَّةٌ কিন্তু بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ -এর ক্ষেত্রে দুটি عِلَّةٌ-এর কোনোটিই বিদ্যমান নেই। সুতরাং তাদের নিকট مُتَفَاضِلًا এবং نَسِيْئَةً উভয়টাই জায়েজ। তাদের আর একটি দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদীসটি–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الْاِبِلُ فَامَرَهُ اَنْ يَأْخُذَ فِىْ قَلَاصِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَ يَأْخُذُ الْبَعِيْرَ بِالْبَعِيْرَيْنِ اِلٰى اِبِلِ الصَّدَقَةِ -

হানাফীদের দলিল : হানাফীরা দলিলস্বরূপ বলে যে, হানাফীদের عِلَّةُ الرِّبَاءِ হলো قَدْرٌ مَعَ الْجِنْسِ ; এর উভয়টা বিদ্যমান থাকলে تَفَاضُلٌ وَنَسِيْئَةٌ উভয় সুরতই হারাম। আর একটি পাওয়া গেলে تَفَاضُلٌ জায়েজ; কিন্তু نَسِيْئَةٌ হারাম।

আরেকটি দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদীস :

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً -

জবাব : হানাফীরা বলেন যে, এক উটের বিনিময়ে দুই উট নিতাম। এটা মূলত ক্রয়বিক্রয় ছিল না; বরং বাইতুল মাল থেকে ঋণ নিতেন। আর এভাবে ঋণগ্রহণ আমাদের নিকটও বৈধ। তাছাড়া তাদের হাদীসের সনদের মধ্যে اِضْطِرَابٌ আছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ : لَمْ يَشْعُرْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ نَفِىْ جَحَدْ بِلَمْ دَرْ فِعْلِ مُسْتَقْبِلْ مَعْرُوْفْ বাবে كَرُمَ মাসদার اَلشُّعُوْرُ অর্থ– অনুভব করা।

لَمْ يُبَايِعْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ نَفِىْ جَحَدْ بِلَمْ دَرْ فِعْلِ مُسْتَقْبِلْ مَعْرُوْفْ বাবে مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُبَايَعَةُ অর্থ– বায়'আত হওয়া।

وَعَنْ ٢٦٩٢ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيْلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمّٰى مِنَ التَّمْرِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৬৯২. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন যে, একদিকে খেজুরের একটি স্তূপ যার [সঠিকরূপে] পরিমাণ জানা যায়নি; অপর দিকে পরিমাপকৃত খেজুর। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হুজুর ﷺ লেনদেনের এ সুরতকে নিষেধ করেছেন যে, একদিকে খেজুরের অনির্দিষ্ট স্তূপ, অপর দিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুর। কেননা, এমতাবস্থায় ঐ স্তূপের খেজুরের পরিমাণ অনির্দিষ্ট। হতে পারে স্তূপের খেজুর ঐ নির্দিষ্ট খেজুরের চেয়ে বেশি বা কম হবে। উভয় অবস্থাতেই সুদ হয়ে যাবে। তবে এ নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র সমজাতীয় জিনিসের বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু অসমজাতীয় জিনিসের ক্ষেত্রে কমবেশি করে ক্রয়বিক্রয় জায়েজ হবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَلصُّبْرَةُ : স্তূপ, ফসলের স্তূপ।

اَلْمَكِيْلَةُ : এটি একবচন, বহুবচনে مَكَايِلُ অর্থ– পরিমাপকৃত, পরিমাপ যন্ত্র, পরিমাণ।

وَعَنْ ٢٦٩٣ فُضَالَةَ بْنِ اَبِيْ عُبَيْدٍ (رض) قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِيْنَارًا فِيْهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُّ فِيْهَا اَكْثَرَ مِنْ اِثْنَيْ عَشَرَ دِيْنَارًا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا تُبَاعُ حَتّٰى تُفَصَّلَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৬৯৩. অনুবাদ : হযরত ফাযালা ইবনে আবূ ওবায়দা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খায়বর বিজয়ের সময় একটি মালা ক্রয় করলাম বারো দিনার [স্বর্ণমুদ্রা]-এর বিনিময়ে; ঐ মালায় স্বর্ণ-দানাও ছিল এবং পুঁতিও ছিল। আমি স্বর্ণদানাগুলো ভিন্ন করে দেখলাম, তা বারো দিনারের পরিমাণ হতে অধিক। আমি ঐ ক্রয় সম্পর্কে নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এরূপ ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে স্বর্ণকে লক্ষ্য করা ব্যতিরেকে ক্রয়বিক্রয় জায়েজ নয়। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : এ হাদীসের দ্বারা জানা গেল যে, সুদী মালের মধ্যে দুটি সমজাতীয় জিনিসকে পরস্পরের মাঝে বিনিময় করা, যাতে এক পক্ষের জিনিসের মধ্যে অন্য জাতীয় জিনিসও অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তা জায়েজ হবে না। যেমন- কেউ যদি স্বর্ণমিশ্রিত অলঙ্কার স্বর্ণের বিনিময়ে ক্রয়বিক্রয় করে, চাই তা আশরাফীর বিনিময়ে বা অন্য কোনো সুরতে হোক, তখন আবশ্যক হলো সেই অলঙ্কার হতে খচিত স্বর্ণ পুঁতি ইত্যাদি পৃথক করে ফেলা এবং সেই অলঙ্কারের খাঁটি স্বর্ণটুকু অন্য স্বর্ণের বিনিময়ে সমান-সমান ওজন করে নেওয়া। এ হুকুম এজন্যই যে, যেন সমজাতীয় জিনিসের মধ্যে কমবেশি করে পারস্পরিক লেনদেনের কারণে সুদি কারবার না হয়ে যায়, তবে যদি স্বর্ণখচিত অলঙ্কার রৌপ্যের বিনিময়ে অথবা তার বিপরীত হয়, তখন সেই অলঙ্কারে খচিত স্বর্ণ, পুঁতি ইত্যাদি পৃথক করা আবশ্যক নয়। কেননা, ভিন্ন জাতীয় জিনিসের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধিতে ক্রয়বিক্রয় জায়েজ আছে। সেক্ষেত্রে সুদের কোনো সম্ভাবনা নেই।

শব্দ বিশ্লেষণ : قِلَادَةٌ : এটি একবচন, বহুবচনে قَلَائِدُ অর্থ- মালা, গলার হার।

خَرَزٌ : পুঁতি।

فَصَّلْتُهَا : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْفْ বাবে تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّفْصِيْلُ - هَا যমীর مَنْصُوْبْ مُتَّصِلْ অর্থ- পৃথক করা, আমি সেটাকে পৃথক করলাম।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٦٩٤ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيَاتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقٰى اَحَدٌ اِلَّا اٰكِلُ الرِّبٰوا فَاِنْ لَّمْ يَاكُلْهُ اَصَابَهٗ مِنْ بُخَارِهٖ وَيُرْوٰى مِنْ غُبَارِهٖ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৬৯৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- লোকদের উপর এমন যুগ আসবে, যখন [সুদী কারবার ব্যাপক হয়ে পড়বে, এমনকি] একটি লোকও সুদের ব্যবহার হতে অব্যাহতি পাবে না। সে সরাসরি না খেলেও সুদের ধোঁয়া বা ধুলা তাকে স্পর্শ করবে। -[আহমদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "ধোঁয়া বা ধূলি" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার প্রভাব বা চিহ্ন। অর্থাৎ সুদের ব্যাপকতা ও প্রসারতার যুগে যদি কোনো ব্যক্তি সরাসরি সুদের লেনদেন থেকে রক্ষাও পায়, তাহলে কোনো না কোনোভাবে সুদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হবেই। উদাহরণস্বরূপ একজন পরহেজগার ও মুত্তাকী ব্যক্তির কথাই চিন্তা করুন তার জীবনের এমন কোনো দিক নেই, যেখানে তার ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। আকিদাগত ও আমলী জিন্দেগির সর্বদিকেই তিনি একজন বাস্তবিকই অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তার ন্যায় একজন ব্যক্তি যখন তার সন্তানের জন্য ১ টাকার বাদাম কিনে আনে, তখন সেও চিন্তা করে এই যে, একটা অতি নগণ্য জিনিস আমি ক্রয় করছি; না জানি তা শত সুদী লেনদেন অতিক্রম করে আমার হস্তগত হয়েছে।

হাদীসের মর্মার্থ হলো পরবর্তী যুগে সুদের অভিসম্পাত এত ব্যাপক ও সম্প্রসারিত হবে যে, প্রতিটি ব্যক্তিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাতে লিপ্ত হয়ে পড়বে। কেউ প্রত্যক্ষভাবে কেউ বা পরোক্ষভাবে আবার কেউ অজান্তেই এর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ : بُخَارٌ : এটি একবচন, বহুবচনে اَبْخِرَةٌ অর্থ– ধোঁয়া, বাষ্প।

غُبَارٌ : এটি একবচন, বহুবচনে أَغْبِرَةٌ অর্থ– ধূলি, ধুলা।

وَعَنْ ٢٦٩٥ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضـ) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَلَا الشَّعِيْرَ بِالشَّعِيْرِ وَلَا التَّمَرَ بِالتَّمَرِ وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ يَدًا بِيَدٍ وَلٰكِنْ بِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرَ بِالْبُرِّ وَالتَّمْرَ بِالْمِلْحِ وَالْمِلْحَ بِالتَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ - (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

২৬৯৫. অনুবাদ : হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ বিক্রি করো না– যতক্ষণ উভয় দিকের বস্তু সমপরিমাণের না হয়, উভয় দিক হতে নগদ লেনদেন না হয় এবং উপস্থিত মজলিসে হস্তগত না হয়। –হ্যাঁ, রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ, স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য, যবের বিনিময়ে গম, গমের বিনিময়ে যব, লবণের বিনিময়ে খেজুর, খেজুরের বিনিময়ে লবণ উভয়পক্ষ হতে উপস্থিত আদান-প্রদানে [পরিমাণে] যেরূপ ইচ্ছা বিক্রয় করতে পার। –[শাফেয়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

خُلَاصَةُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের সারমর্ম] : যদি সমজাতীয় দু জিনিসের পরস্পরের মধ্যে লেনদেন করা হয়, যেমন– গমের বিনিময়ে গম, তখন উভয় বস্তু সমান-সমান ও হাতে হাতে হওয়া জরুরি। আর যদি তা ভিন্ন জাতীয় হয় [যেমন– গমের বিনিময়ে যব], তখন হাতে হাতে বা নগদ হওয়া জরুরি; কিন্তু সমান-সমান হওয়া আবশ্যক নয়।

وَعَنْ ٢٦٩٦ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ شَرْيِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ اَيَنْقُصُ الرُّطَبُ اِذَا يَبِسَ فَقَالَ نَعَمْ فَنَهَاهُ عَنْ ذٰلِكَ - (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৬৯৬. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি [নিজ কানে] শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো– পাকা খেজুরের বিনিময়ে শুকনো খেজুর ক্রয় করা সম্পর্কে। তিনি বললেন, পাকা খেজুর শুকালে কি ঘাটতি হয়। জিজ্ঞাসাকারী বলল, হ্যাঁ। সে মতে তিনি ঐরূপ ক্রয় করতে নিষেধ করলেন। –[মালেক, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

هَلْ يَجُوْزُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ؟ [পাকা খেজুরের বিনিময়ে শুকনো খেজুর ক্রয়বিক্রয় জায়েজ কিনা?] : তাজা খেজুরকে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করা জায়েজ আছে কিনা, সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

১. اَئِمَّةُ ثَلَاثَةٌ ও সাহেবাইনের নিকট بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ জায়েজ নেই। তাঁদের দলিল–

سُئِلَ عَنْ شَرْيِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ اَيَنْقُصُ الرُّطَبُ اِذَا يَبِسَ فَقَالَ نَعَمْ فَنَهَاهُ عَنْ ذٰلِكَ –

২. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ সমান-সমান হলে জায়েজ আছে। তাঁর দলিল নিম্নরূপ–

١. قَوْلُهُ تَعَالٰى اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ .

٢. اِنَّهُ (ع) قَالَ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ...... وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مَثَلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ - (مُسْلِمٌ)

এখানে বলা হয়েছে, শুকনা খেজুরকে শুকনা খেজুরের বিনিময় সমান-সমানে বিক্রয় করা জায়েজ আছে। تَمْرٌ শব্দটি عَامٌ এর দ্বারা শুকনা ও ভিজা দু ধরনের খেজুরই অন্তর্ভুক্ত হয়।

٣- قَوْلُهُ (ع) اِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ -

জবাব : প্রথমত তাদের দলিলের উত্তরে ইমাম ত্বাহাবী (র.) বলেন, সেই হাদীসটি نَسِيْئَةً বিক্রয়ের জন্য প্রযোজ্য হবে। এতদসংক্রান্ত একটি হাদীসে স্পষ্ট বর্ণিত রয়েছে–نَهٰى عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيْئَةً সুতরাং যদি يَدًا بِيَدٍ হয়, তাহলে জায়েজ হবে।

দ্বিতীয়ত সেই হাদীসের عَيَّاشٌ নামক একজন রাবী আছেন, আর তিনি হলেন مَجْهُوْلٌ সুতরাং হাদীসটি দুর্বল। –[**বযলুল মাজহুদ, ফতহুল মুলহিম**]

শব্দ-বিশ্লেষণ : رُطَبٌ : এটি একবচন, বহুবচনে اَرْطَابٌ অর্থ– তাজা খেজুর।

تَمْرٌ : এটি একবচন, বহুবচনে تُمُوْرٌ অর্থ– শুকনো খেজুর।

وَعَنْ ٢٦٩٧ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلًا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ قَالَ سَعِيْدٌ كَانَ مِنْ مَيْسَرِ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ - (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

২৬৯৭. অনুবাদ : তাবেয়ী সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (র.) হতে মুরসালরূপে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন প্রাণীর বিনিময়ে গোশ্ত বিক্রি করতে। তাবেয়ী সাঈদ (র.) বলেছেন, অন্ধকার যুগে এক প্রকার জুয়ার প্রচলন ছিল; তাতে ঐরূপ ক্রয়বিক্রয় হতো। –[শরহুস সুন্নাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَفِى الْقَامُوْسِ اللَّعِبُ بِالْقِدَاحِ اَوِ النَّرْدِ وَقَالَ الطِّيْبِيُّ اِشْتِقَاقُ الْمَيْسِرِ مِنَ الْيُسْرِ لِاَنَّهُ اَخْذُ مَالِ الرَّجُلِ بِيُسْرٍ وَسُهُوْلَةٍ مِنْ غَيْرِ كَدٍّ -

بَحْثُ الْاِخْتِلَافِ فِىْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ [প্রাণীর বিনিময়ে গোশ্ত বিক্রয়ের বৈধতার ব্যাপারে মতভেদ] : প্রাণীর বিনিময়ে গোশ্ত বিক্রয় করা বৈধ কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

১. ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর নিকট যে কোনো ধরনের প্রাণীর বিনিময়ে গোশ্ত বিক্রয় করা বৈধ নয়। তাঁদের দলিল–

* عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مُسَيَّبِ اَنَّهُ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ -

২. ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ বাকিতে বিক্রয় জায়েজ নয়, কিন্তু তা যদি يَدًا بِيَدٍ হয়, তাহলে জায়েজ হবে। কেননা, গোশ্ত পরিমাপযোগ্য জিনিস আর প্রাণী হলো অপরিমাপযোগ্য। আর প্রাণীকে পরিমাপ করা সম্ভবও নয়। لِأَنَّهُ يُخَفِّفُ نَفْسَهُ مَرَّةً وَيَثْقُلُ أُخْرَى .

প্রতিপক্ষের জবাব : عِلَّةُ الرِّبَا হলো قَدْر وَجِنْس কিন্তু এখানে قَدْر পাওয়া যাচ্ছে না শুধুমাত্র جِنْس পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং اِتِّحَادُ الْجِنْسِ অবস্থায় শুধুমাত্র نَسِيْئَةً বিক্রয় নিষিদ্ধ; কিন্তু تَفَاضُلًا জায়েজ হবে। আর হাদীসেও مَعَ اِخْتِلَافِ الْقَدْرِ نَسِيْئَةً বা বাকিতে ক্রয়বিক্রয় নিষেধ করা হয়েছে। -[ফতহুল কাদীর খ. ৩, পৃ. ১৯০, হেদায়া খ. ৩, পৃ. ৬৫, তা'লীক- ৩০৯]

وَعَنْ ٢٦٩٨ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

[২৬৯৮] **অনুবাদ :** হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ নিষেধ করেছেন জীবের বিনিময়ে জীব বাকিতে বিক্রি করতে। -[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

وَعَنْ ٢٦٩٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الْاِبِلُ فَاَمَرَهُ اَنْ يَّاْخُذَ عَلٰى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَاْخُذُ الْبَعِيْرَ بِالْبَعِيْرَيْنِ اِلٰى اِبِلِ الصَّدَقَةِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৬৯৯. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাঁকে একটি অভিযানের সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করার আদেশ করেছিলেন। তা প্রস্তুত করতে [সরকারি ধনভাণ্ডার- বাইতুল মালে] প্রয়োজনীয় উটের অভাব হয়ে পড়ল। তখন নবী করীম ﷺ তাঁকে আদেশ করলেন [বাইতুল মালে] সদকার উট প্রাপ্তিসাপেক্ষে [জনসাধারণ হতে] উট ধার নেওয়ার। সে মতে তিনি সদকার উট সংগৃহীত হওয়া সাপেক্ষে এক একটি উট দু-দুটি উটের বিনিময়ে গ্রহণ করলেন। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ اِقْتِرَاضِ الْحَيَوَانِ **[পশু ঋণ গ্রহণের হুকুম] :** পশু ঋণ গ্রহণ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামত নিম্নরূপ-

১. مَذْهَبُ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ : জমহুরে ওলামায়ে কেরামের মতে, যাবতীয় প্রাণী বিনা শর্তে ঋণ গ্রহণ জায়েজ। তাঁদের দলিল হচ্ছে এ বাবের নিম্নোক্ত হাদীস-

* فَاَمَرَهُ اَنْ يَاْخُذَ عَلٰى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَاْخُذُ الْبَعِيْرَ بِالْبَعِيْرَيْنِ اِلٰى اِبِلِ الصَّدَقَةِ

২. مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَعُلَمَاءِ الْكُوْفَةِ : ইমাম আবূ হানীফা ও কূফার আলেমদের মতে, প্রাণীর ঋণ প্রদান ও গ্রহণ অবৈধ। তাঁদের দলিল হচ্ছে-

* ঋণ দেওয়া হয় এমন জিনিসের মধ্যে, যার অনুরূপ জিনিস আছে, প্রাণী ذَوَاتُ الْاَمْثَالِ -এর অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এর ঋণ প্রদান ও গ্রহণ বৈধ নয়।

* হাদীস- عَنْ سَمُرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً -

* হযরত ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণও প্রাণী ঋণ প্রদান ও গ্রহণ অবৈধ মনে করতেন।

اَلْجَوَابُ : তাঁদের দলিলের উত্তর নিম্নরূপ–

* এ হাদীস দ্বারা তাদের হাদীস মানসূখ হয়ে গেছে।

* আমাদের হাদীস হলো مُحَرِّمٌ আর তাদের হাদীস হলো مُبِيْحٌ আর উসূল হলো مُحَرِّمٌ আর مُبِيْحٌ হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিলে مُحَرِّمٌ প্রাধান্য লাভ করে।

* قَوْلِىْ আর فِعْلِىْ হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হলে قَوْلِىْ হাদীসই প্রাধান্য পায়। তাই আমাদের হাদীস গ্রহণীয় হবে। সুতরাং প্রাণী ঋণ গ্রহণ বৈধ হবে না।

শব্দ-বিশ্লেষণ : يُجَهِّزُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّجْهِيْزُ অর্থ– প্রস্তুত করা, ব্যবস্থা করা, সরবরাহ করা।

نَفِدَتْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাবে سَمِعَ মাসদার اَلنَّفَادُ . اَلنَّفَدُ অর্থ– ফুরিয়ে যাওয়া, নিঃশেষ হওয়া। যেমন কুরআনে রয়েছে– لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّىْ

قَلَائِصُ : এটি বহুবচন, একবচনে اَلْقَلُوْصُ অর্থ– [লম্বা পাবিশিষ্ট] উট।

اَلْبَعِيْرُ : এটি একবচন, বহুবচনে بِعْرَانٌ ، اَبْعِرَةٌ ، اَبَاعِرُ অর্থ– উট।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٧٠٠ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الرِّبٰوا فِى النَّسِيْئَةِ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ لَا رِبًوا فِيْمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭০০. **অনুবাদ** : হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন– শুধু বাকির কারণেও [অনেক ক্ষেত্রে] সুদ হয়। অপর এক বর্ণনায় আছে– নগদ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সুদ হয় না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلرِّبٰوا فِى النَّسِيْئَةِ **-এর ব্যাখ্যা** : 'বাকি লেনদেনের ক্ষেত্রে সুদ' হওয়ার অর্থ হলো সুদ এমন সব ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়, যাতে দুটি সমপরিমাণযোগ্য বস্তুর পারস্পরিক বিনিময় বাকিতে করা হয়। অর্থাৎ এক পক্ষ নগদ দিয়ে দেয় এবং অপর পক্ষ পরে দেওয়ার অঙ্গীকার করে। যদিও উভয় জিনিসই সত্তাগতভাবে বিভিন্ন হয় এবং সমান-সমান হয়। যেমন– কোনো ব্যক্তি কাউকে যব দিয়ে এর বিনিময়ে তার থেকে গম নেয়, তাহলে এ রকম লেনদেনের ক্ষেত্রে কম করাও জায়েজ হবে, তবে হাতে হাতে হতে হবে। যদি কোনো এক পক্ষ থেকেও বাকি হয়, তাহলে এ লেনদেন জায়েজ হবে না এবং তা সুদ হবে।

"যে লেনদেন হাতে হাতে হয়, তাতে সুদ হয় না"– কথাটির অর্থ হলো যদি এমন দুটি বস্তুর পারস্পরিক লেনদেন করা হয়, যা সত্তাগতভাবে এক এবং সমান-সমান এবং উভয়েই স্বীয় মাল ঐ বৈঠকেই কব্জা করে ফেলে, তাহলে তা জায়েজ হবে; সুদ হবে না। আর যদি তা সমজাতীয় না হয়, তাহলে হ্রাস-বৃদ্ধিতেও লেনদেন জায়েজ হবে; সুদ হবে না। তবে আদান-প্রদান হাতে হাতে হতে হবে।

وَعَنْ ٢٧٠١ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْظَلَةَ (رض) غَسِيْلِ الْمَلٰئِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِرْهَمُ رِبًوا يَاْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَّثَلٰثِيْنَ زَنْيَةً - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ وَقَالَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ فَالنَّارُ اَوْلٰى بِهٖ)

২৭০১. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা (রা.) হতে বর্ণিত, যিনি ফেরেশতাগণ কর্তৃক গোসলপ্রাপ্ত হযরত হানযালার পুত্র– তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– সুদের মাত্র একটি রৌপ্যমুদ্রাও যে ব্যক্তি জেনেশুনে খায়, তার গুনাহ ছত্রিশবার জেনা করা অপেক্ষা বেশি হয়। –[আহমদ, দারাকুতনী এবং বায়হাকী শোআবুল ঈমানে এ হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। এতে অতিরিক্ত এটাও আছে– রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তির দেহের গোশ্ত হারাম মালে গঠিত, তার জন্য দোজখই অধিক শ্রেয়।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"غَسِيْلُ الْمَلٰئِكَةِ" **-এর অর্থ :** অত্র হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ (রা.) একজন সাহাবী। তাঁর পিতা হানযালা (রা.)-ও একজন বিশিষ্ট সাহাবী, উক্ত হাদীসে যাঁর একটি অতি অস্বাভাবিক ঘটনার ইঙ্গিত উল্লেখ হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ তাঁকে গোসল দিয়েছেন। ঘটনার বিবরণ এই– ওহুদের যুদ্ধে যাওয়ার জন্য নবী করীম ﷺ মুসলমানগণকে আহ্বান করলেন। সেই আহ্বান হযরত হানযালা (রা.)-এর কর্ণে এমতাবস্থায় পৌঁছল যে, তিনি স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত ছিলেন। আহ্বান শুনার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে জেহাদের ময়দানে ছুটে গেলেন। তিনি যে নাপাক অবস্থায় আছেন– তাঁর উপর গোসল ফরজ রয়েছে, সেটাও তাঁর লক্ষ্যে থাকেনি। তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

সাধারণত শহীদকে গোসল না দিয়েই দাফন করা হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি তো নাপাক শরীরে শহীদ হয়েছেন, তাঁকে গোসল দেওয়া কর্তব্য; অথচ তাঁর এই অবস্থা যুদ্ধ ময়দানের কেউই জ্ঞাত নয়। সুতরাং গোসল ব্যতিরেকে দাফন হওয়ার আশঙ্কা ছিল, তাই ফেরেশতাগণ তাঁকে গোসল দিয়েছিলেন। এ কারণেই তাঁকে غَسِيْلُ الْمَلَائِكَةِ বলা হয়। –[মেরকাত খ. ৬, পৃ. ৬৭]

সুদের পাপ জেনা থেকে জঘন্য হওয়ার কারণ : ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, সুদ খাওয়ার গুনাহকে ব্যভিচারের চেয়ে জঘন্য বলার কারণ হলো– সুদখোর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা যত কঠোর শব্দ ব্যবহার করেছেন, তা জেনা ব্যতীত অন্যকোনো গুনাহ সম্পর্কে ব্যবহার করেননি। সুদখোর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন– فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

প্রতিটি বিবেকবান মানুষই জানে যে, কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণার অর্থ কি? তাছাড়া আল্লাহ ও রাসূল যার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন, তার বঞ্চনা, লাঞ্ছনা ও হতভাগ্যতার আর কি বাকি থাকতে পারে?

ওলামায়ে কেরাম আরো বলেছেন, সুদকে জেনার চেয়ে জঘন্য বলার আরেকটা কারণ হলো সুদের কারণে মানুষ আকিদাগত ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়। ফলে সে সুদ হারাম হওয়া সত্ত্বেও সেটাকে হালাল মনে করে, আর হারামকে হালাল মনে করার পরিণতি হলো কুফরি সমতুল্য, যা ক্ষমার অযোগ্য। এ কারণেই সুদকে জেনার চেয়ে জঘন্য বলা হয়েছে।

وَجْهُ الْعَدَدِ الْمَخْصُوْصِ **[নির্দিষ্ট সংখ্যা বলার কারণ] :** নির্দিষ্ট সংখ্যা ৩৬ বলার একটা কারণ হলো অপরাধের জঘন্যের আধিক্য বুঝানো। যেমন– আমরা কোনো ব্যাপারে বলে থাকি ১০০ বার তোমাকে আমি বলেছি, সর্বোপরি এর মূল হেতু আল্লাহর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। –[মেরকাত খ. ৬, পৃ. ৬৭]

শব্দ-বিশ্লেষণ : غَسِيْلٌ : এটি একবচন, বহুবচনে غُسَلٰى . غُسَلَاءُ যার مُؤَنَّث হচ্ছে غَسِيْلَةٌ **অর্থ–** গোসলকৃত।

وَعَنْ ٢٧٠٢ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرِّبَوا سَبْعُوْنَ جُزْءًا اَيْسَرُهَا اَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهٗ .

২৭০২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– সুদের গুনাহের সত্তরটি অংশ রয়েছে। এর ক্ষুদ্রতম অংশ এই পরিমাণ যে, কোনো ব্যক্তি যেন স্বীয় মায়ের সাথে সঙ্গম করে।

وَعَنْ ٢٧٠٣ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الرِّبَوا وَاِنْ كَثُرَ فَاِنَّ عَاقِبَتَهٗ تَصِيْرُ اِلٰى قُلٍّ . (رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَرَوٰى اَحْمَدُ الْاَخِيْرَ)

২৭০৩. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– সুদের দ্বারা সম্পদ বেশি হলেও পরিণামে অভাব আসবে। [উক্ত হাদীস দুটি রেওয়ায়েত করেছেন ইবনে মাজাহ এবং বায়হাকী শোআবুল ঈমানে, আর ইমাম আহমদ রেওয়ায়েত করেছেন শেষের হাদীসটি।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : সুদের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ বাহ্যত অধিক অনুভূত হয়। কিন্তু যেহেতু কল্যাণের কোনো অংশই তাতে বিদ্যমান থাকে না, তাই এর পরিণতিতে সেই মাল এমনভাবে ধ্বংস ও বিনাশ সাধিত হয় যে, তার নাম-চিহ্নও অবশিষ্ট থাকে না। এ কথাটি শুধুমাত্র একটি সতর্কবাণীই নয়; বরং এর বাস্তবতা দিবালোকের ন্যায় সত্যে পরিণত হয়ে পড়েছে। এ বাস্তবতাকে কুরআন কারীম স্পষ্ট করে দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ অর্থাৎ যে সম্পদ সুদের দ্বারা অর্জন করা হয়, আল্লাহ তা'আলা সেটাকে ধ্বংস করে দেন। পক্ষান্তরে যে সম্পদ নিজের পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জিত হয়, তা হতে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে; আল্লাহ তা'আলা তাকে বৃদ্ধি করে দেন। এ আয়াতে সুদ ও সদকাকে একত্রে উল্লেখ করে এ কথাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, উভয়টার তাৎপর্য ও ফলাফল বিপরীতধর্মী। মুফাসসিরগণ লিখেছেন যে, সুদকে বিনাশ করা ও সদকাকে বৃদ্ধি করা– এটি পরকাল সম্পর্কিত ব্যাপার। অর্থাৎ সুদখোরকে তার সম্পদ পরকালে কোনোই উপকার করবে না; বরং শাস্তি বৃদ্ধি করবে। পক্ষান্তরে সদকা দানকারী ব্যক্তির সম্পদ পরকালে তার চিরস্থায়ী শান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া এর ফলাফল দুনিয়ার বেলায়ও প্রযোজ্য। যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য সুদকে চিরদিনের জন্য পরিহার করা সকলের জন্যই অপরিহার্য।

وَعَنْ ٢٧٠٤ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ عَلٰى قَوْمٍ بُطُوْنُهُمْ كَالْبُيُوْتِ فِيْهَا الْحَيَّاتُ تُرٰى مِنْ خَارِجِ بُطُوْنِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرَئِيْلُ قَالَ هٰؤُلَاءِ اٰكِلَةُ الرِّبَوا . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৭০৪ অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মে'রাজের রাতে আমি এমন একশ্রেণির লোকের নিকট পৌঁছলাম, যাদের পেট ঘরের ন্যায় বড়। এর ভিতরে বহু সাপ রয়েছে, যা তাদের পেটের বাহির থেকে দেখা যায়। আমি [আমার সঙ্গীকে] জিজ্ঞাসা করলাম– হে জিবরাঈল! ওরা কারা? তিনি বললেন, ওরা সুদখোর। –[আহমদ ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٢٧٠٥ عَلِيٍّ (رضـ) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهٰى عَنِ النَّوْحِ . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

২৭০৫. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অভিশাপ করতে শুনেছেন– সুদখোরের প্রতি এবং সুদ প্রদানকারীর প্রতি এবং সুদের ঋণপত্র লেখকের প্রতি। আরও অভিশাপ করেছেন দান-খয়রাতে বাধা দানকারীর প্রতি। আর তিনি নিষেধ করতেন মৃতের জন্য বিলাপ করে কাঁদা হতে। —[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنٰى مَانِعِ الصَّدَقَةِ : "সদকা হতে বারণকারী" কথাটির দুটি অর্থ হতে পারে– ১. দান-সদকা করা হতে অন্যকে বাধা দানকারী। এ ধরনের ব্যক্তির উপর লানত করা হয়েছে। ২. অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফরজ জাকাত আদায় না করা।

[وَكَانَ يَنْهٰى عَنِ النَّوْحِ -এর মর্মার্থ] : মৃত ব্যক্তির বিভিন্ন গুণাবলি উচ্চারণ করে চিৎকার করে বিলাপ করাকে نَوْحَةٌ বলা হয়। যেহেতু এটি একটি অহেতুক ও অশোভনীয় কাজ, তাই তা হতে নিষেধ করা হয়েছে ।

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَسْرٰى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِى مُطْلَقْ مَجْهُوْل বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْرَاءُ অর্থ– রাত্রিকালীন ভ্রমণ।

اَلْحَيَّاتُ : এটি বহুবচন, একবচনে حَيَّةٌ অর্থ– সাপ।

اَلنَّوْحُ : মাসদার, বাবে نَصَرَ অর্থ– বিলাপ করে কাঁদা।

وَعَنْ ٢٧٠٦ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) اَنَّ اٰخِرَ مَا نَزَلَتْ اٰيَةُ الرِّبٰوا وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا فَدَعُوا الرِّبٰوا وَالرِّيْبَةَ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

২৭০৬. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত আছে, সুদ হারাম হওয়ার আয়াতই [কুরআন শরীফের] শেষ আয়াত। [অর্থাৎ কুরআন শরীফে সুদ হারাম ঘোষিত হওয়ার পরে এতে আর কোনো পরিবর্তন হয়নি।] এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তিরোধান হয়ে গিয়েছে, অথচ সুদের [অসংখ্য শাখা-প্রশাখার] পূর্ণ বিবরণ তিনি আমাদের সম্মুখে রেখে যাননি। সুতরাং কুরআন সুন্নায় বর্ণিত সুদ এবং যে যে ক্ষেত্রে সুদের কোনো প্রকার সন্দেহ হয়, তাও বর্জন করবে। —[ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সর্বশেষ আয়াত কোনটি? ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ الخ এ আয়াতটি কুরআন শরীফের সর্বশেষ নাজিলকৃত আয়াত। কিন্তু এ হাদীসে বলা হয়েছে رِبَا বা সুদ সম্পর্কিত يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا আয়াত সর্বশেষে নাজিল হয়েছে। এর অর্থ হলো লেনদেন সম্পর্কিত সর্বশেষ আয়াত হলো সুদ সম্পর্কিত আয়াত। আর সাধারণভাবে সর্বশেষ আয়াত হলো وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ الخ আয়াতটি। তাহলে আর কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না।

"وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا" **বাক্যটির ব্যাখ্যা :** হযরত ওমর (রা.)-এর উক্তি "রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সম্মুখে বিশ্লেষণ করে যাননি" কথাটির মর্মার্থ হলো কুরআনে যে সুদের নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা হলো বিশেষ ধরনের সুদ অর্থাৎ ঋণ দিয়ে তা হতে মুনাফা নেওয়া। আরবি ভাষায় رِبَا দ্বারা এ প্রকারকে বুঝানো হয় এবং رِبَا বললে এ প্রকার সুদের কথা বুঝতে কারো কোনো

প্রকার বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু যখন হুজুর ﷺ ওহীর মাধ্যমে অবগত হয়ে ربا -এর অর্থে আরো ব্যাপকতা সৃষ্টি করে কতিপয় বিষয় সংযোজন করেন, যা আরবদের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল না এবং তাদের প্রচলিত সুদের অতিরিক্ত বিষয় ছিল এবং দুর্ভাগ্যক্রমে হুজুর ﷺ সে বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ করার পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করেন। এ কারণেই হযরত ওমর (রা.) সে বিষয়গুলোর সমাধান দিতে সাময়িকভাবে কিছুটা সমস্যায় পড়েন। পরবর্তীতে তিনি ইজতেহাদের মাধ্যমে সতর্কতা অবলম্বন করত বলেন– সুদের যে সমস্ত বিষয়াবলি সুস্পষ্ট যেমন– প্রচলিত সুদ ও বস্তুর পারস্পরিক লেনদেনের যে বিষয়গুলো হুজুর ﷺ নিষেধ করেছেন, তোমরা সেগুলোকে পূর্ণভাবে বর্জন কর। আর যে বিষয়গুলোতে সুদের লেশমাত্র সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তাকওয়া ও সতর্কতাবশত সেগুলোও বর্জন কর।

وَعَنْ ٢٧٠٧ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَقْرَضَ اَحَدُكُمْ قَرْضًا فَاَهْدٰى اِلَيْهِ اَوْ حَمَلَهٗ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهُ وَلَا يَقْبَلْهَا اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ جَرٰى بَيْنَهٗ وَبَيْنَهٗ قَبْلَ ذٰلِكَ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

২৭০৭. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের কেউ যদি কোনো ব্যক্তিকে ঋণ দেয়, অতঃপর ঋণগ্রহীতা যদি দাতাকে কোনো হাদিয়া বা উপহার দেয়, তবে তা গ্রহণ করবে না। অথবা যদি ঋণগ্রহীতা তার যানবাহনের উপর ঋণদাতাকে বসাতে চায়, তবে এর উপর বসবে না। অবশ্য যদি ঋণ নেওয়ার পূর্ব হতে তাদের মধ্যে ঐরূপ ব্যবহার প্রচলিত থাকে, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। –[ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী : শোআবুল ঈমান]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** আলোচ্য হাদীসে ঋণদাতা তার ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে উপহার বা উপঢৌকন হিসেবে কোনো জিনিস গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো এমতাবস্থায় তা সুদ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, ঋণদাতা ঋণের মাধ্যমে যা কিছুই মুনাফা অর্জন করুক না কেন, তাই সুদ হিসেবে গণ্য হবে। তবে যদি পূর্ব থেকেই তাদের মধ্যে হাদিয়া লেনদেনের প্রচলন থাকে, তাহলে তা ভিন্ন কথা। সেক্ষেত্রে অবশ্য তা সুদের আওতাভুক্ত হবে না এবং তা গ্রহণ করাও বৈধ হবে।

বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এক ব্যক্তিকে কিছু ঋণ দিয়েছিলেন। একদিন তিনি তার তাগাদায় তার বাড়িতে যান। তখন ছিল তীব্র গরমের সময়। তিনি ভাবলেন ঋণগ্রহীতা ঘর থেকে বের হওয়া পর্যন্ত তার বাড়ির দেয়ালের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকি। সাথে সাথেই তিনি চিন্তা করলেন যদিও শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এ কাজ নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু তাকওয়া ও আল্লাহভীতির চাহিদা হলো যে আমি দেয়ালের ছায়া থেকেও উপকৃত হবো না। অতঃপর ঋণগ্রহীতা অনেক বিলম্বে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, আর ইমাম সাহেব ততক্ষণ প্রচণ্ড গরমের মধ্যেই রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকেন। এ হলো তাঁর তাকওয়ার দৃষ্টান্ত।
—[মিরকাত খ. ৬, পৃ. ৬৯, তা'লীক খ. ৩. পৃ. ৩১২]

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَقْرَضَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাবে اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِقْرَاضْ অর্থ– ঋণ দেওয়া।

اَهْدٰى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাবে افعال মাসদার اَلْاِهْدَاءُ অর্থ– উপঢৌকন দেওয়া, হাদিয়া দেওয়া।

وَعَنْهُ ٢٧٠٨ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَقْرَضَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَا يَاْخُذْ هَدِيَّةً - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِىْ تَارِيْخِهٖ هٰكَذَا فِى الْمُنْتَقٰى)

২৭০৮. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন– এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ঋণ দিলে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট হতে কোনো উপহার বা হাদিয়া গ্রহণ করবে না। –[বুখারী]

وَعَنْ ٢٧٠٩ أَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ أَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلَامٍ فَقَالَ اِنَّكَ بِأَرْضٍ فِيْهَا الرِّبٰوا فَاشٍ فَاِذَا كَانَ لَكَ عَلٰى رَجُلٍ حَقٌّ فَاَهْدٰى اِلَيْكَ حَمْلَ تِبْنٍ اَوْ حَمْلَ شَعِيْرٍ اَوْ حَبْلَ قَتٍّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَاِنَّهُ رِبٰوا - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৭০৯. **অনুবাদ :** তাবেয়ী হযরত আবূ বুরদা ইবনে আবূ মুসা (র.) বলেন, একবার আমি মদিনায় এসে সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি এমন এলাকায় বাস কর যেখানে সুদের প্রচলন অনেক বেশি। অতএব, কারো উপর যদি তোমার কোনো প্রাপ্য থাকে, সে যদি তোমাকে এক বোঝা খড়, এক গাঁটরি যব বা ঘাসের একটি বোঝাও উপঢৌকন দেয়, তবে তা গ্রহণ করো না; কেননা তা সুদ হিসেবে বিবেচিত হবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ওলামায়ে কেরাম বলেন যে, كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا অর্থাৎ যে ঋণ এর বিনিময়ে মুনাফা অর্জন করা হয়, তাই সুদ। এ মূলনীতির ভিত্তিতে যে কোনো ঋণের বিনিময়ে কোনো শর্তযুক্ত করা হয়, তাও সুদ হবে। তদ্রূপভাবে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতা হতে যে কোনো ধরনের উপকৃত হোক না কেন তা সুদ হবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ : تِبْنٌ : এটি একবচন, বহুবচনে تُبُوْنٌ ـ اَتْبَانٌ অর্থ– খড় বা ভুসি।

حَبْلٌ : এটি একবচন, বহুবচনে اَحْبَالٌ শব্দটি এখানে মাসদার اِسْمُ مَفْعُوْل-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। أَىْ مَشْدُوْدٌ بِالْحَبْلِ অর্থাৎ রশি দ্বারা যা বাঁধা হয়েছে।

قَتٌّ : তৃণবিশেষ। - أَىْ نَبْتٌ مَعْرُوْفٌ مِنْ اَشْرَفِ مَا يَاْكُلُهُ الدَّوَابُّ يُسَمّٰى الرُّطْبَةُ

بَابُ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْبُيُوْعِ
পরিচ্ছেদ : নিষিদ্ধ শ্রেণির ক্রয়বিক্রয়

ইসলামি শরিয়ত ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত কিছু লেনদেন সম্পর্কে নিষেধ করেছে। আবার কিছু জিনিস এমন আছে যার ক্রয়বিক্রয় শরিয়তে নিষিদ্ধ।

হানাফী মাযহাবের মূলনীতি হিসেবে নিষিদ্ধ শ্রেণির بَيْع দু প্রকার– ১. بَيْع فَاسِدْ ২. بَيْع بَاطِلْ

بَيْع فَاسِدْ : যে ক্রয়বিক্রয় ও লেনদেন بَيْع -এর মূলনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক হয় কিন্তু তা صَحِيْح হওয়ার শর্তাবলি থেকে কোনোটি বিদ্যমান না থাকার কারণে তা বৈধ থাকে না। এজন্য এরকম লেনদেন ভঙ্গ করে দেওয়াই অপরিহার্য। ফকীহদের পরিভাষায় একে "مَشْرُوْعٌ بِنَفْسِهٖ وَمَمْنُوْعٌ بِوَصْفِهٖ" বলা হয়।

بَيْع بَاطِلْ : এমন ক্রয়বিক্রয় ও লেনদেনকে বলা হয় শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে যার কোনোই গ্রহণযোগ্যতা নেই। أُصُوْلْ بَيْع তথা মূলনীতি এবং শর্ত ও গুণাবলি কোনো দিক থেকেই তা বৈধ হয় না। এরূপ بَيْعْ -কে بَيْع فَاسِدْ বলা হয়।

[اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ] بَيْع بَاطِلْ ও بَيْع فَاسِدْ -এর মাঝে পার্থক্য] : بَيْع بَاطِلْ -এর মধ্যে পার্থক্য হলো بَيْع بَاطِلْ -এর মধ্যে مَبِيْع বা পণ্য শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রেতার মালিকানায় কোনোভাবেই আসতে পারে না। কিন্তু بَيْع فَاسِدْ -এর মধ্যে কব্জা করার পূর্বে بَيْع বা পণ্যের কোনো ধর্তব্য নেই, তবে কব্জা করার পর হারাম পন্থায় ক্রেতার মালিকানা এসে যায় এবং মূল্য পরিশোধ করা অপরিহার্য হয়। এতদসত্ত্বেও সে بَيْعْ -কে ভঙ্গ করা ওয়াজিব।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٧١٠ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ اَنْ يَّبِيْعَ ثَمَرَ حَائِطِهٖ اِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا وَاِنْ كَانَ كَرْمًا اَنْ يَّبِيْعَهٗ بِزَبِيْبٍ كَيْلًا اَوْ كَانَ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ وَاِنْ كَانَ زَرْعًا اَنْ يَّبِيْعَهٗ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهٰى عَنْ ذٰلِكَ كُلِّهٖ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لَّهُمَا نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ قَالَ وَالْمُزَابَنَةُ اَنْ يُّبَاعَ مَا فِىْ رُءُوْسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى اِنْ زَادَ فَلِىْ وَاِنْ نَقَصَ فَعَلَىَّ -

২৭১০. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযাবানা ধরনের ক্রয়বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হলো, বাগানের মধ্যে রেখে ফল বিক্রি করা। কর্তিত খেজুরের বিনিময়ে অনুমান করে। আর যদি আঙ্গুর হয়, কিশমিশের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রি করা। অথবা যদি ক্ষেতের শস্য হয়, [বুখারী শরীফের রেওয়ায়েতে اَوْ كَانَ আর মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে وَاِنْ كَانَ শব্দের উল্লেখ রয়েছে] তা খাদ্যের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রি করা। উক্ত সব ধরনের বিক্রি থেকে তিনি নিষেধ করেছেন। —[বুখারী ও মুসলিম] উভয়ের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযাবানা থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, মুযাবানা হলো গাছের মাথায় খেজুর রেখে, কর্তিত খেজুরের বিনিময়ে অনুমান করে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিক্রি করা, যদি তা এর থেকে বেশি হয়, তাহলে তা আমার [বিক্রেতার]। আর যদি তা এর থেকে কম হয়, তাহলে তা আমার, [অর্থাৎ বিক্রেতার। এর লাভ ক্ষতি আমারই হবে]।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُزَابَنَةُ-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْمُزَابَنَةُ শব্দটি বাবে مُفَاعَلَةٌ-এর মাসদার, زَبْنٌ মূলধাতু থেকে নির্গত হয়েছে। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– اَلدَّفْعُ الشَّدِيْدُ বা কঠোরভাবে প্রতিহত করা। যেমন বলা হয়–

اَلْمُزَابَنَةُ مَاخُوْذٌ مِنَ الزَّبْنِ وَهُوَ الدَّفْعُ الشَّدِيْدُ - كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ يَدْفَعُ الْاٰخَرَ مِنْ حَقِّهِ -

শব্দটির প্রয়োগ পবিত্র কুরআনে রয়েছে। যেমন– سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا

اَلْمُزَابَنَةُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : بَيْعُ الْمُزَابَنَةِ-এর সংজ্ঞায় ইমামগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যেমন–

১. হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন– اَلْمُزَابَنَةُ بَيْعُ التَّمْرِ فِيْ رُءُوْسِ النَّخْلِ مُسَمًّى اِنْ زَادَ فَلِيْ وَاِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ অর্থাৎ গাছে থাকা খেজুরকে কর্তিত খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা। এভাবে যে, যদি বেশি হয়, তাহলে আমি পাব, আর কম হলে তা আমি দিয়ে দেব।

২. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন– هُوَ بَيْعُ الْمَجْهُوْلِ بِالْمَجْهُوْلِ অর্থাৎ অজ্ঞাত বস্তুর বিনিময়ে অজ্ঞাত বস্তু বিক্রি করাকে بَيْعُ مُزَابَنَةٌ বলা হয়।

৩. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন– "هُوَ بَيْعُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ" অর্থাৎ গাছে অবস্থিত কাঁচা খেজুরকে পূর্বে কাটা সংরক্ষিত শুকনা খেজুরের বিনিময়ে অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রি করাকে মুযাবানাহ বলা হয়।

৪. ইমাম মালেক (র.) বলেন– هُوَ مَا لَا يُعْلَمُ كَيْلًا اَوْ عَدَدًا اَوْ وَزْنًا بِمَعْلُوْمِ الْمِقْدَارِ অর্থাৎ যাতে বস্তুর পরিমাপ, সংখ্যা ও ওজন অজ্ঞাত থাকে, তাকে بَيْعُ مُزَابَنَةٍ বলা হয়।

اَلْمُزَابَنَةُ-এর হুকুম : সকল ইমামের ঐকমত্যে গাছের উপরে থাকা খেজুরের বিনিময়ে ঘরে সংরক্ষিত থাকা খেজুরকে বিক্রয় করা হারাম।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ -

* তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, কাটা খেজুর ও শুকনা খেজুর উভয়টি কর্তিত হলেও সাদৃশ্য বজায় থাকলে একটির বিনিময়ে অন্যটি বিক্রি করা জায়েজ হবে। তবে জমহুরের মতে এ অবস্থাতেও জায়েজ নেই।

وَعَنْ ٢٧١١ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. وَالْمُحَاقَلَةُ اَنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرْقٍ حِنْطَةٍ وَالْمُزَابَنَةُ اَنْ يَبِيْعَ التَّمْرَ فِيْ رُءُوْسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرْقٍ وَالْمُخَابَرَةُ كِرَاءُ الْاَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৭১১. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন– 'মুখাবারা', 'মুহাকালা' এবং 'মুযাবানা' হতে। মুহাকালা হলো কোনো ব্যক্তি ক্ষেতের শস্যকে বিক্রি করা একশ ফরক [বিশ মন প্রায়] গমের বিনিময়ে। মুযাবানা হলো খেজুর গাছের মাথায় যে খেজুর রয়েছে, তা কর্তিত একশ ফরক [বিশ মন প্রায়] খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা। মুখাবারা হলো এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ শস্যের বিনিময়ে জমি ইজারা দেওয়া। [অর্থাৎ ক্ষেত বর্গা দেওয়া।] –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বি. দ্র. فَرْقٌ : এমন একটা পরিমাপযোগ্য পাত্রের নাম যাতে আনুমানিক ৭ সের শস্য সংকুলান হয়। فُرْقٌ : এমন একটা মাপার পাত্র যাতে ১২০ রিতল শস্য সংকুলান হয়।

كِرَاءٌ : এটি একবচন, বহুবচনে اَكْرِيَةٌ অর্থ– ভাড়া, বর্গা।

اَلْمُحَاقَلَةُ-এর আভিধানিক অর্থ : এটি বাবে مُفَاعَلَةٌ-এর মাসদার, যা حَقْلٌ মূলধাতু হতে مُشْتَقٌ হয়েছে। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– সবুজ শস্য বা শস্যক্ষেত্র।

☐ মেরকাত গ্রন্থকার বলেন– وَهِيَ الطَّيِّبَةُ التُّرْبَةُ الْخَالِصَةُ مِنْ شُرْبِ السَّبْخِ الصَّالِحَةِ لِلْاَرْضِ

اَلْمُحَاقَلَةُ-এর শরয়ী অর্থ : শরিয়তের পরিভাষায় مُحَاقَلَةٌ হচ্ছে কোনো ফসল খোসার মধ্যে থাকা অবস্থায় সেটাকে ছড়ানো গমের বিনিময়ে ক্রয়বিক্রয় করা।

ㄱ কেউ বলেছেন– هِيَ بَيْعُ حِنْطَةٍ مَعَ سُنْبُلِهَا بِحِنْطَةٍ مِثْلِ كَيْلِهَا تَقْدِيْرًا

ㄱ কেউ কেউ বলেছেন– اَلْمُحَاقَلَةُ اَلْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ اَوْ بِالرُّبُعِ

অর্থাৎ ফসলের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ পাওয়ার বিনিময়ে জমি চাষাবাদ করাকে مُحَاقَلَةٌ বলে।

حُكْمُ الْمُحَاقَلَةِ **[মুহাকালার হুকুম] :** প্রথম সংজ্ঞানুযায়ী জমহুরের নিকট মুহাকালাহ হারাম। আর শেষ সংজ্ঞানুযায়ী এর حُكْم সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। সাহেবাইনের মতে জায়েজ, আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে জায়েজ নয়।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ **[মুযাবানা ও মুহাকালার মাঝে পার্থক্য] :** সাধারণত মুযাবানা হয় খেজুরের মধ্যে আর মুহাকালাহ হয় গম ও ধান ইত্যাদির মধ্যে।

وَعَنْهُ ٢٧١٢ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِى الْعَرَايَا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৭১২. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন মুহাকালা, মুযাবানা, মুখাবারা ও মুআওয়ামা হতে এবং নিষেধ করেছেন [অনির্দিষ্টরূপে] কিছু অংশ বাদ দেওয়া হতে। আর عَرَايَا-কে জায়েজ করেছেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُخَابَرَةُ-এর আভিধানিক অর্থ : مُخَابَرَةٌ শব্দটি বাবে مُفَاعَلَةٌ-এর মাসদার। خَبَرٌ মূলধাতু থেকে নির্গত, আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– ১. مُكَالَمَةٌ বা পরস্পর কথাবার্তা বলা। ২. সংবাদ জিজ্ঞাসা করা। ৩. জমি বর্গা দেওয়া।

ㄱ শব্দটির উৎসস্থল সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন–

১. জমহুরের মতে এটি اَلْخَبْرُ মূলধাতু থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ اَلْفِلَاحَةُ বা কৃষিকাজ।

২. ইবনুল আরাবী বলেন, শব্দটি خَيْبَرٌ থেকে নির্গত হয়েছে। কেননা, خَيْبَر-এর মধ্যেই এর শুভ সূচনা হয়।

৩. কারো কারো মতে, هِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْخِبَارِ وَهِيَ الْاَرْضُ اللَّيِّنَةُ অর্থাৎ خِبَارٌ থেকে নির্গত, যার অর্থ হলো– নরম জমি।

اَلْمُخَابَرَةُ-এর পারিভাষিক অর্থ : শরিয়তের পরিভাষায় مُخَابَرَةٌ বলা হয়–

هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ فِى الزَّرْعِ بِجُزْءٍ خَارِجٍ مِنَ الْاَرْضِ كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ -

অর্থাৎ জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট এক অংশের বিনিময়ে জমি বর্গা দেওয়ার চুক্তিকে مُخَابَرَةٌ বলা হয়।

حُكْمُ الْمُخَابَرَةِ **[মুখাবারার হুকুম] :**

১. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মুখাবারা জায়েজ নয়। তবে مُسَاقَاةٌ তথা বাগানের অধীনে জায়েজ। কেননা, রাসূল ﷺ খায়বারের জমি ও খেজুর গাছ একসাথে বর্গা দিয়েছেন।

২. ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম যুফার (র.)-এর মতে, এটা নাজায়েজ। তাঁদের দলিল হচ্ছে নিম্নরূপ–

* مَنْ كَانَتْ لَهٗ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَاِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا اَخَاهُ فَاِنْ لَمْ يَمْنَحْ اَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهُ .
* عَنْ جَابِرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ - وَالْمُخَابَرَةُ قِسْمٌ مِنَ الْكِرَايَةِ .

৩. ইমাম আহমদ ও সাহেবাইনের মতে বিনা শর্তে مُخَابَرَةٌ জায়েজ। তাঁদের দলিল–

* اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ .

বি. দ্র. বর্তমানে সাহেবাইনের রায়ের উপরই ফতোয়া।

সাহেবাইনের পক্ষ থেকে অন্যান্য ইমামের দলিলের জওয়াব :

* ইমাম আবূ হানীফা (র.) যে হাদীসটি পেশ করেছেন, তাতে نَهْيٌ দ্বারা مَكْرُوْهٌ تَنْزِيْهِيٌّ উদ্দেশ্য।
* অথবা বলা যায় যে, হাদীসে نَهْيٌ দ্বারা বিশেষ একপ্রকার ইজারাকে নিষেধ করা হয়েছে। তা হচ্ছে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ফসলের বিনিময়ে ইজারা দেওয়া।
* অথবা বলা যায় যে, মুখাবারাহ নিষেধ করার উদ্দেশ্য হলো تَرْغِيْبًا عَلَى الْمَنِيْحَةِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ نَفْسِ الْمُخَابَرَةِ অর্থাৎ গরিবদেরকে জমি দান করতে উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে مُخَابَرَةٌ নিষেধ করেছেন।

اَلْمُعَاوَمَةُ-এর আভিধানিক অর্থ : مُعَاوَمَةٌ শব্দটি عَامٌ শব্দ থেকে নির্গত বাবে مُفَاعَلَةٌ-এর মাসদার। অর্থ– বৎসর, বৎসরভিত্তিক চুক্তি।

اَلْمُعَاوَمَةُ-এর পারিভাষিক অর্থ : هِيَ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ اَوِ الشَّجَرِ سَنَتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا فَصَاعِدًا قَبْلَ اَنْ تَظْهَرَ ثِمَارُهُ .
অর্থাৎ বৃক্ষের ফল প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে এক বৎসর, দুই বৎসর বা ততোধিক বৎসরের জন্য বিক্রয় করা।

بَيْعُ الْمُعَاوَمَةِ-এর হুকুম : এ ধরনের ক্রয়বিক্রয় ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে অবৈধ। কেননা, এতে প্রতারণার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তা এমন জিনিসের বেচাকেনা, যা এখনো অস্তিত্বেই আসেনি। মেরকাত গ্রন্থকার বলেন–

وَهٰذَا الْبَيْعُ بَاطِلٌ لِاَنَّهُ بَيْعُ مَا لَمْ يَخْلُقْ فَهُوَ كَبَيْعِ الْوَلَدِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ . —[মেরকাত ৬, পৃ. ৭১]

اَلثُّنْيَا-এর আভিধানিক অর্থ : ثُنْيَا শব্দটি دُنْيَا-এর ওজনে اِسْتِثْنَاءٌ থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ হলো– ব্যতিক্রম, বাদ রাখা।

اَلثُّنْيَا-এর আভিধানিক অর্থ : بَيْعُ ثُنْيَا-এর পারিভাষিক অর্থ হলো–

اَنْ يَبِيْعَ ثَمَرَ حَائِطٍ وَيَسْتَثْنِىْ مِنْهُ جُزْأً غَيْرَ مَعْلُوْمِ الْقَدْرِ .

অর্থাৎ বৃক্ষের ফল বিক্রি করা এবং তাতে অনির্দিষ্ট অংশকে বাদ রাখা। যেমন কেউ বলল, আমি এ গাছের ফল বিক্রয় করলাম, কিন্তু তা থেকে যে কোনো ১০টি ফল বাদ থাকবে।

بَيْعُ الثُّنْيَا-এর হুকুম : যদি বাদ দেওয়া বস্তুটি অনির্দিষ্ট হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে এ بَيْعٌ বাতিল হবে। আর যদি নির্দিষ্ট হয়, তবে بَيْعٌ সঠিক হবে। যেমন কেউ বলল– بِعْتُكَ هٰذِهِ الصُّبْرَةَ اِلَّا نِصْفَهَا অর্থাৎ আমি এ স্তূপটি বিক্রয় করলাম, কিন্তু তা হতে অর্ধেক থাকবে। যেহেতু হাদীসে রয়েছে– نَهٰى عَنِ الثُّنْيَا اِلَّا اَنْ تَعْلَمَ

اَلْعَرَايَا-এর আভিধানিক অর্থ : عَرَايَا শব্দটি عَرِيَّةٌ-এর বহুবচন, আভিধানিক অর্থ–

১. বৃক্ষ হতে আহরণকৃত খেজুর। ২. দানকৃত খেজুর। ৩. উপহার।

اَلْعَرَايَا-এর পারিভাষিক অর্থ : بَيْعُ الْعَرَايَا-এর সংজ্ঞা নিয়ে আলেমগণের মতানৈক্য রয়েছে–

১. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন– بَيْعُ الْعَرَايَا হলো হুজুর ﷺ -এর যুগে কিছু দরিদ্র লোক ছিল। তাদের নিকট কোনো টাকাপয়সা ছিল না। কিন্তু তাদের তাজা খোরমা খাওয়ার ইচ্ছা হতো। খেজুরের মৌসুমে তারা হুজুরের নিকট এ অভিযোগ জানালে হুজুর ﷺ তাদেরকে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে অনুমান করে তাজা খেজুর ক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন।
২. ইমাম মালেক (র.)-এর এ ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে, কারো বাগানে অন্য এক ব্যক্তির শুধুমাত্র দু-একটি খেজুর গাছ থাকে। আর মদিনাবাসীর অভ্যাস হলো তারা খেজুরের মৌসুমে সপরিবারে বাগানে চলে যায়। সুতরাং এক দুটি বৃক্ষের মালিকের ঐ বাগানে যাতায়াতের ফলে বাগানের মূল মালিকের সমস্যা হতো। তাই বাগানের মালিক ঐ ব্যক্তিকে বলত, তোমার গাছে যত পরিমাণ তাজা খেজুর আছে, তার বিনিময়ে আমার থেকে অনুমান করে ঐ পরিমাণ শুকনো খেজুর নিয়ে যাও।
৩. ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মালেক (র.)-এর দ্বিতীয় অভিমত হলো- اَلْعَرِيَّةُ اِسْمٌ لِعَطِيَّةِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ عَلٰى عَادَةِ الْعَرَبِ অর্থাৎ আরবদের প্রথা অনুযায়ী খেজুর বৃক্ষ দান করা। সুতরাং মৌসুমে যাদের তাজা খোরমা না থাকত, তাদেরকে বিত্তশালীরা দু-একটি বৃক্ষের তাজা খেজুর هِبَةٌ স্বরূপ দান করত। যখন مَوْهُوْبٌ لَهُ [যাকে দান করেছে সে] ঐ বাগানে আসা-যাওয়া করত, তখন দানকারীর সমস্যা হতো। তাই সে ওয়াদা ভঙ্গের হাত থেকে রক্ষার জন্য তাজা খোরমার পরিবর্তে শুকনো খোরমা দিয়ে দিত। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফার নিকট عَرَايَا হলো هِبَةٌ আর অন্যান্যদের নিকট তা হলো بَيْعٌ-
৪. ইমাম আহমদের নিকট عَرَايَا হলো, এক ব্যক্তিকে কোনো একটি বৃক্ষের খেজুর দান করার পর এ ব্যক্তি ঐ ফলগুলোকে দানকারী ব্যতীত অন্যের নিকট বিক্রয় করা।

اَلْعَرِيَّةُ কি ক্রয়বিক্রয় নাকি দান? ائمة ثلاثة -এর মতে عَرَايَا হলো بَيْع আর ইমাম আবূ হানীফার মতে তা হলো هِبَة বা দান। **بَيْعُ الْعَرَايَا -এর হুকুম :** ইমাম শাফেয়ীর মতে, খেজুরের পরিমাণ ৫ ওসাক হলে بَيْعُ الْعَرَايَا জায়েজ। এর অধিক হলে জায়েজ নয়। ইমাম মালেকের মতে ৫ ওসাক এর বেশি হলেও জায়েজ। আর ইমাম আহমদের মতে ৫ ওসাকের কম হলেও জায়েজ।

وَعَنْ ٢٧١٣ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ التَّمَرِ بِالتَّمَرِ اِلَّا اَنَّهُ رَخَّصَ فِى الْعَرِيَّةِ اَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَاْكُلُهَا اَهْلُهَا رُطَبًا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭১৩. অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে আবূ হাসমা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন– তৈরি বা প্রস্তুত খোরমার বিনিময়ে [গাছে অবস্থিত] খেজুর বিক্রি করা থেকে। অবশ্য আরিয়্যার অনুমতি দিয়েছেন। আরিয়্যা বলে ফলকে অনুমান করে বিক্রি করা– সেই অনুমান অনুসারে খোরমা দেবে। আরিয়্যার ফলে ক্রেতা তা পাকা ও তাজা অবস্থায় খাবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দ-বিশ্লেষণ : خَرْصٌ এটি বাবে نَصَرَ -এর মাসদার। অর্থ– অনুমান করা।

وَعَنْ ٢٧١٤ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرْخَصَ فِىْ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِىْ مَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ اَوْ فِىْ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ شَكَّ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭১৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমতি দিয়েছেন আরিয়্যা জাতীয় ক্রয়বিক্রয়ে– এর ফলের অনুমানে খোরমার বিনিময়ে, যা সাধারণত পাঁচ ওসাকের কমের মধ্যে হয়ে থাকে; অথবা পাঁচ ওসাকের মধ্যে হয়ে থাকে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ -এর ব্যাখ্যা : পাঁচ ওসাকের শর্ত এজন্য আরোপ করা হয়েছে যে, এ ধরনের অনুমতির সম্পর্ক হলো মানুষের প্রয়োজনের সাথে। আর প্রয়োজন সাধারণত পাঁচ ওসাকের কমেই পূরণ হয়ে যায়। সুতরাং بَيْعُ الْعَرَايَا পাঁচ ওসাকের কমে জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। পাঁচ ওসাকের অধিক কারো মতেই জায়েজ নয়। আর পূর্ণ পাঁচ ওসাকে জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। তবে না হওয়ার মতটাই অধিক সহীহ। কেননা এতেই সাবধানতা নিহিত।

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَوْسُقٌ এটি وَسْقٌ -এর বহুবচন। ষাট صَاعٌ পরিমাণ ওজন। আর এক صَاعٌ হলো আনুমানিক সাড়ে তিন সের।

وَعَنْ ٢٧١٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ نَهٰى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى تَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتّٰى يَبْيَضَّ وَيَاْمَنَ الْعَاهَةَ ـ

২৭১৫. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন গাছের ফল ক্রয়বিক্রয় করতে যতক্ষণ পর্যন্ত তা [খাওয়ার বা কাজে লাগার] উপযোগী না হয়। বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়কে নিষেধ করেছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে– রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন খেজুর বিক্রি করতে যে পর্যন্ত তাতে লাল বা হলুদ বর্ণ এসে না যায় এবং [গম, যব ইত্যাদি] শীষ জাতীয় বস্তু যে পর্যন্ত না [পূর্ণ পেকে] শুষ্ক সাদা রংধারী না হয়ে যায়। আর কোনো প্রকার মোড়কে বিনষ্ট হওয়া থেকে নিরাপদ না হয়ে যায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى بُدُوِّ الصَّلَاحِ : بُدُوّ এটি বাবে نَصَرَ -এর মাসদার। এর অর্থ– প্রকাশ পাওয়া। আর صَلَاحٌ -এর অর্থ হলো– উপযোগী। অতএব بُدُوُّ الصَّلَاحِ -এর একত্রে অর্থ হচ্ছে– ফল বিক্রি করার উপযোগী হওয়াটা প্রকাশ পাওয়া।

ফলের উপযোগিতা নির্ণয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, بُدُوُّ الصَّلَاحِ -এর মর্মার্থ হচ্ছে– ظُهُوْرُ النَّضْجِ وَبُدُوُّ الْحَلَاوَةِ ফলের মধ্যে মিষ্টতা আসা এবং পাকা শুরু হওয়া।

২. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, بُدُوُّ الصَّلَاحِ হলো– اَنْ تَامَنَ الثَّمَرَةُ الْعَاهَةَ وَالْفَسَادَ

অর্থাৎ ফল যাবতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে মুক্ত হওয়ার সীমায় পৌঁছা। তিনি তাঁর মতের সপক্ষে দলিল পেশ করেন–

* وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتّٰى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ –

* عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ ـ

ফলের তিনটি অবস্থা :

১. قَبْلَ الظُّهُوْرِ - ফল প্রকাশ হওয়ার পূর্বে।

২. بَعْدَ الظُّهُوْرِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ - ফল প্রকাশ হয়েছে, কিন্তু بُدُوُّ الصَّلَاحِ হয়নি।

৩. بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ - ফল প্রকাশ হওয়ার পর بُدُوُّ الصَّلَاحِ ও পাওয়া যাবে।

ফল বিক্রয়ের তিনটি অবস্থা :

১. ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির সাথে সাথে ফল কেটে নেওয়ার শর্তারোপ করা। ২. ফল গাছে রেখে দেওয়ার শর্তারোপ করা।
৩. কোনো শর্তারোপ করা ব্যতীত ফল বিক্রি করা।

بَيْعُ الثِّمَارِ -এর হুকুম :

ㄱ. بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ الظُّهُوْرِ : প্রকাশ হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রি করা সর্বসম্মতিক্রমে অবৈধ।

ㄴ. بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ : بُدُوُّ الصَّلَاحِ -এর পূর্বে যদি بِشَرْطِ الْقَطْعِ বা তৎক্ষণাৎ কেটে নেওয়ার শর্তে হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ।

আর যদি بِشَرْطِ التَّرْكِ অর্থাৎ পাকা পর্যন্ত গাছে থাকার শর্তে হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েজ। দলিল হচ্ছে আলোচ্য بَابٌ -এর হাদীস– نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

আর যদি مُطْلَقًا হয়, অর্থাৎ কোনো শর্তারোপ ব্যতীত হয়, তাহলে সে ব্যাপার মতানৈক্য রয়েছে–

১. اَئِمَّةٌ ثَلَاثَةٌ -এর মতে দ্বিতীয় অবস্থার ন্যায় এটিও বাতিল হবে।

لِحَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ (رض) نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا –

২. হানাফীগণের নিকট এ ধরনের ক্রয়বিক্রয় জায়েজ। কেননা এ সুরত بِشَرْطِ الْقَطْعِ -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবং বিক্রেতা ক্রেতাকে নির্দেশ দিলেই তা কর্তন করা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর নির্দেশ না দিলে কর্তন করা ওয়াজিব হবে না; বরং এটা হবে তার পক্ষ থেকে ক্রেতাকে সুযোগ দেওয়া।
দলিল হিসেবে ইমাম ত্বাহাবী (র.) হযরত ইবনে ওমরের নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন–

قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ اُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ – (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

আর تَابِيْرُ النَّخْلَةِ হয়ে থাকে بُدُوُّ الصَّلَاحِ -এর পূর্বেই। এখানে হুজুর ﷺ بَعْدَ التَّابِيْرِ তৎক্ষণাৎ বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। যার দ্বারা বুঝা গেল بُدُوُّ الصَّلَاحِ -এর পূর্বে ফল বিক্রি করা জায়েজ আছে।

اَلْجَوَابُ [উত্তর] : আল্লামা ইবনে হুমাম বলেন, এ নিষেধাজ্ঞাটা بَيْعُ الثِّمَارِ بِشَرْطِ التَّرْكِ -এর জন্য প্রযোজ্য। আমরা তার উপরই আমল করি। তাছাড়া হাদীসের ব্যাপকতার উপর তারাও আমল করে না।

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَلثِّمَارُ : এটি বহুবচন, একবচনে ثَمَرٌ অর্থ– ফল।

يَبْدُوْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْفْ বাবে نَصَرَ মাসদার اَلْبُدُوُّ অর্থ– প্রকাশিত হওয়া, বের হওয়া।

صَلَاحٌ : এটি বাবে نَصَرَ ও كَرُمَ -এর মাসদার। অর্থ– উপযুক্ত হওয়া, উপযোগী হওয়া।

تَزْهُوْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْفْ বাবে نَصَرَ মাসদার اَلزَّهْوُ অর্থ– রঙিন হওয়া, উজ্জ্বল হওয়া।

اَلسُّنْبُلُ : এটি একবচন, বহুবচন سَنَابِلُ ، سُنْبُلَاتٌ অর্থ– শীষ।

اَلْعَاهَةُ : এটি একবচন, বহুবচনে عَاهَاتٌ অর্থ– শঙ্কা, বিপদ।

২. ইমাম ত্বাহাবী (র.) বলেন, এ হাদীস সাধারণ بُيُوْعَاتٌ -এর জন্য নয়; বরং بَيْع سَلَمْ -এর জন্য প্রযোজ্য।

৩. এ নিষেধাজ্ঞা تَحْرِيْم -এর জন্য নয়; বরং পরামর্শমূলকভাবে বলেছেন।

بُدُوُّ الصَّلَاحِ -এর পর ফল বিক্রয় প্রসঙ্গ [بَيْعُ الثِّمَارِ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ] : بُدُوُّ الصَّلَاحِ -এর পরও ফল বিক্রয়ের তিন অবস্থা– ১. مُطْلَقًا ২. بِشَرْطِ التَّرْكِ ৩. بِشَرْطِ الْقَطْعِ

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও মালেকের নিকট তিন অবস্থাতেই ক্রয়বিক্রয় জায়েজ। আর যদি শর্তারোপ ব্যতীত مُطْلَقًا ক্রয়বিক্রয় হয়, সেক্ষেত্রে ক্রেতার অধিকার থাকবে ফল পাকা পর্যন্ত গাছে রাখার। তাদের দলিল بَابٌ -এর এ হাদীস। এখানে بُدُوُّ الصَّلَاحِ -এর পূর্বে ক্রয়বিক্রয় নিষেধ করা হয়েছে। বুঝা গেল যে, بُدُوُّ الصَّلَاحِ -এর পর জায়েজ হবে।

হানাফীদের মতে প্রথম ও তৃতীয় صُوْرَتْ জায়েজ, তবে দ্বিতীয় صُوْرَتْ অর্থাৎ গাছে রাখার শর্তে জায়েজ নয় এবং مُطْلَقًا -এর অবস্থায় বিক্রেতা বললে ক্রেতার জন্য ফল কেটে ফেলা ওয়াজিব। সুতরাং بِشَرْطِ التَّرْكِ কোনো অবস্থাতেই জায়েজ নয়।

وَعَنْ ٢٧١٦ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى تُزْهِىَ قِيْلَ وَمَا تُزْهِىْ قَالَ حَتّٰى تَحْمَرَّ وَقَالَ اَرَاَيْتَ اِذَا مَنَعَ اللّٰهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَاْخُذُ اَحَدُكُمْ مَالَ اَخِيْهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭১৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন ফল পরিপক্ব হওয়ার পূর্বে বিক্রি করা হতে। প্রশ্ন করা হলো, পরিপক্বতা কি? তিনি বললেন, ফল লাল হওয়া। নবী করীম ﷺ বলেছেন, [এর পূর্বে ফল বিক্রি করলে] তুমি কি মনে কর আল্লাহর সৃষ্ট কোনো মড়কে যদি ফল বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে মুসলমান ভাই [ক্রেতা] হতে কিসের বিনিময়ে টাকা আদায় করবে? –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ফল উপযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করলে এ কথার সম্ভাবনা থাকে যে, কোনো দুর্যোগের কারণে ফল সব নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিক্রেতা ক্রেতা হতে যে অর্থ নেবে তা বিনিময়বিহীন হয়ে যাবে। তাই ফল উপযোগী হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা জরুরি।

শব্দ-বিশ্লেষণ : تُزْهِىْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِزْهَاءُ অর্থ– ফলে রং আসা।

وَعَنْ ٢٧١٧ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ وَاَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৭১৭. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন– [কোনো বিশেষ বৃক্ষ বা বাগানের ফল] কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম বিক্রি করা হতে এবং তিনি পরামর্শ দিয়েছেন [বিক্রীত ফল-ফসল ক্রেতা কর্তৃক] আহরণের পূর্বে যা বিনষ্ট হয়, এর মূল্য কর্তন করতে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَضْعُ الْجَوَائِحِ -এর অর্থ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিক্রেতা কর্তৃক ঐ ফলের মূল্য হতে কিছু বাদ দেওয়া, যাতে দুর্যোগের কারণ নষ্ট হয়ে গেছে।

وَضْعُ الْجَوَائِحِ-এর হুকুম : এ ক্ষেত্রে بَيْعٌ-এর কয়েকটি অবস্থা হতে পারে–

১. যদি بُدُوُّ صَلَاحٍ-এর পূর্বে বৃক্ষে থাকার শর্তে ক্রয়বিক্রয় হয়ে থাকে এবং তা যদি দুর্যোগের কারণে নষ্ট হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে এর ক্ষতিপূরণ بَائِعٌ বা বিক্রেতাকেই বহন করতে হবে। ক্রেতা থেকে কোনোরূপ মূল্য চাওয়া যাবে না। কেননা এ ধরনের ক্রয়বিক্রয় فَاسِدٌ হবে।

২. بُدُوُّ صَلَاحٍ-এর পূর্বে অথবা পরে ফল কেটে নেওয়ার শর্তে যদি ক্রয়বিক্রয় হয় এবং বিক্রেতা ক্রেতাকে ফল বুঝিয়ে না দেয় এবং ক্রেতা তা কবজা না করে, এমতাবস্থায় যদি তাতে বিপদ আসে এবং তা নষ্ট হয়ে যায়। সেক্ষেত্রেও সর্বসম্মতিক্রমে ক্ষতিপূরণ বিক্রেতাকেই বহন করতে হবে। আর যদি ক্রেতাকে ফল বুঝিয়ে দেওয়ার পর বিপদ আসে আর সে কর্তন না করে, সেক্ষেত্রে ক্রেতাই ক্ষতিপূরণ বহন করবে।

৩. بُدُوُّ صَلَاحٍ বা ফল উপযোগী হওয়ার পূর্বে বা পরে ক্রয়বিক্রয় হয়, অতঃপর ফল পাড়ার সময়ে ফল পাড়ার পূর্বেই বিপদ আসে, তাহলে এর ক্ষতিপূরণও সর্বসম্মতিক্রমে ক্রেতাকেই বহন করতে হবে এবং বিক্রেতা ক্রেতা থেকে মূল্য দাবি করবে।

৪. بُدُوُّ صَلَاحٍ-এর পর কর্তনের শর্ত ব্যতীতই بَيْعٌ হয়েছে এবং বিক্রেতা ক্রেতার নিকট মাল হস্তান্তরও করেছে। এরপর যদি বিপদ আসে, সেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম আবূ হানীফা ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে এ ক্ষতিপূরণ ক্রেতাই বহন করবে। বিক্রেতাকে পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

* ইমাম মালেকের নিকট যদি $\frac{১}{৩}$ অংশ থেকে কম ক্ষতি সাধিত হয়, সেক্ষেত্রে ক্রেতা বহন করবে, আর তার চেয়ে বেশি হলে বিক্রেতা বহন করবে।

* ইমাম আহমদের নিকট যত পরিমাণই ধ্বংস হোক না কেন, তা বিক্রেতার মাল থেকে ধর্তব্য হবে। তাঁর দলিল–

فَاَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ اَنْ تَاْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا .

এখানে কমবেশির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি। ইমাম মালেকও এ হাদীস দ্বারাই দলিল দেন এবং ন্যূনতার কারণে $\frac{১}{৩}$ অংশকে ব্যতিক্রম করেন। কেননা শরিয়তের অনেক ক্ষেত্রেই ثُلُثٌ বা $\frac{১}{৩}$ অংশ গ্রহণযোগ্য।

হানাফী ও শাফেয়ীদের দলিল : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে এক ব্যক্তি ফল ক্রয় করেছিল, তা বিপদের কারণে নষ্ট হয়ে গেলে সে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর হুজুর ﷺ সকলের নিকট থেকে চাঁদা আদায় করে ঋণদাতাদের ঋণ পরিশোধ করেন। বুঝা গেল ক্রেতার হাতে মাল নষ্ট হলে এর জন্য বিক্রেতা দায়ী নয়। কেননা, হুজুর ﷺ বিক্রেতা থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করেননি।

اَلْجَوَابُ : ইমাম আহমদ ও মালেকের দলিলের উত্তর হলো, এখানে اَمْر টা ওয়াজিব এর জন্য নয়; বরং مُسْتَحَبٌ-এর জন্য হবে। অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ক্ষতিগ্রস্ত ফলের কর কর্তন করতে বলা হয়েছে। সুতরাং এ মাসআলার সাথে এ হাদীসের কোনোই সম্পর্ক নেই।

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَلسِّنِيْنَ : এটি বহুবচন, একবচনে اَلسَّنَةُ অর্থ– বছর।

بَيْعُ السِّنِيْنَ : দ্বারা بَيْعُ الْمُعَاوَمَةِ উদ্দেশ্য। যার আলোচনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَضْعٌ : এটি বাবে فَتَحَ এর মাসদার, অর্থ– মূল্য কর্তন করা।

اَلْجَوَائِحُ : এটি বহুবচন, একবচনে جَائِحَةٌ অর্থ– বিপদ, শঙ্কা, দুর্যোগ।

وَعَنْ ٢٧١٨ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ بِعْتَ مِنْ اَخِيْكَ ثَمَرًا فَاَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ اَنْ تَاْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَاْخُذُ مَالَ اَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৭১৮. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তুমি যদি তোমার মুসলমান ভ্রাতার নিকট [তোমার বাগানের বা বৃক্ষের] ফল বিক্রি কর, অতঃপর [তুমি তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার পূর্বেই] যদি তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে তোমার জন্য জায়েজ হবে না যদি তুমি তার নিকট হতে কোনো মূল্য আদায় কর। তার প্রাপ্য তাকে না দিয়ে কিসের বিনিময়ে তুমি মূল্য গ্রহণ করবে? –[মুসলিম]

وَعَنْ ٢٧١٩ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِيْ أَعْلَى السُّوْقِ فَيَبِيعُوْنَهُ فِيْ مَكَانِهِ فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِهِ فِيْ مَكَانِهِ حَتّٰى يَنْقُلُوْهُ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ)

২৭১৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, অনেক লোক বাজারে আগত খাদ্যদ্রব্য বাজারের অগ্রভাগে গিয়ে ক্রয় করে ফেলত। অতঃপর সেখানে বসে বিক্রয় করত। এ শ্রেণির লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ বস্তু সেখানে বসে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন– যে পর্যন্ত তারা [উক্ত বস্তু বিক্রয়ের সাধারণ স্থানে] না নিয়ে যায়। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْهُ ٢٧٢٠ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيْعُهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَتّٰى يَكْتَالَهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭২০. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো খাদ্যবস্তু ক্রয় করবে, সে তা বিক্রি করতে পারবে না, যতক্ষণ না তা [হস্তগত] করে নেয়। হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় আছে– যতক্ষণ না তাকে পরিমাপ করে বুঝে নেয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ : এর অর্থ হলো যতক্ষণ না তা নিজে হস্তগত করে নেয়। আর হস্তান্তরযোগ্য দ্রব্যের মধ্যে হস্তগত করার অর্থ হলো ক্রয় করার পর সেস্থান থেকে উঠিয়ে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা।

اَلْاِخْتِلَافُ فِيْ بَيْعِ الْمَبِيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ [পণ্যদ্রব্য হস্তগত হওয়ার পূর্বে তা বিক্রয়ের ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ] : কোনো পণ্য ক্রয় করার পর হস্তগত করার পূর্বে ক্রেতা কর্তৃক বিক্রয় করা জায়েজ হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে।

مَذْهَبُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে, কোনো জিনিসই হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় করা জায়েজ নেই। তাঁদের দলিল হচ্ছে এই– * مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيْعُهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ .

مَذْهَبُ الْإِمَامِ مَالِكٍ (رحـ) : ইমাম মালেকের মতে مَطْعُوْم ও مَشْرُوْب তথা খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় قَبْلَ الْقَبْضِ বিক্রি করা জায়েজ নেই। এছাড়া অন্যান্য জিনিস বিক্রি করা জায়েজ। কেননা হাদীসে শুধুমাত্র طَعَامٌ -কে খাস করা হয়েছে। যেমন–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيْعُهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ .

مَذْهَبُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَأَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে– لَا يَجُوْزُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْعَقَارَ অর্থাৎ জমি ছাড়া অন্য কোনো জিনিস হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি জায়েজ নয়। আর জমি তথা غَيْر مَنْقُوْلَة জিনিস قَبْلَ الْقَبْضِ বিক্রি করা জায়েজ। কেননা এ সম্পর্কে যত হাদীস এসেছে, সবগুলোতে طَعَامٌ -এর উল্লেখ এসেছে। তাই طَعَامٌ দ্বারা أَشْيَاء مَنْقُوْلَة বা হস্তান্তরযোগ্য বস্তু সামগ্রী উদ্দেশ্য হবে।

مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ (رحـ) : ইমাম আহমদ ও আওযায়ী (র.)-এর মতে– لَا يَجُوْزُ فِي الْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُوْنِ وَيَجُوْزُ فِيْمَا سِوَاهُمَا

اَلْجَوَابُ : ইমাম শাফেয়ী ও মুহাম্মদ (র.)-এর হাদীসে اِضْطِرَابٌ রয়েছে। তাই তা দলিল হওয়ার যোগ্য হতে পারে না। আর ইমাম মালেক (র.) -এর পেশকৃত হাদীসে طَعَامٌ দ্বারা শুধুমাত্র طَعَامٌ উদ্দেশ্য নয়; বরং সকল أَشْيَاء مَنْقُوْلَة উদ্দেশ্য।

وَعَنْ ٢٧٢١ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اَمَّا الَّذِىْ نَهٰى عَنْهُ النَّبِىُّ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ اَنْ يُّبَاعَ حَتّٰى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا اَحْسَبُ كُلَّ شَىْءٍ اِلَّا مِثْلَهُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭২১. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ যা নিষেধ করেছেন তা হলো, খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি এটাই ধারণা করি যে, প্রত্যেক বস্তুই এরূপ।

-[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٢٧٢٢ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَلَقَّوا الرُّكْبَانَ لِبَيْعٍ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْاِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ اَنْ يَحْلِبَهَا اِنْ رَضِيَهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ مَنِ اشْتَرٰى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَاِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ ـ

২৭২২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ১. বাজারে বিক্রি করার জন্য যারা বাহির হতে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসে, বাজারে পৌছিবার পূর্বে তাদের পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে নেওয়ার জন্য অগ্রসর হয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হবে না। ২. ক্রয়বিক্রয়ের আলোচনা একজনের পক্ষ হতে চলা অবস্থায় অপরজন তার আলোচনা করবে না। ৩. দালালি করবে না। ৪. গ্রাম্য লোকের পণ্যদ্রব্য শহরী লোকগণ বিক্রি করে দেওয়ার চাপ দেবে না। ৫. উট, ছাগী [বিক্রি করার পূর্বে তা] -র স্তনে দুই-তিন দিনের দুগ্ধ জমা রেখে স্তনকে ফুলিয়ে রাখবে না। যদি ঐরূপ করে, তবে যে ব্যক্তি তা ক্রয় করে, সে তার দুধ দোহনের পর তার জন্য, খেয়ারের অবকাশ থাকবে। ইচ্ছা করলে ক্রয়ের উপর রাখবে, ইচ্ছা করলে ক্রয় ভঙ্গ করে তাকে ফেরত দেবে। ফেরত দিলে [দুধপানের বিনিময়ে] সঙ্গে এক সা' [৩ সের ১২ ছটাক] পরিমাণ খোরমা দেবে।-[বুখারী ও মুসলিম] মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে– যে ব্যক্তি স্তন ফুলানো ছাগী ক্রয় করবে, তিন দিন পর্যন্ত তার জন্য অবকাশ থাকবে। যদি সে ছাগী ফেরত দেয়, তবে সে তার সঙ্গে এক সা' খাদ্যবস্তুও দেবে– উত্তম গম দিতে বাধ্য নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ -এর অর্থ : لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে "তোমরা ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ করো না।" আর ফিকহশাস্ত্রের পরিভাষায় এর অর্থ হলো–

هُوَ اِشْتِرَاءُ السِّلَعِ مِنَ التُّجَّارِ الْقَادِمَةِ مِنَ الْخَارِجِ قَبْلَ الْوُصُوْلِ اِلَى الْبَلَدِ ثُمَّ اَنْ يَبِيْعَهَا حَسْبَ الْاِخْتِيَارِ ـ

অর্থাৎ বহিরাগত ব্যবসায়ী কাফেলা শহরে প্রবেশের পূর্বেই তাদের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করে ইচ্ছানুযায়ী বিক্রয় করা।

এরূপ ক্রয়বিক্রয় থেকে নিষেধাজ্ঞার কারণ : নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো–

* বিক্রেতাকে প্রতারণার হাত হতে রক্ষা করা।
* শহরবাসীকে ক্ষতির হাত হতে উদ্ধার করা।

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ -এর হুকুম : أَئِمَّة ثَلَاثَة -এর নিকট এটা মাকরূহ। তাঁদের দলিল হচ্ছে- إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যদি تَلْبِيْس سِعْر বা মূল্যে সংশয় সৃষ্টি ও إِضْرَارُ أَهْلِ بَلَدٍ বা اَلتَّلَقِّيْ শহরবাসীর ক্ষতি সাধন না হয়, তাহলে জায়েজ। আর যদি إِضْرَار ও تَلْبِيْس পাওয়া যায়, তাহলে জায়েজ হবে না। তিনি বলেন, এ হাদীস এ অবস্থার জন্যই প্রযোজ্য হবে।

صُوْرَةُ بَيْعِ بَعْضٍ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ : এর দুটি পদ্ধতি হতে পারে-

* দুজনে পরস্পরে ক্রয়বিক্রয় করছিল, এমতাস্থায় অপরজন গিয়ে মূল্য বৃদ্ধি করা। এতে ক্রেতার ক্ষতিসাধন হবে। অথবা ক্রেতার নিকট তোমার মাল কম মূল্যে বিক্রয় করা। এতে বিক্রেতার ক্ষতি হলো।

* কেউ কোনো মাল خِيَار شَرْط -এর ভিত্তিতে ক্রয় করার পর তার নিকট গিয়ে এরূপ বলা যে, তুমি এ بَيْع ভঙ্গ করে ফেল। আমি তোমার নিকট আরো অনেক কম মূল্যে বিক্রি করব। এর দ্বারা বিক্রেতার ক্ষতি সাধিত হয়। তাই بَيْعُ بَعْضٍ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ হারাম। -[মেরকাত খ. ৬, পৃ. ৭৫]

قَوْلُهُ لَا تَنَاجَشُوْا :

اَلنَّجْشُ -এর আভিধানিক অর্থ : نَجْش শব্দটি বাবে نَصَرَ -এর মাসদার, এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- ১. الاثارة বা উদ্বুদ্ধ করা। যেমন বলা হয়- نَجَشْتُ الصَّيْدَ ২. اَلْخِدَاعُ বা প্রতারণা করা ৩. اَلْمَدْحُ বা প্রশংসা করা। ৪. اَلسَّمْسَرَةُ বা দালালি করা।

اَلنَّجْشُ -এর পারিভাষিক অর্থ : نَجْش শব্দের পারিভাষিক অর্থ হলো-

اَلنَّجْشُ هُوَ الزِّيَادَةُ فِيْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ مِنْ غَيْرِ رُغْبَةٍ فِيْهَا لِتَخْدِيْعِ الْمُشْتَرِيْ وَتَرْغِيْبِهِ وَنَفْعِ صَاحِبِهَا .

অর্থাৎ নিজে ক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয়; বরং অন্যকে অধিক মূল্যে ক্রয়ে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এর ক্রেতাকে প্রতারণায় ফেলার উদ্দেশ্যে নিত্য মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য বলা।

اَلنَّجْشُ -এর হুকুম : এ ধরনের দালালি করা হারাম। এটা যদি দালাল শুধু নিজের পক্ষ থেকে করে, তাহলে সে একাই গুনাহগার হবে। আর যদি উভয়ের যোগসাজশে হয়ে থাকে, তাহলে বিক্রেতা ও দালাল উভয়েই গুনাহগার হবে। তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উক্ত بَيْع সংঘটিত হয়ে যাবে। আহলে জাহেরদের নিকট بَيْع বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম আহমদ ও মালেকের নিকট بَيْع সহীহ হয়ে যাবে। তবে غَبْن فَاحِش -এর সুরতে بَيْع ভঙ্গ করার অধিকার থাকবে।

بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِيْ : حَاضِر অর্থ- শহরবাসী, আর بَادِيْ অর্থ- গ্রাম্য লোক। বর্তমান মূল্যে বিক্রির জন্য স্বীয় মাল নিয়ে বাজারে আসে, কিন্তু কোনো শহরের লোক তার কাছে এসে বলে, তোমার মাল এখন বিক্রি করো না; বরং আমার কাছে রেখে যাও, আমি আস্তে আস্তে চড়া দামে বিক্রি করব।

حُكْمُ هٰذَا الْبَيْعِ [এরূপ ক্রয়বিক্রয়ের হুকুম] :

১. জমহুরের নিকট এ ধরনের بَيْع মাকরূহ, তাঁদের দলিল হলো بَاب -এর হাদীস।

২. হানাফীদের মতে, যদি এর দ্বারা শহরবাসীর ক্ষতি সাধিত হয়, তাহলে مَكْرُوْه হবে, আর ক্ষতি না হলে مَكْرُوْه হবে না। হানাফীগণ বলেন, এ নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো إِضْرَارُ أَهْلِ بَلَدٍ বা শহরবাসীর ক্ষতি সাধন। সুতরাং কারণ পাওয়া না গেলে مَكْرُوْه -ও হবে না।

قَوْلُهُ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ :

اَلتَّصْرِيَةُ -এর আভিধানিক অর্থ : এটি বাবে تَفْعِيْل -এর মাসদার। صَرَّ বা صَرْيٌ মূলধাতু থেকে নির্গত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-

১. اَلْحَبْسُ বা আটকে রাখা। যেমন বলা হয়- صَرَيْتُ الْمَاءَ اَيْ حَبَسْتُهُ সুতরাং مُصَرَّاةٌ -এর অর্থ হবে এমন প্রাণী, যার স্তনে দুধ আটকে রাখা হয়।

২. اَلْجَمْعُ বা একত্রিত করা।
৩. اَلشَّدُّ বা বেঁধে রাখা।
এখান থেকে لَا تُصَرُّوا হলো جَمْع مُذَكَّر حَاضِر-এর সীগাহ এবং مُصَرَّاةٌ হলো اِسْم مَفْعُوْل-এর সীগাহ।
اَلتَّصْرِيَةُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : تَصْرِيَة-এর পারিভাষিক অর্থ হলো–

وَهِيَ اَنْ يَشُدَّ الضَّرْعَ قَبْلَ الْبَيْعِ اَيَّامًا لِيَظُنَّ الْمُشْتَرِيْ اَنَّهَا لَبُوْنٌ فَيَزِيْدُ فِي الثَّمَنِ - (مِرْقَاةٌ)

অর্থাৎ দুগ্ধবতী প্রাণী বিক্রির পূর্বে ইচ্ছাপূর্বক কয়েক দিন এর দুগ্ধ দোহন হতে বিরত থাকা, যাতে করে ক্রেতা অধিক দুগ্ধবতী মনে করে চড়া দামে ক্রয় করতে আগ্রহী হয়।

بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ-এর হুকুম] : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে تَصْرِيَة করা হারাম। তবে পদ্ধতিগতভাবে بَيْع সংঘটিত হয়ে যাবে, কিন্তু পরে যদি ক্রেতা তার ধারণা অনুযায়ী দুধ না পায় এবং ফেরত দিতে ইচ্ছা করে, তাহলে এর পদ্ধতি সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর এক قَوْل অনুযায়ী এ ধরনের বিক্রিতে ক্রেতার তিন দিনের خِيَار থাকবে। ইচ্ছা করলে পশুটি রেখে দেবে। নতুবা পশুটি ফেরত দেবে এবং দোহনকৃত দুধের বিনিময় স্বরূপ এক صَاع খেজুরও ফেরত দেবে। তাঁদের দলিল–

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ اِنْ شَاءَ اَمْسَكَهَا وَاِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ.

* ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন যে, تصرية এমন কোনো ক্রটি নয়, যা দ্বারা مَبِيْع ফেরত দিতে হবে; বরং خِيَار عَيْب-এর ভিত্তিতে رُجُوْعٌ بِالنُّقْصَانِ বা বিক্রেতা থেকে অতিরিক্ত মূল্য ফেরত নেবে। তাঁদের দলিল নিম্নরূপ–

١. قَوْلُهُ تَعَالٰى اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ.
٢. فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ.
٣. جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا.

এখানে প্রথম আয়াতের দ্বারা বুঝা গেল যে, اِيْجَابٌ ও قَبُوْل দ্বারা যে عَقْد হয়েছে, তা পূর্ণ করতে হবে। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, ক্ষতিপূরণ দিতে হলে তারই অনুরূপ জিনিস দ্বারা দিতে হবে। এখানে দুধের বিনিময়ে تَمْر বা খেজুর দেওয়া কুরআনের আয়াতের সরাসরি পরিপন্থি। তাছাড়া এটি قِيَاسٌ-এরও পরিপন্থি। কেননা قِيَاسٌ অনুযায়ী যতটুক দুধ দোহন করেছে, ততটুকুই ফেরত দিতে হবে। কিন্তু এক صَاع খেজুর কোনোক্রমেই ঐ দুধের সমপরিমাণ হবে না। হয় বেশি হবে নতুবা কম হবে।

اَلْجَوَابُ : তাঁদের দলিলের উত্তর হলো–
১. উক্ত হাদীসের মধ্যে اِضْطِرَابٌ রয়েছে। সুতরাং তা দলিলযোগ্য নয়।
২. কুরআনের আয়াত দ্বারা এ হাদীস مَنْسُوْخ হয়ে গেছে।
৩. এ হাদীস ইজমা ও কিয়াসের পরিপন্থি।

শব্দ-বিশ্লেষণ : لَا تَلَقَّوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ اَمْر حَاضِر مَعْرُوْف বাবে تَفَعُّل মাসদার اَلتَّلَقِّيْ অর্থ–তোমরা মিলিত হয়ো না।
اَلرُّكْبَانُ : এটি বহুবচন; একবচনে اَلرَّاكِبُ অর্থ– কাফেলা।
لَا تَنَاجَشُوا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ نَهِيْ حَاضِر مَعْرُوْف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلنَّجْشُ অর্থ– তোমরা দালালি করো না।
حَاضِر : একটি একবচন, বহুচনে حَاضِرُوْنَ অর্থ– শহরবাসী।
بَادٍ : এটি একবচন, বহুবচনে بِوَادٍ অর্থ– গ্রাম্য, বেদুইন।
لَا تُصَرُّوا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ نَهِيْ حَاضِر مَعْرُوْف বাবে تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّصْرِيَةُ অর্থ– তোমরা আটক করো না।

وَعَنْهُ ٢٧٢٣ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَلَقُّوا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرٰى مِنْهُ فَاِذَا اَتٰى سَيِّدُهُ السُّوْقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৭২৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যারা বাজারে বিক্রি করার জন্য পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসছে, এগিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হবে না। যদি কেউ এরূপ করে এবং কোনো বস্তু ক্রয় করে, তবে ঐ বিক্রেতা মালিক বাজারে পৌঁছার পর অবকাশ পাবে [উক্ত বিক্রয়কে ভঙ্গ করার]। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হানাফী মাযহাব মতে উক্ত অবকাশ একতরফা বাধ্যতামূলক হবে তখন, যখন ক্রেতার কোনো কথায় বিক্রেতা ধোঁকা খেয়ে থাকে। যেমন– ক্রেতা বলেছে, বাজারে এ জিনিসের দর পাঁচ টাকা সের আছে। এ কথায় বিক্রেতা তাকে পাঁচ টাকায় দিয়েছে। অথচ বাজারে ঐ বস্তু ছয় টাকা সের। এমতাবস্থায় বিক্রেতার জন্য এখতিয়ার থাকবে বিক্রয় ভঙ্গ করার।

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَلْجَلَبُ : এটি একবচন, বহুবচনে اَجْلَابٌ : আর جَالِبٌ অর্থ– আকর্ষণকারী, এখানে جَالِبٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ ব্যক্তি, যে ব্যবসার পণ্য নিয়ে বাজারে আসে। উল্লেখ্য যে, تَلَقِّى جَلَبٍ আর تَلَقِّى رُكْبَانٍ একই জিনিস। আর تَلَقِّى رُكْبَانٍ-এর বিস্তারিত আলোচনা উপরের হাদীসে দ্রষ্টব্য।

وَعَنِ ٢٧٢٤ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَلَقُّوا السِّلَعَ حَتّٰى يُهْبَطَ بِهَا اِلَى السُّوْقِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭২৪. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা পূর্বে অগ্রগামী হয়ে বিক্রয়ের বস্তু ক্রয় করার জন্য যেও না, যে পর্যন্ত তা বিপনীকেন্দ্রে উপস্থিত না করা হয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দ বিশ্লেষণ : اَلسِّلَعُ : এটি বহুবচন, একবচনে سِلْعَةٌ অর্থ– পণ্য, সামগ্রী।

يُهْبَطُ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ اِثْبَاتُ فِعْلِ مُضَارِعٍ مَعْرُوْف বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِهْبَاطُ অর্থ– অবতরণ করানো। এর আলোচনা تَلَقِّى رُكْبَانٍ-এ দ্রষ্টব্য।

وَعَنْهُ ٢٧٢٥ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ اِلَّا اَنْ يَاْذَنَ لَهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৭২৫. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতেই বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো ব্যক্তি তার মুসলমান ভ্রাতার ক্রয়বিক্রয়ের কথার উপর নিজে ক্রয়বিক্রেয়ের কথা বলতে পারবে না এবং নিজ মুসলমান ভ্রাতার বিবাহের প্রস্তাবের উপর নিজে প্রস্তাব দিতে পারবে না। হ্যাঁ, যদি ঐ ভ্রাতা অনুমতি দেয়, তবে পারবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يَبِيْعُ الرَّجُلُ : এর আলোচনার জন্য لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ অংশে দ্রষ্টব্য।

قَوْلُهُ لَا يَخْطُبُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ-এর মর্মার্থ : خِطْبَةٌ শব্দের অর্থ হলো বিবাহের প্রস্তাব। হাদীসের এ অংশের মর্মার্থ হলো যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, তখন অন্যের জন্য সমীচীন নয় যে, সে মহিলাকে বিবাহের

প্রস্তাব দেবে। তবে যদি তারা আলোচনা ভঙ্গ করে দেয় বা প্রথম পক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে সেই মহিলার নিকট প্রস্তাব পাঠানো যাবে। এ মাসআলা ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

وَعَنْ ٢٧٢٦ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَسِمُ الرَّجُلُ عَلٰى سَوْمِ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৭২৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো ব্যক্তি তার মুসলমান ভ্রাতার ক্রয়বিক্রয়ের কথার উপর নিজে ক্রয়বিক্রয়ের কথা বলবে না। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٢٧٢٧ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৭২৭. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শহরী লোক গ্রাম্য লোকদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে দেওয়ার চাপ সৃষ্টি করবে না। [গ্রাম্য লোকগণ নিজেদের জিনিস নিজেরাই বিক্রি করবে, তাতে শহর-বন্দরের ক্রেতাগণ সস্তা দামে জিনিস পাবে।] লোকদেরকে এভাবেই থাকতে দাও, আল্লাহ তা'আলা একজনকে অপরজন দ্বারা লাভবান হওয়ার সুযোগ দিয়ে থাকেন। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٢٧٢٨ أَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ نَهٰى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذٰلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُوْنُ ذٰلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلٰى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوْ أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرٰى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭২৮. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বস্ত্র পরিধানের দুটি নিয়মপ্রণালিকে নিষেধ করেছেন এবং ক্রয়বিক্রয়েরও দুটি প্রণালি নিষেধ করেছেন।

ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে মুলামাসা ও মুনাবাযা থেকে নিষেধ করেছেন। 'মুলামাসা' হলো এই যে, রাত্রে বা দিনে ক্রেতা বিক্রেতার [বিক্রয়ের] কাপড়টিকে হাতে স্পর্শ করলেই সে কাপড় গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। সেটাকে দেখে বিবেচনা করার কোনো সুযোগই তার থাকবে না। 'মুনাবাযা' হলো এই যে, [কোনো বস্তুর ক্রয়বিক্রয়ের আলোচনাকালে ক্রেতা ও বিক্রেতা] পরস্পর একজনের কোনো বস্ত্র অপরজনের প্রতি ছুঁড়ে মারলেই তাদের মধ্যে ক্রয়বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। ক্রয়ের বস্তু দেখার সুযোগও থাকবে না এবং উভয়ের সম্মতিরও অপেক্ষা করা হবে না।

আর বস্ত্র পরিধানের প্রাণালি দুটি হলো– ১. সম্মা পদ্ধতিতে চাদরকে জাড়িয়ে রাখা। আর সম্মা পদ্ধতি হলো চাদরের একপাশকে এমনভাবে কাঁধের উপরে উঠিয়ে রাখা, যাতে করে অপর পাশ খোলা হয়ে যায়, যে কাঁধের উপর কোনো কাপড় থাকে না। ২. দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো ইহতিবা পদ্ধতিতে বসা, যাতে সতরের মধ্যে কোনো কাপড় থাকে না। [উভয় পদ্ধতিতে সতর খুলে যায় বিধায় তা হতে নিষেধ করা হয়েছে।] – [বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُلَامَسَةُ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ : مُلَامَسَةٌ শব্দটি বাবে مُفَاعَلَةٌ-এর মাসদার, আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- পরস্পর স্পর্শ করা। শরিয়তের পরিভাষায় مُلَامَسَةٌ-এর কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে।

* ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন-

اَلْمُلَامَسَةُ اَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ اَبِيْعُكَ هٰذَا الْمَتَاعَ بِكَذَا فَاِذَا لَمَسْتُكَ وَجَبَ الْبَيْعُ اَوْ يَقُوْلَ الْمُشْتَرِيْ كَذٰلِكَ .

অর্থাৎ বিক্রেতা কর্তৃক এরূপ বলা যে, আমি তোমার নিকট এ বস্তু বিক্রি করব, যখন আমি তোমাকে স্পর্শ করব, তখন বিক্রি আবশ্যক হয়ে পড়বে। অথবা ক্রেতা অনুরূপ বলবে।

* আবার কেউ বলেন- هُوَ اَنْ يَقُوْلَ لِصَاحِبِهٖ اِذَا لَمَسْتُ ثَوْبَكَ وَلَمَسْتَ ثَوْبِيْ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

অর্থাৎ একজন অপরজনকে বলবে, আমি যখন তোমার কাপড় স্পর্শ করব এবং তুমি যখন আমার কাপড় স্পর্শ করবে, তখন بَيْع সংঘটিত হবে।

* অথবা ভাঁজ করা কাপড় স্পর্শ করে এ শর্তে ক্রয় করবে যে, দেখার পর তার কোনো خِيَارْ থাকবে না।

اَلْمُنَابَذَةُ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ : مُنَابَذَةٌ শব্দটি বাবে مُفَاعَلَةٌ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো- নিক্ষেপ করা।

শরিয়তের পরিভাষায় مُنَابَذَةٌ-এর সংজ্ঞা সম্পর্কে কয়েকটি মতামত রয়েছে-

* হাদীসে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

هِيَ اَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهٗ اِلَى الْاٰخَرِ وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اِلٰى ثَوْبِ صَاحِبِهٖ

অর্থাৎ দেখা ব্যতীতই পরস্পর পরস্পরের প্রতি কাপড় নিক্ষেপ করে بيع সম্পন্ন করাকে بَيْع مُنَابَذَة বলে।

* আবার কেউ বলেন- بِعْتُكَ مَاذَا نَبَذْتُهٗ اِلَيْكَ فَقَدِ انْقَطَعَ الْخِيَارُ وَلَزِمَ الْبَيْعُ

অর্থাৎ আমি তোমার নিকট এটা বিক্রয় করলাম। যখন আমি এটা তোমার দিকে নিক্ষেপ করব, তখন আর তোমার خِيَارْ থাকবে না এবং بَيْع অত্যাবশ্যক হয়ে যাবে।

* কেউ বলেন- يَقُوْلُ الْبَائِعُ بِعْتُكَ وَلِيَ الْخِيَارُ اِلٰى اَنْ اَرْمِيَ الْحَصَاةَ

অর্থাৎ আমি তোমার নিকট এটা বিক্রয় করলাম, তবে কঙ্কর নিক্ষেপ পর্যন্ত আমার خِيَارْ থাকবে।

* বিক্রেতা ক্রেতা বলবে- তুমি কঙ্কর নিক্ষেপ কর, যে পণ্যের উপর কঙ্কর গিয়ে পড়বে, সেটা এত পরিমাণ মূল্যে তোমার হয়ে যাবে।

حُكْمُ هَاتَيْنِ الْبَيْعَتَيْنِ [এরূপ ক্রয়বিক্রয়ের হুকুম] : সকল ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে সিদ্ধান্ত যে, এ দু ধরনের ক্রয়বিক্রয় শরিয়তে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কেননা এটা প্রতারণামূলক বিক্রি জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।

اَللِّبْسَتَيْنِ দ্বারা উদ্দেশ্য : لِبْسَتَيْنِ দ্বারা জাহিলি যুগের দু ধরনের পদ্ধতিতে পোশাক পরিধান হতে নিষেধ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে- ১. اِشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ২. اِحْتِبَاءٌ

* اِشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ হচ্ছে- চাদর দ্বারা পূর্ণ দেহকে এমনভাবে ঢেকে রাখা, যেন কোনো অঙ্গই দেখা না যায়। এমনকি হস্তদ্বয়ও ভিতরে থাকে এবং চাদরের এক পার্শ্বকে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে দেয়। শব্দটি صَخْرَةٌ صَمَّاءُ থেকে مُشْتَقٌّ হয়েছে। যে পাথরে কোনো ছিদ্র না থাকে, সেটাকে صَمَّاءُ বলা হয়। তাই পূর্ণ দেহকে কাপড়ে জড়িয়ে নেওয়াকে اِشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ বলা হয়।

* اِحْتِبَاءٌ হচ্ছে দু পা খাড়া করে নিতম্বের উপর উপবেশন করা এবং উভয় রানকে পেটের সাথে মিলিয়ে রাখা। এ ধরনের বসাকে حَبْوَةٌ বলা হয়। আবার কেউ বলেছেন, اِحْتِبَاءٌ হচ্ছে নিতম্বের উপর রান খাড়া করে বসা। অতঃপর রান ও কোমরের পার্শ্বে কোনো একটি কাপড় এমনভাবে পরিধান করা, যার দ্বারা সতর খোলা থাকে। নিষেধের কারণ হলো পর্দা রক্ষা না হওয়া, আর যদি পর্দা রক্ষা হয়, তাহলে নিষেধ নয়। উল্লেখ্য যে, রান খাড়া করে দুই হাত গোলাকার করে বিশেষ পদ্ধতিতে বসা সুন্নত।

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَللِّبْسَةُ : কাপড় পরিধান করার পদ্ধতি।

اَلْمُلَامَسَةُ : এটি বাবে مُفَاعَلَةٌ-এর মাসদার। অর্থ হলো– পরস্পর স্পর্শ করা।

اَلْمُنَابَذَةُ : এটি বাবে مُفَاعَلَةٌ-এর মাসদার, মূলবর্ণ (ن ـ ب ـ ذ) জিনসে صَحِيْح অর্থ– 'পরস্পর নিক্ষেপ করা।

اِشْتِمَالٌ : এটি মাসদার বাবে اِفْتِعَالٌ মূলবর্ণ (ش ـ م ـ ل) জিনসে صَحِيْح অর্থ– সমস্ত শরীরে কাপড় পেঁচানো।

وَعَنْ ٢٧٢٩ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৭২৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন– 'বায়-এ হাসাত' তথা কঙ্কর নিক্ষেপ করার ক্রয়বিক্রয় হতে এবং 'বায়-এ গরর' তথা প্রতারণামূলক ক্রয়বিক্রয় হতে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى الْحَصَاةِ لُغَةً وَشَرْعًا [اَلْحَصَاةُ-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ] : حَصَاةٌ শব্দটির অর্থ হচ্ছে পাথর ও কঙ্কর নিক্ষেপ করা। জাহিলি যুগে কঙ্কর ও পাথর নিক্ষেপ করে যে ক্রয়বিক্রয় সম্পন্ন হতো, সেটাকে بَيْع حَصَاةٌ বলা হয়।

بَيْعُ الْحَصَاةِ-এর সংজ্ঞায় ওলামায়ে কেরামের মতামত নিম্নরূপ–

* মোল্লা আলী কারী (র.) মেরকাত গ্রন্থে লিখেন– اَنْ يَقُوْلَ الْمُشْتَرِىْ لِلْبَائِعِ اِذَا نَبَذْتُ اِلَيْكَ الْحَصَاةَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

অর্থাৎ ক্রেতা এরূপ বলবে যে, যখন আমি কঙ্কর নিক্ষেপ করব, তখন بيع আবশ্যক হয়ে পড়বে।

اَوْ يَقُوْلَ الْبَائِعُ بِعْتُكَ مِنَ السِّلَعِ مَا تَقَعُ حَصَاتُكَ اِذَا رَمَيْتَ بِهَا اَوْ مِنَ الْاَرْضِ اِلٰى حَيْثُ تَنْتَهِىْ حَصَاتُكَ ـ

অর্থাৎ বিক্রেতা এরূপ বলবে যে, তোমার নিকট পণ্য বিক্রয় করলাম, যার উপর তোমার কঙ্কর এসে পড়বে; যা তুমি নিক্ষেপ করবে, অথবা জমির যে পর্যন্ত তোমার কঙ্কর পৌঁছবে, সে পর্যন্ত জমি বিক্রি করলাম।

مَعْنَى الْغَرَرِ لُغَةً وَشَرْعًا : بَيْعُ الْغَرَرِ হলো এমন بَيْع যাতে প্রতারণার সম্ভাবনা থাকে। এর পদ্ধতি সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামত নিম্নরূপ। মেরকাত-এর মুসান্নিফ বলেন–

اَىْ مَا لَا يَعْلَمُ عَاقِبَتَهُ مِنَ الْخَطَرِ الَّذِىْ لَا يَدْرِىْ اَيَكُوْنُ اَمْ لَا كَبَيْعِ الْاٰبِقِ وَالطَّيْرِ فِى الْهَوَاءِ وَالسَّمَكِ فِى الْمَاءِ ـ

অর্থাৎ, যার পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না, সে বস্তুত তা পাওয়া যাবে কিনা। যেমন– পলায়নকারী দাস-দাসী ও মুক্ত আকাশে উড়ন্ত পাখি ও পানির নীচের মাছ। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

وَعَنْ ٢٧٣٠ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُوْرَ اِلٰى اَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِىْ فِىْ بَطْنِهَا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

[২৭৩০] অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন, পেটের বাচ্চার বাচ্চা বিক্রয় করতে। এটা অন্ধকার যুগের ক্রয়বিক্রয় ছিল। [কোনো উট উত্তম জাতের, তার চাহিদা বেশি এরূপ ক্ষেত্রে] অনেকে উট ক্রয় করত এ শর্তে যে, বিক্রেতার উটের পেটে যেই বাচ্চা হবে, ঐ বাচ্চা বড় হবার পর এর পেটে যে বাচ্চা হবে, তা ক্রয় করা হলো। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى حَبْلِ الْحَبَلَةِ [حَبَلُ الْحَبَلَةِ -এর অর্থ] : حَبَلُ الْحَبَلَةِ -এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও নাফে' (র.)-এর মতে– هُوَ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ اِلٰى اَنْ تَلِدَ النَّاقَةُ وَيَلِدَ وَلَدُهَا

কোনো জিনিস বিক্রয় করে গর্ভধারিণী উষ্ট্রীর গর্ভরত বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় পর্যন্ত মূল্য পরিশোধের সময় নির্দিষ্ট করা। যেমন– কেউ বলল, আমার এ গর্ভধারিণী উষ্ট্রী বাচ্চা প্রসব করার দিন মূল্য পরিশোধ করব।

২. হযরত ইবনে ওমরের মতে– গর্ভজাত বাচ্চা প্রসব করার পর সে বাচ্চা বড় হয়ে গর্ভবতী হয়ে যেদিন বাচ্চা দেবে, সেদিন মূল্য পরিশোধ করার সময় নির্দিষ্ট করা।

৩. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে– هُوَ بَيْعُ جَنِيْنِ النَّاقَةِ فِى الْحَالِ

অর্থাৎ উষ্ট্রীর পেটে যে বাচ্চা রয়েছে, তা জন্মের আগে বিক্রি করাকে بَيْعُ حَبْلِ الْحَبَلَةِ বলা হয়।

উপরিউক্ত সকল পদ্ধতিই নিষিদ্ধ। কেননা এগুলোতে সময় ও পণ্য সবই অনির্দিষ্ট।

শব্দ-বিশ্লেষণ : حَبَلٌ : এটি বাবে سَمِعَ -এর মাসদার অর্থ– গর্ভ।

حَبَلَةٌ : এটি বহুবচন, একবচনে حَابِلَةٌ অর্থ– গর্ভ ধারণকারিণী। حَبَلٌ সাধারণত মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয়, আবার কখনো প্রাণীর জন্যও প্রযোজ্য হয়, যেমন এখানে হয়েছে।

اَلْجَزُوْرُ : এটি একবচন, বহুবচনে جُزُرٌ ، جَزَائِرُ অর্থ– উষ্ট্রী।

وَعَنْهُ ٢٧٣١ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

২৭৩১. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতেই বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন– ষাঁড় দ্বারা সঙ্গম করিয়ে তার মজুরি গ্রহণ করা হতে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নরপশু দ্বারা স্ত্রীপশুকে সঙ্গম করিয়ে এর বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, এতে এমন একটি কাজের বিনিময় গ্রহণ করা হয়, যা সংঘটিত হওয়া না হওয়া অনিশ্চিত, কখনো এর দ্বারা গর্ভ ধারণ হয় আবার কখনো হয় না। এ কারণে অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম এটাকে হারাম বলেছেন। তবে নরপশুকে সঙ্গম করানোর জন্য ঋণ স্বরূপ দেওয়া মুস্তাহাব। অবশ্য স্ত্রীপশুর মালিক যদি এর বিনিময়ে স্বেচ্ছায় কিছু দেয়, তাহলে তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

وَعَنْ ٢٧٣٢ جَابِرٍ (رضـ) (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْاَرْضِ لِتُحْرَثَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৭৩২. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন– উষ্ট্র দ্বারা পাল দিয়ে এর মজুরি গ্রহণ করা হতে এবং চাষের জন্য কোনো ব্যক্তিকে জমি ও পানি দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা হতে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْاَرْضِ لِتُحْرَثَ **-এর মর্মার্থ :** চাষের জন্য জমি ও পানি দিয়ে এর বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধ করার অর্থ হলো– কেউ তার জমি ও তার পানি এ শর্তে কাউকে চাষ করতে দেওয়া যে, এ জমি ও পানি আমার আর বীজ ও পরিশ্রম তোমার এবং এ হতে যে ফসল উৎপন্ন হবে তার একটা নির্দিষ্ট অংশ আমার। নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো এখানে পারিশ্রমিক ও [উৎপন্ন দ্রব্য] মুনাফা উভয়টিই অনির্দিষ্ট ও অস্তিত্বহীন।

وَعَنْهُ ٢٧٣٣ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৭৩৩. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতেই বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি কাউকে দান করে এর বিনিময় গ্রহণ করা হতে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنٰى بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ [بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ-এর মর্মার্থ] : অর্থাৎ যদি কারো মালিকানায় এত পরিমাণ পানি থাকে, যা তার প্রয়োজনের চেয়ে অধিক হয়, আর অপর ব্যক্তি পানির মুখাপেক্ষী হয়, তাহলে ঐ বেঁচে যাওয়া পানি আটকে রাখা ও অন্যের নিকট বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। তবে এটা হলো ঐ ব্যক্তির নিজে পান করা ও পশুকে পান করানোর জন্য। কিন্তু যদি সে নিজের জমি ও বৃক্ষে সেচ দেওয়ার জন্য নিতে চায়, তাহলে মালিকের অধিকার আছে যে, তার কাছ থেকে পারিশ্রমিক নেবে।

وَعَنْ ٢٧٣٤ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭৩৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, স্বয়ং উৎপন্ন ঘাসের মূল্য [যা গ্রহণ করা জায়েজ নয়, এটা] আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানির মূল্য গ্রহণ করতে পারবে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنٰى لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ الخ [لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ الخ বাক্যের অর্থ] : পানি বিক্রি করার দ্বারা ঘাস বিক্রি করা আবশ্যক হয়, কথাটির অর্থ হলো যেমন– এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির মালিকানাধীন পানির আশেপাশে তার পশুরপাল চরায়। আর একথা স্পষ্ট যে, পশুপাল বিচরণের পর অবশ্যই পানি পান করবে। কিন্তু পানির মালিক অন্যের পশুকে বিনামূল্যে পানি দেয় না। তখন ঐ ব্যক্তি বাধ্য হবে তার নিকট থেকে পানি ক্রয় করতে। এভাবে মূলত পানি বিক্রয় বনাম ঘাস বিক্রয় করা হলো। আর ঘাস বিক্রয় জায়েজ নেই।

* আল্লামা খাত্তাবী (রা.) এর আরও একটা পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, যে কোনো এক ব্যক্তি কোনো সরকারি পতিত জমিতে কূপ খনন করে এর মালিক হয়ে গেল। এর আশেপাশের জমিতে ঘাস আছে, আর ঐ কূপ ব্যতীত সেখানে অন্য কোনো পানি নেই। এখন কূপের মালিক যদি পানি না দেয়, তাহলে পশুর মালিক এ সরকারি পতিত জমিতে পশুপাল চরাতে পারে না। এ সুযোগে কূপের মালিক ঐ ঘাসের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। এ কারণেই তাকে অতিরিক্ত পানি আটকে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এটা ঘাসকে বাধা দেওয়ারই নামান্তর। অথচ ঘাস সকলের জন্যই বৈধ। اَئِمَّةُ ثَلَاثَةُ-এর নিকট এটা হবে مَكْرُوْه تَحْرِيْمِىْ আর অন্যান্য ইমামগণের মতে এটা শুধুমাত্র সহানুভূতি সহমর্মিতার জন্যই বলা হয়েছে। কেননা মালিকের অধিকার আছে তার জিনিস অন্যকে দেওয়ার বা না দেওয়ার, তাকে কোনোরূপ বাধ্য করা যাবে না।

وَعَنْهُ ٢٧٣٥ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتْ اَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ اَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتّٰى يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّىْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৭৩৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতেই বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা [বিক্রয় করার জন্য স্তূপীকৃত] খাদ্যবস্তুর একটি স্তূপের নিকট দিয়ে গমনকালে এর ভিতরে হাত ঢুকালেন। স্তূপের ভিতরে হাতে ভিজা অনুভব হলো। তিনি ঐ স্তূপের মালিককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? ঐ ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বৃষ্টির পানিতে ঐগুলো ভিজে গিয়েছিল। নবী করীম ﷺ বললেন, ভিজাগুলোকে স্তূপের উপরে কেন রাখলে না, যাতে লোকেরা তা দেখতে পায়? যে ব্যক্তি প্রবঞ্চনা করবে, আমার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। –[মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২৭৩৬ - عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الثُّنْيَا اِلَّا اَنْ يُعْلَمَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

২৭৩৬. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে বিক্রীত বস্তু হতে অনির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু অংশ বাদ রাখতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ বাদ রেখে বিক্রয় করে, তবে তা জায়েজ হবে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[مَعْنٰى نَهٰى عَنِ الثُّنْيَا اِلَّا اَنْ يُعْلَمَ] نَهٰى عَنِ الثُّنْيَا اِلَّا اَنْ يُعْلَمَ-এর মর্মার্থ : অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি কোনো জিনিস বিক্রয়ের সময় এরকম বলবে যে, আমি এ জিনিস তোমার নিকট বিক্রয় করলাম, কিন্তু তা হতে কিছু অংশ বাদ থাকবে, এভাবে مَبِيْع হতে কিছু অংশ ব্যতিক্রম রাখা হলো بَيْع ثُنْيَا হুজুর ﷺ এ ধরনের ক্রয়বিক্রয় নিষিধ করেছেন। কেননা এখানে مبيع বা পণ্য অনির্দিষ্ট থাকে। তবে যদি নির্দিষ্ট করা হয়, সেক্ষেত্রে জায়েজ হবে।

২৭৩৭ - وَعَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتّٰى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتّٰى يَشْتَدَّ هٰكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَلَيْسَ عِنْدَهُمَا بِرِوَايَتِهِ نَهٰى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتّٰى تَزْهُوَ اِلَّا بِرِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتّٰى تَزْهُوَ وَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ عَنْ اَنَسٍ وَالزِّيَادَةُ الَّتِيْ فِي الْمَصَابِيْحِ وَهِيَ قَوْلُهُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتّٰى تَزْهُوَ اِنَّمَا ثَبَتَ فِيْ رِوَايَتِهِمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى تَزْهُوَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ـ

২৭৩৭. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন আঙ্গুর বিক্রয় করতে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা কালো না হয়; শস্য বিক্রয় করতে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা পুষ্ট না হয়। তিরমিযী ও আবূ দাউদ এ রকম বর্ণনা করেছেন, তবে তাঁদের বর্ণনাতে نَهٰى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتّٰى تَزْهُوَ উল্লেখ নেই [তিনি খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, যে পর্যন্ত তা লাল বা হলুদ না হয়ে যায়] হযরত ইবনে ওমরের বর্ণনা ব্যতীত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, যে পর্যন্ত তা লাল বা হলুদ না হয়। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।]

মাসাবীহ নামক গ্রন্থে অতিরিক্ত উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتّٰى تَزْهُوَ খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, যে পর্যন্ত তা লাল বা হলুদ না হয়ে যায়।

তিরমিযী ও আবূ দাউদের এক বর্ণনায় হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তা লাল বা হলুদ না হয়ে যায়। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদীস হাসান গরীব।

২৭৩৮ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ـ (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

২৭৩৮. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয় করতে। – [দারাকুতনী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَيْعُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ -এর পদ্ধতি : كَالِئٌ এটি كَلَأٌ থেকে مُشْتَقٌّ [নির্গত] হয়েছে, যার অর্থ হলো– ঋণ, বিলম্ব, অবকাশ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ - بَيْعُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ -এর কয়েকটি পদ্ধতি হতে পারে–

১. ক্রয়বিক্রয়ের সময় মূল্য ও পণ্য কোনোটিই পরিশোধ করা হয় না। এটা নাজায়েজ, কেননা بَيْع সঠিক হওয়ার জন্য কমপক্ষে একপক্ষ তৎক্ষণাৎ পরিশোধ হওয়া আবশ্যক।

২. যেমন ওমরের নিকট খালেদের একটি কাপড় ঋণ আছে, এদিকে এ ওমরের নিকট রাশেদের ১০ টাকা পাওনা আছে। এখন খালেদ রাশেদকে বলল যে, আমি তোমার ১০ টাকার বিনিময়ে আমার ঐ কাপড়টা বিক্রয় করছি, যা আমি ওমরের নিকট পাই। এখন তুমি আর আমার নিকট টাকার দাবি করবে না; বরং তার বদলায় ওমর থেকে টাকা উসুল করে নেবে। খালেদ বলল, আমি রাজি আছি। এটাও নিষিদ্ধ।

৩. কারো থেকে কোনো জিনিস বাকিতে ক্রয় করল, যখন ঐ বাকির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তখন ব্যবসায়ী ক্রেতার নিকট টাকা দাবি করে, কিন্তু তখন সে টাকা পরিশোধ করতে সক্ষম হয়নি। এজন্য ব্যবসায়ীকে বলল যে, এটা আপনি আমার নিকট আরেকটি মেয়াদের জন্য কিছু অধিক মূল্যে বিক্রয় করুন। ব্যবসায়ী বলল, ঠিক আছে। অথচ সে ঐ জিনিসের উপর কবজা করেনি। এটাও নিষিদ্ধ। –[মেরকাত– খ. ৬, পৃ. ৮০]

وَعَنْ ٢٧٣٩ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ . (رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৭৩৯. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শোআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন– 'ওরবান' [বায়না] জাতীয় ক্রয়বিক্রয় হতে। –[মালেক, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ بَيْعِ الْعُرْبَانِ [بَيْعُ الْعُرْبَانِ -এর ব্যাখ্যা] : بَيْعُ الْعُرْبَانِ -এর পদ্ধতি হলো ক্রেতার সাথে দামাদামি চূড়ান্ত হওয়ার সময় বিক্রেতাকে কিছু টাকা বায়না স্বরূপ এ শর্তে দেবে যে, ঐ মাল নির্দিষ্ট তারিখে পূর্ণ টাকা পরিশোধ করে না নিলে এ টাকা বাতিল হয়ে যাবে। এর প্রচলন বর্তমানেও আছে। এ بَيْع সম্পর্কে ইমামদের মতানৈক্য রয়েছে–

ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে এটা জায়েজ। দলিলস্বরূপ তিনি বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রা.) এর অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু أَئِمَّةٌ ثَلَاثَةٌ -এর মতে জায়েজ নেই। তাঁদের দলিল হলো بَابٌ -এর হাদীস– نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ তাছাড়া এটি হলো فَاسِدٌ শর্ত ও প্রতারণাপূর্ণ, আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ -এর মধ্যে এ بَيْع -ও অন্তর্ভুক্ত হবে।

وَعَنْ ٢٧٤٠ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

২৭৪০. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন– জবরদস্তিমূলক ক্রয়বিক্রয় হতে এবং প্রতারণামূলক বস্তুর ক্রয়বিক্রয় হতে এবং পুষ্ট হওয়ার পূর্বে ফল ক্রয়বিক্রয় করা হতে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَيْعُ الْمُضْطَرِّ-এর পদ্ধতি : এ প্রকার بَيْع-এর দুটি পদ্ধতি হতে পারে–

১. আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেন, بَيْع مُضْطَرّ -এর পদ্ধতি হলো কাউকে বেচাকেনায় বাধ্য করা, যেমন– কোনো ব্যক্তি بَيْع করতে ইচ্ছুক নয়; কিন্তু এমনভাবে বাধ্য করা যে, সে বেচাকেনা করতে বাধ্য হয়। এ ধরনের بَيْع ফাসেদ হবে।

২. কোনো ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে অথবা সে সংসারের দায়িত্বশীল; কিন্তু তার নিকট টাকা নেই, তাই তাকে বাধ্য হয়ে, নিজের কোনো সম্পদ অল্পমূল্যে বিক্রয় করতে ইচ্ছুক হয়, তখন মানবতার দাবি হলো সেই জিনিস ক্রয় না করে তাকে কোনো জিনিস দান করে বা ঋণ দিয়ে সহযোগিতা করা। তথাপি যদি কোনো ব্যক্তি ক্রয় করে, তাহলে সে بَيْع জায়েজ হবে; কিন্তু মাকরূহ হবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَلْمُضْطَرُّ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাবে اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِضْطِرَارُ মূলবর্ণ (ض . ر . ر) অর্থ– বাধ্য।

وَعَنْ ٢٧٤١ أَنَسٍ (رض) أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

২৭৪১. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, কেলাব গোত্রের এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল ষাঁড়ের পাল বা প্রজননের মজুরি গ্রহণ সম্পর্কে। নবী করীম ﷺ তাকে নিষেধ করলেন। তখন সে ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা ষাঁড়ের পাল দিয়ে থাকি এবং এর বিনিময়ে সৌজন্যমূলক কিছু পেয়ে থাকি। নবী করীম ﷺ ঐ রূপ সৌজন্য গ্রহণের অনুমতি প্রদান করলেন। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَلْفَحْلُ : এটি একবচন, বহুবচনে فُحُوْلٌ অর্থ– ষাঁড়।

نُطْرِقُ : সীগাহ جَمع مُتَكَلِّم বহছ اِثْبَات فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِطْرَاقُ অর্থ– নরপশু দ্বারা স্ত্রীপশুকে সঙ্গম করানো।

وَعَنْ ٢٧٤٢ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ (رض) قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أَبِيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدِيْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ وَلِأَبِيْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَأْتِيْنِي الرَّجُلُ فَيُرِيْدُ مِنِّي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِيْ فَأَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوْقِ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ .

২৭৪২. **অনুবাদ :** হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন ঐ বস্তু বিক্রয় করতে, যা আমার দখলে নেই। –[তিরমিযী]

তিরমিযীর আরেক বর্ণনায় এবং আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে আছে, হাকীম ইবনে হেযাম বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোনো লোক আমার নিকট এসে কোনো বস্তু ক্রয় করতে চায়, তা আমার নিকট নেই। আমি [কি] এক বাজার হতে তার জন্য তা ক্রয় করে আনব। [– এ আশায় যে, আমি তার নিকট তা বিক্রয় করব।] তিনি বললেন, তোমার দখলে যা নেই, তা বিক্রি করো না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলেন, ক্রয়বিক্রয়ের সময় যা মালিকানায় না থাকে, তা বিক্রয় করা যাবে না। এর দুটি পদ্ধতি হতে পারে–

১. যে জিনিসটির মালিকানাও তার নয় এবং জিনিসটি তার কাছেও নেই, এ অবস্থায় ঐ জিনিসের بَيْع সহীহ হবে না।

২. যে জিনিসটির মালিক সে নয়, কিন্তু জিনিসটি তার নিকট বিদ্যমান আছে। এ অবস্থাতেও আসল মালিকের অনুমতি ব্যতীত ক্রয়বিক্রয় সহীহ হবে না। কিন্তু যদি মালিকের অনুমতি ব্যতীত বিক্রি করে, তাহলে ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে তা মালিকের অনুমতির উপর নির্ভর করবে। সে অনুমতি দিলে সহীহ হবে, নতুবা হবে না। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কোনোক্রমেই উক্ত بَيْع সহীহ হবে না; মালিক অনুমতি দিক বা না দিক।

وَعَنْ ٢٧٤٣ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِىْ بَيْعَةٍ. (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

২৭৪৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন– একই বিক্রির মধ্যে দু-রকমের বিক্রি হতে। –[মালেক, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَيْعَتَيْنِ فِىْ بَيْعَةٍ-এর অর্থ [مَعْنٰى بَيْعَتَيْنِ فِىْ بَيْعَةٍ] : "একই বিক্রির মধ্যে দু-রকমের বিক্রি" -এর দুটি পদ্ধতি হতে পারে–

১. আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেন– اَنْ يَّقُوْلَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِىْ بِعْتُكَ هٰذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَنَسِيْئَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَةَ অর্থাৎ বিক্রেতা ক্রেতাকে বলে, তোমার নিকট এ কাপড়টি বিক্রয় করলাম। নগদ হলে দশ টাকা, আর বাকি হলে পনেরো টাকা। এরকম بَيْع জায়েজ হবে না। কেননা ثَمَنْ অনির্দিষ্ট।

২. বিক্রেতা ক্রেতাকে বলে আমি তোমার নিকট আমার এ গোলামটি দশ দিনারে বিক্রয় করলাম এ শর্তে যে, তুমি তোমার দাসী আমার নিকট দশ দিনারে বিক্রয় করবে। এ ধরনের بَيْع ও فَاسِدْ হবে। কেননা এখানে এমন শর্তারোপ করেছে, যা بَيْع-এর চাহিদার পরিপন্থি, তাছাড়া এক بَيْع পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে অন্য بَيْع সম্পাদন করেছে; যা জায়েজ নেই। ইমাম আবূ হানীফা ও শাফেয়ী (র.) এ মতই পোষণ করেন। –[তানযীমুল আশতাত খ. ২, পৃ. ১৩৫]

وَعَنْ ٢٧٤٤ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِىْ صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ - (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

২৭৪৪. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শোআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন দুই বিক্রয়ের ব্যবস্থা এক বিক্রয়ের মধ্যে করা হতে। –[শরহুস্ সুন্নাহ]

وَعَنْهُ ٢٧٤٥ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِىْ بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ)

২৭৪৫. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শোআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঋণ এবং ক্রয়বিক্রয় একসঙ্গে জায়েজ নয়। এক বিক্রয়ের সঙ্গে দুটি শর্ত জুড়ে দেওয়াও জায়েজ নয়। যে বস্তুর খেসারতের দায়িত্ব বর্তেনি– তার লাভের অধিকার হাসিল হবে না। আর যে বস্তু তোমার হস্তগত নয়, তা বিক্রি করাও জায়েজ নয়। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদীস সহীহ।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ : "ঋণ ও ক্রয়বিক্রয় হালাল নয়" কথাটির তাৎপর্য হলো, উভয় লেনদেনকে একত্রিত করা উচিত নয়। যেমন– কোনো ব্যক্তি কারো নিকট কোনো জিনিস বিক্রয় করে যে ক্রেতা তাকে কিছু টাকা ঋণ দেবে। অথবা কোনো ব্যক্তি কাউকে ঋণ দিয়ে ঋণগ্রহীতার নিকট কোনো জিনিস আসল মূল্যের অধিক মূল্যে বিক্রয় করে। উভয় প্রকারই হারাম।

قَوْلُهُ لَا شَرْطَانِ فِيْ بَيْعٍ : "এক بيع -এর মধ্যে দু-শর্তারোপ করবে না" এ বাক্যের একটি উদ্দেশ্য হলো যা بَيْعَتَيْنِ فِيْ بَيْعَةٍ -এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

* অথবা কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো এক ক্রয়বিক্রয়ে দু-শর্তারোপ করা জায়েজ নয়। তবে এক শর্ত জায়েজ। যেমন কোনো ব্যক্তি ক্রেতাকে বলল, আমি তোমার নিকট এ কাপড়টি দশ টাকায় বিক্রয় করব, তবে শর্ত হলো ধোলাই ও সেলাই করে দেব। এটা জায়েজ নয়। হ্যাঁ যদি শুধু সেলাই বা ধোলাই এর শর্ত করে, তাহলে জায়েজ হবে। এটা হলো ইমাম আহমদ ও ইবনে শুবরুমার অভিমত।

* ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, শর্তারোপের সাথে ক্রয়বিক্রয় مُطْلَقًا নাজায়েজ। এখানে দুয়ের কথা স্বভাবিকভাবেই বলা হয়েছে। তাঁদের দলিল হলো– عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ

সুতরাং باب -এর হাদীসের অর্থ হবে, উভয় পক্ষ থেকে শর্তারোপ করা জায়েজ নয়।

وَعَنْ ٢٧٤٦ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كُنْتُ اَبِيْعُ الْاِبِلَ بِالنَّقِيْعِ بِالدَّنَانِيْرِ فَاٰخُذُ مَكَانَهَا الدَّرَاهِمَ وَاَبِيْعُ بِالدَّرَاهِمِ فَاٰخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيْرَ فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ اَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

২৭৪৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি নকী' নামক স্থানে উট বিক্রি করতাম দিনারের [স্বর্ণ-মুদ্রার] বিনিময়ে। মূল্য গ্রহণকালে আমি ঐ স্বর্ণ-মুদ্রার স্থলে ক্রেতার নিকট হতে দিরহাম [রৌপ্য-মুদ্রা] গ্রহণ করতাম। কোনো সময় রৌপ্য-মুদ্রা বিক্রি করে এর স্থলে স্বর্ণ-মুদ্রা গ্রহণ করতাম। আমি নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে ঐ বিষয়ের উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, স্বর্ণ-মুদ্রা ও রৌপ্য-মুদ্রার উপস্থিত বিনিময়-হার অনুযায়ী বদল গ্রহণে কোনো দোষ নেই। কোনো অংশও বাকি রেখে ক্রেতা বিক্রেতা পরস্পর পৃথক হতে পারবে না। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী]

وَعَنْ ٢٧٤٧ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ (رض) اَخْرَجَ كِتَابًا هٰذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِشْتَرٰى مِنْهُ عَبْدًا اَوْ اَمَةً لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

২৭৪৭. অনুবাদ : হযরত আদ্দা ইবনে খালেদ ইবনে হাওযা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি একটি লেখা বের করলেন, যা ছিল একটি চুক্তিনামা, [ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত] আদ্দা ইবনে খালেদ ইবনে হাওযা ও মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মধ্যে। তিনি তাঁর নিকট থেকে একটি দাস বা দাসী ক্রয় করেছেন। যার মধ্যে কোনো রোগ ছিল না, কোনো দোষ ছিল না, কোনো খারাবি ছিল না, এক মুসলমান অপর মুসলমানের সাথে ক্রয়বিক্রয়ের মতো। –[তিরমিযী। তিনি বলেছেন, এ হাদীস গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দ-বিশ্লেষণ : دَاءٌ : এটি একবচন, বহুবচনে أَدْوَاءٌ অর্থ– দোষ, ত্রুটি, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য রোগ। এখানে কুষ্ঠ, উন্মাদনা ইত্যাদি প্রকাশ্য রোগ-ব্যাধি উদ্দেশ্য।

غَائِلَةٌ : এটি একবচন, বহুবচনে غَوَائِلُ অর্থ– অনিষ্ট, আভ্যন্তরীণ দোষ-ত্রুটি। যেমন– জেনা, ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদির স্বভাব।

وَعَنْ ٢٧٤٨ أَنَسٍ (ض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيْ هٰذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَزِيْدُ عَلٰى دِرْهَمٍ فَاَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৭৪৮. **অনুবাদ** : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একখণ্ড কম্বল ও একটি পেয়ালা বিক্রি করতে চাইলেন। তিনি ক্রেতা আহ্বানে বলতে লাগলেন, এ কম্বলখণ্ড ও পেয়ালা কে ক্রয় করবে? এক ব্যক্তি বলল, আমি উভয়টিকে এক দিরহামের বিনিময়ে [রৌপ্য-মুদ্রায়] ক্রয় করতে পারি। নবী করীম ﷺ [নিলামের ডাক আকারে] বললেন, এক দিরহামের বেশি কে দেবে? এক ব্যক্তি তাঁকে দুই দিরহাম বিনিময় দিল। তিনি ঐ ব্যক্তির নিকট তা বিক্রয় করে দিলেন। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের পেক্ষাপট : এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ -এর দরবারে এসে কিছু ভিক্ষা চাইল। হুজুর ﷺ তাকে বললেন, তোমার নিকট বিক্রয়যোগ্য কিছু আছে কি? সে বলল, আমার নিকট একমাত্র একটি চট ও পাত্র ব্যতীত আর কিছু নাই। হুজুর ﷺ বললেন, সেটি বিক্রি করে খাবারের ব্যবস্থা কর! যখন তা শেষ হয়ে যাবে, তখন ভিক্ষা করবে। অতঃপর লোকটি এ জিনিস দুটি নিয়ে হুজুরের দরবারে হাজির হলো। অতঃপর হুজুর ﷺ উক্ত পদ্ধতিতে তা বিক্রয় করলেন। শরিয়তের পরিভাষায় এ ধরনের بَيْع -কে بَيْعُ مَنْ يَزِيْدُ আর বাংলায় নিলাম বলা হয়। এটা শরিয়তসম্মত।

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ **[দুই হাদীসের মাঝে দ্বন্দ্ব]** : উপরে একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– لَا يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ أَخِيْهِ তোমরা অপরের بَيْع -এর মধ্যে بَيْع করো না। আর নিলামের মধ্যে তো তাই হয়ে থাকে।

دَفْعُ التَّعَارُضِ **[দ্বন্দ্বের সমাধান]** : এ দ্বন্দ্বের নিরসনে ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, নিষেধাজ্ঞা হলো ঐ সুরতে যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতা কোনো একটি দামের উপর রাজি হয়ে যায় এবং بَيْع চূড়ান্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় অন্যের সেখানে গিয়ে দামাদামি করা জায়েজ হবে না। কিন্তু এখানে যে সুরত বলা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। কেননা এখানে বিক্রেতার উদ্দেশ্য হলো, যে সর্বাধিক দাম বলবে– সেই মাল পাবে। কেননা নিলামের মধ্যে এ ধরনেরই হয়ে থাকে। প্রতিযোগিতামূলকভাবে একজন অপরজনের চেয়ে দাম বেশি বলে থাকে। যে সর্বাধিক মূল্য বলে, তার কাছেই বিক্রয় করে দেওয়া হয়।

শব্দ-বিশ্লেষণ : حِلْسٌ : এটি একবচন, বহুবচনে أَحْلَاسٌ অর্থ– পাটের সুতার তৈরি মোটা বস্ত্রবিশেষ, চট, ছালা, কম্বল।

قَدَحٌ : এটি একবচন, বহুবচনে أَقْدَاحٌ অর্থ– পাত্র, পেয়ালা, বাটি।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٧٤٩ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُنَبِّهْهُ لَمْ يَزَلْ فِيْ مَقْتِ اللّٰهِ اَوْ لَمْ تَزَلِ الْمَلٰئِكَةُ تَلْعَنُهُ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

২৭৪৯. **অনুবাদ** : হযরত ওয়াছেলা ইবনে আসকা' (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি কোনো দোষযুক্ত বস্তু এর দোষ জ্ঞাত না করে বিক্রি করবে, সে সর্বদা আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে নিমজ্জিত থাকবে। অথবা বলেছেন, সদা তার প্রতি ফেরেশতাগণ লানত ও অভিশাপ করবেন। –[ইবনে মাজাহ]

بَابٌ
পরিচ্ছেদ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٧٥٠ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ اَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اِلَّا اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ اِلَّا اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ الْمَعْنَى الْاَوَّلَ وَحْدَهُ)

২৭৫০. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো খেজুর বাগান ক্রয় করে এর 'তাবীর' করার পর, সেক্ষেত্রে ঐ বাগানের বর্তমান ফল বিক্রেতার স্বত্ব হবে। অবশ্য যদি ক্রেতার জন্য হওয়া শর্ত করা হয়, তবে ক্রেতাই পাবে। যে ব্যক্তি কোনো ক্রীতদাস ক্রয় করে এবং ঐ ক্রীতদাসের সংশ্লিষ্টে কোনো মাল রয়েছে, সেই মাল বিক্রেতার হবে। অবশ্য যদি ক্রেতার জন্য হওয়া শর্ত করা হয়, [তবে ক্রেতার হবে।] -[মুসলিম, আর বুখারী শুধু প্রথম অংশ বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّابِيْرُ-এর আভিধানিক অর্থ : تَابِيْر শব্দটি বাবে تَفْعِيْل-এর মাসদার, اَبْرٌ মূলধাতু থেকে নির্গত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. تَلْقِيْحُ النَّخْلِ বা গাছের কলপ লাগানো। ২. اَلْاِصْلَاحُ বা সংস্কার করা। ৩. اَلشَّقُّ বা কর্তন ও বিদীর্ণ করা।

اَلتَّابِيْرُ-এর পারিভাষিক অর্থ : মোল্লা আলী কারী (র.) মেরকাত গ্রন্থে বলেন-

وَهُوَ اَنْ يُوْضَعَ شَيْءٌ مِنْ طَلْعِ فُحَّلِ النَّخْلِ فِيْ طَلْعِ الْاُنْثٰى اِذَا انْشَقَّ فَتَصْلُحُ ثَمَرَتُهُ بِاِذْنِ اللّٰهِ .

অর্থাৎ খেজুর বৃদ্ধির লক্ষ্যে নর-খেজুরের পুষ্প রেণুকে স্ত্রী-খেজুর গাছের কাঁদিকে বিদীর্ণ করে তাতে প্রবিষ্ট করানো। এটাকে تَابِيْر বলে।

পরাগায়নকৃত গাছের ফলের স্বত্ব নিয়ে ইমামদের মতানৈক্য : তা'বীরকৃত খেজুর গাছ বিক্রয় করলে এর ফলের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে-

* ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতে তাবীরকৃত গাছ বিক্রি করা হলে, এর ফল বিক্রেতা পাবে। তবে ক্রেতা ক্রয়ের সময় ফলের শর্ত করলে তা ক্রেতাই পাবে। তাঁদের দলিল হচ্ছে-

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ اُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ اِلَّا اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

আর তাবীর করার পূর্বে বিক্রি করা হলে ফল ক্রেতা পাবে। তবে বিক্রেতা ফলে শর্তারোপ করলে বিক্রেতা পাবে। কেননা অত্র হাদীসে نَخْلًا শব্দকে قَدْ اُبِّرَتْ শব্দ দ্বারা قَيْد করা হয়েছে, তাই مَفْهُوْم مُخَالِفْ হিসেবে شَجَر غَيْر مُؤَبَّر-এর ফলের মালিক ক্রেতা হবে। শর্তারোপ করলে বিক্রেতা পাবে।

* ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন যে, تَابِيْر করা হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় বিক্রেতা ফলের মালিক হবে। তবে শর্তারোপ করলে ক্রেতা পাবে। তাঁদের দলিল হচ্ছে-

مَنِ اشْتَرٰى اَرْضًا فِيْهَا نَخْلٌ فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ اِلَّا اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

এখানে نَخْل শব্দটি عَامٌ যা তাবীরকৃত বা তাবীরবিহীন সবগুলোকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

اَلْأَئِمَّةُ الثَّلٰثَةُ‎ [اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيلِ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ‎-এর দলিলের জবাব] :

১. أَئِمَّةُ ثَلَاثَةٌ তাঁদের দলিলে مَفْهُوم مُخَالِفٌ দ্বারা দলিল দিয়েছেন, যা গ্রহণযোগ্য নয়।

২. আল্লামা ত্বীবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেন, উক্ত হাদীসে تَأْبِيْر দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফল প্রকাশিত হওয়া। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি বৃক্ষে ফল প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই বিক্রয় করে, তাহলে ফল ক্রেতা পাবে, আর ফল প্রকাশ হওয়ার পর বিক্রয় করলে ফল বিক্রেতা পাবে। কিন্তু যদি ক্রেতা কোনো শর্তারোপ করে। সুতরাং এ হাদীস হানাফীদের বিপক্ষে নয়। –[বাযলুল মাজহূদ- খ. ৪, পৃ. ১৬৭]

* আমাদের হাদীসটি عُمُوْم বা ব্যাপকতার দাবি করে, সুতরাং এর উপরই আমল করা উত্তম।

وَعَنْ ٢٧٥١ جَابِرٍ (رض) أَنَّهُ كَانَ يَسِيْرُ عَلٰى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيٰى فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ فَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَيْسَ يَسِيْرُ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ بِعْنِيْهِ بِوُقِيَّةٍ قَالَ فَبِعْتُهُ فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلٰى أَهْلِيْ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِيْ ثَمَنَهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَأَعْطَانِيْ ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِبِلَالٍ اِقْضِهِ وَزِدْهُ فَأَعْطَاهُ وَزَادَهُ قِيْرَاطًا .

২৭৫১. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একদা তিনি তাঁর একটি উটের উপর আরোহণ করে চলছিলেন, উটটি নিতান্তই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় নবী করীম ﷺ তাঁর নিকট দিয়ে গেলেন এবং উটটিকে আঘাত করলেন। তাতে উটটি এমন দ্রুত গতিতে চলতে লাগল যে, ঐরূপ চলতে সে সক্ষম ছিল না। অতঃপর নবী করীম ﷺ বললেন, উটটি আমার নিকট চল্লিশ দিরহামে [রৌপ্য-মুদ্রায়] বিক্রয় করে ফেল। তিনি বলেন, সেমতে আমি তা বিক্রি করলাম, কিন্তু এ শর্ত করলাম যে, আমি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে এর উপর আরোহণ করব। মদিনায় পৌঁছার পর আমি উটটি নিয়ে নবীজীর নিকট উপস্থিত হলাম; তিনি আমাকে এর মূল্য আদায় করে দিলেন। অপর এক বর্ণনায় আছে– তিনি আমাকে এর মূল্য আদায় করে দিলেন এবং উটটিও আমাকে ফেরত দিয়ে দিলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, তিনি হযরত বেলাল (রা.) -কে বললেন, তাঁকে তাঁর প্রাপ্য আদায় করে দাও এবং কিছু অতিরিক্তও প্রদান কর। সেমতে হযরত বেলাল (রা.) হযরত জাবের (রা.)-কে তাঁর প্রাপ্য [চল্লিশ দিরহাম পরিমাণ রৌপ্য] প্রদান করলেন এবং অতিরিক্ত এক কীরাত [পরিমাণবিশেষ] দিলেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَيْعٌ بِالشَّرْطِ-**এর হুকুম :** শর্তাসাপেক্ষে بَيْعٌ সহীহ হওয়া সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে–

১. ইমাম আহমদের মতে পশুর ক্ষেত্রে بَيْعٌ بِالشَّرْطِ জায়েজ আছে। যেমন বিক্রেতা আরোহণ করার শর্ত সাপেক্ষে বিক্রয় করে বলে আমি বিক্রয় করলাম; কিন্তু আমি এতটুকু পরিমাণ সওয়ার হবো। তাঁর দলিল এ হাদীসের অংশ فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلٰى أَهْلِيْ এখানে হযরত জাবের (রা.) হুজুরের নিকট উট বিক্রয়কালে আরোহণের শর্তারোপ করেন।

২. ইমাম মালেকের মতে, সামান্য পরিমাণ পথ সওয়ার হওয়ার শর্ত হলে জায়েজ আছে, কেননা উল্লিখিত স্থান থেকে মদিনার দূরত্ব সামান্য পথ ছিল।

৩. ইমাম আবূ হানীফা ও শাফেয়ী (র.)-এর নিকট এরকম শর্ত লাগানো কোনোক্রমেই বৈধ নয়। তাঁদের দলিল–
نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ .

اَلْجَوَابُ : এটি একটি সাময়িক ঘটনা, যা হযরত জাবেরের সাথেই خَاصّ ছিল। এটি বাহ্যত بَيْع ছিল, কিন্তু মূলত উদ্দেশ্য হযরত জাবেরকে পুরস্কার প্রদান করা।

অথবা বলা যায় যে, এ শর্ত হযরত জাবের আরোপ করেননি; বরং হুজুর ﷺ বিশেষ কমিশন স্বরূপ তাকে প্রদান করেছিলেন। আর এটা ছিল শর্ত নিষেধ হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَعْيٰى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر বহছ اِسْم تَفْضِيْل বাবে اِفْعَال মাসদার اَلْاِعْيَاءُ অর্থ– ক্লান্ত হওয়া।

وُقِيَّةٌ : এটি একবচন, বহুবচনে وُقَايَا . وُقِيّ . رِطْلٌ -এর অংশ; এক ধরনের ওজন ৭ মিছকাল সমপরিমাণ। اُوْقِيَّةٌ -এর সমার্থবোধক।

حُمْلَانَهٗ : এটি বাবে ضَرَبَ -এর মাসদার অর্থ– আরোহণ করা।

قِيْرَاطٌ : ১২ দানেক, কারো মতে দিনারের $\frac{৪}{৬}$ অংশ, আবার কারো মতে দিনারের $\frac{১}{১০}$ অংশ, কোনো জিনিসে $\frac{১}{২৪}$ অংশ পরিমাপবিশেষ।

وَعَنْ ٢٧٥٢ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ اِنِّيْ كَاتَبْتُ عَلٰى تِسْعِ اَوَاقٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ وُقِيَّةٌ فَاَعِيْنِيْنِيْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اِنْ اَحَبَّ اَهْلُكِ اَنْ اَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَاُعْتِقَكِ فَعَلْتُ وَيَكُوْنَ وَلَاءُكِ لِيْ فَذَهَبَتْ اِلٰى اَهْلِهَا فَاَبَوْا اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذِيْهَا وَاَعْتِقِيْهَا ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَ اِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ فَقَضَاءُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَشَرْطُ اللّٰهِ اَوْثَقُ وَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭৫২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত বারীরা (রা.) [তিনি একজন ক্রীতদাসী ছিলেন] একদা আমার নিকট এসে বলল, আমি আমার মালিকের সাথে নয় বছরে নয় উকিয়া [৩৩৬ দিরহাম] প্রতি বছর এক উকিয়া [৪০ দিরহাম] দেওয়ার শর্তে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলাম। তার জন্য আপনি আমাকে সাহায্য করুন। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, তোমার মালিক যদি পছন্দ করে [এবং তুমি রাজি হও] যে, সমুদয় দিরহাম একসঙ্গে আদায় করে আমি তোমাকে [ক্রয় করত] মুক্ত করে দেব, তা আমি করতে পারি এবং সেমতে তোমার মুক্তিদান সূত্রীয় উত্তরাধিকার-স্বত্বের অধিকারিণী গণ্য হবো আমি।

হযরত বারীরা (রা.) তার মালিকের নিকট গিয়ে এ কথা ব্যক্ত করলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করল এবং বলল, যদি উক্ত উত্তরাধিকার-স্বত্বের অধিকারী আমাদেরকে করা হয়, তবে আমরা রাজি আছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ [সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণান্তে হযরত আয়েশা (রা.)-কে] বললেন, তুমি তাকে ক্রয় করে নাও এবং মুক্ত কর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে একত্র করে ভাষণদানে দাঁড়ালেন, সেমতে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং বললেন, অতঃপর একশ্রেণির লোকের এই অভ্যাস কেন যে, তারা এরূপ শর্ত আরোপ করে, যা আল্লাহপ্রদত্ত শরিয়তে নেই? [যথা– যে ব্যক্তি ক্রীতদাস ক্রয় করে আজাদ করবে, সেই সূত্রে উত্তরাধিকার-স্বত্বের অধিকারী সে-ই হবে; ঐরূপ ক্ষেত্রে উক্ত স্বত্বের অধিকার বিক্রেতার জন্য শর্ত করা শরিয়তে নেই।]

যদি এরকম শর্ত করে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই, তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এমনকি যদি একশ শর্তও করে, তাহলেও আল্লাহ তা'আলার বিধানই অগ্রগণ্য এবং আল্লাহ তা'আলার দেওয়া শর্তই সর্বাধিক মজবুত। নিশ্চয় মুক্তকরণ সূত্রের উত্তরাধিকার-স্বত্ব একমাত্র মুক্তকারীর জন্যই সাব্যস্ত থাকবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَاتَبْتُ عَلٰى تِسْعٍ বাক্যের ব্যাখ্যা : كَاتَبْتُ শব্দটি مُكَاتَبَةٌ থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ হলো– পরস্পর লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। পরিভাষায় مكاتبة বলা হয়, গোলাম ও তার মালিকের মধ্যে এমন চুক্তি হওয়া যে, মালিক তাকে এ শর্তে মুক্ত করবে যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। সে যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা পরিশোধ করতে পারে, তাহলে চুক্তি অনুযায়ী আজাদ হয়ে যাবে। আর না পারলে পূর্বের ন্যায় গোলামই থেকে যাবে। এ ধরনের গোলামকে مُكَاتَبٌ [মুকাতাব] বলা হয়।

اَلْوَلَاءُ : শব্দের অর্থ হলো– মুক্তিদান সূত্রীয় উত্তরাধিকার স্বত্ব, যা গোলামের মালিক প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যদি কেউ তার নিজের গোলামকে আজাদ করে দেয় এবং ঐ আজাদ অবস্থায়ই সে মৃত্যুবরণ করে এবং মৃত্যুকালীন কিছু সম্পদ রেখে যায়, তখন তার নিকটতম আত্মীয়স্বজন থাকা অবস্থায় তার সমুদয় সম্পদের মালিক হবে আজাদকারী ব্যক্তি। একেই حَقُّ الْوَلَاءِ বলা হয়।

[تَشْرِيْحُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ] إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ বাক্যের ব্যাখ্যা] : হযরত বারীরা (রা.) ছিলেন হযরত আয়েশা (রা.)-এর পরিচারিকা। তিনি হযরত আয়েশার সংস্রবে আসার পূর্বে এক ইহুদির দাসী ছিলেন। যখন তিনি তাঁর মালিকের সাথে كِتَابَتْ করেন, তখন তিনি হযরত আয়েশার নিকট এসে বললেন, আমি আমার মালিকের সাথে নয় উকিয়ার বিনিময়ে এ শর্তে عَقْد كِتَابَتْ করেছি যে, প্রতি বছর এক উকিয়া করে পরিশোধ করব, সুতরাং আপনি আমাকে এ ব্যাপারে কিছু সাহায্য করুন! হযরত আয়েশা (রা.) এ কথা শুনে বললেন, তুমি গিয়ে তোমার মালিককে বল যে, তারা যদি রাজি থাকে, তাহলে আমি একসাথেই সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করে দেব, তবে حَقِّ وَلَاء থাকবে আমার। বারীরার মালিক পক্ষ حَقِّ وَلَاء বা উত্তরাধিকারী স্বত্ব ছাড়তে সম্মত না হওয়ায়, হযরত আয়েশা (রা.) হুজুরকে বিষয়টি অবহিত করালে সে প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ এ উক্তি করেন।

وَعَنْ ٢٧٥٣ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهٖ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭৫৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন মুক্তকরণ সূত্রের উত্তরাধিকার স্বত্বকে বিক্রি করা হতে এবং তা দান করা হতে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : حَقِّ وَلَاء বা মুক্তকরণ সূত্রের উত্তরাধিকার স্বত্বকে বিক্রি করা বা তা কাউকে দান করা অবৈধ। হুজুর ﷺ তা বিক্রয় বা দান করতে নিষেধ করেছেন। কেননা তা হলো نَسَب -এর ন্যায়। নসব যেরকম অন্যের নিকট হস্তান্তরযোগ্য নয়, তদ্রূপ وَلَاء-ও হস্তান্তরযোগ্য নয়।

আল্লামা নববী (র.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, وَلَاء-কে বিক্রয় বা দান করা সঠিক নয়। কেননা তা হস্তান্তরযোগ্য নয়। কেননা, তা হলো নসব দ্বারা প্রমাণিত মাংসপিণ্ডের ন্যায়। জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত এটাই। –[মেরকাত- খ. ৬, পৃ. ৮৯]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٧٥٤ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ قَالَ ابْتَعْتُ غُلَامًا فَاسْتَغْلَلْتُهٗ ثُمَّ ظَهَرْتُ مِنْهُ عَلٰى عَيْبٍ فَخَاصَمْتُ فِيْهِ اِلٰى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَضٰى لِيْ بِرَدِّهٖ وَقَضٰى عَلَيَّ بِرَدِّ غَلَّتِهٖ

২৭৫৪. অনুবাদ : মাখলাদ ইবনে খোফাফ (র.) বলেছেন, আমি একটি ক্রীতদাস ক্রয় করেছিলাম এবং তার দ্বারা কিছু উপার্জনও করিয়েছিলাম। অতঃপর তার মধ্যে একটি দোষ সম্পর্কে আমি অবগত হলাম এবং শাসনকর্তা ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের নিকট আমি তার অভিযোগ দায়ের করলাম। তিনি বিচার করলেন যে, আমি তাকে ফেরত দিতে পারব, অবশ্য এর দ্বারা যা কিছু উপার্জন করিয়েছি, তাও আমার ফেরত দিতে হবে।

فَاَتَيْتُ عُرْوَةَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَرُوْحُ اِلَيْهِ الْعَشِيَّةَ فَاُخْبِرُهُ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِىْ مِثْلِ هٰذَا اَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ فَرَاحَ اِلَيْهِ عُرْوَةُ فَقَضٰى لِىْ اَنْ اٰخُذَ الْخَرَاجَ مِنَ الَّذِىْ قَضٰى بِهٖ عَلَىَّ لَهٗ . (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

আমি তাবেয়ী ওরওয়া (র.)-এর নিকট এসে তাঁকে এ রায় জ্ঞাত করলাম। তিনি বললেন, আমি সন্ধ্যাকালেই শাসনকর্তার নিকট যাব এবং তাঁকে অবহিত করব– হযরত আয়েশা (রা.) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ শ্রেণির ঘটনায় রায় প্রদান করেছেন যে, উপার্জিত আয় [উপার্জনকারীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য] ক্রেতা মালিক হবে। ওরওয়া (র.) সন্ধ্যাকালেই হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের নিকট গেলেন [এবং উক্ত হাদীস তাঁকে শুনালেন]। সেমতে তিনি [পুনঃ] বিচার করলেন যে, আমি যেন উক্ত উপার্জন গ্রহণ করে থাকি তার নিকট হতে, যাকে দেওয়ার জন্য প্রথমে তিনি রায় প্রদান করেছিলেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ-এর মর্মার্থ [مَعْنٰى اَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ] : যেমন ঐ দাসটি যদি ক্রেতার নিকট মারা যেত অথবা তার কোনো ক্ষতি সাধিত হতো, তাহলে এ ক্ষতি ক্রেতারই হতো, বিক্রেতার নয়। তদ্রূপ এ দাস দ্বারা কোনো উপার্জন হলে তার মালিকও ক্রেতাই হবে, বিক্রেতার এতে কোনো অধিকার থাকবে না।

শব্দ-বিশ্লেষণ : اِسْتَغْلَلْتُ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাবে اَلْاِسْتِفْعَالُ মাসদার اَلْاِسْتِغْلَالُ অর্থ– ফসল বহন করানো, উপার্জন করা।

اَرُوْحُ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلرَّوَاحُ অর্থ– সন্ধ্যাবেলা আসা বা যাওয়া।

اَلْخَرَاجُ : এটি একবচন, বহুবচনে اَخْرَاجٌ , اَخْرِجَةٌ অর্থ– ভূমিকর, উপার্জন। এখানে গোলামের দ্বারা উপার্জিত সমুদয় বস্তু উদ্দেশ্য।

وَعَنْ ٢٧٥٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ) وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىِّ قَالَ الْبَيِّعَانِ اِذَا اخْتَلَفَا وَالْمَبِيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهٖ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ اَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ .

২৭৫৫. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যদি কোনো মতবিরোধ হয় [এবং কোনো পক্ষেই সাক্ষী না থাকে], তবে সে ক্ষেত্রে বিক্রেতার কথা অগ্রগণ্য হবে এবং ক্রেতার জন্য অবকাশ [এখতিয়ার] থাকবে [ক্রয় ভঙ্গ করে দেওয়ার]। –[তিরমিযী] ইবনে মাজাহ ও দারেমীর বর্ণনায় আছে– ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যদি বিরোধ হয় এবং বিক্রীত বস্তু হুবহু বর্তমান থাকে, আর কোনো পক্ষে সাক্ষী না থাকে, তবে বিক্রেতার কথা অগ্রগণ্য হবে। অথবা উভয়ে ক্রয়বিক্রয়কে ভঙ্গ করে পরস্পর বস্তু ও মূল্য ফেরত নিয়ে নেবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ صُوْرَةِ اِخْتِلَافِ الْبَيِّعَانِ [ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে সৃষ্ট মতভেদ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতানৈক্য] : ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে যদি মূল্য, পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় এবং কোনো সাক্ষী না থাকে, সেক্ষেত্রে দু অবস্থা হতে পারে। প্রথমত পণ্য উপস্থিত থাকবে, দ্বিতীয়ত পণ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। উভয় অবস্থাতেই–

১. ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। অর্থাৎ সে যদি শপথ করে, তখন ক্রেতাকে বলা হবে, হয়তো বিক্রেতার কথা মেনে নাও নতুবা স্বীয় বক্তব্যের জন্য শপথ করে অস্বীকার কর। এরপর যদি তারা উভয়ে রাজি হয়ে যায়, তাহলে তো ভালো, তা না হলে বিচারক উক্ত بَيْع ভঙ্গ করে দেবেন এবং পণ্য বা মূল্য বিক্রেতাকে দিয়ে দেবে। তাঁদের দলিল بَابٌ -এর হাদীস, কেননা এখানে مُطْلَقٌ বলা হয়েছে।

২. ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে পণ্য উপস্থিত থাকা অবস্থায় এ হুকুমই হবে, কিন্তু পণ্য ধ্বংস হওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পরের শপথ গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং ক্রেতার বক্তব্যই শপথের সাথে গ্রহণযোগ্য হবে।

তাঁদের দলিল হলো– قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ اَنْكَرَ

অর্থাৎ বাদীকে সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে, যদি তা না পারে, তবে সেক্ষেত্রে বিবাদীকে শপথ দিয়ে বলতে হবে। সুতরাং উল্লিখিত মূল্যের পরিমাণের ক্ষেত্রে বিক্রেতা আধিক্যের দাবিদার, আর ক্রেতা হলো অস্বীকারকারী। তাই ক্রেতার কথাই শপথ সহকারে গ্রহণযোগ্য হবে।

اَلْجَوَابُ : তাঁদের দলিলের উত্তরে বলা যায় যে, তারা যে হাদীস مُطْلَقٌ হওয়ার দাবি করেছে, সেটা সঠিক নয়। কেননা এ হাদীসই অন্য সূত্রে مُقَيَّدٌ -এর সাথে বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

اِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ وَلَا بَيِّنَةَ لِاَحَدِهِمَا تَحَالَفَا وَتَرَادَّا .

অন্য রেওয়ায়েত আছে– يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ যার দ্বারা বুঝা যায় যে, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের পক্ষ থেকেই ফেরত দিতে হবে, যা পণ্যের অস্তিত্বকে আবশ্যক করে। সুতরাং পণ্য উপস্থিত থাকা আবস্থায় تَحَالُفُ হবে, আর না থাকা অবস্থায় ক্রেতার বক্তব্য শপথ সহকারে গ্রহণযোগ্য হবে। –[বাযলুল মাজহূদ- খ. ৪, পৃ. ২৮৯]

وَعَنْ ٢٧٥٦ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَقَالَ مُسْلِمًا اَقَالَهُ اللّٰهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ) وَفِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ عَنْ شُرَيْحٍ الشَّامِيِّ مُرْسَلًا .

২৭৫৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমান ভ্রাতার [অনুরোধ রক্ষার্থে তার] ক্রয় বা বিক্রয়কে ভঙ্গ করবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ মাফ করবেন। –[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

এ হাদীসটি শরহুস্‌সুন্নার মধ্যে মাসাবীহের শব্দ দ্বারা শুরাইহ শামী (রা.) মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : اِقَالَة শব্দের অর্থ– হলো بَيْع ভঙ্গ করে দেওয়া। এ প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ আরো ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম ভ্রাতার অপছন্দনীয় بَيْع -কে ফেরত দিয়ে দেবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন। সুতরাং ব্যবসায়ীগণ اِقَالَه -এর মাধ্যমে জান্নাতে নিজেদের অবস্থানকে সুসংহত করতে পারেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٧٥٧ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِشْتَرٰى رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ عَقَارًا مِنْ رَجُلٍ فَوَجَدَ الَّذِى اشْتَرَى الْعَقَارَ فِىْ عَقَارِهٖ جَرَّةً فِيْهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِى اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ عَنِّىْ اِنَّمَا اشْتَرَيْتُ الْعَقَارَ وَلَمْ اَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ فَقَالَ بَائِعُ الْاَرْضِ اِنَّمَا بِعْتُكَ الْاَرْضَ وَمَا فِيْهَا فَتَحَاكَمَا اِلٰى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِىْ تَحَاكَمَا اِلَيْهِ اَ لَكُمَا وَلَدٌ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِىْ غُلَامٌ وَقَالَ الْاٰخَرُ لِىْ جَارِيَةٌ فَقَالَ اَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقُوْا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭৫৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের এক ব্যক্তি একখণ্ড ভূমি অপর ব্যক্তি হতে ক্রয় করল। ক্রেতা যে ভূমি ক্রয় করেছিল, ঐ ভূমির মধ্যে এক কলসে স্বর্ণ পেল। সে বিক্রেতাকে বলল, যার থেকে ভূমি ক্রয় করেছিল, তোমার স্বর্ণ তুমি নিয়ে যাও! আমি তো শুধু ভূমি ক্রয় করেছি; আমি তোমার থেকে স্বর্ণ ক্রয় করিনি। বিক্রেতা বলল, ভূমি এবং ভূমির মধ্যে যা কিছু আছে সবই আমি বিক্রয় করে দিয়েছি। তারা উভয়ে বিরোধ মীমাংসার জন্য তৃতীয় ব্যক্তির নিকট গেল। ঐ ব্যক্তি তাদের উভয়কে জিজ্ঞসা করল, তোমাদের সন্তানসন্ততি আছে কি? তাদের একজন বলল, আমার একটি ছেলে আছে। অপরজন বলল, আমার একটি মেয়ে আছে। ঐ ব্যক্তি বলল, তোমাদের ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বিবাহ সম্পাদন কর এবং এই স্বর্ণ ঐ বিবাহে ব্যয় কর। আর [যা অবশিষ্ট থাকে, তা] দান-খয়রাত করে দাও। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ ঘটনা হযরত দাউদ (আ.)-এর জামানায় সংঘটিত হয়েছিল, আর ঐ দুই ব্যক্তি যাঁকে বিচারক নির্ধারণ করেছিল, তিনি ছিলেন হযরত দাউদ (আ.)। তাই তো তিনি পূর্ণ বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা এমন মীমাংসা করেছেন, যা একমাত্র নবীগণের জন্যই শোভনীয়।

بَابُ السَّلَمِ وَ الرَّهْنِ

অধ্যায় : অগ্রিম বিক্রয় করা এবং বন্ধক রাখা

اَلسَّلَمُ : শব্দটি اَسْلَمَ ফে'ল -এর اِسْم مَصْدَرٌ যার অর্থ হলো- সোপর্দ করা। শব্দটি سَلَفٌ বা ঋণ অর্থের জন্যও ব্যবহৃত হয়। শরিয়তের পরিভাষায় سَلَمٌ হলো, بَيْعُ الْاٰجِلِ بِالْعَاجِلِ অর্থাৎ মূল্য নগদ আর পণ্য বাকি রেখে ক্রয়বিক্রয় করা। এ প্রকার ক্রয়বিক্রয়ে ক্রেতাকে مُسْلَمٌ فِيْهِ বিক্রেতাকে مُسْلَمٌ اِلَيْهِ, মূল্যকে رَأْسُ الْمَالِ, رَبُّ السَّلَمِ এবং পণ্যকে বলা হয়। এটি যদিও بَيْع مَعْدُوْم কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনের তাকিদে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে শরিয়ত এ بَيْع -কে জায়েজ রেখেছে। কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা এ প্রকারের بَيْع প্রমাণিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন–

اَشْهَدُ اَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُوْنَ اِلٰى مُسَمًّى قَدْ اَحَلَّهُ اللّٰهُ فِى الْكِتَابِ وَاَذِنَ فِيْهِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ.

অপর হাদীসে রয়েছে- نَهَى الشَّئَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْاِنْسَانِ وَرَخَّصَ فِى السَّلَمِ

بَيْع سَلَمْ-এর শর্তসমূহ : ১. ঐ পণ্যের গুণ ও পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়া, ২. جِنْس বা প্রকার জ্ঞাত হওয়া, ৩. نَوْع বা ধরন জ্ঞাত হওয়া, ৪. আদায়ের স্থান জ্ঞাত হওয়া, ৫. সংঘটিত হওয়ার বৈঠকেই কবজা হওয়া, ৬. كَيْل ৭. ওজন ও ৮. اَجَلْ বা আদায়ের নির্দিষ্ট সময়সীমা জ্ঞাত হওয়া। আরো কিছু শর্ত রয়েছে যা ফিকহ-এর কিতাবে বর্ণিত হবে।

اَلرَّهْنُ : এটি বাবে فَتَحَ এর মাসদার, আভিধানিক অর্থ হলো আটক রাখা, আবদ্ধ রাখা, বন্ধক রাখা। যেমন কুরআনে আছে- كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ اَىْ مَمْنُوْعَةٌ.

رَهْن-এর পারিভাষিক অর্থ হলো- اَلرَّهْنُ مَا يُوْضَعُ وَثِيْقَةً لِلدَّيْنِ 'ঋণের পরিবর্তে যা কিছু অন্যের কাছে বন্ধক রাখা হয়।' যখন ঋণ পরিশোধ করে ফেলবে, তখন আবার তা ফেরত নেবে। বন্ধকের প্রকার কুরআনেও রয়েছে। যেমন- فرهان مقبوضة হাদীস দ্বারাও তা প্রমাণিত; হুজুর ﷺ এক ইহুদির নিকট স্বীয় বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٧٥٨ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِى الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلٰثَ فَقَالَ مَنْ اَسْلَفَ فِىْ شَىْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِىْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭৫৮. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদিনায় পদার্পণ করলেন, তখন মদিনাবাসীগণ এক, দুই এবং তিন বছরের মেয়াদে বিভিন্ন প্রকার ফল ক্রয়বিক্রয় করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে কেউ অগ্রিম ক্রয়বিক্রয় করবে, তাকে নির্ধারিত পরিমাপে বা নির্ধারিত ওজনে এবং নির্ধারিত মেয়াদে তা করতে হবে।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যে জিনিসের بَيْع سَلَمْ করা হচ্ছে, তা যদি পরিমাপযোগ্য জিনিস হয়, তাহলে তার পরিমাপ নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। যেমন- এ জিনিস দশ পাল্লা হবে বা পনেরো পাল্লা হবে। আর যদি তা ওজনযোগ্য হয়, তাহলে এর ওজন নির্দিষ্ট হতে হবে যে, এটা ১০ কেজি বা ২০ কেজি হবে। তদ্রূপ পণ্য প্রত্যর্পণের মেয়াদ বা সময়ও নির্দিষ্ট হতে হবে। যেমন- ১ মাস বা ২ মাস পরে আদায় করব। উল্লেখ্য যে, بَيْع سَلَمْ -এর সর্বনিম্ন মেয়াদ ১ মাস হতে হবে।

وَعَنْ ٢٧٥٩ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ اِشْتَرٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ اِلٰى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيْدٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭৫৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ইহুদির নিকট হতে কিছু খাদ্যবস্তু বাকি ক্রয় করেছেন এবং [মূল্য বাকি থাকায় এর জন্য] তাঁর লৌহবর্ম ঐ ইহুদির নিকট বন্ধক রেখেছিলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় জানা গেল–

* কোনো জিনিস বাকিতে ক্রয় করা এবং এর বিনিময়ে বন্ধক রাখা জায়েজ।
* সফরের ন্যায় স্বদেশেও বন্ধক রাখা জায়েজ আছে, যদিও কুরআনে সফরের কথা উল্লেখ আছে। কুরআনে সফরের উল্লেখটা قَيْدِ اِتِّفَاقِيْ নয়; বরং قَيْدِ اِحْتِرَازِيْ -
* জিম্মিদের [ইসলামি রাষ্ট্রে কর দিয়ে বসবাসকারী বিধর্মী] সাথেও লেনদেন করা জায়েজ আছে, যদিও তাদের মাল সুদমুক্ত নয়।
* সমরাস্ত্রও বিধর্মীদের নিকট বন্ধক রাখা জায়েজ আছে।
* এ হাদীস দ্বারা আরও একটি জিনিস প্রতীয়মান হয় যে, হুজুর ﷺ -এর দুনিয়ার প্রতি কোনো মোহ ছিল না। পৃথিবীর ধনসম্পদ অতি অল্পই তাঁর কাছে ছিল।
* সাহাবীদের পরিবর্তে ইহুদিদের সাথে লেনদেনের কারণ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরাম বলেন, এটা হয়তো بَيَانِ جَوَازٍ -এর জন্য, অথবা এজন্য যে, সাহাবীদের নিকট তখন কোনো বাড়তি সম্পদ ছিল না।

وَعَنْهَا ٢٧٦٠ قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِثَلٰثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৭৬০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহধাম ত্যাগকালে তাঁর লৌহবর্ম প্রায় তিন মণ যবের মূল্যের জন্য এক ইহুদির নিকট বন্ধক ছিল। –[বুখারী]

وَعَنْ ٢٧٦١ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهٖ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهٖ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَ عَلَى الَّذِيْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৭৬১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আরোহণের পশু বন্ধক রাখা হলে এর উপর আরোহণ করা যাবে, তবে এর ব্যয়ভারও বহন করতে হবে। দুগ্ধবতী পশু বন্ধক রাখা হলে এর দুগ্ধ দোহন করা যাবে, তবে এর ব্যয়ভারও বহন করতে হবে। আরোহণের এবং দুগ্ধপানের স্বত্ব যার, তাকেই ব্যয়ভার বহন করতে হবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

هَلْ يَجُوْزُ الْاِنْتِفَاعُ بِالرَّهْنِ؟ : বন্ধকি জিনিস দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে কিনা, সে ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতামত নিম্নরূপ–

* ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, مُرْتَهِنْ বা বন্ধকগ্রহীতা رَاهِنْ বা বন্ধকদাতার অনুমতি ব্যতীতই তা হতে উপকৃত হতে পারবে। তাঁর দলিল– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهٖ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهٖ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا
* اَئِمَّةُ ثَلَاثَةٌ -এর মতে, তা হতে উপকৃত হওয়া مُرْتَهِنْ -এর জন্য বৈধ নয়।

তাদের দলিল– عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِيْ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

এখানে বলা হয়েছে বন্ধকদাতাই বন্ধকি সম্পত্তি হতে উপকৃত হবে, লাভ-লোকসান সেই বহন করবে।

اَلْجَوَابُ : তাঁর দলিলের উত্তরে বলা হয়েছে–

* আল্লামা শওকানী (র.) বলেন, উক্ত হাদীসে شُرْب ও رُكُوْب -এর فَاعِلْ নির্দিষ্ট করা হয়নি। সুতরাং পরবর্তী হাদীসের আলোকে [যেখানে رَاهِنْ -কে উপকৃত হওয়া থেকে বিরত রাখা যাবে না বলা হয়েছে] رَاهِنْ -কেই এর فَاعِلْ নির্ধারণ করতে হবে, مُرْتَهِنْ -কে নয়।

* অথবা বলা যায় যে, بنفقته -এর ب হরফটি بَدَلِيَّةْ -এর জন্য নয়; বরং مَعِيَّةْ -এর জন্য, তখন অর্থ হবে–

فَالْمَعْنٰى اَنَّ الظَّهْرَ يُرْكَبُ عَلَيْهِ مَعَ النَّفَقَةِ لَهُ فَلَا يُمْنَعُ الرَّاهِنُ مِنَ الْاِنْتِفَاعِ بِالْمَرْهُوْنِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْاِنْفَاقُ .

* যদি مُرْتَهِنْ বন্ধকি জিনিস হতে উপকৃত হয়, তাহলে তা كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًى এ হাদীসের আলোকে সুদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে।

* অথবা, مُرْتَهِنْ তা হতে তার খরচের পরিমাণ উপকৃত হতে পারবে; অতিরিক্ত নয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٧٦٢ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِيْ رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ . (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مُرْسَلًا) وَرُوِيَ مِثْلُهُ اَوْ مِثْلُ مَعْنَاهُ لَا يُخَالِفُ عَنْهُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) مُتَّصِلًا .

২৭৬২. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (র.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রাহন বা বন্ধক রাখা বন্ধকি বস্তু হতে তার মালিককে স্বত্বহীন করে না। ঐ বস্তুর আয়-উৎপন্নের অধিকারী সে-ই হবে এবং তারই উপর বর্তাবে এর [ব্যয় বহন ও] ক্ষয়-ক্ষতি। –[শাফেয়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উল্লিখিত হাদীসের অর্থ হলো, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো জিনিস বন্ধক রাখে, তাহলে এর দ্বারা তার মালিকানা শেষ হয়ে যায় না; বরং সেটার মালিক সেই থাকবে। সুতরাং সেই বন্ধকি জিনিসের দ্বারা যদি কোনো লাভ হয় বা লোকসান হয়, তাহলে তা বন্ধকদাতাই ভোগ করবে। তা হতে যদি মাসিক ভাড়া আদায় হয়, তাহলে সে-ই ভাড়া উঠাবে, তা যদি বাহনযোগ্য পশু হয়, তাহলে এর উপর সওয়ার হবে, পশু থেকে বাচ্চা হলে বাচ্চাও সে-ই পাবে। তদ্রূপ লোকসানের অংশীদারও সে হবে। সুতরাং যদি তা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তা رَاهِنْ -ই বহন করবে। সে কারণে مُرْتَهِنْ থেকে কোনো অংশ হ্রাস করা হবে না; বরং তার ঋণের পুরোটাই তাকে শোধ করতে হবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ : لَا يَغْلَقُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ نَهِيْ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাবে سَمِعَ মাসদার اَلْغَلَقُ অর্থ– বন্ধকি বস্তু স্বত্বহীন হওয়া।

غُنْمٌ : এটি মাসদার, বাবে سَمِعَ অর্থ– উপার্জন, লাভ, গনিমত।

غُرْمٌ : বাবে سَمِعَ -এর মাসদার অর্থ– লোকসান, ক্ষতি।

وَعَنْ ٢٧٦٣ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَالْمِيْزَانُ مِيْزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

২৭৬৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, [শরিয়তের বিধানে উল্লিখিত] পরিমাপের ক্ষেত্রে মদিনায় প্রচলিত পরিমাপই গণ্য হবে এবং ওজনের ক্ষেত্রে মক্কায় প্রচলিত ওজন গণ্য হবে। –[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَجْهُ التَّرْجِيْحِ بَيْنَهُمَا [উভয়ের মধ্যকার প্রাধান্যের কারণ] : উভয়টার মধ্যে একটাকে অন্যটার উপর প্রাধান্য দেওয়ার কারণ হলো তৎকালীন যুগে ফসলের লেনদেন পরিমাপ করে করা হতো, আর মদিনাবাসী যেহেতু কৃষি পেশায় অগ্রণী ছিল, তাই পরিমাপের ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতা অধিক থাকাই স্বাভাবিক। আর ওজনের ব্যবহার যেহেতু ব্যবসায়িক লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্ট, আর মক্কাবাসী যেহেতু ব্যবসায় অগ্রণী ছিল, তাই তারা ওজন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিল। এজন্য মক্কার ওজন ও মদিনার পরিমাপকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

وَعَنْ ٢٧٦٤ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِأَصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْمِيْزَانِ إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيْتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيْهِمَا الْأُمَمُ السَّابِقَةُ قَبْلَكُمْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

২৭৬৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিমাপ ও ওজনকারীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমাদের উপর এমন দুটি কার্যের দায়িত্ব অর্পিত আছে, যে দুটির ব্যাপারে পূর্ববর্তী অনেক উম্মত ও জাতি ধ্বংস হয়েছে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে এমন কিছু বদ স্বভাবের লোক ছিল, যারা ক্রয়ের সময় পরিপূর্ণ মাপে ক্রয় করত আর বিক্রয়ের সময় মাপে কম দিত। তাদের এহেন জঘন্য অপরাধের কারণে আল্লাহ তাদের উপর আজাব অবতীর্ণ করলেন এবং তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো হযরত শুআইব (আ.)-এর কওম। এ কারণে হুজুর ﷺ স্বীয় উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তোমরা মাপে কম দেওয়া হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকবে, যাতে সেই আজাব হতে রক্ষা পেতে পার।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٧٦٥ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَسْلَفَ فِيْ شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلٰى غَيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৭৬৫. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো বস্তু 'বায়-এ-সলম' এর মাধ্যমে তথা অগ্রিম ক্রয় করেছে, সে ঐ বস্তু হস্তগত করার পূর্বে অপরের নিকট হস্তান্তর করতে পরবে না।

–[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

بَابُ الْاِحْتِكَارِ
পরিচ্ছেদ : খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করা

اِحْتِكَارٌ-এর আভিধানিক অর্থ : اِحْتِكَارٌ শব্দটি বাবে اِفْتِعَالٌ-এর মাসদার حَكْرٌ মূলধাতু থেকে নির্গত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلْاِدِّخَارُ বা গুদামজাত করা। ২. اَلْحَبْسُ বা স্টক করা। ৩. اَلْاِمْسَاكُ বা আটকে রাখা / ধরে রাখা।

اِحْتِكَارٌ-এর পারিভাষিক অর্থ : শরিয়তের পরিভাষায় اِحْتِكَارٌ-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

اَلْاِحْتِكَارُ هُوَ حَبْسُ الْاَقْوَاتِ وَالْبَضَائِعِ مُتَرَبِّصًا لِلْغَلَاءِ.

* অর্থাৎ মানুষ ও প্রাণীর খাবার ক্রয় করে মূল্য বৃদ্ধির জন্য জমা করে রাখা।

* মেরকাত গ্রন্থকারের মতে– هُوَ لَبْسُ الطَّعَامِ حِيْنَ اِحْتِيَاجِ النَّاسِ بِهِ حَتّٰى يَغْلُوْا

অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনের সময় খাদ্যদ্রব্য কিনে মূল্য বৃদ্ধির জন্য আটকে রাখা।

اِحْتِكَارٌ-এর হুকুম : শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এ অর্থে গুদামজাত করা হারাম। এহেন জঘন্য কাজে লিপ্ত ব্যক্তি শরিয়তের দৃষ্টিতে ঘৃণিত ব্যক্তি। তবে কোনো ব্যক্তি যদি স্বীয় জমিতে উৎপন্ন ফসল গুদামজাত করে অথবা সস্তার সময় ফসল ক্রয় করে জমা করে রাখে অতঃপর মূল্য বৃদ্ধির সময় বিক্রয় করে, তাহলে তা হারাম হবে না। তদ্রূপ খাদ্য সংক্রান্ত নয় এমন জিনিস গুদামজাত করাও হারাম নয়।

হিদায়া গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, মানুষ ও পশুর খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করা মাকরূহ, তবে শর্ত হলো তা এমন শহরে হতে হবে, যেখানে উক্ত কারণে শহরবাসীদের ক্ষতি সাধিত হয়। সুতরাং সেরকম শহরে গুদামজাত করা হারাম। কিন্তু যদি বড় শহর হয় এবং গুদামজাতের ফলে শহরবাসীদের সমস্যা সৃষ্টি না হয়, সেক্ষেত্রে গুদামজাতকরণ হারাম নয়।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٧٦٦ مَعْمَرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَتْ اَمْوَالُ بَنِى النَّضِيْرِ فِىْ بَابِ الْفَىْءِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

২৭৬৬. **অনুবাদ :** হযরত মা'মার (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি [জনগণের জীবিকা সঙ্কীর্ণ করে] খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে, সে বড় অপরাধী; সে গুনাহগার সাব্যস্ত হবে। –[মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٧٦٧ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ)

২৭৬৭. **অনুবাদ :** হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন– আমদানিকারক জীবিকাপ্রাপ্ত [লাভবান] হবে, পক্ষান্তরে গুদামজাতকারী অভিশপ্ত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসের তাৎপর্য হলো, যে ব্যক্তি বাহির থেকে মাল আমদানি করে তা প্রচলিত মূল্যে বিক্রয় করে এবং মূল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুদামজাত করে রাখে না, তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক দেওয়া হয়। অর্থাৎ গুনাহ ব্যতীত লাভবান হতে পারে এবং তার রিজিকে বকরত দান করা হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহর সৃষ্টজীবের দুঃখ-দুর্দশা ও খাদ্য-স্বল্পতাকে পুঁজি করে অবৈধ পন্থায় গুদামজাতকারী পাপিষ্ঠ হয়ে থাকে এবং সর্বপ্রকার কল্যাণ হতে বঞ্চিত থাকে।

وَعَنْ ٢٧٦٨ اَنَسٍ (رض) قَالَ غَلَا السِّعْرُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَعِّرْ لَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَاِنِّيْ لَاَرْجُوْ اَنْ اَلْقٰى رَبِّيْ وَلَيْسَ اَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِيْ بِمَظْلِمَةٍ بِدَمٍ وَلَا مَالٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

২৭৬৮. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ﷺ -এর আমলে এক সময় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেল। লোকেরা অনুরোধ করল– ইয়া রাসূলাল্লাহ! দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত করে দিন। নবী করীম ﷺ বললেন, মূল্যের গতি আল্লাহ তা'আলার তরফ হতেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। সঙ্কীর্ণতা ও প্রশস্ততা আনয়নকারী একমাত্র তিনিই এবং তিনিই রিজিকদাতা। সদা আমার এ চেষ্টাই থাকবে, আমি যেন প্রভুর দরবারে এ অবস্থায় সাক্ষাৎ করি যে, আমার উপর তোমাদের কারো প্রতি কোনো জুলুম-অন্যায়ের দাবি না থাকে– জানের বা মালের। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ" -এর ব্যাখ্যা : "আল্লাহ তা'আলা মূল্য নির্ধারণকারী" কথাটির মর্মার্থ হলো, মূল্য বৃদ্ধি বা দাম সস্তা করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই হাতে। তিনি যখন ইচ্ছা মূল্য বৃদ্ধি করে দেন, আবার যখন ইচ্ছা জিনিসের দাম সস্তা করে দিয়ে মানুষের রিজিকের প্রশস্ততা দান করেন।

সুতরাং যখন দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি বৃদ্ধি পাবে, তখন আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। নিজেদের ঈমান-আক্বীদা দুরস্ত করে আল্লাহর সন্তুষ্টির পাথেয় সঞ্চয় করতে হবে, তাহলে আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং দ্রব্যমূল্য সস্তা করে সচ্ছলতা দান করবেন।

قَوْلُهُ "وَاِنِّيْ لَاَرْجُوْ اَنْ اَلْقٰى رَبِّيْ" -এর **মর্মার্থ** : হাদীসের শেষাংশের অর্থ হলো, মূলত এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা যে, সরকার ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া সঠিক নয়। কেননা, তা মানুষের লেনদেনের মধ্যে অনাধিকার চর্চারই নামান্তর এবং তার সম্পদে তার বিনানুমতিতে হস্তক্ষেপ করার অন্তর্ভুক্ত, এটাও এক প্রকারের জুলুম। তাছাড়া মূল্য নির্ধারণ করার অশুভ পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, সে ক্ষেত্রে লোকেরা কারবার, আমদানি-রপ্তানি বন্ধ করে দেবে, যার দ্বারা ব্যবসায়ী মহলে নেমে আসবে এক মহা বিপর্যয়, যা দুর্ভিক্ষের ন্যায় সঙ্কটও সৃষ্টি করতে পারে।

শেষ ফল এ দাঁড়াবে যে, যা মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, তা-ই তাদের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং নবীজীর উদ্দেশ্য হলো, মূল্য নির্ধারণ করে দিয়ে মানুষদেরকে সমস্যায় ফেলা ও ব্যবসায়ী মহলে অসন্তোষ সৃষ্টি না করা; বরং এর পরিবর্তে ব্যবসায়ীদেরকে এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে, তারা যেন মানুষের প্রতি সহমর্মিতার হস্ত প্রসারিত করে, ইনসাফ, ন্যায়নিষ্ঠা ও কল্যাণকামিতার পন্থা অবলম্বন করে। তাদের মন-মানসিকতাকে সচেতন করে তুলতে হবে। তারা যেন অযথা মূল্য বৃদ্ধি করে আল্লাহর সৃষ্টজীবকে বিপদে ফেলা হতে মুক্ত থাকে।

শব্দ-বিশ্লেষণ :

سَعِّرْ : সীগাহ اَمْر حَاضِر مَعْرُوف বহছ وَاحِد مُذَكَّر حَاضِر বাবে تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْعِيْرُ মূলবর্ণ (س ـ ع ـ ر) জিনসে صَحِيْح অর্থ– মূল্য নির্ধারণ করে দিন।

اَلْمُسَعِّرُ : সীগাহ اِسْم فَاعِلْ বহছ وَاحِد مُذَكَّرْ বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اَلتَّسْعِيْرُ মূলবর্ণ (س ـ ع ـ ر) জিনসে صَحِيْح অর্থ– মূল্য নির্ধারণকারী।

اَلْقَابِضُ : সীগাহ اِسْم فَاعِلٌ বহছ وَاحِدْ مُذَكَّرٌ বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلْقَبْضُ মূলবর্ণ (ق ـ ب ـ ض) জিনসে صَحِيْح অর্থ– সংকোচনকারী।

اَلْبَاسِطُ : সীগাহ اِسْم فَاعِلٌ বহছ وَاحِدْ مُذَكَّرٌ বাবে نَصَرَ মাসদার اَلْبَسْطُ মূলবর্ণ (ب ـ س ـ ط) জিনসে صَحِيْح অর্থ– প্রশস্তকারী, সচ্ছলতা দানকারী।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٧٦٩ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللّٰهُ بِالْجُذَامِ وَالْاَفْلَاسِ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَرَزِيْنٌ فِيْ كِتَابِهِ)

২৭৬৯. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুসলমানদের উপর অভাব-অনটন সৃষ্টি করে খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করবে, [আশঙ্কা আছে] আল্লাহ তা'আলা তাকে কুষ্ঠরোগে এবং দারিদ্র্যে পতিত করবেন। –[ইবনে মাজাহ, বায়হাকী-শোআবুল ঈমানে ও রাযীন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে ব্যক্তি আল্লাহর মাখলুক তথা মানবজাতিকে কষ্ট দেবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দৈহিক ও আর্থিক উভয় সঙ্কটে নিপতিত করবেন। আর যারা মানুষের কল্যাণকামিতা প্রদর্শন করবে, আল্লাহ তা'আলা তার শরীর ও দেহে বরকত দান করবেন।

শব্দ বিশ্লেষণ : اَلْجُزَامُ : কুষ্ঠ রোগ।

اَلْاِفْلَاسُ : দারিদ্র্য, নিঃস্বতা, এটি বাবে اِفْعَالٌ-এর মাসদার।

وَعَنْ ٢٧٧٠ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا يُرِيْدُ بِهِ الْغَلَاءَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللّٰهِ وَبَرِئَ اللّٰهُ مِنْهُ . (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

২৭৭০. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চল্লিশ দিন খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখবে, সে আল্লাহ থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলাও তার থেকে মুক্ত হয়ে যান। –[রাযীন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে اَرْبَعِيْنَ দ্বারা চল্লিশ দিনকেই নির্দিষ্ট করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা এমন গুদামজাত পেশার নিন্দা করা উদ্দেশ্য যা দ্বারা শুধু নিজেই লাভবান হবে ও অন্যকে কষ্টে ফেলবে।

قَوْلُهُ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللّٰهِ وَبَرِئَ اللّٰهُ مِنْهُ-এর মর্মার্থ : অর্থাৎ সে আল্লাহ তা'আলার কৃত এমন ওয়াদা ভঙ্গ করেছে, যা সে শরিয়তের বিধান পালন ও সৃষ্টজীবের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন সম্বন্ধে করেছিল।

তদ্রূপ "আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট" কথাটির অর্থ হলো– সে যেভাবে আল্লাহর সৃষ্টজীবকে কষ্টে ফেলার কারণ হলো, আল্লাহও তার হেফাজতের দায়িত্ব উঠিয়ে নেবেন এবং তার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের দৃষ্টি সরিয়ে নেবেন। –[মেরকাত খ. ৬, পৃ. ৯৬]

وَعَنْ ٢٧٧١ مُعَاذٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ اِنْ اَرْخَصَ اللّٰهُ الْاَسْعَارَ حَزِنَ وَاِنْ اَغْلَاهَا فَرِحَ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَرَزِيْنٌ فِيْ كِتَابِهٖ)

২৭৭১. অনুবাদ : হযরত মু'আয (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, গুদামজাতকারী ব্যক্তি কতই না ঘৃণিত! আল্লাহ তা'আলা দ্রব্যমূল্য হ্রাস করে দিলে সে চিন্তিত হয়। আর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে দিলে সে আনন্দিত হয়। –[বায়হাকী শোআবুল ঈমানে ও রাযীন তাঁর গ্রন্থে তা বর্ণনা করেছেন]

وَعَنْ ٢٧٧٢ اَبِيْ اُمَامَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهٖ لَمْ يَكُنْ لَهٗ كَفَّارَةً - (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

২৭৭২. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখবে, সে তার এ মাল দান-খয়রাত করে দিলেও তার [গুনাহ মাফের] জন্য যথেষ্ট হবে না। –[রাযীন]

بَابُ الْإِفْلَاسِ وَالْإِنْظَارِ
পরিচ্ছেদ : দেউলিয়া হওয়া এবং ঋণীকে অবকাশ দান

اِفْلَاسٌ ও اِنْظَارٌ-এর অর্থ :

اِفْلَاسٌ : এটি বহুবচন, একবচনে فَلْسٌ অর্থ– পয়সা। বাবে اِفْعَالٌ থেকে, এর মধ্যে হামযাহ سَلْبٌ-এর জন্য। সুতরাং অর্থ হবে– পয়সা না থাকা। অথবা هَمْزَه টা صَيْرُوْرَتٌ-এর জন্য, তখন অর্থ হবে– সকল টাকাপয়সায় রূপান্তরিত হওয়া। এর পারিভাষিক অর্থ হলো 'দেউলিয়া হওয়া'।

اِنْظَارٌ : বাবে اِفْعَالٌ-এর মাসদার نَظْرٌ মূলধাতু থেকে নির্গত অর্থ হলো– অবকাশ দেওয়া, সুযোগ দেওয়া। মানুষের জীবন কখনো এক অবস্থায় স্থির থাকে না। আজ একরকম, কাল আরেক রকম। মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা আরো টলটলায়মান। একজন রিক্তহস্ত ও পথের ভিখারি রাতারাতি অঢেল সম্পদের মালিক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বিশাল বিত্ত-বৈভবের মালিক চোখের পলকে দেউলিয়া হয়ে যায়। লাখ লাখ টাকা যাদের হাতের খেলনা, এক সময় তাদেরকেই ১ পয়সার মুখাপেক্ষী হতে দেখা যায়। এটাই হলো দুনিয়ার চিরাচরিত নিয়ম এবং তকদীরের অলঙ্ঘনীয় নীতি। কবির ভাষায় "সকাল বেলার ধনীরে তুই, ফকির সন্ধ্যা বেলা" এ পরিচ্ছেদে সে সম্পর্কিত হাদীসগুলোই উল্লেখ করা হয়েছে। যদি কারো এহেন দৈন্যদশা হয়ে যায়, তাদের পার্শ্বে দাঁড়ানো, তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করা একটা মানবিক দায়িত্ব। সে সম্পর্কে উৎসাহ ও উদ্দীপনামূলক হাদীসসমূহ আমাদের চলার পথের পাথেয় হবে এবং একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা গঠন করা সম্ভব হবে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٧٧٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٌ اَفْلَسَ فَاَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭৭৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোনো ব্যক্তি দেউলিয়া সাব্যস্ত হলে তার নিকট যে নিজের মাল হুবহু পাবে, অন্য পাওনাদার অপেক্ষা একমাত্র সে-ই ঐ মালের অগ্রাধিকারী হবে।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَيُّمَا رَجُلٌ اَفْلَسَ-এর **মর্মার্থ** : যদি কোনো ব্যক্তি কোনো জিনিস বাকিতে ক্রয় করে পণ্যটা নিজের আয়ত্তে নিয়ে নিয়েছে, পণ্যটা ক্রেতার নিকট হুবহু মজুদ থাকা অবস্থায়ই সে দেউলিয়া হয়ে যায় বা মৃত্যুবরণ করে এবং তার নিকট তা ছাড়া অন্য কোনো জিনিসও নেই। এ ক্ষেত্রে সে বিক্রেতার কাছে ঋণী রয়েছে। এছাড়া তার আরো ঋণদাতাও রয়েছে। এখন ঐ পণ্যে সকল ঋণদাতাগণ সমভাবে হকদার হবে নাকি বিক্রেতা অধিক হকদার হবে? সে ব্যাপার মতানৈক্য রয়েছে।

১. اَئِمَّة ثَلَاثَة ও দাউদ জাহেরীর মতে, বিক্রেতাই এ মালের অধিক হকদার হবে। তাঁদের দলিল হলো–

حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٌ اَفْلَسَ فَاَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ـ

২. ইমাম আবূ হানীফা, সাহেবাইন ও ইবরাহীম নখঈ প্রমুখের মতে সমস্ত ঋণদাতাগণ সমভাবে সেই মালের মধ্যে হকদার হবে। অন্যরা যতটুকু পাবে, বিক্রেতাও ততটুকুই পাবে। তাঁদের দলিল–

১. قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ .

তাছাড়া কুরআন, হাদীস ও উসূল দ্বারা একথা প্রমাণিত যে مَبِيْع -এর উপর কবজা হওয়ার পর বিক্রেতার আর তাতে কোনো হক বাকি থাকে না, তার মালিক ক্রেতাই হয়ে যায়।

২. عَنْ عَلِيٍّ (رض) اَنَّهُ قَالَ هُوَ فِيْهَا اُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ اِنْ وَجَدَهَا بِعَيْنِهِ .

৩. عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ اِذَا اَفْلَسَ الْمُشْتَرِىْ فَهُوَ اَىِ الْبَائِعُ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ .

اَلْجَوَابُ : ইমাম ত্বাহাবী (র.) বলেন, এ হাদীসে ক্রয়বিক্রয়ের মালের কথা বলা হয়নি; বরং ছিনতাই, চুরি, জবরদখল, ঋণ বা বন্ধক ইত্যাদি জিনিস সম্পর্কে বলা হয়েছে। অথবা, বলা যায় যে, এ হুকুম আইনগতভাবে নয়; বরং মানবিক কারণে এ হুকুম দেওয়া হয়েছে।

وَعَنْ ٢٧٧٤ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ اُصِيْبَ رَجُلٌ فِىْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ ثِمَارٍ اِبْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ اِلَّا ذٰلِكَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৭৭৪. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ -এর সময়ে এক ব্যক্তি [ব্যবসার জন্য বিভিন্ন লোকের বাগানের] ফল ক্রয় করে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় অনেক ঋণের দায়ে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে বললেন, তাকে দান-খয়রাত দ্বারা সাহায্য কর। সেমতে লোকেরা তাকে দান-খয়রাত করল, কিন্তু তার ঋণ পরিশোধের পরিমাণ হলো না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ব্যক্তির পাওনাদারগণকে ডেকে বললেন, যা উপস্থিত আছে, তা তোমরা নিয়ে যাও; এর অতিরিক্ত আর পাবে না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ঘটনার বিবরণ এ রকম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে এক ব্যক্তি ফলবিশিষ্ট খেজুর গাছ ক্রয় করেছিল। কিন্তু ফল উপযোগী হওয়ার পূর্বেই দুর্যোগের কারণে সমস্ত ফল নষ্ট হয়ে যায়। এদিকে সে তখনো ফলের মূল্যও পরিশোধ করেনি। সুতরাং বিক্রেতারা যখন তার নিকট টাকা দাবি করল, তখন লোকের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে তাদের মূল্য পরিশোধ করে দেয়। যার কারণে সে অনেক ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। হুজুর ﷺ যখন তার এ দুরবস্থা দেখলেন, তখন তাকে দান করার জন্য লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করলেন। লোকেরা তাকে সাহায্য করল। কিন্তু তা ঋণ পরিশোধ করার মতো ছিল না। দান-সদকা হতে যতটুকুই অর্জন হলো, তা ঋণদাতাদেরকে দিয়ে বললেন, যা উপস্থিত আছে তোমার তা নিয়ে যাও; এর অতিরিক্ত কিছুই পাবে না।

قَوْلُهُ خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ اِلَّا ذٰلِكَ **-এর মর্মার্থ :** "যা আছে তা-নাও এর অতিরিক্ত আর পাবে না।" পাওনাদারকে এ কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল যে, লোকটির দেউলিয়াত্ব যখন স্পষ্ট হয়ে পড়েছে, আর তার দুরবস্থা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, সুতরাং এহেন অবস্থায় তাকে বিরক্ত করা তোমাদের সমীচীন নয়; বরং তাকে অবকাশ দাও। যখন সে আবার অর্থ যোগাতে পারবে, তখন তার কাছে গমনের দাবি করবে। হুজুরের কথার উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, পাওনাদারদের হক মওকুফ হয়ে যাবে বা তা আর দেওয়া লাগবে না; বরং তাদের হক তাদেরকে দিতে হবে, তবে একটু অবকাশের সাথে। –[মেরকাত খ. ৬, পৃ. ৯৭]

وَعَنْ ٢٧٧٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ اِذَا اَتَيْتَ مُعْسِرًا تَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَّتَجَاوَزَ عَنَّا قَالَ فَلَقِىَ اللّٰهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭৭৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, এক ব্যক্তি লোকদেরকে ধার দিত। সে তার কর্মচারীকে বলত, কোনো খাতককে ঋণ পরিশোধে অক্ষম দেখলে তাকে মুক্তি দিয়ে দিও; এ অসিলায় হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমাদের [গোনাহ হতে] মুক্তি দেবেন। তিনি বলেছেন, ঐ ব্যক্তি [মৃত্যুর পর] আল্লাহর দরবারে পৌছলে আল্লাহ তা'আলা তাকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দ-বিশ্লেষণ :

يُدَايِنُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُدَايَنَةُ মূলবর্ণ (د ـ ى ـ ن) জিনসে اَجْوَفْ يَائِىْ অর্থ– ঋণ বা ধার দিত।

مُعْسِرٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعْسَارُ মূলবর্ণ (ع ـ س ـ ر) জিনসে صَحِيْح অর্থ– অসচ্ছল, অক্ষম।

وَعَنْ ٢٧٧٦ اَبِىْ قَتَادَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّنَجِّيَهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ اَوْ يَضَعْ عَنْهُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৭৭৬. অনুবাদ : হযরত আবূ কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এ কামনা করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামত দিবসের দুঃখকষ্ট হতে মুক্তি দেন, সে যেন অক্ষম ঋণীর সহজ ব্যবস্থা করে অথবা ঋণ কর্তন করে দেয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, ফরজ আমল দ্বারা নফল আমলের চেয়ে ৭০ গুণ অধিক ছওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে নফল ইবাদত ওয়াজিবের চেয়ে বেশি ফজিলতপূর্ণ হয়ে যায়। যেমন–ঋণগ্রহীতার ঋণ মওকুফ করে দেওয়া। এটা যদিও মোস্তাহাব কিন্তু তাকে ঋণ আদায়ের অবকাশ দেওয়ার চেয়ে উত্তম, অথচ এটা ওয়াজিব। দ্বিতীয় হলো আগে সালাম দেওয়া সুন্নত; কিন্তু এটা সালামের জওয়াব দেওয়ার চেয়ে উত্তম; অথচ তা ওয়াজিব। তৃতীয়ত সময়ের পূর্বে অজু করা মোস্তাহাব; কিন্তু এটা সময় আসার পর অজু করার চেয়ে উত্তম, অথচ সেটা ফরজ। –[মেরকাত খ. ৬. পৃ. ৯৮]

وَعَنْهُ ٢٧٧٧ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا اَوْ وَضَعَ عَنْهُ اَنْجَاهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৭৭৭. অনুবাদ : উক্ত আবূ কাতাদা (রা.) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অক্ষম ঋণীকে সময় দান করবে অথবা ঋণ কর্তন করে দেবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসের দুঃখকষ্ট হতে তাকে মুক্তি দান করবেন। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٢٧٧٨ اَبِى الْيَسَرِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا اَوْ وَضَعَ عَنْهُ اَظَلَّهُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৭৭৮. **অনুবাদ :** হযরত আবুল ইয়াসার (রা.) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অক্ষম ঋণীকে সময়দান করবে অথবা তার ঋণ কর্তন করে দেবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে [হাশরের মাঠে] তাঁর [রহমতের] ছায়া দান করবেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** ইমাম আহমদ, ইবনে মাজাহ ও হাকেম হুজুর ﷺ -এর ইরশাদ বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি কোনো দরিদ্র ও নিঃস্ব ঋণী ব্যক্তিকে অবকাশ দেবে, পরিশোধের দিন আসা পর্যন্ত প্রতিদিনের বিনিময়ে ঐ ঋণের সমপরিমাণ সদকা দেওয়ার সমান ছওয়াব পেতে থাকবে। এরপর পরিশোধের দিন এসে গেলে যদি পুনরায় আবার অবকাশ দেয়, তাহলে পরিশোধের দিন আসা পর্যন্ত প্রতিদিনের বিনিময়ে ঐ ঋণের সমপরিমাণ সদকা দেওয়ার সমান ছওয়াব পেতে থাকবে। আবার যখন পরিশোধের দিন আসবে, তখন পুনরায় তাকে অবকাশ দিলে পরিশোধের দিন পর্যন্ত প্রতিদিনের বিনিময়ে এ ঋণের দ্বিগুণ পরিমাণ সদকা করার সমান ছওয়াব সে পেতে থাকবে। -[মেরকাত খ. ৬, পৃ. ৯৮]

وَعَنْ ٢٧٧٩ اَبِىْ رَافِعٍ (رض) قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ اِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ اَبُوْ رَافِعٍ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اَقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ لَا اَجِدُ اِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْطِهِ اِيَّاهُ فَاِنَّ خَيْرَ النَّاسِ اَحْسَنُهُمْ قَضَاءً - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৭৭৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ রাফে' (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [জেহাদ উপলক্ষে কোনো মুজাহিদের জন্য] এক ব্যক্তি হতে একটি যুবা উট ধার নিলেন। অতঃপর [বাইতুল মালে] সদকার উট আমদানি হলো; আবূ রাফে' বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে আদেশ করলেন [বাইতুল মাল হতে একটি উট প্রদান করে] তার ঋণ পরিশোধ করতে। আমি আরজ করলাম, [বাইতুল মালে] শুধুমাত্র সাত বছর বয়সের উট আছে [যা তার উট অপেক্ষা বড়]। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ঐ বড়টিই তাকে প্রদান কর; নিশ্চয় ঐ ব্যক্তি লোকদের মধ্যে উত্তম যে প্রাপ্য পরিশোধ করতে ভালোবস্তুটি প্রদান করে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ اِقْتِرَاضِ الْحَيَوَانِ **[পশু ঋণের হুকুম] :** এ হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, পশু ঋণ গ্রহণ বৈধ, এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামত নিম্নরূপ-

১. জমহুর ওলামার মতে, যাবতীয় প্রাণী বিনা শর্তে ঋণ গ্রহণ জায়েজ। তাঁদের দলিল হচ্ছে-

* عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ (رض) اِسْتَسْلَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ بَكْرًا الخ
* عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ حَقٌّ الخ

২. ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ওলামায়ে কূফীগণের মতে, প্রাণীর ঋণ প্রদান ও গ্রহণ অবৈধ। তাঁদের দলিল হচ্ছে-

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رض) اَنَّهُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً.

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : বিরোধীদের দলিলের জবাবে বলা যায়-

* তাঁদের হাদীসটি হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.)-এর হাদীস দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে।
* حَدِيْثُ مُبِيْحٍ ও حَدِيْثُ مُحَرِّمٍ -এর মধ্যে تَعَارُضٌ পরিলক্ষিত হলে حَدِيْثُ مُحَرِّمٍ প্রাধান্য লাভ করে।
* قَوْلِىْ হাদীস فِعْلِىْ হাদীসের উপর প্রাধান্য লাভ করে। আমাদের حَدِيْث হলো قَوْلِىْ সুতরাং আমাদের মাযহাবই تَرْجِيْح যোগ্য।

وَعَنْ ٢٧٨٠ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَجُلًا تَقَاضٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوْهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرُوْا لَهُ بَعِيْرًا فَأَعْطُوْهُ إِيَّاهُ قَالُوْا لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ اشْتَرُوْهُ فَأَعْطُوْهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭৮০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট কঠোরতার সাথে প্রাপ্যের তাগাদা করল; তাতে সাহাবীগণ তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে বললেন, তাকে কিছু বলো না। কারণ, পাওনাদার কঠোর উক্তি প্রয়োগ করতে পারে; তার প্রাপ্য পরিশোধের জন্য একটি উট ক্রয় করে তাকে দিয়ে দাও! সাহাবীগণ বললেন, তার প্রাপ্য উট অপেক্ষা বড় উট ভিন্ন অন্য উট পাওয়া যাচ্ছে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বড়টিই ক্রয় করে তাকে দিয়ে দাও; তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে অন্যের প্রাপ্য পরিশোধে উত্তম হয়। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا **-এর মর্মার্থ :** নবী করীম ﷺ বলেছেন- "পাওনাদারের কিছু বলার অধিকার রয়েছে।" অর্থাৎ ঋণদাতা কঠোর ভাষায় পাওনা ও তার প্রাপ্য তলব করতে পারে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও গালিগালাজ বা সীমালঙ্ঘনমূলক কোনো আচরণ করা উচিত নয়, আবার সে একটু বাড়াবাড়ি করলেও তার সাথে বাড়াবাড়িমূলক আচরণ করা সমীচীন নয়।

নবীজি কর্তৃক ইহুদি থেকে ঋণ গ্রহণের কারণ : এখানে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, হুজুর ﷺ ইহুদি থেকে ঋণ নিয়েছেন, অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى أَوْلِيَاءَ **"তোমরা ইহুদি ও নাসারাদেরকে বন্ধু বানাবে না।"** বাহ্যত দেখা যায় এটা আয়াতের পরিপন্থি।

اَلْجَوَابُ : এর উত্তর হলো-

* আয়াতে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু বেচাকেনা ও লেনদেন করতে নিষেধ করা হয়নি। সুতরাং তাদের সাথে দুনিয়াবি লেনদেন বৈধ। এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম একমত।
* অথবা বলা যায় যে, আয়াত নাজিলের পূর্বে ইহুদিদের ঋণ নিয়েছিলেন।
* তখন সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না।
* অথবা, بَيَانِ جَوَازْ -এর জন্য হুজুর ﷺ এরূপ করেছেন। সুতরাং আয়াত ও হাদীসের মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَغْلَظَ : সীগাহ বহছ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ إِثْبَاتْ فِعْلْ مَاضِيْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাবে إِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِغْلَاظُ মূলবর্ণ (غ ـ ل ـ ظ) জিনসে صَحِيْح অর্থ- কঠোরতা করা।

بَعِيْرٌ : এটি একবচন, বহুবচনে أَبْعِرَةٌ , بُعْرَانٌ অর্থ- উট।

وَعَنْهُ ٢٧٨١ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭৮১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সক্ষম ব্যক্তির জন্য [অন্যের প্রাপ্য পরিশোধে] টালবাহানা করা অন্যায়। তোমাদের কারো প্রাপ্য পরিশোধে ঋণী ব্যক্তি অপর সক্ষম ব্যক্তির উপর দায়িত্ব দিলে তা অনুমোদন করা কর্তব্য। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ -**এর মর্মার্থ** : "যদি তোমাদের কারো প্রাপ্য পরিশোধে ঋণী ব্যক্তি অপর সক্ষম ব্যক্তির উপর দায়িত্ব অর্পণ করে।" কথাটির অর্থ হলো, যদি কোনো ব্যাক্তি কারো নিকট ঋণী হয় এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো ধনী ব্যক্তিকে বলে যে, তুমি আমার ঋণটা পরিশোধ করে দাও, তখন ঋণদাতার উচিত তার এ প্রস্তাবকে তৎক্ষণাৎ মেনে নেওয়া যেন তার মালটা নষ্ট হয়ে না যায়। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, এ হুকুমটা اِسْتِحْبَابٌ -এর জন্য।

وَعَنْ ٢٧٨٢ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رض) أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِيْ حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتّٰى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادٰى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ يَا كَعْبُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قُمْ فَاقْضِهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭৮২. অনুবাদ : হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে একদা মসজিদের মধ্যে ইবনে আবী হাদরাদ (রা.) নামীয় ব্যক্তির নিকট স্বীয় প্রাপ্য ঋণের তাগাদা করলেন। উভয়ের কথাবার্তায় উচ্চ আওয়াজের সৃষ্টি হলো; রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ গৃহে ছিলেন; তিনি তাঁদের উচ্চ আওয়াজ শুনে তাদের দিকে বের হলেন এবং দরজার পর্দা উঠিয়ে হে কা'ব! বলে ডাকলেন। হযরত কা'ব (রা.) 'উপস্থিত আছি ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে ছুটে আসলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতের ইশারায় তাঁকে তাঁর প্রাপ্য ঋণের অর্ধভাগ ক্ষমা করে দিতেন বললেন। হযরত কা'ব (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাই করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঋণী ব্যক্তিকে বললেন, যাও, অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধ করে দাও। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [**হাদীসের ব্যাখ্যা**] : এ হাদীসের আলোকে বুঝা গেল যে, মসজিদে পাওনাদারের নিকট তাগাদা করা, হকদারের নিকট সুপারিশ করা, ঝগড়াকারীদের ঝগড়া মিটানো এবং কারো সুপারিশ কবুল করা, যদি তা কোনো গুনাহের কাজের সুপারিশ না হয়, এসব কিছু জায়েজ আছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ : سِجْفٌ : এটি একবচন, বহুবচনে سُجُوْفٌ, أَسْجَافٌ অর্থ– দরজার পর্দা।

اَلشَّطْرُ : শব্দটি বাবে نَصَرَ -এর মাসদার। অর্থ– অর্ধেক, অংশ।

وَعَنْ ٢٧٨٣ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوْا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوْا لَا فَصَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ

২৭৮৩. অনুবাদ : হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া' (রা.) বলেন, একদা আমরা নবী করীম ﷺ -এর নিকট বসাছিলাম, এমতাবস্থায় একটি জানাজা উপস্থিত করা হলো। লোকেরা নবী করীম ﷺ -কে জানাজার নামাজ পড়ানোর অনুরোধ জ্ঞাপন করল। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, মৃত ব্যক্তির উপর ঋণ আছে কি? তারা বলল, না। নবী করীম ﷺ ঐ জানাজার নামাজ পড়ালেন। অতঃপর আরেকটি জানাজা উপস্থিত করা হলো। সেটি

أُخْرٰى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيْلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوْا ثَلٰثَةَ دَنَانِيْرَ فَصَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ اُتِىَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوْا ثَلٰثَةُ دَنَانِيْرَ قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوْا لَا قَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ قَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلَىَّ دَيْنُهُ فَصَلّٰى عَلَيْهِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

সম্পর্কেও নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, মৃত ব্যক্তির উপর ঋণ আছে কি? বলা হলো হ্যাঁ, আছে। জিজ্ঞাসা করলেন, [ঋণ পরিশোধের] কোনো বস্তু রেখে গেছে কি? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, সে তিনটি স্বর্ণমুদ্রা রেখে গেছে। নবী করীম ﷺ এ জানাজার নামাজ পড়ালেন। অতঃপর আরেকটি জানাজা উপস্থিত করা হলো। সেটি সম্পর্কেও নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তার উপর ঋণ আছে কি? লোকগণ বলল, তিনটি স্বর্ণ-মুদ্রা তার উপর ঋণ আছে। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, [ঋণ পরিশোধের] কিছু রেখে গিয়েছে কি? লোকেরা বলল, না। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরাই তোমাদের সাথির জানাজার নামাজ পড়ে নাও। [অর্থাৎ নবী করীম ﷺ ঋণের দরুন ঐ ব্যক্তির জানাজার নামাজ পড়তে সম্মত হলেন না।] সাহাবী হযরত আবূ কাতাদা (রা.) বললেন, এ ব্যক্তির জানাজার নামাজ পড়িয়ে দিন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম। তখন নবী করীম ﷺ তার জানাজার নামাজ পড়িয়ে দিলেন। −[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঋণী ব্যক্তির জানাজার নামাজ পড়াতে অনীহা প্রকাশের কারণ : ঋণী ব্যক্তির জানাজার নামাজ পড়াতে অনীহা প্রকাশের কারণ হলো, ঋণের ব্যাপারে লোকদেরকে সতর্ক করা বা ঋণ আদায়ে টালবাহানা করার নিন্দা জ্ঞাপন বা এমন ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে অপছন্দ করা, যার উপর ঋণ রয়েছে, যা জুলুমের সমতুল্য। −[মেরকাত]

وَعَنْ ٢٧٨٤ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَهَا اَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ وَمَنْ اَخَذَ يُرِيْدُ اِتْلَافَهَا اَتْلَفَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

২৭৮৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অপর লোকের মাল [ঋণরূপে] গ্রহণ করে তা পরিশোধ করার নিয়তে, আল্লাহ তা'আলা তার ঋণ পরিশোধ [করায় সাহায্য] করবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করে ঋণদাতার মাল হালাক [নষ্ট ও আত্মসাৎ] করার নিয়তে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করবেন। −[বুখারী]

وَعَنْ ٢٧٨٥ أَبِىْ قَتَادَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ يُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنِّىْ خَطَايَاىَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ فَلَمَّا اَدْبَرَ نَادَاهُ فَقَالَ نَعَمْ اِلَّا الدَّيْنَ كَذٰلِكَ قَالَ جِبْرَئِيْلُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৭৮৫. অনুবাদ : হযরত আবূ কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলুন তো− যদি আমি আল্লাহর পথে শহীদ হই দৃঢ়পদ থেকে, ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে, সম্মুখপানে অগ্রগামী থেকে− পশ্চাদপদ না হয়ে, তবে আল্লাহ আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর ঐ ব্যক্তি চলে যেতে উদ্যত হলে পিছন হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডেকে বললেন, কিন্তু ঋণ মাফ হবে না। হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে এ কথাই বলে গেলেন। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীস দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছে যে, حُقُوْقُ الْعِبَادِ তথা বান্দার হকের ব্যাপারটি অত্যন্ত সুকঠিন ব্যাপার। আল্লাহ স্বীয় হক তথা ইবাদত-বন্দেগির ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা প্রদর্শন করবেন; কিন্তু বান্দার হক কোনো ক্রমেই ক্ষমা করবেন না; যতক্ষণ না বান্দা তা ক্ষমা না করে। এ হাদীস দ্বারা আরো একটি বিষয় স্পষ্ট হলো যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) ওহীর মাধ্যমে শুধু কুরআনই অবতীর্ণ করেননি; বরং অন্যান্য বিষয়ও অবতীর্ণ করেছেন। –[মেরকাত]

শব্দ-বিশ্লেষণ :

صَابِرٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلصَّبْرُ মূলবর্ণ (ص . ب . ر) জিনসে صحيح অর্থ– ধৈর্যশীল, দৃঢ়, স্থির।

مُحْتَسِبًا : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাবে اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِحْتِسَابُ মূলবর্ণ (ح . س . ب) জিনসে صَحِيْح অর্থ– ধারণা করা, ছওয়াব লাভের আশা করা।

مُقْبِلًا : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقْبَالُ মূলবর্ণ (ق . ب . ل) জিনসে صَحِيْح অর্থ– সম্মুখবর্তী হওয়া।

مُدْبِرٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِدْبَارُ মূলবর্ণ (د . ب . ر) জিনসে صَحِيْح অর্থ– পশ্চাদপদ হওয়া।

وَعَنْ ٢٧٨٦ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৭৮৬. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শহীদের সমস্ত গুনাহই মাফ করা হয়, ঋণ ব্যতীত। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ إِلَّا الدَّيْنَ : دَيْن দ্বারা উদ্দেশ্য হলো حُقُوْقُ الْعِبَادِ বা বান্দার হক। অর্থাৎ যদি কেউ আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়; কিন্তু তার জিম্মায় বান্দার হকও থাকে, যেমন– কাউকে হত্যা করেছে, বা সম্মানহানি করেছে, বা গালি দিয়েছে, বা মাল নষ্ট করেছে, তাহলে সে ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না। কেননা, বান্দার হক আল্লাহ ক্ষমা করেন না। কিন্তু ইবনুল মালিক (র.) বলেছেন, সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে যে এখানে যা বলা হয়েছে, তা হলো স্থলযুদ্ধ সংক্রান্ত। কেননা, সামুদ্রিক যুদ্ধে শহীদ হলে সমস্ত গুনাহ এমনকি বান্দার হকও ক্ষমা করা হবে। –[ইবনে মাজাহ, আহমদ, মেরকাত- খ. ৬, পৃ. ১০৩]

وَعَنْ ٢٧٨٧ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتٰى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفّٰى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْئَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ قَضَاءً فَاِنْ حُدِّثَ اَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلّٰى وَاِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ قَامَ فَقَالَ اَنَا اَوْلٰى

২৭৮৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাজা উপস্থিত করা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা রেখে গিয়েছে কি? যদি বলা হতো যে, ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা রেখে গিয়েছে, তবে তিনি তার জানাজার নামাজ পড়তেন। অন্যথায় [নিজে ঐ জানাজার নামাজে শরিক না হয়ে] মুসলমানগণকে বলতেন, তোমরা তোমাদের সাথির জানাজার নামাজ পড়ে নাও। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিভিন্ন জেহাদে বিজয় দান করলেন [এবং তিনি গনিমত তথা যুদ্ধলব্ধ মালসম্পদের দ্বারা বাইতুল মাল– সরকারি ধন-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করলেন], তখন [এর সর্বপ্রথম ব্যয়-বরাদ্দের বলিষ্ঠ ঘোষণা প্রদানে] বললেন, আমি মু'মিনদের জন্য তাদের নিজ অপেক্ষা

بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاءُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অধিক মঙ্গলকামী। সে মতে মু'মিনদের মধ্য হতে যে কেউ ঋণ রেখে দুনিয়া ত্যাগ করবে, ঐ ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব [বাইতুল মালের পক্ষে] আমার [তথা রাষ্ট্রপ্রধানের] উপর ন্যস্ত থাকবে। পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তির ধনসম্পদ থাকলে [এর উপর বাইতুল মালের দাবি আসবে না; বরং ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট থাকলে] তা তার ওয়ারিশগণ পাবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ : "আমি মু'মিনদের জন্য তাদের নিজ অপেক্ষা অধিক মঙ্গলকামী" এ উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মু'মিনদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হলো হুজুর ﷺ -কে স্বীয় জীবন অপেক্ষা অধিক ভালোবাসতে হবে, তাঁর চাহিদাকে নিজেদের নফসের চাহিদার উপর প্রাধান্য দিতে হবে, তাঁর হককে নিজেদের হকের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। কেননা, হুজুর ﷺ ও প্রত্যেক মুসলমানের ব্যাপারে 'সে নিজের জন্য যতটুকু স্নেহশীল হতে পারে' তার চেয়ে অধিক স্নেহশীল ও দয়ালু ছিলেন, যার কারণেই তো তিনি এমন এক যুগান্তকারী ঘোষণা দিতে সক্ষম হয়েছেন– বিশ্বের কোনো মানুষের দ্বারা তেমন ঘোষণার কল্পনাও করা যায় না। তিনি বলেছেন, যদি কেউ ঋণ রেখে মারা যায় আর ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার। আর যদি সে মালসম্পদ রেখে মারা যায়, তাহলে তার পরিবারবর্গই তার মালিক হবে। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, হুজুর ﷺ মৃতদের ঋণ বায়তুল মাল হতে পরিশোধ করতেন। আবার কেউ বলেছেন, হুজুর ﷺ নিজের সম্পদ থেকেই তা পরিশোধ করতেন। –[মেরকাত খ. ৬, পৃ. ১০৩]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٧٨٨ اَبِيْ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ (رضـ) قَالَ جِئْنَا اَبَا هُرَيْرَةَ فِيْ صَاحِبٍ لَنَا قَدْ اَفْلَسَ فَقَالَ هٰذَا الَّذِيْ قَضٰى فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ اَوْ اَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ اَحَقُّ بِمَتَاعِهِ اِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ ـ (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَ ابْنُ مَاجَةَ)

২৭৮৮. অনুবাদ : হযরত আবূ খালদা যুরাকী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা আমাদের এক সঙ্গী ব্যক্তি, যে নিতান্তই নিঃস্ব সাব্যস্ত হয়েছিল [এবং তার নিকট অপর ব্যক্তির একটি জিনিস রক্ষিত ছিল] তার সম্পর্কে [মাসআলা জানার জন্য] হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর নিকট গমন করলাম। তিনি বললেন, এ জাতীয় ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফয়সালা করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় বা নিঃস্ব সাব্যস্ত হয়, তার নিকট যে ব্যক্তি স্বীয় কোনো বস্তু হুবহু রক্ষিত পায়, সে-ই তার অগ্রাধিকারী হবে। –[শাফেয়ী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٢٧٨٩ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتّٰى يُقْضٰى عَنْهُ ـ (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَاَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

২৭৮৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মু'মিন ব্যক্তি [মৃত্যুর পর তার মর্যাদা লাভে] বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে ঋণের কারণে, যতক্ষণ না তার পক্ষ হতে তা পরিশোধ করা হয়। –[শাফেয়ী, আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "মু'মিন ব্যক্তির রূহ ঝুলন্ত থাকে ঋণের কারণে" এ কথার ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, এখানে ঋণ দ্বারা এমন ঋণ উদ্দেশ্য, যা সে বিনা প্রয়োজনে মানুষ থেকে নিয়েছে এবং যা অনর্থক ও অযথা কাজে ব্যয় করেছে। তবে যে ব্যক্তি তার বাস্তবিক প্রয়োজনের তাকিদে ঋণ নিয়েছে সে যদি তা আদায়ের পূর্বে মারা যায়, তাহলে এমন ঋণ তাকে জান্নাতে প্রবেশ ও নেককারদের সাথে মিলিত হতে ইনশাআল্লাহ প্রতিবন্ধক হবে না। তবে এরকম ঋণ সম্পর্কে রাষ্ট্রপ্রধানের ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে তা পরিশোধ করে দেওয়া উচিত, আর তা করলেও আশা করা যায়, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামত দিবসে ঋণদাতাকে রাজি করাবেন, যেন সে দাবি পরিহার করে।

وَعَنْ ٢٧٩٠ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَاسُوْرٌ بِدَيْنِهٖ يَشْكُوْ اِلٰى رَبِّهِ الْوَحْدَةَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ. (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ) وَرُوِيَ اَنَّ مُعَاذًا كَانَ يَدَّانُ فَاَتٰى غُرَمَاؤُهٗ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَاعَ النَّبِيُّ ﷺ مَالَهٗ كُلَّهٗ فِيْ دَيْنِهٖ حَتّٰى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ مُرْسَلٌ هٰذَا لَفْظُ الْمَصَابِيْحِ وَلَمْ اَجِدْهُ فِي الْاُصُوْلِ اِلَّا فِي الْمُنْتَقٰى وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شَابًّا سَخِيًّا وَكَانَ لَا يُمْسِكُ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ يَدَّانُ حَتّٰى اَغْرَقَ مَالَهٗ كُلَّهٗ فِي الدَّيْنِ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَكَلَّمَهٗ لِيُكَلِّمَ غُرَمَاءَهٗ فَلَوْ تَرَكُوْا لِاَحَدٍ لَتَرَكُوْا لِمُعَاذٍ لِاَجْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَاعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَهُمْ مَالَهٗ حَتّٰى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ رَوَاهُ سَعِيْدٌ فِيْ سُنَنِهٖ مُرْسَلًا.

২৭৯০. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঋণী ব্যক্তি [মৃত্যুর পর আপন মর্যাদার স্থানে পৌছতে পারবে না,] ঋণের দায়ে আবদ্ধ থাকবে। সে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকার অভিযোগ করতে থাকবে তার পরওয়ারদেগারের নিকট। –[শরহে সুন্নাহ]

এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, হযরত মু'আয (রা.) ঋণ নিতেন। তাঁর পাওনাদারগণ [নিজ নিজ দাবি নিয়ে] নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলে নবী করীম ﷺ তাদের প্রাপ্য পরিশোধের জন্য হযরত মু'আযের সমুদয় সম্পদ বিক্রয় করে দিলেন। এমনকি হযরত মু'আয (রা.) নিঃস্ব হয়ে পড়লেন। –[মাসাবীহুস সুন্নায় এ হাদীস মুরসালরূপে উল্লেখ আছে, তবে এর মূল কিতাবসমূহে এ হাদীস পাইনি। অবশ্য মুনতাকা কিতাবে তা বর্ণিত আছে।]

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (রা.) বলেন, হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) তরুণ দানবীর ছিলেন– কোনো কিছু জমা রাখতেন না; ফলে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। এমনকি তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি ঋণে নিমজ্জিত হয়ে গেল। এমতাবস্থায় তিনি নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে অনুরোধ জানালেন– তিনি যেন তাঁর পাওনাদারগণের নিকট সুপারিশ করেন। পাওনাদারগণের পক্ষে প্রাপ্যের দাবি ছেড়ে দেওয়া যদি সম্ভব হতো, তবে তাঁরা অবশ্যই হযরত মু'আযের জন্য তা ছেড়ে দিতেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুপারিশ করেছিলেন। [কিন্তু তাঁদের জন্য তা সম্ভব হয়নি।] অবশেষে রাসূল ﷺ পাওনাদারগণের জন্য হযরত মু'আযের সুমদয় সম্পত্তি বিক্রি করে দিলেন। এমনকি হযরত মু'আয (রা.) নিঃস্ব হয়ে গেলেন। –[সা'ঈদ তাঁর সুনান গ্রন্থে মুরসালরূপে এটা বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَاسُوْرٌ بِدَيْنِهِ الخ : "ঋণী ব্যক্তি ঋণের দায়ে আবদ্ধ থাকবে এবং একাকিত্বে অভিযোগ করবে।" এ কথার উদ্দেশ্য হলো, যখন ঐ ব্যক্তির না জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি মিলবে, আর না সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সংস্পর্শে যাওয়ার সুযোগ মিলবে এবং সে দেখতে পাবে যে, সকল নেককার লোকজন জান্নাতে প্রবেশ করছে আর আমি এমন হতভাগা যে, তাদের সাহচর্যের সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত এবং আমার কোনো সুপারিশকারীও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না– যে আমাকে এ নিঃসঙ্গতার বন্দীদশা থেকে মুক্তি দেবে, তখন সে আল্লাহর দরবারে সরাসরি অভিযোগ করবে। সুতরাং সে যতক্ষণ না আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে বা ঋণদাতাদের থেকে ক্ষমা করানোর মাধ্যমে ঋণ থেকে মুক্তি পাবে, ততক্ষণ সে ঐ একাকিত্বের অবস্থাতেই থাকবে। ঐ একাকিত্বই তার জন্য শাস্তিস্বরূপ পরিগণিত হবে।

قَوْلُهُ لَمْ أَجِدْهُ فِي الْأُصُوْلِ إِلَّا فِي الْمُنْتَقٰى : "أُصُوْل" এমন কিতাবকে বলা হয়, যাতে হাদীসগুলো সনদ সহকারে বর্ণিত হয়। আর منتقى হলো ইবনে তাইমী (র.) প্রণীত একটি হাদীসগ্রন্থের নাম। সুতরাং মেশকাতের মুসান্নিফের উক্তি وَلَمْ أَجِدْهُ الخ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তিনি বলতে চাচ্ছেন যে, مَصَابِيْح -এর مُصَنِّف এ- রেওয়ায়েতটি وَرُوِيَ أَنَّ مُعَاذًا كَانَ الخ যে শব্দে বর্ণনা করেছেন, সেই শব্দে আমি أُصُوْل -এর কোনো কিতাবে হাদীসটি পাইনি; বরং রেওয়ায়েতটি مُنْتَقٰى নামক কিতাবে وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ এ সূত্রে বর্ণিত আছে।

আল্লামা ত্বীবী (র.) বলেন, এখানে এ কথাটি বলার উদ্দেশ্য হলো একথা বুঝানো যে, এ হাদীসটি যদিও أُصُوْل -এর ঐ সমস্ত কিতাবে বর্ণিত নেই, যা মুসান্নিফ-এর দৃষ্টিগোচর হয়েছে; কিন্তু হাদীসটি مُنْتَقٰى নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, সুতরাং হাদীসটি যদি أُصُوْل -এর কিতাবে না থাকত, তাহলে مُنْتَقٰى প্রণেতা তা উল্লেখ করতেন না।

وَعَنْ ٢٧٩١ الشَّرِيْدِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُحِلُّ عِرْضَهُ يُغَلَّظُ لَهُ وَعُقُوْبَتَهُ يُحْبَسُ لَهُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

২৭৯১. অনুবাদ : হযরত শারীদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সক্ষম ব্যক্তি [ঋণ পরিশোধে] টালবাহানা করলে তাকে লজ্জিত করা এবং শাস্তি প্রদান করা জায়েজ হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) বলেছেন, লজ্জিত করার অর্থ, তার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা। আর শাস্তি প্রদান করার অর্থ [আইনের মাধ্যমে] তাকে হাজতে রাখা। –[আবূ দাঊদ ও নাসায়ী]

وَعَنْ ٢٧٩٢ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلٰى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ هَلْ تَرَكَ لَهُ مِنْ وَفَاءٍ قَالُوْا لَا قَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَتَقَدَّمَ فَصَلّٰى عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَعْنَاهُ وَقَالَ فَكَّ اللّٰهُ رِهَانَكَ مِنَ النَّارِ كَمَا

২৭৯২. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, একদা নবী করীম ﷺ -এর নিকট একটি জানাজা উপস্থিত করা হলো– তার নামাজ পড়ার জন্য। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের সাথি– মৃত ব্যক্তির উপর কোনো ঋণ আছে কি? লোকেরা উত্তরে বলল, জী হ্যাঁ। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, ঋণ পরিশোধের কোনো ব্যবস্থা রেখে গেছে কি? লোকেরা বলল, জি-না। নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা তোমাদের সাথির জানাজার নামাজ পড়ে নাও। তখন হযরত আলী ইবনে আবূ তালেব (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম– অতঃপর নবী করীম ﷺ তার নামাজ পড়লেন।

অপর এক বর্ণনায় আরো আছে যে, [হযরত আলী (রা.)-এর জন্য দোয়ারূপে] নবী করীম ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে

فَكَكْتَ رِهَانَ اَخِيْكَ الْمُسْلِمِ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقْضِىْ عَنْ اَخِيْهِ دَيْنَهُ اِلَّا فَكَّ اللّٰهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ - (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

দোজখ হতে মুক্তি দান করুন, যেরূপ তুমি তোমার মুসলমান ভ্রাতাকে [ঋণের বোঝা হতে] মুক্ত করেছ। যে কোনো মুসলমান তার ভ্রাতাকে ঋণ হতে মুক্ত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামত দিবসে মুক্তি দান করবেন। -[শরহে সুন্নাহ]

وَعَنْ ٢٧٩٣ ثَوْبَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِئٌ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُوْلِ وَالدَّيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ)

২৭৯৩. অনুবাদ : হযরত ছাওবান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তির মৃত্যু হবে অহংকার, খেয়ানত ও ঋণ হতে মুক্ত অবস্থায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

-[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

وَعَنْ ٢٧٩٤ اَبِىْ مُوْسٰى (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَعْظَمَ الذُّنُوْبِ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِىْ نَهَى اللّٰهُ عَنْهَا اَنْ يَمُوْتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

২৭৯৪. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন- নবী করীম ﷺ বলেছেন, বান্দা আল্লাহ তা'আলার নিকট উপস্থিত হলে কবীরা গুনাহসমূহের পরেই সর্বশ্রেষ্ঠ গুনাহে পরিগণিত হবে এমতাবস্থায় মৃত্যু হওয়া যে, সে ঋণগ্রস্ত হয় এবং তা পরিশোধের ব্যবস্থা রেখে না যায়। -[আহমদ ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِىْ نَهَى اللّٰهُ عَنْهَا : ঋণের বোঝা নিয়ে মৃত্যুবরণকে কবীরা গুনাহের পর স্থান দেওয়ার কারণ হলো, কবীরা গুনাহ তো এমনিতেই নিষিদ্ধ। কিন্তু ঋণ গ্রহণ তো কোনো গুনাহের কাজ নয় যে, সেটা কবীরা হবে; বরং প্রয়োজনের তাকিদে ঋণ গ্রহণকে মোস্তাহাব বলা হয়েছে। সুতরাং ঋণ গ্রহণকে যে কোথাও নিষেধ করা হয়েছে, তা এজন্য যে, কখনো কখনো বিভিন্ন কারণে ঋণ গ্রহণের দ্বারা মানুষের হক নষ্ট হয়, অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি যখন ঋণ পরিশোধ না করে, তখন ঋণদাতা ব্যক্তির মাল অযথা নষ্ট হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণ গুনাহে পরিণত হয়। -[মেরকাত- খ. ৬, পৃ. ১০৭]

وَعَنْ ٢٧٩٥ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِىِّ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى شُرُوْطِهِمْ اِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَاَبُوْ دَاوُدَ) وَانْتَهَتْ رِوَايَتُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ شُرُوْطِهِمْ.

২৭৯৫. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে আওফ আল-মুযানী (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, মুসলমানদের পরস্পর আপস-মীমাংসাকে ইসলাম অনুমোদন করে। কিন্তু যে মীমাংসা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করবে, তা অনুমোদিত হবে না। মুসলমানগণ পরস্পর যে শর্ত ও চুক্তি করবে, তা অবশ্য পালনীয় হবে। কিন্তু যে শর্ত ও চুক্তি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করবে তা পালনীয় হবে না। -[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا : "হারাম সন্ধি"র দৃষ্টান্ত হলো, যেমন– কেউ এ কথার উপর সন্ধি করল যে, আমি স্ত্রীর সতীনের সাথে সহবাস করব না। এ রকম সন্ধি বৈধ নয়। কেননা, এ ক্ষেত্রে এমন এক জিনিসকে হারাম করা হয়, যা সম্পূর্ণরূপে বৈধ।

তদ্রূপ যে সন্ধি দ্বারা হারাম জিনিসকে হালাল করা হয় তার দৃষ্টান্ত হলো, যেমন– কেউ এ কথার উপর সন্ধি করল যে, আমি মদ পান করব বা শূকরের গোশ্ত খাব, এক্ষেত্রে এমন জিনিসকে নিজের জন্য হালাল করা হলো, যা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

যে চুক্তি ও সন্ধি রক্ষা করা আবশ্যক নয় তার দৃষ্টান্ত হলো, যেমন– কেউ তার স্ত্রীর সাথে সন্ধি করল যে, দাসীর সাথে সহবাস করবে না। এ ক্ষেত্রে এমন এক জিনিসকে নিজের জন্য হারাম করার শর্ত করা হলো, যা হালাল, অথবা যেমন– কেউ এ কথার শর্ত করল যে, আমি আমার স্ত্রীর উপস্থিতিতে তার বোনকে বিবাহ করব, এ শর্তও রক্ষা করা আবশ্যক নয়। কেননা, এখানে এমন একটি জিনিসকে নিজের জন্য হালাল করল, যা হারাম।

وَجْهُ مُنَاسَبَةِ الْحَدِيْثِ بِالْبَابِ : বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখে যায় যে, এর بَابٌ-এর সাথে হাদীসটির কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই, কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে باب-এর সাথে হাদীসের সূক্ষ্ম মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তা এভাবে যে, ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দেউলিয়া হয়ে গেলে সাধারণত সন্ধি স্থাপনের আবশ্যকতা দেখা দেয়। সেদিক বিচারে بَابٌ-এর সাথে হাদীসের মিল পাওয়া যায়।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٧٩٦ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ (رضـ) قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِّنْ هَجَرَ فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ فَجَاءَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِيْ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيْلَ فَبِعْنَاهُ وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالْاَجْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زِنْ وَارْجِحْ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭৯৬. অনুবাদ : হযরত সুওয়াইদ ইবনে কায়েস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং মাখরাফাতুল আবদী (রা.) 'হাজার' নামক স্থান হতে ব্যবসার জন্য কাপড় নিয়ে মক্কায় আসলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন; তিনি আমাদের নিকট হতে একটি পায়জামা ক্রয় করতে চাইলেন। আমরা তা তাঁর নিকট বিক্রয় করলাম। অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন বস্তু ওজনকারী এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে রৌপ্য-মুদ্রা ওজন করে দিতে বললেন। তিনি তাকে এটাও বললেন, ওজন করার সময় প্রাপ্য অপেক্ষা একটু বেশি দেবে। –[আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]। আর তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ কি পায়জামা পরিধান করেছেন? হযরত আবূ লায়লা স্বীয় সনদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর ﷺ সেই পায়জামাটি চার দিরহাম দ্বারা ক্রয় করেছিলেন। হাদীসে শুধুমাত্র হুজুরের পায়জামা ক্রয়ের কথা প্রমাণিত আছে, পায়জামা পরিধান করেছেন কিনা, সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন, তিনি পরিধান করেননি। তবে পায়জামা পরিধানের অনুমোদন হুজুর ﷺ থেকে রয়েছে। আল্লামা ত্বীবী (র.) বলেন, স্পষ্ট কথা হলো তিনি পরিধান করেছেন এবং তাঁর যুগে সকলেই পরিধান করত। –[মেরকাত- খ. ৬, পৃ. ১০৮]

تَوَاضُعُ النَّبِيِّ ﷺ : এ হাদীসে বিশ্বনবী ﷺ -এর বিনয় ও নম্রতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। কেননা, পায়জামা ক্রয়ের জন্য তিনি নিজে পায়ে হেঁটে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তদুপরি হুজুর ﷺ এখানে বিক্রেতাকে চূড়ান্ত মূল্যের অধিক মূল্য প্রদান করে এমন এক মহানুভবতার পরিচয় প্রদান করেছেন, বিশ্বের ইতিহাসে যার দৃষ্টান্ত বিরল।

শব্দ-বিশ্লেষণ :

بَزٌّ : একটি এটি একবচন, বহুবচনে بُزُوْزٌ অর্থ– বস্ত্র, কাপড়, ইমাম মুহাম্মদ (র.) سِيَرٌ গ্রন্থে বলেছেন, কূফীদের নিকট بز বলা হয়, কাতান ও কটন কাপড়কে।

سَاوَمَنَا : সীগাহ بحث اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বহছ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বাবে مُفَاعَلَة মাসদার اَلْمُسَاوَمَةُ মূলবর্ণ (س . و . م) জিনসে اَجْوَفْ وَاوِىْ অর্থ– দর কষাকষি করা।

سَرَاوِيْلَ : এটি বহুবচন, একবচনে سِرْوَالٌ অর্থ– পায়জামা।

وَعَنْ ٢٧٩٧ جَابِرٍ (رض) قَالَ كَانَ لِيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ فَقَضَا لِيْ وَ زَادَنِيْ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৭৯৭. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর নিকট আমার কিছু পাওনা ছিল। তা পরিশোধকালে তিনি আমাকে আমার প্রাপ্যের অধিক প্রদান করলেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

هَلْ يَجُوْزُ زِيَادَةُ الثَّمَنِ فِى الْبَيْعِ اَوِ الْقَرْضِ : এ হাদীস এবং উপরের হাদীস দ্বারা স্পষ্টত জানা গেল যে, যদি কেউ ঋণ বা মূল্য পারিশোধকালে নিজের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার শর্তারোপ ব্যতীত অতিরিক্ত দেয়, তাহলে তা জায়েজ হবে। এ ধরনের অতিরিক্ত প্রদানকে সুদ আখ্যা দেওয়া যাবে না; বরং এটা হাদিয়ার পর্যায়ে পড়বে। কেননা, সুদ তো হবে সে ক্ষেত্রে, যা ঋণদাতা ঋণ প্রদানের সময় অতিরিক্ত প্রদানের শর্তারোপ করে দেয়।

وَعَنْ ٢٧٩٨ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ (رض) قَالَ اِسْتَقْرَضَ مِنِّى النَّبِيُّ ﷺ اَرْبَعِيْنَ اَلْفًا فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ اِلَىَّ وَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ اِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْاَدَاءُ . (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

২৭৯৮. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবূ রাবীআহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ [বাইতুল মালের প্রয়োজনে] আমার নিকট হতে চল্লিশ হাজার দিরহাম ধার নিয়েছিলেন। যখন [বাইতুল মালে] অর্থ সঞ্চয় হলো, তখন তিনি আমার প্রাপ্য পরিশোধ করলেন এবং দোয়া করলেন– আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ধনে-জনে বরকত দান করুন। আর বললেন, ধার দেওয়ার প্রতিদান হচ্ছে ধারদাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং ধার পরিশোধ করা। –[নাসায়ী]

وَعَنْ ٢٧٩٩ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهٗ عَلٰى رَجُلٍ حَقٌّ فَمَنْ اَخَّرَهٗ كَانَ لَهٗ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

২৭৯৯. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তির প্রাপ্য থাকে অপর কারো উপর, সে যদি খাতককে কিছু দিনের সময় দান করে, তবে প্রতিদিনের বিনিময়ে সদকা বা দান-খয়রাত করার ছওয়াব তার লাভ হবে। –[আহমদ]

وَعَنْ ٢٨٠٠ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ (رض) قَالَ مَاتَ أَخِيْ وَتَرَكَ ثَلٰثَمِائَةِ دِيْنَارٍ وَ تَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوْسٌ بِدَيْنِهٖ فَاقْضِ عَنْهُ قَالَ فَذَهَبْتُ فَقَضَيْتُ عَنْهُ ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ وَلَمْ تَبْقَ إِلَّا امْرَأَةٌ تَدَّعِيْ دِيْنَارَيْنِ وَلَيْسَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ أَعْطِهَا فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

২৮০০. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে আতওয়াল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ভ্রাতার মৃত্যুকালে, তিনি তিন শত দিনার [স্বর্ণ-মুদ্রা] রেখে গেলেন এবং নাবালক সন্তান রেখে গেলেন। আমার ইচ্ছা হলো– তাঁর দিনারগুলো তাঁর শিশুদের জন্য ব্যয় করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তোমার ভ্রাতা ঋণের দায়ে আবদ্ধ রয়েছে; তার ঋণ পরিশোধ কর। তিনি বলেন, সে মতে আমি গিয়ে ঋণ পরিশোধ করলাম এবং পুনঃ এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সব ঋণই পরিশোধ করেছি; শুধুমাত্র একজন মহিলা অবশিষ্ট রয়েছে। সে দুই দিনার পাওয়ার দাবি করে, কিন্তু তার কোনো সাক্ষী নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকেও দিয়ে দাও, সে সত্যবাদিনী। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে হযরত সা'দের ভ্রাতার অবস্থা জানতে পারলেন? হযরত সা'দ (রা.)-এর ভ্রাতার ঋণের অবস্থা এবং মহিলার সত্যবাদিনী হওয়ার কথা হয়তো হুজুর ﷺ কোনো বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছিলেন অথবা ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে তার ভাইকে ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছেন এবং মহিলাকে সত্যবাদিনী আখ্যা দিয়েছেন।

ঋণ মিরাসের উপর অগ্রগণ্য : উল্লিখিত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, ঋণ মিরাসের উপর অগ্রগণ্য। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ধনসম্পদ দ্বারা সর্বপ্রথম ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তারপর যা থাকে তা ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টন করতে হবে।

وَعَنْ ٢٨٠١ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ (رض) قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ يُوْضَعُ الْجَنَائِزُ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَصَرَهُ قِبَلَ السَّمَاءِ فَنَظَرَ ثُمَّ طَأْطَأَ بَصَرَهُ وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلٰى جَبْهَتِهٖ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا نَزَلَ مِنَ التَّشْدِيْدِ قَالَ فَسَكَتْنَا يَوْمَنَا وَلَيْلَتَنَا فَلَمْ نَرَ إِلَّا خَيْرًا حَتّٰى أَصْبَحْنَا قَالَ مُحَمَّدٌ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا التَّشْدِيْدُ

২৮০১. অনুবাদ : হযরত মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদের সম্মুখস্থ খোলা জায়গায় বসাছিলাম, যেখানে জানাজা রাখা হতো, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আকাশপানে চোখ উঠালেন এবং তাকালেন, অতঃপর দৃষ্টিকে অবনত করে ললাটের উপর হাত রাখলেন এবং বললেন, সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! কী কঠোরতা অবতীর্ণ হলো!

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা এক দিন এক রাত্র চুপই রইলাম; এ সময়ের মধ্যে [কোনো মন্দ দেখলাম না] সব ভালোই দেখলাম। হযরত মুহাম্মদ (রা.) বলেন, পরবর্তী দিন ভোর হলে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, কি কঠোরতা অবতীর্ণ

الَّذِىْ نَزَلَ قَالَ فِى الدَّيْنِ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ اَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَقْضِىَ دَيْنَهٗ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَفِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ نَحْوَهٗ)

হয়েছে? তিনি বললেন, ঋণ সম্পর্কে কঠোরতা [ওহী মারফত] অবতীর্ণ হয়েছে!

ঐ আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে পুনরায় [দুনিয়ার] জীবন লাভ করেছে, আবার শহীদ হয়ে পুনরায় জীবন লাভ করেছে, আবার শহীদ হয়ে [পরকালের জন্য] পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং তার উপর ঋণ ছিল, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তার ঋণ পরিশোধ না করা হয়। -[আহমদ ও শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দ-বিশ্লেষণ :

طَأْطَأَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাবে فَعْلَلَ - طَأْطَأَ الرَّأْسَ অর্থ–মস্তক অবনত করল। طَأْطَأَ بَصَرَهٗ অর্থ– দৃষ্টি অবনত করল।

جَبْهَةٌ : এটি একবচন, বহুবচনে جِبَاهٌ অর্থ– কপাল, ললাট।

اَصْبَحْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাবে اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِصْبَاحُ মূলবর্ণ (ص ـ ب ـ ح) জিনসে صَحِيْح অর্থ– সকালে উপনীত হওয়া, সকাল করা।

اَلتَّشْدِيْدُ : বাবে تَفْعِيْل -এর মাসদার। অর্থ– কঠোরতা।

بَابُ الشِّرْكَةِ وَالْوَكَالَةِ
পরিচ্ছেদ : অংশীদারিত্ব ও ওকালত

اَلشِّرْكَةُ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ : شِرْكَةٌ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো- اَلضَّمُّ বা মিলানো। শরিয়তের পরিভাষায় شِرْكَةٌ বলা হয়, দু ব্যক্তির মধ্যে এমন লেনদেন হওয়া, যাতে তারা আসল ও মুনাফা উভয়টার মধ্যে অংশীদার হয়।

اَلشِّرْكَةُ-এর প্রকারভেদ : شِرْكَةٌ বা অংশীদারিত্ব প্রথমত দু প্রকার। যেমন-

১. اَلشِّرْكَةُ فِى الْمِلْكِ বা মালিকানায় অংশীদারিত্ব।

২. اَلشِّرْكَةُ فِى الْعَقْدِ বা লেনদেনের মধ্যে অংশীদারিত্ব।

* আবার اَلشِّرْكَةُ فِى الْمِلْكِ কয়েক প্রকার। যেমন-

ক. দুই বা ততোধিক ব্যক্তি ক্রয়বিক্রয়, দান বা উত্তরাধিকারী সূত্রে কোনো কিছুর মালিক হওয়া।

খ. অথবা, দুই ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে কোনো বৈধ জিনিস অর্জন করা। যেমন- দু ব্যক্তি মিলে শিকার করল, উক্ত শিকারে উভয়ের মালিকানা থাকবে।

গ. বা দু ব্যক্তির একই রকম ভিন্ন ভিন্ন জিনিস একটি অপরটির মধ্যে এমনভাবে মিশ্রিত হওয়া, যা পার্থক্য করা না যায়। যেমন- একজনের দুধ অন্যের দুধের সাথে মিশ্রিত হওয়া।

ঘ. উভয়ে পরস্পরে স্বেচ্ছায় নিজেদের মাল একটি অপরটির মাঝে মিলিয়ে দেওয়া।

اَلشِّرْكَةُ فِى الْمِلْكِ-এর হুকুম : শরিয়তের দৃষ্টিতে এর বিধান হলো, প্রত্যেক অংশীদার তার অপর অংশীদারের অংশে অপরিচিতি ব্যক্তির ন্যায় হবে এবং কেউই নিজের অংশ অপর অংশীদারের অনুমতি ব্যতীত অন্যের নিকট বিক্রয় করতে পারবে না। তবে শেষের দুই সুরতে একজন অপরজনের অনুমতি ব্যতীত বিক্রয় করতে পারবে।

اَلشِّرْكَةُ فِى الْعَقْدِ : বা লেনদেনের মধ্যে অংশীদারিত্ব হলো, অংশীদারগণ اِيْجَابٌ ও قَبُوْل-এর দ্বারা নিজেদের মালকে মিলিত করে নেয়। যেমন- একজন অপরকে বলল, আমি আমার অমুক হক বা অমুক ব্যবসায় তোমাকে অংশীদার করলাম। অপরজন বলল, আমি কবুল করলাম।

اَلرُّكْنُ وَشَرْطُهَا : এ প্রকারের رُكْن হলো اِيْجَابٌ ও কবুল এবং তাসহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো এমন কোনো শর্তারোপ না করা বা এমন কোনো দফা জুড়ে না দেওয়া যা অংশীদারিত্বের মৌলিক নীতিকে ব্যাহত করে। যেমন- শরিকদের মধ্য থেকে কোনো একজনের মুনাফা হতে কিছু অংশ নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেওয়া। উদাহরণস্বরূপ কোনো ব্যবসায়ে দুজন অংশীদার তন্মধ্যে একজন শর্তারোপ করল যে, এ ব্যবসায়ে অর্জিত মুনাফা হতে পাঁচশত টাকা করে মাসিক হারে আমি নেব। এ ধরনের শর্তারোপ করা যৌথ ও অংশীদারিত্বপূর্ণ ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ পরিপন্থি, যা অংশীদারিত্বের মৌলিক নীতিকে ব্যাহত করে। এজন্যই অংশীদারিত্বের চুক্তিতে কোনো এমন দফা জুড়ে না দেওয়া যা অংশীদারিত্ব সহীহ হওয়ার পূর্বশর্ত।

اَلشِّرْكَةُ فِى الْعَقْدِ-এর প্রকারভেদ : লেনদেনের মধ্যে অংশীদারিত্ব চার প্রকার। যেমন-

١. شِرْكَةُ الْمُفَاوَضَةِ ٢. شِرْكَةُ الْعِنَانِ ٣. شِرْكَةُ صَنَائِعِ وَالتَّقَبُّلِ ٤. شِرْكَةُ الْوُجُوْهِ .

اَلْوَكَالَةُ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ : وَكَالَة শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো- দায়িত্ব অর্পণ করা, অভিভাবক বানানো। শরিয়তের পরিভাষায় وَكَالَةٌ বলা হয়- عِبَارَةٌ عَنْ اِقَامَةِ الْاِنْسَانِ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِىْ تَصَرُّفٍ مَعْلُوْمٍ
অর্থাৎ কাউকে কোনো একটা নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা।

وَكَالَةٌ : رُكْنُ الْوَكَالَةِ وَشَرْطُهَا-এর رُكْن হলো وَكَلْتُ বা তার অনুরূপ শব্দ বলা। অপর শর্ত হলো–

وَشَرْطُهَا أَنْ يَمْلِكَ الْمُوَكِّلُ التَّصَرُّفَ وَيَلْزَمُهُ الْأَحْكَامُ.

অর্থাৎ مُوَكِّلُ তাকে নিযুক্ত করার মালিক হওয়া এবং যাকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা হচ্ছে, সে উক্ত কাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়া।

وَحُكْمُهَا مُبَاشَرَةُ الْوَكِيلِ مَا فُوِّضَ إِلَيْهِ.

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٨٠٢ - عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِى الطَّعَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ فَيَقُولَانِ لَهُ أَشْرِكْنَا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيُشْرِكُهُمْ فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هِشَامٍ ذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৮০২. **অনুবাদ :** তাবেয়ী হযরত যুহরা ইবনে মা'বাদ (র.) হতে বর্ণিত, তাঁর দাদা সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম (রা.) তাঁকে নিয়ে বাজারে যেতেন এবং খাদ্যশস্য ক্রয় করতেন; অতঃপর তাঁর সাথে হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে যুবায়েরের সাক্ষাৎ হতো। তখন তাঁরা তাঁকে বলতেন, আপনি আমাদেরকেও আপনার সাথে শরিক করুন। কেননা, নবী করীম ﷺ আপনার জন্য বরকতের দোয়া করেছেন। সুতরাং তিনি তাঁদেরকে নিজের শরিক করতেন। দেখা যেত, কোনো কোনো সময় তিনি পূর্ণ এক উট বোঝাই মাল লাভ করতেন এবং তা নিজের বাড়ির দিকে পঠিয়ে দিতেন। যুহরা বলেন, ব্যাপার হলো এই যে, একদা আমার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে হিশামকে তাঁর মাতা নবী করীম ﷺ -এর নিকট নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁর জন্য বরকতের দোয়া করেছিলেন। –[বুখারী]

٢٨٠٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ قَالَ لَا تَكْفُونَنَا الْمُؤْنَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৮০৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আনসারগণ নবী করীম ﷺ -কে বললেন, হুজুর আমাদের খেজুর বাগানগুলো আমাদের ও আমাদের ভাই মুহাজিরদের মধ্যে ভাগ করে দিন! তিনি বললেন, না, [বাগান তোমাদের কাছে থাকুক।] আমাদের জন্য তোমাদের পক্ষ হতে এটাই যথেষ্ট যে, তোমরা বাগানের তত্ত্বাবধানের কষ্ট স্বীকার কর, আমরা তোমাদেরকে ফলে শরিক করব। তাঁরা বললেন, হুজুর, আমরা এটা শুনলাম ও মানলাম। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মক্কার মুসলমানদেরকে তাদের স্বদেশ ভূমি মক্কাতে সংকুচিত করা হয়েছিল এবং আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশে তারা মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় গমন করলেন। তারা যেহেতু মক্কাতেই তাদের সমুদয় সম্পদ রেখে এসেছিলেন, তাই তাদের জীবিকা নির্বাহের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন মদিনাবাসীগণ। এ কারণেই তাদেরকে

"আনসার" বলা হয়। হুজুর ﷺ মদিনার আনসার এবং মক্কার মুহাজিরদের মাঝে "ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক" স্থাপন করে দেন। তাই আনসারগণ মুহাজিরদেরকে তাদের সমুদয় সম্পদের মধ্যে সমান অংশীদার বানিয়েছেন। সে পরিপ্রেক্ষিতেই আনসারগণ নবী করীম ﷺ -এর নিকট আবেদন করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের খেজুর গাছগুলোকেও আমাদের এবং মুহাজিরদের মাঝে সমান সমান বণ্টন করে দেন। তাহলে আমরা আমাদের অংশে পরিশ্রম করব, তারা তাদের অংশে পরিশ্রম করে ফল উৎপন্ন করবে। হুজুর ﷺ বললেন যে, আমি খেজুর গাছ বণ্টন করব না; বরং তোমরাই সেগুলোর পরিচর্যা কর এবং পানি ইত্যাদি দেওয়ার কষ্ট স্বীকার কর, কেননা তোমাদের মুহাজির ভাইয়েরা এসব কষ্ট বরদাশত করতে পারবে না। তবে ফল পেকে গেলে তখন তা তোমাদের এবং তাদের মাঝে বণ্টন করে দেব। হুজুরের এ সিদ্ধান্ত আনসারগণ অবনত মস্তকে মেনে নেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَلْمُؤْنَةُ : এটি একবচন, বহুবচনে مُؤَنٌ অর্থ– রসদ, খাবার, জীবিকা নির্বাহ পরিমাণ খাবার, পরিশ্রম।

وَعَنْ ٢٨٠٤ عُرْوَةَ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ الْبَارِقِىِّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطَاهُ دِيْنَارًا لِيَشْتَرِىَ لَهُ شَاةً فَاشْتَرٰى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ اِحْدٰهُمَا بِدِيْنَارٍ وَاَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِيْنَارٍ فَدَعَا لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ فَكَانَ لَوِ اشْتَرٰى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيْهِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

২৮০৪. অনুবাদ : হযরত ওরওয়াহ ইবনে আবুল জা'দ বারেকী (রা.) হতে বর্ণিত. একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে একটি বকরি ক্রয় করতে একটি দিনার দিলেন। তিনি তা দ্বারা তাঁর জন্য দুটি বকরি ক্রয় করলেন। অতঃপর একটি এক দিনারে বিক্রয় করে দিলেন এবং একটি বকরি ও একটি দিনার তাঁকে এনে দিলেন। অতএব, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেচাকেনার ব্যাপারে তাঁর জন্য বরকতের দোয়া করলেন। অতঃপর যদি তিনি মাটিও ক্রয় করতেন, তাতেও লাভ হতো। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইবনে মালিক (রা.) বলেন যে, এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, ব্যবসায়ী লেনদেনের মধ্যে পতিনিধি নিয়োগ করা জায়েজ আছে। তেমনিভাবে এমন সব ব্যাপারেও প্রতিনিধি নিয়োগ জায়েজ আছে, যার মধ্যে প্রতিনিধি নিয়োগ সম্ভবপর। যদি কোনো ব্যক্তি কারো মাল তার অনুমতি ব্যতীত বিক্রয় করে, তাহলে সে ক্রয়বিক্রয় সংঘটিত হয়ে যাবে। তবে তা কার্যকরী হবে মালিকের অনুমতি সাপেক্ষে। মালিক অনুমতি দিলে তা কার্যকর হবে, নতুবা হবে না। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে তার মাল বিক্রয় করা আদৌ জায়েজই হবে না। পরবর্তীতে মালিক অনুমতি দিলেও না। –[মেরকাত খ. ৬, পৃ. ১১১]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٨٠٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) رَفَعَهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَزَادَ رَزِيْنٌ وَجَاءَ الشَّيْطَانُ .

২৮০৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ -এর নাম উল্লেখ করে বললেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, দুই অংশীদারের মধ্যে আমি তৃতীয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা একে অন্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে। যখন তাদের কেউ অপরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আমি তাদের মধ্য হতে সরে পড়ি। –[আবূ দাউদ]

কিন্তু রাযীন বর্ধিত করেছেন, [তাদের মধ্যে] শয়তান এসে পৌছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ : আল্লাহর বাণী- "দুই অংশীদারের মাঝে আমি তৃতীয়" এ হাদীসাংশের ব্যাখ্যা হলো, অংশীদারগণ যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদারি, সততা, আমানতদারি ও ন্যায়নিষ্ঠার সাথে পরস্পর লেনদেনে রত থাকবে, ততক্ষণ আমার হেফাজত ও বরকতের ছায়া তাদের উপর বিস্তার করি এবং আমি তাদেরকে যাবতীয় অনিষ্টতা হতে রক্ষা করি, তাদের মালে দুর্যোগ অবতীর্ণ করি না। তাদের রিজিক প্রসন্ন করে দেই, তাদের লেনদেনকে কল্যাণকর করে দেই এবং সর্বোপরি তাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করি।

قَوْلُهُ فَاِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا : "যখন তাদের কেউ অপরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আমি তাদের মধ্য হতে সরে পড়ি" এ কথার তাৎপর্য হলো, যখন অংশীদারদের মধ্যে অসততা ও খেয়ানতের জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে, তখন আমার হেফাজত ও বরকতের ছায়া তাদের উপর থেকে সরে যায় এবং শয়তান এসে সেখানে প্রভাব বিস্তার করে। যার ফলশ্রুতিতে অংশীদারগণ পরিপূর্ণ ক্ষতি ও লোকসানের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌছে।

এ হাদীসের আলোকে ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, যৌথভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করা মোস্তাহাব। কেননা, এর মাধ্যমে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও কল্যাণ অর্জন করা সম্ভব হয়।

٢٨٠٦ - وَعَنْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَدِّ الْاَمَانَةَ اِلٰى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ)

২৮০৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তার আমানত আদায় করবে যে তোমার নিকট আমানত রেখেছে এবং খেয়ানত করবে না যে তোমার খেয়ানত করেছে। -[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ : হাদীসের এ অংশের ব্যাখ্যায় কাযী ইয়ায (র.) বলেন, খেয়ানতকারী তোমার সাথে যে আচরণ করেছে সেই আচরণ তুমি তার সাথে করো না। কেননা, তুমি যদি খেয়ানত কর, তাহলে তুমিও তো তার ন্যায় হয়ে গেলে। তবে যদি কেউ তোমার মাল নিয়ে যায়, তাহলে তুমি তার কাছ থেকে ততটুকু নিতে পার, সে যতটুকু তোমার থেকে নিয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যদি কারো হক অন্য কারো নিকট পাওনা থাকে, আর সে ব্যক্তির কোনো মাল হকদারের নিকট কোনোভাবে এসে যায়, তাতে সে এখান থেকে ঐ পরিমাণ নিয়ে নিতে পারবে, যতটুকু সে ঐ ব্যক্তির নিকট পাওনা আছে। তবে তা সমজাতীয় জিনিসের বেলায় প্রযোজ্য হবে। -[মেরকাত- খ. ৬, পৃ. ১১২]

٢٨٠٧ - وَعَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ اَرَدْتُ الْخُرُوْجَ اِلٰى خَيْبَرَ فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ اِنِّيْ اَرَدْتُ الْخُرُوْجَ اِلٰى خَيْبَرَ فَقَالَ اِذَا اَتَيْتَ وَكِيْلِيْ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَاِنِ ابْتَغٰى مِنْكَ اٰيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلٰى تَرْقُوَتِهٖ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৮০৭. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খায়বরের দিকে যেতে ইচ্ছা করলাম। অতঃপর নবী করীম ﷺ -এর নিকট গিয়ে তাঁকে সালাম করে বললাম, হুজুর! আমি খায়বরের দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। হুজুর ﷺ বললেন, সেখানে যখন আমার উকিলের নিকট পৌছবে, তার নিকট হতে পনের 'ওয়াসাক' [খেজুর] নেবে। সে যদি তোমার নিকট আমার কোনো নিদর্শন তালাশ করে, তখন তুমি তার গলার হাঁসুলির উপর হাত রেখ। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হুজুর ﷺ যে ব্যক্তিকে খায়বর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন তাকে নির্দেশনা দিয়ে রেখেছিলেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে তোমার নিকট কিছু চায়, তাহলে তার নিকট তুমি কোনো নিদর্শন চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সে যদি তার হাত তোমার কণ্ঠ হাড়ে রেখে দেয়– তাহলে বুঝবে যে, সে আসলেই আমার প্রতিনিধি, আমিই তাকে পাঠিয়েছি। এ কারণেই হুজুর ﷺ হযরত জাবের (রা.)-কে এ নিদর্শন শিখিয়ে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, যেন ঐ প্রতিনিধি তাকে নিদর্শন দ্বারা ১৫ ওয়াসাক খেজুর দিয়ে দেয়। –[মাযাহেরে হক- খ. ৩; পৃ. ৫৪৬]

শব্দ-বিশ্লেষণ : تَرْقُوَةٌ : এটি একবচন, বহুবচনে تَرَاقِيْ , تَرَاقٍ অর্থ– গলার হাড়, গলার অগ্রভাগ।

خَيْبَر : মদিনার নিকটবর্তী এক জনপদের নাম।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٨٠٨ صُهَيْبٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ اَلْبَيْعُ اِلٰى اَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

২৮০৮. অনুবাদ : হযরত সুহাইব রূমী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তিন জিনিসে বরকত রয়েছে, অঙ্গীকারের উপর বিক্রয় করা, ভাগে বা শরিকে ব্যবসা করা এবং ঘরের কাজে গমের সাথে যব মেশানো, বিক্রিতে নয়। –[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْبَيْعُ اِلٰى اَجَلٍ : নির্দিষ্ট সময়ে মূল্য পরিশোধে বিক্রয় করার অর্থ হলো, ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধের জন্য অবকাশ দেওয়া। এ ধরনের অবকাশ দেওয়ার মধ্যে অনেক ছওয়াবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

قَوْلُهُ الْمُقَارَضَةُ : এর অর্থ مُضَارَبَةٌ আর মুদারাবা হলো কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে স্বীয় মাল ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে দেয় এবং ঐ ব্যক্তি পরিশ্রম করে কারবার পরিচালনা করে অতঃপর ঐ কারবারে যে মুনাফা অর্জিত হয় তা উভয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ হারে বণ্টন করে নেয়। এ রকম ক্রয়বিক্রয়কে بَيْعُ مُضَارَبَةٍ বলা হয়।

قَوْلُهُ اَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ : "গমের সাথে যব মিশানো" ঘরের কাজে ব্যবহারের নিমিত্তে গমের সাথে যব মেশানো এটা খুবই উত্তম ও বরকতময় কাজ। কেননা, এর দ্বারা ঘরের খাবারের চাহিদা মেটানোর জন্য একটি সুন্দর পন্থা। কিন্তু বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এরকম করা সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। কেননা, এটা প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত।

وَعَنْ ٢٨٠٩ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِدِيْنَارٍ لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ اُضْحِيَّةً فَاشْتَرٰى كَبْشًا بِدِيْنَارٍ وَبَاعَهُ بِدِيْنَارَيْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرٰى اُضْحِيَّةً بِدِيْنَارٍ فَجَاءَ بِهَا وَبِالدِّيْنَارِ الَّذِيْ اِسْتَفْضَلَ مِنَ الْاُخْرٰى فَتَصَدَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالدِّيْنَارِ فَدَعَا لَهُ اَنْ يُبَارِكَ لَهُ فِيْ تِجَارَتِهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

২৮০৯. অনুবাদ : হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি কোরবানির পশু ক্রয় করতে একটি দিনার দিয়ে তাকে বাজারে পাঠালেন। তিনি এক দিনার দিয়ে একটি দুম্বা ক্রয় করলেন এবং তা দুই দিনারে বিক্রয় করলেন। অতঃপর তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। আবার গিয়ে এক দিনার দিয়ে একটি কোরবানির পশু ক্রয় করে আনলেন, অতঃপর পশু ও অতিরিক্ত দিনার এনে হুজুর ﷺ -কে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দান করে দিলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন যেন তার ব্যবসায়ে বরকত হয়। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

بَابُ الْغَصَبِ وَالْعَارِيَةِ
পরিচ্ছেদ : কারো মালে অন্যায় হস্তক্ষেপ, ধার ও ক্ষতিপূরণ

اَلْغَصَبُ : অর্থ হলো কারো মাল চুরি করা ব্যতীত অন্যায়ভাবে নেওয়া। অথবা অন্যের মালে অবৈধ কবজা করা, যেমন কোনো জিনিস কারো কাছ থেকে চেয়ে আনাল কিন্তু পরবর্তীতে তা আর ফেরত দিল না। অথবা কারো নিকট আমানত রাখলে তা অস্বীকার করে ফেলল। এসব কিছু غَصَبٌ -এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

اَلْعَارِيَةُ : শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো "ধারকৃত বস্তু" আর পরিভাষায় কারো জিনিস হতে তার অনুমতি সাপেক্ষে কোনো বিনিময় ব্যতীত উপকৃত হওয়া। আল্লামা তুরেপুশতী (র.) বলেন, عَارِيَةٌ শব্দটি عَارٌ থেকে নির্গত হয়েছে, যার অর্থ হলো লজ্জা, যেহেতু মানুষেরা এ ধরনের কাজে লজ্জাবোধ করে তাই এর নামকরণ হয়েছে عَارِيَةٌ কবির ভাষায়–

إِنَّمَا اَنْفُسُنَا اَعْرِيَةٌ * وَالْعَوَارِىْ قِصَارُهَا اَنْ تُرَدَّ –[মেরকাত- খ. ৬, পৃ. ১১৩]

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٨١٠ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৮১০. অনুবাদ : হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কারো এক বিঘত জমিন জোরদখল করেছে, কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক হতে ঐ পরিমাণ জমিন বেড়িরূপে পরিয়ে দেওয়া হবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কারো কোনো জিনিস চাই তা অধিক হোক বা স্বল্প পরিমাণ হোক জোরপূর্বক ছিনতাই করা বা জবরদখল করা এটা শুধুমাত্র সামাজিকভাবে অন্যায় নয়; বরং চারিত্রিকভাবে জঘন্য অপরাধ ও পাপ কাজ হিসেবেও বিবেচিত। ইসলাম মানবাধিকার সংরক্ষণের যে সুমহান চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে এবং মানবাধিকার সংরক্ষণে ছিনতাইকারী ও চোরদের যে শাস্তির বিধান রেখেছে এ হাদীস তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হাদীসের সারমর্ম হলো এই যে, যে ব্যক্তি অন্যের জমি থেকে অর্ধহাত পরিমাণও যদি জোরপূর্বক দখল করে, তার এহেন জঘন্য অপরাধের শাস্তি হলো ঐ পরিমাণ জমির ৭ স্তর পর্যন্ত নিয়ে তার গলায় বেড়িরূপে পরিয়ে দেওয়া হবে।

শরহুস্ সুন্নাহ গ্রন্থে বেড়ি পরানোর অর্থ বলা হয়েছে, তাকে জমিতে ধসানো হবে এভাবে জমির ঐ অংশ যা সে জবরদখল করেছে তা তার গলার বেড়ির ন্যায় হয়ে যাবে। আবার কেউ বলেছেন ঐ পরিমাণ জমি তাকে বহন করতে বাধ্য করা হবে। উল্লেখ্য যে, আসমান যে রকম ৭ স্তর বিশিষ্ট, তদ্রূপ জমির ৭টি স্তর রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী প্রণিধানযোগ্য–اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ –[মেরকাত- খ. ৬, পৃ. ১১৪]

শব্দ-বিশ্লেষণ : شِبْرٌ এটি একবচন, বহুবচনে اَشْبَارٌ অর্থ– বিঘত, অল্প পরিমাণ।

يُطَوَّقُ : সীগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ বহছ اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّطْوِيْقُ অর্থ– গলায় বেড়ি পরানো।

وَعَنْ ٢٨١١ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَحْلُبَنَّ اَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يُؤْتٰى مَشْرَبَتَهُ فَتُكْسَرَ خَزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ وَاِنَّمَا يَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوْعُ مَوَاشِيْهِمْ اَطْعِمَاتِهِمْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৮১১. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন কারো বিনা অনুমতিতে তার পশুর দুধ না দোহন করে। কেননা, তোমাদের মধ্যে কেউ কি পছন্দ করে, কেউ তার দোতলায় পৌঁছুক, আর তার খাদ্য ভাণ্ডার ভেঙ্গে তার খাদ্যশস্য নিয়ে যাক। নিশ্চয় তাদের পশুর স্তন তাদের জন্য খাদ্যকে [দুধকে] পুঞ্জীভূত করে রাখে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : পশুর স্তনকে ফসলের গুদামের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে, তোমরা যেভাবে ফসলকে গুদামজাত করে সংরক্ষণ করে রাখ, তদ্রূপ মানুষের পশুও স্তনের মাঝে মালিকের জন্য খাদ্য অর্থাৎ দুধ সংরক্ষণ করে রাখে। সুতরাং যেভাবে তোমরা একথা পছন্দ করবে না যে, কেউ তোমাদের গুদামে হামলা চালিয়ে মালামাল নিয়ে যাক, তদ্রূপ তোমাদের এ কাজও পশুর মালিকদের কিভাবে পছন্দ হতে পারে যে, তোমরা পশুর স্তন থেকে দুধ দোহন করে নিয়ে যাবে।

শরহুস সুন্নাহ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত হয়ে ফতোয়া দিয়েছেন যে, কারো পশুর দুধ মালিকের অনুমতি ব্যতীত দোহন করা জায়েজ নয়। তবে কেউ যদি ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে পড়ে, তাহলে তার জন্য জীবন রক্ষা পরিমাণ অন্যের প্রাণীর দুধ দোহন করে পান করবে এবং পরে মূল্য পরিশোধ করে দেবে। উল্লেখ্য যে, জাহেলিয়াতের যুগের আরবরা অন্যের পশুর দুধ তার অনুমতি ব্যতিরেকে দোহন করে খেত। সে কারণে হুজুর ﷺ এহেন গর্হিত কাজ হতে নিষেধ করেছেন।

وَعَنْ ٢٨١٢ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَاَرْسَلَتْ اِحْدٰى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِصَحْفَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتِ الَّتِيْ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيْهَا الطَّعَامَ الَّذِيْ كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُوْلُ غَارَتْ اُمُّكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتّٰى اُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيْحَةَ اِلَى الَّتِيْ كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَ اَمْسَكَ الْمَكْسُوْرَةَ فِيْ بَيْتِ الَّتِيْ كَسَرَتْ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৮১২. অনুবাদ : হযরত আনাস (র.) বলেন, একদা নবী করীম ﷺ তাঁর জনৈকা বিবির ঘরে ছিলেন, এমন সময় উম্মুল মু'মিনীনদের অপর একজন বড় পেয়ালায় করে হুজুরের জন্য কিছু খাদ্য পাঠালেন। [এতে রাগ করে] নবী করীম ﷺ যাঁর ঘরে ছিলেন তিনি খাদেমের হাতে আঘাত হানলেন যাতে পেয়ালা পড়ে টুকরা টুকরা হয়ে গেল। নবী করীম ﷺ পেয়ালার টুকরাগুলো একত্র করলেন, অতঃপর তাতে যে খাদ্য ছিল তা জমা করতে লাগলেন এবং বললেন, তোমাদের মাতা ঈর্ষান্বিত হয়েছেন। এ সময় তিনি খাদেমকে ঐ পর্যন্ত আটকে রাখলেন, যে পর্যন্ত না তিনি যাঁর ঘরে ছিলেন তাঁর ঘর হতে একটি আস্ত পেয়ালা আনা হলো। অতঃপর আস্ত পেয়ালাটি তিনি তাঁকে দিলেন, যাঁর পেয়ালা ভাঙ্গা হয়েছিল এবং ভাঙ্গাটি তাঁর জন্য রাখলেন যিনি তা ভেঙ্গেছিলেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَضَرَبَتِ الَّتِيْ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ بَيْتِهَا : পেয়ালাটা পড়ে ভেঙ্গে গেলে পেয়ালার খাবারও পড়ে গেল, তখন হুজুর ﷺ স্বহস্তে ভাঙ্গা টুকরাগুলো এবং পড়ে যাওয়া খাবারগুলো সতর্কতার সাথে একত্রিত করতে লাগলেন। এর দ্বারা হুজুর ﷺ -এর দুটি মহৎ গুণের বহিঃপ্রকাশ হয়।

প্রথমত হুজুরের বিনয়-নম্রতা ও সহনশীলতা এবং সহধর্মিণীগণের সাথে উত্তম আচরণ ও ক্ষমা প্রদর্শনীর সুমহান আদর্শের প্রতিফলন। দ্বিতীয়ত আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি সীমাহীন মর্যাদাশীল হওয়া।

قَوْلُهُ غَارَتْ أُمُّكُمْ : তোমাদের মাতা ঈর্ষান্বিত হয়েছেন– এটি মূলত এ হাদীসের পাঠক ও শ্রোতাদের প্রতি সাধারণ সম্বোধনের নামান্তর। এর দ্বারা তিনি বস্তুত হযরত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষ থেকে আত্মপক্ষ সমর্থন ব্যক্ত করেছেন যে, হযরত আয়েশা থেকে যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তা মূলত আত্মসম্মানবোধের বশবর্তী হয়ে করেছেন, যা বিশ্বের প্রতিটি মহিলার চিরাচরিত স্বভাবেরই প্রতিফলন মাত্র। কেননা, মহিলা জাতি চাই যত উচ্চ-মর্যাদার অধিকারীই হোক না কেন, তিনি কখনো স্বীয় সতীনের ব্যাপারে ঈর্ষা করা হতে মুক্ত থাকতে পারেন না এবং কোনো মহিলাই এ ব্যাপারে স্বীয় স্বভাবজাত অভ্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এ কারণেই নবী করীম ﷺ এ বাণী ইরশাদ করেছেন যে, যেন কোনো মানুষ হযরত আয়েশা (রা.)-এর এ আচরণকে খারাপ দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে; বরং তাদের বুঝা উচিত যে, এ কাজটি তার থেকে মানবীয় চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতেই সংঘটিত হয়েছে, যাতে তার ইচ্ছার বা অসৎ উদ্দেশ্যের কোনোই প্রভাব নেই।

وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ بِالْبَابِ : কাযী আয়ায (র.) লিখেছেন যে, এ পরিচ্ছেদের অধীনে এ হাদীস উল্লেখ করার কারণ হলো পাত্র ভেঙ্গে ফেলা ও এক ধরনের غَصْبٌ বা জবরদখল। কেননা, এটা দ্বারা অপরের মাল নষ্ট করা হয়েছে। যদিও তা যে-কোনো কারণেই হোক না কেন।

অথবা বলা যায় যে, যে খাবার জিনিস পাঠানো হয়েছিল তা ছিল হাদিয়া স্বরূপ। আর যে পাত্রে তা পাঠানো হয়েছিল, তা ছিল عَارِيَةٌ বা ধারস্বরূপ। এ কারণেই এ পরিচ্ছেদে এ হাদীসটি আনা হয়েছে। –[মেরকাত- খ. ৬, পৃ. ১১৫]

শব্দ-বিশ্লেষণ : صَحْفَةٌ : এটি একবচন, বহুবচনে صِحَافٌ অর্থ– প্লেট, পাত্র।

اِنْفَلَقَتْ : সীগাহ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِيْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বহছ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বাবে اِنْفِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْفِلَاقُ মূলবর্ণ (ف ـ ل ـ ق) অর্থ– ফেটে যাওয়া, বিদীর্ণ হওয়া।

اَلْخَادِمُ দ্বারা পরিচারক এবং পরিচারিকা উভয়কে বুঝানো হয়। এখানে পরিচারিকাই উদ্দেশ্য হবে, যে হযরত আয়েশার নিকট খাবার এনেছিল।

٢٨١٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৮১৩. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি লুণ্ঠন করতে ও কারো নাক-কান কর্তন করতে নিষেধ করেছেন।–[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কোনো মুসলমানের মাল লুণ্টন করা হারাম– এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, অমুসলিমদের মাল লুণ্টন করা বৈধ; বরং এখানে নবী করীম ﷺ -এর উদ্দেশ্য হলো শুধুমাত্র এ কথা প্রকাশ করা যে, ইসলাম স্বীয় অনুসারীদের কখনো এ কথার অনুমতি দেয় না, যে-কোনো অবস্থাতেই যে-কোনো মানুষের মাল অন্যায় ও জবরদখলমূলক ছিনিয়ে আনবে। কেননা, এর দ্বারা শুধুমাত্র বান্দার হকই পদদলিত হয় না; বরং সমাজেরও শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। সুতরাং শান্তি ও নিরাপত্তার উৎস ইসলামের অনুসারী হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে একজন মুসলমানের উপর সর্বাধিক দায়িত্ব অর্পিত হয় যে, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়া ও অরাজকতা ছড়িয়ে পড়া প্রতিহত করবে। যার বুনিয়াদি পদক্ষেপ হলো অন্যের ধনসম্পদ, সহায়-সম্পত্তি ও অন্যান্য অধিকারসমূহ বিনষ্ট ও ছিনতাই, লুণ্ঠন, অবৈধ দখল ইত্যাদিকে এমনভাবে ক্ষমার অযোগ্য মনে করবে যেভাবে নিজের সম্পদ ও অধিকার ব্যাহত হওয়াকে ক্ষমার অযোগ্য মনে করা হয়।

اَلْمُثْلَةُ : مُثْلَةٌ শব্দের অর্থ হলো– অঙ্গচ্ছেদ করা। যেমন– নাক, কান ইত্যাদি কর্তন করা। এ ধরনের কাজ শরিয়ত নিষিদ্ধ করেছে। কেননা, এর দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে বিকৃতি সাধন হয়ে থাকে। সুতরাং কাউকে শাস্তিস্বরূপও مُثْلَة করা যাবে না। উল্লেখ্য যে, ইসলামের প্রথম যুগে এ ধরনের শাস্তির বিধান ছিল, পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গেছে। তবে চুরি ও ডাকাতির শাস্তিস্বরূপ হস্ত-পা কর্তন এ হুকুম থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, তা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত এবং সব সময়ের জন্য তা কার্যকর হবে।

وَعَنْ ٢٨١٤ جَابِرٍ (رض) قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِاَرْبَعِ سَجَدَاتٍ فَانْصَرَفَ وَقَدْ اَضَتِ الشَّمْسُ وَقَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ تُوْعَدُوْنَهُ اِلَّا قَدْ رَاَيْتُهُ فِيْ صَلٰوتِيْ هٰذِهٖ لَقَدْ جِيْءَ بِالنَّارِ وَذٰلِكَ حِيْنَ رَاَيْتُمُوْنِيْ تَاَخَّرْتُ مَخَافَةَ اَنْ تُصِيْبَنِيْ مِنْ لَفْحِهَا وَحَتّٰى رَاَيْتُ فِيْهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَكَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهٖ فَاِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ اِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِيْ وَاِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهٖ وَحَتّٰى رَاَيْتُ فِيْهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِيْ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَاْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الْاَرْضِ حَتّٰى مَاتَتْ جُوْعًا ثُمَّ جِيْءَ بِالْجَنَّةِ وَذٰلِكَ حِيْنَ رَاَيْتُمُوْنِيْ تَقَدَّمْتُ حَتّٰى قُمْتُ فِيْ مَقَامِيْ وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِيْ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرَتِهَا لِتَنْظُرُوْا اِلَيْهِ ثُمَّ بَدَا لِيْ اَنْ لَا اَفْعَلَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৮১৪. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জমানায় একবার সূর্য গ্রহণ হলো, যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পুত্র ইবরাহীম ইন্তেকাল করলেন। হুজুর ﷺ মানুষকে নিয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়লেন ছয় রুকু ও চার সিজদা দ্বারা। তিনি নামাজ শেষ করলেন, আর সূর্য তার পূর্ব অবস্থায় ফিরে গেল। এ সময় তিনি বললেন, তোমাদেরকে যেসব জিনিসের ওয়াদা দেওয়া হয়, আমি আমার এই নামাজে সেসব দেখেছি। এ সময় আমার সম্মুখে দোজখকে আনা হয়েছিল, আর তা তখনই হয়েছিল যখন তোমরা আমাকে দেখেছিলে, আমাতে আগুনের ফুল্‌কি পৌঁছার ভয়ে আমি পিছনে হটেছিলাম। [আমি তাতে সবকিছু দেখছি,] এমনকি বাঁকা মাথা লাঠিওয়ালা [আমর ইবনে লুহায়আ]-কেও দেখেছি, যে তাতে আপন নাড়িভুঁড়ি টানতেছে। সে বাঁকা মাথা লাঠি দ্বারা হাজীদের জিনিস চুরি করত। যদি লোকে টের পেত, বলত, আমার লাঠির মাথায় আটকে গিয়েছে, আর যদি টের না পেত তবে তা নিয়ে যেত। এমনকি আমি দোজখে বিড়ালওয়ালীকেও দেখেছি, যে তাকে বেঁধে রেখেছিল, অথচ তাকে খাদ্য দিত না, আর ছেড়েও দিত না, যাতে তা মাটির জীব [ইঁদুর ইত্যাদি] ধরে খেতে পারে। অবশেষে তা ক্ষুধার কারণে বা ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা গেল। অতঃপর আমার নিকট বেহেশত আনা হলো, আর তা ঐ সময় হয়েছিল যখন তোমরা দেখলে আমি সামনে এগিয়ে গেলাম, এমনকি আমি আমার এ অবস্থানে দাঁড়ালাম। নিশ্চয় আমি তখন এই ইচ্ছায় হাত বাড়িয়ে ছিলাম যে, আমি তার ফল নেই, যাতে তোমরা তা দেখতে পাও। অতঃপর আমার নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠিল যে, আমি তা যেন না করি। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِىْ صَلَاتِىْ الخ : আল্লামা ত্বীবী (র.) বলেন, হুজুর ﷺ জান্নাতের ফল আহরণ না করার কারণ হলো মানুষের اِيْمَانْ غَيْبِىْ যেন اِيْمَانْ شُهُوْدِىْ -এর দ্বারা পরিবর্তন না হয়ে যায়। অথবা জান্নাতের ফল আহরণ করলে জাহান্নামের আগুনও চয়ন করতে হয়, আর জাহান্নামের আগুন দেখলে মানুষের ভয়টা আশার উপর প্রবল হয়ে যাবে, যা মানুষের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত করবে। তাঁর ভাষায়–

لِئَلَّا يَنْقَلِبَ الْاِيْمَانُ الْغَيْبِىْ اِلَى الشُّهُوْدِىْ . اَوْ لَوْ اَرَاهُمْ ثِمَارَ الْجَنَّةِ لَزِمَ اَنْ يُرِيَهُمْ لَفْحَ النَّارِ اَيْضًا وَحِيْنَئِذٍ يَغْلِبُ الْخَوْفُ عَلَى الرَّجَاءِ فَتَبْطُلُ اُمُوْرُ مَعَاشِهِمْ .

হাদীসের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ : এ হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় জানা গেল–

* জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে।
* আজাব ও ধ্বংসে স্থান থেকে হটে যাওয়া সুন্নত।
* কিছুলোক বর্তমানেও শাস্তিতে আছে।
* عَمَلْ قَلِيْلْ বা অল্প কাজ দ্বারা নামাজ নষ্ট হয় না। যেমন হুজুর ﷺ নামাজের মধ্যেই আগে বেড়েছেন আবার পিছনে হটেছেন।
* জান্নাতের ফল দুনিয়ার ফলের সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। এটিই হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা।

আর এক রাকাতে একাধিক রুকুর আলোচনা صَلَاةُ الْكُسُوْفِ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

শব্দ-বিশ্লেষণ :

اِنْكَسَفَتْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাবে اِنْفِعَالْ মাসদার اَلْاِنْكِسَافُ মূলবর্ণ (ك . س . ف) জিনসে صَحِيْح অর্থ– চন্দ্র, সূর্য গ্রহণ লাগা।

اَضَتْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাবে نَصَرَ মাসদার ضَوْءٌ মূলবর্ণ (ض . و . ء) জিনসে মুরাক্কাব اَجْوَفْ وَاوِىْ وَمَهْمُوْزْ لَامْ অর্থ– উজ্জ্বল হওয়া।

لَحْفُ النَّارِ : لَحْفٌ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

اَلْمِحْجَنُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْمُ آلَه বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْحَجْنُ মূলবর্ণ (ح . ج . ن) জিনসে صَحِيْح অর্থ– বক্র লাঠি, লম্বা লাঠি। যার অগ্রভাগে বক্র লোহা লাগানো থাকে।

قُصْبٌ : এটি একবচন, বহুবচনে اَقْصَابٌ অর্থ– নাড়িভুঁড়ি; পেটের তলদেশের নাড়িভুঁড়ি।

وَعَنْ ٢٨١٥ قَتَادَةَ (رحـ) قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِىُّ ﷺ فَرَسًا مِنْ اَبِىْ طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوْبُ فَرَكِبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ مَا رَاَيْنَا مِنْ شَىْءٍ وَاِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৮১৫. **অনুবাদ :** তাবেয়ী কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহাবী হযরত আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি, একদা মদিনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। [শত্রু আসতেছে,] তখন নবী করীম ﷺ আবূ তালহা হতে একটি ঘোড়া ধার নিলেন, যার নাম ছিল 'মানদূব' এবং অনুসন্ধানের জন্য তাতে সওয়ার হলেন; কিন্তু যখন ফিরলেন, বললেন, আমি তো কিছু দেখলাম না, আর আমি এ ঘোড়াকে দ্রুতগামীই পেয়েছি। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ : এ হাদীস হতে কয়েকটি বিষয় জানা যায়–

* প্রাণী বা বাহন ঋণ নেওয়া এবং তা ব্যবহার করে ফেরত দেওয়া জায়েজ।
* প্রাণী ও অস্ত্রশস্ত্রের নাম রাখা জায়েজ আছে।

* হুজুর ﷺ -এর বীরত্ব, সাহসিকতা ও বাহাদুরির পরিচয় পাওয়া যায়।
* শত্রু আগমনের সংবাদ শুনলে তা অনুসন্ধান করা।
* কোনো ভীতিপ্রদ পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়ার নিমিত্ত ভীতিকর সংবাদের ভিত্তিহীনতার সুসংবাদ দিয়ে সকলকে শান্ত করা।

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَلْبَحْرُ : অর্থ– দ্রুতগামী ঘোড়া, মূলত بَحْرٌ শব্দের অর্থ হলো– সমুদ্র এখানে ঘোড়াকে সমুদ্রের সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে দ্রুততার দিক থেকে। অর্থাৎ مَا وَجَدْنَاهُ اِلَّا بَحْرًا -

اَلْمَنْدُوْبُ : অর্থ– ক্ষতের চিহ্নযুক্ত, উক্ত ঘোড়ার দেহে ক্ষতের চিহ্ন ছিল বলে এর নাম রাখা হয়েছে اَلْمَنْدُوْبُ। আবার কেউ বলেছেন اَلْمَنْدُوْبُ অর্থ– মন্থর গতি সম্পন্ন। যেহেতু উক্ত ঘোড়া খুবই মন্থরগতিসম্পন্ন ছিল, তাই তার নাম রাখা হয়েছিল اَلْمَنْدُوْبُ কিন্তু হুজুর ﷺ -এর বরকতে তা দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়ে যায়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٨١٦ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ اَحْيٰى اَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ) وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ـ

২৮১৬. অনুবাদ : হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে পতিত জমি আবাদ করে তা তার। অন্যায় দখলকারীর মেহনতের কোনো হক নেই। –[আহমদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ] মালেক ওরওয়া হতে মুরসালরূপে। তিরমিযী (র.) বলেন, এটা হাসান গরীব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنٰى مَنْ اَحْيٰى اَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ : পতিত বা অনাবাদি জমি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা পূর্ব থেকে কোনো মুসলমানের মালিকানাধীন না হয় এবং তা কোনো শহর গ্রামের কোনো জনকল্যাণমূলক কাজেরও উপযোগী নয়। সে রকম জমি কেউ আবাদ করলে সে তার মালিক হবে কিনা? সে ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সে রকম জমির মালিক হওয়ার জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি নেওয়া আবশ্যক। তাঁর দলিল হলো– قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ لِلْمَرْءِ اِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ اِمَامِهِ
* ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও সাহেবাইনের মতে রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি নেওয়া আবশ্যক নয়। তাঁদের দলিল হলো– مَنْ اَحْيٰى اَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ـ

এখানে مُطْلَقًا বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতির শর্তারোপ করা হয়নি।

اَلْجَوَابُ : এ مُطْلَقْ হাদীসটিকে ঐ হাদীসের দ্বারা خَاصْ করা হবে।

قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ : অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি অন্যের আবাদকৃত জমিতে ফসল বা বৃক্ষ রোপণ করে, তাহলে এর দ্বারা সে ঐ জমি বা বৃক্ষের মালিক হবে না। মালিক সেই বৃক্ষ উৎপাটন করে ফেলতে পারবে। –[মেরকাত- খ. ৬, পৃ. ১১৭]

وَعَنْ ٢٨١٧ اَبِيْ حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا لَا تَظْلِمُوْا اَلَا لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْمُجْتَبٰى)

২৮১৭. অনুবাদ : তাবেয়ী আবূ হুররা রাক্কাশী তাঁর চাচার থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সাবধান! কেউ কারো প্রতি জুলুম করবে না। সাবধান! কারো মাল তার মনের সন্তোষ ব্যতীত কারো জন্য হালাল নয়। –[বায়হাকী শোআবুল ঈমান; দারাকুতনী মুজতাবায়]

وَعَنْ ٢٨١٨ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِى الْاِسْلَامِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

২৮১৮. অনুবাদ : হযরত ইবনে হুসাইন (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ইসলামে 'জলব' এবং 'জনব' নেই ও 'শেগার' নেই। আর যে কোনো প্রকার লুট করেছে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ-এর বিশ্লেষণ : উল্লেখ্য যে, جَلَبْ ও جَنَبْ দুটি পারিভাষিক শব্দ, যা ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা, সদকা ও بَيْع এ তিন ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়।

اَلْجَلَبُ وَالْجَنَبُ فِى السِّبَاقِ : ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় "جَلَبْ" হলো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি ঘোড়ার পিছনে আরও একজন লোককে বসাবে যে সে ঘোড়াকে প্রহার করবে, আওয়াজ দেবে, দ্রুতগতিতে দৌড়ানোর জন্য।

আর "جَنَبْ" হলো নিজের ঘোড়ার পাশে আরও একটি ঘোড়া রাখবে, যেন তার নিজের ঘোড়াটি ক্লান্ত হয়ে গেলে ঐ ঘোড়ায় চড়ে অগ্রসর হয়ে যেতে পারে।

اَلْجَلَبُ وَالْجَنَبُ فِى الزَّكَاةِ : "زَكَاةْ" এর ক্ষেত্রে جَلَبْ হলো জাকাত উসুলকারী কর্মকর্তা যখন কোনো এলাকায় জাকাত আদায় করতে যায়, তখন লোকালয় থেকে দূরে কোথাও অবস্থান নিয়ে লোকদের নিকট খবর পাঠায় যে, তোমারা সকলে এখানে এসে জাকাত দিয়ে যাও। এতে জনগণের কষ্ট হয়। আর جَنَبْ হলো যাদের উপর জাকাত ওয়াজিব, তারা তাদের মাল নিয়ে দূরে কোথাও চলে যায়। আর কর্মকর্তাকে বলে যে, আপনি এখানে এসে জাকাত নিয়ে যান এতে কর্মকর্তার কষ্ট হয়। جَلَبْ ও جَنَبْ এর সকল প্রকারই নিষিদ্ধ। جَنَبْ ও جَلَبْ-এর বিস্তারিত আলোচনা زكاة অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

قَوْلُهُ وَلَا شِغَارَ فِى الْاِسْلَامِ : شِغَارْ শব্দটি বাবে مُفَاعَلَةٌ-এর মাসদার। অর্থ– বিনিময়মূলক বিবাহ সম্পাদন করা। শব্দটি মূলত شَغَرُ الْبَلَدِ থেকে مُشْتَقْ হয়েছে। যার অর্থ হলো– শহর জনমানব শূন্য হওয়া, এ ধরনের বিবাহও যেহেতু মহরশূন্য হয়ে থাকে, তাই একে نِكَاحُ شِغَارْ বলা হয়। শরিয়তের পরিভাষায় نِكَاحُ شِغَارْ হলো কোনো ব্যক্তি তার ভগ্নি বা কন্যাকে কারো সাথে এ শর্তে বিবাহ দেয় যে, সে তার ভগ্নি বা কন্যাকে এর নিকট বিবাহ দেয় এবং কোনো মহর নির্দিষ্ট করা না হয়, বরং এ শর্তই মহরের স্থলাভিষিক্ত হয়। এ ধরনের বিবাহের বৈধতা নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে–

* জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে এ ধরনের বিবাহ সংঘটিত হবে না; বরং فَاسِدْ হয়ে যাবে। তাঁদের দলিল হলো–

لَا شِغَارَ فِى الْاِسْلَامِ

* ইমাম আবূ হানীফা, সাহেবাইন ও সুফিয়ান ছাওরী (র.)-এর মতে বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে। কেননা, বিবাহের رُكْن তথা اِيْجَابْ ও قَبُوْلْ পাওয়া গেছে। তবে প্রত্যেকের জন্য مَهْرِ مِثْلْ ওয়াজিব। ঐ শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।

اَلْجَوَابُ : উক্ত হাদীসে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা মহর ব্যতীত লজ্জাস্থানকে হালাল করা বুঝানো হয়েছে, যা অবশ্যই নিষিদ্ধ।

وَعَنْ ٢٨١٩ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَأْخُذْ اَحَدُكُمْ عَصَا اَخِيْهِ لَاعِبًا جَادًّا فَمَنْ اَخَذَ عَصَا اَخِيْهِ فَلْيَرُدَّهَا اِلَيْهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَرِوَايَتُهُ اِلَى قَوْلِهِ جَادًّا)

২৮১৯. অনুবাদ : সাহাবী সায়েব তাঁর পিতা সাহাবী ইয়াযীদের মাধ্যমে নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের লাঠি হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে রেখে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কেড়ে না নেয়। যে তার ভাইয়ের লাঠি কেড়ে নিয়েছে সে যেন তা তাকে ফেরত দেয় [অন্যথায় 'গসব' হবে]।
–[তিরমিযী আর আবূ দাউদে جَادًّا পর্যন্ত]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ যেমন কোনো ব্যক্তি কারো থেকে তার লাঠি বা অন্যকোনো জিনিস বাহ্যিকভাবে তো হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে নেয়; কিন্তু তার উদ্দেশ্য থাকে তাকে আমি সুযোগ বুঝে গ্রাস করে ফেলব। যেমন– ইদানিং এ ধরনের কাজই বহু সংঘটিত হচ্ছে যে, একজন অপরজনের কোনো জিনিস ঠাট্টাচ্ছলে লুকিয়ে রাখে। যদি মালিক টের পায়, তাহলে তা ফেরত দেয়। আর বলবে যে, আমি ঠাট্টাচ্ছলে নিয়েছিলাম। আর যদি মালিক জানতে না পারে, তাহলে তা চিরদিনের জন্য গায়েব করে দেওয়া হয়। এ ধরনের গর্হিত কাজ হতে হুজুর ﷺ নিষেধ করেছেন। উল্লেখ্য যে, এখানে যদিও লাঠির কথা বলা হয়েছে কিন্তু এর দ্বারা সকল জিনিসই উদ্দেশ্য হবে।

২৮২০ وَعَنْ سَمُرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

২৮২০. অনুবাদ : হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে তার হুবহু মাল কারো নিকট পায়, সে তার অধিক হকদার। খরিদ্দার ধরবে তাকে যে তার নিকট বিক্রয় করেছে। –[আহমদ, আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের সারমর্ম হলো, যেমন কেউ কারো মাল আত্মসাৎ করেছে বা চুরি করেছে বা কারো হারানো জিনিস সে পেয়েছে এবং ঐ জিনিস সে অন্যের নিকট বিক্রয় করে দিয়েছে। এখন যদি মালিক তার মাল ক্রেতার নিকট পায়, তাহলে তার মাল নিয়ে নেওয়ার অধিকার আছে। আর ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নিয়ে নেবে।

২৮২১ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا اَخَذَتْ حَتّٰى تُؤَدِّيَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৮২১. অনুবাদ : হযরত সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে যা গ্রহণ করেছে সে তার জন্য দায়ী, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা আদায় করে। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি কারো কাছ থেকে কোনো জিনিস নিয়ে থাকে, তাহলে তা তাকে পরিশোধ করে দেওয়া ওয়াজিব। তদ্রূপভাবে কেউ যদি কারো মাল চুরি করে থাকে বা ছিনতাই করে থাকে বা তার নিকট আমানত রাখা হয়ে থাকে, তাহলে সর্বাবস্থায়ই তা মালিকের নিকট আদায় করে দেওয়া ওয়াজিব। যদিও মালিক দাবি না করুক না কেন। তবে আমানতের ক্ষেত্রে মালিকের দাবি করা জরুরি, যখন তিনি দাবি করবেন তখনই ফেরত দিতে হবে।

২৮২২ وَعَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ اَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا فَاَفْسَدَتْ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ عَلٰى اَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَاَنَّ مَا اَفْسَدَتِ الْمَوَاشِيْ بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلٰى اَهْلِهَا. (رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৮২২. অনুবাদ : তাবেয়ী হারাম ইবনে সা'দ ইবনে মুহায়্যাসা হতে বর্ণিত আছে, একবার হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.)-এর একটি উট কারো বাগানে ঢুকে তা নষ্ট করে দিল। এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিচার করলেন, দিনে বাগান রক্ষা করার দায়িত্ব বাগানওয়ালার, আর রাত্রে পশু যা নষ্ট করবে সে জন্য দায়ী পশুওয়ালা। –[মালেক, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যদি কারো পশু দিনের বেলা কারো ফসল নষ্ট করে ফেলে তাহলে পশুর মালিক সে ক্ষতিপূরণ দেবে না। কেননা, দিনের বেলা ফসলের সংরক্ষণ করার দায়িত্ব হলো জমির মালিকের। সুতরাং এটা হলো দুর্বলতা যে সে তার ফসল সংরক্ষণ ও বাগানে পশু প্রবেশ হতে বিরত রাখতে পারেনি। আর যদি রাত্রে বাগানের ক্ষতি সাধন করে তাহলে পশুর মালিককেই এ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা, এটা হলো পশুর মালিকের দুর্বলতা যে, রাত্রি বেলা পশুর সংরক্ষণের দায়িত্ব হলো পশুর মালিকের। সেক্ষেত্রে সে পশুকে মুক্ত ছেড়ে দিয়ে অপরের ক্ষতি সাধন কেন করল।

এসব কিছু এমতাবস্থার জন্য প্রযোজ্য হবে যদি পশুর মালিক সাথে না থাকে। আর যদি পশুর মালিক পশুর সাথে থাকে, তাহলে দিনের বেলায় ক্ষতিকৃত ফসলেরও ক্ষতিপূরণ পশুর মালিককেই দিতে হবে। চাই পদদলিত করে নষ্ট করুক বা মুখ দ্বারা নষ্ট করুক।

* ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র.) এ মতই পোষণ করেন।
* কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যদি পশুর মালিক পশুর সাথে না থাকে তাহলে পশুর মালিককে কোনো অবস্থাতেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, দিনে ক্ষতি করুক বা রাত্রে ক্ষতি করুক।

وَعَنْ ٢٨٢٣ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلرِّجْلُ جُبَارٌ وَقَالَ اَلنَّارُ جُبَارٌ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৮২৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, পা দণ্ডহীন এবং বলেছেন আগুন দণ্ডহীন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الرِّجْلُ جُبَارٌ : অর্থাৎ কারো পশু যদি অন্য কারো জিনিসকে পদদলিত করে নষ্ট করে ফেলে, তাহলে পশুর মালিককে এর জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না– যদি মালিক সাথে না থাকে।

قَوْلُهُ النَّارُ جُبَارٌ : অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি কারো ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকেই নিজের প্রয়োজনের জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত করে, আর সে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বাতাসে উড়ে গিয়ে অন্যের ক্ষতির কারণ হয়, সে ক্ষেত্রে অগ্নি প্রজ্বলনকারীর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কিন্তু শর্ত হলো সে যখন অগ্নি প্রজ্বলন করছিল, তখন বাতাস থেমে ছিল, আর যদি বাতাসের সময় অগ্নি প্রজ্বলন করে আর সে কারণেই অপরের ক্ষতি হয়, সে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

وَعَنْ ٢٨٢٤ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمْ عَلٰى مَاشِيَةٍ فَاِنْ كَانَ فِيْهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلٰثًا فَاِنْ اَجَابَهُ اَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَاِنْ لَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৮২৪. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী (র.) সাহাবী হযরত সামুরা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কোনো [ক্ষুধার্ত] ব্যক্তি কোনো পশুপালের নিকট পৌছে, তখন যদি তাতে তাদের মালিক থাকে, তবে যেন সে তার নিকট হতে অনুমতি নেয়। আর যদি তাতে মালিক না থাকে, তবে যেন সে তিনবার শব্দ করে। যদি কেউ তাতে সাড়া দেয়, তবে তার নিকট হতে অনুমতি নেয়। আর যদি কেউ সাড়া না দেয়, তবে যেন সে দুধ দোহন করে এবং খায়, কিন্তু কিছু যেন নিয়ে না যায়। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : দুগ্ধ দোহন করে ও খায়– এটা [অর্থাৎ বিনা অনুমতিতে খাওয়া] তখনকার কথা যখন ক্ষুধায় মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দেয়। সামর্থ্যবান হলে পরে তার মূল্য আদায় করে দিতে হবে। কারো কারো মতে, এ অবস্থায় খাওয়াতে মূল্য দেওয়া লাগবে না। আমাদের ফিকহের কিতাব দুররে মুখতারে এটাই গ্রহণ করা হয়েছে। ইমাম আহমদের মতে ঠিক মৃত্যুর আশঙ্কা ব্যতীত ক্ষুধায় অতি কষ্ট পেলেও খেতে পারবে। –[মেরকাত]

আবার কেউ বলেছেন যে, এ হাদীস এমন স্থানের জন্য প্রযোজ্য যেখানের পথিকদের জন্য প্রাণীর দুধ দোহন করে পান করার ব্যাপক অনুমতি আছে। সেরকম স্থানের জন্য প্রয়োজন মতো দুধ দোহন করে পান করা জায়েজ আছে।

وَعَنْ ٢٨٢٥ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

২৮২৫. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো বাগানে পৌছে সে যেন তা হতে খায়, তবে যেন আঁচলে ভরে কিছু না নিয়ে যায়। [তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। –কিন্তু তিরমিযী (র.) বলেন হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসের দ্বারা এ কথার সাধারণ অনুমতি প্রদান উদ্দেশ্য নয় যে, যে কোনো মানুষের বাগানে গিয়ে ফল পেড়ে খাবে। কেননা, অপরের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো জিনিসই খাওয়া জায়েজ নয়। সুতরাং এখানেও মুমূর্ষ অবস্থার জন্য প্রযোজ্য হবে এবং সে অবস্থায় কারো বাগানে গেলে মালিক না থাকলেও প্রয়োজন অনুযায়ী খাওয়া যাবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ : خُبْنَةٌ এটি একবচন, বহুবচনে خُبَنٌ অর্থ– আঁচল।

وَعَنْ ٢٨٢٦ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ قَالَ بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُوْنَةٌ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

২৮২৬. অনুবাদ : তাবেয়ী উমাইয়া ইবনে সাফওয়ান তাঁর পিতা [সাফওয়ান] হতে বর্ণনা করেন, হুনাইন যুদ্ধের দিনে নবী করীম ﷺ তাঁর লৌহবর্মসমূহ ধারে নিলেন। তখন সাফওয়ান বললেন, হে মুহাম্মদ! জোর করে নিলে? হুজুর বললেন না; বরং ধারে নিলাম, ফেরত দেওয়া হবে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সাফওয়ান কুরাইশদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন হুজুর ﷺ তাঁকে চার মাসের জন্য আমান অর্থাৎ জানের নিরাপত্তা দান করেন অতঃপর তিনি কাফের অবস্থায় হুনাইন যুদ্ধে হুজুর ﷺ -এর সাথি হন। হুজুর ﷺ তাঁকে হুনাইন যুদ্ধের বহু মাল দান করেন। এতে মুগ্ধ হয়ে তিনি বললেন, নবী ছাড়া এমন দান কেউ করতে পারে না এবং মুসলমান হয়ে গেলেন।

এখানে যে সে হুজুর ﷺ -এর সাথে অসৌজন্য আচরণ করেছে, তার কারণ হলো তখন তিনি কাফের ছিলেন, পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে যান। ঋণকৃত জিনিস নষ্ট হয়ে গেলে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কিনা সে ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতে ঋণকৃত জিনিস স্বকীয়ভাবেই ধ্বংস হোক বা ব্যক্তির কারণে ধ্বংস হোক উভয় অবস্থাতে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তাঁদের দলিল بَابٌ -এর হাদীস "بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُوْنَةٌ" এখানে مُطْلَقًا ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেখানে ধ্বংস হওয়া বা ধ্বংস করার মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

مَذْهَبُ الْاِمَامِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) : ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং জমহুর ফোকাহায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসগণের মতে যদি ঋণকৃত জিনিস ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, আর যদি তা ধ্বংস করা হয়, তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তাঁদের দলিল– عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِعَارِيَةٌ مَضْمُوْنَةٌ اَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ ـ (اَبُوْ دَاوُدَ) তার উত্তরে হুজুর বললেন– بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ অর্থাৎ বরং ফেরত দেওয়ার যোগ্য ঋণ। এ কথা বলে তিনি عَارِيَةٌ مَضْمُوْنَةٌ অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ যোগ্য ঋণ। একথাকে রদ করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় দলিল– عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ الْعَارِيَةُ وَدِيْعَةٌ لَا ضِمَانَ عَلَيْهَا اِلَّا اَنْ يَتَعَدّٰى ـ (مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ)

اَلْجَوَابُ : তাদের হাদীসে বর্ণিত مَضْمُوْنَةٌ অর্থ হলো مُؤَدَّاةٌ অথবা বলা যায় যে, হুজুর ﷺ সাফওয়ানকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য مَضْمُوْنَةٌ শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথবা যুদ্ধাবস্থায় নষ্ট হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

وَعَنْ ٢٨٢٧ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِىٌّ وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

২৮২৭. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ঋণের বস্তু ফেরত দিতে হবে। 'মনিহা' ফেরত দিতে হবে, ঋণ পরিশোধ করতে হবে এবং জামিনদারের দণ্ড দিতে হবে।

–[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দ-বিশ্লেষণ : مَنِحَةٌ বা مَنِيْحَةٌ গরু-ছাগল, যা অন্যকে দুধ খেতে দেওয়া হয়– আরবে এ নিয়ম ছিল। কিছুদিনের জন্য হালচাষ করতে ধার দেওয়া হলেও তাকে 'মনিহা' বলা যাবে। এরূপে ফল খেতে গাছ দেওয়া হলে বা চাষ করতে জমি দেওয়া হলেও তা 'মনিহার অন্তর্গত হবে।

مُؤَدَّاةٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ বহছ اِسْمِ مَفْعُوْلٍ বাবে تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّأْدِيَةُ মূলবর্ণ (ا . د . ى) জিনসে মুরাক্কাব (مَهْمُوْزُ فَاءْ وَنَاقِصْ يَائِىْ) অর্থ– আদায় করা।

وَعَنْ ٢٨٢٨ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو نِ الْغِفَارِىِّ (رضـ) قَالَ كُنْتُ غُلَامًا اَرْمِىْ نَخْلَ الْاَنْصَارِ فَاُتِىَ بِىَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ يَا غُلَامُ لِمَ تَرْمِى النَّخْلَ قُلْتُ اٰكُلُ قَالَ فَلَا تَرْمِ وَكُلْ مِمَّا سَقَطَ فِىْ اَسْفَلِهَا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهٗ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَشْبِعْ بَطْنَهٗ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِىْ بَابِ اللُّقْطَةِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

২৮২৮. অনুবাদ : হযরত রাফে' ইবনে আমর গেফারী (রা.) বলেন, আমি বাচ্চা ছিলাম। আনসারদের খেজুর গাছে ঢিল ছুঁড়তাম। একবার আমাকে নবী করীম ﷺ-এর নিকট ধরে আনা হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বাচ্চা, তুমি কেন খেজুর গাছে ঢিল ছোঁড়? আমি বললাম, খেতে। তিনি বললেন, ঢিল ছুঁড়িও না। গাছের নীচে যা পড়ে তা খেয়ো। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তার মাথার উপর হাত বুলিয়ে বললেন, হে আল্লাহ তুমি তার পেটকে ভরে দাও। –[তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ] অচিরেই আমরা আমর ইবনে শোআয়ব-এর হাদীস بَابُ اللُّقْطَةِ -এর মধ্যে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হুজুর ﷺ হযরত রাফে'কে গাছের নিচে পড়ে থাকা ফল খেজুর খেতে বলেছেন, কারণ হলো– সাধারণত নিচে পড়ে থাকা ফল খেতে কেউ নিষেধ করে না, বিশেষ করে ছোট ছেলেরা কাঁচাপাকা পড়ে থাকা ফল কুড়িয়ে খেতে খুবই উৎসাহ বোধ করে। এ কারণেই সেগুলো খেতে নিষেধ করা হয়নি। এতে বুঝা গেল যে, যেখানে নিচে পড়া ফল খেতে নিষেধ করা হয় না সেখানে এরূপ করা গুনাহ হবে না।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٨٢٩ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَخَذَ مِنَ الْاَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِلٰى سَبْعِ اَرْضِيْنَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৮২৯. অনুবাদ : তাবেয়ী সালেম (র.) তাঁর পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে অনধিকারে কারো কিছু জমিন নিয়েছে, কিয়ামতের দিন তাকে সাত তবক জমিন পর্যন্ত ধসিয়ে দেওয়া হবে। –[বুখারী]

وَعَنْ ٢٨٣٠ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَخَذَ اَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ اَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا الْمَحْشَرَ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

২৮৩০. অনুবাদ : হযরত ইয়া'লা ইবনে মুররাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে অন্যায়ভাবে কারো কোনো জমি দখল করেছে, তাকে তার মাটি [মাথায় করে] হাশরের মাঠে নিয়ে যেতে বাধ্য করা হবে। –[আহমদ]

وَعَنْهُ ٢٨٣١ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ كَلَّفَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يَحْفِرَهُ حَتّٰى يَبْلُغَ اٰخِرَ سَبْعِ اَرَضِيْنَ ثُمَّ يُطَوَّقُهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يَقْضِىَ بَيْنَ النَّاسِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

২৮৩১. অনুবাদ : হযরত ইয়া'লা ইবনে মুররাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে কোনো ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো এক বিগত জমি দখল করে তাকে আল্লাহ তা সাত তবকের শেষ পর্যন্ত খুঁড়তে বাধ্য করবেন। অতঃপর তার গলায় তা শিকলরূপে পরিয়ে দেওয়া হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের বিচার শেষ করা হয়। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অন্যায়ভাবে কারো সামান্যতম জমিও জবরদখল করলে তাকে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তিভোগ করতে হবে। এর শাস্তি সম্পর্কে কয়েক ধরনের বর্ণনা এসেছে। হয়তো ব্যক্তিবিশেষ বা অপরাধের তারতম্যের কারণে শাস্তিও বিভিন্ন ধরনের হবে। সুতরাং হাদীসসমূহের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকবে না।

بَابُ الشُّفْعَةِ
পরিচ্ছেদ : শোফা'র হক

اَلشُّفْعَةُ : শব্দটি شَفْع থেকে নির্গত, যার অর্থ হলো– মিলানো, সংযুক্ত, জোড়া ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায় شُفْعَةٌ বলা হয় এমন প্রতিবেশীত্ব বা অংশীদারিত্বকে, যার দ্বারা কোনো প্রতিবেশী বা অংশীদার অপর প্রতিবেশী বা অংশীদারের বিক্রয়যোগ্য জমি বা বাড়ি ক্রয় করার এক বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়। এ অধিকার শুধুমাত্র জমি বা ঘরবাড়ির জন্যই নির্দিষ্ট। উক্ত অধিকারের নাম হলো شُفْعَةٌ আর অধিকার প্রাপ্তকে شَفِيْع বলা হয়।

وَجْهُ التَّسْمِيَةِ [নামকরণের কারণ] : এই হক বা অধিকারের নাম شُفْعَةٌ রাখার কারণ হলো, যেহেতু এই বিশেষ অধিকার বিক্রয়যোগ্য জমি বা ঘরকে شَفِيْع -এর জমি বা ঘরের সাথে মিলিত করে, এজন্য এর নাম রাখা হয়েছে شُفْعَةٌ করে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٨٣٢ - عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِيْ كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৮৩২. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ শোফা'র ফয়সালা করেছেন সেসব [স্থাবর] সম্পত্তিতে, যা ভাগ করা হয়নি। যখন সীমানা চিহ্নিত হয় ও পথ পৃথক করা হয়, তখন শোফা' নেই। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شُفْعَةٌ -এর কারণ কয়টি সে ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন–

১. اَئِمَّةٌ ثَلَاثَةٌ -এর নিকট শুধুমাত্র شِرْكَتْ فِيْ نَفْسِ الْمَبِيْعِ অর্থাৎ অংশীদার ব্যতীত আর কেউই শোফা'র অধিকার পাবে না। সুতরাং প্রতিবেশী শোফা'র অধিকার পাবে না। তাঁদের দলিল হলো–

قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

অর্থাৎ যখন সীমানা চিহ্নিত করা হয় এবং রাস্তা পৃথক করা হয়। বুঝা গেল حَقْ شُفْعَةٌ শুধুমাত্র অংশীদারিত্বের ভিত্তিতেই পাবে। প্রতিবেশীত্বের ভিত্তিতে নয়।

২. ইমাম আবূ হানীফা, বুখারী, হাসান বসরী (র.) প্রমুখ ওলামায়ে কেরামের মতে তিন ধরনের ব্যক্তি শোফা'র দাবিদার হতে পারবে।
প্রথমত যার সাথে জমি বণ্টন হয়নি।
দ্বিতীয়ত যার সাথে জমি বণ্টন হয়ে গেছে কিন্তু রাস্তা ও ঘাট বণ্টন হয়নি।
তৃতীয়ত মিলিত প্রতিবেশীর জন্যও শোফার অধিকার রয়েছে। তাঁদের দলিল–

١. عَنْ رَافِعٍ (رض) اَنَّهُ قَالَ الْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ . (بُخَارِيْ)

অর্থাৎ, প্রতিবেশী শোফা'র অধিক হকদার তার নৈকট্যের কারণে, বুঝা গেল প্রতিবেশীও শোফা'র হকদার হবে। তাঁদের দলিল–

٢. عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَارُ الدَّارِ اَحَقُّ بِالدَّارِ . (اَبُوْ دَاوُدَ)

٣. عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ اَلْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ . (تِرْمِذِيْ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

اَلْجَوَابُ عَنْ اَدِلَّةِ الْمُخَالِفِيْنَ :

১. উক্ত হাদীসে فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ হলো হযরত জাবের (রা.)-এর বাণী। সুতরাং مَرْفُوْع হাদীসের মোকাবিলায় এ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

২. আর এটিকে হুজুরের বাণী মেনে নিলেও আমাদের দলিলের ভিত্তিতে এ হাদীসের অর্থ হবে বণ্টনের পরে অংশীদারিত্বের শোফা' পাবে না, বরং প্রতিবেশীত্বের শোফা' পাবে।

৩. তাঁদের দলিলের দ্বারা প্রতিবেশীর জন্য শোফা'র نَفِىْ হওয়াটা ইশারার দ্বারা প্রমাণিত হয়, আর আমাদের দলিলের দ্বারা তার জন্য শোফা'র اِثْبَاتْ টা عِبَارَةُ النَّصِّ দ্বারা প্রমাণিত হয়। সুতরাং আমাদের দলিলই অগ্রাধিকারযোগ্য।

৪. হানাফীদের দলিল সংখ্যায় ও বিশুদ্ধতায় অধিক।

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَلْحُدُوْدُ : এটি বহুবচন, একবচনে حَدٌّ অর্থ– সীমানা।

اَلطُّرُقُ : এটি বহুবচন, একবচনে طَرِيْقٌ অর্থ– রাস্তা।

وَعَنْ ٢٨٣٣ قَالَ قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِىْ كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ اَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَّبِيْعَ حَتّٰى يُؤْذِنَ شَرِيْكَهُ فَاِنْ شَاءَ اَخَذَ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَ فَاِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৮৩৩. অনুবাদ : উক্ত হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক এমন শরিকি সম্পত্তিতে শোফা'র অধিকার দিয়েছেন, যা বিভক্ত করা হয়নি। চাই তা বাড়ি-ভিটা হোক; বা বাগান হোক। তার পক্ষে তা বিক্রয় করা জায়েজ নয়, যাবৎ না তার অংশীদারকে খবর দেয়। অংশীদার ইচ্ছা করলে গ্রহণ করবে, আর ইচ্ছা না করলে ছেড়ে দেবে। যখন এ খবর না দিয়ে বিক্রয় করবে, শফী'ই তার হকদার হবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শোফা'র অধিকার শুধুমাত্র স্থাবর সম্পত্তি যেমন জমি, ঘর, বাগান ইত্যাদির জন্যই নির্দিষ্ট। অস্থাবর সম্পত্তিতে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না। তদ্রূপভাবে ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, শোফা' শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যই নির্দিষ্ট নয়; বরং মুসলমান ও জিম্মির মধ্যেও প্রযোজ্য হবে। জিম্মি এমন অমুসলিমকে বলে যারা নিজেদের জান, মাল ও ইজ্জত রক্ষার্থে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর প্রদান করেই ইসলামি রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে থাকে।

قَوْلُهُ لَا يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَّبِيْعَ -এর ব্যাখ্যা : "কারোই নিজের অংশ বিক্রয় বৈধ নয়।" এ কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি কোনো যৌথ সম্পত্তি বিক্রয় করতে চায়, তাহলে প্রথমেই তার অংশীদারকে অবহিত করা আবশ্যক। সে যদি ক্রয় করতে ইচ্ছুক হয় তাহলে ক্রয় করবে। আর যদি তাকে অবহিত না করেই বিক্রয় করে, তাহলে অংশীদার ব্যক্তিই সেই সম্পত্তির হকদার হবে।

وَعَنْ ٢٨٣٤ اَبِىْ رَافِعٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

২৮৩৪. অনুবাদ : হযরত আবূ রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিকটতম প্রতিবেশীই শোফা'র সর্বাধিক হকদার তার নৈকট্যের কারণে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নিকটতম ও মিলিত প্রতিবেশীই শোফার সর্বাধিক হকদার। এ হাদীস হানাফীদের স্পষ্ট দলিল, سَقَبٌ শব্দের অর্থ হলো নিকটতম।

وَعَنْ ٢٨٣٥ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِىْ جِدَارِهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৮৩৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো প্রতিবেশী যেন তার দেওয়ালে তার কোনো প্রতিবেশীকে কড়িকাঠ গাড়তে নিষেধ না করে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : একজনের দেওয়ালে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রতিবেশীকে কাষ্ঠ খণ্ড গাড়তে নিষেধ করো না, কেউ বলেছেন এ নির্দেশ ওয়াজিবের জন্য, আবার কেউ বলেছেন মোস্তাহাব ও মানবতার খাতিরে এ হুকুম পালন করা কর্তব্য।

শব্দ-বিশ্লেষণ :

يَغْرِزُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْلْ مُضَارِعْ مَعْرُوْفْ বাবে ضَرَبَ মাসদার غَرْزٌ মূলবর্ণ (غ ـ ر ـ ز) জিনসে صَحِيْحْ অর্থ- গেড়ে দেওয়া, গাড়া, গাঁথা।

وَعَنْهُ ٢٨٣٦ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِى الطَّرِيْقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৮৩৬. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা কোনো রাস্তার প্রস্থ সম্পর্কে মতভেদ করবে, তখন তার প্রস্থ সাত হাত ধরা হবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ-এর ব্যাখ্যা : "রাস্তার প্রস্থ সাত হাত নির্ধারণ করা হবে" কথাটির অর্থ হলো যদি কোনো পতিত জমিতে রাস্তা নির্মাণ হয়েছে এবং সেখানে কিছু লোক বসতি স্থাপন করতে চায়, তাহলে পরস্পরের আপস সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই রাস্তার উপযুক্ত জায়গা রেখে তার আশেপাশে বসতি স্থাপন করবে। কিন্তু যদি তারা রাস্তার ব্যাপারে মতৈক্য হতে না পারে তাহলে সেক্ষেত্রে রাস্তার জন্য প্রস্থে ৭ হাত জমি ছেড়ে দেবে এবং সেই সীমার মধ্যে কেউ ঘরবাড়ি নির্মাণ করবে না। উল্লেখ্য যে, যদি কোনো চালু রাস্তা ৭ হাতের অধিক প্রশস্ত থাকে, সেক্ষেত্রে কারো জন্যই এটা জায়েজ হবে না যে, ৭ হাতের অতিরিক্ত জমি দখল করে নেবে এই বলে যে, রাস্তার জন্য তো সাত হাত রাখার কথা বলা হয়েছে।

আর যদি কেউ নিজের জমিতে জনগণের সুবিধার্থে রাস্তা নির্মাণ করে দেয়, তাহলে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশস্ত করেই নির্মাণ করা উচিত। তবে সে ক্ষেত্রে তার ইচ্ছাই ধর্তব্য হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٨٣٧ سَعِيْدِ بْنِ حُرَيْثٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أَوْ عِقَارًا قَمِنٌ أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ فِىْ مِثْلِهِ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَ الدَّارِمِىُّ)

২৮৩৭. অনুবাদ : হযরত সাঈদ ইবনে হুরাইছ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বাড়ি অথবা জমি বিক্রয় করেছে, তার কাজে বরকত না হওয়ারই সে উপযুক্ত। তবে যদি সে তা ঐরূপ কাজে লাগায়। -[ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের মর্মার্থ হলো স্থাবর বা ভূসম্পত্তি বিক্রয় করে তার অর্থ দ্বারা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় সমীচীন নয়। কেননা, স্থাবর সম্পত্তিতে যেমন তা কেউ চুরি করতে পারে না, ছিনতাই করতে পারে না। পক্ষান্তরে অস্থাবর সম্পত্তির চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের আশঙ্কা সব সময়ই থাকে। সুতরাং এটাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় যে, বিনা প্রয়োজনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা উচিত নয়। আর বিক্রয় করলেও তা দ্বারা অন্য কোনো জমি বা বাড়ি করা উচিত।

শব্দ-বিশ্লেষণ : عَقَارٌ এটি একবচন, বহুবচনে عَقَارَاتٌ অর্থ– ভূসম্পত্তি।

قَمِنٌ : শব্দটি قَمْنًا (س) قَمِنٌ অর্থাৎ বাবে سَمِعَ থেকে নেওয়া হয়েছে। যার অর্থ হলো উপযুক্ত হওয়া। শব্দটির وَاحِدْ ـ جَمْع হয় না।

وَعَنْ ٢٨٣٨ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَتِهٖ يُنْتَظَرُ لَهَا وَاِنْ كَانَ غَائِبًا اِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

২৮৩৮. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রতিবেশী তার শোফা'র হকদার। তার জন্য এ ব্যাপারে অপেক্ষা করা হবে, যদিও সে অনুপস্থিত থাকে, যখন উভয়ের পথ এক হয়। –[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

وَعَنْ ٢٨٣٩ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلشَّرِيْكُ شَفِيْعٌ وَ الشُّفْعَةُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا وَ هُوَ اَصَحُّ ـ

২৮৩৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, শরিক হলো শফী', আর প্রত্যেক [স্থাবর] জিনিসেই শোফা' রয়েছে। –[তিরমিযী] তিনি বলেন, হাদীসটি তাবেয়ী ইবনে আবূ মুলাইকা হতে মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে। আর এটাই বিশুদ্ধতর কথা।

وَعَنْ ٢٨٤٠ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللّٰهُ رَأْسَهٗ فِي النَّارِ ـ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مُخْتَصَرٌ يَعْنِيْ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِيْ فَلَاةٍ يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيْلِ وَالْبَهَائِمُ غَشْمًا وَظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ يَكُوْنُ لَهٗ فِيْهَا صَوَّبَ اللّٰهُ رَأْسَهٗ فِي النَّارِ ـ

২৮৪০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুবাইশ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে বরই গাছ কেটেছে তাকে আল্লাহ মাথা নিচু করে জাহান্নামে ফেলবেন। –আবূ দাউদ এটা বর্ণনা করে বলেন যে, হাদীসটি সংক্ষিপ্ত। এর মর্ম হলো, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে তার কোনো ফায়দা ব্যতীত মাঠের বরই গাছ কেটেছে, যার নিচে মুসাফির ও পশুপাল আশ্রয় নেয়, আল্লাহ তার মাথাকে নিচু করে দোজখে ফেলবেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللّٰهُ الخ -এর অর্থ : যে ব্যক্তি বরই গাছ কাটবে, আল্লাহ তাকে মাথা নিচু করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, এ কথার ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসগণ কয়েকটি উক্তি করেছেন–

* কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মক্কার বরই গাছ। কেননা, হেরেমের বৃক্ষ কাটা নিষেধ।

* কেউ বলেছেন, মদিনার বরই গাছ উদ্দেশ্য। কেননা, তা দ্বারা মানুষ ছায়া গ্রহণ করবে।

* আবার কেউ বলেছেন, মরুভূমির রাস্তার বরই গাছ উদ্দেশ্য, যার নিচে পথিক বা পশুপাল ছায়া অর্জন করে।

* আবার কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অন্যের বরই গাছ অন্যায়ভাবে কাটা।

وَجْهُ تَخْصِيْصِ السِّدْرَةِ **[বরই গাছ নির্দিষ্টকরণের কারণ]** : বরই বৃক্ষকে নির্দিষ্ট করার কারণ হলো, সম্ভবত বরই বৃক্ষের ছায়া অন্য বৃক্ষের ছায়ার তুলনায় অধিক ঠাণ্ডা ও শীতল হয়ে থাকে। নতুবা যে কোনো বৃক্ষই এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং যে কোনো ছায়াদার বৃক্ষই বিনা কারণে কেটে ফেলা সমীচীন নয়।

قَوْلُهُ غَشْمًا ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ : এ বাক্যের মধ্যে "ظُلْم" ও "بِغَيْرِ حَقٍّ" শব্দ দুটি غَشْمًا-এর تَاكِيْد-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, অথবা ظُلْمًا হলো غَشْمًا-এর تَاكِيْد আর بِغَيْرِ حَقٍّ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো شُفْعَة। -[মেরকাত- খ. ৬, পৃ. ১২৮]

শব্দ-বিশ্লেষণ :

اَلتَّصْوِيْبُ মূলবর্ণ : صَوَّبَ সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাবে تَفْعِيْل মাসদার (ص . و . ب) জিনসে اَجْوَفْ وَاوِىْ অর্থ- নিচু করা। صَوَّبَ رَأْسَهُ - মাথা নিচু করেছে।

فَلَاةٌ : এটি একবচন, বহুবচনে فَلَوَاتٌ অর্থ- মরুভূমি, নির্জন প্রান্তর।

يَسْتَظِلُّ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِظْلَالُ মূলবর্ণ (ظ . ل . ل) জিনসে مُضَاعَفْ ثُلَاثِىْ অর্থ- ছায়া কামনা করা।

غَشْمًا : শব্দটি বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার অর্থ- অত্যাচার করা, শব্দটি তারকীবে حَالْ হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٨٤١ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (رض) قَالَ اِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ فِى الْاَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيْهَا وَلَا شُفْعَةَ فِىْ بِئْرٍ وَلَا فَحْلِ النَّخْلِ . (رَوَاهُ مَالِكٌ)

২৮৪১. অনুবাদ : হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) বলেন, যখন জমিনে সীমানা চিহ্নিত হয়, তখন তাতে শোফা' নেই। কূপ ও নর খেজুর গাছেও শোফা' নেই। -[মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কূপ হলো এমন এক জিনিস যা বণ্টনের সম্ভাবনা রাখে না। আর শোফা'র অধিকার এমন জমিতে হয় যা বণ্টনযোগ্য। সুতরাং কূপের মধ্যে শোফা'র অধিকার হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) এ মতই পোষণ করেন। তাঁর দলিল- لَا شُفْعَةَ فِىْ بِئْرٍ وَلَا فَحْلِ النَّخْلِ

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, শোফা' যে-কোনো জমিতেই হবে, চাই বণ্টনের সম্ভাবনা রাখুক বা না রাখুক। যেমন- বাগান, ঘর, কূপ, হাম্মাম ইত্যাদি। তাঁর দলিল- اَلشُّفْعَةُ فِىْ كُلِّ شَيْءٍ 'সকল স্থাবর সম্পত্তিতে শোফা' হবে।'

قَوْلُهُ وَلَا فَحْلِ النَّخْلِ-এর ব্যাখ্যা : অর্থাৎ কিছু লোক খেজুরের কিছু বৃক্ষ যৌথভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছে, যেগুলো তারা পরস্পরে বণ্টন করে নিয়েছে, কিন্তু সেখানে একটি নর খেজুর গাছও ছিল, যার ফুল নিয়ে সকলেই নিজেদের মাদি খেজুর গাছে দিত। তন্মধ্যে হতে একজন স্বীয় অংশের খেজুর গাছের সাথে ঐ নর গাছের নিজের অংশও বিক্রয় করতে চাইলে ঐ ক্রয়বিক্রয়ে شُفْعَةٌ-এর অধিকার থাকবে না। কেননা, সেটা জমিও নয়, আর তাকে বণ্টন করাও সম্ভব নয়। -[মেরকাত- খ. ৬, পৃ. ১২৯]

بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ
পরিচ্ছেদ : বাগান ও জমি বর্গা

مُسَاقَاةٌ-এর আভিধানিক অর্থ : مُسَاقَاةٌ শব্দটি বাবে مُفَاعَلَةٌ-এর মাসদার। এর অর্থ হলো– পরস্পর পানি পান করানো, সেচকার্য করা, প্লাবিত করা।

مُسَاقَاةٌ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : مُسَاقَاةٌ শব্দের পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। যেমন–

* আল্লামা তকী ওসমানী [দা. বা.] তাঁর تَكْمِلَةُ فَتْحِ الْمُلْهِمِ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন–

هُوَ دَفْعُ الشَّجَرِ اِلٰى مَنْ يُصْلِحُ بِجُزْءٍ مَعْلُوْمٍ مِنْ ثَمَرِهٖ.

অর্থাৎ ফলের নির্দিষ্ট এক অংশ দেওয়ার বিনিময়ে গাছ বর্গা দেওয়াকে مُسَاقَاةٌ বলে।

* আবার কেউ বলেন– اَلْمُسَاقَاةُ هِىَ كِرَايَةُ حَدِيْقَةِ الثَّمَرِ بِعِوَضٍ مِقْدَارٍ مَعْلُوْمٍ كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ

অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ ফল যেমন– অর্ধাংশ, তৃতীয়াংশ ও চতুর্থাংশ দেওয়ার বিনিময়ে কারো নিকট ফলের বাগান বর্গা দেওয়াকে মুসাকাত বলে।

مُزَارَعَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ : مُزَارَعَةٌ শব্দটি বাবে مُفَاعَلَةٌ-এর মাসদার زَرْعٌ মূলধাতু হতে مُشْتَقٌّ হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে– চাষ করা।

مُزَارَعَةٌ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ফিকহশাস্ত্রের পরিভাষায় مُزَارَعَةٌ বলা হয়–

هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ فِى الزَّرْعِ بِجُزْءٍ خَارِجٍ مِنَ الْاَرْضِ كَالنِّصْفِ اَوِ الثُّلُثِ اَوِ الرُّبُعِ.

অর্থাৎ উৎপাদিত ফসলের অর্ধাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ চাষীকে দেওয়ার শর্তে জমি বর্গা দানের عَقْد-কে مُزَارَعَةٌ বলা হয়। এর অপর নাম مُخَابَرَةٌ -

وَلٰكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ اَنَّ الْبَذْرَ عَلَى الْمَالِكِ فِى الْمُزَارَعَةِ وَعَلَى الْعَامِلِ فِى الْمُخَابَرَةِ.

مُزَارَعَةٌ ও مُسَاقَاةٌ-এর মধ্যে পার্থক্য : মুসাকাত ও মুযারা'আতের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে– জমি বর্গা দেওয়াকে مُزَارَعَةٌ বলে আর গাছ বর্গা দেওয়াকে مُسَاقَاةٌ বলে।

مُسَاقَاةٌ-এর হুকুম : মুসাকাতের হুকুম সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন–

* ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, খেজুর ও আঙ্গুর গাছের বেলায় مُسَاقَاةٌ জায়েজ। এছাড়া অন্যান্য গাছে مُسَاقَاةٌ জায়েজ নয়।

* ইমাম মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতে সকল প্রকার গাছে مُسَاقَاةٌ জায়েজ। তাঁদের দলিল হচ্ছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ.

এখানে ثَمَرٌ শব্দ এসেছে তা প্রত্যেক প্রকার গাছকে বুঝায়।

* ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, مُسَاقَاةٌ কোনো অবস্থাতেই জায়েজ নেই। কেননা, এটি একটি عَقْدٌ فَاسِدٌ -

* সাহেবাইন (র.)-এর মতে, মানুষের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে مُسَاقَاةٌ সর্বাবস্থায় জায়েজ।

হুকুমসহ مُزَارَعَةٌ-এর প্রকারভেদ : জমি বর্গা দেওয়ার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা–

১. জমির মালিক ও বর্গা গ্রহীতার মাঝে এমন চুক্তি সম্পর্কিত হয় যে, কৃষক জমির মালিককে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বা ফসল দেবে যা ঐ জমিতে উৎপন্ন হওয়া শর্ত নয়। এটা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ।

২. উভয়ের মাঝে এমন চুক্তি সম্পাদিত হয় যে, অমুক জমির ফসল মালিকের আর অমুক জমির ফসল কৃষকের। এটা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েজ।

৩. উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ মালিকের বা কৃষকের হবে এরূপ শর্তে বর্গা জায়েজ হবে কিনা? সে ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

ক. ইমাম আহমদ ও সাহেবাইন (র.)-এর মতে তা জায়েজ। তাঁদের দলিল নিম্নরূপ-

١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ عَلٰى نِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ.

٢. عَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ قَالَ مَا بِالْمَدِيْنَةِ اَهْلُ بَيْتٍ اِلَّا وَيَزْرَعُوْنَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.

খ. ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এ ধরনের বর্গা বৈধ নয়। তাঁদের দলিল-

١. حَدِيْثُ جَابِرٍ (رض) اَنَّهُ نَهٰى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَهِيَ الْمُزَارَعَةُ.

٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ حَتّٰى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْهُ فَتَرَكْنَاهُ.

٣. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ، قُلْتُ وَمَا الْمُخَابَرَةُ قَالَ اَنْ تَأْخُذَ الْاَرْضَ بِنِصْفٍ اَوْ ثُلُثٍ اَوْ رُبُعٍ.

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : اَئِمَّةٌ ثَلَاثَةٌ-এর পক্ষ থেকে সাহেবাইনদের দলিলের জওয়াব দেওয়া হয় এভাবে যে, খায়বারবাসীদের সাথে যে লেনদেন হয়েছিল তা মুযারা'আ ও মুসাকাত ছিল না; বরং তা ছিল جِزْيَةٌ বা করস্বরূপ। প্রমাণস্বরূপ তারা বলেন যে, جِزْيَةٌ-এর আয়াত নাজিল হওয়ার পরও হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.) তাদের থেকে পূর্বের ন্যায় কর নিতে থাকেন। যদি সেটা মুযারা'আ হতো তাহলে পৃথকভাবে কর নিতেন।

অথবা বলা যায় যে, সেটা ছিল خراج مقاسمة "ইসলামি রাষ্ট্র কর্তৃক সাবেক মালিকদেরকে বহাল রেখে তাদের থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন ফসল নেওয়াকে খারাজে মুকাসামা বলে।"

قَوْلٌ مُفْتٰى بِهٖ : পরবর্তী হানাফীগণ জনগণের প্রয়োজন ও উম্মতের ভুক্তভোগী হওয়ার কথা বিবেচনা করে সাহেবাইনের অভিমত অনুযায়ীই ফতোয়া প্রদান করেছেন এবং তারা اَئِمَّةٌ ثَلَاثَةٌ-এর দলিলের উত্তর দিয়েছেন এভাবে যে-

* তাদের হাদীসগুলো হলো- نَهْىٌ تَنْزِيْهِيٌّ-এর জন্য, তাহরীমীর জন্য নয়।
* এ নিষেধাজ্ঞাটা مُطْلَقًا মুযারায়া'আর জন্য নয়; বরং এমন عَقْد সম্পর্কিত যেখানে মালিক নিজের জন্য ভালো জমি নির্ধারণ করে রাখে এবং কৃষককে খারাপ জমি নির্ধারণ করে। এ ধরনের করা সম্মতিক্রমে অবৈধ।

সুতরাং জনসাধারণ ও সকল উম্মতের আমল ও উপকারিতার কথা বিবেচনা করে এ মাযহাবই অগ্রাধিকারযোগ্য হবে।

-[আইনী ৫/ ৭২৪, হেদায়া ৪/ ৪০৮, বয়ানুল মাহমূদ ৪/ ২৭৫, তা'লীক ৩/ ৩৬২]

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٨٤٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَفَعَ اِلٰى يَهُوْدِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَاَرْضَهَا عَلٰى اَنْ يَعْتَمِلُوْهَا مِنْ اَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَطْرُ ثَمَرِهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطٰى خَيْبَرَ الْيَهُوْدَ اَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا.

২৮৪২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরের খেজুর বাগান ও জমিন খায়বরের ইহুদিদেরকে দিয়েছিলেন তারা নিজেদের অর্থে তাতে কাজ করবে; আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ফলের অর্ধেক পাবেন। -[মুসলিম] বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে- রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরকে ইহুদিদের দিয়েছিলেন, তারা তাতে পরিশ্রম করবে ও শস্য উৎপাদন করবে, আর তাদের জন্য উৎপাদনের অর্ধেক হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

خَيْبَرُ পরিচিতি : খায়বার (خَيْبَرُ) একটি জনপদের নাম যা মদিনা হতে আনুমানিক ৬০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। পূর্বে এটি একটি প্রসিদ্ধ স্থান হিসেবে পরিগণিত হতো, সেখানে ইহুদিরা বসবাস করত। কিন্তু সাম্প্রতিককালে তা মাত্র কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি মাত্র। তথাকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যসম্মত না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে লোকজন সেখানে বসবাস করতে আগ্রহী হয় না। সেখানে খেজুর জন্মে।

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসের আলোকে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ব্যতীত সকল ওলামায়ে কেরাম বলেন যে, বর্গা প্রথা বৈধ। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাদের উত্তরে বলেন যে, খায়বারের জমি তথাকার ইহুদিদের দেওয়ার সাথে বর্গার কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা, খায়বারের জমি এবং গাছপালার মালিক হুজুর ﷺ ছিলেন না যে, তিনি তা ইহুদিদেরকে বর্গা দেবেন; বরং সেখানকার জমি ও গাছপালার মালিক ইহুদিরাই ছিল। হুজুর ﷺ তাদেরই সম্পদকে তাদের নিকট অর্পণ করেন এবং তা হতে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক কর ধার্য করেন। কেননা কর দু প্রকার– ১. خَرَاجُ مُوَظَّفٌ - ২. خَرَاجُ مُقَاسَمَةٌ। خَرَاجُ مُوَظَّفٌ হলো, কর আরোপিত ব্যক্তিদের থেকে বাৎসরিক নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ধার্য করা। আর خَرَاجُ مُقَاسَمَةٌ হলো, কর আরোপকৃত ব্যক্তিদের থেকে তাদের জমির উৎপন্ন ফসলের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কর হিসেবে ধার্য করা। উল্লেখ্য যে, খায়বারের ইহুদিদের সাথে এ প্রকারই নির্ধারণ করা হয়েছিল।

وَعَنْ ٢٨٤٣ قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرٰى بِذٰلِكَ بَأْسًا حَتّٰى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْهَا فَتَرَكْنَا مِنْ اَجَلِ ذٰلِكَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৮৪৩. অনুবাদ : উক্ত হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বর্গার কারবার করতাম, আর তাতে কোনো আপত্তি আছে বলে মনে করতাম না, যাবৎ না রাফে' ইবনে খাদীজ (রা.) বললেন, নবী করীম ﷺ তা নিষেধ করেছেন। অতঃপর তার কারণে আমরা তা পরিত্যাগ করলাম। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٢٨٤٤ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمَّاىَ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُكْرُوْنَ الْاَرْضَ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْاَرْبَعَاءِ اَوْ شَىْءٍ يَسْتَثْنِيْهِ صَاحِبُ الْاَرْضِ فَنَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ هِىَ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ فَقَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ وَكَانَ الَّذِىْ نُهِىَ عَنْ ذٰلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيْهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيْزُوْهُ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৮৪৪. অনুবাদ : তাবেয়ী হান্‌যালা ইবনে কায়েস হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার দুই চাচা আমাকে বলেছেন, তাঁরা নবী করীম ﷺ -এর যুগে এরূপে জমিন বর্গা দিতেন– যা খালের নিকটের জমিনে ফলবে, তা তার। অথবা জমিনের মালিক অপর কোনো অংশ বাদ রাখত [তার ফসল তাকে দিতে হতো]। অতঃপর নবী করীম ﷺ আমাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। হযরত হানযালা (র.) বলেন, আমি রাফে'কে জিজ্ঞাসা করলাম, দিরহাম ও দিনারের বিনিময়ে কেরায়া দেওয়া [লাগিত করা] কেমন? তিনি বললেন, এতে কোনো আপত্তি নেই। [রাফে' অথবা কোনো রাবী অথবা ইমাম বুখারী বলেন, যা হতে নিষেধ করা হয়েছে, তা এ সুরতই। হালাল-হারামে অভিজ্ঞ বিবেচক ব্যক্তিরা যদি এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেন, তবে তার অনুমতি দেবেন না। যেহেতু তাতে বিপদের [ঠকাঠকির] আশঙ্কা রয়েছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উল্লেখ্য যে, জমি বর্গাচাষে দেওয়ার এমন দুটি পদ্ধতির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যা হুজুর ﷺ কর্তৃক নিষিদ্ধ এবং বর্গা প্রথা বৈধ জ্ঞানকারী ওলামায়ে কেরামের নিকটও নিষিদ্ধ।

বর্গা সম্পর্কিত হাদীস যেহেতু বিভিন্ন ধরনের বর্ণিত হয়েছে, তাই এর বৈধতা দানকারী আলেমগণও হাদীস দ্বারাই দলিল দিয়ে থাকেন। আবার যারা এটাকে বৈধ মনে করেন না, তারাও তাদের মতের স্বপক্ষে হাদীস দ্বারা দলিল দেন। সুতরাং উভয়েরই ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে।

আমরা পূর্বেও বলেছি যে, অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে বর্গা প্রথা বৈধ, শুধুমাত্র ইমাম আবূ হানীফা (র.) এটাকে অবৈধ মনে করেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দুজন স্বনামধন্য ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর বৈধতার স্বপক্ষে মত দিয়েছেন, তদুপরি মানুষের সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে হানাফী মাযহাবের ফতোয়া বৈধতার পক্ষেই। সুতরাং সকল ওলামাদের মতেই বর্গা প্রথা বৈধ।

শব্দ-বিশ্লেষণ : كَانُوْا يُكْرُوْنَ : সীগাহ جَمْعُ مُذَكَّرٍ غَائِبٍ বহছ مَاضِى اِسْتِمْرَارِىْ مَعْرُوْف বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِكْرَاءُ অর্থ– ভাড়া দেওয়া, বর্গা দেওয়া।

اَلْمُخَاطَرَةُ : এটি বাবে مُفَاعَلَةٌ -এর মাসদার, অর্থ– বিপদের আশঙ্কা।

وَعَنْ ٢٨٤٥ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رضـ) قَالَ كُنَّا اَكْثَرَ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ حَقْلًا وَكَانَ اَحَدُنَا يُكْرِىْ اَرْضَهٗ فَيَقُوْلُ هٰذِهِ الْقِطْعَةُ لِىْ وَهٰذِهٖ لَكَ فَرُبَّمَا اَخْرَجَتْ ذِهٖ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهٖ فَنَهَاهُمُ النَّبِىُّ ﷺ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৮৪৫. অনুবাদ : হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মদিনার সর্বাপেক্ষা অধিক জমির মালিক ছিলাম। আমাদের মধ্যে কেউ তার জমিন বর্গা দিতে এভাবে বলত, জমিনের এ টুকরা আমার আর এ টুকরা তোমার অথচ কখনও কখনও এ টুকরায় ফসল উৎপন্ন হতো, আর ঐ টুকরায় হতো না। অতঃপর নবী করীম ﷺ তাদেরকে এটা নিষেধ করলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٢٨٤٦ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قُلْتُ لِطَاؤُسٍ لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَاِنَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْهُ قَالَ اَىْ عَمْرُو اِنِّىْ اُعْطِيْهِمْ وَاُعِيْنُهُمْ وَاِنَّ اَعْلَمَهُمْ اَخْبَرَنِىْ يَعْنِىْ ابْنَ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلٰكِنْ قَالَ اِنْ يَمْنَحْ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ خَيْرٌ لَهٗ مِنْ اَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُوْمًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৮৪৬. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে দীনার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত তাউসকে বললাম, আপনি যদি বর্গা দেওয়া ছেড়ে দিতেন। কেননা, ওলামারা মনে করেন, নবী করীম ﷺ তা নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন, আমর! আমি কৃষকদের দান করি এবং সাহায্যও করি। আমাদের ওলামাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা নিষেধ করেননি। অবশ্যই তিনি এ কথা বলেছেন, তোমাদের কারো পক্ষে আপন ভাইকে বিনা বিনিময়ে ধাররূপে জমি দেওয়া তার উপর নির্দিষ্ট কর গ্রহণ করা অপেক্ষা উত্তম। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বর্গার মধ্যে তো কিছু দেওয়া হয় এবং কিছু গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ মালিক স্বীয় জমি দিয়ে থাকে আর কৃষক থেকে তার বিনিময়ে নির্দিষ্ট অংশ নিয়ে থাকে। কিন্তু এর বিপরীত যদি কারো প্রতি অনুগ্রহ করা হয়, এভাবে যে, স্বীয় জমি তার বিনিময়ে কিছু গ্রহণ ব্যতিরেকেই তাকে সহযোগিতা স্বরূপ দেওয়া হয়, তাহলে তা অধিক শ্রেয়।

وَعَنْ ٢٨٤٧ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيَمْنَحْهَا اَخَاهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُمْسِكْ اَرْضَهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৮৪৭. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যার কোনো জমি আছে সে যেন তাতে চাষ করে অথবা তার ভাইকে দান করে দেয়। যদি সে তা না করে, তবে সে তার জমি ধরে রাখুক। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيَمْنَحْهَا-এর ব্যাখ্যা : শায়খ মাযহার এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন যে, যাদের সম্পদ আছে তাদের সেই সম্পদ দ্বারা তাদের উচিত হলো, সে জমি চাষাবাদ করে তা হতে ফসল উৎপন্ন করে নিজেই উপকৃত হবে। আর যদি সে নিজে চাষ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে একজন দরিদ্র মুসলমান কৃষককে দেবে যাতে সে চাষাবাদ করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। এভাবে মানবীয় সহমর্মিতার একটি দায়িত্বও তার পূরণ হলো।

قَوْلُهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُمْسِكْ اَرْضَهُ-এর ব্যাখ্যা : "যদি সে না দেয় তাহলে যেন নিজের নিকট আটকে রাখে।" এ কথার ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরামের মতামত নিম্নরূপ–

* কেউ বলেছেন, এ নির্দেশটা اِبَاحَةٌ-এর জন্য। তখন অর্থ হবে– কোনো মুসলমান ভাই যদি জমি নিতে রাজি না হয়, তাহলে তা নিজের কাছেই রেখে দেবে, সে ক্ষেত্রে তার কোনো গুনাহ হবে না।
* আল্লামা ত্বীবী (র.) বলেন, বরং এ কথাটি ধমক স্বরূপ বলেছেন যে, তারা যদি প্রথম দুই পন্থার কোনোটি পালন না করে তাহলে সে যেন অবশ্যই তৃতীয় কোনো পন্থা যেমন– বর্গা, ইজারা ইত্যাদি দেয়।
* শায়খ মাযহার বলেন, মূলত এখানে ঐ দুটির যে-কোনো একটি করার প্রতি জোর দিচ্ছেন এবং না করার কারণে তিরস্কার করছেন যে, সে যেন নিজের মাল যা ইচ্ছা তা করুক। –[মেরকাত- খ. ৬, পৃ. ১৩৩]

শব্দ-বিশ্লেষণ : لِيَمْنَحْهَا : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اَمْرْ غَائِبْ مَعْرُوْفْ বাবে فَتَحَ . ضَرَبَ মাসদার اَلْمَنْحَةُ মূলবর্ণ (م . ن . ح) জিনসে صَحِيْح অর্থ– দান করা।

وَعَنْ ٢٨٤٨ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) وَرَاٰى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ اٰلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ هٰذَا بَيْتَ قَوْمٍ اِلَّا اَدْخَلَهُ الذُّلَّ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

২৮৪৮. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি একটি লাঙ্গল ও কিছু চাষের যন্ত্রপাতি দেখে বললেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে জাতির ঘরেই এগুলো প্রবেশ করবে, সে জাতিতেই আল্লাহ লাঞ্ছনা প্রবিষ্ট করবেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يَدْخُلُ هٰذَا بَيْتَ قَوْمٍ اِلَّا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الذُّلَّ-এর ব্যাখ্যা : "যে ঘরে এগুলো প্রবশে করবে আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।" একথার দ্বারা কৃষি কাজের নিন্দা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। অর্থাৎ যে পরিপূর্ণ রূপে কৃষি কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, তাহলে সে যুদ্ধ থেকে বিমুখ হয়ে পড়তে পারে। তাই যুদ্ধের আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য একথা বলেছেন। আবার কেউ বলেছেন, এটা হলো শত্রুদের সন্নিকটে অবস্থানকারী সীমান্তবর্তী লোকদের জন্য। অর্থাৎ তারা যদি পরিপূর্ণ রূপে চাষাবাদেই লিপ্ত থাকে এবং যুদ্ধ ছেড়ে দেয়, তাহলে তারা শত্রুদের দ্বারা লাঞ্ছিত হবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَلسِّكَّةُ : এটি একবচন, বহুবচনে سِكَكٌ অর্থ– লাঙ্গল।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٨٤٩ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ زَرَعَ فِىْ اَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

২৮৪৯. অনুবাদ : হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো লোকের অনুমতি ব্যতীত তার জমিতে কৃষি করে, তার জন্য কৃষির কোনো অংশ নেই। সে তার খরচ পাবে মাত্র। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, হাদীসটি গরীব]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَهُ نَفَقَتُهُ : এখানে نَفَقَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বীজের মূল্য এবং পারিশ্রমিক। এক ব্যক্তি অন্যের জমিতে তার অনুমতি ব্যতিরেকে চাষ করলে সে উৎপন্ন ফসল সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে−

১. ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে ফসল জমির মালিক পাবে, আর বীজ বপনকারী পাবে বীজের মূল্য ও পারিশ্রমিক। তাঁদের দলিল হলো রাসূল ﷺ -এর হাদীস− مَنْ زَرَعَ فِىْ اَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىْءٌ وَلَهُ نَفَقَةٌ

২. اَئِمَّةٌ ثَلَاثَةٌ -এর মতে ফসল বীজ বপনকারী পাবে, আর জমির মালিক পাবে জমির ভাড়া, তবে ঐ চাষের দ্বারা জমির কোনো ক্ষতি সাধিত হলে, তার ক্ষতিপূরণ সে পাবে। তাঁদের দলিল−

* হুজুরের জমানায় চার ব্যক্তি যৌথভাবে চাষাবাদ করেছিল এভাবে যে, একজনের বীজ, দ্বিতীয়জনের পরিশ্রম, তৃতীয়জনের জমি আর চতুর্থজনের বলদ। তাদের ব্যাপারে হুজুর সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন এভাবে যে,

فَجَعَلَ الزَّرْعَ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ وَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْعَمَلِ اَجْرًا مَعْلُوْمًا، وَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْفَدَّانِ دِرْهَمًا فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَالْغَىَّ الْاَرْضَ فِىْ ذٰلِكَ . (طَحَاوِىْ)

এখানে জমির মালিককে কিছুই দেওয়া হয়নি, তবে জমির ভাড়া এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা অন্য হাদীসে প্রমাণিত আছে−

* ফসল তো বীজের দ্বারাই হয়, আর জমি তো হলো একটি পাত্র, আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন− فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ মেয়েলোকও জমির ন্যায়। আর বীজ বপনকারী হলো কৃষক। সন্তান পিতার দিকেই مَنْسُوْبٌ হয়, অর্থাৎ বীজ বপনকারীর দিকে। তবে জমির মালিককে তার ভাড়া দিতে হবে।

اَلْجَوَابُ : ১. তাঁদের দলিলের উত্তর হলো, এ হুকুমটা শাস্তিস্বরূপ দেওয়া হয়েছিল। কেননা, সেতো জমি জবরদখল করেছিল।

২. আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেন− حَدِيْثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ لَا يَثْبُتُ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ

৩. ইমাম বুখারী (র.) এ হাদীসকে যঈফ বলেছেন। −[ঈযাহুল মেশকাত- খ. ২, পৃ. ৮১৩]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٨٥٠ - عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ قَالَ مَا بِالْمَدِيْنَةِ اَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ اِلَّا يَزْرَعُوْنَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَاٰلُ اَبِىْ بَكْرٍ وَاٰلُ عُمَرَ وَاٰلُ عَلِيٍّ وَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْاَسْوَدِ كُنْتُ اُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ فِى الزَّرْعِ وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلٰى اَنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهٖ فَلَهُ الشَّطْرُ وَاِنْ جَاءُوْا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

২৮৫০. **অনুবাদ :** তাবেয়ী হযরত কায়েস ইবনে মুসলিম (র.) ইমাম আবূ জাফর [মুহাম্মদ বাকের] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মদিনায় কোনো মুহাজির পরিবারই ছিল না যাঁরা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের উপর বর্গার কারবার করেননি। বর্গার কারবার করেছেন হযরত আলী, সা'দ ইবনে মালেক, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয, কাসেম ইবনে মুহাম্মদ, ওরওয়া ইবনে জুবাইর এবং হযরত আবূ বকরের পরিবার; ওমরের পরিবার; আলীর পরিবার ও ইবনে সীরীন। আব্দুর রহমান ইবনে আসওয়াদ বলেন, আমি বর্গায় আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদের অংশীদার ছিলাম। হযরত ওমর (রা.) লোকদের সাথে বর্গার কারবার করেছেন নিম্নরূপে− যদি ওমর (রা.) নিজ হতে বীজ দেন, তবে তিনি অর্ধেক পাবেন। আর যদি তারা [কৃষকরা] বীজ দেয়, তারা এমনই পাবে। −[বুখারী]

بَابُ الْإِجَارَةِ
পরিচ্ছেদ : ভাড়া দেওয়া

اَلْاِجَارَةُ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো– কোনো জিনিস ভাড়া দেওয়া। শরিয়তের পরিভাষায় اِجَارَةٌ বলা হয়– تَمْلِيْكُ الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ شَرْعًا অর্থাৎ "শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় নিজের কোনো জিনিসের মুনাফাকে কোনো জিনিসের পরিবর্তে কাউকে মালিক বানিয়ে দেওয়া।" ফিকহ-এর দৃষ্টিকোণ থেকে قِيَاسٌ অনুযায়ী اِجَارَةٌ সঠিক ও বৈধ না হওয়ার কথা। কেননা, তাতে মুনাফা বিদ্যমান থাকে না। তা সত্ত্বেও মানুষের সমস্যা ও প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে তাকে বৈধ করা হয়েছে। সুতরাং اِجَارَةٌ বৈধ হওয়ার প্রমাণ হাদীসে রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٨٥١ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (رض) قَالَ زَعَمَ ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَاَمَرَ بِالْمُوَاجَرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৮৫১. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [সাহাবী] হযরত ছাবেত ইবনে যাহ্হাক (রা.) মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্গা নিষেধ করেছেন এবং ইজারার আদেশ দিয়েছেন। হযরত ছাবেত (রা.) বলেন, ইজারাতে কোনো আপত্তি নেই। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ نَهٰى عَنِ الْمُزَارَعَةِ-এর ব্যাখ্যা : বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন বলতে এখানে ঐ ধরনের বর্গা বুঝানো হয়েছে যা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত এবং যা নিষিদ্ধ হওয়াটা নিশ্চিত। যার বিশদ আলোচনা উপরের পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَلْمُزَارَعَةُ : এটি বাবে مُفَاعَلَةٌ-এর মাসদার। অর্থ– পরস্পর কৃষিভিত্তিক লেনদেন করা, চাষাবাদ করা।
اَلْمُوَاجَرَةُ : এটি বাবে مُفَاعَلَةٌ-এর মাসদার। অর্থ–পরস্পর ভাড়া লেনদেন করা, ইজারা দেওয়া।

وَعَنْ ٢٨٥٢ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَمَ فَاَعْطَى الْحَجَّامَ اَجْرَهٗ وَاسْتَعَطَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৮৫২. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ শিঙ্গা লাগালেন এবং শিঙ্গাদাতাকে মজুরি দিয়েছেন এবং তিনি নাকে ঔষধও টেনেছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শিঙ্গা লাগানের বিনিময় গ্রহণ জায়েজ কিনা? শিঙ্গা লাগানোর বিনিময় গ্রহণ বৈধ কিনা এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

১. ইমাম আহমদ (র.)-এর নিকট শিঙ্গা লাগানোর পারিশ্রমিক নেওয়া মাকরূহ। তাঁর দলিল হলো–

١. حَدِيْثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رض) اَنَّهٗ قَالَ كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ . (اَبُوْ دَاوٗدَ)

٢. وَفِيْ رِوَايَةٍ اَنَّهٗ قَالَ مِنَ السُّحْتِ كَسْبُ الْحَجَّامِ . (اَبُوْ دَاوٗدَ)

২. জমহুর ওলামায়ে কেরাম ও ইমামগণের মতে তা বৈধ। তাঁদের দলিল হলো–

১. حَدِيْثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَمَ فَاَعْطَى الْحَجَّامَ اَجْرَهٗ .

২. وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَعْطَى الْحَجَّامَ اَجْرَهٗ وَلَوْ عَلِمَهٗ خَبِيْثًا لَمْ يُعْطِهٖ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

اَلْجَوَابُ : ইমাম আহমদ (র.)-এর দলিলের উত্তর হলো–

* উক্ত হাদীস মনসূখ হয়ে গেছে।

* উক্ত হাদীসে বর্ণিত خَبِيْثٌ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো خَسِيْسٌ অর্থাৎ হীন কাজ।

* نَهِىْ টা تَنْزِيْهِى-এর জন্য হবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ : اِحْتَجَمَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوفْ বাবে اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِحْتِجَامُ অর্থ– শিঙ্গা লাগানো।

اَلْحَجَّامُ : এটি একবচন, বহুবচনে حَجَّامُوْنَ অর্থ– শিঙ্গাদাতা, যে শিঙ্গা লাগায়।

وَعَنْ ٢٨٥٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا اِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ اَصْحَابُهٗ وَاَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ اَرْعٰى عَلٰى قَرَارِيْطَ لِاَهْلِ مَكَّةَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

২৮৫৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ কোনো নবী পাঠাননি, যিনি ছাগল-ভেড়া চরাননি। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিও কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি কয়েক কিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল-ভেড়া চরাতাম। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নবীদের ছাগল চরানোর কারণ : নবুয়তের মহান দায়িত্ব পালনের জন্য যে সমস্ত গুণাবলি থাকা আবশ্যক এবং নবীদের স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমাজ ও জনতার যত নৈকট্য ও গভীর সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন, তার জন্য অত্যাবশ্যক ছিল দাওয়াত ও তাবলীগ, সমাজ সংস্কার ও দিকনির্দেশনার বাঁকে বাঁকে সমাজের জনসাধারণ ও নবীর মাঝে থাকবে না কোনো দূরত্ব সৃষ্টিকারী প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর। এ কারণেই সূচনা লগ্নেই নবীদেরকে প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষামূলক বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করায়ে থাকেন। তার কিছু কিছু স্তর বাহ্যিক দৃষ্টিতে হীন ও নীচ শ্রেণির অনুভূত হলেও কল্যাণকারিতার দৃষ্টিকোণ থেকে তাই দূরদর্শী ও কার্যকারী প্রমাণিত হয়। তদ্রূপ একটি হলো বকরি চরানো। যদিও কাজটি সাধারণ ও নিম্নস্তরের; কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এ বকরি চরানোর মধ্যে রয়েছে অনুগ্রহ ও দয়া, কষ্টসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক সম্পর্ক, ব্যাপক জনকল্যাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের এক অতুলনীয় অনুশীলন, যা একজন পথপ্রদর্শক ও সংস্কারকের জীবনের বুনিয়াদি গুণ। এ কারণেই সকল নবীগণ বকরি চরাতেন। যেন এ অভিজ্ঞতা থেকে অতিক্রম করার পর উম্মতের রক্ষণাবেক্ষণ, অনুগ্রহ ও দয়া এবং সমাজের সাথে সম্পর্কোন্নয়নের বাস্তব অনুভূতি সমগ্র জীবনের প্রতিটি স্তরে বিস্তৃত থাকে এবং জাতির পক্ষ থেকে আসা সকল বাধাবিপত্তিতে ধৈর্যের উপর অটল থেকে স্বীয় মিশন চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। উপরের বক্তব্য আরো সুস্পষ্টভাবে বুঝে আসবে এই দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে যে, একজন পথপ্রদর্শক ও একজন বাদশাহর সম্পর্ক হবে স্বীয় জাতির সাথে ঐরূপ, যেরূপ একজন রাখালের সম্পর্ক হয় ছাগল পালের সাথে।

শব্দ-বিশ্লেষণ : قَرَارِيْطَ : এটি বহুবচন, একবচনে قِيْرَاطٌ অর্থ– পরিমাপবিশেষ, এক দিরহামের ছয় ভাগের এক ভাগ, দিরহাম হলে চার আনার সামান্য বেশি।

وَعَنْهُ ٢٨٥٤ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلٰثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ رَجُلٌ اَعْطٰى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ وَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهُ وَ رَجُلٌ اِسْتَاْجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهٖ اَجْرَهٗ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৮৫৪. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হবো– ১. যে ব্যক্তি আমার নামে প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরে তা ভঙ্গ করেছে, ২. যে ব্যক্তি স্বাধীন মানুষকে বিক্রয় করে তার মূল্য খেয়েছে এবং ৩. যে ব্যক্তি মজুরিতে মজুর রেখে তার নিকট হতে পূর্ণ কাজ নিয়েছে, অথচ তার মজুরি পূর্ণ করেনি। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীসে এমন তিন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর ক্রোধের শিকার হবে। তন্মধ্যে প্রথম হলো– যে ব্যক্তি আল্লাহর কসম খেয়ে কোনো অঙ্গীকার করে আবার তা ভঙ্গ করে। এমনিতেই অঙ্গীকার পূরণ করা একটি জরুরি বিষয়। কেননা, মানুষের আভিজাত্য ও মানবতার দাবি হলো অঙ্গীকার করলে তা পূর্ণ করা, বিনা কারণে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা আভিজাত্যের পরিপন্থি। তদুপরি সে অঙ্গীকার যদি আল্লাহর নামে করা হয়, তাহলে তা পূরণ করা অধিকতর গুরুত্ব বহন করে। একারণেই আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে সত্যিকার অর্থেই সে আল্লাহর ক্রোধের উপযুক্ত হবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো, যে স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে। মানবতার আভিজাত্যের অবমাননা এর চেয়ে অধিক আর কি হতে পারে, একজন মানুষ তারই ন্যায় আর একজনকে বাজারী পণ্যে পরিণত করে তার ক্রয়বিক্রয় করে। এমন ব্যক্তিও কিয়ামতের দিন আল্লাহর ক্রোধের উপযুক্ত হবে।

তৃতীয় হলো ঐ ব্যক্তি যে কোনো শ্রমিককে নিজের কোনো কাজে নিযুক্ত করে এবং স্বীয় কার্যসিদ্ধির পর তার পারিশ্রমিক না দেয়। এটি একটি ঘৃণিত কাজ। শ্রম হলো মানবদেহের একটি মূল্যবান পুঁজিস্বরূপ, যা অর্জন করে তার পারিশ্রমিক না দেওয়া মানবতার চরিত্রের পরিপন্থি। একজন দরিদ্র মানুষ দু-মুঠো অন্নের জন্য দেহের রক্ত পানি করে কারো জন্য শ্রম দিয়ে থাকে আর তার পারিশ্রমিক দেওয়া হবে না, এর চেয়ে জঘন্য অন্যায় আর কি হতে পারে।

শব্দ-বিশ্লেষণ : خَصْمٌ : এটি একবচন, বহুবচনে خُصُوْمٌ অর্থ– বিপক্ষ, বাদী।

اِسْتَأْجَرَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْلْ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْفْ বাবে اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِيْجَارُ অর্থ– শ্রমিক নিয়োগ করা।

اَجِيْرٌ : একচন, বহুবচনে اَجَرَاءُ অর্থ– শ্রমিক।

اِسْتَوْفٰى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْلْ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْفْ বাবে اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِيْفَاءُ অর্থ– পরিপূর্ণ লাভ করা।

وَعَنِ ٢٨٥٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ نَفَرًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوْا بِمَاءٍ فِيْهِمْ لَدِيْغٌ اَوْ سَلِيْمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيْكُمْ مِنْ رَاقٍ اِنَّ فِى الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيْغًا اَوْ سَلِيْمًا فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَاَ بِفَاتِحَةِ

২৮৫৫. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ -এর সাহাবীদের মধ্যে একদল এক পানির কূপওয়ালাদের নিকট পৌছলেন, যাদের একজনকে বিচ্ছু অথবা সাপে দংশন করেছিল। কূপওয়ালাদের এক ব্যক্তি এসে বলল, আপনাদের মধ্যে কোনো মন্ত্র জানা লোক আছে কি? এ পানির ধারে একজন বিচ্ছুতে কাটা বা সাপে কাটা লোক রয়েছে। তখন তাঁদের মধ্য হতে একজন [হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)] গেলেন এবং কতক ভেড়ার

اَلْكِتَابِ عَلٰى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ اِلٰى اَصْحَابِهٖ فَكَرِهُوْا ذٰلِكَ وَقَالُوْا اَخَذْتَ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ اَجْرًا حَتّٰى قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخَذَ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ اَجْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَقَّ مَا اَخَذْتُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا كِتَابُ اللّٰهِ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِيْ رِوَايَةٍ اَصَبْتُمْ اَقْسِمُوْا وَاضْرِبُوْا لِيْ مَعَكُمْ سَهْمًا ـ

বিনিময়ে তার উপর সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিলেন। এতে সে ভালো হয়ে গেল এবং সাহাবী ভেড়াগুলি নিয়ে আপন সহচরদের নিকট আসলেন। তাঁরা এটা অপছন্দ করলেন এবং বলতে লাগলেন, আপনি কি আল্লাহর কিতাবের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিলেন? অবশেষে তাঁরা মদিনায় পৌঁছলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইনি কিতাবুল্লাহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা যেসব জিনিসের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে থাক, তাদের মধ্যে হলো কিতাবুল্লাহ অধিকতর উপযোগী। -[বুখারী]

অপর এক বর্ণনায় আছে, তোমরা ঠিক করেছ, তা ভাগ কর এবং আমার জন্যও তোমাদের সাথে এক ভাগ রাখ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ هٰذَا الصَّحَابِيْ : সেই সাহাবী কে ছিলেন? যিনি সূরা ফাতিহা পড়েছিলেন। সে সম্পর্কে সঠিক কথা হলো, তিনি ছিলেন হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)। আর সে দলে ৩০ জন লোক ছিলেন, এ কারণে তিনি সূরা ফাতেহা পড়ার বিনিময়ে ৩০ টি বকরি নিয়েছিলেন।

قَوْلُهٗ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلٰى شَاءٍ فَبَرَأَ -এর ব্যাখ্যা : যখন তারা একজন মন্ত্রকারী লোক খুঁজছিল, তখন হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বললেন- আমি এ শর্তে তোমাদের সর্প দংশিত ব্যক্তিকে ফুঁক দেব যে, তার বিনিময়ে তোমরা আমাকে ৩০টি বকরি দেবে। তারা এ শর্তে রাজি হলে তিনি তাকে সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিলেন এবং লোকটি সুস্থ হয়ে গেল। কেননা, সূরা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ

قَوْلُهٗ فَكَرِهُوْا ذٰلِكَ -এর ব্যাখ্যা : رُقْيَةٌ বা ঝাড়ফুঁক করে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ হবে কিনা, সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

১. হযরত শা'বী, কাতাদাহ, সাঈদ ইবনে জুবাইর প্রমুখগণের মতে رُقْيَةٌ বা ঝাড়ফুঁক করা মাকরূহ; বরং তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি হওয়ার কারণে তা হতে বিরত থাকা ওয়াজিব। তাঁদের দলিল হলো-

١ـ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَمَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ الخ ـ

٢ـ وَاسْتَدَلُّوْا بِحَدِيْثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضـ) اَنَّهٗ كَانَ يَنْهٰى عَنِ الْكَيِّ فَابْتُلِيَ مَكَانَ يَقُوْلُ لَقَدْ اِكْتَوَيْتُ لَبْتَهٗ بِنَارٍ فَمَا اَبْرَاَتْنِيْ مِنْ اِثْمٍ وَلَا شَفَتْنِيْ مِنْ سَقَمٍ ـ (رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ)

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) যখন দাগ দেওয়া দ্বারা সুস্থ না হওয়ার কারণে তাওয়াক্কুল করেছেন, তদ্রূপ সকলেরই তাওয়াক্কুল করা উচিত।

২. ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী, আহমদ, হাসান বসরী, নাখঈ (র.) প্রমুখগণের মতে, لَا بَأْسَ بِالرُّقٰى কুরআন দ্বারা ঝাড়ফুঁক করলে কোনো অসুবিধা নেই। তাঁদের দলিল হলো-

١ـ لِحَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اِنَّ نَفَرًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوْا بِمَاءٍ فِيْهِ لَدِيْغٌ وَفِيْهِ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلٰى شَاءٍ فَبَرَأَ ـ

যখন সাহাবী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) সর্প দংশিত ব্যক্তিকে সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিলেন তখন যে সুস্থ হয়ে গেল। এ খবর হুজুর ﷺ শুনে তার প্রশংসাই করলেন না; বরং সে বিনিময়ের অংশ নিতে চাইলেন। বুঝা গেল তা অবশ্যই বৈধ।

প্রতিপক্ষের জবাব : এ ধরনের ঝাড়ফুঁক তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয়; বরং এ ধরনের করাটাই তার তাকদীরে লেখা ছিল। আর হযরত ইমরান ইবনে হুসাইনের হাদীসে যে সুস্থ না হওয়ার কথা উল্লেখ আছে, তা দ্বারা নাজায়েজ প্রমাণিত হয় না।

–[আইনী- খ. ৫, পৃ. ৬৫৩; তানযীম- খ. ২. পৃ. ৫১]

قَوْلُهُ إِنَّ اَحَقَّ مَا اَخَذْتُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا **-এর বিশ্লেষণ :** কুরআন শিক্ষা দিয়ে তার বিনিময় গ্রহণ বৈধ হবে কিনা সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে–

১. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও মালেক (র.)-এর নিকট কুরআন শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক নেওয়া বৈধ। তাঁদের দলিল হলো بَابْ -এর এই হাদীস।

২. ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও مُتَقَدِّمِيْنَ হানাফীগণে মতে এর বিনিময়ে গ্রহণ অবৈধ। তাঁদের দলিল হলো–

١. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ (رض) اَنَّهُ (ع) اِتَّخَذَ مُؤَذِّنًا لَا يَاْخُذُ عَلٰى اَذَانِهِمْ اَجْرًا .

٢. اِتَّبِعُوْا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ .

قَوْلُ الْمُفْتٰى بِهِ **[সিদ্ধান্ত কথা] :** কিন্তু مُتَاَخِّرِيْنَ হানাফীগণ জামানার অবস্থার পরিবর্তনের কারণে সর্বসম্মতিক্রমে তাঁদের পূর্বের মত পরিবর্তন করে নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কুরআন শিক্ষা, নামাজের ইমামতি, আজান ইত্যাদির বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ বৈধ।

হেদায়ার মধ্যে লিখেছেন–

قَالَ فِى الْهِدَايَةِ وَبَعْضُ مَشَائِخِنَا (رح) اِسْتَحْسَنُوا الْاِسْتِيْجَارَ عَلٰى تَعْلِيْمِ الْقُرْاٰنِ لِظُهُوْرِ التَّوَانِىْ فِى الْاُمُوْرِ الدِّيْنِيَّةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى .

– [আইনী- খ. ৫, পৃ. ৬৪৭]

শব্দ-বিশ্লেষণ : نَفَرٌ : এটি একবচন, বহুবচনে اَنْفَارٌ অর্থ– দল, ব্যক্তি।

لَدِيْغٌ : এটি একবচন, বহুবচনে لُدَغٰى অর্থ– দংশিত, দংশনাহত।

سَلِيْمٌ : এটি একবচন, বহুবচনে سَلْمٰى অর্থ– সর্প দংশিত, সাপেকাটা। আল্লামা ত্বীবী (র.) বলেছেন, সাধারণত বিচ্ছু দংশিত ব্যক্তিকে لَدِيْغٌ এবং সর্প দংশিত ব্যক্তিকে سَلِيْمٌ হলো হয়। আর এখানে اَوْ শব্দটি সন্দেহের জন্য, অর্থাৎ বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে যে, লোকটি সর্প দংশিত নাকি বিচ্ছু দংশিত।

رَاقٍ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْمُ فَاعِلْ বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلرُّقْيَةُ অর্থ– মন্ত্রকারী।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٨٥٦ - عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ اَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْنَا عَلٰى حَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالُوْا اِنَّا اُنْبِئْنَا اَنَّكُمْ قَدْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هٰذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ اَوْ رُقْيَةٍ فَاِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوْهًا فِى الْقُيُوْدِ فَقُلْنَا نَعَمْ فَجَاءُوْا بِمَعْتُوْهٍ فِى الْقُيُوْدِ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلٰثَةَ

২৮৫৬. অনুবাদ : তাবেয়ী খারেজা ইবনে সালত (র.) তাঁর চাচা [সাহাবী] হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হতে রওয়ানা করলাম এবং একটি আরব গোত্রের নিকট পৌঁছলাম। তারা বলল, আমরা সংবাদ পেয়েছি, আপনারা এ ব্যক্তির [রাসূলুল্লাহর] নিকট হতে কল্যাণ [কুরআন] নিয়ে এসেছেন। আপনাদের নিকট কি কোনো ঔষধ বা মন্ত্র আছে? আমাদের নিকট বন্ধনে আবদ্ধ একটি পাগল আছে। আমরা বললাম, হ্যাঁ, আছে। তারা বন্ধন সহকারে পাগলটাকে নিয়ে আসল। আমি তিনদিন যাবৎ সকাল-বিকাল তার উপর

أَيَّامٍ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً أَجْمَعُ بُزَاقِي ثُمَّ أَتْفُلُ قَالَ فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطُونِي جُعْلًا فَقُلْتُ لَا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ كُلْ فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقٍّ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

এরূপে সূরা ফাতিহা পড়লাম, আমি আমার থুথু একত্র করে তার উপর থুকতাম। তিনি বলেন, এতে সে যেন হঠাৎ বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে গেল। অতঃপর তারা আমাকে কিছু পারিশ্রমিক দিল। আমি বললাম, না [তা আমি খাব না], যাবৎ না আমি নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করি। [অতঃপর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম।] তিনি বললেন, খাও! আমার জীবনের শপথ, অবশ্য যে ব্যক্তি বাতিল মন্ত্র দ্বারা খায় [সে খায় বাতিল পন্থায়], আর তুমি খাচ্ছ সত্য মন্ত্র দ্বারা। -[আহমদ ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى قَوْلِهِ فَلَعَمْرِي [فَلَعَمْرِي -এর অর্থ] : "আমার জীবনের কসম" হুজুর ﷺ নিজের জীনের শপথ করেছেন, অথচ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করা জায়েজ নয়, তাহলে তিনি কেন কসম খেয়েছেন? তার উত্তর হলো- فَلَعَمْرِي দ্বারা কসম উদ্দেশ্য নয়; বরং আরবদের স্বভাবসুলভে একথা বলেছেন। কেননা, আরবরা কথার ফাঁকে ফাঁকে এ শব্দ বলে থাকে। অথবা বলা যায় যে, এটা ঐ সময়ের কথা যখন غَيْرُ اللّٰهِ -এর নামে কসম খাওয়া নিষিদ্ধ হয়নি।

আল্লামা ত্বীবী (র.) বলেন, সম্ভবত হুজুরের জন্য এ ধরনের কসম খাওয়ার অনুমতি ছিল। সুতরাং তা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য যা অন্যের জন্য জায়েজ নয়।

مَا هِيَ رُقْيَةٌ بَاطِلَةٌ [বাতিল মন্ত্র কি?] : 'বাতিল মন্ত্র' এমন ঝাড়ফুঁককে বলা হয়, যা তারকা, খবিস আত্মা, জিন ও আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য জিনিসের নামে করা হয় এবং তাদের থেকে সাহায্য কামনা করা হয়। সুতরাং সে ধরনের তাবিজ ও ঝাড়ফুঁক সম্পূর্ণরূপে অবৈধ এবং তার বিনিময় গ্রহণও অবৈধ।

لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقٍّ -এর বিশ্লেষণ : "তুমি খাচ্ছ সত্য মন্ত্র দ্বারা" সত্য মন্ত্র বলতে এমন ঝাড়ফুঁক উদ্দেশ্য যা আল্লাহর নাম, কুরআনের আয়াত ও নেককারগণের আমল দ্বারা করা হয়, চাই তা তাবিজের আকারে হোক বা ঝাড়ফুঁক হোক- সর্বাবস্থায়ই জায়েজ এবং এর বিনিময় গ্রহণও বৈধ।

শব্দ-বিশ্লেষণ : مَعْتُوهٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْمُ مَفْعُوْلٌ বাবে سَمِعَ মাসদার اَلْعَتَاهِيَةُ অর্থ- উন্মাদ হওয়া, বেহুঁশ হওয়া।
اَلْقُيُوْدُ : এটি বহুবচন, একবচনে قَيْدٌ অর্থ- বেড়ি, বন্ধন।

وَعَنْ ٢٨٥٧ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

২৮৫৭. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক তার ঘাম শুকানোর পূর্বেই আদায় করে দেবে। -[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দ-বিশ্লেষণ : يَجِفُّ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْلْ مُضَارِعْ مَعْرُوْفْ বাবে نَصَرَ মাসদার اَلْجَفُّ অর্থ- শুকিয়ে যাওয়া।

وَعَنْ ٢٨٥٨ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَفِي الْمَصَابِيْحِ مُرْسَلٌ)

২৮৫৮. অনুবাদ : হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যাচনাকারীর হক রয়েছে, যদিও সে ঘোড়ায় চড়ে আসে। -[আহমদ ও আবূ দাউদ, আর মাসাবীহতে মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : এ হাদীসের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ কথার শিক্ষা দেওয়া যে, সওয়ালকারীকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত নয়। যদি সে ঘোড়ায় চড়েও ভিক্ষা করতে আসে তবুও তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা উচিত। অর্থাৎ তাকে সচ্ছল মনে হলেও তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত নয়। কেননা, তার যদি একান্তই প্রয়োজন না হতো তাহলে সে ভিক্ষার হস্ত প্রসারিত করে নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করত না।

وَجْهُ مُنَاسَبَةِ الْحَدِيْثِ بِالْبَابِ **[বাবের সাথে হাদীসের সম্পর্ক]** : বাহ্যিকভাবে এ হাদীসের بَابٌ -এর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। তদুপরি বলা যায় যে, ভিক্ষুককে যা কিছু দেওয়া হয় তা মূলত তার ভিক্ষার أُجْرَتٌ বা পারিশ্রমিক। এ সামান্য মিলের কারণে এ হাদীসকে এখানে আনা হয়েছে।

এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে ইমাম আহমদ (র.) বলেছেন, এ হাদীসের কোনো ভিত্তি নেই; বরং এটি বাজারি হাদীস। ইমাম আবূ দাউদ (র.)-এর ব্যাপারে মন্তব্য করা থেকে নিরবতা অবলম্বন করেছেন। যা এ কথারই প্রমাণ গ্রহণ করে যে হাদীসটি সহীহ। মাসাবীহ গ্রন্থে এটিকে مُرْسَلٌ বলা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٨٥٩ - عَنْ عُتْبَةَ بْنِ النُّدَّرِ (رض) قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَأَ طٰسٓمٓ حَتّٰى بَلَغَ قِصَّةَ مُوْسٰى قَالَ اِنَّ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ اَجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانَ سِنِيْنَ اَوْ عَشْرًا عَلٰى عِفَّةِ فَرْجِهٖ وَطَعَامِ بَطْنِهٖ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৮৫৯. অনুবাদ : হযরত ওতবা ইবনে নুদ্দার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গেলাম, তিনি [সূরা কাসাসের] 'তা' 'সীন' 'মীম' হতে পড়তে আরম্ভ করে হযরত মূসার কাহিনী পর্যন্ত পৌঁছে বললেন, হযরত মূসা (আ.) মহর ও পানাহারের বিনিময়ে আট কি দশ বৎসর নিজেকে মজুরিতে খাটিয়েছিলেন। -[আহমদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَقَرَأَ طٰسٓمٓ حَتّٰى بَلَغَ قِصَّةَ مُوْسٰى الخ **-এর বিশ্লেষণ : طٰسٓمٓ** অর্থাৎ সূরা কাসাসে হযরত মূসা (আ.)-এর আলোচনা রয়েছে। সেখানে রয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) মাদইয়ান পৌঁছেন, সেখানে হযরত শোয়াইব (আ.)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর তাঁর কন্যার সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর বিবাহ হয়, যার বিনিময়ে হযরত মূসা (আ.) হযরত শোয়াইব (আ.)-এর শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। হুজুর ﷺ এ সূরা তেলাওয়াতের সময় হযরত মূসা (আ.)-এর এ ঘটনায় পৌঁছে উপরিউক্ত মন্তব্য করেন।

قَوْلُهُ عِفَّةِ فَرْجِهٖ **-এর ব্যাখ্যা :** "লজ্জাস্থানকে নিষ্কলুষ রাখার জন্য" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিবাহ করা। যার বিবরণ হলো, হযরত মূসা (আ.) হযরত শোয়াইব (আ.)-এর কন্যাকে বিবাহ করেন এ শর্তে যে, ৮/১০ বৎসর আপনার বকরি চরাব। সুতরাং নির্দিষ্ট দিনের বকরি চরানোর শ্রমকে তিনি মহর নির্ধারণ করেন। কেননা, তাঁদের শরিয়তে এ বিধান জায়েজ ছিল স্বাধীন ব্যক্তির-শ্রমকে তার স্ত্রীর মহর নির্ধারণ করা, অথবা বলা যায় যে, হযরত মূসা (আ.) স্ত্রীর মহর তো অন্যভাবে আদায় করেছেন, আর বকরি চরানোটাকে তাদের প্রতি অনুগ্রহস্বরূপ করেছিলেন।

هَلْ يَجُوْزُ الْخِدْمَةُ مَهْرًا؟ **[সেবা মহর হওয়া জায়েজ কিনা?]** : সেবা মহর হতে পারবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। হানাফী আলেমগণের নিকট এ ধরনের বিবাহ জায়েজ হবে না যে, কোনো মহিলার বিবাহ এ শর্তে হয় যে, তার স্বাধীন স্বামী নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় তার সেবা করবে। তবে স্বামীর গোলাম বা কর্মচারী স্ত্রীর সেবা করবে এ শর্তে হলে জায়েজ আছে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে কিছু কাজের পারিশ্রমিক এবং সেবার বিনিময়ে বিবাহ করা জায়েজ আছে। তবে مُسْتَاجَرٌ لَهٗ -এর مَخْدُوْمٌ فِيْهِ নির্দিষ্ট হতে হবে।

وَعَنْ ٢٨٦٠ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضـ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَجُلٌ اَهْدٰى اِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ اُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْاٰنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ فَارْمِيْ عَلَيْهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ اِنْ كُنْتَ تُحِبُّ اَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৮৬০. **অনুবাদ :** হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক ব্যক্তি– যাকে আমি লেখা এবং কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলাম, সে আমার জন্য একটি ধনুক উপহার পাঠিয়েছে, যা মূল্যবান কোনো মাল নয়, সুতরাং আমি কি তা দিয়ে জিহাদে তীর মারতে পারি? তিনি বললেন, যদি তুমি দোজখের শিকল গলায় পরতে ভালোবাস, তবে তা গ্রহণ করতে পার।

–[আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "ধনুক কোনো মূল্যবান মাল নয়" একথার দ্বারা হযরত ওবাদার উদ্দেশ্য ছিল ধনুক এমন কোনো জিনিস নয়, যাকে সম্পদ বা পারিশ্রমিক হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে; বরং এটি হলো একটি সমর সরঞ্জাম, যাকে আমি আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহার করব। কিন্তু হুজুর ﷺ তাকে এই বলে সতর্ক করে দিলেন যে, এ ধনুক যদিও কুরআন শিক্ষা দেওয়ার পারিশ্রমিক হিসেবে পাওনি, আর যদিও এটি এমন মাল নয়– যাকে পারিশ্রমিক ধর্তব্য করা যায়, এতদসত্ত্বেও এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এর দ্বারা তোমার একনিষ্ঠতা নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং তোমার জন্য তা গ্রহণ না করাই সমীচীন। কুরআন শিক্ষার বিনিময় গ্রহণ বৈধ হবে কিনা তার বিস্তারিত আলোচনা এ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে দ্রষ্টব্য।

بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَالشِّرْبِ
পরিচ্ছেদ : অনাবাদি জমি আবাদ করা ও সেচের পালা

اَلْمَوَاتُ : শব্দের অর্থ হলো– অনাবাদি জমি। আর পরিভাষায় اَلْمَوَاتُ বলা হয়, নেহায়া গ্রন্থকারের মতে 'এমন জমি যাতে না আবাদ হয়, না বসবাস করা হয়, আর না তা যে কোনো কাজের উপযোগী হয়।' আর হেদায়া গ্রন্থকারের মতে যা পানিশূন্যতা বা অধিকাংশ সময় পানির নীচে থাকার কারণে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়।

اَلْاِحْيَاءُ শব্দটি বাবে اِفْعَالٌ -এর মাসদার। অর্থ– জীবিত করা। সুতরাং اِحْيَاءُ الْمَوَاتِ শব্দটির সমষ্টিগত অর্থ হলো– অনাবাদি জমি আবাদ করা।

اَلشِّرْبُ : শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো– পানীয়, পানের উপযোগী পানি, পানির অংশ, পানের সময়, ঘাট ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থ হলো– وَفِى الشَّرِيْعَةِ عِبَارَةٌ عَنْ نَوْبَةِ الْاِنْتِفَاعِ بِالْمَاءِ سُقْيًا لِلْمَزَارِعِ اَوِ الدَّوَابِّ

শরিয়তের পরিভাষায় شِرْبٌ বলা হয়, পানি থেকে উপকৃত হওয়ার এমন অধিকারকে যা পান করা, ব্যবহার করা, সেচ দেওয়া ও পশুদেরকে পান করানোর জন্য অর্জিত হয়। সুতরাং পানি যতক্ষণ তার স্বস্থানে যেমন– সমুদ্র, পুকুর ইত্যাদিতে থাকে, ততক্ষণ তাতে বাধা দেওয়ার অধিকার কারো থাকবে না। কেননা, তা হতে উপকৃত হওয়া চন্দ্র-সূর্যের আলো হতে উপকৃত হওয়ার ন্যায়। আল্লাহ তা'আলা এ নিয়ামতসমূহকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। চন্দ্র-সূর্যের আলো থেকে কাউকে বাধা দেওয়ার অধিকার যেমন কারো নেই, তদ্রূপ সমুদ্রের পানি হতে উপকৃত হওয়া থেকে বাধা দেওয়ার অধিকারও কারো নেই। ইসলামি শরিয়তের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আইনেও তা নিষিদ্ধ। সুতরাং প্রতিবেশী রাষ্ট্র কর্তৃক ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে বাংলাদেশের জনগণকে পানির এ ব্যাপক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ইসলামি শরিয়ত ও আন্তর্জাতিক আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٨٦١ عَائِشَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ عَمَرَ اَرْضًا لَيْسَتْ لِاَحَدٍ فَهُوَ اَحَقُّ قَالَ عُرْوَةُ قَضَى بِهِ عُمَرُ فِىْ خِلَافَتِهِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

২৮৬১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এমন জমিন আবাদ করে যা কারো মালিকানায় নয়– সে-ই তার হকদার। তাবেয়ী ওরওয়া ইবনে যুবায়ের (র.) বলেন, হযরত ওমর (রা.)ও তাঁর খেলাফতকালে এ হুকুম দিয়েছিলেন। [সুতরাং এটা মনসুখ নয়।] –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অনাবাদি ও পতিত জমি যে আবাদ করবে সে তার মালিক হবে কিনা সে ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে–

১. ইমাম শাফেয়ী ও সাহেবাইন (র.)-এর মতে, যে জমির কোনো মালিক জানা নেই– যদি কেউ বৃক্ষ রোপণ, গৃহ নির্মাণ ইত্যাদির দ্বারা তাকে আবাদ করে, তাহলে তা লোকালয়ের কাছাকাছি হোক বা না হোক সে তার মালিক হয়ে যাবে। রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতির কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁদের দলিল হলো–

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّهُ قَالَ مَنْ عَمَرَ اَرْضًا لَيْسَتْ لِاَحَدٍ فَهُوَ اَحَقُّ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

২. ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, সে জমি যদি লোকালয়ের নিকটবর্তী হয়, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ব্যতিরেকে শুধু আবাদ করার দ্বারা মালিক হবে না।

৩. ইমাম আবূ হানীফা, ইবরাহীম নাখঈ, ইবনে সীরীন (র.) প্রমুখগণের মতে এবং ইমাম মালেকের এক قَوْلٌ অনুযায়ী জমি লোকালয়ের নিকটবর্তী হোক বা না হোক রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ব্যতিরেকে শুধু আবাদ করার দ্বারা মালিক হবে না। তাঁদের দলিল হলো–

১. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّهُ قَالَ لَا حِمَى اِلَّا لِلّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ ـ

"حِمًى" এমন জমিকে বলা হয় যা সংরক্ষণ করা হয়। আর এ সংরক্ষণের মালিক হলো একমাত্র আল্লাহ ও রাসূল এবং তাঁদের খলিফা তথা রাষ্ট্রপ্রধান।

২. اِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لَيْسَ لِلْمَرْءِ اِلَّا الْاَرْضِيْنَ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ اِمَامِهِ ـ

তাছাড়া সে জমিতে সকল মুসলমানদের হক রয়েছে। সুতরাং বাদশাহর অনুমতি ব্যতীত তা কোনো একজন কুক্ষিগত করতে পারবে না।

প্রতিপক্ষের জবাব : হযরত আয়েশা (র.) -এর হাদীসের উত্তরে হেদায়া গ্রন্থকার বলেন–

১. এটি হলো مُطْلَقْ হাদীস, যাকে مُقَيَّدْ -এর উপর مَحْمُوْل করা হবে।

২. এ হাদীসে কোনো গোষ্ঠীবিশেষের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়েছিল, যা দ্বারা كُلِّى বা ব্যাপক হুকুম প্রমাণিত হবে না।

৩. এ হাদীসে تَاوِيْل বা ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু হানাফীদের হাদীস অকাট্য, তাই হানাফীদের মাযহাবই প্রাধান্য পাবে।

–[হিদায়া- খ. ৪, পৃ. ৪৬২; আইনী- খ. ৫, পৃ. ৭২২]

٢٨٦٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا حِمَى اِلَّا لِلّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৮৬২. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, হযরত সা'ব ইবনে জাছ্ছামা (রা.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত চারণভূমি রক্ষিত করার অধিকার কারো নেই। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حِمًى **-এর অর্থ :** শব্দটির [ح বর্ণে যেরযোগে] অর্থ– এমন বিচরণ ভূমিকে বলা হয়, যা পশুর জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা হয় এবং কাউকে তাতে বিচরণ করতে দেওয়া হয় না।

সুতরাং হাদীসের অর্থ হবে এটা সমীচীন হবে না যে, আল্লাহ ও রাসূলের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো বিচরণ ভূমিকে ব্যক্তিবিশেষের জন্য নির্দিষ্ট করা এবং অন্যের পশুকে সেখানে বিচরণ করতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। হুজুর ﷺ সদকা ও যুদ্ধের উটের জন্য বিচরণ ভূমি নির্দিষ্ট করেছিলেন।

اَلْمُنَاسَبَةُ **[প্রসঙ্গ] :** কাযী আয়ায (র.) বলেন যে, জাহিলিয়া যুগে আরব নেতাদের নিয়ম ছিল যে, তারা অধিক তৃণসমৃদ্ধ ভূমিকে নিজেদের পশুপালের বিচরণের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখত এবং সেখানে অন্যের পশুদের বিচরণের অনুমতি থাকত না। এ কারণেই হুজুর ﷺ এ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন।

هَلْ يَجُوْزُ ذٰلِكَ الْاٰنَ **[বর্তমানে এটা জায়েজ হবে কি না?] :** একক ব্যক্তি স্বার্থের জন্য নয়; বরং ব্যাপক মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বার্থে এরূপ করা জায়েজ হবে কিনা সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। এ হাদীসের ভিত্তিতে কেউ বলেন, তা পরবর্তী কোনো যুগের জন্য জায়েজ হবে না। আবার কেউ বলেন, ব্যাপক মুসলিম জনস্বার্থে তা জায়েজ হবে। যেমন– হুজুর ﷺ মুসলিম স্বার্থে বিচরণ ভূমি নির্দিষ্ট করেছিলেন। –[মেরকাত- খ. ৬, পৃ. ১৪০]

٢٨٦٣ - وَعَنْ عُرْوَةَ (رض) قَالَ خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ فِىْ شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ اَرْسِلِ الْمَاءَ اِلٰى جَارِكَ فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ اِنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ

২৮৬৩. **অনুবাদ :** তাবেয়ী হযরত ওরওয়া (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাররা হতে প্রবাহিত নালার পানি বণ্টন সম্পর্কে [আমার পিতা] যুবায়েরের এক আনসারের সাথে বিবাদ হলো। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, যুবায়ের! তুমি তোমার জমিনে পানি দাও, অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর জমিনের দিকে ছেড়ে দাও। আনসারী বলে উঠল– আপনার ফুফাতো ভাই,

فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ اِسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَى الْجَدْرِ ثُمَّ اَرْسِلِ الْمَاءَ اِلٰى جَارِكَ فَاسْتَوْعَى النَّبِيُّ ﷺ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِيْ صَرِيْحِ الْحُكْمِ حِيْنَ اَحْفَظَهُ الْاَنْصَارِيُّ وَكَانَ اَشَارَ عَلَيْهِمَا بِاَمْرٍ لَهُمَا فِيْهِ سَعَةٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

তাইতো। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। এবার তিনি বললেন, যুবায়ের! তুমি তোমার জমিনে পানি দাও, অতঃপর তা আটকে রাখ যাতে পানি আইল পর্যন্ত পৌঁছে, অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর জমিনের দিকে ছেড়ে দাও। এখন নবী করীম ﷺ স্পষ্ট নির্দেশ দ্বারা যুবায়েরকে তার পূর্ণ হক দিয়ে দিলেন, যখন আনসারী তাঁকে রাগান্বিত করল, আর প্রথমে তাদেরকে এমন নির্দেশ দিয়াছিলেন যাতে উভয়ের সুবিধা ছিল। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : উক্ত ঘটনার বিবরণ এ রকম যে, জনৈক আনসারীর জমির সাথে হযরত যুবায়ের (রা.)-এর জমি মিলিত ছিল এবং একই নালা দিয়ে তারা জমিতে পানি সেচ দিত। পানি নেওয়াকে কেন্দ্র করে একবার তাদের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। আনসারীর দাবি হলো সে প্রথমে পানি দেবে, আর হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন যে, আমি আগে পানি দেব। অবশেষে এর সমাধানের জন্য তারা হুজুর ﷺ -এর শরণাপন্ন হন।

এদিকে হযরত যুবায়ের (রা.)-এর জমি ছিল উচ্চ অংশে এবং নালার নিকটবর্তী, আর আনসারীর জমি ছিল নিম্ন অংশে এবং নালা থেকে দূরে। নিয়মানুযায়ী সর্বপ্রথম সেচ দেওয়ার অধিকার হযরত যুবায়ের (রা.)-এরই প্রাপ্য। এ সমস্ত দিক বিবেচনা করেই হুজুর ﷺ ন্যায়সঙ্গত রায় দিলেন যে, প্রথমে যুবায়ের তার জমিতে সেচ দেবে অতঃপর তার প্রতিবেশী পানি দেবে। সততা ও ন্যায়-নীতির অবক্ষয় কবলিত মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম হলো এই যে, যখন সে কোনো ব্যাপারে হকের উপর না থাকে এবং এ কারণেই ফয়সালা তাদের মনমতো না হয়, তখন সে তা মেনে নেওয়ার পরিবর্তে বিচারককে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করে। এক্ষেত্রে তাই হলো। কেননা, উক্ত আনসারী যেহেতু হকের উপর ছিল না তাই রাসূল ﷺ কর্তৃক প্রদেয় রায় তার মনঃপূত না হওয়ায় সে উক্ত রায় মানার পরিবর্তে উল্টা সে রাসূল ﷺ -কে দোষারোপ করে বলল, "যুবায়ের আপনার ফুফাতো ভাই তো, সেজন্য এমন সিদ্ধান্ত দিলেন।" এভাবে সে হুজুর ﷺ -কে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে অভিযুক্ত করল, যা একজন ন্যায়বিচারক মানুষের মানসিক কষ্ট প্রদানের জন্য যথেষ্ট।

এতদশ্রবণে রাসূলের মানসিকতা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, ক্রোধে ফেটে পড়লেন, চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যায় এবং ক্রোধান্বিত হয়ে পূর্বের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে [যাতে আনসারীরও কিছুটা সুবিধা ছিল] বললেন, হে যুবায়ের! এখন তুমি স্বীয় হক পূর্ণভাবে গ্রহণ কর এবং প্রথমে জমিতে পানি নিয়েই ক্ষান্ত হবে না, বরং পূর্ণভাবে জমিতে সেচ দাও এবং আইল পর্যন্ত পানি পূর্ণ করে অতঃপর আনসারীর জমিতে পানি ছাড়বে।

হুজুরের এ সিদ্ধান্তের সারমর্ম হলো এই যে, সর্বপ্রথম তিনি যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, তাতে হযরত যুবায়েরের প্রতি ইঙ্গিত ছিল, স্বীয় হকের কিছু অংশ প্রতিবেশীর জন্য ছেড়ে দাও, যাতে তোমার স্বার্থ উদ্ধার হবে। যা হলো পূর্ণ ইনসাফ। আর আনসারীর প্রতিও সহমর্মিতা প্রদর্শন হবে, যদিও তা তোমার উপর ওয়াজিব নয়। কিন্তু যখন সে এ সিদ্ধান্ত মানল না তখন তিনি যুবায়েরকে বললেন, এবার তুমি তোমার পূর্ণাঙ্গ অধিকার গ্রহণ করে নাও।

হযরত যুবায়ের (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী : হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়ের ইবনে আল-আওয়াম ছিলেন একজন সুউচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন তাবেয়ী। তৎকালীন যুগে মদিনায় যে সাতজন বিশিষ্ট ফকীহ ছিলেন এবং যাদের ইলম ও প্রজ্ঞার কারণে সকলে প্রভাবান্বিত ছিল, তার মধ্যে হযরত ওরওয়া (র.) ছিলেন অন্যতম। তাঁর সম্মানিতা মাতা ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা.)-এর কন্যা হযরত আসমা (রা.), আর তাঁর পিতা ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী ও হুজুর ﷺ -এর ফুফু হযরত সাফিয়্যাহ (রা.)-এর সাহেবজাদা হযরত যুবায়ের (রা.)। হযরত যুবায়ের (রা.) ছিলেন প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর। ইসলাম গ্রহণের কারণে স্বীয় চাচার পক্ষ থেকে তিনি বিভিন্ন ধরনের জুলুম-নির্যাতনের শিকার হন। ইললাম ধর্ম ত্যাগ করার জন্য তাকে শাস্তিস্বরূপ প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ফেলে রাখা হতো। কিন্তু ঈমানের বলে বলীয়ান এ টগবগে জোয়ান সমস্ত জুলুম-নির্যাতন সহ্য করে সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হওয়ার পরিবর্তে সম্মুখেই অগ্রসর হতে লাগলেন। তিনি হুজুর ﷺ

-এর নেতৃত্বে পরিচালিত সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং ইসলামের সুমহান পতাকা উড্ডীন করার নিমিত্তে সকল প্রকার বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্যের পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। যে দশজন সৌভাগ্যবান সাহাবায়ে কেরামকে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছিল, [যাদেরকে "عَشَرَةُ مُبَشَّرَةٌ" বলা হয়] তন্মধ্যে হযরত যুবায়ের (রা.) অন্যতম। আল্লাহর রাস্তার প্রথম তরবারি পরিচালনকারীও তিনিই ছিলেন।

ইন্তেকাল : ৩৬ হিজরিতে ওমর ইবনে জারমুক নামক জনৈক কাফেরের হাতে তিনি বসরার সফওয়ান নামক স্থানে নির্মমভাবে নিহত হন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। তাঁকে সিবা নামক উপত্যকায় সমাহিত করা হয়। পরবর্তীতে সেখান থেকে বসরায় স্থানান্তর করা হয়। প্রসিদ্ধ মত হলো তাঁর কবর সেখানেই অবস্থিত। তাঁর থেকে তাঁরই দুই সন্তান ওরওয়া এবং আবদুল্লাহ এবং অন্যান্যরাও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাদীসে উল্লিখিত আনসারী কে ছিল? কে ছিল সেই আনসারী যে হুজুর ﷺ -এর সাথে ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করেছিল এবং তার কারণইবা কি ছিল? এর উত্তরে কতেক ওলামায়ে কেরাম বলেন যে, সে ছিল মূলত মুনাফিক। আর তৎকালীন মুনাফিকদের স্বভাব ছিল যে, রাসূল ﷺ -এর সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অশালীন আচরণের মাধ্যমে হুজুরকে মানসিকভাবে কষ্ট দেওয়ার সুযোগ পেলে কোনোক্রমেই তা হাতছাড়া করত না। কিন্তু প্রশ্ন আসে যে, তাহলে তাকে 'আনসারী' বলা হলো কেন? তার উত্তর হলো, তাকে আনসারী বলার কারণ হলো সে আনসার সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আর আনসার সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু কিছু মুনাফিকও ছিল যেমন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই প্রমুখ। তারপরও প্রশ্ন থেকে যায় যে, সে যদি মুনাফিকই হয়ে থাকে এবং সে রাসূলের শানে এত জঘন্য ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও তাকে শাস্তিস্বরূপ হত্যা করা হলো না কেন? তার উত্তরে বলা হয় যে, তাকে হত্যা না করার কারণ হয়তো تَالِيْف বা হৃদ্যতাপূর্ণ ও সৌজন্যমূলক আচরণ দ্বারা তার অন্তর জয় করা বা ধৈর্য ধরা, যা হুজুর ﷺ বরবারই তাদের ব্যাপারে করে আসছিলেন। তদুপরি যদি তাকে হত্যা করা হতো তাহলে কাফিররা বলাবলি করার সুযোগ পেত যে, মুহাম্মদ ﷺ তো তার সাথিদেরকেও হত্যা করা হতে বিরত থাকে না। কেননা, মুনাফিকরা তো নিজেদেরকে বাহ্যিকভাবে মুসলমান এবং হুজুরের সাথি হওয়ার দাবি করত।

আবার কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, মূলত উক্ত আনসারী মুসলমানই ছিল; কিন্তু ক্রোধের বশবর্তী হয়ে নিজেকে কন্ট্রোল করতে না পেরে এরকম আচরণ করে বসেছিল। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

এখানে আরও একটি প্রশ্ন হয় যে, হুজুর ﷺ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সিদ্ধান্ত দিলেন, অথচ ক্রোধের অবস্থায় সিদ্ধান্ত দেওয়া নিষিদ্ধ। তার উত্তর হলো, এ হুকুম হুজুরের জন্য প্রযোজ্য নয়, কেননা তিনি ছিলেন মাসুম। সুতরাং ক্রোধ বা স্বাভাবিক কোনো অবস্থাতেই তাঁর হতে অন্যায় সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হতো না। -[মেরকাত- খ. ৬, পৃ. ১৪২; মাযাহের- খ. ৩, পৃ. ৫৮২]

শব্দ-বিশ্লেষণ : شِرَاجٌ : এটি বহুবচন, একবচনে شَرْجَةٌ অর্থ- স্রোতস্বিনী নালা।

اَلْحَرَّةُ : এটি একবচন, বহুবচনে حَرَّاتٌ অর্থ- কালো কঙ্করময় ভূমি।

اَلْجَدْرُ : বহুবচন, একবচনে جِدَارٌ অর্থ- দেয়াল, প্রাচীর, এখানে উদ্দেশ্য হলো জমির আইল।

وَهِيَ لِلْاَرْضِ كَالْجِدَارِ لِلدَّارِ وَقِيْلَ هُوَ اَصْلُ الْجِدَارِ . وَقَدَّرَهُ الْعُلَمَاءُ بِاَنْ يَرْتَفِعَ الْمَاءُ فِي الْاَرْضِ كُلِّهَا حَتّٰى يَبْلُغَ كَعْبَ رِجْلِ الْاِنْسَانِ .

আবার কেউ বলেছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রাচীরের ভিত্তি, আর এর পরিমাণ হলো পায়ের টাখনু পর্যন্ত।

اِسْتَوْعٰى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِيْ مُطْلَقْ مَعْرُوْفْ বাবে اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِيْعَاءُ মূলবর্ণ وَعْيٌ অর্থ- পূর্ণ অংশ দান করা, অংশ দান করা- اَيْ اَعْطَى الزُّبَيْرَ حَقَّهُ تَامًّا অর্থাৎ যুবায়েরকে পূর্ণ অধিকার দান করেন।

وَعَنْ ٢٨٦٤ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَمْنَعُوْا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوْا بِهٖ فَضْلَ الْكَلَاءِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৮৬৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কাউকেও অতিরিক্ত পানিতে বাধা দিয়ো না। তাতে তোমাদের বাধা দেওয়া হবে অতিরিক্ত ঘাসে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ হাদীসের বিশ্লেষণ بَابُ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْبُيُوْعِ -এর প্রথম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

وَعَنْهُ ٢٨٦٥ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ رَجُلٌ حَلَفَ عَلٰى سِلْعَةٍ لَقَدْ اُعْطِىَ بِهَا اَكْثَرَ مِمَّا اُعْطِىَ وَهُوَ كَاذِبٌ وَ رَجُلٌ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ رَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ الْيَوْمَ اَمْنَعُكَ فَضْلِىْ كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَاءٍ لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَ ذُكِرَ حَدِيْثُ جَابِرٍ فِىْ بَابِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْبُيُوْعِ .

২৮৬৫. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি [রহমতের নজরে] দেখবেন না। ১. যে ব্যক্তি কোনো পণ্য সম্পর্কে শপথ করেছে যে, "এটার যে মূল্য বলা হয়েছে তা অপেক্ষা অধিক মূল্য বলা হয়ে গিয়েছে", অথচ সে মিথ্যুক। ২. যে ব্যক্তি অপর মুসলমানের মাল গ্রহণ করতে আসরের পর মিথ্যা শপথ করেছে এবং ৩. যে ব্যক্তি অতিরিক্ত পানিতে বাধা দিয়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আজ আমি বাধা দেব তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহে, যেভাবে তুমি বাধা দিয়েছিলে যা তোমার হাত সৃষ্টি করেনি তাতে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ -এর বিশ্লেষণ : তিন শ্রেণির লোকের সাথে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের মাঠে কথা বলবেন না এবং তাকাবেন না। এখানে কথা না বলা ও না তাকানো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দয়া অনুগ্রহমূলক কথা না বলা এবং অনুগ্রহের দৃষ্টিতে না তাকানো। বরং তাদের সাথে কঠোর ভাষায় এবং শাস্তিমূলক কথা অবশ্যই বলবেন এবং ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকাবেন।

قَوْلُهُ بَعْدَ الْعَصْرِ -এর ব্যাখ্যা : এখানে 'আসরের পরে'র সময়টাকে নির্দিষ্ট করার কারণ কয়েকটি হতে পারে–

১. সাধারণত কঠিন ও জঘন্য ধরনের কসম উক্ত সময়েই খাওয়া হয়।

২. আসরের পরবর্তী সময়টা যেহেতু খুবই বরকতময় ও মূল্যবান সময় এ কারণে উক্ত সময়ে মিথ্যা কসম খাওয়া অন্য সময়ের তুলনায় অধিক গুনাহের কারণ।

৩. উক্ত সময়ে গুনাহমুক্ত অবস্থায় বাসায় ফেরার কথা কিন্তু সে মিথ্যা কসম খেয়ে গুনাহ অর্জন করে বাসায় ফিরে যাবে, এজন্য নিষেধ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ -এর ব্যাখ্যা : "যদিও উক্ত পানি তোমার হস্ত নির্গত করেনি" একথা বলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ভৎর্সনা করছেন যে, পানি যদি তুমি নিজ হাতে সৃষ্টি করতে তাহলে না হয় একটা কথা ছিল যে, তুমি তাতে বাধা দিতে পারবে, অথচ পানির প্রতিটি ফোঁটা আমার সৃষ্টি এবং আমি তা সৃষ্টি করেছি, সকল সৃষ্ট জীবের ব্যাপক সুবিধার জন্য। সুতরাং তোমার এ স্পর্ধা কিভাবে হলো যে, তুমি তা ভোগ করা হতে সৃষ্ট জীবকে বাধা দেবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ : سِلْعَةٌ এটি একবচন, বহুবচনে سِلَعٌ অর্থ– পণ্য, সামগ্রী।

لِيَقْتَطِعَ : يَقْتَطِعُ সীগাহ বহছ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ اِثْبَاتْ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِقْتِطَاعُ অর্থ– নেওয়া, গ্রহণ করা।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٨٦٦ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَاطَ حَائِطًا عَلَى الْاَرْضِ فَهُوَ لَهُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৮৬৬. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী (র.) হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা.) হতে, আর তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মালিকহীন জমিনের চারিপার্শ্বে দেওয়াল ঘেরা দিয়েছে, সে জমিন তার। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অর্থাৎ যে ব্যক্তি অনাবাদি ও পতিত জমিতে দেয়াল ঘেরা দেয়, উক্ত জমির মালিক সে হয়ে যাবে। অবশ্য প্রাচীর নির্মাণ দ্বারা মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে শুধুমাত্র প্রাচীর নির্মাণ করলেই সে মালিক হয়ে যাবে। দলিলস্বরূপ তিনি উল্লিখিত হাদীসটি উপস্থাপন করেন।

* আইম্মায়ে ছালাছার মতে, মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য শর্ত হলো اِحْيَاءٌ তথা আবাদ করা। তাঁদের দলিল হলো—

١. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) مَنْ عَمَّرَ اَرْضًا لَيْسَتْ لِاَحَدٍ فَهُوَ اَحَقُّ .

٢. قَضٰى بِهٖ عُمَرُ فِيْ خِلَافَتِهٖ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

ইমাম আহমদের দলিলের উত্তর : যেহেতু মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য শর্ত হলো اِحْيَاءٌ তথা আবাদ করা, আর প্রাচীর উঠানো দ্বারা আবাদ করা বুঝায় না। সুতরাং এ হাদীস তার দলিল হতে পারে না। আল্লামা ত্বীবী (র.) বলেন, এখানে প্রাচীর নির্মাণ দ্বারা উদ্দেশ্য নিজেদের বসবাসের জন্য বা পশুপালের বসবাসের জন্য বা ফল শুকানোর জন্য প্রাচীর নির্মাণ করা উদ্দেশ্য। সুতরাং শুধুমাত্র একটি খুঁটি গেড়ে বা সামান্য প্রাচীর নির্মাণ করলেই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না। -[মেরকাত- খ. ৬, পৃ. ১৪৩]

وَعَنْ ٢٨٦٧ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقْطَعَ لِلزُّبَيْرِ نَخْلًا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৮৬৭. অনুবাদ : হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ [তাঁর স্বামী] হযরত যুবায়ের (রা.)-কে এক খণ্ড খেজুর বাগান দান করেছিলেন। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَقْطَعَ لِلزُّبَيْرِ نَخْلًا-**এর ব্যাখ্যা :** اَقْطَعَ শব্দটি اِقْطَاعٌ মাসদার থেকে নির্গত। কাযী আয়ায (র.) বলেন, اِقْطَاعٌ অর্থ হলো— জমির কোনো অংশ দান করা। শরহুস্ সুন্নাহ গ্রন্থে আছে اِقْطَاعٌ দু প্রকার। প্রথমত জমির কোনো খণ্ডকে আবাদ করার জন্য স্থায়ী মালিক বানিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয়ত সাময়িকভাবে মালিক বানিয়ে দেওয়া। যেমন— বাজারের কোনো অংশকে কাউকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য মালিক বানানো।

মাজহার (র.) বলেন, হুজুর ﷺ হযরত যুবায়েরকে যে ভূখণ্ড দান করেছিলেন তা ছিল অনাবাদি জমি থেকে আবাদ করার জন্য। আবার কেউ বলেন, তা ছিল হুজুরের নিজস্ব ভূমি, যা তিনি খায়বারের গনিমতের পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশরূপে পেয়েছিলেন।

وَعَنْ ٢٨٦٨ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَقْطَعَ لِلزُّبَيْرِ حُضْرَ فَرَسِهٖ فَاَجْرٰى فَرَسَهٗ حَتّٰى قَامَ ثُمَّ رَمٰى بِسَوْطِهٖ فَقَالَ اَعْطُوْهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৮৬৮. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ হযরত যুবায়ের (রা.)-কে তাঁর ঘোড়ার এক দৌড়ের পরিমাণ ভূমি দিতে বললেন। সুতরাং যুবায়ের আপন ঘোড়া দৌড়ালেন, অবশেষে ঘোড়া থেমে গেল, অতঃপর তিনি আপন বেত নিক্ষেপ করলেন। তখন হুজুর ﷺ বললেন, তাকে তার বেত পৌছার স্থান পর্যন্ত দিয়ে দাও। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٢٨٦٩ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَقْطَعَهٗ اَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ قَالَ فَارْسَلَ مَعِىْ مُعَاوِيَةَ قَالَ اَعْطِهَا اِيَّاهُ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

২৮৬৯. অনুবাদ : তাবেয়ী আলকামা তাঁর পিতা ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ তাঁকে [ইয়েমেনের] হাযরামাওতে একখণ্ড জমিন দান করেছেন। ওয়ায়েল বলেন, এজন্য আমার সাথে মুআবিয়া [ইবনে হাফাফ]-কে পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন, তাকে তা [মেপে] দাও। –[তিরমিযী ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

'হাযরামাউত'-এর পরিচয় : "হাযরামাউত" এটি ইয়েমেনের একটি শহরের নাম। শব্দটি মূলত حَضَرَ ও مَوْتَ দু-শব্দের সমন্বিত রূপ। নাহ্শাস্ত্র মতে শব্দটি غَيْرُ مُنْصَرِفٌ -

নামকরণের কারণ : এ শহরটির নাম হাযরামাউত রাখা সম্পর্কিত মজার মজার তথ্য রয়েছে, যার কিছু নিম্নে প্রদত্ত হলো–

* আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন যে, যখন হযরত সালেহ (আ.)-এর কওমের লোকেরা ধ্বংস হতে লাগল তখন তারা হযরত সালেহ (আ.)-এর নিকট আসত এবং যেই তাঁর নিকট আসত সেই মৃত্যুবরণ করত, তখন লোকেরা বলতে লাগল حَضَرَمَوْتُ বা মৃত্যু হাজির হয়েছে। তখন থেকে এর নামকরণ হয়ে যায় 'হাযরামউত'।
* মুবাররাদ বলেন, এটি ইয়েমেনীদের পূর্বপুরুষ আমের -এর উপাধি ছিল। বর্ণিত আছে, তিনি যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন সে যুদ্ধে ব্যাপক হারে বিপক্ষের লোকজন মারা পড়ত। সুতরাং তাঁকে দেখলেই লোকেরা বলত حَضَرَ مَوْتُ 'মৃত্যু হাজির হয়েছে।'

قَوْلُهٗ عَنْ وَائِلٍ : وَائِلٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ তিনি ছিলেন ইয়েমেনের শাহী খান্দানের লোক। তাঁর পিতা ইয়েমেনের বাদশাহ ছিলেন। হযরত وَائِلٌ যখন ইসলামের ডাক শুনলেন, তখন তিনি একদল প্রতিনিধি নিয়ে রাসূলের দরবারে হাজির হওয়ার উদ্দেশ্যে হাযরামাউত থেকে রওয়ানা হলেন। এদিকে তাঁর রওয়ানা হওয়ার পর মদিনায় পৌছার পূর্বেই নবী করীম ﷺ মদিনাতে সাহাবায়ে কেরামকে তাঁর রওয়ানার সংবাদ শুনিয়ে দেন এবং তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন এই বলে যে, وَهُوَ بَقِيَّةُ اَبْنَاءِ الْمُلُوْكِ অতঃপর তিনি মদিনায় পৌছলে সাধ্যমতো তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়, হুজুর ﷺ তাঁকে নিকটে বসান এবং স্বীয় চাদর মোবারক বিছিয়ে দেন। অতঃপর ইয়েমেনের কিছু ভূখণ্ডের জমিদারি তার উপর ন্যস্ত করেন এবং হুজুর এই বলে তাঁর জন্য দোয়া করেন– اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِىْ وَائِلٍ وَ وَلَدِهٖ وَ وَلَدِ وَلَدِهٖ । –[মেরকাত- খ. ৬, পৃ. ১৪৩]

وَعَنْ ٢٨٧٠ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ الْمَارِبِيِّ (رض) أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ الَّذِيْ بِمَارِبَ فَأَقْطَعَهُ إِيَّاهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّمَا أَقْطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَرَجَعَهُ مِنْهُ قَالَ وَسَأَلَهُ مَاذَا يُحْمٰى مِنَ الْأَرَاكِ قَالَ مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

২৮৭০. **অনুবাদ :** হযরত আবইয়ায ইবনে হাম্মাল মাআরিবী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আপন গোত্রের প্রতিনিধিরূপে আসলেন; এ সময় তিনি মাআরেবস্থ লবণের কূপটি তাঁর নিকট দানরূপে চাইলেন। তিনি তাঁকে তা দান করলেন। যখন সে রওয়ানা হলো, এক ব্যক্তি [আকরা ইবনে হাবেস] বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তাঁকে প্রস্রবণের অফুরন্ত পানি দিয়ে দিলেন। তিনি [আক্‌রা] বলেন, অতঃপর হুজুর ﷺ তাঁর নিকট হতে তা ফেরত নিলেন। রাবী বলেন, আবইয়ায এটাও জিজ্ঞাসা করেন যে, আরাক গাছের কোন্‌টি রক্ষিত করা যায়? হুজুর ﷺ বললেন, যা উটের ক্ষুর পায় না। –[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْمَاءَ الْعِدَّ -এর বিশ্লেষণ : "তৈরি পানি" এ কথার অর্থ হলো সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত, সর্বদা বিদ্যমানশীল যা কখনো শেষ হয় না। একথার দ্বারা খনির মধ্যে লবণ পূর্ণ প্রস্তুত এ অবস্থার কথা বুঝানো হয়েছে। হুজুর ﷺ প্রথমে ভেবেছিলেন যে, হযরত আবইয়ায যে লবণের খনি হুজুরের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন সেটা প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে এবং তা হতে মেহনত ও পরিশ্রম করে লবণ বের করতে হবে। কিন্তু যখন হযরত আক্‌রা (রা.)-এর সতর্ক করার দ্বারা তিনি বুঝতে পারলেন যে, সেটা তো প্রাথমিক অবস্থায় নয় বরং তাতে লবণ সম্পূর্ণরূপ প্রস্তুত এবং যা পানি ও ঘাসের ন্যায় বিনা পরিশ্রমেই অর্জন করা যায় তখন তিনি সেই খনি ফেরত নিয়ে নিলেন। কেননা, সে অবস্থার সেই খনি ও তাতে তৈরি লবণের হকদার সকলেই, কোনো একক ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া সমীচীন নয়। সে কারণেই ব্যাপক জনগোষ্ঠীর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি তা ফেরত নেওয়াই সমীচীন মনে করলেন।

قَوْلُهُ مَاذَا يُحْمٰى مِنَ الْأَرَاكِ -এর ব্যাখ্যা : يُحْمٰى সংরক্ষিত করা হবে, অর্থাৎ অনাবাদ জমি আবাদ করা হবে। আর اَلْأَرَاكُ এক ধরনের গাছ, এখানে অর্থ হলো আরাক বৃক্ষ সমৃদ্ধ ভূখণ্ড। সুতরাং উভয় বাক্যের সমন্বিত অর্থ হবে– হযরত আকরা (রা.) জানতে চেয়েছিলেন যে, আরাক গাছবিশিষ্ট কোনো অনাবাদি জমি আবাদ করে মালিক হওয়া যাবে?

قَوْلُهُ مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ -এর বিশ্লেষণ : "যেখানে উটের ক্ষুর পৌছে না" অর্থাৎ যে জমি বিচরণ ভূমি ও লোকালয় থেকে দূরে থাকে, যেখানে উট ইত্যাদি বিচরণ করে না।

مَا اسْتَفَدْنَا مِنَ الْحَدِيْثِ [উক্ত হাদীস হতে আমরা যে বিষয় জানতে পারি] : এ হাদীস হতে কয়েকটি বিষয় জানা গেল–

* হুকুমত বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কাউকে এমন খনি দান করা যাবে যা জমির উপর বিদ্যমান থাকবে এবং তা হতে পরিশ্রম করে খনিজ দ্রব্য উত্তোলন করা যায়।
* আর যে খনি প্রস্তুত হয়ে যায় এবং তা হতে বিনা পরিশ্রমে দ্রব্য উত্তোলন করা যায় তা কোনো ব্যক্তিবিশেষকে দান করা বৈধ হবে না; বরং খাস প্যানির ন্যায় তা।
* ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
* প্রশাসক কর্তৃক কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর তার বিপরীতটা সঠিক বিবেচতি হলে পূর্বের সিদ্ধান্ত রহিত করা জায়েজ হবে।
* যে অনাবাদি জমি লোকালয়ের নিকটবর্তী হয় সে রকম জমি আবাদের মাধ্যমে মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। কেননা, তা পশুদের বিচরণের ও বসবাসকারীদের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার হতে পারে। –[মেরকাত- খ. ৬, পৃ. ১৪৫]

শব্দ-বিশ্লেষণ :

وَفَدَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلْوُفُوْدُ অর্থ- প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হওয়া।

اَبْيَضُ : অর্থ- অধিক শুভ্র। পূর্বে তার নাম ছিল اَسْوَدُ 'অধিক কালো', হুজুর ﷺ তার নাম রাখেন اَبْيَضُ।

اَلْمَارِبُ : এটি ইয়েমেনের একটি শাহরের নাম, যা সান'আ থেকে ৬০ মাইল পূর্বে সমতল ভূমি থেকে আনুমানিক ৪০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। ইয়েমেনে প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত সাব'আ গোত্রীয়দের শাসনামলে 'মাআরিব' ইয়েমেনের রাজধানী হওয়ার পাশাপাশি বৃহৎ ব্যবসাকেন্দ্রও ছিল। হযরত اَبْيَضُ সে শহরের বাসিন্দা ছিলেন, তাই তাঁকে মাআরিবী বলা হয়।

وَعَنْ ٢٨٧١ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِىْ ثَلٰثٍ فِى الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৮৭১. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন জিনিসে সকল মুসলমান অংশীদার, আর তা হলো পানি, ঘাস ও আগুন। -[আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উক্ত হাদীসে আল্লাহ তা'আলার তিনটি মহান নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা বিশ্বের সকলের জন্য উন্মুক্ত। তা হলো-

প্রথমত পানি : এখানে যে পানির মধ্যে সকলের অংশীদারিত্ব বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো এমন পানি যা কোনো প্রকার পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত হয়নি এবং কোনো পাত্রে সংরক্ষণ করাও হয়নি। উল্লেখ্য যে, পানি কয়েক প্রকার হয়ে থাকে-

ক. مَاءُ الْبِحَارِ বা সমুদ্রের পানি। সুতরাং সমুদ্রের পানিতে সকলেই সমান অংশীদার- চাই সে মুসলমান হোক বা কাফের, মানুষ হোক বা পশু। কেননা, তা হতে উপকৃত হওয়াটা চন্দ্র-সূর্যের আলো থেকে উপকৃত হওয়ার ন্যায়। চন্দ্র-সূর্যের আলো গ্রহণে যেরকম কাউকে বাধা দেওয়ার কারো অধিকার নেই তদ্রূপ সমুদ্রের পানি থেকে বাধা দেওয়ার অধিকারও কারো নেই। مَاءُ الْاَنْهَارِ বা নদীর পানি। যেমন- দজলা, ফুরাত, কর্ণফুলী, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, শীতলক্ষা, ধলেশ্বরী ইত্যাদিও সমুদ্রের পানির হুকুমেই হবে। এ ব্যাপারে কিছু আলোচনা পরিচ্ছেদের শুরুতে করা হয়েছে।

খ. মালিকানাধীন কূপ, টিউবওয়েল ও হাউজের পানি : এগুলোর পানিও সকলের পান করার সাধারণ অনুমতি থাকবে। তবে জমিতে সেচ দেওয়ার ক্ষেত্রে মালিকের অনুমতি ছাড়া বৈধ হবে না। কিন্তু যদি সেখানে মালিকানাহীন পানির ব্যবস্থা থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্য মালিকানাধীন কূপওয়ালা বাধা দিতে পারবে। অন্য পানি না থাকলে, পান করার অনুমতি দিতে হবে। যদি তার কোনো প্রকার ক্ষতি সাধিত না হয়।

গ. পাত্রে ভর্তি পানি : এ পানির হুকুম হলো তা হতে উপকৃত হওয়ার অধিকার মালিকের অনুমতি ব্যতীত অন্য কারো থাকবে না। অবশ্য মালিকের অনুমিত সাপেক্ষে যে কেউ উপকৃত হতে পারবে।

দ্বিতীয়ত ঘাস : এখানে ঘাস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মালিকানাহীন জমির খাস এবং যে মালিকানা জমির ঘাস প্রাকৃতিক পানিতে উৎপন্ন হয়, তাতে সমস্ত মানুষ সমানভাবে অংশীদার হবে, তবে যদি কেউ নিজে পানি সেচ দেয় এবং রোপণ করে ব্যবসা বা নিজের পশুর জন্য উৎপন্ন করে, তাতে অন্যের অধিকার থাকবে না।

তৃতীয়ত আগুন : অর্থাৎ কারো নিকট যদি আগুন থাকে তাহলে অন্যকে সেখান থেকে আগুন নেওয়া বা আগুনের আলো দ্বারা উপকৃত হওয়া থেকে বাধা দিতে পারবে না। তবে যদি জ্বলন্ত আগুনের লাকড়ি বা কয়লা নিতে চায় তাহলে সে ইচ্ছা করলে বাধা দিতে পারবে। কেননা, এর দ্বারা তার আগুন হ্রাস পাবে এবং নিভে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

وَعَنْ ٢٨٧٢ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ (رض) قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ هُوَ لَهُ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

২৮৭২. অনুবাদ : হযরত আসমার ইবনে মুযাররিস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে [ইসলামের] বায়'আত করলাম। তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কোনো পানির নিকট প্রথম পৌছেছে, যার নিকট তার আগে কোনো মুসলমান পৌছেনি, তা তার। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٢٨٧٣ طَاءُوسٍ مُرْسَلًا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحْيٰى مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ لَهُ وَعَادِيُّ الْأَرْضِ لِلّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّيْ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَ رُوِيَ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَقْطَعَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ الدُّوْرَ بِالْمَدِيْنَةِ وَهِيَ بَيْنَ ظَهْرَانِيْ عِمَارَةِ الْأَنْصَارِ مِنَ الْمَنَازِلِ وَالنَّخْلِ فَقَالَ بَنُوْ عَبْدِ بْنِ زُهْرَةَ نَكِّبْ عَنَّا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلِمَ اَبْتَعَثَنِيَ اللّٰهُ اِذًا أَنَّ اللّٰهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيْفِ فِيْهِمْ حَقُّهُ .

২৮৭৩. অনুবাদ : তাবেয়ী তাউস ইবনে কায়সার মুরসালরূপে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো অনাবাদি জমিন আবাদ করবে, তা তার হবে। মালিকহীন জমিন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, অতঃপর আমার পক্ষ হতে তা তোমাদের। –[শাফেয়ী] শরহে সুন্নাহর এক বর্ণনায় আছে, নবী করীম ﷺ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে মদিনায় বসতবাড়ির জায়গা জায়গিররূপে দান করলেন; আর তা ছিল আনসারদের খেজুর বাগান ও বাড়ির ইমারতের মধ্যস্থলে। তখন আনসারীদের বনী আবদে যুহ্‌রা গোত্র বলে উঠল, হুজুর! উম্মে আবদের পুত্রকে আমাদের হতে দূরে রাখুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন, তবে কেন আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন? আল্লাহ সেই জাতিকে পবিত্র করেন না যাদের মধ্যে দুর্বলের হক দেওয়া হয় না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ -এর ব্যাখ্যা : "তা আল্লাহ ও রাসূলের" অর্থাৎ সকল অনাবাদ ও পতিত জমি, যার কোনো মালিক নেই তা আমার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। আমার ইচ্ছানুযায়ী তা আমি ব্যবহার করব। যাকে ইচ্ছা দান করব এবং যাকে ইচ্ছা আবাদ করার অনুমতি দেব।

قَوْلُهُ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّيْ -এর ব্যাখ্যা : "অতঃপর তা আমার পক্ষ থেকে তোমাদের" কাযী আয়ায (র.) বলেন, এ বাক্যে এবং পূর্ববর্তী বাক্যে رَسُوْل -এর সাথে اَللّٰهُ শব্দ সংযুক্ত করার কারণ হলো হুজুরের সম্মান বৃদ্ধি করা। নতুবা আল্লাহর এমন জমির প্রয়োজন নেই।

বনী আবদ ইবনে যুহরার বিরুদ্ধাচরণের কারণ : আবদ ইবনে যুহরার সন্তানেরা স্বীয় ঘরবাড়ি ও বাগানের মাঝে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের বাড়ি নির্মাণের বিরোধিতা করার কারণ ছিল এই যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের পিতার আবদ ইবনে যুহরার সন্তানদের حَرِيْف বা বিপক্ষ গোত্রের সাথে সম্পর্ক ছিল, তাছাড়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মাতা উম্মে আবদ ছিলেন তাদের পরিচারিকাদের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই তারা হেয় প্রতিপন্ন করে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের বাড়ি তাদের বাড়ির সন্নিকটে হওয়াটাকে মেনে নিতে পারছিল না।

قَوْلُهُ فَلِمَ اِبْتَعَثَنِيَ اللّٰهُ-**এর বিশ্লেষণ :** "তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাকে কেন প্রেরণ করেছেন" এ কথার দ্বারা হুজুর ﷺ তাদের ভ্রান্তিমূলক ধারণার খণ্ডন করেছেন এবং নিজের অসন্তুষ্টির কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমাকে পাঠানো হয়েছে উঁচু ও নিচু, দুর্বল ও শক্তিশালীদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ছিলেন দুর্বল। সুতরাং দুর্বলদের ব্যাপারে এহেন হেয় ও তুচ্ছ ধারণা করা যদি বৈধ হয়, তাহলে আমাকে রাসূল বানিয়ে কেন পাঠানো হয়েছে? আমি যদি দুর্বলদের শক্তি সঞ্চয় করতে না পারি, তাহলে আমার আগমনের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়ে যাবে। আমাকে পাঠানোর আল্লাহর উদ্দেশ্যই বা কি? তোমরা শুনে রাখ! আমার আগমনের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো সমাজের উঁচু-নিচু ও সাম্প্রদায়িক শ্রেণিবৈষম্য দূরীভূত করে অহংকারীদের দর্প চূর্ণ করে তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করা এবং দুর্বলদের সাহায্য-সহযোগিতা করা। শুনে রাখ! যে জাতি দুর্বলদের হক সঠিকভাবে আদায় করে না আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পবিত্র করেন না।

শব্দ-বিশ্লেষণ : عَادِيُّ الْاَرْضِ : "প্রাচীন জমি" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন অনাবাদ জমি যার মালিক জানা যায় না। এখানে এমন জমির نِسْبَتْ করা হয়েছে عَادْ জাতির দিকে। আর এটা করা হয়েছে একমাত্র প্রাচীনতার আধিক্য বুঝানোর জন্য। কেননা, হযরত হুদ (আ.) ও তাঁর জাতির ইতিহাস অনেক প্রাচীন।

اَلدُّوْرُ : এটি বহুবচন, একবচনে دَارٌ অর্থ– বাড়ি, ঘর।

نَكِّبْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাবে تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّنْكِيْبُ অর্থ– সরানো, দূর করা।

اِنْبَعَثَنِيْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাবে اِنْفِعَالْ মাসদার اَلْاِنْبِعَاثُ অর্থ– প্রেরণ করা।

وَعَنْ ٢٨٧٤ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِى السَّيْلِ الْمَهْزُوْرِ اَنْ يُمْسَكَ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلَ الْاَعْلٰى عَلَى الْاَسْفَلِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৮৭৪. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মাহ্যূর' মাঠের পানি সম্পর্কে ফয়সালা করেছেন, তা আটকে রাখা হবে, যাবৎ না তা পায়ের ছোট গিরা পর্যন্ত পৌছে। অতঃপর উপরের ব্যক্তি নিচের ব্যক্তির [জমিনের] দিকে ছেড়ে দেবে।
–[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : مَهْزُوْر হলো মদিনার একটি উপত্যকার নাম, যা বনূ কুরায়যার মহল্লায় অবস্থিত। বনূ কুরায়যার ক্ষেত ও বাগানে সেই উপত্যকা দিয়েই পানি আসত। সে সম্পর্কেই হুজুর ﷺ এ নির্দেশ জারি করেন যে, ঐ উপত্যকা থেকে পানি আনয়নকারী নালার নিকটবর্তী যে ব্যক্তির জমি হবে সে সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পানি পাবে। অতঃপর যখন তার জমিতে এক হাঁটু পরিমাণ পানি জমা হবে অর্থাৎ পূর্ণরূপে পানি সিঞ্চন হবে তখন সে অন্যের জন্য পানি ছেড়ে দেবে, যাদের জমি তাদের থেকে নিচুতে অবস্থিত।

সকল নদী-নালার ব্যাপারেই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে যা বিনা পরিশ্রমে এবং চেষ্টা ব্যতীত প্রবাহিত হয়, যে ব্যক্তির জমি ঐ নদীর নিকটবর্তী ও উঁচুতে অবস্থিত হবে সে সর্বপ্রথম জমিতে এক হাঁটু পরিমাণ পানি আটকে রাখবে, অর্থাৎ তার প্রয়োজন মেটার পর অন্যের জন্য পানি ছেড়ে দেবে, যাদের জমি তার চেয়ে নিচুতে অবস্থিত।

وَعَنْ ٢٨٧٥ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رض) أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَضُدٌ مِنْ نَخْلٍ فِيْ حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْلُهُ فَكَانَ سَمُرَةُ يَدْخُلُ عَلَيْهِ فَيَتَأَذَّى بِهِ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَطَلَبَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ لِيَبِيْعَهُ فَاَبٰى فَطَلَبَ اَنْ يُنَاقِلَهُ فَاَبٰى قَالَ فَهَبْهُ لَهُ وَلَكَ كَذَا اَمْرًا رَغَّبَهُ فِيْهِ فَاَبٰى فَقَالَ اَنْتَ مُضَارٌّ فَقَالَ لِلْاَنْصَارِيِّ اِذْهَبْ فَاقْطَعْ نَخْلَهُ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَ ذُكِرَ حَدِيْثُ جَابِرٍ مَنْ اَحْيٰى اَرْضًا فِيْ بَابِ الْغَصَبِ بِرِوَايَةِ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ اَبِيْ صِرْمَةَ مَنْ ضَارَّ اَضَرَّ اللّٰهُ بِهِ فِيْ بَابِ مَا يُنْهٰى مِنَ التَّهَاجُرِ .

২৮৭৫. অনুবাদ : হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, এক আনসারীর বাগানের ভিতরে তাঁর কতক খেজুর গাছ ছিল। আর লোকটির সাথে তার পরিবার উক্ত বাগানে বসবাস করত। সুতরাং যখন হযরত সামুরা বাগানে প্রবেশ করতেন তখন আনসারীর তাতে কষ্ট হতো। এ কারণে আনসারী নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে তাঁর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলেন। নবী করীম ﷺ হযরত সামুরা (রা.)-কে ডেকে তা বিক্রয় করতে বললেন, কিন্তু হযরত সামুরা তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। অতঃপর হুজুর ﷺ বললেন, তার পরিবর্তে অন্য কোথাও গাছ নিয়ে নাও। কিন্তু হযরত সামুরা তাতেও অস্বীকৃতি জানালেন। অতঃপর হুজুর ﷺ বললেন, তুমি তাকে তা দান কর, আর তোমার জন্য [বেহেশতে] তার প্রতিদান রয়েছে। মোটকথা, হুজুর ﷺ তাকে এমন কথা বললেন, যাতে তাকে উৎসাহিত করা হলো, কিন্তু এতেও তিনি স্বীকার করলেন না। তখন হুজুর ﷺ বললেন, তুমি প্রতিবেশীর পক্ষে ক্ষতিকর এবং আনসারীকে বললেন, যাও তুমি তার গাছ কেটে ফেল। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : হুজুর ﷺ আনসারীর নিকট খেজুর গাছ বিক্রয় করার বা বিনিময় করার বা দান করার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর হযরত সামুরা (রা.) সে নির্দেশ পালন না করার কারণ ছিল মূলত নির্দেশটি وُجُوْب বা অত্যাবশ্যক রূপে ছিল না; বরং তা ছিল সুপারিশস্বরূপ। এ কারণেই তো তাকে জান্নাতের প্রতিদানের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছেন। সে নির্দেশটা যদি অত্যাবশ্যক রূপেই হতো তাহলে হযরত সামুরা (রা.) কর্তৃক তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করার কথা কল্পনাও করা যায় না। কেননা, তিনি হলেন একজন অনুগত সাহাবী।

সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে যে, বিষয়টি যদি সুপারিশ সংক্রান্ত হয়ে থাকে, তাহলে আনসারীকে উক্ত গাছ কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন কেন?

তার উত্তরে বলা যায় যে, মূলত হুজুর ﷺ প্রথমও সুপারিশের মাধ্যমে উত্তম আচরণ দ্বারা হযরত সামুরাকে বিষয়টি মানানোর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু যখন তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন তখন হুজুরের নিকট বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত সামুরা ঐ গাছগুলি আনসারীর বাগানে ঋণস্বরূপ বা বর্গাস্বরূপ লাগিয়েছেন, কিন্তু এখন সে ঐগুলি বিক্রয়, বিনিময় বা দান কোনোটিই করতে সম্মত হচ্ছে না তখন হুজুর ﷺ বুঝতে পারলেন যে, বাস্তবিকই সে আনসারীকে কষ্ট দিতে ইচ্ছুক। এ ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক ছিল উক্ত আনসারীকে সমস্যামুক্ত করা। এ কারণেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিলেন ঐ গাছগুলি কেটে ফেলার।

শব্দ-বিশ্লেষণ :

عَضُدٌ : অন্য রেওয়ায়েতে আছে عَضِيْدٌ- عَضِيْدٌ-এর বহুবচন হলো عَضْدَانٌ এর অর্থ সম্পর্কে কয়েকটি বক্তব্য আছে। কেউ বলেছেন- اِعْدَادٌ مِنَ النَّخْلِ 'খেজুর গাছের কাতার', আবার কেউ বলেছেন- اَلطَّرِيْقَةُ مِنَ النَّخْلِ 'কতকগুলো খেজুর গাছ', আবার কেউ বলেছেন- اَلطَّرِيْقَةُ عَلٰى صَفٍّ وَاحِدٍ 'খেজুর গাছের একটি কাতার'।

يُنَاقِلُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে مُفَاعَلَةْ মাসদার اَلْمُنَاقَلَةُ কেউ বলেছেন অর্থ- পরস্পর বিনিময় করা, অদল-বদল করা।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٨٧٦ عَائِشَةَ (رض) اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِىْ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّارُ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الْمَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا بَالُ الْمِلْحِ وَالنَّارِ قَالَ يَا حُمَيْرَاءُ مَنْ اَعْطٰى نَارًا فَكَاَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيْعِ مَا اَنْضَجَتْ تِلْكَ النَّارُ وَمَنْ اَعْطٰى مِلْحًا فَكَاَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيْعِ مَا طَيَّبَتْ تِلْكَ الْمِلْحُ وَمَنْ سَقٰى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ يُوْجَدُ الْمَاءُ فَكَاَنَّمَا اَعْتَقَ رَقَبَةً وَمَنْ سَقٰى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ لَا يُوْجَدُ الْمَاءُ فَكَاَنَّمَا اَحْيَاهَا . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

২৮৭৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একদা তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন জিনিস সম্পর্কে নিষেধ করা বৈধ নয়? তিনি বললেন, পানি, লবণ ও আগুন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, এই পানির কথার তাৎপর্য তো বুঝলাম, কিন্তু লবণ ও আগুনের কথার তাৎপর্য কি? তখন তিনি বললেন, হে হোমায়রা [আয়েশা]! যে আগুন দান করেছে সে যেন আগুন যা পাক করেছে তা সমস্ত দান করেছে, আর যে লবণ দান করেছে সে যেন লবণ যা সুস্বাদু করেছে তা সমস্ত দান করেছে, আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে পানি পান করিয়েছে যেখানে পানি পাওয়া যায় সেখানে- সে যেন একটা দাস আজাদ করেছে। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে পানির শরবত পান করিয়েছে যেখানে পানি পাওয়া যায় না সেখানে, সে যেন তাকে জীবন দান করেছে। -[ইবনে মাজাহ]

بَابُ الْعَطَايَا
পরিচ্ছেদ : হাদিয়া ও দানের

اَلْعَطَايَا : শব্দটি عَطِيَّةٌ -এর বহুবচন, যার অর্থ হলো– বখশিশ, দান, হাদিয়া। পরিভাষায় عَطِيَّةٌ বলা হয় নিজের কোনো জিনিসের মালিকানা অন্যের নিকট হস্তান্তর করা অথবা নিজের কোনো জিনিসকে বিনিময়বিহীন অন্যকে দিয়ে দেওয়া। এ পরিচ্ছেদে দানের সকল প্রকার যেমন– ওয়াকফ, হেবা, ওমরা, রুকবা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

মোল্লা আলী কারী (র.) লিখেছেন যে, عَطَايَا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাজা-বাদশাহ ও প্রশাসনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের উপহার, উপঢৌকন ও বখশিশ।

ইমাম গাযালী (র.) 'মিন্হাজুল আবেদীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, রাজা-বাদশাহদের বখশিশ এবং সরকারি পুরস্কার গ্রহণ করার বৈধতা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

কোনো কোনো আলেম বলেন, যদি উক্ত পুরস্কার বা উপঢৌকন এমন মাল দ্বারা দেওয়া হয় যা হারাম হওয়াটা সুস্পষ্ট নয়, তাহলে তা গ্রহণ করা জায়েজ হবে।

আবার কেউ বলেছেন, যতক্ষণ উক্ত মালের হালাল হওয়াটা يَقِيْن বা দৃঢ়তার সাথে জানা না যায়, ততক্ষণ তা গ্রহণ না করাই উত্তম। কেননা, সাম্প্রতিক কালের রাজা-বাদশাহদের নিকট রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অধিকাংশ সম্পদ হারাম ও অবৈধ পন্থায় অর্জিত হয়।

কোনো কোনো আলেম বলেন, ধনি-দরিদ্র উভয়ের জন্যই রাজা-বাদশাহদের উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ বৈধ, যদি তা হারাম হওয়া সুস্পষ্ট না হয়। তাঁদের দলিল হলো, হুজুর ﷺ গ্রীক সম্রাট মুকাওকাসের হাদিয়া গ্রহণ করেছিলেন এবং এক ইহুদি হতে ঋণ নিয়েছিলেন, অথচ ইহুদিদের সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত আছে যে– اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ "তারা হারাম মাল ভক্ষণকারী।"

আবার কেউ বলেছেন, হারাম মাল নয় এমন হলে দরিদ্রদের জন্য তা হালাল এবং ধনীদের জন্য হালাল নয়।

মোটকথা দরিদ্রদের জন্য রাজা-বাদশাহদের দান গ্রহণ করতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা, উক্ত মাল যদি তার ব্যক্তিগত মাল হয়, তাহলে তো বিনা সন্দেহে তা বৈধ। আর যদি গনিমতের মাল বা ট্যাক্স, ওশর ইত্যাদি থেকে হয়, তাহলে তো দরিদ্ররাই তার অধিক হকদার। তদ্রূপভাবে আহলে ইল্‌ম বা আলেম-ওলামাদেরও উক্ত মাল গ্রহণের পূর্ণ অনুমতি রয়েছে। কেননা, হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ইসলাম কবুল করবে এবং কুরআন শিক্ষা করবে সে 'বাইতুল মাল' বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বাৎসরিক দুইশত দিনার / দিরহাম পাবে। যদি সে উক্ত হক দুনিয়াতে না পায়, তাহলে পরকালে তার প্রতিদান অবশ্যই পাবে। –[মেরকাত- খ. ৬, পৃ. ১৪৮]

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٨٧٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ (رضـ) اَصَابَ اَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَصَبْتُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ اُصِبْ مَالًا قَطُّ اَنْفَسَ عِنْدِىْ مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِىْ بِهٖ قَالَ اِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ اَنَّهٗ لَا يُبَاعُ اَصْلُهَا وَلَا يُوْهَبُ وَلَا

২৮৭৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রা.) খায়বরে [গনিমতের] একখণ্ড ভূমি লাভ করলেন। অতঃপর তিনি নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি খায়বরে একখণ্ড ভূমি লাভ করেছি, যা অপেক্ষা উত্তম সম্পদ আমি আর কখনো লাভ করিনি। এখন হুজুর আমাকে এতে কি করতে বলেন? তখন হুজুর ﷺ বললেন, আপনি যদি চান এটার মূল রক্ষা করে লভ্য দান করতে পারেন। সুতরাং হযরত ওমর (রা.) তা এরূপে দান করলেন যে, তার মূল বিক্রয় করা যাবে না, হেবা করা যাবে না

يُوْرَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِى الْفُقَرَاءِ وَفِى الْقُرْبٰى وَفِى الرِّقَابِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلٰى مَنْ وَلِيَهَا اَنْ يَّأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ اَوْ يُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

এবং তাতে উত্তরাধিকার প্রবর্তিত হবে না। তা দান করা হবে অভাবীদের জন্য, আত্মীয়দের জন্য, দাসমুক্তকরণে, আল্লাহর রাস্তায় [অর্থাৎ জিহাদে], মুসাফিরদের জন্য ও মেহমানদের জন্য। যে উক্ত ভূমির মুতাওয়াল্লি হবে সে জমা না করে তা হতে ন্যায়সঙ্গতভাবে খেতে বা [আপন পরিবারকে] খাওয়াতে পারবে। এতে আপত্তি নেই। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সকল মুসলমানের ঐকমত্যে ওয়াক্ফ বৈধ, এ হাদীস তার দলিল। ওয়াক্ফ হলো নিজের কোনো সম্পদ যেমন– জমি, ঘর ইত্যাদি কোনো সৎ উদ্দেশ্যে ও জনকল্যাণমূলক কাজে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করে দেওয়া এ দানের ফলে ওয়াক্ফকারী অগণিত ছওয়াবের অধিকারী হবে। এ হাদীসের দ্বারা আরো জানা গেল যে, ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি বিক্রয়, দান ও মিরাসযোগ্য হবে না। ওয়াক্ফ হলো সদকায়ে জারিয়ামূলক কাজ। ওয়াক্ফকারী এর ছওয়াব পেতে থাকবে।

خَيْبَرُ : খায়বার একটি জনবসতির নাম, যা মদিনা হতে ষাট মাইল উত্তরে অবস্থিত। সেখানে খেজুর উৎপন্ন হয়। হুজুরের যুগে মুসলমানেরা শক্তির বলে উক্ত এলাকা বিজয় করেন। সুতরাং বিজেতাদের মাঝে তা বণ্টন করা হয়। সেখান থেকে হযরত ওমর (রা.)ও একটি অংশ প্রাপ্ত হন, সেই ভূখণ্ডকেই তিনি আল্লাহর রাহে ওয়াক্ফ করে দেন।

قَوْلُهُ لَا جُنَاحَ عَلٰى مَنْ وَلِيَهَا اَنْ يَّأْكُلَ مِنْهَا الخ -এর বিশ্লেষণ : শরহুস্ সুন্নাহ গ্রন্থে লিখিত আছে এ হাদীসের আলোকে অনুমিত হয় যে, ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি হতে ওয়াক্ফকারী তার নিজের ও পরিবারবর্গের জন্য প্রয়োজন মাফিক খরচ করতে পারে। কেননা, হুজুর ﷺ হযরত ওমরের ওয়াক্ফনামার শর্তাবলি অনুমোদন করেছেন, যাতে হযরত ওমর (রা.) মুতাওয়াল্লির জন্য নির্দিষ্ট অংশ রেখেছেন। আর ওয়াকফকারীই সাধারণত মুতাওয়াল্লি হয়ে থাকে।

এর আরো একটি দলিল হলো, হুজুর ﷺ بِئْرُ رُوْمَةَ সম্পর্কে বলেছিলেন এমন কেউ আছে কি যে, তা ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য ওয়াক্ফ করে দিবে। সেই কূপে তার বালতি সাধারণ মুসলমানের বালতির ন্যায় বিবেচিত হবে। অর্থাৎ সেও তা হতে ব্যবহার করতে পারবে। অতঃপর হযরত ওসমান (রা.) তা ক্রয় করে ওয়াক্ফ করে দেন। –[মেরকাত- খ. ৬, পৃ. ১৪৯]

وَعَنْ ٢٨٧٨ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْعُمْرٰى جَائِزَةٌ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৮৭৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ওমরা বা জীবনস্বত্ব দান জায়েজ। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَقْسَامُ الْعُمْرٰى [ওমরার প্রকারভেদ] : ওমরা তিন প্রকার–

১. দানকারী বলবে– اَنْ يَّقُوْلَ الْمُعْطِىْ عَمَّرْتُكَ هٰذِهِ الدَّارَ فَاِذَا مِتَّ فَهِىَ لِوَرَثَتِكَ

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি স্বীয় বাড়ি কাউকে দান করে বলবে, আমি তোমাকে এটা দান করলাম, তুমি যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন এটার মালিক তুমিই থাকবে। তোমার মৃত্যুর পর তোমার উত্তরাধিকারীগণ এর মালিক হবে।

২. দানকারী কোনোরূপ শর্তারোপ ছাড়াই বলবে– اَعْمَرْتُكَ هٰذِهِ الدَّارَ اَىْ جَعَلْتُهَا لَكَ عُمْرَكَ

অর্থাৎ যতদিন তুমি বেঁচে থাক ততদিন এ বাড়ি তোমার, আর তুমি মারা গেলে এটা আমার বা আমার ওয়ারিশদের নিকট ফিরে আসবে।

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِى الْعُمْرٰى [اَلْعُمْرٰى **সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ**] : যাকে বাড়ি দান করা হয়েছে সে জীবিত থাকাকালীন তার কাছ থেকে উক্ত বাড়ি ফেরত নেওয়া যাবে না, এ ব্যাপারে সকলে একমত। তবে তার মৃত্যুর পর ফেরত নেওয়া যাবে কিনা এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে–

১. ইমাম মালেক (র.)-এর মতে উপরিউক্ত তিন অবস্থাতেই তা تَمْلِيْكُ مَنَافِعْ অর্থাৎ ঋণের পর্যায়ভুক্ত হবে এবং যাকে দান করা হয়েছিল তার মৃত্যুর পর আসল মালিকের নিকট ফিরে আসবে। তাঁর দলিল হলো–

عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ اِذَا قَالَ هِىَ لَكَ مَا عِشْتَ فَاِنَّهَا تَرْجِعُ اِلٰى صَاحِبِهَا ـ (اَبُوْ دَاوُدَ)

২. ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী, আহমদ ও জমহুরের মতে সকল সুরতেই তা تَمْلِيْكُ شَيْءٍ হয়ে হেবা বা দান হয়ে যাবে এবং ফেরত আনার শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং যাকে দান করা হয়েছে তার মৃত্যুর পর তারই উত্তরাধিকারীগণ তার মালিক হয়ে যাবে। তাঁদের দলিল–

١. عَنْ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) كَانَ يَقُوْلُ الْعُمْرٰى لِمَنْ وَهَبَ لَهٗ ـ (اَبُوْ دَاوُدَ)

٢. عَنْ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّهٗ قَالَ مَنْ اَعْمَرَ عُمْرٰى فَهِىَ لِلَّذِىْ اَعْمَرَ ضَالَّهٗ حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهٖ ـ

٣. عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ اِنَّ الْعُمْرٰى مِيْرَاثٌ لِاَهْلِهَا ـ

এ সমস্ত হাদীসের মধ্যে عُمْرٰى-কে হেবা বলা হয়েছে। সুতরাং হেবা করে তা ফেরত নেওয়া যায় না।

প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব :

১. হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীসে فَاِنَّهَا تَرْجِعُ اِلٰى اَهْلِهَا এটি হলো হযরত জাবের (র.)-এর নিজস্ব মত, যা مَرْفُوْعْ হাদীসের মোকাবিলায় দলিল হতে পারে না।

২. মূলত এটি হযরত জাবের (র.)-এর উক্তি নয়; বরং ইমাম জুহরীর উক্তি। -[হেদায়া- খ. ৩, পৃ. ২৭৫; মেরকাত- খ. ৬, পৃ. ১৫০]

শব্দ-বিশ্লেষণ :

اَلْعُمْرٰى : عُمْرٰى শব্দটি فُعْلٰى-এর ওযনে عُمْرٌ মূলধাতু থেকে নির্গত। অর্থ হলো –জীবনের পরিধি, জীবন কাল, আজীবন। এ রকম দানের ক্ষেত্রেও যেহেতু যাকে দান করা হয় তার জীবনের উল্লেখ থাকে এজন্য তাকে ওমরা বলা হয়। পরিভাষায় عُمْرٰى বলা হয় এমন শব্দ দ্বারা বাড়ি দান করা যাতে জীবনকালের কথা উল্লেখ থাকে। যেমন কাউকে বাড়ি দান করার সময় বলা– قَوْلُ الْقَائِلِ اَعْمَرْتُكَ هٰذِهِ الدَّارَ اَوْ جَعَلْتُهَا لَكَ عُمْرَكَ اَوْ حَيَاتَكَ অথবা আল্লামা নববীর ভাষায়– هٰذِهِ الدَّارُ لَكَ عُمْرٰى অর্থাৎ তুমি যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিনের জন্য তোমাকে এ বিল্ডিং দান করলাম।

وَعَنْ ٢٨٧٩ جَابِرٍ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْعُمْرٰى مِيْرَاثٌ لِاَهْلِهَا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৮৭৯. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, জীবনস্বত্ব যাকে দেওয়া হয়েছে তার ওয়ারিশগণই তা মিরাসরূপে পাবে। -[মুসলিম]

وَعَنْهُ ٢٨٨٠ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٍ اُعْمِرَ عُمْرٰى لَهٗ وَلِعَقِبِهٖ فَاِنَّهَا لِلَّذِىْ اُعْطِيَهَا لَا يَرْجِعُ اِلَى الَّذِىْ اَعْطَاهَا لِاَنَّهٗ اَعْطٰى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْثُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৮৮০. অনুবাদ : উক্ত হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোনো ব্যক্তিকে জীবনস্বত্ব দেওয়া হয় তার ও তার উত্তরাধিকারীদের জন্য, তা যাকে দেওয়া হয়েছে তারই হয় এবং যে দিয়েছে তার দিকে ফিরে আসে না। কেননা, সে এমন দান করেছে যাতে [গ্রহীতার] উত্তরাধিকার স্থাপিত হয়। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : হাদীসের সারমর্ম হলো, যা কাউকে ওমরা হিসেবে প্রদান করা হয় তার মালিক সে হয়ে যায় এবং তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীগণ তার মালিক হয়ে যাবে। দানকারী আর কখনো তা ফেরত পাবে না। এ হাদীসও হানাফীগণের দলিল।

وَعَنْهُ ٢٨٨١ قَالَ اِنَّمَا الْعُمْرٰى الَّتِىْ اَجَازَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّقُوْلَ هِىَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَاَمَّا اِذَا قَالَ هِىَ لَكَ مَا عِشْتَ فَاِنَّهَا تَرْجِعُ اِلٰى صَاحِبِهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৮৮১. অনুবাদ : উক্ত হযরত জাবের (রা.) বলেন, যে জীবনস্বত্বের অনুমতি রাসূলুল্লাহ ﷺ দিয়েছেন তা হলো, দাতা এরূপ বলবে, 'এটা তোমার ও তোমার উত্তরাধিকারীদের জন্য', কিন্তু যে এমন বলবে, 'এটা তোমার জন্য যাবৎ তুমি বেঁচে থাক', তখন তা তার দাতার দিকে ফিরে যাবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

عَنْ ٢٨٨٢ جَابِرٍ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا تُرْقِبُوْا وَلَا تُعْمِرُوْا فَمَنْ اُرْقِبَ شَيْئًا اَوْ اُعْمِرَ فَهِىَ لِوَرَثَتِهِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৮৮২. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, [ফেরতের আশায়] তোমরা 'রুকবা'রূপে ও 'ওমরা'রূপে দান করো না। যে ব্যক্তিকে 'রুকবা'রূপে বা 'ওমরা'রূপে কোনো জিনিস দান করা হয়েছে, তা তার ওয়ারিশগণই পাবে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تُرْقِبُوْا **-এর ব্যাখ্যা :** عُمْرٰى -এর ন্যায় رُقْبٰى ও হেবা -এর একটি শাখা। رُقْبٰى শব্দটি فُعْلٰى -এর ওযনে تَرَقُّبٌ থেকে নির্গত রয়েছে। যার শাব্দিক অর্থ হলো অপেক্ষা করা অর্থাৎ অপরের মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকা। আর পরিভাষায় رُقْبٰى বলা হয়– وَهِىَ اَنْ يَّقُوْلَ وَهَبْتُ لَكَ دَارِىْ فَاِنْ مُتَّ قَبْلِىْ رَجَعَتْ اِلَىَّ وَاِنْ مُتُّ قَبْلَكَ فَهِىَ لَكَ

অর্থাৎ, দানকারী বলবে, আমার বাড়ি তোমাকে হেবা করলাম সুতরাং তুমি যদি আমার পূর্বে মৃত্যুবরণ কর তাহলে আমাকে ফিরিয়ে দিবে, আর যদি আমি তোমার পূর্বে মৃত্যুবরণ করি তাহলে এটি তোমার।

وَجْهُ التَّسْمِيَةِ **[নামকরণের কারণ]** : যেহেতু এক্ষেত্রে উভয়ে উভয়ের মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকে, এজন্য এর নামকরণ করা হয়েছে رُقْبٰى।

رُقْبٰى **বৈধ হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য :** رُقْبٰى বৈধ হবে কিনা সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে–

১. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে, عُمْرٰى -এর ন্যায় رُقْبٰى ও হেবা হিসেবে পরিগণিত হয়ে জায়েজ হবে। তাঁদের দলিল–

١. عَنْ جَابِرٍ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْعُمْرٰى جَائِزَةٌ لِاَهْلِهَا وَالرُّقْبٰى جَائِزَةٌ لِاَهْلِهَا .

٢. وَعَنْهُ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَجَازَ الْعُمْرٰى وَالرُّقْبٰى .

২. ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, رُقْبٰى সঠিক ও বৈধ নয়। তাঁদের দলিল–

١. عَنْ شُرَيْحٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَجَازَ الْعُمْرٰى وَاَبْطَلَ الرُّقْبٰى .

٢. عَنْ جَابِرٍ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا تُرْقِبُوْا وَلَا تُعْمِرُوْا .

* رُقْبٰى হলো জুয়ার ন্যায়. আর জুয়া সকলের মতেই অবৈধ।

* رُقْبٰى-এর ক্ষেত্রে অপরের মৃত্যুর কামনা করা হয়ে থাকে, যা একটি জঘন্য ও অপছন্দীয় কাজ।

اَلْجَوَابُ : জুয়ার আয়াত দ্বারা এ হুকুম মনসুখ হয়ে গেছে।

২. এখানে رُقْبٰى দ্বারা عَارِيَةٌ বা ঋণ উদ্দেশ্য হবে।

وَعَنْ ٢٨٨٣ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُمْرٰى جَائِزَةٌ لِاَهْلِهَا وَالرُّقْبٰى جَائِزَةٌ لِاَهْلِهَا . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

২৮৮৩. অনুবাদ : উক্ত হযরত জাবের (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ওমরা জায়েজ, যাকে ওমরা দেওয়া হয়েছে তা তারই এবং 'রুকবা' জায়েজ, যাকে রুকবা দেওয়া হয়েছে তা তারই। -[আহমদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পরিচ্ছেদ

عَنْ ٢٨٨٤ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمْسِكُوْا اَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ لَا تُفْسِدُوْهَا فَاِنَّهُ مَنْ اَعْمَرَ عُمْرٰى فَهِيَ لِلَّذِيْ اُعْمِرَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৮৮৪. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মাল তোমরা তোমাদের নিকট ধরে রাখ এবং নষ্ট করো না। জেনে রাখ, যে ব্যক্তি 'ওমরা'রূপে দান করেছে তা তারই হবে, যাকে তা দান করা হয়েছে তার জীবনকালে, মৃত্যুকালে এবং পরেও তার ওয়ারিশগণের হবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা নববী (র.) বলেন, ওমরা হলো হেবা বা দান। এর দ্বারা مَوْهُوْبٌ لَهٗ পরিপূর্ণ মালিক হয়ে যাবে, وَاهِبٌ বা দানকারীর প্রতি কখনো ফিরে আসবে না। সুতরাং একথা জানার পর যার ইচ্ছা সে ওমরা করুক অথবা না করুক, এটা তার অধিকার। বস্তুত এ হাদীস শাফেয়ীদের নয়; বরং হানাফীদেরই দলিল। -[মেরকাত- খ. ৬, পৃ. ১৫২]

قَوْلُهٗ حَيًّا وَمَيِّتًا **-এর বিশ্লেষণ** : 'জীবনকালে' ও 'মৃত্যুকালে'- অর্থাৎ জীবনকালে সে বেচাকেনা এবং মরণকালে দান-হেবা বা অসিয়ত করতে পারবে। মোটকথা, এটা আর দাতার থাকবে না। সুতরাং এটা বুঝে আসে, যে 'ওমরা' দিতে চায়, দিতে পারে। এটা ধার নয় যে, সে ফেরত পাবে।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ : দান, হেবা ও উপহার সম্পর্কীয় বিধিবিধান

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম পরিচ্ছেদ

عَنْ ٢٨٨٥ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيْحِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৮৮৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যাকে সুগন্ধি দান করা হয় সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কেননা, এটা হালকা বোঝা, অথচ সুগন্ধযুক্ত। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ফুল হলো দুনিয়ার মধ্যে জান্নাতের একটি নিয়ামত। ফুলের নির্মলতা মানুষের মুখে মুখে। ফুলের সৌন্দর্য মানুষের হৃদয় কাড়ে। ফুলের ঘ্রাণ মোহিত করে মন-প্রাণ। ফুলকে ভালোবাসা মানুষের সুস্থ স্বভাবের পরিচায়ক। কেননা, ফুলের আগমন ঘটেছে জান্নাত থেকেই। হুজুর ﷺ ফুল ফেরত দিতে নিষেধ করার কারণ হলো তা দ্বারা দুনিয়াতেই জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যাবে। এর আরো একটি কারণ হলো, হেয় ভেবে কোনো তুচ্ছ হাদিয়াকেও ফেরত দিতে নেই। এ হাদীস দ্বারা আরো একটা জিনিস জানা গেল যে, মানুষের অন্তরে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা এবং তাদের মন রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি বিষয়।

শব্দ-বিশ্লেষণ : رَيْحَانٌ এটি একবচন, বহুবচনে رَيَاحِيْنَ অর্থ– সুগন্ধ ফুল।

وَعَنْ ٢٨٨٦ أَنَسٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيْبَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৮৮৬. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ সুগন্ধি জিনিস ফিরিয়ে দিতেন না। –[বুখারী]

وَعَنْ ٢٨٨٧ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَائِدُ فِىْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِىْ قَيْئِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৮৮৭. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে দান করে ফেরত নেয় সে হলো কুকুরের ন্যায়। সে আপন বমি পুনঃ খায়। আমাদের পক্ষে এই মন্দ উদাহরণ সাজে না। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হেবা করে তা ফেরত নেওয়া যাবে কিনা সে ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে–

১. ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে, যে কোনোভাবেই হোক হেবা করে তা ফেরত নেওয়া হারাম। তাঁদের দলিল হলো–

١. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَائِدُ فِىْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِىْ قَيْئِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ .

٢. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّهُ قَالَ لَا يَرْجِعُ الْوَاهِبُ فِىْ هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ فِيْمَا يَهَبُ لِوَلَدِهِ .

২. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, নিষেধাজ্ঞার সাতটা উপকরণ পাওয়া না গেলে مَوْهُوْبٌ لَهٗ-এর সন্তুষ্টি অথবা বিচারকের ফয়সালা অনুযায়ী তা ফেরত নেওয়া যাবে। সেই সাতটি জিনিসের সমষ্টি সংক্ষেপে "دَمْعُ خَزْقَةٍ"

"د" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো زِيَادَتْ مُتَّصِلَةْ বা অতিরিক্ত বস্তু-সংশ্লিষ্ট হওয়া যা পৃথক করা সম্ভবপর না হয়। যেমন– আটার মধ্যে চিনি মিশ্রিত করে ফেলেছে, জমিতে বৃক্ষ রোপণ করে ফেলেছে।

"م" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, مَوْتُ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ বা দুজনের যে কোনো একজনের মৃত্যু হওয়া।

"ع" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দানকারীকে কোনো عِوَضْ বা প্রতিদান দেওয়া।

"خ" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, خُرُوْجٌ عَنْ مِلْكِ الْمَوْهُوْبِ لَهُ অর্থাৎ যাকে দান করা হয়েছে তার মালিকানা থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

"ز" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ বা স্বামী-স্ত্রী হওয়া।

"ق" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, قَرَابَتُ ذِيْ رَحِمٍ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ

"ه" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, هَلَاكُ مَوْهُوْبٍ لَهُ বা হেবাকৃত বস্তুটি ধ্বংস হয়ে যাওয়া।

এ সকল অবস্থায় হেবা করে তা ফেরত নেওয়া নাজায়েজ। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অবস্থায় জায়েজ হবে। তাঁদের দলিল–

١. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّهُ قَالَ الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا أَيْ لَمْ يُعَوَّضْ مِنْهَا .

অর্থাৎ হেবাকারী তার হেবার অধিকতর হকদার থাকবে যতক্ষণ তার প্রতিদান গ্রহণ না করে।

٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّهُ قَالَ مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ .

٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) مَرْفُوْعًا قَالَ مَنْ وَهَبَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ .

এ সকল হাদীস হেবাকৃত বস্তু ফেরত নেওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

প্রতিপক্ষের জবাব : তাঁদের দলিলে যে হেবা ফেরত নেওয়াকে কুকুরের বমি পুনঃ খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ কাজের অপছন্দনীয়তা ও ঘৃণিত হওয়া বুঝানো; হারাম হওয়া বুঝাবে না। কেননা, কুকুরের কাজ নিন্দনীয় তো হতে পারে; কিন্তু হারাম হতে পারে না। لِأَنَّ الْكَلْبَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فَالْقَيْءُ لَيْسَ حَرَامًا عَلَيْهِ.

অর্থাৎ কুকুর শরিয়তের مُكَلَّفٌ নয়, তা ছাড়া বমি খেয়ে ফেলা কুকুরের জন্য তো হারাম নয়। সুতরাং হানাফীগণও رُجُوْعٌ فِي الْهِبَةِ নিন্দনীয় মনে করেন, তবে হারাম মনে করেন না। আর দ্বিতীয় যে বলা হয়েছে لَا يَرْجِعُ الْوَاهِبُ তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিচারকের ফয়সালা ব্যতীত وَاهِبْ এককভাবে তাফেরত নেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। –[হেদায়া- খ. ৩, পৃ. ২৭৩]

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَلْعَائِدُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْمِ فَاعِلْ মাসদার اَلْعَوْدُ বাবে نَصَرَ অর্থ– ফেরত নেওয়া।

اَلْهِبَةُ : এটি বাবে ضَرَبَ -এর মাসদার অর্থ– দান করা। শরিয়তের পরিভাষায় হেবা বলা হয়– কাউকে বিনিময়বিহীন কোনো জিনিসের মালিক বানিয়ে দেওয়া। এর رُكْنْ হলো, اِيْجَابٌ ও قَبُوْلْ -এর মধ্যে কবজা করা শর্ত।

وَعَنْ ٢٨٨٨ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رض) أَنَّ أَبَاهُ أَتٰى بِهِ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّيْ نَحَلْتُ ابْنِيْ هٰذَا غُلَامًا فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُوْنُوْا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلٰى قَالَ فَلَا إِذًا وَفِيْ رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ أَعْطَانِيْ أَبِيْ عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ

২৮৮৮. অনুবাদ : হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা.) বলেন, তাঁর পিতা তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং বললেন, হুজুর! আমার এই সন্তানকে আমি একটি গোলাম দান করেছি। হুজুর ﷺ বললেন, তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে এরূপ দান করেছ? তিনি বললেন, না। হুজুর ﷺ বললেন, তবে তুমি তা ফেরত নাও।

অপর এক বর্ণনায় আছে– তুমি কি চাও যে, তারা সকলে তোমার সাথে সমানভাবে সদ্ব্যবহার করুক? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হুজুর ﷺ বললেন, তবে তা বৈধ হবে না।

অপর বর্ণনায় আছে– হযরত নো'মান বলেছেন, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করলেন। তখন [আমার মা] আমরাহ বিনতে রাওয়াহাহ [আমার

لَا أَرْضَى حَتّٰى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّىْ أَعْطَيْتُ ابْنِىْ مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِىْ أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هٰذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهٗ وَفِىْ رِوَايَةٍ أَنَّهٗ قَالَ لَا أَشْهَدُ عَلٰى جَوْرٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

পিতাকে] বললেন, আমি এতে রাজি নই যতক্ষণ না আপনি এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সাক্ষী করান। সুতরাং আমার পিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গিয়ে বললেন, আমি আমরাহ বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার এই সন্তানকে একটি দান প্রদান করেছি; কিন্তু আমরাহ আমাকে বলেছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে যেন সাক্ষী করাই। হুজুর ﷺ বললেন, তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে এর অনুরূপ দান করেছ? তিনি বললেন, না। তখন হুজুর ﷺ বললেন, তবে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমার সকল সন্তানের মধ্যে সমান ব্যবহার কর। হযরত নো'মান বলেন, সুতরাং তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন এবং আপন দান ফিরিয়ে নিলেন। অপর বর্ণনায় আছে, হুজুর ﷺ বললেন, আমি অন্যায়ের উপর সাক্ষী হই না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لَا أَشْهَدُ عَلٰى الخ -এর ব্যাখ্যা : "আমি অন্যায়ের উপর সাক্ষী হই না" এ হাদীসের আলোকে নিজ সন্তানদেরকে দানের ব্যাপারে কমবেশি করা প্রসঙ্গে মতবিরোধ রয়েছে।"

১. ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, সন্তানদেরকে কোনো কিছু হেবা বা দান করার ক্ষেত্রে একজনকে অন্যের উপর প্রাধান্য দেওয়া হারাম। তাঁর দলিল হলো– اِعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ لَا أَشْهَدُ عَلٰى جَوْرٍ

২. ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও শাফেয়ী (র.) প্রমুখের মতে সন্তানদের মধ্যে কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দেওয়া অর্থাৎ একজনকে অন্যের চেয়ে বেশি দেওয়া জায়েজ, তবে এ রকম করা মাকরূহ এবং হেবা সহীহ হয়ে যাবে। তাঁদের দলিল হলো–

كَمَا فَضَّلَ أَبُوْ بَكْرٍ عَائِشَةَ بِأَحَدٍ وَعِشْرِيْنَ وَسْقًا نَحَلَهَا إِيَّاهَا دُوْنَ سَائِرِ أَوْلَادِهٖ وَفَضَّلَ عُمَرُ عَاصِمًا فِىْ عَطَائِهٖ وَفَضَّلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَلَدَ أُمِّ كُلْثُوْمٍ .

অর্থাৎ হযরত আবূ বকর (রা.) হযরত আয়েশাকে ২১ ওয়াসাক অন্যের তুলনায় অধিক দিয়েছেন, হযরত ওমর (র.) আসেমকে এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) উম্মে কুলছুমের সন্তানকে অন্য সন্তানদের তুলনায় অধিক দিয়েছেন, যা সকল সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে হয়েছে। কেউ এর বিরোধিতা করেননি, সুতরাং সাহাবীদের إِجْمَاعٌ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

প্রতিপক্ষের জবাব : তাঁদের দলিলের মধ্যে اِعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ বলা হয়েছে তা اِسْتِحْبَابٌ -এর জন্য বলেছেন, وُجُوْب -এর জন্য নয়। আর جَوْر বা জুলুম দ্বারা হারাম বুঝায় না।

لِأَنَّهٗ هُوَ الْمَيْلُ عَنِ الْاِسْتِوَاءِ وَالْاِعْتِدَالِ وَكُلُّ مَا خَرَجَ عَنِ الْاِعْتِدَالِ فَهُوَ جَوْرٌ سَوَاءٌ كَانَ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوْهًا .

–[মেরকাত- খ. ৬, পৃ. ১৫৪]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٨٨٩ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِىْ هِبَتِهٖ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهٖ . (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৮৮৯. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউই আপন হেবার জিনিস ফিরিয়ে নিতে পারে না পিতা আপন পুত্রের হেবা ব্যতীত।

–[নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : এ হাদীস ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতের স্বপক্ষে দলিল। কেননা, তাঁর মতে হেবা করে তা ফেরত নেওয়া জায়েজ নয়, কিন্তু পিতা তার ছেলেকে হেবা করে ফেরত নিতে পারবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন যে, একথার অর্থ হলো যেভাবে কোনো পিতা প্রয়োজনের সময় স্বীয় সন্তানের সম্পদ থেকে নিয়ে নিজের জন্য খরচ করতে পারে, তদ্রূপ যা সে তার সন্তানকে হেবা করেছে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সেখান থেকেও নিতে পারবে।

وَعَنْ ٢٨٩٠ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيْهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِيْ وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِيْ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتّٰى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيْ قَيْئِهِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

২৮৯০. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, কোনো ব্যক্তির পক্ষে দান করে অতঃপর তা ফেরত নেওয়া হালাল নয়– পিতা আপন পুত্রকে যা দান করে তা ব্যতীত। যে ব্যক্তি দান করে অতঃপর তা ফেরত নেয়, তার উদাহরণ সেই কুকুরের ন্যায় যে খায়, অবশেষে যখন পেট ভরে তখন বমি করে, অতঃপর আপন বমি ফেরত খায়। –[আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী একে সহীহ্ বলেছেন।]

وَعَنْ ٢٨٩١ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدٰى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَكْرَةً فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ فَتَسَخَّطَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فُلَانًا أَهْدٰى إِلَيَّ نَاقَةً فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ فَظَلَّ سَاخِطًا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

২৮৯১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি উষ্ট্রী উপহার দিল। হুজুর ﷺ এটার প্রতিদানে তাকে ছয়টি উষ্ট্রী উপহার দিলেন, কিন্তু এতে সে [খুশি হলো না; বরং] নাখোশ হলো। এ খবর নবী করীম ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি আল্লাহর হামদ ও ছানা পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন, অমুক আমাকে একটি উষ্ট্রী উপহার দিয়েছে, আর আমি তার পরিবর্তে তাকে ছয়টি উষ্ট্রী উপহার দিয়েছি, কিন্তু সে তাতেও নাখোশ। আল্লাহর কসম! আমি সংকল্প করেছি, কোনো কুরাইশী অথবা আনসারী অথবা ছাকাফী অথবা দাওসী ব্যতীত কারো উপহার গ্রহণ করব না। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : হুজুর ﷺ কাউকে হাদিয়াস্বরূপ কোনো কিছু দিলে তার প্রতিদানের আশা রাখতেন না। কিন্তু হুজুরকে কেউ কিছু দিলে তিনি যে কোনোভাবেই তার প্রতিদান দিয়ে দিতেন। এটা ছিল তাঁর সুউচ্চ মননশীলতার পরিচায়ক। সাহাবায়ে কেরাম হুজুর ﷺ -কে কিছু হাদিয়া দিয়ে তার কিঞ্চিৎ পরিমাণও প্রতিদানের আশা পোষণ করতেন না।

কেননা, তাঁদের হাদিয়া ছিল পুরোটাই ভালোবাসার নজরানা, যাতে পার্থিব কোনো প্রতিদানের বিন্দুমাত্র আশাও মিশ্রিত থাকত না। এতদসত্ত্বেও হুজুরের স্বভাব ছিল যখনই কেউ হুজুরকে কোনো কিছু হাদিয়া দিত তখন হুজুর তার চেয়ে অধিক জিনিস তাকে প্রতিদান দিয়ে দিতেন, যা ছিল হুজুরের উচ্চাভিলাষী মনোভাবের প্রতিফলন মাত্র।

সুতরাং এক গ্রাম্য লোক হুজুর ﷺ -কে একটি উট হাদিয়া দিলে হুজুর ﷺ স্বভাবসুলভ তার হাদিয়ার প্রতিদানে ছয়টি জোয়ান উট তাকে দিয়েছেন, কিন্তু তাতে সেই গ্রাম্য লোকটি সন্তুষ্ট হতে পারছিল না, যা ছিল রীতিমতো একটি আশ্চর্যের ব্যাপার। কেননা, একে তো সে তার হাদিয়ার ব্যাপারে একনিষ্ঠ ছিল না এবং উক্ত হাদিয়া দানের পিছনে তার পার্থিব প্রতিদান প্রাপ্তিই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। যার কারণে হুজুর ﷺ সীমাহীন অসন্তুষ্ট হন এবং তিনি ঘোষণা দিতে বাধ্য হন যে, আমি কুরায়শী, আনসারী, ছাকাফী ও দাওসী গোত্র ব্যতীত অন্য কারো হাদিয়া গ্রহণ না করার সংকল্প করেছি। কেননা, তাদের হাদিয়ায় রয়েছে নিরঙ্কুশ ভালোবাসা, হৃদ্যতা ও একনিষ্ঠতার বহিঃপ্রকাশ।

قَوْلُهُ مِنْ قُرَشِيٍّ الخ -এর বিশ্লেষণ : কুরায়শী অর্থাৎ কুরায়শ গোত্রীয় আনসারী অর্থাৎ মদিনার আনসার যারা মক্কার মুহাজির ও হুজুর ﷺ -কে সাহায্য করেছিল। ছাকাফী ও দাওসী দুটি গোত্রের নাম। এ গোত্রগুলোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো তারা ছিল উচ্চাভিলাষী, সৎ সাহসী, দানশীলতা ও বদান্যতায় অন্যের তুলনায় ব্যতিক্রমী।

শব্দ-বিশ্লেষণ :

بَكْرَةٌ : এটি একবচন, বহুবচনে بَكَرَاتٌ - بِكَارٌ অর্থ– উষ্ট্রী।

تَسَخَّطَ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ اِثْبَاتٌ فِعْل مَاضِى مُطْلَق مَعْرُوْف বাবে تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّسَخُّطُ অর্থ– ক্রোধান্বিত হওয়া।

اَثْنٰى : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ اِثْبَاتٌ فِعْل مَاضِى مُطْلَق مَعْرُوْف বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِثْنَاءُ অর্থ– প্রশংসা করা।

وَعَنْ ٢٨٩٢ جَابِرٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْطٰى عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهٖ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ فَاِنَّ مَنْ اَثْنٰى فَقَدْ شَكَرَ وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ تَحَلّٰى بِمَا لَمْ يُعْطَ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَىْ زُوْرٍ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

২৮৯২. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যাকে দান করা হয় তার যদি সামর্থ্য থাকে সে যেন তার প্রতিদান করে; আর যার সামর্থ্য নেই সে যেন তার প্রশংসা করে। কেননা, যে তার প্রশংসা করেছে সে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে, আর যে তা গোপন করেছে সে তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। আর যে দান না পেয়েও পেয়েছে বলে, সে মিথ্যার দুটি কাপড় পরিধানকারী বা ডবল মিথ্যুক।

–[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَلَابِسِ ثَوْبَىْ زُوْرٍ -এর অর্থ : "সে হলো মিথ্যার দুটি কাপড় পরিধানকারী।" এ উক্তির কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে–

* এ উক্তিটি হুজুর ﷺ এমন মহিলার ব্যাপারে করেছেন যার সতিন ছিল। সে এসে হুজুর ﷺ -কে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সতিন আছে। সুতরাং আমার জন্য কি গুনাহ হবে যে, আমি আমার সতিনের সম্মুখে এমন ভাব প্রদর্শন করব, যা আমার স্বামী আমাকে দেয়নি। তখন হুজুর ﷺ তাকে বললেন, যে এ রকম করবে সে দুই মিথ্যার কাপড় পরিধানকারী–

  فَاَحَدُ الْكِذْبَيْنِ قَوْلُهَا اَعْطَانِىْ وَالثَّانِىْ اِظْهَارُهَا اَنَّ زَوْجِىْ يُحِبُّنِىْ اَشَدَّ مِنْ ضَرَّتِىْ .

  অর্থাৎ একটি মিথ্যা হলো যা তার স্বামী দেয়নি তার ব্যাপারে বলা যে, এটা আমার স্বামী আমাকে দিয়েছে। দ্বিতীয় মিথ্যা হলো, একথা প্রকাশ করা যে, আমার স্বামী আমাকে সতিনের চেয়ে অধিক মহব্বত করে।

* আবার কেউ বলেছেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন ব্যক্তি, যারা আলেম-ওলামাদের পোশাক পরিধান করে নিজেকে আলেম প্রকাশ করে অথচ বাস্তবিকপক্ষে সে আলেম নয়।

* আবার কেউ বলেছেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি এমন জামা পরিধান করে যার হাতার নিচে অতিরিক্ত দুটি হাতা থাকে, যাতে কেউ মনে করে যে, এ লোক দুটি জামা পরিধান করেছে।

* আবার কেউ বলেছেন যে, আরব দেশে এক ব্যক্তি ছিল, যে উন্নত মানের দুটি কাপড় পরিধান করত, যেন লোকেরা তাকে সম্মান করে এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে যেন সকলে তা বিশ্বাস করে। হুজুর ﷺ এ ব্যক্তিকে এমন ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছেন যে নিজেকে যোগ্য ব্যক্তি বলে প্রকাশ করে অথচ সেই যোগ্যতা তার মধ্যে নেই।

–[মেরকাত- খ. ৬, পৃ. ১০৬; মাজাহের খ. ৩, পৃ. ৬০২]

٢٨٩٣ - وَعَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صُنِعَ اِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهٖ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا فَقَدْ اَبْلَغَ فِى الثَّنَاءِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

২৮৯৩. অনুবাদ : হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার প্রতি কোনো ভালো ব্যবহার করা হলো, আর সে ভালো ব্যবহারকারীকে বলল, আল্লাহ আপনাকে ভালো প্রতিদান দিন। সে তার বহুল প্রশংসা করল। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَقَدْ اَبْلَغَ فِى الثَّنَاءِ-এর অর্থ : "সে তার বহুল প্রশংসা করল" উপকারীর উপকারের পরিবর্তে এ উক্তি করে সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের হক আদায় করে দিয়েছে। কেননা, সে উপকারীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে নিজের অপারগতা প্রকাশ করে তার প্রতিদানের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত করেছে, আর আল্লাহর চেয়ে অধিক প্রতিদান দানকারী আর কে হতে পারে।

٢٨٩٤ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ)

২৮৯৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। –[আহমদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** এ হাদীসের ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায়ের পূর্ণতা নির্ভর করে তার আনুগত্যের উপর। আর আল্লাহ তা'আলা শুকরিয়া আদায় বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং কেউ যদি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, তাহলে সে যেন আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করল। আর যে মানুষের উপকারের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল না, সে যেন আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করল না।

অথবা এর ব্যাখ্যা হলো, যে ব্যক্তি স্বীয় উপকারীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না এবং নিজের সাথে কৃত অনুগ্রহ ও উত্তম আচরণের কথা স্বীকার করে না সে নিয়ামতের নাশুক্‌রী করার এ বদঅভ্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলারও শুকরিয়া আদায় করে না।

٢٨٩٥ - وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ اَتَاهُ الْمُهَاجِرُوْنَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا رَاَيْنَا قَوْمًا اَبْذَلَ مِنْ كَثِيْرٍ وَلَا اَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيْلٍ مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ

২৮৯৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনা আগমন করলেন, মুহাজিরগণ তাঁর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যাদের মধ্যে এসে পৌঁছেছি তাঁদের অপেক্ষা প্রচুর জিনিসের দাতা এবং অল্প জিনিস দ্বারা হলেও সহানুভূতিশীল কোনো সম্প্রদায় আমরা আর দেখিনি। তাঁরা আমাদের কষ্টের ভার

اَظُهُرِهِمْ لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ وَاَشْرَكُوْنَا فِى الْمَهْنَاِ حَتّٰى لَقَدْ خِفْنَا اَنْ يَذْهَبُوْا بِالْاَجْرِ كُلِّهٖ فَقَالَ لَا مَا دَعَوْتُمُ اللّٰهَ لَهُمْ وَاَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَصَحَّحَهُ)

নিয়েছেন এবং কষ্টে অর্জিত জিনিসে আমাদেরকে শরিক করেছেন, যাতে আমরা ভয় করছি যে, তারাই সমস্ত ছওয়াব নিয়ে যাবেন। হুজুর ﷺ বললেন, তা হবে না যাবৎ তোমরা তাদের জন্য দোয়া কর ও তাদের প্রশংসা কর।-[তিরমিযী এটা বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ বলেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নবী করীম ﷺ বিরাট একদল মুহাজিরদের নিয়ে যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনা গমন করেন, তখন মদিনার অধিবাসী অর্থাৎ আনসারগণ তাঁদের সাথে যে উত্তম আচরণ, দানশীলতা, বদান্যতা, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন মানবতার ইতিহাস আজ পর্যন্ত তার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়নি। মদিনার আনসারগণ মক্কার মুহাজিরদের জন্য শুধুমাত্র মৌখিক ভালোবাসা জ্ঞাপন করেই ক্ষান্ত হননি; বরং তাদের ঘাম ঝরানো উপার্জনের অর্ধাংশও তাদের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন। জমাজমি, বাগবাগিচা, ঘরবাড়ি সব কিছু তাদের জন্য অর্ধেক বণ্টন করেছেন, এমনকি অনেকেই যাদের একাধিক স্ত্রী ছিল তন্মধ্য হতে সুন্দরী স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন এবং মুহাজির ভাইয়ের নিকট বিবাহ দিয়েছেন। তাদের সেবা ও খাতিরদারির নিমিত্ত মানবতার আভিজাত্যের সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষাসমূহকে পশ্চাতে ঠেলে রাখেন। তাদের এ ধরনের সীমাহীন অনুগ্রহে অনুপ্রাণিত হয়ে এক পর্যায়ে তারা হুজুর ﷺ -এর দরবারে তাদের সুপ্ত আশঙ্কা নিয়ে হাজির হন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ আনসারগণ সকল নেকিরই মালিক হয়ে যায় কিনা। কেননা, আমরা অদ্যাবধি তাদের ন্যায় এত অধিক দানশীল, অনুগ্রহকারী ও নিজের তুলনায় অন্যকে অগ্রাধিকার প্রদানকারী জাতি আর কাউকে দেখিনি।

মোটকথা, তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমাদের প্রতি আতিথেয়তা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করেছে। এমনকি জীবিকা উপার্জনের জন্য পরিশ্রম করা থেকেও আমাদেরকে বিরত রেখেছে। সকল পরিশ্রম তারা নিজেরা করে, কিন্তু উপার্জিত সম্পদে আমাদেরকে অর্ধেক বণ্টন করে দেয়। সুতরাং আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমাদের হিজরত ও অন্যান্য ইবাদতের সকল পুণ্য আল্লাহ তা'আলা তাদের আমলনামায় লিখে না দেয়।

কিন্তু হুজুর ﷺ তাদের আশ্বস্ত করলেন যে, এমন হবে না। কেননা, আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া অনেক বিশাল। তাঁর দরবারে ছওয়াবের ঘাটতি নেই। তোমরা তোমাদের কর্মের প্রতিফল পাবে, আর আনসারগণ তাদের কর্মের ফল পাবে– যদি তোমরা তাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করতে থাক। কেননা, তাদের জন্য তোমাদের দোয়া তাদের ইহসানের বিনিময় হয়ে যাবে এবং তোমাদের ইবাদতের ছওয়াব তোমরাই পেতে থাকবে।

وَعَنْ ٢٨٩٦ عَائِشَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَهَادَوْا فَاِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ الضَّغَائِنَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

২৮৯৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন– পরস্পরে উপহার [হাদিয়া] দেবে। কেননা, উপহার হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে। -[তিরমিযী]

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَلضَّغَائِنُ : এটি বহুবচন, একবচনে ضَغِيْنَةٌ অর্থ– হিংসা-বিদ্বেষ।

وَعَنْ ٢٨٩٧ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَهَادَوْا فَاِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسَنِ شَاةٍ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

২৮৯৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– একে অন্যকে হাদিয়া [উপহার] দাও। হাদিয়া অন্তরের কলুষ দূর করে। এক পড়শি অপর পড়শিকে হাদিয়া দিতে যেন অবহেলা না করে এবং কেউ যেন হাদিয়াকে সামান্য মনে না করে– যদিও এক টুকরা ভেড়ার ক্ষুর হয়। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ প্রতিবেশীকে সামান্য জিনিসও হাদিয়া দিতে তুচ্ছবোধ করবে না। আর যার নিকট হাদিয়া পাঠানো হলো তারও উচিত তা গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ না করা; বরং খুশিমনে সন্তুষ্টচিত্তে তা গ্রহণ করবে। যদিও তা অতি সামান্য জিনিসও হোক না কেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ : وَحَرٌ : এটি বাবে سَمِعَ -এর মাসদার। অর্থ– হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, মনের জ্বালা, শত্রুতা।

شِقٌّ : অর্থ– অর্ধাংশ, অংশ।

فِرْسَنٌ : অর্থ– অতি সামান্য গোশ্ত, ক্ষুর।

شَاةٌ : এটি একবচন, বহুবচনে شِيَاهٌ অর্থ– ছাগল, বকরি।

وَعَنْ ٢٨٩٨ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثٌ لَا تُرَدُّ الْوَسَائِدُ وَالدُّهْنُ وَاللَّبَنُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ قِيْلَ أَرَادَ بِالدُّهْنِ الطِّيْبَ .

২৮৯৮. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তিন জিনিস ফিরিয়ে দেওয়া যায় না, বসার গদি, তৈল ও দুধ। –[তিরমিযী]

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীস গরীব। কেউ বলেছেন, তৈল অর্থে এখানে খোশবুকে বুঝিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি অতিথি আপ্যায়নের নিমিত্তে শয়নকালে বালিশ, মাথায় লাগানোর জন্য তৈল ও পান করার জন্য দুধ পরিবেশন করে তাহলে সেই অতিথির জন্য সেগুলোর কোনোটিকেই হেয় প্রতিপন্ন করে প্রত্যাখ্যান করা সমীচীন হবে না। কেননা, এর দ্বারা মেজবানের মনে আঘাত লাগতে পারে। কেউ কেউ دُهْن দ্বারা সুগন্ধ উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন। তবে বাস্তবিক কথা হলো, এখানে তৈলই উদ্দেশ্য হবে। কেননা, তৎকালীন যুগেও আরবের লোকেরা মাথায় তৈল লাগাত।

وَعَنْ ٢٨٩٩ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ (رحـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمُ الرَّيْحَانَ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا)

২৮৯৯. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত আবূ ওসমান নাহদী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন তোমাদের কাউকে খোশবুদার জিনিস দেওয়া হয়, তখন সে যেন এটা ফিরিয়ে না দেয়। কেননা, তা বেহেশত হতে বের হয়েছে। –[তিরমিযী মুরসালরূপে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "তা জান্নাত থেকে বের হয়েছে" এ কথার অর্থ হলো, সুগন্ধিযুক্ত ফুলের জড় [শিকড়] জান্নাতে থাকে। এ কারণেই তা থেকে যে সুঘ্রাণ ছড়ায় তা জান্নাতেরই সুঘ্রাণ। ফুল সংক্রান্ত আলোচনা পরিচ্ছেদের শুরুতে দ্রষ্টব্য।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٩٠٠ - عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَتْ اِمْرَأَةُ بَشِيْرٍ اَنْحِلِ ابْنِيْ غُلَامَكَ وَاَشْهِدْ لِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَاَلَتْنِيْ اَنْ اَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِيْ وَقَالَتْ اَشْهِدْ لِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلَهُ اِخْوَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَفَكُلَّهُمْ اَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ مَا اَعْطَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَلَيْسَ يَصْلُحُ هٰذَا وَاِنِّيْ لَا اَشْهَدُ اِلَّا عَلٰى حَقٍّ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৯০০. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে। বর্ণিত তিনি বলেন, বশীরের স্ত্রী [আমরাহ বিনতে রাওয়াহাহ] বশীরকে বলল, আমার ছেলেকে তোমার গোলামটি দান কর এবং এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সাক্ষী করাও। সুতরাং সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, হুজুর! অমুকের মেয়ে আমার নিকট চেয়েছে আমি যেন তার ছেলেকে আমার গোলামটি দান করি এবং বলেছে, 'এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সাক্ষী করাও।' তখন হুজুর ﷺ বললেন- তার অন্য ভাই আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাদের প্রত্যেককেই কি এর অনুরূপ দান করেছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, তবে এটা ঠিক নয়, আর আমি সাক্ষী হই না হক বিষয় ছাড়া কিছুর উপরে। -[মুসলিম]

٢٩٠١ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُتِيَ بِبَاكُوْرَةِ الْفَاكِهَةِ وَضَعَهَا عَلٰى عَيْنَيْهِ وَعَلٰى شَفَتَيْهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ كَمَا اَرَيْتَنَا اَوَّلَهُ فَاَرِنَا اٰخِرَهُ ثُمَّ يُعْطِيْهَا مَنْ يَكُوْنُ عِنْدَهُ مِنَ الصِّبْيَانِ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ)

২৯০১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি, যখন তাঁর নিকট কোনো নতুন ফল আনা হতো, তিনি তা আপন চক্ষে ও ওষ্ঠে লাগাতেন এবং বলতেন, আয় আল্লাহ! যেভাবে তুমি আমাদেরকে এর প্রথমটি দেখিয়েছ সেভাবে এর শেষটিও দেখাও। অতঃপর তা তাঁর নিকট যে সকল ছেলে থাকত তাদেরকে দিয়ে দিতেন। -[বায়হাকী দাওয়াতে কাবীর]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَضَعَهَا عَلٰى عَيْنَيْهِ وَشَفَتَيْهِ **-এর মর্মার্থ :** "তিনি তা আপন চক্ষে ও ওষ্ঠে লাগাতেন" এর কারণ ছিল এর দ্বারা তিনি আল্লাহর একটি তাজা নিয়ামতকে সম্মান প্রদর্শন করা। আর দোয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হে আল্লাহ! যেভাবে আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতে নিয়ামত দান করেছেন, তেমনিভাবে পরকালীন নিয়ামতও দান করুন।

শব্দ-বিশ্লেষণ : بَاكُوْرَةٌ : এটি একবচন, বহুবচনে بَوَاكِرُ - بَاكُوْرَاتٌ অর্থ- গাছের প্রথম ফল, যে কোনো জিনিসেরই প্রথম বস্তু।

بَابُ اللُّقْطَةِ
পরিচ্ছেদ : কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস

اَللُّقَطَةُ -এর অর্থ : لُقَطَة শব্দটিকে দুভাবে পড়া যায়– ১. لُقَطَةٌ তথা لَامْ বর্ণে পেশ এবং قَافْ বর্ণে যবর। ২. لُقْطَةٌ তথা لَامْ বর্ণে পেশ ও قَافْ বর্ণে سَاكِنْ যোগে। শব্দটি لَقْطٌ মূলধাতু থেকে নির্গত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো– اَلْاَخْذُ مِنَ الْاَرْضِ বা জমিন থেকে কোনো জিনিস কুড়িয়ে নেওয়া। অতএব لُقَطَة -এর অর্থ– مَا يُوجَدُ عَلَى الْاَرْضِ مُلْقًى অর্থাৎ যা জমিতে পতিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

اَللَّقِيْطُ -এর অর্থ : لَقِيْطٌ শব্দটি فَعِيْلٌ -এর ওজনে صِفَتْ -এর সীগাহ। এর অর্থ হচ্ছে– اَلْوَلِيْدُ الَّذِيْ يُوْجَدُ مُلْقًى عَلَى الْاَرْضِ لَا يُعْرَفُ اَبَوَاهُ অর্থাৎ যে শিশুকে রাস্তায় পতিত পাওয়া যায়, যার পিতামাতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

اَلضَّالَّةُ -এর অর্থ : ضَالَّةٌ শব্দটি ضَلَالٌ থেকে নির্গত। اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ গ্রন্থকারের মতে এর অর্থ হলো– كُلُّ مَا ضَلَّ اَيْ فَقَدَ وَضَاعَ অর্থাৎ হারানো ও নষ্ট হওয়া বস্তুকে ضَالَّة বলা হয়।

উল্লিখিত শব্দত্রয়ের মধ্যকার পার্থক্য : উল্লিখিত শব্দ তিনটি হারানো বস্তুকে বুঝায়। তবে এদের পার্থক্য হচ্ছে এই–

১. জ্ঞানহীন বস্তুর জন্য لُقَطَة শব্দ, মানুষের জন্য لَقِيْط এবং চতুষ্পদ জন্তুর জন্য ضَالَّة শব্দ ব্যবহার করা হয়।

২. কেউ কেউ বলেন, যে জিনিস দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়, তাকে لُقَطَة এবং দেরিতে নষ্ট হলে তাকে لَقِيْط বলা হয়।

৩. আবার কারো মতে, অল্প বস্তুকে لُقَطَة আর বেশি বস্তুকে لَقِيْط বলা হয়।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٩٠٢ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ اَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ هِيَ لَكَ اَوْ لِاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৯০২. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, তার থলি ও মুখবন্ধন চিনে নেবে। অতঃপর এক বছরকাল তার প্রচার করবে। ইত্যবসরে যদি তার মালিক আসে [তবে তো ভালো], নচেৎ তোমার ইচ্ছা [দান কর বা খাও]। আবার সে জিজ্ঞাসা করল, তবে হারানো ছাগল? তিনি বললেন,তা তোমার, না হয় তোমার ভাইয়ের [মালিকের], না হয় নেকড়ে বাঘের। সে পুনঃ জিজ্ঞাসা করল, তবে হারানো উট? তিনি বললেন, তাতে তোমার মাথা ঘামাবার কি আছে? এর সাথে তার মশক ও জুতা রয়েছে– তা পানিতে নামিয়ে পানি এবং গাছের কাছে গিয়ে পাতা খাবে– অবশেষে তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে।

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اَعْرِفْ وِكَائَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَادِّهَا إِلَيْهِ.

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে– তিনি বললেন, তার প্রচার করবে এক বছরকাল এবং তার মুখবন্ধন ও থলি চিনিয়ে রাখবে। অতঃপর [যদি মালিক না আসে] তুমি তা ব্যয় করবে। তারপর যদি মালিক আসে তাকে তা দিয়ে দেবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لُقَطَة، لَقِيْط ও ضَالَّة-এর হুকুম : রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস উঠিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মতামত নিম্নরূপ–

১. مُتَقَلِّسَفَة গণের মতে, لُقَطَة কুড়িয়ে নেওয়া জায়েজ নয়। لِأَنَّهُ اَخْذُ الْمَالِ بِغَيْرِ اِذْنِ صَاحِبِهِ وَذٰلِكَ حَرَامٌ شَرْعًا ـ

২. কিছু কিছু তাবেয়ীর মতে, لُقَطَة উঠিয়ে নেওয়া জায়েজ, তবে না নেওয়া উত্তম।

لِاَنَّ صَاحِبَهَا يَطْلُبُهَا فِى الْمَوْضِعِ الَّذِىْ سَقَطَتْ مِنْهُ ـ

৩. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হলে তা কুড়িয়ে নেওয়া ওয়াজিব। সেটা যদি সামান্য বস্তু হয় এবং মালিক তা তালাশ করার মতো না হয়, তাহলে তা দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ। আর যদি এ পরিমাণ হয় যা মালিক তালাশ করবে, তাহলে মালিকের জন্য সংরক্ষণ করা ওয়াজিব।

৪. হানাফীগণের মতে, যদি তা মূল্যবান বস্তু হয় এবং নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তাহলে মালিককে পৌছানোর নিয়তে উঠানো উত্তম। আর যদি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকে, তাহলে উঠানো মুবাহ। আর যদি নিজে কুক্ষিগত করার নিয়তে উঠায়, তাহলে তা হারাম হবে। তবে যদি সামান্য জিনিস হয় তাহলে হারাম হবে না। যেমন– দু-চারটা আঙ্গুর ইত্যাদি। –[বাদায়েউস সানায়ে]

حُكْمُ دَفْعِ اللُّقْطَةِ بِغَيْرِ الْبَيِّنَةِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ : যদি কেউ লোক্তার রশি ও পাত্রের সঠিকমতো পরিচয় দেয় এবং এছাড়া অন্যকোনো দলিল পেশ করতে না পারে, তাহলে তাকে উক্ত মাল অর্পণ করা ওয়াজিব কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের মতানৈক্য রয়েছে–

১. ইমাম মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতে, عِفَاصْ ও وِكَاء তথ্য লোকতার পাত্র ও বাঁধন সম্পর্কে শনাক্ত করতে পারলে অন্যকোনো প্রমাণ ব্যতিরেকেই তাকে লোকতা প্রদান করা ওয়াজিব। তাঁদের দলিল হচ্ছে–

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا

২. ইমাম আবূ হানীফা ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে, বাঁধন, থলের সংখ্যা এবং ওজনের শনাক্ত দেওয়ার পর مُلْتَقِطْ-এর যদি বিশ্বাস হয় যে, মাল তার তাহলে তাকে লোকতা দেওয়া যেতে পারে। আর যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে দাবির অনুকূলে দলিল দেখাতে হবে।

اَلْجَوَابُ : হাদীসে مُلْتَقِطْ-কে عِفَاصْ ও وِكَاء-এর পরিচিতির যে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে তা دَفْعٌ اِلَى الْمُدَّعِىْ-এর জন্য নয়; বরং তা مُلْتَقِطْ-এর মালের সাথে সংমিশ্রণ না হওয়ার জন্য। অন্যথা মালিক আসলে তা পৃথক করা কষ্টকর হবে।

প্রচার করার সময়সীমার ব্যাপারে মতানৈক্য : রাস্তায় পতিত জিনিস উঠালে তা মালিকের অবগতির জন্য কতদিন পর্যন্ত প্রচারকার্য চালাতে হবে– এ সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে।

১. اَئِمَّة ثَلَاثَة ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, মাল চাই কম হোক বা বেশি হোক সর্বাবস্থায় এক বছর পর্যন্ত প্রচার করতে হবে। তাঁদের দলিল হলো হুজুর ﷺ -এর বাণী– ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً

২. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এ ব্যাপারে তিনটি অভিমত রয়েছে–

ক. اَئِمَّة ثَلَاثَة -এর অভিমতের ন্যায়।

খ. যদি তা ১০ দিরহামের চেয়ে কম হয় তাহলে অল্প কিছুদিন প্রচার করতে হবে, আর যদি ১০ দিরহাম বা এর চেয়ে অধিক হয় তাহলে এক বছর প্রচার করতে হবে।

গ. প্রচারের নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই; বরং তা مُبْتَلٰى بِهٖ -এর রায়ের উপর নির্ভরশীল। তাঁদের দলিল–

عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ (رض) قَالَ وَجَدْتُ صُرَّةً فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا ـ (اَبُوْ دَاوُدَ)

এখানে দু বৎসর প্রচার করতে বলা হয়েছে। অন্য এক হাদীসে مُطْلَقًا প্রচারের কথা বলা হয়েছে। যেমন–

قَالَ النَّبِىُّ ﷺ عَرِّفْهَا ـ

এ সকল হাদীস দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা বুঝা যায় না; বরং স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে।

بَابٌ : اَلْجَوَابُ-এর হাদীসে এক বৎসরের কথা اِتِّفَاقِيْ বা অধিকাংশের হিসেবে বলা হয়েছে।

–[আত-তা'লীকুস সাবীহ- খ. ৩, পৃ. ৩৮৪, বাযলুল মাজহূদ- খ. ৩, পৃ. ৬৭]

اَلْاِخْتِلَافُ فِي الْاِسْتِمْتَاعِ بِاللُّقْطَةِ : مُلْتَقِطْ কর্তৃক লোকতার মাল ব্যবহার করা ও তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে–

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ (رح) : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে, مُلْتَقِطْ ধনী হোক বা দরিদ্র হোক, ভালোভাবে প্রচার করার পর মালিকের হাদীস পাওয়া না গেলে সে তা ব্যবহার করতে পারবে। তাঁদের দলিল হলো–

١. اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاِلَّا فَشَانُكَ بِهَا -

٢. وَفِي رِوَايَةٍ وَاِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا -

مَذْهَبُ الْاِمَامِ الْاَعْظَمِ اَبُو حَنِيْفَةَ (رح) : ইমাম আবূ হানীফা, সুফিয়ান ছাওরী ও সাহেবাইন (র.)-এর মতে, مُلْتَقِطْ যদি গরিব হয় তাহলে সে তা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে, আর যদি ধনী ও হাশেমী বংশের হয় তাহলে তা সদকা করে দেওয়া অত্যাবশ্যক। তাঁদের দলিল হলো–

١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِيَتَصَدَّقْ بِهَا الْغَنِيُّ وَلَا يَنْتَفِعْ بِهَا - (اَحْمَدُ)

٢- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ فَلْيَرُدَّهُ اِلَيْهِ وَاِنْ لَمْ يَاْتِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ -

اَلْجَوَابُ :

১. প্রথম দলিলের জবাবে বলা যায় যে, এখানে شَانُكَ উহ্য فِعْل-এর مَفْعُوْل মূল ইবারত হবে এরূপ–

اَيْ خُذْ شَانَكَ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ مِنْ صَدَقَةٍ اَوْ اَكْلٍ اَوْ غَيْرِهَا .

অর্থাৎ "তুমি তা উঠিয়ে নাও। যদি ধনী হও তাহলে সদকা করে দিও, আর গরিব হলে নিজে উপভোগ করবে।"

২. দ্বিতীয় দলিলের জবাব হলো, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) ঋণগ্রস্ত ছিলেন বিধায় হুজুর ﷺ বলেছেন– فَاسْتَمْتِعْ بِهَا তিনি যে অভাবী ছিলেন, তার প্রমাণ হুজুরের অন্য উক্তি থেকে পাওয়া যায়। হযরত আবূ তালহা (রা.) একটি বাগান সদকা করার মত ব্যক্ত করলে হুজুর ﷺ তাকে বলেছেন– اِجْعَلْهَا فُقَرَاءَ اَهْلِكَ فَتَصَدَّقْ عَلٰى حَسَّانٍ وَاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

قَوْلُهُ فَضَالَّةُ الْاِبِلِ : হারানো উট প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে হুজুর ﷺ বললেন– "উটের ব্যাপারে তোমার চিন্তা কেন"? অর্থাৎ তা নিও না। কেননা, তা ধ্বংসশীল নয়। সুতরাং ضَالَّةُ الْاِبِلِ এবং এমন প্রাণী যা হারিয়ে গেলে ধ্বংস হয় না তা কুড়িয়ে নেওয়া জায়েজ হবে কিনা, সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

১. اَئِمَّةٌ ثَلَاثَةٌ-এর মতে, তার اِلْتِقَاطٌ বা কুড়িয়ে নিয়ে যাওয়া জায়েজ হবে না। কেননা, এমন প্রাণী কুড়িয়ে নিতে হবে যা রাখাল ব্যতীত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাঁদের দলিল হলো–

حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ فَضَالَّةُ الْاِبِلِ قَالَ (ع) مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاءُهَا وَحِذَاءُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاْكُلُ الشَّجَرَ -

অর্থাৎ উটের সাথে পানি ও বিচরণ করার মতো জিনিস তার আছে সুতরাং তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

২. হানাফীগণের মতে সকল প্রকার প্রাণীই হারিয়ে গেলে তা ধরে নিয়ে গিয়ে সংরক্ষণ করা যাবে। তাঁদের দলিল হলো– ضَالَّةُ الْغَنَمِ-এর اِلْتِقَاطٌ-এর যে কারণ বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো– قَالَ هِيَ لَكَ اَوْ لِاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ

অর্থাৎ তুমি ধরে না নিলে তা বাঘে খেয়ে ফেলবে তথা নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং সাম্প্রতিককালে উট যদিও বাঘে খাবে না, কিন্তু মানুষ নামক বাঘ তা খেয়ে ফেলবে। সুতরাং এ যুগে উটও ধরে নিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। মোটকথা, যে কারণে বকরি কুড়িয়ে নিতে বলা হয়েছে, বর্তমান যুগে সেই কারণ উটের মধ্যেও পাওয়া যায়।

এ কারণেই হযরত ওসমান (রা.) উটের اِلْتِقَاطٌ-এর নির্দেশ দিয়েছেন।

اَلْجَوَابُ :

১. مَا لَكَ দ্বারা اِلْتِقَاطٌ না করার جَوَازٌ বুঝে আসে; وُجُوْبٌ বুঝে আসে না।

২. সে যুগ ছিল خَيْرُ الْقُرُوْنِ-এর যুগ। চোর-ডাকাতের আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু বর্তমান যুগে তার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে, তাই উটও اِلْتِقَاطٌ করা উচিত।

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَلْعِفَاصُ وَالْوِكَاءُ : তানযীমুল আশতাত গ্রন্থকারের মতে, عِفَاصٌ হচ্ছে- اَلْوِعَاءُ الَّذِىْ يَكُوْنُ فِيْهِ اَللُّقْطَةُ অর্থাৎ যে পাত্রে لُقْطَة রাখা হয়। আর وِكَاء হলো- هُوَ الْخَيْطُ الَّذِىْ تُشَدُّ بِهِ الصُّرَّةُ اَوِ الْكِيْسُ اَوْ غَيْرُهَا অর্থাৎ যে রশি দ্বারা বেগ ও থলে বাঁধা হয়।

وَعَنْهُ ٢٩٠٣ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اٰوٰى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৯০৩. অনুবাদ : উক্ত হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে হারানো পশুকে আশ্রয় দিয়েছে সে নিজেই পথহারা, যাবৎ না সে তার প্রচার করে। -[মুসলিম]

وَعَنْ ٢٩٠٤ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৯০৪. অনুবাদ : হযরত আবদুর রহমান ইবনে ওসমান তাইমী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজীদের হারানো জিনিস উঠাতে নিষেধ করেছেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاِخْتِلَافُ فِىْ لُقْطَةِ الْحَرَمِ : হেরেম শরীফের কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস প্রচার করার সময়সীমা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ রয়েছে-

১. শাফেয়ীদের মতে হেরেম শরীফের কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস উঠালে তার প্রচার সব সময় করতে হবে। তা সদকা করা বা নিজে মালিক হওয়া যাবে না। তাঁদের দলিল হলো-

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لُقْطَةِ الْحَاجِّ

২. হানাফীগণের মতে, হেরেম ও হেরেমের বাহিরের কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসের হুকুম একই। এর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। তাঁদের দলিল হলো-

* হযরত ওমর, ইবনে আব্বাস, আয়েশা ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা.)-এর মতে উভয়টির হুকুম হলো-

اِنَّ حُكْمَ لُقْطَةِ مَكَّةَ كَحُكْمِ سَائِرِ الْبُلْدَانِ .

اَلْجَوَابُ : তাঁদের দলিলের উত্তর হলো, উক্ত হাদীস خَيْرُ الْقُرُوْنِ -এর জন্য প্রযোজ্য হবে, কিন্তু বর্তমান যুগে পড়ে থাকলে নষ্ট বা চুরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, তাই তা কুড়িয়ে নেওয়া জায়েজ হবে। -[বযলুল মাজহুদ- খ. ৩, পৃ. ৭০, তা'লীক, মেরকাত]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٩٠٥ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَنْ اَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِىْ حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَىْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوْبَةُ وَمَنْ

২৯০৫. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, গাছে ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন- যদি কোনো অভাবী লোক তা হতে কিছু খায় তাতে তার উপর কিছুই নেই, যদি আঁচলে ভরে কিছু না নিয়ে যায়। হ্যাঁ, যদি তার কিছু নিয়ে যায়, তবে তার উপর দুই গুণ দণ্ড বর্তিবে, তদুপরি সাজাও হবে, [অবশ্য হাত কাটা যাবে না। কিন্তু] যে তার কিছু

سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ اَنْ يُّؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَ ذَكَرَ فِيْ ضَالَّةِ الْاِبِلِ وَالْغَنَمِ كَمَا ذَكَرَ غَيْرُهُ قَالَ وَسُئِلَ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْهَا فِى الطَّرِيْقِ الْمَيْتَاءِ وَالْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا اِلَيْهِ وَاِنْ لَمْ يَاْتِ فَهُوَ لَكَ وَمَا كَانَ فِى الْخَرَابِ الْعَادِيِّ فَفِيْهِ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ ـ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَ رَوٰى اَبُوْ دَاوُدَ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ وَسُئِلَ عَنِ اللُّقْطَةِ اِلٰى اٰخِرِهِ)

চুরি করবে খলায় স্থান দেওয়ার পর, যার মূল্য হয় একটি ঢালের, তার হাত কাটা যাবে। এখানে আমরের দাদা হারানো উট ও ছাগলের উল্লেখ করেন যেভাবে অন্যরা উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, হুজুরকে জিজ্ঞাসা করা হলো হারানো জিনিস সম্পর্কেও। তখন তিনি বললেন, যা আবাদ রাস্তায় অথবা আবাদ বস্তিতে পাওয়া যায়, আর তার জন্য সে এক বছর প্রচার করে, অতঃপর যদি তার মালিক আসে, তবে তো তা তাকে দিয়ে দেবে, আর যদি এর মালিক না আসে, তবে তা তোমার হবে। আর যা বিরান জায়গায় পাওয়া যায় তাতে এবং মাটিতে প্রোথিত গুপ্তধনের এক-পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে দিতে হবে [এবং বাকিটা তোমার হবে]। –[নাসায়ী। আবূ দাউদ 'হারানো জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো' হতে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مِنْ ذِىْ حَاجَةٍ : ذِىْ حَاجَةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য যে কোনো দরিদ্র ও গরিব মানুষ, অথবা مُضْطَرٌّ বা মৃত প্রায় ব্যক্তি। অর্থাৎ এ ধরনের ব্যক্তি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে ফল পেড়ে খেতে পারবে; কিন্তু থলেতে ভর্তি করে নিয়ে যেতে পারবে না। হযরত ইবনে মালেক (র.) বলেন, এ কাজের দ্বারা গুনাহ হবে না, তবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

অথবা বলা যায় যে, এ হুকুম ইসলামের শুরু যুগে ছিল, পরবর্তীতে তা মনসুখ হয়ে গেছে। অথবা এ হুকুম এমন এলাকার জন্য যেখানে ফল পেড়ে খাওয়াকে দূষণীয় মনে করা হয় না।

قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ : "তার উপর দ্বিগুণ দণ্ড বর্তিবে।" হযরত ইবনে মালেক (র.) বলেন, একথা সতর্কতার জন্য বলা হয়েছে, নতুবা মাসআলা অনুসারে ঐ ফলের দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তবে হযরত ওমর (রা.) ও ইমাম আহমদ (র.) হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণের কথা বলে থাকেন। আবার কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এটাও ইসলামের শুরু যুগের ঘটনা। পরবর্তীতে তা মনসুখ হয়ে গেছে। –[মেরকাত- খ. ৬, পৃ. ১৬৩]

২৯০٦ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ وَجَدَ دِيْنَارًا فَاَتٰى بِهٖ فَاطِمَةَ فَسَاَلَ عَنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا رِزْقُ اللّٰهِ فَاَكَلَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَكَلَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ اَتَتْ اِمْرَاَةٌ تَنْشُدُ الدِّيْنَارَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَلِيُّ اَدِّ الدِّيْنَارَ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৯০৬. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একবার হযরত আলী (রা.) একটি হারানো দিনার পেলেন এবং তা হযরত ফাতেমা (রা.)-কে দিলেন। অতঃপর [অর্থাৎ প্রচারের পর] সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক। সুতরাং এটা হতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খেলেন এবং হযরত আলী ও ফাতেমা (রা.)ও খেলেন। এরূপ হওয়ার পর এক স্ত্রীলোক দিনারের সন্ধানে আসল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আলী! তার দিনার আদায় করে দাও। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হুজুর ﷺ যাচাই-বাছাইবিহীন উক্ত মহিলাকে لُقْطَة দিয়ে দেওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, তিনি ওহীর মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, উক্ত لُقْطَة তারই।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, হযরত আলী (রা.) প্রচারের পূর্বেই উক্ত দিনার কেন ব্যবহার করে ফেললেন, অথচ প্রচার করা সর্বসম্মতিক্রমে জরুরি?

উত্তর : ১. প্রচারের জন্য কোনো শব্দ নির্দিষ্ট নেই। হযরত আলী (রা.) যখন উক্ত দিনার নিয়ে সাহাবীদের সম্মুখ দিয়ে হুজুরের দরবারে আসলেন এবং আলোচনা করলেন, এতেই প্রচার হয়ে যায়। তা ছাড়া একটা দিনারের জন্য এতটুকু প্রচারই যথেষ্ট।

২. মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাকে উক্ত রেওয়ায়েত অন্যভাবে এসেছে। তা হলো—

إِنَّ عَلِيًّا وَجَدَ دِيْنَارًا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ عَرِّفْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, হযরত আলী (রা.) তিনদিন ঘোষণা করেছিলেন।

৩. এ হাদীসটির সনদ খুবই দুর্বল। - قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِيْ إِسْنَادِهِ رَجُلٌ مَجْهُوْلٌ

٢٩٠٧ - وَعَنِ الْجَارُوْدِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ - (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

২৯০৭. অনুবাদ : হযরত জারূদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— মুসলমানের হারানো জিনিস আগুনের স্ফুলিঙ্গস্বরূপ [যে তার জন্য প্রচার না করে]। –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি لُقْطَة -কে অসৎ উদ্দেশ্যে উঠায় বা তার ঘোষণা বা প্রচার না করে নিজেই মালিক হয়ে যায়, তাহলে উক্ত লোকতা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

٢٩٠٨ - وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَجَدَ لُقْطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَىْ عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ)

২৯০৮. অনুবাদ : হযরত ইয়ায ইবনে হেমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— যে ব্যক্তি কোনো হারানো বস্তু পায়, সে যেন এক কি দুজন ন্যায়বান লোককে সে সম্পর্কে সাক্ষী করে এবং তা গোপন ও গায়েব না করে, অতঃপর যদি তার মালিককে পায় তাকে তা ফিরিয়ে দেয়। নচেৎ তা আল্লাহর মাল, তিনি যাকে চান তাকে দেন। –[আহমদ, আবূ দাউদ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

লোকতার মাল পাওয়ার সাক্ষী রাখার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : লোকতার মাল পাওয়ার সাক্ষী রাখা জরুরি কিনা এ ব্যাপারে ইমামদের মতামত নিম্নরূপ—

১. ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে, লোকতার উপর দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী বানানো মোস্তাহাব। তাঁদের দলিল হচ্ছে- لِاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَاْمُرْ بِهِ وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَبَيَّنَهُ

অর্থাৎ নবী করীম ﷺ এর নির্দেশ দেননি। যদি এটা ওয়াজিব হতো, তাহলে নিশ্চয়ই নির্দেশ দিতেন।

২. ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অন্য অভিমত অনুযায়ী لُقَطَة-এর উপর সাক্ষী রাখা আবশ্যক। তাঁদের দলিল হলো- لِحَدِيْثِ عِيَاضٍ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ

اَلْجَوَابُ : আহনাফ তাঁদের দলিলের উত্তরে বলেন যে, এক হাদীসে সাক্ষী কায়েম করার কথা উল্লেখ না থাকা বিষয়টি সাবেত না হওয়ার দলিল নয়। কেননা, একই হাদীসে সব কিছুর উল্লেখ থাকে না।

وَعَنْ ٢٩٠٩ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ رَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَاَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَ ذُكِرَ حَدِيْثُ الْمِقْدَامِ ابْنِ مَعْدِيْكَرِبَ اَلَا لَا يَحِلُّ فِىْ بَابِ الْاَعْتِصَامِ)

২৯০৯. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছড়ি, চাবুক, রশি ও এগুলোর ন্যায় [নগণ্য] জিনিস– যা কোনো ব্যক্তি উঠায়, তার দ্বারা নিজে উপকার লাভ করতে আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসের অর্থ হলো, যদি لُقَطَة হাদীসে বর্ণিত জিনিসসমূহের যে কোনো একটি হয় সে ক্ষেত্রে যদি গ্রহণকারী গরিব হয়, তাহলে ঘোষণা ও প্রচার ব্যতিরেকেই নিজ কার্যে ব্যবহার করতে পারবে।

'শরহুস সুন্নাহ' গ্রন্থে লিখিত আছে, এ হাদীস এ কথার দলিল যে, যদি লোকতা কোনো সাধারণ ও তুচ্ছ জিনিস হয় তাহলে তার ঘোষণা করার প্রয়োজন নেই। তবে তুচ্ছ হওয়ার সীমা সম্পর্কে কেউ বলেছেন– দশ দিরহামের কম মূল্য হলে তা তুচ্ছ বা স্বল্প বিবেচিত হবে, আবার কেউ বলেছেন– এক দিরহাম হলে তা স্বল্প বিবেচিত হবে। যেমন হযরত আলী (র.)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

اَلْفَرَائِضُ-এর আভিধানিক অর্থ : فَرَائِضُ শব্দটি فَرِيْضَةٌ-এর বহুবচন। মূল অক্ষর فَرْضٌ ; এর আভিধানিক অর্থ–

১. اَلتَّقْدِيْرُ বা নির্ধারণ করা। যেহেতু এতে ওয়ারিশদের হক আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে।

২. শরহুস্ সুন্নাহ গ্রন্থকারের মতে, فَرْض-এর অর্থ হচ্ছে– "قَطْع" বা কর্তন করা। যেমন বলা হয়–

فَرَضْتُ لِفُلَانٍ إِذَا قَطَعْتَ لَهُ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا .

৩. إِعْطَاءُ شَيْءٍ بِلَا عِوَضٍ বা বিনা প্রতিদানে কাউকে কোনো কিছু দান করা। একে ফারায়েয এজন্য বলা হয় যে, তাতে ওয়ারিশদেরকে বিনা প্রতিদানে সম্পদ দেওয়া হয়।

اَلْفَرَائِضُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরিয়তের পরিভাষায় ফারায়েয বলা হয়–

اَلْفَرَائِضُ هُوَ عِلْمٌ بِقَوَاعِدَ وَجُزْئِيَّاتٍ مِنْ فِقْهٍ وَحِسَابٍ تُعْرَفُ بِهَا كَيْفِيَّةُ صَرْفِ التَّرِكَةِ إِلَى الْوَارِثِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ -

مَوْضُوْعُ عِلْمِ الْفَرَائِضِ : ইলমে ফারায়েযের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে–

১. اَلتَّرِكَةُ – মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ।

২. اَلْوَرَثَةُ – ওয়ারিশগণ।

غَايَةُ الْفَرَائِضِ : প্রত্যেক উত্তরাধিকারীকে তার প্রাপ্য ন্যায়সঙ্গতভাবে নিশ্চিতকরণ এবং সকলের সঠিক প্রাপ্য প্রদান করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

কতিপয় পরিভাষা এবং তার প্রকার ও বিশ্লেষণ :

* ذَوِى الْفُرُوْضِ : পবিত্র কুরআনে যে সকল ওয়ারিশদের অংশ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে ذَوِى الْفُرُوْضِ বলা হয়। তাদের সংখ্যা মোট ১২ জন– চারজন পুরুষ আর আটজন মহিলা।

* পুরুষ চারজন হচ্ছে– ১. পিতা, ২. দাদা, ৩. বৈপিত্রেয় ভাই ও ৪. স্বামী।
  নারী আটজন হচ্ছে– ১. স্ত্রী, ২. কন্যা, ৩. পুত্রের কন্যা, ৪. সহোদরা ভগ্নি, ৫. বৈমাত্রেয় ভগ্নি, ৬. বৈপিত্রেয় ভগ্নি, ৭. মা ও ৮. দাদী।

* اَلْعَصَبَةُ : عَصَبَةُ শব্দটি عَاصِبٌ-এর বহুবচন। এটা عَصُوْبَةٌ মাসদার থেকে নির্গত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ– রগ, জোড়া, টুকরা। اَلْقَامُوْسُ الْفِقْهِيُّ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পিতার দিকের আত্মীয়তাকে عَصَبَة বলা হয়। বহুবচনে عَصَبَاتٌ ব্যবহৃত হয়।

* ফারায়েযের পরিভাষায় ঐ সকল ওয়ারিশকে عَصَبَة বলা হয়, যাদের সাথে মৃত ব্যক্তির রক্ত-মাংসের সম্পর্ক থাকে। ذَوِى الْفُرُوْضِ-কে সম্পদ দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে এরা সবগুলোর মালিক হবে।

* عَصَبَة মোট তিন প্রকার :

১. عَصَبَة بِنَفْسِه : এমন পুরুষ ওয়ারিশ যাদের সাথে মৃত ব্যক্তির সম্পর্ক স্থাপনে কোনো নারীর মধ্যস্থতা লাগে না। তারা চার শ্রেণিতে বিভক্ত–

ক. جُزْءُ الْمَيِّتِ : যেমন– পুত্র, (খ) اَصْلُ الْمَيِّتِ যেমন– পিতা, গ. جُزْءُ اَبٍ যেমন– ভাই, ঘ. جُزْءُ جَدٍّ যেমন– চাচা।

২. عَصَبَةٌ بِغَيْرِه : অন্যের কারণে যারা আসাবা হয়। তারা হচ্ছে ৪ প্রকার মহিলা। যেমন– ১. মৃত ব্যক্তির কন্যা, ২. পৌত্রী, ৩. সহোদরা বোন, ৪. বৈমাত্রেয় বোন। এরা তখনই عَصَبَة হবে যখন এদের ভাই থাকবে। পক্ষান্তরে যদি এদের ভাই না থাকে, তাহলে তারা ذَوِى الْفُرُوْضِ হিসেবে অংশ পাবে।

৩. عَصَبَةٌ مَعَ غَيْرِهِ : এদের পরিচয় দিচ্ছেন আল্লামা সিরাজী (র.) –

فَكُلُّ أُنْثَى تَصِيْرُ عَصَبَةً مَعَ أُنْثَى أُخْرَى كَالْأُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত তিন প্রকার আসাবাকে فرائض-এর পরিভাষায় عَصَبَه نَسَبِيْ বলে। এছাড়া আরেক প্রকার عَصَبَة আছে যাকে عَصَبَة سَبَبِيْ বলা হয়। তা হচ্ছে مَوْلَى الْعَتَاقَة কেননা, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ

مَوَانِعُ اِرْث বা উত্তরাধিকারের প্রতিবন্ধকতাসমূহ : তা মোট ৪টি–

১. اَلرِّقُّ বা দাসত্ব। সুতরাং কোনো গোলাম আজাদের এবং কোনো আজাদ ব্যক্তি গোলামের উত্তরাধিকার হতে পারবে না।

২. اَلْقَتْلُ বা হত্যা। হত্যা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন হত্যা যাতে কেসাস বা কাফফারা ওয়াজিব হয়। সুতরাং قَتْلٌ بِسَبَبٍ -এর কারণে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না। কেননা, এ ধরনের হত্যায় قِصَاص ও كَفَّارَة কোনোটাই ওয়াজিব হয় না। [উল্লেখ্য যে, قَتْل বা হত্যা পাঁচ প্রকার, যার আলোচনা যথাস্থানে আসবে।]

৩. اِخْتِلَافُ الدِّيْنَيْنِ বা উভয়ের ধর্ম ভিন্ন হওয়া। যেমন– একজন কাফের অপরজন মুসলমান। এক্ষেত্রেও উত্তরাধিকার হতে পারবে না।

৪. اِخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ বা ভিন্ন দেশি হওয়া। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি ইসলামি রাষ্ট্রে থাকে আর উত্তরাধিকার دَارُ الْحَرْبِ-এ থাকে সে ক্ষেত্রেও মিরাস থেকে বঞ্চিত হবে। তবে এ হুকুম বিধর্মীদের জন্য। কেননা, মুসলমান মৃত ব্যক্তি ও উত্তরাধিকার ভিন্ন দেশের অধিবাসী হলেও মিরাস পাবে।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٩١٠ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهٖ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِيْ فَاَنَا مَوْلَاهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهٖ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَاِلَيْنَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৯১০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন– আমি মু'মিনদের পক্ষে তাদের নিজেদের অপেক্ষাও নিকটতর। সুতরাং যে মরে যায় ও তার উপর ঋণের বোঝা থাকে, আর যে তা পরিশোধ করার পরিমাণ সম্পত্তি রেখে না যায়, তা পরিশোধ করার ভার আমার উপর। আর যে মাল রেখে যায় তা তার ওয়ারিশগণের। অপর এক বর্ণনায় আছে– যে ঋণ অথবা অসহায় পোষ্য রেখে যায়, সে যেন আমার নিকট আসে, আমিই তার অভিভাবক। অপর বর্ণনায় আছে– যে মাল রেখে যাবে তা তার ওয়ারিশগণের হবে; আর যে কোনো বোঝা রেখে যাবে তা আমার প্রতি বর্তাবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٢٩١١ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِاَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৯১১. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– নির্ধারিত দায়-ভাগসমূহ তাদের হকদারদেরকে পৌঁছিয়ে দেবে। তারপর যা বাঁচবে তা নিকটতম পুরুষ ব্যক্তির। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে প্রথমে ঐ সমস্ত লোকদের অংশ বুঝিয়ে দাও, যাদের ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। যাদেরকে ذَوِى الْفُرُوْضِ বলা হয়। তাদের নির্দিষ্ট অংশ দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা عَصَبَاتٌ দেরকে দাও। আবার عَصَبَاتٌ -এর মধ্যে সর্বপ্রথম ঐ عَصَبَة -কে দিতে হবে যারা মৃত ব্যক্তির নিকটতম। কেননা, নিকটতম আত্মীয় থাকা অবস্থায় দূরবর্তী আত্মীয়স্বজন অংশ পাবে না। ذَوِى الْفُرُوْضِ ও عَصَبَاتٌ -এর আলোচনা পরিচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِاَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ : এখানে رَجُلٌ -এর পর ذَكَرٌ শব্দটি تَاكِيْد -এর জন্যও হতে পারে, আবার এর দ্বারা مُخَنَّثٌ -কে مُسْتَثْنٰى করাও উদ্দেশ্য হতে পারে।

শরহুস্ সুন্নাহ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, এ হাদীস একথার প্রমাণ বহন করে যে, কতেক ওয়ারিশ অপর ওয়ারিশগণের জন্য حَاجِبٌ অর্থাৎ মিরাস হ্রাসকারী হয়ে থাকে। যেমন– মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকলে তার মা পূর্ণ সম্পত্তি হতে $\frac{1}{3}$ অংশ পায়। আর সন্তান থাকলে সে $\frac{1}{6}$ অংশ পায়। আবার কখনো একজনের কারণে অপরজন্য পূর্ণ মিরাস থেকে বঞ্চিত হয়। যেমন– মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকা অবস্থায় তার ভাই কিছুই পাবে না। –[মেরকাত- খ. ৬, পৃ. ১৬৮]

وَعَنْ ٢٩١٢ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৯১২. অনুবাদ : হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– না মুসলিম কাফেরের ওয়ারিশ হবে আর না কাফের মুসলিমের। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ وِرَاثَةِ الْكَافِرِ مِنَ الْمُسْلِمِ : আল্লামা নববী (র.) বলেন, এ ব্যাপারে সকল মুসলমানের ইজমা রয়েছে যে, কাফের মুসলমানের ওয়ারিশ হতে পারবে না। এর দলিল হলো–

١. لَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا .

٢. اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .

حُكْمُ وِرَاثَةِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ : মুসলমান কাফেরের উত্তরাধিকার হবে কিনা এ বিষয়ে দুটি মত পাওয়া যায়।

১. জমহুর ওলামার মতে, মুসলমানও কাফেরের ওয়ারিশ হবে না। কেননা, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

২. একদল আলেমের মতে, মুসলমান কাফেরের وَارِثٌ হবে। তাদের দলিল হচ্ছে– اَلْاِسْلَامُ يَعْلُوْ وَلَا يُعْلٰى عَلَيْهِ

اَلْجَوَابُ : জমহুরের পক্ষ থেকে তাদের দলিলের জবাব হলো, এ হাদীসে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে مِيْرَاثٌ সংক্রান্ত কোনো আলোচনা নেই। অতএব সহীহ হাদীসের উপর আমল করে বলতে হবে যে, মুসলমান কাফেরের وَارِثٌ হবে না।

وَعَنْ ٢٩١٣ اَنَسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৯১৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোনো গোত্রের মুক্ত ক্রীতদাস সে গোত্রেরই একজন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে مَوْلٰى দ্বারা উদ্দেশ্য হলো "আজাদকারী"। সুতরাং হাদীসের অর্থ হবে- আজাদকৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ হবে ঐ ব্যক্তি যে তাকে আজাদ করেছে। কিন্তু "আজাদকৃত গোলাম" তার মালিকের ওয়ারিশ হতে পারবে না।

আবার কেউ বলেছেন যে, "مَوْلٰى" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো "আজাদকৃত গোলাম" অর্থাৎ যে গোত্রের লোকেরা বা কোনো ব্যক্তি গোলাম আজাদ করবে, তাহলে ঐ গোলামের হুকুম সেটাই হবে যা তার আজাদকারী ব্যক্তি বা গোত্রের হুকুম হবে। উদাহরণত বনী হাশেম গোত্রের লোকেরা কোনো গোলাম আজাদ করেছে, তাহলে ঐ আজাদকৃত গোলাম জাকাতের ব্যাপারে বনী হাশেমের হুকুমে হবে। বনী হাশেম যেভাবে জাকাতের মাল খেতে পারবে না; এ গোলামও জাকাত খেতে পারবে না।

٢٩١٤ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِبْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَ ذُكِرَ حَدِيْثُ عَائِشَةَ اِنَّمَا الْوَلَاءُ فِيْ بَابٍ قَبْلَ بَابِ السَّلَمِ وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ الْبَرَاءِ اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْاُمِّ فِيْ بَابِ بُلُوْغِ الصَّغِيْرِ وَحِضَانَتِهٖ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى -

২৯১৪. অনুবাদ : উক্ত হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গোত্রের ভাগিনেয় গোত্রেরই একজন।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِبْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ-এর ব্যাখ্যা : ভাগিনা মামাদের ওয়ারিশ হবে কিনা সে ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মত হলো ভাগিনা মামাদের ওয়ারিশ হতে পারবে। কেননা, এরা হলো ذَوِي الْاَرْحَامِ ; তাঁদের দলিল হলো–

১. اِبْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ
২. وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهٗ

তবে শর্ত হলো মৃত ব্যক্তির আর কোনো عَصَبَاتٌ ও ذَوِي الْفُرُوْضِ না থাকা। সুতরাং তাদের উপস্থিতিতে ভাগিনারা অংশ পাবে না।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٩١٥ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَتَوَارَثُ اَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتّٰى ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ جَابِرٍ)

২৯১৫. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুই ভিন্নধর্মের লোক পরস্পরে ওয়ারিশ হয় না। –[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ এবং তিরমিযী হযরত জাবের (রা.) হতে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ নাতো মুসলমান কোনো অমুসলিমের ওয়ারিশ হতে পারবে, আর না অমুসলিম কোনো মুসলমানের ওয়ারিশ হতে পারবে। مَوَانِعُ الْاِرْثِ-এর মধ্যে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে।

وَعَنْ ٢٩١٦ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَلْقَاتِلُ لَا يَرِثُ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৯১৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হত্যাকারী [নিহতের] মিরাস পায় না। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি যার থেকে মিরাস পাবে তাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে সে উক্ত ব্যক্তির মিরাস হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে। এটিও مَوَانِعُ اِرْثٌ-এর একটি।

وَعَنْ ٢٩١٧ بُرَيْدَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ اِذَا لَمْ تَكُنْ دُوْنَهَا اُمٌّ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৯১৭. অনুবাদ : হযরত বুরায়দা ইবনে হুসাইব (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ দাদি ও নানির জন্য এক-ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করেছেন– যদি তাদের মোকাবিলায় [মৃত্যের] মা না থাকে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : হাদীসের ব্যাখ্যা হলো, মৃত ব্যক্তির মা জীবিত থাকা অবস্থায় তার দাদি বা নানি মিরাস থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। তবে তার মা জীবিত না থাকলে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে সে $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে। এখানে جده দ্বারা দাদি ও নানি উভয়ে উদ্দেশ্য।

وَعَنْ ٢٩١٨ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

২৯১৮. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে যখন চিৎকার করবে, তার জানাজা পড়তে হবে এবং তাকে ওয়ারিশ করতে হবে। –[ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ : "যদি বাচ্চা চিৎকার করে" এ উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো "প্রাণের চিহ্ন" পাওয়া যাওয়া। অর্থাৎ যদি কোনো সন্তান প্রসবকালে মায়ের পেট থেকে অর্ধেকের বেশি বের হয় এবং তার মধ্যে জীবনের কোনো চিহ্ন প্রকাশ পায়, যেমন– কান্না করা, শ্বাস নেওয়া, হাঁচি দেওয়া, অথবা শরীরের কোনো অঙ্গ নড়াচড়া করা। অতঃপর সে মারা যায়, তাহলে ঐ সন্তানের জানাজার নামাজ পড়া হবে এবং সে ওয়ারিশ সাব্যস্ত হবে, তার পরিত্যক্ত সম্পদ উত্তরাধিকারদের মাঝে বণ্টন করা হবে। সুতরাং যদি কোনো লোক মারা যায় এবং তার ওয়ারিশ মায়ের পেটে থাকে তাহলে তার সম্পদ বণ্টন করা হবে না– যতক্ষণ না সে ভূমিষ্ঠ হয়। জীবিত ভূমিষ্ঠ হলে সে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হবে। আর যদি মৃত ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে সে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হবে না। সেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ অন্যান্য ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টন হয়ে যাবে।

وَعَنْ ٢٩١٩ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَحَلِيْفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَابْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ ـ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

২৯১৯. অনুবাদ : তাবেয়ী কাছীর ইবনে আবদুল্লাহ তিনি তাঁর বাপ থেকে, তাঁর বাপ তাঁর দাদা থেকে হাদীস বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গোত্রের মুক্ত ক্রীতদাস তাদেরই একজন, গোত্রের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তি তাদেরই একজন এবং গোত্রের ভাগিনেয় তাদেরই একজন। –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَحَلِيْفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ : "গোত্রের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তি তাদেরই একজন" এ উক্তির ব্যাখ্যা হলো এই যে, প্রাচীনকালে আরবদের মাঝে এ রীতি প্রচলন ছিল যে, দুই ব্যক্তি পরস্পর শপথ করে চুক্তিবদ্ধ হতো যে, আমরা উভয়ে সুখ-দুঃখে, জীবন-মরণে অংশীদার হবো। একের রক্ত অন্যের রক্ত, একের সন্ধি অন্যের সন্ধি, একের যুদ্ধ অন্যের যুদ্ধ বলে বিবেচতি হবে। আমাদের কারো কোনো প্রকার দণ্ড বা জরিমানা হলে উভয়ে মিলে তা আদায় করব। এভাবে মিরাসের ব্যাপারেও একে অন্যের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতো যে, আমি তোমার ওয়ারিশ হবো এবং তুমি আমার ওয়ারিশ হবে। সুতরাং মিরাসের ব্যাপারে ইসলামের শুরু যুগেও এ হুকুম বলবৎ ছিল। কিন্তু যখন কুরআনে কারীমে উত্তরাধিকার সূত্রে সুস্পষ্ট বিধান অবতীর্ণ হয় এবং ওয়ারিশদের অংশ নির্ধারিত হয়; তখন এ প্রাচীন হুকুম মনসুখ হয়ে যায়।

وَعَنِ ٢٩٢٠ الْمِقْدَامِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَا أَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيْنَا وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا مَوْلٰى مَنْ لَا مَوْلٰى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عَانَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

২৯২০. অনুবাদ : হযরত মেকদাম ইবনে মা'দীকারেব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি প্রত্যেক মুমিনের পক্ষে তার নিজের চেয়েও বেশি নিকটে; সুতরাং যে ঋণ অথবা পোষ্য রেখে যাবে তা আমার জিম্মায় হবে; আর যে মাল রেখে যাবে তা তার ওয়ারিশগণের হবে। আমিই অভিভাবক যার অভিভাবক নেই, আমি তার মালের ওয়ারিশ হবো এবং তার বন্দি মুক্ত করব। মামু তার ওয়ারিশ হবে যার কোনো ওয়ারিশ নেই। সে তার মালের ওয়ারিশ হবে এবং তার বন্দি মুক্ত করবে।

আরেক বর্ণনায় আছে– আমি ওয়ারিশ যার ওয়ারিশ নেই, আমি তার রক্তপণ দেব এবং তার ওয়ারিশ হবো। মামু ওয়ারিশ যার ওয়ারিশ নেই, সে তার রক্তপণ দেবে ও তার ওয়ারিশ হবে। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٢٩٢١ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحُوْزُ الْمَرْأَةُ ثَلٰثَ مَوَارِيْثَ عَتِيْقَهَا وَلَقِيْطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِيْ لَاعَنَتْ عَنْهُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৯২১. অনুবাদ : হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, স্ত্রীলোক তিনটি মিরাস সম্পূর্ণ লাভ করে, তার মুক্ত ক্রীতদাসের মিরাস, তার কুড়িয়ে পাওয়া সন্তানের মিরাস এবং যে সন্তান সম্পর্কে সে লে'আন করেছে তার মিরাস। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عَتِيْقَهَا : "মুক্ত ক্রীতদাস" যেমন একজন মহিলা কোনো একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করল এবং সেই ক্রীতদাস এমতাবস্থায় মারা গেল যে, তার কোনো عَصَبَةٌ نَسَبِيٌّ নাই, তখন ঐ মহিলা উক্ত ক্রীতদাসের মিরাস পাবে। যেমন– একজন পুরুষ পেয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَلَقِيْطَهَا : "এবং কুড়িয়ে পাওয়া সন্তান থেকে" যেমন কোনো এক মহিলা রাস্তায় পতিতাবস্থায় একটি সন্তান পেয়ে তাকে লালনপালন করল, এখন এ মহিলা তার ওয়ারিশ হবে এবং ঐ لَقِيْط মারা গেলে সে তার মিরাস পাবে।

قَوْلُهُ وَ وَلَدَهَا الَّذِيْ لَاعَنَتْ عَنْهُ : "এবং যে সন্তান সম্পর্কে সে লে'আন করেছে তার থেকে।" "لِعَانٌ" বলা হয় কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দিল, অথবা ভূমিষ্ঠ হওয়া সন্তানকে নিজের বলে অস্বীকার করল, এমতাবস্থায় উভয়ে উভয়ের উপর লানত করা। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা "كِتَابُ اللِّعَانِ" -এ দ্রষ্টব্য। সুতরাং যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া

সম্পর্কে লে'আন হয়েছে– ঐ সন্তানের বংশ পিতা থেকে সাবেত হবে না এবং ঐ সন্তান ও পিতার মাঝে মিরাস চলবে না। কেননা, উত্তরাধিকার সূত্র বংশ দ্বারা প্রমাণিত হয়। তবে যেহেতু তার বংশ মায়ের থেকে প্রমাণিত হয়, সুতরাং ঐ সন্তান ও মা একে অপরের ওয়ারিশ হবে। অবৈধ সন্তানেরও একই হুকুম।

وَعَنْ ٢٩٢٢ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ اَوْ اَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ وَلَا يُوْرَثُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

২৯২২. **অনুবাদ :** আমর ইবনে শো'আইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে কোনো ব্যক্তি স্বাধীনা নারী অথবা বাঁদির সাথে জেনা করেছে [আর তাতে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে], সে সন্তান হবে জেনার সন্তান। সে জেনাকারীর ওয়ারিশ হবে না এবং মৌরুসও হবে না। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا : "সে সন্তান হবে জেনার সন্তান" অর্থাৎ জেনা করার দ্বারা যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় সে জেনাকারীর ওয়ারিশ হবে না এবং তার কোনো নিকটতম আত্মীয়েরও ওয়ারিশ হবে না। কেননা, উত্তরাধিকার হয়ে থাকে নসব বা বংশের মাধ্যমে। এখানে উক্ত সন্তান ও জেনাকারীর মাঝে বংশগত কোনো সম্পর্ক স্থাপন হয়নি। তদ্রূপভাবে জেনাকারীও উক্ত সন্তান থেকে মিরাস পাবে না এবং তার আত্মীয়স্বজন থেকেও পাবে না। পক্ষান্তরে সে তার মায়ের ওয়ারিশ হবে এবং মাও তার ওয়ারিশ হবে।

وَعَنْ ٢٩٢٣ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ مَوْلًى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا وَلَمْ يَدَعْ حَمِيْمًا وَلَا وَلَدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْطُوْا مِيْرَاثَهٗ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ قَرْيَتِهٖ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

২৯২৩. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এক মুক্ত গোলাম মারা গেল এবং কিছু মিরাস রেখে গেল, কিন্তু কোনো আত্মীয় বা সন্তান রেখে গেল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তার মিরাস তার গ্রামবাসীদের কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে দাও। –[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَعْطُوْا مِيْرَاثَهٗ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ قَرْيَتِهٖ : "তার মিরাস তার গ্রামবাসীদের কোনো ব্যক্তিকে দাও" এ উক্তির কারণ হলো, উক্ত আজাদকৃত গোলামের যেহেতু কোনো নিকটতম আত্মীয়স্বজন ছিল না, এজন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবে "বাইতুল মাল"। আর বাইতুল মালের খাত হলো গরিব-মিসকিন, এ কারণেই রাসূল ﷺ উক্ত মাল সরাসরি তার গ্রামের কোনো গরিব লোককে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

নবীগণ কারো ওয়ারিশ হন না : এ কথা সকলেরই জানা যে, আজাদকৃত গোলামের যদি عَصَبَةٌ نَسَبِيٌّ না থাকে, তাহলে তার ولاء পাবে তাকে আজাদকারী অর্থাৎ তার মৃত্যুর পর আজাদকারী তার ওয়ারিশ বিবেচিত হবে। এ নিয়ম অনুযায়ী হুজুর ﷺ তার ওয়ারিশ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নবীগণ যেহেতু কারো ওয়ারিশ হন না এবং নবীগণেরও কেউ ওয়ারিশ হয় না– এ কারণেই ঐ আজাদকৃত গোলামের মিরাস হুজুর নিজে গ্রহণ করেন না; বরং রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রদান করেন।

وَعَنْ ٢٩٢٤ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَاُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِيْرَاثِهٖ فَقَالَ اِلْتَمِسُوْا لَهٗ وَارِثًا اَوْ ذَا رَحِمٍ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهٗ

২৯২৪. **অনুবাদ :** হযরত বুরায়দা আসলামী (রা.) বলেন, খুযা'আ গোত্রের এক [লা-ওয়ারিশ] ব্যক্তি মারা গেল এবং তার মিরাস নবী করীম ﷺ -এর নিকট আনা হলো। তিনি বললেন, তার কোনো ওয়ারিশ অথবা দূর-আত্মীয় আছে কিনা তালাশ কর, কিন্তু তারা

وَارِثًا وَلَا ذَا رِحْمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْطُوْهُ الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ اُنْظُرُوْا اَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ .

তার কোনো ওয়ারিশ অথবা দূর-আত্মীয় পেল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, খুযা'আর প্রবীণতম ব্যক্তিকে দিয়ে দাও! –[আবূ দাঊদ] তাঁর অপর বর্ণনায় রয়েছে, খুযা'আর প্রবীণতম ব্যক্তিকে তালাশ করে দেখ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَعْطُوْهُ الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةَ : এখানে اَكْبَرُ বা كُبْرٌ সম্পর্কে কেউ বলেছেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নেতা বা সরদার। اَىْ كَبِيْرُهُمْ আর তাদেরকে দেওয়া হবে সম্মানার্থে মিরাস হিসেবে নয়। আর কেউ বলেছেন– وَهُوَ اَقْرَبُهُمْ اِلَى الْجَدِّ الاعلى। আবার কেউ বলেছেন সমাজের প্রবীণতম ব্যক্তি। কেননা, সেও বাইতুল মাল থেকে সম্পদ পাওয়ার উপযুক্ত।

وَعَنْ ٢٩٢٥ عَلِيٍّ (رض) قَالَ اِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَاَنَّ اَعْيَانَ بَنِى الْاُمِّ يَتَوَارَثُوْنَ دُوْنَ بَنِى الْعَلَّاتِ اَلرَّجُلُ يَرِثُ اَخَاهُ لِاَبِيْهِ وَاُمِّهٖ دُوْنَ اَخِيْهِ لِاَبِيْهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ) وَفِىْ رِوَايَةِ الدَّارِمِىِّ قَالَ الْاِخْوَةُ مِنَ الْاُمِّ يَتَوَارَثُوْنَ دُوْنَ بَنِى الْعَلَّاتِ اِلٰى اٰخِرِهٖ .

২৯২৫. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) বলেন, [মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তি বণ্টন সম্পর্কে] তোমরা এ আয়াত পড়ে থাক: "[মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টিত হবে] তোমরা যে অসিয়ত কর, সে অসিয়ত ও ঋণ আদায়ের পর" [সূরা নেসা] অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ ঋণ আদায়ের হুকুম দিয়েছেন অসিয়তের পূর্বে [যদিও আয়াতে ঋণের উল্লেখ পরে রয়েছে]। তিনি আরও হুকুম দিয়েছেন, সহোদর ভাই বোন ওয়ারিশ হবে, সৎ ভাই বোন নয়। [অর্থাৎ] ভাই ওয়ারিশ হয় এক বাপ ও এক মায়ের ভাইয়ের, এক বাপের [ও ভিন্ন মায়ের] ভাইয়ের নয়। –তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ] কিন্তু দারেমীর বর্ণনায় রয়েছে, সহোদর ভাইরা ওয়ারিশ হবে, সৎ ভাইরা নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উক্ত হাদীসে বর্ণিত আয়োতের মর্মার্থ হলো, কোনো ব্যক্তি যদি অসিয়ত করে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে প্রথমে তার অসিয়ত পূর্ণ করার পর যদি তার কোনো ঋণ থাকে তারপর ঋণ পরিশোধ করতে হবে। অতঃপর ওয়ারিশদেরকে মিরাস বণ্টন করতে হবে। বুঝা গেল এ আয়াতে প্রথমে অসিয়ত আদায় করতে বলা হয়েছে। অথচ হুজুর ﷺ অসিয়তের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করতেন। এ কারণেই হযরত আলী (রা.) সকলকে জিজ্ঞেস করছেন, তোমরা যে এ আয়াত তেলাওয়াত কর, তোমরা কি এর মর্মার্থ বুঝ? আয়াতে যদিও অসিয়তকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু বাস্তবে এর মর্মার্থ তা-ই যা হুজুর ﷺ আমল করেছেন, অর্থাৎ প্রথমে ঋণ পরিশোধ করতে হবে এরপর অসিয়ত পুরা করতে হবে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হলো তাহলে অসিয়তকে ঋণের উপর مُقَدَّمْ তথা অগ্রগামী করার কারণ কি? এর সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো, মৃত ব্যক্তির অসিয়ত পুরা করাটা মানুষেরা কষ্টসাধ্য ও দুরূহ ব্যাপার মনে করে এবং এ ব্যাপারে সকলে অবহেলা করে থাকে। এ কারণেই অসিয়তকে প্রথমে বর্ণনা করে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির অসিয়তকে তোমরা অহেতুক মনে করো না; বরং তাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করে তা আদায় করতে ভুল করবে না।

وَعَنْ ٢٩٢٦ جَابِرٍ (رض) قَالَ جَاءَتْ اِمْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَاتَانِ اِبْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قُتِلَ اَبُوْهُمَا مَعَكَ يَوْمَ اُحُدٍ شَهِيْدًا وَاِنَّ عَمَّهُمَا اَخَذَ مَالَهُمَا وَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً وَلاَ تُنْكَحَانِ اِلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِى اللّٰهُ فِىْ ذٰلِكَ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى عَمِّهِمَا فَقَالَ اَعْطِ لِابْنَتَىْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَاَعْطِ اُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِىَ فَهُوَ لَكَ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَابْنُ مَاجَةَ) وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

২৯২৬. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) বলেন, একদা সা'দ ইবনে রবী'র স্ত্রী সা'দের ঔরসে জন্ম, তার দুই মেয়েকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ দুটি সা'দ ইবনে রবী'র মেয়ে। তাদের বাপ আপনার সাথে উহুদের যুদ্ধে শহীদরূপে নিহত হয়েছেন। তাদের চাচা তাদের সমস্ত মাল-সম্পদ নিয়ে গিয়েছে এবং তাদের জন্য কিছুই রাখেনি। অথচ তাদের বিবাহ দেওয়া যাবে না যদি তাদের মাল না থাকে। হুজুর ﷺ বললেন, [আশা করি] আল্লাহ এ ব্যাপারে কোনো হুকুম জারি করবেন। তখন মিরাসের আয়াত নাজিল হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের চাচার নিকট লোক পাঠিয়ে বললেন, সা'দের দুই মেয়েকে দুই-তৃতীয়াংশ দাও এবং তাদের মাকে অষ্টমাংশ; অতঃপর যা বাকি থাকবে তা তোমার। –[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ] তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** হুজুর ﷺ -এর আগমনের পূর্বে জাহেলিয়াতের যুগে নিয়ম ছিল মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ হতে একমাত্র তারাই মিরাস পেত যারা ছিল সবল, প্রাপ্তবয়স্ক এবং যারা যুদ্ধে যেতে সক্ষম পুরুষ। আর মহিলা ও দুর্বলরা মিরাস পেত না। দরিদ্র, নিঃস্ব, অসহায়, বিধবা ও নিষ্পাপ এতিম বালক ও অনুগ্রহের পাত্র বালিকাদের কান্নায় আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে যেত; কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সবল, যুবক ও ধনী চাচা ও ভায়েরা এসে মৃত ব্যক্তির সব কিছু বণ্টন করে নিয়ে যেত। এহেন জুলুম-নির্যাতনের মূলোৎপাটন করে হুজুর ﷺ এতিম, বিধবা, নিঃস্ব ও মহিলাদেকে নির্যাতনের হাত থেকে মুক্ত করতে এবং দুঃসময়ের বন্ধু হয়ে তিনি এ দুনিয়াতে প্রেরিত হন।

মিরাসে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তির সূচনা হয় এভাবে যে, সাহাবী হযরত আওস ইবনে সাবেত আনসারী (রা.) ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন কন্যা ও এক পুত্র সন্তান রেখে যান। হযরত আওস (রা.) যে দুজন লোককে তার সমুদয় সম্পদের দায়িত্বশীল বানিয়ে রেখেছিল, তারা জাহিলি যুগের প্রথা অনুযায়ী আওসের সমুদয় সম্পদ তার চাচাতো ভাই, কোনো বর্ণনা মতে আপন দুই ভাই খালেদ ও উরফুতাহকে দিয়ে দেন। যার ফলশ্রুতিতে তার বিধবা স্ত্রী ও এতিম সন্তানেরা কেঁদে আকাশ বাতাস মুখরিত করল। কিন্তু তারা কিছুই পেল না। অগত্যা তার স্ত্রী এসে হুজুরের নিকট অভিযোগ করল। হুজুর ﷺ তাদের অভিযোগ শুনলেন এবং আওসের স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপাতত বাড়ি ফিরে যাও এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ কর। আর হুজুর ﷺ ও আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় রইলেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়–

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا .

অর্থাৎ পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনদের সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে; অল্প হোক কিংবা বেশি হোক। এ অংশ নির্ধারিত। যেহেতু এ আয়াতের বিধান কিছুটা অস্পষ্ট ছিল;

কেননা এতে নারী-পুরুষের অংশ নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই হুজুর ﷺ আওসের বানানো প্রতিনিধিকে ফরমান জারি করে সংবাদ পাঠালেন যে, আল্লাহ তা'আলা মিরাসে মহিলাদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছেন, কিন্তু এখনো অংশ নির্দিষ্ট হয়নি তাই তুমি আওসের সমুদয় সম্পদ সংরক্ষণ করে রাখ, সেখানে এক বিন্দুমাত্রও হেরফের করবে না; অচিরেই সকলের অংশ নির্ধারণ সংক্রান্ত বিধান নাজিল হয়ে যাবে। এর কিছু দিন যেতে না যেতেই হাদীসে বর্ণিত ঘটনা সংঘটিত হলো এবং কিছু দিন পরই মিরাসের আয়াত- يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ الخ নাজিল হয়।

এ সর্বশেষ সিদ্ধান্তের পর যখন সকল ওয়ারিশদের অংশ নির্ধারণ হয়ে যায়, তখন হুজুর ﷺ সা'দ ইবনে রবী' -এর নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, আল্লাহর নির্দেশের আলোকে স্বীয় ভ্রাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে তিন ভাগের দুই ভাগ তার মেয়েদেরকে অষ্টমাংশ তার স্ত্রীকে দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকবে, তা তুমি নিজে নিয়ে নাও। অর্থাৎ সমুদয় সম্পত্তিকে ২৪ ভাগ করে আট অংশ করে ১৬ অংশ দুই মেয়েকে, তিন অংশ তার স্ত্রীকে এবং অবশিষ্ট পাঁচ অংশ তুমি নাও।

وَعَنْ ٢٩٢٧ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ (رحـ) قَالَ سُئِلَ اَبُوْ مُوْسٰى عَنْ اِبْنَةٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَاُخْتٍ فَقَالَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْاُخْتِ النِّصْفُ وَائْتِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَسَيُتَابِعُنِىْ فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَاُخْبِرَ بِقَوْلِ اَبِىْ مُوْسٰى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ . اَقْضِىْ فِيْهَا بِمَا قَضَى النَّبِىُّ ﷺ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الْاِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِىَ فَلِلْاُخْتِ فَاَتَيْنَا اَبَا مُوْسٰى فَاَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ لَا تَسْأَلُوْنِىْ مَادَامَ هٰذَا الْحَبْرُ فِيْكُمْ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

২৯২৭. অনুবাদ : তাবেয়ী হুযাইল ইবনে শুরাহবীল (র.) বলেন, হযরত আবূ মুসা আশআরী (রা.)-কে কন্যা, পৌত্রি ও ভগ্নি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, কন্যার অর্ধেক ও ভগ্নির অর্ধেক। তবে একবার হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা কর। আশা করি তিনি আমার অনুরূপই বলবেন। হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো এবং তাকে হযরত আবূ মূসার উত্তরও জ্ঞাপন করা হলো। তিনি বললেন, [যদি আমিও তাঁর ন্যায় বলি] তবে তো আমি পথভ্রষ্ট হবো এবং সুপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না। আমি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেব যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন স্বয়ং নবী করীম ﷺ। তা হলো, কন্যার অর্ধেক এবং পৌত্রির এক-ষষ্ঠাংশ, দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে। আর বাকি যা থাকবে, তা [অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ] ভগ্নির [আসাবা রূপে] রাবী বলেন, অতঃপর আমরা হযরত আবূ মূসার নিকট গেলাম এবং তাঁকে হযরত ইবনে মাসঊদের উত্তর জ্ঞাপন করলাম। তখন তিনি বললেন, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না যাবৎ তোমাদের মধ্যে এ মহাপণ্ডিত আছেন। -[বুখারী]

وَعَنْ ٢٩٢٨ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ ابْنَ اِبْنِىْ مَاتَ فَمَالِىْ مِنْ مِيْرَاثِهٖ قَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ قَالَ لَكَ سُدُسٌ اٰخَرُ فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ قَالَ اِنَّ السُّدُسَ الْاٰخَرَ طُعْمَةٌ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ) وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৯২৮. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, হুজুর! আমার পৌত্র মারা গিয়েছে, আমার জন্য তার মিরাসের কি রয়েছে? তিনি বললেন, তোমার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ রয়েছে। সে যখন চলল, তাকে ডেকে বললেন, তোমার জন্য আরেক ষষ্ঠাংশ রয়েছে। সে যখন চলল, আবার ডেকে বললেন, দ্বিতীয় ষষ্ঠাংশ তুমি নিয়ামতরূপে পেলে। -[আহমদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ] ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এটা হাসান সহীহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ : "দ্বিতীয় ষষ্ঠাংশ তুমি নিয়ামতরূপে পেলে" একথার তাৎপর্য হলো, প্রথম ষষ্ঠাংশ তো তুমি ذَوِي الْفُرُوض হওয়ার কারণে পেয়েছ, আর এ দ্বিতীয় ষষ্ঠাংশ পেলে তুমি عَصَبَةٌ হওয়ার ভিত্তিতে। এভাবে এ ব্যক্তি সমুদয় সম্পদের তৃতীয়াংশ পেয়ে গেল। কিন্তু একবারেই তাকে তৃতীয়াংশ না দেওয়ার কারণ হলো, যেন সে ধারণা না করে যে, পৌত্রের মিরাস দাদার জন্য ذوى الفروض হওয়ার ভিত্তিতে তৃতীয়াংশই।

وَعَنْ ٢٩٢٩ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ (رضـ) قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيْرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا مَا لَكِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ شَيْءٌ وَمَا لَكِ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْءٌ فَارْجِعِيْ حَتّٰى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرٰى إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيْرَاثَهَا فَقَالَ هُوَ ذٰلِكَ السُّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا . (رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৯২৯. অনুবাদ : হযরত কাবীসা ইবনে যুওয়াইব (রা.) বলেন, হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট এক নানি এসে তার [কন্যার সন্তানের] মিরাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি তাকে বললেন, আল্লাহর কিতাবে তোমার কোনো অংশ নেই এবং [আমার জানা মতে] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নতেও তোমার কোনো অংশ নেই! এখন যাও! আমি সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করে দেখি। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তিনি নানিকে ছয় ভাগের এক ভাগ দিয়েছেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আপনার সাথে আপনি ছাড়া অপর কেউ ছিল কি? তখন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা মুগীরার কথার অনুরূপ বললেন। সুতরাং হযরত আবূ বকর (রা.) তার জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ দেওয়ার হুকুম দিলেন। [কাবীসা বলেন,] অতঃপর [হযরত ওমরের জামানায়] অন্য দাদি এসে হযরত ওমর (রা.)-কে তার মিরাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, সে ছয় ভাগের এক ভাগই। তোমরা যদি উভয়ে থাক, তবে তা তোমাদের মধ্যে [আধাআধি] ভাগ হবে। আর তোমাদের দুয়ের কেউ যদি একা থাক, তবে তা তারই হবে। −[মালেক, আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, দারেমী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْجَدَّةُ -এর অর্থ : جَدَّةٌ দাদিকেও বলা হয়, আবার নানিকেও বলা হয়। হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট যে جَدَّةٌ এসেছিল সে মৃত ব্যক্তির নানি ছিল, আর হযরত ওমরের দরবারে যে এসেছিল সে ছিল মৃত ব্যক্তির দাদি। অন্য রেওয়ায়েতে একথার স্পষ্টতা রয়েছে।

قَوْلُهُ هُوَ ذٰلِكَ السُّدُسُ : "সে ছয় ভাগের এক ভাগই" এ উক্তির ব্যাখ্যা হলো, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে جَدَّةٌ-এর অংশ হলো ষষ্ঠাংশ, চাই তারা একজন হোক বা একাধিক হোক। যদি একজন হয়, তাহলে সে পুরাটারই মালিক হবে, আর যদি একাধিক হয় তাহলে ঐ ষষ্ঠাংশ সকলে সমানভাবে বণ্টন করে নেবে। যেমন− হযরত আবূ বকর (রা.) সেই ষষ্ঠাংশ একজনকেই অর্থাৎ নানিকে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। কেননা, তাঁর জানা ছিল না যে, মৃত ব্যক্তির দাদিও আছে। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) যখন জানতে পেরেছিলেন যে, মৃত ব্যক্তির অন্য جَدَّةٌও আছে, তখন তিনি নির্দেশ দিলেন যে, ঐ ষষ্ঠাংশে উভয় جَدَّةٌ-ই অংশীদার হবে।

وَعَنْ ٢٩٣٠ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ فِي الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا اَنَّهَا اَوَّلُ جَدَّةٍ اَطْعَمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ ضَعَّفَهُ)

২৯৩০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি দাদি আপন ছেলের সাথে থাকলে [নাতির] মিরাস পাবে কিনা সে সম্পর্কে বলেন যে, সে হলো প্রথম দাদি যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন ছেলের সাথে ছয় ভাগের এক ভাগ দিয়েছেন, অথচ তার ছেলে জীবিত। -[তিরমিযী ও দারেমী] কিন্তু ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মাসআলার সুরত হলো এরকম যে, এক ব্যক্তি দাদি ও পিতা রেখে মারা যায়, তখন হুজুর ﷺ ঐ ব্যক্তির মিরাস থেকে দাদিকে ষষ্ঠাংশ দিয়েছিলেন, মৃত ব্যক্তির পিতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও। অথচ পিতা থাকা অবস্থায় দাদি কিছুই পাবে না। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। সুতরাং এ হাদীসের উত্তরে ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, হাদীসটি যঈফ, যা দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। অথবা বলা যায় যে, এটি ছিল একটি বিশেষ ঘটনা, যা হুজুরের জন্য খাস ছিল।

وَعَنْ ٢٩٣١ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ اِلَيْهِ اَنْ وَرِّثْ اِمْرَأَةَ اَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৯৩১. অনুবাদ : হযরত যাহহাক ইবনে সুফিয়ান (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট লিখেছেন, আশইয়াম যুবাবীর স্ত্রীকে তার স্বামীর রক্তপণের অংশ দাও! -[তিরমিযী ও আবূ দাউদ] ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ : "আশইয়াম যুবাবী"-কে হুজুরের যুগে হত্যা করা হয়েছিল। তবে এ হত্যা ইচ্ছাকৃত ছিল না; বরং قَتْل خَطَأ বা ভুলক্রমে হত্যা করা হয়েছিল। সুতরাং যে ব্যক্তি দ্বারা তিনি নিহত হয়েছিলেন, তার উপর রক্তপণ ওয়াজিব হয়। এ হিসেবে সে যখন রক্তপণ দিতে চাইল তখন হুজুর ﷺ হযরত যাহহাকের নিকট লিখে পাঠালেন- আশইয়াম যুবাবীর রক্তপণ হিসাবে যে সম্পদ পাওয়া গেছে তা দ্বারা তার স্ত্রীকে মিরাসস্বরূপ দিয়ে দেওয়া হোক।

শরহুস্ সুন্নাহ কিতাবে লিখিত আছে যে, এ হাদীস এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, دِيَتْ বা রক্তপণ প্রথমত মৃত ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব হয়, অতঃপর তা হতে প্রাপ্য অর্থ নিহত ব্যক্তির অন্যান্য ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টন হয়ে যায়। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের অভিমত এটিই।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রা.) -এর মত ছিল যে, স্ত্রী তার নিহত স্বামীর دِيَتْ থেকে প্রাপ্য অর্থের মিরাস পায় না; কিন্তু হযরত যাহহাক (রা.) যখন তাঁর সম্মুখে এ হাদীস বর্ণনা করেন, তখন তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করে ফেলেন।

وَعَنْ ٢٩٣٢ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ (رضـ) قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ اَهْلِ الشِّرْكِ يُسْلِمُ عَلٰى يَدَيْ رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ هُوَ اَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

২৯৩২. অনুবাদ : হযরত তামীমে দারী (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, শরিয়তে ঐ মুশরিক ব্যক্তির [উত্তরাধিকার সম্পর্কে] হুকুম কি, যে কোনো মুসলমানের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে? তিনি বললেন, সে মুসলমান তার নিকটতম লোক তার জীবনে ও মরণে। -[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাবী পরিচিতি : হযরত তামীমে দারী (রা.) একজন সুউচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও প্রখ্যাত সাহাবী ছিলেন। প্রথমে তিনি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে হেদায়েত দান করেন। ৯ম হিজরিতে তিনি মুসলমান হন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি আল্লাহ ভীতি ও ইবাদত-বন্দেগিতে এত বেশি অনুপ্রাণিত হন যে, রাত্রি জাগরণ -এর ন্যায় মহান গুণে গুণান্বিত হন। রাত্রে এক রাকাতে পূর্ণ কুরআন মাজীদ খতম করতেন। আবার কখনো এক আয়াত বারংবার তিলাওয়াত করতে করতে রাত্রি কাটিয়ে দিতেন। ঘটনাক্রমে এক রাত্রে তিনি তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় কতে পারেননি, যার কারণে স্বীয় নফসকে এমন শাস্তি দেন যে, পূর্ণ এক বছর যাবৎ বিছানায় পিঠ লাগাননি। হযরত তামীমে দারী (রা.)-এর একটি ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য হলো সর্বপ্রথম তিনিই মসজিদে বাতি প্রজ্বলন করেন।

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে সে ঐ নব মুসলিমের مَوْلَى বা অভিভাবক হবে। ইসলামের প্রথম যুগে এ নিয়মই প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে এ হুকুম মনসূখ হয়ে যায়। আবার কেউ বলেছেন যে, فَهُوَ اَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ-এর অর্থ হলো ইসলাম ধর্মে দীক্ষাদান ব্যক্তির উপর সর্বাধিক দায়িত্ব অর্পিত হয়ে যে, সে নব মুসলিমের সাথে তার জীবদ্দশাতে উত্তম আচরণ ও সাহায্য-সহযোগিতা করার পাশাপাশি মৃত্যুর পর তার জানাজায় শরিক হওয়া।

وَعَنْ ٢٩٣٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا اِلَّا غُلَامًا كَانَ اَعْتَقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَهُ اَحَدٌ قَالُوْا لَا اِلَّا غُلَامٌ لَهُ كَانَ اَعْتَقَهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِيْرَاثَهُ لَهُ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৯৩৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি মারা গেল এবং তার আজাদ করা একটি গোলাম ব্যতীত কাউকেও উত্তরাধিকারী রেখে গেল না। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তার কি কেউ আছে? লোকেরা বলল, তার আজাদ করা একটি গোলাম ছাড়া কেউই নেই। তখন নবী করীম ﷺ তার উত্তরাধিকার তাকে দিলেন।

–[আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِيْرَاثَهُ لَهُ : "নবী করীম ﷺ তার উত্তরাধিকারী তাকে দিলেন" এ কথার ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলেন, হুজুর ﷺ যে আজাদকৃত গোলামকে আজাদকারীর উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করেছেন, তা ছিল অনুগ্রহ ও দয়ার ভিত্তিতে। কেননা, আজাদকৃত গোলাম আজাদকারীর উত্তরাধিকারী হতে পারে না। উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হয় নসব বা বংশ পরম্পরাগতভাবে।

এ হাদীসের বাহ্যিক অর্থের উপর ভিত্তি করে হযরত শুরাইহ ও তাউস (র.) মত পোষণ করেন যে, যেভাবে আজাদকারী ব্যক্তি আজাদকৃত গোলামের উত্তরাধিকারী হয়, তদ্রূপভাবে আজদকৃত গোলামও আজাদকারীর উত্তরাধিকারী হতে পারবে।

وَعَنْ ٢٩٣٤ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ اِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

২৯৩৪. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে মালের ওয়ারিশ হয় সে 'ওলার'ও ওয়ারিশ হয়। [তিরমিযী] আর তিনি বলেছেন, এর সনদ সবল নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ : আজাদকৃত গোলামের সম্পদকে শরিয়তের পরিভাষায় "وَلَاءٌ" বলা হয়। وَلَاءٌ-এর মিরাস হওয়ার ব্যাপারে মাসআলা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় এবং তার কিছু দিন পর তার আজাদকৃত বা আজাদকৃত গোলমের আজাদকৃত গোলাম মারা যায়, তাহলে ঐ ব্যক্তির সন্তানেরা অন্যান্য সম্পদের সাথে এ আজাদকৃত গোলামের সম্পদেরও মিরাস

পাবে। তবে এ হুকুম শুধামাত্র عَصَبَةٌ بِنَفْسِه যেমন মৃত ব্যক্তির ছেলে -এর জন্য প্রযোজ্য হবে। সুতরাং তার মেয়ে وَلَاء -এর মিরাস পাবে না। কেননা, মেয়ে যদিও عَصَبَةٌ কিন্তু عَصَبَةٌ بِنَفْسِه নয়। তবে মহিলারা নিজে আজাদকৃত গোলামের মালের মিরাস পাবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٩٣٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا كَانَ مِنْ مِيْرَاثٍ قُسِّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلٰى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا كَانَ مِنْ مِيْرَاثٍ اَدْرَكَهُ الْاِسْلَامُ فَهُوَ عَلٰى قِسْمَةِ الْاِسْلَامِ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

২৯৩৫. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মিরাস জাহেলিয়াত যুগে বণ্টিত হয়েছে, তা জাহেলিয়াতের বণ্টন অনুসারেই থাকবে। আর যে মিরাসকে ইসলাম পেয়েছে তা ইসলামের বণ্টন অনুসারেই হবে। -[ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٢٩٣٦ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ كَثِيْرًا يَقُوْلُ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُوْرَثُ وَلَا تَرِثُ . (رَوَاهُ مَالِكٌ)

২৯৩৬. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর ইবনে হাযম (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর বাপ আবূ বকর ইবনে হাযম (র.)-কে বহুবার বলতে শুনেছেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলতেন, কি আশ্চর্য! ফুফু [ভাইপুত-ভাইঝির] মৌরুস হয় অথচ সে [তাদের] ওয়ারিশ হয় না। -[মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের জাহেরী অর্থ হলো, যদি কারো ফুফু মারা যায় তাহলে সে ফুফুর ওয়ারিশ হবে। পক্ষান্তরে যদি সে [ভাইপো] মারা যায় তাহলে ফুফু তার ওয়ারিশ হতে পারবে না। এ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী একদল ওলামায়ে কেরামের মত হলো ذَوِى الْاَرْحَامِ মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ হতে পারে না।

قَوْلُهُ عَجَبًا لِلْعَمَّةِ : হযরত ওমর (রা.) কেয়াস ও ধারণার বশবর্তী হয়েই আশ্চর্য হয়েছেন, নতুবা আল্লাহর নির্দেশের উপর তাঁর আশ্চর্যের বহিঃপ্রকাশের কোনোই হেতু থাকতে পারে না।

وَعَنْ ٢٩٣٧ عُمَرَ (رض) قَالَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَزَادَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَالطَّلَاقَ وَالْحَجَّ قَالَا فَاِنَّهُ مِنْ دِيْنِكُمْ . (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

২৯৩৭. অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, 'ফারায়েজ' শিক্ষা কর। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বাড়িয়ে বলেছেন, তালাক ও হজের মাসায়েলও, অতঃপর উভয়ে বলেছেন, কেননা, তা তোমাদের দীনের অঙ্গ। - [দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : فَرَائِض শব্দটি فَرِيْضَةٌ -এর বহুবচন, অর্থ হলো- মিরাসের নির্দিষ্ট অংশ। অপর হাদীসে বলা হয়েছে- فَاِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ আল্লামা ত্বীবী (র.) বলেন, একে نِصْفُ الْعِلْمِ বলার কারণ হলো, عِلْم -এর সম্পর্ক হলো حَيَاة ও مَمَات এ দুই জগতের সাথে। অন্যান্য দীনে ইলম এরকম নয়। অথবা এ ইলম শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে। কেননা, এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। فَرَائِض -এর আরেকটি অর্থ- আল্লাহ কর্তৃক জারিকৃত ফরজও হতে পারে, সেক্ষেত্রে عَام -এর পরে এটিকে উল্লেখ করা হয়েছে- একমাত্র এর গুরুত্ব বুঝাবার জন্য। -[মেরকাত]

بَابُ الْوَصَايَا
পরিচ্ছেদ : অসিয়ত

اَلْوَصِيَّةُ-এর আভিধানিক অর্থ : وَصِيَّةٌ শব্দটি إِسْمُ مَصْدَرٍ ; বহুবচনে وَصَايَا এখান থেকে إِيْصَاءٌ - أَوْصَى ; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

* اَلْمَوْعِظَةُ বা উপদেশ প্রদান।

* اَلْأَمْرُ বা নির্দেশ। যেমন–

١. يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ.

٢. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا.

* اَلْوَصْلُ وَالضَّمُّ বা মিলানো ও সংযুক্ত করা। যেমন বলা হয়–

وَصَيْتُ الشَّيْءَ إِذَا وَصَلْتُهُ - وَسُمِّيَتْ وَصِيَّةٌ لِأَنَّهُ وَصَلَ مَا كَانَ فِيْ حَيَاتِهِ بِمَا بَعْدَهُ -

* **অন্তিম উপদেশ** : যিনি অসিয়ত করেন তাকে مُوْصِيْ যার জন্য অসিয়ত করা হয় তাকে مُوْصٰى لَهُ বলে।

اَلْوَصِيَّةُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরিয়তের পরিভাষায় অসিয়ত হচ্ছে– هِيَ تَمْلِيْكُ مَالٍ مُعَيَّنٍ وَيَنْفُذُ بَعْدَ الْمَوْتِ
অর্থাৎ, কাউকে নিজের মালের নির্দিষ্ট এক অংশের মালিক বানিয়ে দেওয়া যা অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর কার্যকর হয়।

اَلْوَصِيَّةُ-এর হুকুম : অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর অসিয়তকৃত সম্পদের মধ্যে مُوْصٰى لَهُ-এর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। অসিয়ত করা ফরজ, ওয়াজিব নাকি মোস্তাহাব এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে–

১. ইমাম ইসহাক, আতা ও দাউদে জাহেরীর মতে ধনী ব্যক্তিদের জন্য অসিয়ত করা ফরজ। তাঁদের দলিল হচ্ছে–

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا نِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ -

২. আবার কেউ কেউ বলেন যে, যাদের পিতামাতা আছে, তাদের জন্য وَصِيَّةٌ করা ফরজ। তাঁদের দলিল হলো–

إِنْ تَرَكَ خَيْرًا نِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ -

৩. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, $\frac{1}{৩}$ অংশ পর্যন্ত অসিয়ত করা জায়েজ। এর চেয়ে কম করা মোস্তাহাব। তবে ওয়ারিশগণ গরিব হলে অসিয়ত না করাই উত্তম। কেননা, অসিয়ত হচ্ছে সদকা।

فَلَمَّا كَانَ التَّبَرُّعُ فِيْ حَالِ الْحَيَاةِ مُسْتَحَبًّا كَذٰلِكَ الْوَصِيَّةُ الَّتِيْ تَتَعَلَّقُ بَعْدَ الْوَفَاةِ فَهُوَ أَيْضًا مُسْتَحَبٌّ -

اَلْجَوَابُ : তাঁদের উপস্থাপিত আয়াতটি মিরাসের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। তা ছাড়া নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

"إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَعْطٰى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"

* হাদীসটি إِحْتِيَاطٌ-এর জন্য প্রযোজ্য; وُجُوْبٌ-এর জন্য নয়।

এক-তৃতীয়াংশের অধিক অসিয়ত করলে উক্ত অসিয়ত প্রয়োগ হবে কিনা? মূলত কিয়াস অসিয়তের অনুমোদন দেয় না। কেননা, এতে ওয়ারিশদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও إِسْتِحْسَانٌ হিসেবে $\frac{1}{৩}$ অংশ পর্যন্ত অসিয়ত করা জায়েজ রাখা হয়েছে। কেননা, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ

তবে এক-তৃতীয়াংশের অধিক যদি কেউ অসিয়ত করে বসে তাহলে তা ওয়ারিশদের অনুমোদনের উপর নির্ভর করবে। তারা যদি অনুমতি দেয়, তাহলে কার্যকর হবে, নতুবা কার্যকর হবে না। –[হিদায়া]

উল্লেখ্য যে, যদি কারো উপর ঋণ থাকে অথবা তার নিকট কারো আমানত রক্ষিত থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে সেগুলো আদায়ের জন্য অসিয়ত করে যাওয়া এবং এ সম্পর্কিত "অসিয়তনামা" লিখে সাক্ষী দ্বারা স্বাক্ষরিত করিয়ে রাখা ওয়াজিব। একটি অসিয়তনামার নমুনা আমরা পাঠকদের সুবিধার্থে এ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করব।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٩٣٨ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوْصٰى فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ اِلَّا وَ وَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৯৩৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মুসলমানের এমন মাল আছে যাতে অসিয়ত করা যেতে পারে, তার নিজের কাছে অসিয়তনামা লেখে না রেখে দুই রাত্র অতিবাহিত করারও তার অধিকার নেই। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ **-এর মর্মার্থ :** এখানে দুই রাত্রী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অতি সামান্য সময়। সুতরাং অসিয়তনামা লিপিবদ্ধ না করে সামান্য সময় অতিবাহিত করাও সমীচীন হবে না। কেননা, মানুষের জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। যে কোনো মুহূর্তে জীবনাবসান হয়ে যেতে পারে। আর অসিয়তনামা না লেখার গুনাহ নিয়ে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

আল্লামা নববী (র.) বলেন, এ হাদীসের আলোকে অসিয়ত করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, إِحْتِيَاطٌ ও বুদ্ধিমত্তার কাজ হলো, অসিয়তনামা লিখে রাখা। এ অসিয়তনামা লিখে রাখার গুরুত্ব প্রসঙ্গে একটি ঘটনা আছে যা আল্লামা সুয়ূতী (র.) শরহুস সুদূর গ্রন্থে ইবনে আসাকির থেকে যায়েদ ইবনে আসলামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যেদিন আমি হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে উক্ত হাদীসটি শুনলাম যে, "অসিয়তনামা না লিখে দু রাত্রিও অতিবাহিত করার অধিকার নেই" সে রাত্রেই আমি অসিয়তনামা লেখার উদ্দেশ্যে কালির দোয়াত ও কাগজ সংগ্রহ করলাম। ইতোমধ্যেই ঘুমের প্রবলতার কারণে তা না লেখেই আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের মধ্যে আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, শুভ্র পোশাক পরিহিত, সুন্দর চেহারার অধিকারী ও মন মাতানো সুরভি ছড়িয়ে এক ব্যক্তি আমার ঘরে প্রবেশ করল। আমি বললাম, কে তুমি? এ ঘরে প্রবেশের অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে? সে বলল, ঘরের মালিকই আমাকে ঘরে প্রবেশ করিয়েছে। আমি বললাম, আপনি কে? সে উত্তর দিল, আমি 'মালাকুল মাউত'। একথা শুনে আমি ভীত হয়ে পড়লাম। সে আমাকে বলল, ভয় করো না। আমি তোমার জান কবজ করার জন্য প্রেরিত হয়নি। আমি বললাম, তাহলে আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির পরোয়ানা লিখে দিন। সে বলল, দাও তোমার দোয়াত ও কাগজ। সুতরাং যে কাগজ ও দোয়াত রেখে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এবং যা আমার শিয়রের পাশেই ছিল, তার প্রতি হাত বাড়িয়ে তা নিলাম এবং তাকে দিলাম। সে তাতে লিখতে লাগল–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ.

এবং এ শব্দ দ্বারা পুরো কাগজ ভর্তি করে ফেলেছে। অতঃপর আমি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় জাগ্রত হয়ে বাতি জ্বালিয়ে দেখি, উক্ত কাগজের উভয় পিঠে উপরিউক্ত শব্দগুলো লিপিবদ্ধ রয়েছে। -[মেরকাত- খ. ৬. পৃ. ১৮০]

সুতরাং অসিয়তনামা লিখে রাখার গুরুত্ব অনুধাবন করে সর্বযুগের স্বনামধন্য ওলামায়ে কেরাম তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কিন্তু এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের প্রতি বর্তমান যুগের লোকদের চরম অবহেলা পরিলক্ষিত হওয়ায় তৎপ্রতি লোকদের অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত অসিয়তনামাটি কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা আশাবাদী।

অসিয়তনামা

অসিয়তের গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীস শরীফ–

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে মুসলমানের উপর অসিয়তযোগ্য কিছু রয়েছে, তার জন্য অসিয়তামা না লেখে দুই রাতও অতিবাহিত করা উচিত নয়। -[বুখারী শরীফ ১ম খ., ৩৮২ পৃ.]
* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে উক্ত কথা শুনেছি, সেদিন হতে এক রাত অতিক্রম করার পূর্বেই আমার অসিয়তনামা আমার নিকট লেখে রেখেছি। -[মুসলিম শরীফ ২য় খণ্ড. ৩৯ পৃ. ও ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, ৩৫৮ পৃ.]
* হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অসিয়ত করে মারা গেল, সে সঠিক রাস্তা এবং সুন্নতের পথের উপর রয়েই মারা গেল এবং তাকওয়া ও শাহাদাতের উপর মারা গেল এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় মারা গেল। -[ইবনে মাজাহ শরীফ ২য় খণ্ড, ১৯৮ পৃ.]

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম।

বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে অসিয়ত করার তাকিদ ও গুরুত্বের প্রতি পরিপূর্ণ অনুপ্রাণিত হয়ে ও অসিয়তকে আল্লাহ তা'আলার হুকুম মনে করে অদ্য সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সুস্থ তবিয়তে এ অসিয়াতনামায় স্বাক্ষর প্রদান করলাম। হে আল্লাহ! আমার অসিয়াতগুলি কবুল করুন এবং আমাকে সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর বহাল রেখে পূর্ণাঙ্গ ঈমানের সাথে মৃত্যু নসিব করুন, আমীন! ছুম্মা আমীন!!

নাম .... গ্রাম .... ঠিকানা .... জেলা .... বাংলাদেশ।

আমার নিজ সন্তানাদি এবং প্রিয়জনদের বিশেষভাবে .... এর প্রতি অসিয়ত এই যে–

১. মুমূর্ষু অবস্থায় সূরা ইয়াসীন নিজে বা অন্য কারো দ্বারা বেশি বেশি পাঠ করবে বা করাবে এবং কালিমার তালক্বীন করবে বা করাবে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে কোনো গাইরে মাহরাম মহিলাদের আমার নিকটে আসতেই দেবে না। কোনো গাইরে মাহরাম পুরুষ দ্বারা কালিমার তালক্বীন, সূরা ইয়াসীন পাঠ ইত্যাদির ক্ষেত্রে খাস পর্দার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবে। সাবধান! যেন খাস পর্দার খিলাফ না হয়। মৃত্যুর পর আমার লাশের পাশে সম্মিলিতভাবে কুরআন শরীফ পাঠ করবে না। তবে পৃথক পৃথক স্থানে থেকে নিজ নিজ তৌফিক অনুযায়ী পাঠ করে বখশিশ করে দেওয়া যেতে পারে।
–[মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ]

২. মারা যাওয়ার সাথে সাথে প্রথমেই গোসল বা স্বল্প সময়ের মধ্যে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করবে। –[আবূ দাউদ শরীফ]

৩. আমার জানাজার প্রস্তুতি, গোসল, কাফন ও দাফনের মধ্যে পুরোপুরি সুন্নত মোতাবেক করবে। –[আবূ দাউদ শরীফ]

৪. আমার মৃত্যুর পর উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন বা নাজায়েজ কথা বলবে না। –[বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ]

৫. আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানিতে যদি বৃহস্পতিবার রাত্রে বা শুক্রবার সকালে মৃত্যু নসিব হয়, তাহলে জুমার পূর্বেই কাফন-দাফন সম্পন্ন করবে। জানাজায় বেশি লোক শরিক হওয়ার উদ্দেশ্যে বা কোনো নিকটতম আত্মীয়ের দর্শনের জন্য আমাকে জুমার আগে কাফন-দাফন হতে যেন বিরত না রাখা হয়। মৃত্যুর পর আমাকে সম্ভব হলে সুন্নত জামাতের অনুসারী দীনদার-পরহেজগার আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি দ্বারা জানাজার ব্যবস্থা করবে। –[শামী ২য় খণ্ড]

৬. অসুস্থতা বা অন্যকোনো কারণে যদি আমার জীবনের নামাজ, রোজা কাজা হয় ও জাকাত প্রদান, হজ আদায় করতে বাকি থাকে, তাহলে আমার স্থাবর-অস্থাবর ষোল আনা সম্পত্তি হতে কাফন-দাফন তারপর ঋণ পরিশোধ অবশিষ্ট সম্পত্তি দ্বারা আদায় করিয়ে দেবে। –[মিরকাত]

৭. আমার মৃত্যুর পর আত্মার কল্যাণার্থে যদি কোনো কিছু কর, তাহলে দীনদার, পরহেজগার ও হক্কানী মুফতি / আলেমের সাথে পরামর্শ করে কাজ করবে। নিজের ইচ্ছামতো কোনো কাজ করবে না। –[ফাযায়িলে সাদাক্বাত]

৮. আমাকে বুগলী বা সিন্দুকী কবরে দাফন করবে, কারণ এটাই উৎকৃষ্ট। কবরের মধ্যে সুন্নত মোতাবেক ঠিক ডান কাতে কিবলামুখী করে শোয়ানো সুন্নত। এমনভাবে যেন সিনা পুরোপুরি কিবলার দিকে ফিরে থাকে, প্রয়োজন হলে মাথা এবং পিঠের নিচে মাটি দেওয়া যাবে। [চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে মুখ ক্বিবলার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া ভুল নিয়ম, এটা শুধু লাশের উপর কষ্ট দেওয়ার শামিল।] –[বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, আবূ দাউদ শরীফ]

৯. পুরুষদের জন্য কবর জেয়ারত করা মোস্তাহাব। সপ্তাহে অন্তত একদিন আমার কবর জেয়ারত করার চেষ্টা করবে। শুক্রবার সবচেয়ে ভালো।

শরিয়তসম্মত বিশেষ মন্তব্য

[যেমন পুত্রের অবর্তমানে দাদা-পোতার মাঝে সম্পদ দানপত্রের অসিয়ত বা দীনি প্রতিষ্ঠানে সম্পদ দান করার অসিয়ত করা যেতে পারে।]

১০. ছওয়াব রেসানির জন্য প্রচলিত যে সমস্ত অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, তা সম্পূর্ণ বর্জন করবে। যেমন– মিলাদ-মাহফিল, কুলখানী, তিন দিনের বা চল্লিশ দিনের খানা খাওয়ানো, মৃত্যু বার্ষিকী বা জন্ম বার্ষিকী ইত্যাদি। –[শামী ২য় খণ্ড]

১১. পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন পাক খতম, কালিমা খতম, নজরানাস্বরূপ টাকাপয়সা লেনদেন, খানা খাওয়ানো, মিষ্টি বিতরণ বা দোয়া-দরুদ করানো থেকেও বিশেষভাবে বিরত থাকবে। এটা কুরআন-হাদীসের আলোকে সম্পূর্ণ হারাম। কবরের পাশে কুরআন শরীফ পড়ানো বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন শরীফ খতম করানোর রীতি সাহাবী, তাবেয়ী এবং প্রথম যুগের উম্মতগণের দ্বারা কোথাও প্রমাণিত নেই। সুতরাং এগুলো নিঃসন্দেহে বিদআতে সায়্যিআহ। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

১২. সফরের হালতে যে শহরে বা গ্রামে আমার ইন্তেকাল হয়, সে শহর বা গ্রামের কবরস্থানে আমাকে দাফন করবে। –[ত্বাহত্বাভী]

১৩. গোসল দেওয়ার সময় নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ শরীরের পর্দার প্রতি খেয়াল রাখবে। যার নিয়ম হলো, দুজন লোক একটি চাদর শরীরের সামান্য উপরে দু'পাশ থেকে টেনে ধরবে। –[শামী ২য় খণ্ড]

১৪. মৃত্যুর পর একাধিক জানাজা পড়া হতে বিরত থাকবে এবং গায়েবানা জানাজা পড়বে না ও পড়াবে না। -[দুররে মুখতার]

১৫. মরণোত্তর চক্ষুদানসহ অন্যকোনো অঙ্গ দান করবে না। কারণ, তা নাজায়েজ। -[জাওয়াহিরুল ফিক্হ]

১৬. মুখ দেখানো প্রথা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করবে। বিশেষ করে গাইরে মাহরাম মহিলাদের গাইরে মাহরাম পুরুষদেরকে মুখ দেখানো হতে বিরত রাখবে। -[আহসানুল ফাতাওয়া]

১৭. স্মরণ রাখবে, কবরে ঘর বানানো হারাম। মজবুতির জন্য কবর পাকা করা, কবর অনেক উঁচু করা এবং কবরে প্রলেপ দেওয়া মাকরূহে তাহরীমী। -[মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ]

আখেরী নসিহত :

১৮. সুন্নতের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ গুরুত্ব সহকারে জামাতের সাথে আদায় করবে। মহিলারা নিজ গৃহে পর্দা সহকারে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে এবং নামাজের বাইরেও সুন্নতের নিয়মাবলি ও মাসনূন দোয়াসমূহের প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করবে। -[বুখারী শরীফ, মুয়াত্তা মালিক, হিদায়া]

১৯. বেপর্দা, জীবজন্তুর ছবি, টিভি, গান-বাদ্য এগুলো স্বীয় বাড়ির নিকটে আসতেই দেবে না। -[মিশকাত শরীফ]

২০. বিবাহ-শাদিসহ অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও অন্যান্য পারিবারিক অনুষ্ঠানে সকল প্রকার কুপ্রথা ও অপচয় হতে বিরত থাকবে। যেমন- গায়ে-হলুদ, গেট সাজানো, ক্লাবে বিবাহ ইত্যাদি। বিশেষ করে বিবাহ সুন্নত মোতাবেক মসজিদে সম্পন্ন করার চেষ্টা করবে। -[তিরমিযী শরীফ, বেহেশতী জেওর]

২১. সব সময় সুন্নতপন্থি আলেম, তালিবে ইল্ম, হাক্কানী পীর-বুজুর্গ ও অন্যান্য সকল দীনের সহীহ খাদিম ও মুবাল্লিগদেরকে আন্তরিকভাবে মহব্বত করবে, খিদমত করবে, সম্পর্ক রেখে চলবে এবং দোয়ার আবেদন জানাবে। -[তা'লীমুল মুতাআল্লিম]

২২. প্রতিদিন কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের অভ্যাস করবে এবং কোনো সুদক্ষ ক্বারীর নিকট হতে কুরআন শরীফের অক্ষরগুলো মশক্ব করে নেবে এবং পবিত্র কুরআন শরীফের ৪টি হকের দিকে লক্ষ্য রাখবে। পবিত্র কুরআন শরীফের ৪টি হক হলো- ক. মহব্বত, খ. সম্মান, গ. বিশুদ্ধ তেলাওয়াত, ঘ. কুরআন শরীফের আদেশ-নিষেধের অনুসরণ করা। -[আহসানুল ফাতাওয়া]

২৩. হাক্কুল ইবাদ [বান্দার হক] যথাযথ আদায় না করে থাকলে হক প্রাপকদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেবে এবং অর্থসম্পদ সংশ্লিষ্ট হক হলে যেমন- দেনমোহর, ঋণ ইত্যাদি সেগুলোকে পরিশোধের ব্যবস্থা করবে। -[তিরমিযী শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফ]

২৪. ত্যাজ্য সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টনের পূর্বে কোনো প্রকার দান-খয়রাত, গরিব-মিসকিনদের খাওয়ানো ইত্যাদি থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। কারণ, ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টনের পূর্বে তা থেকে মেহমানদের আপ্যায়ন, দান-খয়রাত ইত্যাদি করা বৈধ নয়। এ ধরনের দান-খয়রাত দ্বারা মৃত ব্যক্তি কোনো ছওয়াব পায় না; বরং ছওয়াব মনে করে দেওয়া আরো কঠোর গুনাহ। বিশেষ করে ওয়ারিশ যদি নাবালিগ এতিম থাকে, তবে এতিমের অনুমতি নিয়েও দান-খয়রাত করবে না। কারণ, নাবালেগের অনুমতি ধর্তব্য নয়। শরিয়ত বিধি বহির্ভূতভাবে 'এতিমের মাল খাওয়া আগুন খাওয়ার শামিল'। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

২৫. ছেলেমেয়েসহ সকল ওয়ারিশের হক পাই-পাই হিসাব করে বুঝিয়ে দেবে। বিশেষ করে মেয়েদের হকের ব্যাপারে অতীব গুরুত্ব দেবে। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

২৬. ভাই-বোন আপসে সুন্দর সম্পর্ককে অটুট থাকবে। এ সম্পর্ক হেফাজতের জন্য যদি জানমাল, মূল্যবান সম্পদ কুরবানি দিতে হয় তবুও দেবে, তাতে কখনো অস্বীকৃতি জানাবে না। আপস, ঐক্য ও মহব্বতের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা জাল্লা-শানুহুর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। স্মরণ রাখতে হবে, নফসের কুমন্ত্রণায় পড়ে আল্লাহ তা'আলার হুকুম ভঙ্গ হলে পরিণাম হয় ভয়াবহ, আসে নানান অশান্তি। -[আহসানুল ফাতাওয়া]

২৭. কোনো সমস্যা বা প্রয়োজন সামনে আসলে সালাতুল হাজাত নামাজ পড়ে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকট সমাধান চেয়ে নেওয়ার অভ্যাস করবে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট স্বীয় আত্মশুদ্ধির জন্য নিয়মিত দোয়া করবে। -[কাশকূলে মা'রিফাত]
পরিশেষে দুনিয়ায় চলতে গেলে আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তায় এমন কি শাসনের ক্ষেত্রে শিক্ষা-দীক্ষায় ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কেউ না কেউ কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক। কাজেই আমি সকলের কাছে আল্লাহ তা'আলার ওয়াস্তে ক্ষমা চাই। আমাকে দিল থেকে ক্ষমা করে দেবে। যদি জানতে পার যে, কেউ আমার দ্বারা কষ্ট পেয়েছে, তবে তার নিকট আমার পক্ষ হতে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে নিতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। -[আহসানুল ফাতাওয়া ১ম খ. ২৬ পৃ.]
আমার উদ্দেশ্য ছিল নসিহত করা তা করে গেলাম, তোমাকে আল্লাহ তা'আলার হাতে সোপর্দ করে আমি বিদায় নিলাম। -[ফাযায়েলে তাবলীগ ৩৯ পৃ.]

সাক্ষী :
দস্তখতকারী/ কারিণী :
তারিখ :

মুফতি নূরুল আমীন
খলিফায়ে আরিফ বিল্লাহ
শাহ হাকীম মোঃ আখতার সাহেব [দা. বা.]

وَعَنْ ٢٩٣٩ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رضـ) قَالَ مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا اَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ فَاَتَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِىْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ مَالًا كَثِيْرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِىْ اِلَّا اِبْنَتِىْ اَفَاُوْصِىْ بِمَالِىْ كُلِّهٖ قَالَ لَا قُلْتُ فَثُلُثَىْ مَالِىْ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَاِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا اُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةُ تَرْفَعُهَا اِلٰى فِىْ امْرَاَتِكَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৯৩৯. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, মক্কা বিজয়ের বৎসর আমি এক রোগে আক্রান্ত হলাম, যাতে আমি মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছলাম। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখতে আসলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার প্রচুর মাল আছে, আর আমার একমাত্র কন্যা ব্যতীত [ঔরসজাত] কোনো ওয়ারিশ নেই। আমি কি আমার সমস্ত মাল [অন্যদের জন্য] অসিয়ত করে যাব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে কি তিন ভাগের দুই ভাগ? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে কি অর্ধেক? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে কি এক-তৃতীয় ভাগ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এক-তৃতীয় ভাগ; আর এক-তৃতীয় ভাগও বেশি। তুমি তোমার [অপর] ওয়ারিশদেরকে সচ্ছল রেখে যাবে এটা তোমার পক্ষে উত্তম তাদেরকে দরিদ্র রেখে যাওয়া অপেক্ষা– যাতে তারা অন্যের নিকট যাচ্ঞা করবে। তুমি আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে তোমার পরিবারের প্রতি যে খরচ করবে, নিশ্চয় তাতেও তোমাকে ছওয়াব দেওয়া হবে– এমনকি তুমি [আদর করে] তোমার বিবির মুখে যে লোকমা উঠিয়ে দাও তাতেও। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَيْسَ يَرِثُنِىْ اِلَّا اِبْنَتِىْ : "আমার একমাত্র কন্যা ব্যতীত আর কোনো ওয়ারিশ নেই" হযরত সা'দ (রা.)-এর অনেক আসাবা থাকা সত্ত্বেও তিনি রাসূলকে কিভাবে বললেন যে, আমার কোনো ওয়ারিশ নেই। একথার কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে–

১. ইমাম নববী (র.) বলেন যে, ذَوِى الْفُرُوْضِ -এর মধ্যে একমাত্র কন্যা ব্যতীত তার আর কোনো ওয়ারিশ ছিল না।

২. কেউ বলেন, এর অর্থ হলো আমার এমন কোনো ওয়ারিশ নেই যাদের ব্যাপারে এ আশঙ্কা হয় না যে, তারা আমার মালকে নষ্ট করে ফেলবে। একমাত্র কন্যা ব্যতীত আর কেউ নেই।

রুগ্ণ ব্যক্তির জন্য তার সমস্ত মাল অসিয়ত করা জায়েজ কিনা? সমস্ত ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, রুগ্ণ ব্যক্তির যদি কোনো ওয়ারিশ থাকে, তাহলে তার জন্য সকল মাল অসিয়ত করা জায়েজ হবে না। কেননা, হুজুর ﷺ হযরত সা'দ (রা.)-কে $\frac{1}{3}$ অংশের অধিক অসিয়ত করতে নিষেধ করেছেন। তবে রুগ্ণ ব্যক্তি যদি সমস্ত সম্পদ বা $\frac{1}{3}$ এর অধিক অসিয়ত করে, তাহলে তা ওয়ারিশদের অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল। তারা অনুমোদন করলে কার্যকর হবে, নতুবা কার্যকর হবে না।

قَوْلُهُ (ع) اِنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً -এর মর্মার্থ : নবী করীম ﷺ -এর বাণীর মর্মার্থ হচ্ছে– পরিবার-পরিজনকে সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়াটা অসহায় অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম।

এ বাক্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছেলে-সন্তান ও আপন ওয়ারিশদেরকে অভাবগ্রস্ত রেখে যাওয়া সঠিক নয়। তার মৃত্যুর পর তারা সচ্ছল অবস্থায় চলতে পারে, সেজন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিজের উপার্জিত সকল সম্পদ ব্যয় না করে তাদের জন্য কিছু রাখতে হবে। কেননা, দরিদ্রতা এমন এক অভিশাপ যা মানুষকে অন্যায় কাজে বাধ্য করে। এমনকি অনেককে কুফরির দিকেও ঠেলে দেয়।

হাদীসের শিক্ষণীয় বিষয় : এ হাদীস হতে কয়েকটি বিষয় শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। যথা– ১. আত্মীয়স্বজনের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া ও তাদের কল্যাণকামিতার জন্য অধিকভাবে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। ২. স্বীয় সম্পদ অন্যদের দেওয়ার চেয়ে নিজের নিকটাত্মীয়দের দেওয়া উত্তম। ৩. আপন আত্মীয়স্বজনদের জন্য মাল ব্যয় করলে তার জন্য ছওয়াব অর্জিত হয়,

তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে হতে হবে। ৪. কোনো একটি মুবাহ কাজও যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করে, তাহলে তাতেও ছওয়াব পাওয়া যাবে। যেমন– স্ত্রীর জন্য বাহ্যিভাবে পার্থিব ভোগ-বিলাসের পাত্র, আনন্দের আতিশয্যে তার মুখে খাবার উঠিয়ে দেওয়া এটা নিছক চিত্তবিনোদনমূলক কাজ বৈ কিছু নয়, যার সাথে ইবাদতের কোনো সম্পর্ক নেই। তা সত্ত্বেও হুজুর ﷺ বলেছেন– স্ত্রীর মুখে খাবার উঠিয়ে দেওয়াটা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে হয়, তাহলে তাতেও ছওয়াব পাওয়া যাবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ :

اَشْفَيْتُ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ إِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْفْ বাবে إِفْعَالْ মাসদার اَلْإِشْفَاءُ অর্থ– নিকটবর্তী হওয়া।

اَنْ تَذَرَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ إِثْبَاتْ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْفْ বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلْوَذَرُ এ অর্থে مُضَارِعْ ও اَمْر حَاضِرْ ব্যতীত অন্যকোনো সীগাহ ব্যবহার হয় না। অর্থ হলো– ছেড়ে দেওয়া, বিরত রাখা।

يَتَكَفَّفُوْنَ : সীগাহ جَمْعْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ إِثْبَاتْ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْفْ বাবে تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّكَفُّفُ অর্থ– ভিক্ষার জন্য হস্ত প্রসারিত করা, হাত পাতা।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٩٤٠ - عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رض) قَالَ عَادَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا مَرِيْضٌ فَقَالَ اَوْصَيْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكَمْ قُلْتُ بِمَالِىْ كُلِّهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ قُلْتُ هُمْ اَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ فَقَالَ اَوْصِ بِالْعُشْرِ فَمَا زِلْتُ اُنَاقِصُهٗ حَتّٰى قَالَ اَوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

২৯৪০. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, আমার এক রোগে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে দেখতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, অসিয়ত করার ইচ্ছা করেছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কি পরিমাণ? বললাম, আমার সমস্ত মাল আল্লাহর রাস্তায় দিতে ইচ্ছা করেছি। তিনি বললেন, তোমার সন্তানের জন্য কি রাখতে চাও? আমি বললাম, তারা বহু সম্পদের অধিকারী। তিনি বললেন, তথাপি তুমি দশ ভাগের এক ভাগ অসিয়ত কর! হযরত সা'দ বলেন, আমি বরাবর তাঁকে এটা কম, এটা কম বলতে থাকলাম। অবশেষে তিনি বললেন, তবে তিন ভাগের এক ভাগ অসিয়ত কর, আর তিন ভাগের এক ভাগও বেশি। –[তিরমিযী]

٢٩٤١ - وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ خُطْبَتِهٖ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰى كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهٗ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ) وَ زَادَ التِّرْمِذِىُّ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ وَيُرْوٰى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ مُنْقَطِعٌ هٰذَا لَفْظُ الْمَصَابِيْحِ وَفِىْ رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِىْ قَالَ لَا تَجُوْزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ -

২৯৪১. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিদায় হজের ভাষণে বলতে শুনেছি, আল্লাহ প্রত্যক হকদারকেই তার হক দিয়ে দিয়েছেন [যে যা পাবে]। সুতরাং কোনো ওয়ারিশের জন্যই কোনো অসিয়ত নেই। –[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্] ইমাম তিরমিযী বাড়িয়ে বলেছেন, [হুজুর ﷺ এও বলেছেন] সন্তান স্ত্রীর; আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর। আর পরকালে তাদের হিসাব আল্লাহর হাতে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত নেই, কিন্তু যদি ওয়ারিশরা অনুমতি দেয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰى كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهٗ : "আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে তার হক দিয়ে দিয়েছেন" এ কথাটির মর্মার্থ হলো আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ওয়ারিশের জন্য অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, চাই তারা ذَوِى الْفُرُوْضِ হোক অথবা عَصَبَةٌ হোক। সুতরাং এখন থেকে আর কোনো ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করার প্রয়োজন নেই। কেউ যদি কোনো ওয়ারিশের জন্য অংশ বেশি দেওয়ার অসিয়ত করে যায় তা ধর্তব্য হবে না। তবে যদি অন্যান্য ওয়ারিশগণ তা মেনে নেয় তাহলে তা কার্যকরী হবে। কেননা, মৃত ব্যক্তির কোনো সম্পদের অসিয়ত করে যাওয়ার বিধান মিরাসের আয়াত দ্বারা মনসুখ হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ ﷺ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ : "সন্তান স্ত্রীর" فِرَاشٌ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো– বিছানা। এখানে অর্থ হবে– صَاحِبُ الْفِرَاشِ অর্থাৎ স্ত্রী। হাদীসের এ অংশের অর্থ হবে, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলার সাথে জেনা করে এবং তার দ্বারা সন্তান হয়, তাহলে ঐ সন্তানের نَسَبٌ জেনাকারী থেকে সাব্যস্ত হবে না; বরং صَاحِبُ فِرَاشٍ অর্থাৎ মহিলার দিকে সম্পর্কিত হবে।

قَوْلُهُ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ : "আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর"- এ উক্তির দুটি অর্থ হতে পারে। এখানে পাথর দ্বারা তার মিরাস থেকে বঞ্চিত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন– আমরা এমন ব্যক্তি যে কিছুই পাওয়ার উপযুক্ত নয় তার সম্পর্কে বলি, "সে ছাই পাবে" সুতরাং বাক্যের অর্থ হবে– জেনার দ্বারা সৃষ্ট সন্তানের নসব যেহেতু পিতার সাথে সম্পৃক্ত হয় না তাই সে উক্ত সন্তান থেকে মিরাসস্বরূপ কিছুই পাবে না।

অথবা বলা যেতে পারে যে, এখানে পাথর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পাথর নিক্ষেপ করা। অর্থাৎ জেনাকারী ব্যক্তি যদি বিবাহিত হয়, তাহলে তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে।

قَوْلُهُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ : "তার হিসাব [বিচার] আল্লাহর হাতে" - এ বাক্যেরও কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যথা–

১. এহেন অপকর্মে লিপ্ত ব্যক্তির দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত। তিনি তার কর্ম অনুযায়ী তাকে শাস্তি প্রদান করবেন।
২. এর আরেকটি অর্থ যা অধিক সঙ্গতিপূর্ণ তা হলো এই যে, জেনাকারী ব্যক্তির পার্থিব শাস্তি "হদ" জারি করা আমাদের দায়িত্ব, যা আমরা করে থাকি, কিন্তু পরকালে তার ক্ষমা হবে কিনা সে ব্যাপারে আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত। ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন, অথবা তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন।
৩. অথবা বলা যায় যে, যদি কোনো ব্যক্তি জেনা বা অন্য কোনো অপকর্ম করে এবং দুনিয়াতে তাকে কোনো শাস্তি দেওয়া না হয়, তাহলে তার ব্যাপারটা আল্লাহর উপর ন্যস্ত, ইচ্ছা হলে এর জন্য পরকালে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন, আবার ইচ্ছা হলে তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। –[মেরকাত- খ. ৬, পৃ. ১৮৩]

وَعَنْ ٢٩٤٢ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ سِتِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِى الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ ثُمَّ قَرَأَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَاِبْنُ مَاجَةَ)

২৯৪২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন– কোনো পুরুষ বা নারী ষাট বছর যাবৎ আল্লাহর ইবাদত করে, অতঃপর তাদের নিকট মউত বা মৃত্যু পৌঁছে আর তারা অসিয়ত দ্বারা ওয়ারিশের ক্ষতি করে, যাতে তাদের জন্য দোজখ আবশ্যক হয়ে যায়। অতঃপর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এ আয়াত পাঠ করলেন : 'অসিয়তের পর যা অসিয়ত করা হয় এবং ঋণের পর– যদি অসিয়তকারী ক্ষতি না করে [ওয়ারিশদের], বাক্য হতে 'এটা হলো বড় সাফল্য' পর্যন্ত। –[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীস "হক্কুল ইবাদ" বা বান্দার হকের গুরুত্ব বহন করছে যে, যারা সারাটা জীবন আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে কাটিয়ে দিয়েছে, কিন্তু বান্দার হক নষ্ট করা হতে বিরত থাকেনি, সে এত সকল ইবাদত করা সত্ত্বেও আল্লাহর অসন্তুষ্টির হাত থেকে রেহাই পেতে পারবে না। সে কথাই হুজুর বলেছেন যে, যদি কোনো মানুষ চাই সে

পুরুষ হোক বা মহিলা, ষাট বৎসর পর্যন্ত ইবাদতে কাটিয়েছে, কিন্তু জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে স্বীয় সম্পদের ১/৩ অংশের অধিকের অসিয়ত অপর ব্যক্তি সম্পর্কে করে যায়, অথবা কোনো ওয়ারিশকে পূর্ণ সম্পত্তি হেবা করে যায়, যা দ্বারা অন্য ওয়ারিশরা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়ে যায়। এভাবে সে কোনো ওয়ারিশকে ক্ষতি করে যায়, যদ্দরুন সে এত দীর্ঘ কালের ইবাদত-বন্দেগি সত্ত্বেও নিজেকে জাহান্নামের উপযুক্ত সাব্যস্ত করে নেয়। কেননা, নিজের ওয়ারিশদের ক্ষতি সাধন শুধুমাত্র বান্দার হকের ব্যাপারে অবহেলার কারণে অশোভনীয় ও নাজায়েজই নয়; বরং তার পাশাপাশি আল্লাহর হুকুমের পরিপন্থি ও আল্লাহর কর্তৃক নির্ধারিত দিকনির্দেশনার সুস্পষ্ট সীমালঙ্ঘনও বটে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٩٤٣ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ عَلٰى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلٰى سَبِيْلٍ وَسُنَّةٍ وَمَاتَ عَلٰى تُقًى وَشَهَادَةٍ وَّمَاتَ مَغْفُوْرًا لَهُ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

২৯৪৩. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে অসিয়ত করে মরেছে সে সত্য পথ ও ঠিক প্রথার উপর মরেছে, মুত্তাকী ও শহীদরূপে মরেছে এবং আল্লাহর ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে মরেছে। -[ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٢٩٤٤ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ اَوْصٰى اَنْ يُّعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ فَاَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِيْنَ رَقَبَةً فَاَرَادَ اِبْنُهُ عَمْرٌو اَنْ يُّعْتَقَ عَنْهُ الْخَمْسِيْنَ الْبَاقِيَةَ فَقَالَ حَتّٰى اَسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِيْ اَوْصٰى اَنْ يُّعْتَقَ عَنْهُ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَاِنَّ هِشَامًا اَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِيْنَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُوْنَ رَقَبَةً اَفَاُعْتِقُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَاَعْتَقْتُمْ عَنْهُ اَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ اَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذٰلِكَ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৯৪৪. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শো'আইব তাঁর বাপ ও দাদা পরম্পরায় বর্ণনা করেন যে, আস ইবনে ওয়ায়েল [মৃত্যুকালে] অসিয়ত করে যান যে, তার পক্ষ হতে যেন একশত গোলাম আজাদ করা হয়। তদনুসারে তার পুত্র হিশাম পঞ্চাশটি গোলাম আজাদ করেন। অতঃপর তাঁর পুত্র আমর বাকি পঞ্চাশটি আজাদ করার ইচ্ছা করলেন, তবে বললেন, আমি আজাদ করব না যাবৎ না এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করব। অতঃপর তিনি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা তার পক্ষ হতে একশত গোলাম আজাদ করার অসিয়ত করে গেছেন এবং আমার ভাই হিশাম পঞ্চাশটি আজাদও করেছেন; আর বাকি রয়েছে পঞ্চাশটি; আমি কি তার পক্ষ হতে তা আজাদ করব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে যদি মুসলমান হতো, আর তোমরা তার পক্ষ হতে তা আজাদ করতে অথবা দান-খয়রাত করতে বা হজ করতে, তাহলে তার নিকট তার ছওয়াব পৌঁছত। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ : আস ইবনে ওয়ায়েল, ইনি ইসলামের যুগ পাওয়া সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যক্রমে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করার সৌভাগ্য তার হয়নি এবং কুফর অবস্থায়ই তার মৃত্যুবরণ হয়। তার দুই ছেলে ছিল। একজন হযরত হিশাম ইবনে আস, অপরজন হযরত ওমর ইবনে আস। এরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলের সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। -[রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা]

قَوْلُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا الخ : নবী করীম ﷺ -এর উত্তরের সারমর্ম হলো এই যে, তোমাদের পিতা আস যদি মুসলমান হতো এবং ইসলাম অবস্থায় মারা যেত, তাহলে তার পক্ষ থেকে যে কোনো ইবাদতই করা হোক না কেন তা তার কবরে পৌছে যেত। কিন্তু যেহেতু সে মুসলমান হয়নি এবং কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে সুতরাং এখন তার পক্ষ থেকে যত নেক কাজই কর না কেন সেগুলোর ছওয়াব তার কবরে পৌছবে না।

وَعَنْ ٢٩٤٥ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَطَعَ مِيْرَاثَ وَارِثِهِ قَطَعَ اللّٰهُ مِيْرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ)

২৯৪৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি [অতিরিক্ত অসিয়ত দ্বারা] ওয়ারিশদের মিরাসের অংশ কাটিয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার জান্নাতের মিরাসের অংশ কাটবেন। –[ইবনে মাজাহ; আর বায়হাকী তাঁর শোআবুল ঈমানে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَنْ قَطَعَ مِيْرَاثَ وَارِثِهِ : "যে ব্যক্তি ওয়ারিশদের মিরাস কর্তন করেছে" অর্থাৎ ওয়ারিশদেরকে অতিরিক্ত অসিয়তের মাধ্যমে বা অন্য কোনো পন্থায় মিরাস পাওনাদারদেরকে তাদের প্রাপ্য হতে বঞ্চিত করেছে। মূলত ওয়ারিশি স্বত্ব এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বান্দার হক। পিতা মারা গেলে তার সন্তানেরা চাই তারা পুরুষ হোক বা মহিলা হোক পিতার সম্পদে একটা নির্দিষ্ট হারে সম্পদের হকদার হয়ে যায়, কিন্তু সেই জাহিলি যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান যুগেও একই গতিতে ওয়ারিশদেরকে তাদের মিরাস থেকে বঞ্চিত করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। সেটা বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। পিতা কর্তৃক মেয়েকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে ছেলেদেরকে অতিরিক্ত হেবা বা অসিয়ত করার মাধ্যমে। অথবা পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতৃগণ কর্তৃক ভগ্নিদেরকে মিরাস দেওয়া থেকে বিরত থাকা।

মেয়েরা কি তাদের মিরাস গ্রহণ করবে? মেয়েরা তাদের পিতার সম্পদ হতে মিরাস গ্রহণ করা কতটুকু ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত, সমাজে এটি একটি বড় প্রশ্ন। সাধারণত এক্ষেত্রে একটি কুসংস্কার চালু আছে যে, মেয়েরা মিরাসি সম্পত্তি আনলে তাতে বরকত হয় না। অথবা বলা হয় যে, বাপের বাড়ির সব মিরাস নিয়ে গেলে সে বাড়িতে বেড়াতে আসবে কিভাবে? অথবা ভাইদের কষ্ট হবে এ চিন্তা করেও অনেক মহিলারা নিজের সন্তানদেরকে বঞ্চিত করে মিরাস আনা থেকে বিরত থাকে। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাইয়েরাই অন্যায় ও জোরপূর্বক বোনদেরকে মিরাস দেওয়া থেকে বিরত থাকে। কিন্তু এর সবগুলোই অপরাধ ও জুলুমের আওতায় পড়ে। কেননা, মিরাস হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র কুরআনে ঘোষিত নির্দিষ্ট হক। সেটা নিলে বরকত হবে না এমন চিন্তা করা আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করারই নামান্তর। কেননা, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যা কিছু বিধান জারি করেছেন তার কোনোটিই মানুষের অমঙ্গলের জন্য করেননি। তা ছাড়া পরিবার বা সংসারের উন্নতির দায়িত্ব যেরকম স্বামীর তদ্রূপ স্ত্রীর দায়িত্বও কোনো অংশে কম নয়। স্বামীর পিতা মারা গেলে স্বামী তার ছেলে-সন্তানের কথা বিবেচনা করে সমুদয় মিরাস কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব করে বুঝে নেয়। সুতরাং স্ত্রীরও দায়িত্ব তার মিরাস বুঝে নেওয়া। কেননা, এগুলোতো তারই সন্তানেরা ভোগ করবে। সন্তানের চেয়ে ভাইয়ের অধিকার কোনো অংশেই অধিক হতে পারে না। আর যে সমস্ত ভাইয়েরা বা সমাজপতিরা মহিলাদেরকে মিরাস হতে বঞ্চিত করতে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন তাদেরকে এ হাদীসটি মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করা অপরিহার্য।

قَوْلُهُ قَطَعَ اللّٰهُ مِيْرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ : পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মু'মিনদেরকে জান্নাতের ওয়ারিশ বানানোর ঘোষণা দিয়ে বলেছেন– اَلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ 'মু'মিনরা জান্নাতুল ফিরদাউসের ওয়ারিশ হবে।' এ আয়াতের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই হুজুর ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অবৈধভাবে ওয়ারিশদেরকে তাদের মিরাস থেকে বঞ্চিত করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে জান্নাতের ওয়ারিশ হওয়া থেকে বঞ্চিত করবেন। অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশের নসিব তাদের হবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সঠিক জিনিস অনুধাবন করার এবং পূর্ণাঙ্গভাবে দীনের উপর চলার তৌফিক দান করুন। আমীন!

كِتَابُ النِّكَاحِ
অধ্যায় : বিবাহ

اَلنِّكَاحُ **-এর আভিধানিক :** نِكَاحٌ শব্দটি বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ নিয়ে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

১. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর মতে, نِكَاحٌ -এর অর্থ হলো- اَلضَّمُّ মিলানো বা সংযুক্ত করা।

২. ইমাম ফাররা (র.)-এর মতে, نِكَاحٌ -এর অর্থ- اَلْوَطْئُ বা সহবাস করা। যেমনি পবিত্র কুরআনে এসেছে-

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ـ

৩. কারো মতে এর অর্থ হলো- اَلْعَقْدُ বা বন্ধন। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاۤءِ

৪. কারো মতে এর অর্থ হলো- اَلْجَمْعُ বা একত্রিত করা।

৫. আরেক দলের মতে এর অর্থ হলো- اَلرُّشْدُ তথা ভালো সঙ্গ বিচারের জ্ঞান। যেমনি পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَابْتَلُوا الْيَتَامٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ـ

উল্লেখ্য যে, نِكَاحٌ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি এ বিষয়ে ইমামদের মাঝেও মতভেদ রয়েছে।

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, نِكَاحٌ -এর حَقِيْقِىْ অর্থ হলো- وَطْئ আর মাজাযী অর্থ হলো- عَقْد বা বন্ধন।

২. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, نِكَاحٌ-এর حَقِيْقِىْ অর্থ হলো- عَقْد আর মাজাযী অর্থ হলো- وَطْئ বা সহবাস।

৩. কিছু সংখ্যকের মতে, نِكَاحٌ শব্দটি উভয় অর্থে مُشْتَرَكٌ [সম্মিলিত]।

اَلنِّكَاحُ **-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :**

১. শরহে বেকায়া গ্রন্থকারের মতে- اَلنِّكَاحُ عَقْدٌ مَوْضُوْعٌ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ অর্থাৎ যৌনাঙ্গ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সংঘটিত বন্ধনকে বিবাহ বলে।

২. فِقْهُ السُّنَّةِ -এর মতে- هُوَ عَقْدُ التَّزَوُّجِ

৩. কারো মতে- اَلنِّكَاحُ عَقْدٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ يَحِلُّ بِهِ الْوَطْئُ

৪. কিছু সংখ্যকের মতে- هُوَ عَقْدٌ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْاَةِ يَسْتَحِلُّ بِهِ اِسْتِمْتَاعُ الْاَحَدِ مِنَ الْاٰخَرِ

اَرْكَانُ النِّكَاحِ **বা নিকাহের রুকনসমূহ :** নিকাহ বা বিবাহের রুকন দুটি- ১. اِيْجَابٌ বা প্রস্তাব, ২. قَبُوْل বা সম্মতি। এ ঈজাব ও কবূলের মাধ্যমেই নিকাহ সংঘটিত হয়। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মধ্য হতে যে কারো প্রথম উক্তিকে ঈজাব বা প্রস্তাব বলা হয়, আর তদুত্তরে প্রদত্ত সম্মতি জ্ঞাপক উক্তিকে قَبُوْل বা সম্মতি বলা হয়।

شَرْطُ النِّكَاحِ **বা বিবাহের শর্ত :** এখানে শর্ত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- اَلْمُرَادُ الَّتِىْ هِىَ خَارِجَةٌ عَنِ الشَّيْئِ الْمَوْقُوْفِ عَلَيْهَا অর্থাৎ বস্তুর বহির্গত নির্ভরশীল উপাদানকে শর্ত বলা হয়। এ মূলনীতি হিসেবে বিবাহের শর্ত ২টি।

১. اَلشَّرْطُ الْعَامُّ **[সাধারণ শর্ত] :** পাত্র-পাত্রী এমন হওয়া চাই যাতে শরিয়তের পক্ষ থেকে কোনো বাধা না থাকে। যেমন- مُحَرَّمَه না হওয়া, স্ত্রীর বর্তমানে তার সহোদরা বোন না থাকা, কাফির না হওয়া।

২. اَلشَّرْطُ الْخَاصُّ **[বিশেষ শর্ত] :** দুজন স্বাধীন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুজন নারী উপস্থিত থাকা। যেমন ইরশাদ হচ্ছে-

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ ـ

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম মালেক (র.) বলেন, বিশেষ সাক্ষীর কোনো প্রয়োজন নেই; বিয়ের সংবাদ প্রচার করে দিলেই হবে। তিনি দলিল হিসেবে এ হাদীসটি পেশ করেন– قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَعْلِنُوْا هٰذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوْهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ

عِلَلُ النِّكَاحِ বা নিকাহের উপকরণ : নিকাহ -এর মধ্যে চারটি عِلَّةٌ বা উপকরণ রয়েছে–

১. عِلَّةٌ فَاعِلِيَّةٌ বা কর্তৃ-উপকরণ তথা সম্পাদনকারী। আর তা হলো, স্বামী ও স্ত্রী।

২. عِلَّةٌ مَادِيَّةٌ বা বস্তুগত উপকরণ। তা হলো– ঈজাব তথা প্রস্তাব ও কবূল অর্থাৎ সমর্থন বা সম্মতি।

৩. عِلَّةٌ صُوْرِيَّةٌ বা বাহ্যিক বা আকৃতিগত উপকরণ। আর তা হলো, উভয়ের মধ্যকার সেই সম্পর্ক, যা শরিয়ত কর্তৃক স্বীকৃত।

৪. عِلَّةٌ غَائِيَّةٌ বা উদ্দেশ্যমূলক উপকরণ। আর তা হলো, নিকাহের সাথে সংশ্লিষ্ট উপকারিতা।

উল্লেখ্য, عِلَلٌ اَرْبَعَه বা উপকরণ চতুষ্টয়ের মধ্য হতে عِلَّةٌ مَادِيَّةٌ তথা ঈজাব ও কবূলের মাধ্যমে বিবাহ সংঘটিত হয়।

اَقْسَامُ النِّكَاحِ বা নিকাহের প্রকারভেদ : ইসলামি শরিয়ত বিবাহকে চারভাগে বিভক্ত করেছে–

১. **নিকাহে সহীহ (اَلنِّكَاحُ الصَّحِيْحُ)** : মাহরাম নয় এমন মহিলাকে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ করা।

২. **নিকাহে ফাসিদ (اَلنِّكَاحُ الْفَاسِدُ)** : নর ও নারী কোনো সাক্ষী ব্যতীত নিজেরা পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে, তাকে নিকাহে ফাসিদ বলে।

৩. **নিকাহে বাতিল (اَلنِّكَاحُ الْبَاطِلُ)** : অপরের বিবাহিতা স্ত্রী অথবা তালাকপ্রাপ্তা নারীকে তার ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ করাকে নিকাহে বাতিল বলে।

৪. **নিকাহে মাওকূফ (اَلنِّكَاحُ الْمَوْقُوْفُ)** : ওয়ালী বা তৃতীয় ব্যক্তির আকদ ও কবূলের মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন করার পর, যার জন্য এটা করা হলো তার অনুমোদন সাপেক্ষে তা স্থগিত রাখাকে নিকাহে মাওকূফ বলে।

আলোচ্য অধ্যায়ে نِكَاحٌ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে এবং নিকাহ সম্বন্ধীয় বিস্তারিত কথা যথাস্থানে আলোচিত হবে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٩٤٦ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৯৪৬. অনুবাদ : [বিখ্যাত সাহাবী] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যার বিবাহের সামর্থ্য আছে সে যেন বিবাহ করে নেয়। কারণ, বিবাহ দৃষ্টি আনত করার ও লজ্জাস্থান সংরক্ষণের পক্ষে অধিকতর সহায়ক এবং যে সামর্থ্যের অধিকারী নয়, সে যেন রোজা রাখে। কেননা, রোজা তার পক্ষে নির্বীর্যকরণস্বরূপ।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلنِّكَاحُ -এর আভিধানিক অর্থ : نِكَاحٌ শব্দটি نَكَحَ মূলধাতু হতে নির্গত, বাবে فَتَحَ/ضَرَبَ -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلضَّمُّ বা মিলানো।

২. اَلْجَمْعُ বা একত্রীকরণ।

৩. اَلْوَطْئُ বা সহবাস করা। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- "لَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَاۤؤُكُمْ"

৪. اَلْعَقْدُ বা বন্ধন। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ"

৫. اَلرُّشْدُ বা ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান।

৬. ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, এর প্রকৃত অর্থ- اَلْوَطْئُ এবং রূপক অর্থ- اَلْعَقْدُ।

৭. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এর প্রকৃত অর্থ- اَلْعَقْدُ আর রূপক অর্থ- اَلْوَطْئُ।

اَلنِّكَاحُ-এর পারিভাষিক অর্থ :

১. نِكَاحٌ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় شَرْحُ الْوِقَايَةِ গ্রন্থকার বলেন- اَلنِّكَاحُ هُوَ عَقْدٌ مَوْضُوْعٌ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ
অর্থাৎ যৌনাঙ্গ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে নারী-পুরুষের মাঝে প্রতিষ্ঠিত বন্ধনকে نِكَاحٌ বলা হয়।

২. فِقْهُ الْإِسْلَامِىْ গ্রন্থে রয়েছে- اَلنِّكَاحُ هُوَ عَقْدُ التَّزْوِيْجِ অর্থাৎ নিকাহ হলো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।

৩. فَتْحُ الْقَدِيْرِ গ্রন্থকার বলেন- هُوَ عَقْدٌ وُضِعَ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ بِالْأُنْثٰى قَصْدًا

৪. আল্লামা শাওকানী (র.) বলেন- هُوَ عَقْدٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ يَحِلُّ بِهِ الْوَطْئُ

৫. আল্লামা ফখরুল ইসলাম (র.) বলেন-

اَلنِّكَاحُ اِسْمٌ لِلْعَقْدِ الشَّرْعِيِّ الَّذِىْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اَحْكَامٌ وَ مَقَاصِدُ كَحُكْمِ تَمَلُّكِ مُتْعَةِ الْبُضْعِ.

حُكْمُ النِّكَاحِ বা বিবাহের হুকুম : বিবাহের হুকুম সম্পর্কে ইমামদের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে; যা নিম্নরূপ-

مَذْهَبُ اَهْلِ الظَّوَاهِرِ : আহলে জাহেরের মতে, বিবাহ ফরজে আইন। যে ব্যক্তি মোহর ও ভরণপোষণ প্রদানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিবাহ করবে না সে গুনাহগার হবে। তাঁদের দলিল হচ্ছে-

١. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ الخ

٢. قَالَ الرَّسُوْلُ تَزَوَّجُوْا وَفِىْ رِوَايَةٍ تَنَاكَحُوْا .

উসূলের কায়েদা হচ্ছে- اَلْاَمْرُ لِلْوُجُوْبِ অর্থাৎ আমর উজূবের জন্য। কাজেই বিবাহ করা ফরজ সাব্যস্ত হলো।

رَأْىُ الْاِمَامِ الشَّافِعِىِّ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি উত্তেজনা শক্তি খুব বেশি হয়, বিবাহ না করলে জেনায় লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং نَفَقَه ও مَهْر দেওয়ার ক্ষমতা থাকে, তাহলে বিবাহ ফরজ। আর স্বাভাবিক অবস্থায় বিবাহ করা জায়েজ। যেহেতু اَلتَّخَلِّىْ بِالْعِبَادَاتِ اَفْضَلُ مِنَ النِّكَاحِ অর্থাৎ ইবাদত করার মানসে বিবাহ না করে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করা উত্তম।

তাঁর দলিল হচ্ছে-

١. قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاۤءَ ذٰلِكُمْ.

٢. قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ .

رَأْىُ الْاِمَامِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, অবস্থানুপাতে বিবাহের হুকুম কয়েকটি। যেমন-

ক. যদি যৌন উত্তেজনা বেশি হয়, বিবাহ না করলে জেনায় লিপ্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে এবং বিবাহ করার সামর্থ্যও থাকে, তাহলে বিবাহ করা ফরজ। আর সামর্থ্য না থাকলে রোজা রাখতে হবে। (فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهٗ لَهٗ وِجَاۤءٌ)

খ. যৌনাকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হলে তার জন্য বিয়ে করা ওয়াজিব।

গ. স্বাভাবিক অবস্থায় বিয়ে করা সুন্নত। যেমন- اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِىْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : হানাফীদের পক্ষ হতে তাঁদের দলিলসমূহের জবাব-

১. আহলে জাহেরের দলিলগুলোর জবাবে বলা যায় যে, তারা যে সকল اَمْر দ্বারা وُجُوْب সাব্যস্ত করেছেন তা সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য নয়; বরং غَلَبَةُ شَهْوَتْ-এর জন্য প্রযোজ্য।

২. আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাবে বলা যায় যে, বিবাহ فِىْ نَفْسِهٖ মুবাহ কাজ, তবে বিভিন্ন কারণে তা ওাজিব হয়ে যায়।

اَلْبَاءَةُ শব্দের অর্থ : হাদীসে ব্যবহৃত اَلْبَاءَةُ শব্দটির অভিধানে নিম্নোক্ত অর্থ পাওয়া যায়। যেমন–

১. আল-মু'জামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে– اَلْبَاءَةُ اَلنِّكَاحُ اَلْبَاحُ وَالْجِمَاعُ অর্থাৎ বিবাহ এবং যৌনক্ষমতা।

২. মিরকাত গ্রন্থে বলা হয়েছে– اَلْبَاءَةُ অর্থ– اَلْجِمَاعُ অর্থাৎ সহবাস।

৩. কারো মতে, এর অর্থ হলো مُبَاءَةٌ বা আবাসস্থল। কেননা, বিবাহিতা রমণীকে আবাসস্থলে রাখার প্রয়োজন পড়ে। যেমন মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন– لِأَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً بَوَّءَهَا مَنْزِلًا

৪. কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো– مُؤْنَةُ النِّكَاحِ বিবাহের অত্যাবশ্যকীয় খরচ তথা মোহর, ভরণপোষণ ইত্যাদি।

৫. জনৈক অভিধানবেত্তা বলেন, اَلْبَاءَةُ শব্দের অর্থ হচ্ছে– বিবাহ করার সার্বিক ক্ষমতা। কেননা, শব্দটির পূর্বে একটি مُضَافٌ উহ্য রয়েছে।

اَلْبَاءَةُ শব্দের ক্বিরাত : اَلْبَاءَةُ শব্দটিকে কয়েকটি ক্বিরাতে পড়া যায়। যেমন– ১. اَلْبَاءَةُ [মদ সহকারে], ২. اَلْبَةُ [মদ ব্যতীত], ৩. اَلْبَاءُ [মদসহ ও ة ব্যতীত], ৪. اَلْبَهَةُ ['ه' সহ কিন্তু মদ ব্যতীত]।

বিবাহ ও ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য : বিবাহ ও ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যকার পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ–

১. نِكَاحٌ শব্দটি বাবে ضَرَبَ/ فَتَحَ -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– বিবাহ, মিলন, সহবাস, বন্ধন ইত্যাদি। পক্ষান্তরে اَلْبَيْعُ শব্দটি বাবে ضَرَبَ -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– ক্রয়বিক্রয় করা।

২. نِكَاحٌ -এর ক্ষেত্রে ঈজাব ও কবূল-এর শব্দ উভয়টি অতীতকালীন বা একটি অতীতকালীন এবং অপরটি ভবিষ্যৎকালীন হতে পারে। পক্ষান্তরে بَيْع -এর ক্ষেত্রে উভয়টি অতীতকালীন শব্দ হওয়া অপরিহার্য।

৩. نِكَاحٌ -এর ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি প্রস্তাবকারী এবং গ্রহণকারী হতে পারে, আর بَيْع -এর ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি প্রস্তাবক এবং গ্রহণকারী হতে পারে না।

৪. نِكَاحٌ -এর মধ্যে اِسْتِمْتَاعٌ বা উপভোগের অধিকার অর্জিত হয়, আর بَيْع -এর মধ্যে বাস্তব ও মূল মালিকানা অর্জিত হয়।

৫. نِكَاحٌ -এর ক্ষেত্রে অলীর ভূমিকার গুরুত্ব অত্যধিক, কিন্তু بَيْع -এর ক্ষেত্রে অলির কোনো ভূমিকা নেই।

৬. نِكَاحٌ -এর ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুজন সাক্ষী শর্ত, কিন্তু بَيْع -এর ক্ষেত্রে সাক্ষী শর্ত নয়।

৭. نِكَاحٌ -এর ক্ষেত্রে "كُفُوْ" -এর গুরুত্ব রয়েছে, কিন্তু بَيْع -এর ক্ষেত্রে এটা নিষ্প্রয়োজন।

৮. অমুসলিমদের সাথে نِكَاحٌ [বিবাহ] বৈধ হয় না, কিন্তু بَيْع বা বেচাকেনা অমুসলিমদের সাথেও বৈধ।

৯. نِكَاحٌ -এর মধ্যে উভয় জগতের কল্যাণ নিহিত থাকে, কিন্তু بَيْع -এর মধ্যে শুধুমাত্র পার্থিব জগতের কল্যাণ নিহিত।

১০. نِكَاحٌ -এর ক্ষেত্রে خِيَارٌ -এর অবকাশ নেই, কিন্তু بَيْع -এর ক্ষেত্রে خِيَارٌ -এর অবকাশ বিদ্যমান।

১১. بَيْع -এর মধ্যে সব রকমের تَصَرُّف জায়েজ, কিন্তু বিবাহের মধ্যে تَصَرُّف شَرْعِيٌّ ছাড়া অন্য কোনো تَصَرُّف জায়েজ নেই।

১২. نِكَاحٌ -এর মধ্যে خُطْبَة পড়তে হয়, কিন্তু بَيْع -এর মধ্যে خُطْبَة -এর দরকার হয় না।

১৩. نِكَاحٌ -এর জন্য একজন পুরুষ ও একজন নারী হওয়া আবশ্যক, কিন্তু بَيْع -এর মধ্যে এরূপ কোনো শর্ত নেই।

১৪. مَحْرَمٌ -এর সাথে نِكَاحٌ জায়েজ নেই, কিন্তু بَيْع সবার সাথে জায়েজ।

১৫. بَيْع -এর মধ্যে লাভ-ক্ষতি উকিলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, কিন্তু نِكَاحٌ -এর লাভ-ক্ষতি উকিলের দিকে যায় না।

বিবাহের উপকারিতা : মানব জীবনে বিবাহের গুরুত্ব অনস্বীকার্য এবং এর উপকারিতাও অপরিসীম। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিবাহের উপকারিতা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো। যেমন–

১. বিবাহের মাধ্যমে মানসিক তৃপ্তি ও কর্মোদ্দীপনা লাভ করা যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–
وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ـ

২. উন্নত নৈতিকতা ও চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জিত হয়। যেমন, রাসূল ﷺ বলেছেন– فَاِنَّهٗ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

৩. আদম সন্তানের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। যেমন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–
تَنَاكَحُوْا وَتَكَاثَرُوْا فَاِنِّىْ اُبَاهِىْ بِكُمُ الْاُمَمَ الخ

৪. সুখী ও শান্তিময় পারিবারিক জীবন গড়ে উঠে। যেমন রাসূল ﷺ বলেছেন– لَمْ تَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ

৫. ঈমানের মজবুতি ও দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়।

৬. শারীরিক ও মানসিক আনন্দ লাভ করা যায়।

৭. নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৮. যৌন চাহিদা পূরণ করা যায়।

৯. সামাজিক বিপর্যয় ও অবক্ষয় রোধ করা যায়।

১০. ব্যক্তির ইহকাল সুশোভিত হয়ে উঠে। কুরআনের ভাষ্য– زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاۤءِ وَالْبَنِيْنَ

১১. কুরআনের প্রতি আনুগত্য ও রাসূল ﷺ -এর আদর্শের প্রতিফলন ঘটে।

وَعَنْ ٢٩٤٧ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رض) قَالَ رَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ اَذِنَ لَهٗ لَاخْتَصَيْنَا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৯৪৭. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [বিখ্যাত সাহাবী] ওসমান ইবনে মাযঊন (রা.)-এর বিবাহ না করার সংকল্প প্রত্যাখ্যান করে দেন। যদি তিনি তাঁকে এরূপ অনুমতি প্রদান করতেন, তাহলে আমরা সকলে খোঁজা বা খাসি হয়ে যেতাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّبَتُّلُ-এর আভিধানিক অর্থ : تَبَتُّلٌ শব্দটি বাবে تَفَعُّلٌ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো– ১. اَلْاِنْفِرَادُ বা একাকী হওয়া। ২. اِتِّخَاذُ الْوَحْدَةِ বা নির্জনতা অবলম্বন করা। ৩. اَلْاِنْقِطَاعُ বা বিচ্ছিন্ন হওয়া। ৪. اَلتَّفَرُّغُ لِعِبَادَةِ اللّٰهِ বা আল্লাহর ইবাদতের প্রতি অনুরাগী হওয়া। ৫. اَلرُّهْبَانِيَّةُ বা বৈরাগ্যবাদ অবলম্বন।

اَلتَّبَتُّلُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. শরহুস সুন্নাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে– اَلتَّبَتُّلُ هُوَ الْاِنْقِطَاعُ عَنِ النِّسَاۤءِ وَتَرْكُ النِّكَاحِ لِعِبَادَةِ اللّٰهِ

অর্থাৎ দাম্পত্য জীবন পরিত্যাগ করে আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন থাকাই তাবাত্তুল।

২. ইবনে যায়েদ (র.)-এর মতে, দুনিয়া ও দুনিয়ায় সবকিছু পরিহার করে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তিতে মনোনিবেশ করাকে তাবাত্তুল বলে।

اَلتَّبَتُّلُ নিষিদ্ধ করার কারণ : ইসলামি চিন্তানায়কগণ তাবাত্তুল নিষিদ্ধ হওয়ার নিম্নোক্ত কারণগুলো উল্লেখ করেছেন। যেমন– ১. ব্যভিচার ও অনাচার ব্যাপকতা লাভ করে। ২. মুসলিম উম্মাহ বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ৩. এতে নারীর অবমূল্যায়ন করা হয়। ৪. মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। ৫. এক সময় পৃথিবী বিরান ভূমিতে পরিণত হবে। তাই রাসূল ﷺ ঘোষণা করেন– ইসলামে বৈরাগ্যবাদ গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তা'আলাও ইরশাদ করেন– وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ

আয়াত ও হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্বের নিরসন : আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল ﷺ সাহাবীদেরকে তাবাতুল করতে নিষেধ করেছেন, অথচ কুরআনের ভাষ্যে এর অনুমতি পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا সুতরাং উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সমাধান : এ দ্বন্দ্বের সমাধানে হাদীস বিশারদগণ বলেন, হাদীসে ব্যবহৃত تَبَتُّلٌ -এর অর্থ হচ্ছে- বিবাহ না করে সংসার-ধর্ম পরিত্যাগ করে বৈরাগী হওয়া। এটা সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে একটি প্রতিবন্ধকতা। তাই রাসূল ﷺ এটা নিষেধ করেছেন। আর আয়াতে বর্ণিত تَبَتُّلٌ -এর অর্থ হচ্ছে, পার্থিব জগতের মোহ ত্যাগ করে খালেস আল্লাহর স্মরণে মশগুলো থাকা যা ইবাদতের চূড়ান্ত পর্যায়। এর সাথে বৈরাগ্যবাদের কোনো সামঞ্জস্য নেই। অতএব, উভয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব রইল না।

শরিয়তে খাসি হওয়ার হুকুম : সকল ইমাম এ কথার উপর একমত যে, খাসি বা নপুংশক হওয়া ইসলামি শরিয়তে হারাম। তাঁদের ভাষা- إِنَّ الْإِخْتِصَاءَ لِخَوْفِ الْفَقْرِ وَقِلَّةِ الرِّزْقِ حَرَامٌ কেননা, এতে বেশ কয়েকটি অকল্যাণ বা অপকারিতা বিদ্যমান। যেমন-

১. رُهْبَانِيَّةٌ তথা সংসার বৈরাগ্য সাব্যস্ত হয়, যা ইসলাম সমর্থিত নয়।
২. আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করা হয়।
৩. আল্লাহ সকল জীবের রিজিকদাতা, এতে অনাস্থা প্রকাশ করা হয়।
৪. ইসলাম নারীকে যে সম্মান দিয়েছে, তা ভূলুণ্ঠিত হয়। এজন্যই রাসূল ﷺ সাহাবীদেরকে খাসি হওয়ার অনুমতি প্রদান করেননি। এমনকি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন-

يَا اَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا اَنْتَ لَاقٍ فَاخْتَصِ عَلٰى ذٰلِكَ اَوْ ذَرْ.

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হালাল জানোয়ারের গোশ্‌ত সুস্বাদু করার জন্যে ছোট অবস্থায় তাকে খাসি করা বৈধ, কিন্তু বড় হয়ে গেলে তা বৈধ হবে না। কেননা, এতে اِيْذَاءُ الْحَيَوَانِ بِلَا طَائِلَةٍ তথা অপ্রয়োজনে প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ لَوْ اَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا **-এর মর্মার্থ :** হযরত সা'দ (রা.) বলেন, যদি রাসূল ﷺ হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রা.)-কে বিবাহ না করার অনুমতি দিতেন, তাহলে আমরা খাসি (খোঁজা) হয়ে যেতাম।

এখানে প্রশ্ন জাগে, খোঁজা হওয়া কি ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ? এর উত্তরে বলা যায়, আলোচ্য বাক্যটি মুবালাগা বা আতিশয্য প্রকাশের নিমিত্তে বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাক্যটি হতো- وَلَوْ اَذِنَ لَهُ لَتَبَتَّلْنَا আরবি ভাষায় যার পূর্ণ অভিব্যক্তি এরূপ- وَلَوْ اَذِنَ لَهُ لَبَالَغْنَا فِى التَّبَتُّلِ حَتّٰى فِى الْاِخْتِصَاءِ
অর্থাৎ 'তাঁকে তাবাতুলের অনুমতি প্রদান করলে আমরাও তাবাতুল অবলম্বন করতাম। এমনকি তাবাতুলের চরম সীমানা খোঁজা হতেও দ্বিধাবোধ করতাম না।' যেহেতু তাবাতুল-এর অনুমতি পাওয়া যায়নি সেহেতু খোঁজা হওয়ার অবকাশই নেই।

وَعَنْ ٢٩٤٨ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৯৪৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, চারটি গুণের কারণে [সাধারণত] নারীকে বিবাহ করে- নারীর ধন-সম্পদ, অথবা বংশ-মর্যাদা, অথবা তার সৌন্দর্য, অথবা তার ধর্মপরায়ণতার কারণে। [রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,] যদি লাভবান হতে চাও তাহলে ধর্মপরায়ণাকে বিবাহ কর; আরে বোকা, তোমার হস্তদ্বয় ধুলায় ধূসরিত হোক! -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تَرِبَتْ يَدَاكَ -এর ব্যাখ্যা : তোমার হস্তদয় ধুলায় ধূসরিত হোক। আরবিতে এ ধরনের বাক্য অভিসম্পাতের জন্য নয়; বরং মৃদু ভর্ৎসনা মিশ্রিত উদ্বুদ্ধসূচক বাক্য। বক্তব্য বিষয়কে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণে শ্রোতাকে উদ্বুদ্ধ করার মানসে সাধারণত এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করা হয়, এর আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা হয় না। যেহেতু হাদীসে ধর্মপরায়ণাকে বিবাহ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। সাধারণত মানুষ বিবাহ করতে এর প্রতি লক্ষ্য না করে নারীর সৌন্দর্য, বংশমর্যাদা বা ধনসম্পদের প্রতি লোভবশত বিবাহ করে পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবুও মানুষের চৈতন্যোদয় হয় না। সেহেতু তাকে সজাগ-সতর্ক করার জন্য বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে।

অথবা, বাক্যের কিছু অংশ উহ্য আছে। অর্থাৎ যদি তুমি এ উপদেশ গ্রহণ না কর, তাহলে তোমার হস্তদ্বয় ধুলায় ধূসরিত হোক, তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মূলকথা, উল্লিখিত চারটি গুণের মধ্যে দীনদারির দিকটাকে প্রাধান্য দেওয়াই উচিত। কেননা, অর্থসম্পদের গৌরব ও রূপ-সৌন্দর্য ক্ষণিকের তরে। আর ভালো বংশেও কখনো খারাপ লোকের জন্ম হয়ে থাকে। কিন্তু দীনদারি মানুষকে উত্তরোত্তর ভালোর দিকেই নিয়ে যায়। ফলে পরবর্তীতে সন্তান-বংশধরের মধ্যেও এর প্রতিফলন ঘটে।

وَعَنْ ٢٩٤٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৯৪৯. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– দুনিয়ার সমস্ত কিছু তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী সম্পদ। এ সম্পদের মধ্যে মুসলিম সতীসাধ্বী রমণী সর্বোত্তম সম্পদ। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ -এর ব্যাখ্যা : রাসূল ﷺ -এর বাণী خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ -এর অর্থ হলো– "দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ হচ্ছে সতীসাধ্বী রমণী।" বাণীটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র হলেও এর তাৎপর্য খুবই ব্যাপক। একজন নারীর জীবনের সংশ্রব ব্যতীত পুরুষের জীবনের পরিপূর্ণতা আসে না। সুখ-দুঃখে নারীই তার জীবন সঙ্গিনী। সুতরাং দাম্পত্য জীবনে এ নারী যদি পূত-পবিত্র সচ্চরিত্রা হয়, তাহলে জীবন স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়। সমস্যা সংকুল জীবনেও অনাবিল শান্তির ফল্গুধারা বয়ে যায়।

পক্ষান্তরে এ নারী যদি দুশ্চরিত্রা, অসতী ও উদ্ভট স্বভাবের অধিকারিণী হয়, তাহলে পরিবারে অশান্তির দাবানল দাউদাউ করে জ্বলে উঠে। শুরু হয় দুর্বিসহ যন্ত্রণা। যার দৃষ্টান্ত বর্তমান সমাজেই প্রচুর বিদ্যমান। এজন্যেই হযরত আলী (রা.) আল্লাহর বাণী– رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً এ আয়াতে حَسَنَةً শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ বা সতীসাধ্বী রমণী। সুতরাং পারিবারিক জীবনে সতীসাধ্বী নারী আবশ্যকীয় বলা যায়।

وَعَنْ ٢٩٥٠ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْاِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ اَحْنَاهُ عَلٰى وَلَدٍ فِىْ صِغَرِهٖ وَاَرْعَاهُ عَلٰى زَوْجٍ فِىْ ذَاتِ يَدِهٖ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৯৫০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, উটের পিঠে আরোহণকারিণী নারীদের [আরবীয় রমণীদের] মধ্যে সর্বোত্তম নারী কুরাইশ বংশীয় নারীগণ, তারা শিশুকালে স্বীয় সন্তানের প্রতি অধিক স্নেহপরায়ণা এবং স্বামীর প্রতি তার সম্পদে অধিক যত্নবান অর্থাৎ পতি-প্রাণা। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٢٩٥١ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَرَكْتُ بَعْدِىْ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৯৫১. অনুবাদ : হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি আমার পরে আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য নারী অপেক্ষা অধিক ফিতনার বস্তু আর কিছুই রেখে যাইনি। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَوْضِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : স্বভাবগতভাবে পুরুষদের অন্তর নারীদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। ফলে তখন ন্যায়-অন্যায় বা বৈধ-অবৈধের সীমানা রক্ষা করা সম্ভব হয় না এবং হারামের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায়। এ ছাড়া পুরুষেরা তাদের মনস্তুষ্টির জন্য পার্থিব সম্পদের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং দুনিয়ার মহব্বতে জড়িয়ে যায়। আর অপর এক হাদীসে আছে حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ এ সমস্ত কারণে মহিলাদেরকে ফিতনার উৎস বলা হয়েছে। অনেক সময় এমন অবস্থারও সৃষ্টি হয় যে, নারীকে নিয়েই পরস্পরে খুনাখুনিতে লিপ্ত হয়। এমনকি পৃথিবীর সর্বপ্রথম খুনও নারী সংক্রান্ত বিষয়ের কারণে হয়েছে।

وَعَنْ ٢٩٥٢ أَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَاِنَّ اَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৯৫২. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুনিয়া মধুময় ও সবুজের সমারোহে ভরপুর। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে উত্তরসূরিরূপে তাতে প্রেরণ করে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমরা কিরূপ আমল কর। অতএব, দুনিয়ার মোহ পরিত্যাগ কর এবং নারীগণের ছলনা হতে বেঁচে থাক। কেননা, বনী ইসরাঈলগণের মধ্যে সর্বপ্রথম নারীগণ কর্তৃক ফিতনা আত্মপ্রকাশ করেছিল। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ الخ -এর ব্যাখ্যা : রাসূল ﷺ -এর বাণী اِنَّ اللّٰهَ يَسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করে প্রেরণ করেছেন তোমরা কি কর তা পরীক্ষা করার জন্য। এর মর্মার্থ সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ তিনটি মতামত পেশ করেছেন। যেমন-

১. আল্লাহ তোমাদেরকে এ পৃথিবীতে খলিফা নিযুক্ত করেছেন প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। সুতরাং তোমরা এখানে কিরূপ আমল কর, সেটাই আল্লাহ প্রত্যক্ষ করবেন।

২. অথবা, আল্লাহ তোমাদেরকে পূর্ববর্তী উম্মতের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমাদেরকে তাই দেওয়া হবে যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং তোমরা তাদের অবস্থা থেকে কিরূপ শিক্ষা গ্রহণ কর আল্লাহ তাই দেখতে চান।

৩. অথবা, আল্লামা তীবী (র.) বলেন, অন্যকে নিজের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করাকেই খলিফা বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ লোভনীয় করে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং দুনিয়াকে তোমরা তাঁর বিধান অনুযায়ী ব্যবহার কর, না নিজের প্রবৃত্তি অনুযায়ী ব্যবহার কর, আল্লাহ তাই দেখবেন।

قَوْلُهُ اِتَّقُوا النِّسَاءَ **দ্বারা উদ্দেশ্য** : রাসূল ﷺ -এর উপদেশ বাণী اِتَّقُوا النِّسَاءَ -এর অর্থ- তোমরা নারীদের থেকে বেঁচে থাক। অর্থাৎ তাদের ছলনা ফিতনা থেকে আত্মরক্ষা কর। কেননা, নারীদের শারীরিক অবয়ব অতিশয় আকর্ষণীয়, লোভনীয় ও

মোহনীয় করে সৃষ্টি করা হয়েছে। নব যৌবনা রূপসী ষোড়শীর চাল-চলন, আলাপন, বেশভূষা, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি অতি সহজেই কোনো পুরুষকে আকৃষ্ট করে। জৈবিক চাহিদা পূরণে সে উন্মাদ হয়ে উঠে, যার ফলে উভয়ের মাঝে দৈহিক অবৈধ সম্পর্কের সূচনা হয়ে যেতে পারে। এভাবে দেখা যায়, সমাজের সকল প্রকার অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার অধিকাংশই নারীজনিত। সৃষ্টির সূচনা থেকে অদ্যাবধি এর অগণিত প্রমাণ বিদ্যমান। সুতরাং এ ধরনের অনিষ্টতা ও অনভিপ্রেত ঘটনার হাত থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষার জন্যই রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– اِتَّقُوا النِّسَاءَ

فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ -এর ঘটনা : قَوْلُهُ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ রাসূল ﷺ বলেছেন– فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ অর্থাৎ বনী ইসরাঈলদের মধ্যে সর্বপ্রথম নারীদের থেকেই ফিতনার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, সে ফিতনাটি কি ছিল? এর জবাবে ওলামায়ে কেরাম নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন–

১. ইবনুল মালিক ও আল্লামা তীবী (র.) বলেন, বনী ইসরাঈলদের জনৈক লোক তার চাচা কিংবা চাচাতো ভাইয়ের নিকট এ মর্মে প্রস্তাব দিয়েছিল যে, সে যেন তাঁর সুন্দরী মেয়েকে তার নিকট বিয়ে দেয়। কিন্তু প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে প্রস্তাবকারী তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ফলে উভয় দলের মাঝে ভয়াবহ সংঘর্ষের সূচনা হয়। এটাই ছিল বনী ইসরাঈলদের নারী সংক্রান্ত সর্বপ্রথম ফিতনা। এদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূল ﷺ বলেছেন– فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ

২. অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সৈন্যবাহিনীর সাথে শত্রুবাহিনীর সংঘর্ষ বাঁধলে তারা বালয়াম ইবনে বাউরের পরামর্শক্রমে এক সুন্দরী ষোড়শী যুবতীকে মুসলিম সেনাপ্রধানের পেছনে লেলিয়ে দেয়। সেনাপ্রধান একসময় তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং জেনায় লিপ্ত হয়। এতে প্রায় ৭০ হাজার সৈন্য প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয় এবং কিছু সৈন্য মৃত্যুবরণ করে। আর মুসলিম বাহিনী পর্যুদস্ত হয়। অবশেষে ঐ সেনাপ্রধানকে হত্যা করা হয়। সুতরাং এটাই ছিল বনী ইসরাঈলদের নারী সংক্রান্ত সর্বপ্রথম ফিতনা। এদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূল ﷺ বলেছেন–

فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ.

وَعَنْ ٢٩٥٣ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشُّؤْمُ فِى الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ اَلشُّؤْمُ فِىْ ثَلٰثَةٍ فِى الْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ وَالدَّابَّةِ.

২৯৫৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অমঙ্গল স্ত্রীলোক, বাড়ি এবং ঘোড়া হতে আসে। –[বুখারী ও মুসলিম] অন্য এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত, অমঙ্গল তিন বস্তু হতে আসে– নারী, বাড়ি ও চতুষ্পদ জন্তু হতে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দুটি হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান : আলোচ্য হাদীস হতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কোনো কোনো বস্তু হতে অমঙ্গল আসে, অথচ বুখারী শরীফের হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন– وَلَا طِيَرَةَ فِى الْإِسْلَامِ ['কোনো বস্তু হতে অমঙ্গল আসে' এ ধারণার অবকাশ ইসলামে নেই।] আলোচ্য হাদীস তো এই মূলনীতির বিপরীত ধারণা সৃষ্টি করছে।

দ্বন্দ্বের সমাধান : আলোচ্য হাদীসে অশুভ বা অমঙ্গল অর্থে অপছন্দনীয় হওয়া, অপকার সাধন ইত্যাদি অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। নারীর মধ্যে কপটতা, প্রেমে কৃত্রিমতা, ঘোড়ার বশে না আসা, বাড়ির আরামদায়ক না হওয়াকেই অমঙ্গল অর্থে বলা হয়েছে। অমঙ্গল, অশুভ কিছুই নেই তোমরা এ ধারণা পোষণ কর, তবে শোন অমঙ্গল বলতে এ বস্তুত্রয় উপকারে না আসাই অমঙ্গল।

অথবা, আলোচ্য বাক্যটি একটি 'যদি' যুক্ত সম্ভাব্য বাক্য, অর্থাৎ ইসলামে শুভাশুভ বলতে কিছুই নেই, যদি থাকত তাহলে এ তিনের মধ্যেই থাকার সম্ভাবনা ছিল।

وَعَنْ ٢٩٥٤ جَابِرٍ (رض) قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا كُنَّا قَرِيْبًا مِنَ الْمَدِيْنَةِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَبِكْرٌ اَمْ ثَيِّبٌ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبٌ قَالَ فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ اَمْهِلُوْا حَتّٰى نَدْخُلَ لَيْلاً اَىْ عِشَاءً لِكَىْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৯৫৪. অনুবাদ : হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে এক যুদ্ধে শরিক ছিলাম, যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তনকালে যখন আমরা মদিনার নিকটবর্তী হলাম, তখন আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একজন নব-বিবাহিত পুরুষ, [কাজেই সত্বর মদিনায় প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছি]। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিবাহ করেছ? উত্তরে বললাম, জী হ্যাঁ। পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন– কী বিবাহ করেছ? কুমারী না বিধবা? আমি বললাম, বিধবা [বিবাহ করেছি]। তিনি বললেন, [তুমি একজন নব্যযুবক বিধবা বিবাহ করলে কেন?] কুমারী বিবাহ করলে না কেন? তাহলে তুমিও তার সাথে পরিপূর্ণভাবে প্রমোদ করতে এবং সেও তোমার সাথে মন খুলে প্রমোদ করত। হযরত জাবির (রা.) বলেন, অতঃপর আমরা যখন মদিনায় উপস্থিত হলাম, তখন আমরা নিজ নিজ গৃহে প্রবেশে উদ্যত হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, থাম! এখন তোমরা কেউ গৃহে প্রবেশ কর না, রাত পর্যন্ত অপেক্ষা কর, আমরা সকলে রাতে নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করব। যাতে [এই অবকাশে] স্ত্রী তার অবিন্যস্ত চুল আঁচড়ে [পরিপাটি হয়ে] নিতে পারে এবং স্বামী বিচ্ছিন্না নারী ক্ষুর ব্যবহার করতে [পরিচ্ছন্ন হতে] পারে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বিধবা বিবাহ করার কারণ : উহুদের যুদ্ধে হযরত জাবির (রা.)-এর পিতা আবদুল্লাহ শহীদ হন এবং এক পুত্র ও নয় জন কন্যা সন্তান রেখে যান। অবশ্য এর মধ্যে ৩ কন্যা ছিলেন বিবাহিতা, ছয় জন অবিবাহিতা কুমারী ভগ্নিদের পরিচর্যা ও শিক্ষাদীক্ষার নিমিত্তে অনভিজ্ঞা কুমারীর পরিবর্তে সংসারে অভিজ্ঞতা অর্জনকারিণী বয়স্কা বিধবা নারীই দায়িত্বশীলা হতে পারবে– এ ধারণায় তিনি বিধবা বিবাহ করেছেন।

قَوْلُهُ تَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ الخ -এর ব্যাখ্যা : রাসূল ﷺ দীর্ঘ দিনের প্রবাসী স্বামীকে বিনা সংবাদে আকস্মিকভাবে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন, যাতে হঠাৎ স্ত্রীকে অপরিচ্ছন্ন ও অবিন্যস্ত অবস্থায় দেখে তার মন খারাপ না হয়। আর স্ত্রী যাতে এভাবে স্বামীর আকস্মিক আগমনে অপ্রস্তুত হয়ে না পড়ে, তাই প্রবাস হতে এসে ঘরে পৌঁছতে কিছু দেরি করা মোস্তাহাব যাতে নারী পাক-পরিষ্কার হয়ে সাজসজ্জা গ্রহণ করে নিতে পারে। 'ক্ষুর ব্যবহার করা' অর্থ– পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া, উপায় বা পদ্ধতি নির্ধারিত নয়, বরং এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য হলো ব্যবহার করা। সুতরাং 'ক্ষুর' শব্দটি নিতান্তই উদাহরণস্বরূপ।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٩٥٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثَلٰثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُمْ اَلْمُكَاتَبُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْاَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَ النَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৯৫৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সাহায্য করেন। প্রথম ব্যক্তি মুকাতাব গোলাম, যে নিজ মুক্তিপণ আদায়ের ইচ্ছা করে। দ্বিতীয় চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বিবাহে উদ্যোগী ব্যক্তি। তৃতীয় ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারী। –[তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ]

وَعَنْهُ ٢٩٥٦ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ إِنْ لَا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

২৯৫৬. অনুবাদ : উক্ত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– দীনদারি ও চারিত্রিক দিক হতে পছন্দনীয় ব্যক্তি যখন তোমাদের নিকট বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ করে, তখন তোমরা [স্বীয় কন্যা-ভগ্নিকে] তার সাথে বিবাহ দাও। যদি তোমরা এ রকম না কর, তাহলে [তোমাদের এ অবস্থার ফলে] সমাজে বিরাট ফিতনা-বিপর্যয় দেখা দেবে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَوْضِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে সঠিক পাত্র-পাত্রী নির্বাচন অপরিহার্য। আলোচ্য হাদীসে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দীনদারি ও সচ্চরিত্রতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এটাই ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমত। অতএব, হাদীসটি তাঁর মতেরই দলিল; কিন্তু জমহূর ইমামদের মতে বিবাহকার্য সম্পাদনে চারটি বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার– ১. ধনসম্পদ, ২. বংশ-মর্যাদা, ৩. সৌন্দর্য এবং ৪. ধর্মপরায়ণতা। অন্যথায় উভয়ের মধ্যে বনিবনাও তথা মিল না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অত্র হাদীসের শেষাংশে একটি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তা হলো, দীনদার বরের পক্ষ হতে প্রস্তাব আসার সাথে সাথে বিবাহকার্য সম্পন্ন করা। কেননা, বরের ধন-সম্পদ নেই, শুধু এ কারণে যদি বিবাহকার্য না করা হয়, তবে সমাজে অবিবাহিত যুবক-যুবতীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাবে। যার কারণে সমাজে জেনা-ব্যভিচারের মতো জঘন্য অপরাধ অহরহ সংঘটিত হতে থাকবে। এর ফলে মানবসমাজ পশুসমাজে পরিণত হয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

وَعَنْ ٢٩٥٧ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

২৯৫৭. অনুবাদ : হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা পতিভক্তি ও অধিক সন্তান প্রসবকারিণী রমণীকে বিবাহ কর। কেননা, [কিয়ামত দিবসে] তোমাদের [আমার উম্মতের] সংখ্যাধিক্যের গর্ব অন্যান্য উম্মতের সম্মুখে প্রকাশ করব।

–[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْوَدُوْدُ الْوَلُوْدُ-এর ব্যাখ্যা : কোন মহিলা পতিভক্ত ও অধিক সন্তান প্রসবকারিণী হবে তার মা, খালা, ভগ্নি ইত্যাদির স্বভাব চরিত্রের দ্বারা অনুমান করা যায়। ইসলামের দৃষ্টিতে অধিক সন্তান লাভ প্রশংসার বিষয় এবং তা বিবাহের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বলে প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলাও মানুষকে এভাবে দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন– رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ সুতরাং কুরআন ও হাদীস তথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্য হতে বুঝা যায় যে, বর্তমান যুগে 'সন্তান কমাও', বা 'ছোট পরিবার সুখী পরিবার' ইত্যাদি শ্লোগান মানুষের কৃতকর্মের ও অনৈসলামিক সমাজ ব্যবস্থার কুফল মাত্র। নিঃসন্দেহে বলা যায় এটা কুফরি শ্লোগান ও ইসলাম বিরোধী মতবাদ।

وَعَنْ ٢٩٥٨ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضٰى بِالْيَسِيْرِ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مُرْسَلًا)

২৯৫৮. অনুবাদ : হযরত আবদুর রহমান ইবনে সালিম ইবনে উতাইবা ইবনে উয়াইম ইবনে সায়িদাহ আনসারী তাঁর পিতা, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা কুমারী নারী বিবাহ কর, কারণ কুমারী নারীর মুখের মিষ্টতা বেশি, অধিক সন্তান প্রসবে সে শীর্ষে এবং অতি অল্পে সে তুষ্টা। –[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَوْضِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'মুখের মিষ্টতা'-এর দুটি অর্থ হতে পারে। যথা– তাদের কথা মধুর, মায়া বিজড়িত। অথবা, মুখের স্বাদও মিষ্টি। আর জরায়ু সবল থাকে বলে সহজেই গর্ভধারণ করে এবং অন্য কারো কাছে ভোগের সুযোগ পায়নি বলে স্বামীর কাছে যা-ই পায় তা-ই যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত মনে করে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٩٥٩ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ تَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ ـ

২৯৫৯. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দম্পতির পরস্পরের প্রতি যে গভীর প্রেম, তা তুমি অন্য কোনো দুই ব্যক্তির মাঝে দেখতে পাবে না।

وَعَنْ ٢٩٦٠ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّلْقَى اللّٰهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ ـ

২৯৬০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে পাক-সাফ অবস্থায় সাক্ষাতের বাসনা রাখে, সে যেন স্বাধীনা নারী [দাসীকে নয়] বিবাহ করে।

وَعَنْ ٢٩٦١ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ يَقُوْلُ مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللّٰهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ اِنْ اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِنْ نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَاِنْ اَقْسَمَ عَلَيْهَا اَبَرَّتْهُ وَاِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِىْ نَفْسِهَا وَمَالِهِ رَوَى ابْنُ مَاجَةَ الْاَحَادِيْثَ الثَّلَاثَةَ ـ

২৯৬১. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তাকওয়া বা আল্লাহভীতি ব্যতীত [কারণ তাকওয়া লাভ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত লাভ] সতীসাধ্বী স্ত্রী অপেক্ষা অধিক উত্তম আর কোনো নিয়ামত মুমিন লাভ করেনি, তার স্বামী কোনো কিছুর আদেশ করলে তৎক্ষণাৎ সে তা পালন করে, স্বামী তার দিকে তাকালে সে [হাস্যমুখে] স্বামীকে খুশি করে দেয়, স্বামী যদি তার বিষয়ে কোনো শপথ করে, তবে সে স্বামীকে শপথ মুক্ত করে দেয়। স্বামীর অনুপস্থিতিতে মঙ্গল কামনা করে– তার নিজের ব্যাপারে ও স্বামীর ধনসম্পদে [অর্থাৎ স্বামীর মনঃকষ্ট বা ক্ষতির কোনো কাজই সে করে না]। –[উল্লিখিত হাদীসত্রয় ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীসে সতীসাধ্বী স্ত্রীর চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ–

১. اِنْ اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ অর্থাৎ স্বামী যদি স্ত্রীকে কোনো কাজের আদেশ করে, তবে তৎক্ষণাৎ সে তা পালন করে; কিন্তু এ আনুগত্য শরিয়ত গর্হিত কোনো নির্দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। কেননা, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ অর্থাৎ সৃষ্টকর্তার নাফরমানী করে কোনো সৃষ্টজীবের আনুগত্য বৈধ নয়।

২. اِنْ نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ অর্থাৎ স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি তাকায়, তবে সে হাসিমুখে স্বামীকে খুশি করে দেয়। এটা হলো সতীসাধ্বী রমণীদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। স্বামীর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, অভাব-অনটন এক কথায় সর্বাবস্থায় যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, বরং স্বামীর দুঃখ-বেদনা বরণ করে নিয়ে সর্বদাই তাকে আনন্দ দিতে চেষ্টা করে, তার সাথে হাসিমুখে প্রাণভরে

মধুময় আলাপ করে, এমন স্ত্রীই হলো দুনিয়াতে স্বামীর জন্য উত্তম নিয়ামত আর এর ফলে তাদের সংসার হয় সুখের নীড়, সম্পর্ক হয় মধুময়।

৩. إِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ অর্থাৎ স্বামী যদি তার বিষয়ে কোনো শপথ করে, তবে সে স্বামীকে শপথ মুক্ত করে দেয়। অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে এমন কাজ করা বা না করার ব্যাপারে শপথ করাল যা স্ত্রীর অপছন্দনীয়। এতদসত্ত্বেও স্ত্রী স্বামীর শপথ দূরীভূত করার জন্য যা করা দরকার তাই করে, নিজের অভিমতকে সে প্রাধান্য দেয় না।

৪. إِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِيْ نَفْسِهَا وَ مَالِهِ অর্থাৎ স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী তার স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখে তার নিজের ব্যাপারে ও স্বামীর ধনসম্পদে। অর্থাৎ স্বামী যদি গৃহে অনুপস্থিত থাকে, অথবা কোথাও সফরে যায়, তবে স্ত্রী নিজ সতীত্বকে অক্ষুণ্ন রাখে। পরপুরুষের সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে না। আর স্বামীর ধনসম্পদের সংরক্ষণ করে। তাতে যেন কোনো ক্ষতি না হয়, সে ব্যাপারে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। এটা সতীসাধ্বী রমণীদের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য। এসব গুণ সম্পন্না নারীই হলো পুরুষের জন্য নিয়ামতস্বরূপ।

وَعَنْ ٢٩٦٢ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّيْنِ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ فِى النِّصْفِ الْبَاقِيْ .

২৯৬২. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষ যখন বিবাহ করে তখন সে তার ঈমানের অর্ধাংশ হাসিল করে ফেলে, বাকি অর্ধাংশ লাভের জন্য সে যেন তাকওয়া অবলম্বন করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইমাম গাযালী (র.) বলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুটি জিনিসের কারণে ধর্ম-বিধ্বংসী কার্যকলাপ সংঘটিত হয়ে থাকে। একটি লজ্জাস্থান এবং অপরটি পেট। মানুষ চরম ক্ষুধার মুহূর্তে যে কোনো অবৈধ কাজ করতে দ্বিধাবোধ করে না। অনুরূপভাবে যৌন উত্তেজনাও মানুষকে বিপথগামী করে। বিবাহের মাধ্যমে এটা প্রশমিত হয়, যা ঈমানের পরিপূর্ণতার অর্ধাংশেরই নামান্তর। কেননা, বিবাহ শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে রক্ষা করে, কামোত্তেজনাকে নির্বাপণ করে, চক্ষুকে অবনত রাখে।

وَعَنْ ٢٩٦٣ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً . (رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

২৯৬৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, স্বল্প খরচের বিবাহ সর্বাপেক্ষা বরকতময়। বায়হাকী হাদীস দুটি শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সর্বক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করা শরিয়ত সম্মত কর্ম, কোনো অবস্থাতেই অতিরিক্ত করা উচিত নয়। কেননা, পবিত্র কুরআনে এসেছে যে إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ অর্থাৎ নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। তাই বিবাহকর্মে কম খরচ করাকে রাসূল ﷺ সর্বাপেক্ষা বরকতময় বলেছেন অথচ বর্তমানে মানুষ বিবাহের ক্ষেত্রেই অধিক ব্যয় ও অপচয় করে থাকে, যা একেবারেই নিন্দনীয়।

بَابُ النَّظْرِ إِلَى الْمَخْطُوْبَةِ وَبَيَانِ الْعَوْرَاتِ
পরিচ্ছেদ : বিবাহের প্রস্তাবিত পাত্রীকে দেখা ও সতর বর্ণনা প্রসঙ্গে

বিবাহের জন্য যে নারীকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, বিবাহের পূর্বে তাকে দেখে নেওয়া উত্তম। এর ফলে পরস্পরের পছন্দ অপছন্দের দিকটি প্রাধান্য পায় এবং বিবাহোত্তর সৃষ্ট কোনো কোনো সমস্যা হতে মুক্তি পাওয়া যায়। তবে দেখার পদ্ধতি ও অবস্থা সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা সংশ্লিষ্ট হাদীসের অধীনে যথাস্থানে আলোচিত হবে।

পাত্রী দেখার পর পছন্দ না হলে খুব হিকমতের সাথে সরে পড়বে, যাতে পাত্রীর কোনো রকম ক্ষতি না হয়। বিবাহের পূর্বে পাত্র পরপুরুষ, তাই পাত্রীর হাতের কবজি, মুখমণ্ডল, পায়ের পাতা ও হাতের কনুই ইত্যাদির বেশি কিছু দেখা জায়েজ নেই। অবশ্য পাত্রের অভিভাবকদের জন্যও এটুকু দেখার অনুমতি আছে। আর পাত্রী পক্ষেরও উচিত পাত্রের মঙ্গলের জন্য নেক নিয়তের সাথে পাত্রীর কোনো দোষ-ত্রুটি থাকলে তা প্রকাশ করা, অন্যথা একদিকে যেমন গুনাহ হবে, অপরদিকে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

আলোচ্য পরিচ্ছেদে নারী-পুরুষের সতর সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীসও আনয়ন করা হয়েছে। আর এ সম্পর্কীয় হাদীসও যথাস্থানে আলোচিত হবে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٩٦٤ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّ فِىْ اَعْيُنِ الْاَنْصَارِ شَيْئًا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৯৬৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এসে বলল যে, আমি জনৈকা আনসারী রমণীকে বিবাহ করার ইচ্ছা করেছি, [এতদসম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তদুত্তরে] তিনি বললেন, [বিবাহের পূর্বে] তাকে দেখে নাও। কেননা, আনসারী রমণীগণের চক্ষুতে কিছু দোষ থাকে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বিবাহের পূর্বে প্রস্তাবিতা নারীকে দেখার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : বিবাহের পূর্বে পাত্রী দেখা যাবে কিনা এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

জমহুর ইমামদের অভিমত : জমহূর অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী, আহমদ (র.) প্রমুখ ইমামগণের মতে, বিবাহের পূর্বে পাত্র পাত্রীকে দেখতে পারে, এতে পাত্রীর অনুমতি গ্রহণ শর্ত নয়। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, পাত্রীর অনুমতি গ্রহণের শর্তে দেখতে পারে, অন্যথায় নয়। আহলে হাদীসগণের মতে, বিবাহের পূর্বে দেখা আদৌ বৈধ নয়। যাঁরা দেখার বৈধতার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন, তাঁরাও পাত্রীর শুধু মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় দেখার অনুমতি প্রদান করেছেন, অন্য কোনো অঙ্গ নয়। অবশ্য কেউ কেউ হস্ত স্পর্শ করার অনুমতি দিয়েছেন। যদি পাত্রের পক্ষে পাত্রী দেখা সম্ভবপর না হয়, তাহলে পাত্রের নির্ভরযোগ্য স্ত্রীলোকের মাধ্যমে এটা সম্পাদন করাতে পারে।

আলোচ্য হাদীস এবং আবূ দাউদ ও ত্বাহাবীতে বর্ণিত সমার্থক বহু হাদীস দ্বারা জমহূরের অভিমত সপ্রমাণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে যাঁরা দেখার বৈধতা স্বীকার করেন না, তাঁরা যে সকল হাদীস দলিল-প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন সে সকলের প্রত্যেকটি اَجْنَبِيَّةٌ বা পরনারী দর্শন সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞাসূচক হাদীস। اَجْنَبِيَّةٌ বা পরনারী ও مَخْطُوْبَةٌ [বিবাহের প্রস্তাবিত পাত্রী] উভয়ের ব্যাপার একই পর্যায়ের নয় বিধায় এঁদের মত গ্রহণযোগ্য নয়।

وَعَنْ ٢٩٦٥ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَاَنَّهُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৯৬৫. অনুবাদ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো নারী যেন অপর নারীর সাথে সাক্ষাৎ ও মেলামেশার পরে স্বীয় স্বামীর সম্মুখে উক্ত নারীর এরূপ বর্ণনা প্রদান না করে, যাতে সে যেন তাকে দেখছে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কোনো মহিলা অপর মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করা বা মেলামেশা করা অপরাধ নয়, কিন্তু সেই মহিলার রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনা স্বামীর কাছে প্রকাশ করা উচিত নয়। এতে স্বামীর মনে নিজের স্ত্রীর প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাতে পারে এবং উক্ত মহিলার প্রতি তার আকর্ষণ বেড়ে যেতে পারে।

وَعَنْ ٢٩٦٦ اَبِيْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ اِلٰى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ اِلٰى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ اِلَى الْمَرْأَةِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৯৬৬. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো পুরুষ যেন অপর পুরুষের এবং কোনো নারী যেন অপর নারীর সতর [গোপন অঙ্গ] না দেখে, আর কোনো পুরুষ যেন অপর পুরুষের সাথে আবরণ ব্যতীত এক কাপড়ের নিচে শয়ন না করে এবং কোনো নারীও যেন অপর কোনো নারীর সাথে আবরণহীনভাবে একই লেপের নিচে শয়ন না করে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীস দ্বারা এক পুরুষের পক্ষে অপর পুরুষের লজ্জাস্থান ও গুপ্তাঙ্গ [নাভি হতে হাঁটু পর্যন্ত] দেখা ও স্পর্শ করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হলো। অনুরূপভাবে এক নারীর পক্ষেও অপর নারীর লজ্জাস্থান ও গোপন-অঙ্গ [স্বাধীনার জন্য হাত, মুখমণ্ডল ও পদদ্বয় ব্যতীত সর্বাঙ্গ] দেখা বা স্পর্শ করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হলো। অবশ্য প্রয়োজনে [যেমন চিকিৎসক বা ধাত্রী] দেখা বা স্পর্শ করার অনুমতি রয়েছে। স্বতন্ত্র কাপড়ের আবরণ ব্যতীত একই চাদর বা লেপে দুই নারী ও পুরুষের শয়নও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে।

وَعَنْ ٢٩٦٧ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا لَا يَبِيْتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ نَاكِحًا اَوْ ذَا مَحْرَمٍ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৯৬৭. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো বিবাহিতা [অথবা বিধবা] নারীর নিকটে স্বামী অথবা মাহরাম ব্যক্তি [যার সাথে আজীবন বিবাহ নিষিদ্ধ] ব্যতীত যেন অন্য কেউ রাত্রি যাপন না করে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যার সাথে আজীবন বিবাহ নিষিদ্ধ তাকে 'মাহরাম' বলে। হাদীসের দ্বারা রাত যাপন বুঝানো হলেও এখানে রাতে বা দিনে নির্জনে অবস্থান করা বুঝিয়েছে। কুমারী নারী সাধারণত লজ্জাশীলা এবং পরপুরুষের সংস্পর্শ হতে ভীত-সন্ত্রস্ততা। পক্ষান্তরে বিধবা বা বিবাহিতা অনুরূপ নয়, সুতরাং তারা পরপুরুষের কাছে আসতে সংকোচবোধ করে না, তাই বিবাহিতার কথা বলা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, হাদীসের নিষেধাজ্ঞা সর্বপ্রকারের নারীর বেলায় সমভাবে প্রযোজ্য।

وَعَنْ ٢٩٦٨ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৯৬৮. অনুবাদ : হযরত উকবাহ ইবনে আমির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা [অপর] নারীদের [নিঃসঙ্গভাবে] নিকট গমন [বা তার গৃহে প্রবেশ] হতে নিজেদেরকে বিরত রাখ। এটা শুনে উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! দেবরের ব্যাপারে আপনার মতামত কি? [তার প্রতিও এ নির্দেশ সমভাবে প্রযোজ্য?] উত্তরে তিনি বললেন, দেবর তো মরণসম। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : দেবর মৃত্যুর ন্যায় ভয়াবহ বা ধ্বংসকারী। অর্থাৎ মৃত্যুকে যেরূপ ভয় কর এবং তা হতে বাঁচবার চেষ্টা কর, দেবর হতেও অনুরূপভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা কর। কেননা, সেও অন্যায়-আচরণে যমের মতো। ভগ্নিপতিও এর আওতায় পড়ে। বর্তমান সমাজে এরও তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। এটা অনস্বীকার্য যে, রাসূলের হাদীস মানব স্বভাব ও সমাজের অনুকূলে বর্ণিত হয়েছে।

وَعَنْ ٢٩٦٩ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ اِسْتَاْذَنَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى الْحِجَامَةِ فَاَمَرَ اَبَا طَيْبَةَ اَنْ يَحْجُمَهَا قَالَ حَسِبْتُ اَنَّهُ كَانَ اَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ اَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৯৬৯. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) শরীরে শিঙ্গা লাগানোর অনুমতি প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ তায়বাকে শিঙ্গা লাগাবার নির্দেশ দেন। হযরত জাবির (রা.) বলেন, আমার যতদূর মনে হয় আবূ তায়বা হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর দুধ-ভাই ছিল, অথবা ঐ সময়ে সে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ছিল। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যদি মহিলা চিকিৎসক বিদ্যমান থাকে তখন পুরুষ ডাক্তার দ্বারা নারীদের চিকিৎসা গ্রহণ করা বৈধ নয়। অন্যথা ওজরের কারণে জায়েজ আছে এবং এ অবস্থায় পুরুষ [চিকিৎসক] চিকিৎসাধীন মহিলার গায়ে স্পর্শ করা বা তার শরীরের কোনো আক্রান্ত অঙ্গ কাপড় সরিয়ে দেখা জায়েজ আছে। আরবের আবহাওয়া অধিক উত্তপ্ত হওয়ার দরুন নারী-পুরুষ সবাইকে রক্তচাপ কমাবার জন্য মাঝে মাঝে শরীরে শিঙ্গা লাগাতে হয়।

وَعَنْ ٢٩٧٠ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَظْرِ الْفُجَاءَةِ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اَصْرِفَ بَصَرِىْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৯৭০. অনুবাদ : হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে [অপর নারীর উপর] আকস্মিক দৃষ্টি পতিত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি তদুত্তরে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশ প্রদান করলেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অপরিচিতা অথবা পরিচিতা যাই হোক, শরিয়ত নিষিদ্ধ কোনো মহিলার প্রতি তাকানো নাজায়েজ, কিন্তু অকস্মাৎ যদি দৃষ্টি পড়ে যায়, তবে শুধু ঐ এক নজরই দেখা বৈধ। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা অথবা বারবার তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা গুনাহের কাজ। এটা অপরাধ সৃষ্টির মনোবাঞ্ছাকে জাগ্রত করে দেয়। অত্র হাদীসে তাই সাহাবীদের উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো মহিলার প্রতি আকস্মিক দৃষ্টি পতিত হলে তৎক্ষণাৎ তা ফিরিয়ে নিতে হবে।

وَعَنْ ٢٩٧١ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِىْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِىْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ اِذَا اَحَدُكُمْ اَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِىْ قَلْبِهٖ فَلْيَعْمِدْ اِلٰى اِمْرَأَتِهٖ فَلْيُوَاقِعْهَا فَاِنَّ ذٰلِكَ يَرُدُّ مَا فِىْ نَفْسِهٖ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৯৭১. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [ভিন্ন পুরুষের জন্য] পর-নারীর আগমন-প্রত্যাগমন শয়তানের আগমন সদৃশ। যখন তোমাদের কারো নিকট কোনো নারী ভালো লাগে এবং তার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় তোমাদের কারো মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, তবে সে যেন স্বীয় স্ত্রীর নিকট গমন করে সহবাস করে নেয়। এটা তার অন্তরে উদ্ভূত ঐ অবস্থা বিদূরিত করে দেবে। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِىْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ-এর ব্যাখ্যা : নারী সম্প্রদায়কে শয়তানের সাদৃশ্য বর্ণনা করার অর্থ এটা নয় যে তাদেরকে ভর্ৎসনা করে নিন্দা করা হয়েছে; বরং এর অর্থ হলো− নারীর দিকে দৃষ্টি দিলে শয়তান পুরুষদেরকে প্রলুব্ধ করে তোলে, নানা ধরনের কুমন্ত্রণা মনের মধ্যে সৃষ্টি করে। কিন্তু যদি নারী তার সম্মুখে না আসত, তাহলে তার মনে এসব কুমন্ত্রণা জেগে উঠত না। তাই বলা হয়েছে পরপুরুষের জন্য পরনারীর আগমন-প্রত্যাগমন শয়তানের আগমন সদৃশ।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٩٧٢ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَاِنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى مَا يَدْعُوْهُ اِلٰى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৯৭২. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা কোনো নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দাও, তখন যে অঙ্গ দর্শন বিবাহের পক্ষে যথেষ্ট অর্থাৎ [তাকে বিবাহ করার আগ্রহ সৃষ্টি করবে] তা দেখে নাও। −[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে দর্শন জায়েজ দ্বারা মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয় ও পায়ের তালুকে বুঝানো হয়েছে।

وَعَنْ ٢٩٧٣ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رضـ) قَالَ خَطَبْتُ اِمْرَأَةً فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ نَظَرْتَ اِلَيْهَا قُلْتُ لَا قَالَ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ اَحْرٰى اَنْ يُّؤْدَمَ بَيْنَكُمَا - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ)

২৯৭৩. অনুবাদ : হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) বলেন যে, আমি জনৈকা নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলাম, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কি তাকে দেখেছ? আমি বললাম− না, দেখিনি। তখন তিনি নির্দেশ দিলেন যে, তুমি তাকে দেখে নাও। তোমার এই দর্শন তোমাদের মাঝে [বিবাহিত জীবনে] প্রণয়-ভালোবাসা গভীর হবার সহায়ক হবে। −[আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا -এর ব্যাখ্যা : বিবাহের পূর্বে প্রস্তাবিত মহিলাকে দেখা সুন্নত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.)-কে এ ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। প্রস্তাবিতা মহিলাকে দেখার তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল ﷺ তাঁকে বলেন, এ দর্শন তোমাদের মাঝে বিবাহিত জীবনে প্রণয়-ভালোবাসা গভীর হবার সহায়ক হবে। মূলত দেখা-সাক্ষাতের এবং কথাবার্তার মাধ্যমে একে অপরকে জানাশোনা হয়; উভয়ের অপ্রকাশিত বিষয়াবলি উন্মোচিত হয়ে যায়। সবকিছু জেনেশুনে যখন উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন তাদের সাংসারিক জীবন হয় মধুময়। প্রেম-ভালোবাসার মধুর মিলনে স্বর্গীয় সুখ তাদের মাঝে বিরাজ করতে থাকে। পরবর্তীতে আর কোনো সমস্যা পরিলক্ষিত হয় না।

وَعَنْ ٢٩٧٤ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِمْرَأَةً فَاَعْجَبَتْهُ فَاَتَى سَوْدَةَ وَهِيَ تَصْنَعُ طِيْبًا وَعِنْدَهَا نِسَاءٌ فَاَخْلَيْنَهُ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى اِمْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَقُمْ اِلَى اَهْلِهِ فَاِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِيْ مَعَهَا - (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

২৯৭৪. অনুবাদ : হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দৃষ্টিতে জনৈকা নারী নিপতিত হওয়ায় তাঁর মনে তা প্রভাব পড়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় স্ত্রী সাওদা (রা.)-এর নিকট গমন করলেন। ঐ সময়ে সাওদা খোশবু প্রস্তুত করছিলেন এবং পার্শ্বে কয়েকজন নারী উপবিষ্টা ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখে সাওদাকে একাকী ছেড়ে চলে গেল। তখন তিনি নিজ প্রয়োজন মেটালেন। অতঃপর ঘোষণা করলেন যে, অপর নারী দর্শনে কোনো পুরুষের মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলে সে যেন স্বীয় স্ত্রীর নিকট গমন করে, কারণ ঐ নারীর যা আছে তার স্ত্রীরও তা আছে। -[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন রক্ত-মাংসে গঠিত মহামানব। তাঁর প্রতিটি কর্ম ও ব্যাপারে রয়েছে উম্মতের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। তাঁর কোনো কাজ ত্রুটি হিসাবে দেখা বৈধ নয়। একবার কোনো এক মহিলাকে দেখে রাসূল ﷺ-এর অন্তরে তার প্রভাব পড়ল। তৎক্ষণাৎ তিনি স্বীয় সহধর্মিণী হযরত সাওদা (রা.)-এর নিকটে গিয়ে নিজ প্রয়োজন মেটালেন। রাসূল ﷺ -এর ক্ষেত্রে যখন এ ধরনের একটা ঘটনা ঘটে গেল, তখন দুর্বল ঈমানের অধিকারী তাঁর উম্মতের বেলায় ঐ ধরনের কাজ সংঘটিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অতএব, এ হাদীস থেকে তাদের শিক্ষা নিতে হবে যে, যদি এমন ধরনের কোনো ব্যাপারের সম্মুখীন হয় তবে সাথে সাথে নিজ স্ত্রীর নিকট গিয়ে নিজ প্রয়োজন মেটাতে হবে। হয়তো উম্মতদেরকে এ শিক্ষা দেওয়ার জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ হতে এ ধরনের একটি ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে।

وَعَنْهُ ٢٩٧٥ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

২৯৭৫. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নারী আবৃত বিষয়, যখন সে বের হয়, তখন শয়তান তাকে সুশোভিত করে তোলে। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীসটিতে নারীর অবাধ বহির্গমন ও উলঙ্গপনার বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। নারীর জন্য পর্দা তার স্বাধীনতা বা মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে না; বরং তার মর্যাদা ও সম্ভ্রম বৃদ্ধির জন্য পর্দা একটি অপরিহার্য সহায়ক বটে। বর্তমানকালে পুরুষরা স্বীয় পাশব চরিত্র ও হীন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার স্বার্থে নারী স্বাধীনতা ও সমমর্যাদা ইত্যাদি মিষ্টি শ্লোগানে নারীকে প্রলুব্ধ ও বিভ্রান্ত করছে মাত্র। বুদ্ধিমতী নারী সমাজকে নিজেদের সম্ভ্রম ও মর্যাদা

কিসে রক্ষা পায়, সেই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা উচিত। নারী স্বাধীনতার নামে পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ নারী সমাজকে নগ্ন ও উচ্ছিষ্ট এবং বাজারের পণ্যে পরিণত করেছে। ফলে দাম্পত্য জীবনের সকল মাধুর্য ও পবিত্রতা ধুলায় লুণ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহর কালামের বহু আয়াত ও রাসূল ﷺ -এর আদর্শ ও বহু বাণী এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমাদেরকে পথ নির্দেশ প্রদান করেছে। অথচ মুসলমান হিসাবে আমাদেরকে দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, ঐ পথ অবলম্বনের মধ্যেই সার্বিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিহিত। মোটকথা, পর্দা অর্থ যেমন অবরোধ নয়, তেমনি স্বাধীনতা মানে নগ্নতা, বেহায়াপনা ও অবাধ মেলামেশাও নয়। কাজেই আমাদেরকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

وَعَنْ ٢٩٧٦ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَ الدَّارِمِيُّ)

২৯৭৬. **অনুবাদ :** হযরত বুরাইদাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে সম্বোধন করে বললেন, হে আলী! দৃষ্টির পেছনে [অপর নারীর প্রতি] দৃষ্টিপাত কর না। তোমার জন্য প্রথম দৃষ্টি [অনিচ্ছায় ও আকস্মিকভাবে হওয়ার কারণে] বৈধ, পরবর্তী দৃষ্টি বৈধ নয় [কারণ তা স্বেচ্ছায় ও অসদুদ্দেশ্যে]। –[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, দারিমী]

وَعَنْ ٢٩٧٧ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا زَوَّجَ اَحَدُكُمْ عَبْدَهٗ اَمَتَهٗ فَلَا يَنْظُرَنَّ اِلٰى عَوْرَتِهَا وَفِيْ رِوَايَةٍ فَلَا يَنْظُرَنَّ اِلٰى مَا دُوْنَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৯৭৭. **অনুবাদ :** হযরত আমর ইবনে শুয়াইব হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা ও তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ স্বীয় ক্রীতদাসীকে নিজের [অথবা অন্যের] ক্রীতদাসের [অথবা স্বাধীন পুরুষের] সাথে বিবাহ প্রদান করে, তখন সে যেন উক্ত দাসীর সতরের [গোপন অঙ্গের] দিকে দৃষ্টিপাত না করে। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, সে যেন তার নাভি হতে হাঁটুর উপর পর্যন্ত না দেখে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** বিবাহের পূর্বে মালিক আপন দাসীর পূর্ণ শরীর দেখতে এবং তার সাথে সহবাসও করতে পারে। কিন্তু কারো সাথে তাকে বিবাহ দেওয়ার পর উক্ত দাসী তার জন্য হারাম হয়ে যায়। এখানে প্রশ্ন জাগে স্বীয় দাসীকে স্বীয় দাসের সাথে বিবাহ দিলে তখন সেই দাসী আর মালিকের জন্য বৈধ নয়; এতে বুঝা যায়– অন্যের দাসের সাথে বিবাহ দিলে তখন আর মালিকের জন্য হারাম বা অবৈধ হবে না। এর জবাবে বলা হয় যে, স্বীয় দাসের সাথে বিবাহ দিলে যখন উক্ত দাসী মনিবের জন্য হারাম হয়ে যায় তখন অন্যের দাসের সাথে কিংবা কোনো আজাদ ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিলে যে মালিকের জন্য হারাম হয়ে যাবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

وَعَنْ ٢٩٧٨ جَرْهَدٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

২৯৭৮. **অনুবাদ :** হযরত জারহাদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তুমি কি জান না উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** উরু সতর কিনা? এ সম্পর্কে দুটি বর্ণনা রয়েছে। এখানে জারহাদের বর্ণনায় দেখা যায় যে, উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু হযরত আনাস (রা.) হতে বুখারীতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, উরু সতর নয়। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে গুহ্যদ্বার, পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ কেবলমাত্র সতর। আর জমহূর ওলামায়ে কেরামের মতে পুরুষের জন্য সতর নাভির নিচ হতে হাঁটু পর্যন্ত, আর এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে সাবধানতা।

وَعَنْ ٢٩٧٩ عَلِيٍّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ اِلٰى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৯৭৯. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সম্বোধন করত বললেন, হে আলী! তুমি নিজের উরুদেশ উন্মুক্ত করো না এবং কোনো জীবিত বা মৃতব্যক্তির উরুর প্রতি দৃষ্টিপাত করো না। –[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٢٩٨٠ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ (رضـ) قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مَعْمَرٍ وَفَخِذَاهُ مَكْشُوْفَتَانِ قَالَ يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخِذَيْكَ فَاِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ - (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

২৯৮০. অনুবাদ : হযরত মুহাম্মদ ইবনে জাহাশ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মা'মার নামক সাহাবীর পার্শ্ব দিয়ে গমন করছিলেন ঐ সময়ে মা'মারের উরু খোলা ছিল, [এতদ্দর্শনে] রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আদেশ করলেন, হে মা'মার! তোমার উরুদ্বয় ঢেকে ফেল, কেননা উরুদ্বয় সতরের অন্তর্ভুক্ত। –[শরহুস সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উরু কি সতর বা গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত? উপরের বর্ণিত হাদীসত্রয়ের মাধ্যমে রান বা উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত, তা পরিষ্কার ভাষায় প্রমাণিত হলো। এটাই জমহূর অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী, আহমদ, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ (র.) প্রভৃতি ইমামগণের অভিমত। ইমাম মালিক (র.)-ও এ মতের সমর্থক, অবশ্য তাঁর অপর এক মত এবং এটাই দাউদ যাহিরী (র.) প্রমুখের মতে, উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইমাম বুখারী (র.) দ্ব্যর্থহীনভাবে এ বিষয়ে স্বীয় মত প্রকাশ করলেও এদিকেই তাঁর ঝোঁক এটা বুঝা যায়।

এ মতের সমর্থকগণ বুখারীতে বর্ণিত হাদীস– হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, খায়বার যুদ্ধকালে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ অবস্থায় ঘোড়া হাঁকানোর সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উরুদেশ হতে পরিহিত লুঙ্গি সরে গিয়েছিল এবং আমি তাঁর উরুর শুভ্রতা দেখতে পেয়েছিলাম, এ হাদীস দ্বারা নিজেদের মত স্ব-প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন।

জমহূরের পক্ষ হতে এর উত্তরে বলা হয়– যুদ্ধক্ষেত্রে, ঘোড়া দৌড়ানোর কালে, ঘর্ষণের ফলে অজ্ঞাতসারে সেলাইবিহীন তহবন্দ হঠাৎ সরে যাওয়ার এক দুর্লভ ঘটনাকে জারহাদ, আলী ও ইবনে জাহাশ (র.) প্রমুখ কর্তৃক বর্ণিত নীতি নির্ধারণী ও নির্দেশসূচক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত হাদীসের বিপরীতে দলিল-প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা কখনো সমর্থনযোগ্য বুদ্ধিমত্তার কার্য বলে গণ্য হতে পারে না।

وَعَنْ ٢٩٨١ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ فَاِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ اِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِيْنَ يُفْضِي الرَّجُلُ اِلٰى اَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوْهُمْ وَاَكْرِمُوْهُمْ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

২৯৮১. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, তোমরা [নিষ্প্রয়োজনে] উলঙ্গ হওয়া হতে বিরত থাক। তোমাদের সাথে পেশাব-পায়খানা করা ও স্ত্রীসহবাসের সময় ব্যতীত সর্বদায় এঁরা থাকে, যাঁরা কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। অতএব তোমরা তাঁদের ব্যাপারে লজ্জাবোধ কর এবং তাঁদেরকে সম্মান কর। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٢٩٨٢ اُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَيْمُوْنَةَ اِذْ اَقْبَلَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

২৯৮২. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন, একদা তিনি ও [অন্যতমা রাসূলপত্নী] হযরত মায়মূনা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। ঐ সময় [বিখ্যাত অন্ধ সাহাবী] আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) তাঁর খেদমতে আসলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের উভয়কে

اِحْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ هُوَ اَعْمٰى لَا يُبْصِرُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفَعَمْيَاوَانِ اَنْتُمَا اَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা পর্দার আঁড়ালে যাও। [হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন,] আমি বললাম, সে কি অন্ধ নয়? সে তো আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। [তবে কেন আমরা পর্দার মধ্যে যাব?] তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা দুজন কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছ না? –[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীসের আলোকে কিছু সংখ্যক ইমাম মত প্রকাশ করেছেন যে, পুরুষের পক্ষে যেরূপ বেগানা নারীকে দেখা নিষিদ্ধ, তদ্রূপ নারীর পক্ষেও বেগানা পুরুষকে দেখা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে কতিপয় ইমাম এ মতের বিরোধিতা করে বলেন যে, পুরুষ কর্তৃক বেগানা নারী দর্শন যেরূপ নিষিদ্ধ, নারী কর্তৃক বেগানা পুরুষের দর্শন সেই পর্যায়ের নিষিদ্ধ নয়। তাঁরা স্বীয় মতের সমর্থনে বুখারী শরীফে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুমতি ও সহযোগে হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক ঈদের দিনে হাবশীদের অস্ত্রখেলা প্রত্যক্ষ করার ঘটনা উল্লেখ করেন এবং আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, অত্র হাদীসে পর্দার নির্দেশ শরিয়তের বিধানমূলক নয়, বরং তাকওয়া বা পরহেজগারির দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রদান করা হয়েছে।

وَعَنْ ٢٩٨٣ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْفَظْ عَوْرَتَكَ اِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ اَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَرَاَيْتَ اِذَا كَانَ الرَّجُلُ خَالِيًا قَالَ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ يُسْتَحْيٰى مِنْهُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৯৮৩. অনুবাদ : হযরত বাহয ইবনে হাকীম তাঁর পিতা [হাকীম] হতে তিনি তাঁর পিতা [বাহযের দাদা মুয়াবিয়া ইবনে হীদাহ (রা.)] হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, স্বীয় স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ব্যতীত সকল মানুষ হতে তোমার লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ কর, ঢেকে রাখ। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! যদি কেউ নির্জনে একাকী থাকে [ঐ সময়েও কি তাকে লজ্জাস্থান ঢেকে রাখতে হবে?]। উত্তরে তিনি বললেন, [হ্যাঁ, ঐ সময়েও ঢেকে রাখবে]। কেননা, আল্লাহ হতে লজ্জা পাওয়া অধিক কর্তব্য। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যদি কেউ এই প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ তো সর্বাবস্থায় বান্দার সবকিছু দেখেন ও জানেন, তবুও তিনি লজ্জা বা পর্দা করার কি মানে হতে পারে? এর জবাবে বলা হয় যে, আল্লাহর কালামে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, লেবাস-পোশাক হলো একদিকে লজ্জা নিবারণের জন্য আবরণ এবং অপরদিকে সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপকরণ। সুতরাং উলঙ্গ অবস্থায় বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা প্রকাশ পায়। কাজেই সে অবস্থাকে পরিহার করা উচিত হাদীসের অর্থ বা তাৎপর্য এটাই।

অত্র হাদীসের আলোকে ওলামাদের অভিমত হলো– হাম্মাম বা গোসলখানায় উলঙ্গ হয়ে গোসল করা মাকরূহ, এতেও বেহায়াপনা প্রকাশ পায়।

وَعَنْ ٢٩٨٤ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَاَةٍ اِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

২৯৮৪. অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখনই কোনো পুরুষ পরনারীর সাথে নির্জনে দেখা করে, তখনই শয়তান সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত হয়। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নারী পুরুষ দুজন এরূপে নির্জনে সাক্ষাৎ করলে তখন তাদের মধ্যে পাপ সংঘটিত হওয়ার মধ্যে কোনো বাধা থাকে না। ফলে তারা বিপথগামী হয়ে পড়ে, শয়তানই তাদেরকে সে পাপে উদ্বুদ্ধ করে। হযরত শায়খুল আদব মাওলানা ইজাজ আলী (র.) বলেছেন, হাসান বসরী এবং রাবেয়া বসরী (র.)-এর ন্যায় দুজন বুজর্গ নর-নারীরও নির্জনে একত্রিত হওয়া জায়েজ নেই।

وَعَنْ ٢٩٨٥ جَابِرٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَلِجُوْا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ قُلْنَا وَمِنْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَمِنِّيْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ أَعَانَنِيْ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

২৯৮৫. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, গৃহস্বামীর অনুপস্থিতে স্ত্রীদের গৃহে তোমরা প্রবেশ করো না। কেননা, রক্ত সঞ্চালনের ন্যায় শয়তান তোমাদের মাঝে অবাধে চলাচল করে [এবং প্রতি মুহূর্তে তোমাদের প্রত্যেককে বিপথগামী করার কুমন্ত্রণা প্রদান করে]। এতদশ্রবণে আমরা বললাম– হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ভেতরেও কি? [এভাবে শয়তান অবাধে চলাচল করে?] উত্তরে তিনি বললেন– হ্যাঁ, তবে আল্লাহ তা'আলা শয়তানের মোকাবিলায় আমাকে সাহায্য করেছেন বলে আমি [তার কুমন্ত্রণা হতে] নিরাপদে আছি। অথবা, সে আমার অনুগত হয়ে গেছে। [সে পাপের প্ররোচনা দিতে পারে না, ফলে আমার কোনো পাপ করার আশঙ্কা নেই।] –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٢٩٨٦ أَنَسٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتٰى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا وَعَلٰى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا فَلَمَّا رَأٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَلْقٰى قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوْكِ وَغُلَامُكِ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

২৯৮৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ হযরত ﷺ ফাতিমা (রা.)-কে প্রদত্ত গোলামসহ তাঁর গৃহে গমন করেন। ঐ সময় তাঁর পরিধানে এত ছোট কাপড় ছিল যে, মাথা ঢাকলে পা খুলে যায়, পা ঢাকলে মাথা খুলে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এ অসুবিধা দর্শনে বললেন– তুমি অস্বস্তি বোধ করো না। তোমার সম্মুখে তোমার পিতা ও তোমার গোলাম ব্যতীত আর কেউই উপস্থিত হয়নি। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

গোলাম মাহরামের অন্তর্ভুক্ত কিনা? এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ : ক্রীতদাস তার মহিলা মনিবের জন্য মাহরাম কিনা এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ (رح) : ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, গোলাম বা দাস তার মহিলা মালিকের জন্য মাহরাম। আল্লাহর কালামে 'সূরা নূর'-এর মধ্যে বর্ণিত আছে– وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا ..... أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ-এর দ্বারা বুঝা যায়– স্বামী, পিতা ও ভ্রাতা ইত্যাদির ন্যায় দাস-দাসীর সম্মুখে আবরণীয় অঙ্গ প্রকাশের অনুমতি আছে। আর আলোচ্য হাদীসে তো তা স্পষ্টই বুঝা যায়।

কিন্তু ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) সহ অনেক ইমামের মতে গোলাম তার মনিবের জন্য মাহরাম। তাঁরা বলেন– কুরআন ও হাদীসের পর্যালোচনা করলে দেখা যায়; মাহরাম দু-ধরনের ১. যেমন– পিতা, ভ্রাতা, মামু ও খালু ইত্যাদি। এরা আজীবন মাহরাম। ২. সাময়িকভাবে মাহরাম তথা স্থায়ীভাবে মাহরাম নয়। যেমন– ভগ্নিপতি। এক পর্যায়ে তাকেও গায়রে মাহরাম বলা যায়। কেননা, তার সাথে বিবাহ হওয়াটা স্থায়ী নিষিদ্ধ নয়। কোনো মহিলার গোলাম বা ক্রীতদাসও এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু উক্ত গোলাম সে নারীর হাতে গোলাম থাকা অবস্থায় তার মহিলা মনিবকে বিবাহ করা হারাম বটে; কিন্তু মুক্তি লাভের পর আজাদ হয়ে তাকে বিবাহ করা হারাম নয়। কাজেই কোনো নারীর গোলাম তার ভ্রাতা, পিতা ইত্যাদির মতো মাহরাম নয় বিধায় শরীরের আবরণীয় অঙ্গ তার সম্মুখে উন্মুক্ত রাখা বা করা জায়েজ নেই।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : জবাব হলো اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ এ আয়াতের জবাবে বলা হয় যে, তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব, হাসান বসরী (র.) এবং সাহাবী হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) বলেছেন– 'তোমরা সূরা নূরের আয়াত দ্বারা ধোঁকায় পড়ো না। কেননা, উক্ত আয়াতে অধীনস্থ অর্থে– পুরুষ গোলাম নয়; বরং 'মহিলা ক্রীতদাসী' অর্থ নেওয়া হয়েছে। আর اَوْ نِسَائِهِنَّ দ্বারা মুসলিম মহিলা অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।'

আর আলোচ্য হাদীসে হুযূর ﷺ যে বলেছেন– 'তোমার পিতা ও তোমার গোলাম', এখানে গোলামটি ছিল অপ্রাপ্তবয়স্ক। হাদীসে বর্ণিত غُلَامُكِ ও এদিকে ইঙ্গিত বহন করে।

উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশ ও সমাজের চাকর-নকর, এরা পরপুরুষই। সুতরাং তারা মহিলা মনিবের মুখমণ্ডল ও হাত-পা ব্যতীত অপর কোনো অঙ্গ দেখতে পারবে না।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٩٨٧ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ فَقَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ أَبِيْ أُمَيَّةَ أَخِيْ أُمِّ سَلَمَةَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ إِنْ فَتَحَ اللّٰهُ لَكُمْ غَدًا الطَّائِفَ فَإِنِّيْ أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَدْخُلَنَّ هٰؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৯৮৭. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদা [৮ম হিজরির শাওয়াল মাসে মক্কা বিজয় ও হুনায়ন যুদ্ধের পরে তায়েফ অবরোধকালে] রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন এবং আমার গৃহে [তাঁবুতে] এক মুখান্নিছও উপস্থিত ছিল। ঐ সময়ে সে [আমার সহোদর ভ্রাতা] আবদুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়াকে সম্বোধন করে বলল– হে আবদুল্লাহ! আগামীকাল আল্লাহ তা'আলা যদি তায়েফ বিজিত করে দেন, তাহলে আমি তোমাকে গায়লানের কন্যাকে চিনিয়ে দেব, সে তো চার-এর সাথে অগ্রসর হয় এবং আট-এর সাথে পশ্চাদগামিনী হয়। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, খবরদার! এরা যেন কখনও তোমাদের নিকট প্রবেশ না করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُخَنَّثُ-এর পরিচয় : اَلْمُخَنَّثُ বা নপুংসক [نُوْن অক্ষরে فَتْحَة ও كَسْرَة উভয়ই শুদ্ধ, তবে كَسْرَة প্রয়োগে ব্যবহার অধিক] বলা হয়– যে সমস্ত পুরুষ চলনে কথনে নারী সদৃশ। এটা যদি জন্মগতভাবে হয়, তাহলে অপরাধ নয়; কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে কেউ যদি এরূপ করে থাকে, তাহলে তা মারাত্মক অপরাধে পরিণত হয়। হাদীসে এরূপ কৃত্রিম পুরুষ বা কৃত্রিম নারীর উপর আল্লাহ তা'আলার লানত বর্ষিত হয় বলে উল্লেখ আছে। প্রথম শ্রেণির [জন্মগত] মুখান্নিছের নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কীয় উপলব্ধি না থাকায় (غَيْرُ أُولِي الْإِرْبَةِ) তাদের সম্পর্কে পর্দার বিধানে কড়াকড়ি নেই; কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের কৃত্রিম পন্থা অবলম্বনকারী মুখান্নিছের এতদসম্পর্কে পূর্ণ উপলব্ধি থাকে বলে তাদের সম্পর্কে পর্দার বিধান যথাযথভাবে পালনীয়। রাসূলে কারীম ﷺ প্রথমে তাকে জন্মগত মুখান্নিছ বা নপুংসক মনে করে তার প্রবেশে বাধা প্রদান করেননি; কিন্তু আবদুল্লাহকে কথিত তার উক্তি শ্রবণ করে তাকে দ্বিতীয় শ্রেণির [কৃত্রিম] মুখান্নিছ জানতে পেরে বের করেছেন এবং মহিলাদের নিকট প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ-এর ব্যাখ্যা : গায়লান কন্যা দ্বারা তায়েফের এক মোটা রমণীর কথা বলা হয়েছে। সে ছিল শরীর-স্বাস্থ্যে খুব মোটাসোটা, মেদজনিত কারণে স্থূলতার দরুন শরীরের চামড়ায় ভাঁজ পড়ত। কখনও তা পেটের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত রেখার আকার ধারণ করত। সম্মুখের দিক হতে দৃষ্টি করলে দেখা যেত চারটি রেখা পড়েছে এবং যখন চলে যায় তখন পেছনের দিক হতে তাকালে দেখা যেত পেটের দুই পার্শ্বে দুই পাঁজরে চার চারটি, মোট আটটি ভাঁজ পড়েছে। বস্তুত তৎকালীন আরবদের মধ্যে মোটা স্থূল কায়াবিশিষ্ট নারীই ছিল পুরুষদের জন্য খুবই আকর্ষণীয়া। আর আবদুল্লাহকে গায়লান কন্যার কথা বলে এজন্য উৎসাহিত করল যে, যদি তাকে তায়েফের যুদ্ধে বন্দী করতে পার, তবে তাকে তুমি উপভোগ করতে পারবে।

وَعَنْ ٢٩٨٨ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ (رض) قَالَ حَمَلْتُ حَجَرًا ثَقِيلًا فَبَيْنَا اَنَا اَمْشِيْ سَقَطَ عَنِّيْ ثَوْبِيْ فَلَمْ اَسْتَطِعْ اَخْذَهُ فَرَاٰنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِيْ خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ وَلَا تَمْشُوْا عُرَاةً . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৯৮৮. অনুবাদ : মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি [বাল্যকালে] এক ভারী পাথর বহন করে আনছিলাম। এমতাবস্থায় আমার পরিধেয় বস্ত্র খুলে পড়ে গেল। [ভারী পাথর বহনের ফলে] কাপড় পরতে সক্ষম হচ্ছিলাম না। হঠাৎ এ অবস্থায় আমাকে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– কাপড় পরিধান করে নাও। তোমরা উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করো না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** আলোচ্য হাদীসে উলঙ্গ হওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে কত দূষণীয় তা প্রণিধানযোগ্য। হাদীসে উল্লিখিত ঘটনার সময় হযরত মিসওয়ার (রা.)-এর বয়স ৭/৮ বছরের বেশি ছিল না। তথাপি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও কাপড় পরিধানের কঠোর নির্দেশ প্রদান করেন।

تَعْرِيْفُ الرَّاوِيْ **[রাবী পরিচিতি] :** তাঁরা পিতা-পুত্র উভয়ই সাহাবী। কুরাইশ বংশের যুহরা গোত্রের লোক। তিনি হিজরি দ্বিতীয় সালে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। হিজরি ৮ম সালের জিলহজ মাসে মদিনায় আসেন। নবী করীম ﷺ -এর ওফাতের সময় তাঁর বয়স ছিল ৮ বৎসর। তাঁর স্মরণশক্তি ছিল অতীব প্রখর। এ বয়সেই রাসূলের বহু হাদীস তিনি সঠিকভাবে মুখস্থ এবং বহু ঘটনা অবিকলভাবে স্মরণ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। হযরত ওসমান (রা.)-এর শাহাদত পর্যন্ত মদিনায় অবস্থানরত ছিলেন এবং পরে মক্কায় চলে আসেন। তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)-এর পক্ষ সমর্থন করে ইয়াযীদের বায়'আত অস্বীকার করেন। ইবনে যুবাইরের বিরুদ্ধে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের প্রেরিত সেনাবাহিনী যখন মিনজানীকের দ্বারা হেরেম শরীফে গোলা পাথর নিক্ষেপ করছিল, তখন হযরত মিস্ওয়ার (রা.) হাতীমে কা'বায় নামাজে রত ছিলেন। নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে ৬৪ হিজরিতে ৬২ বৎসর বয়সে ১লা রবিউল আউয়ালে তিনি সেখানেই শাহাদাত বরণ করেন। তিনি ছিলেন ফকীহ সাহাবীদের অন্যতম।

وَعَنْ ٢٩٨٩ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ مَا نَظَرْتُ اَوْ مَا رَاَيْتُ فَرْجَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَطُّ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

২৯৮৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কখনো [লজ্জায়] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর লজ্জাস্থান দেখিনি। –[ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٢٩٩٠ اَبِيْ اُمَامَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ اِلٰى مَحَاسِنِ اِمْرَاَةٍ اَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ اِلَّا اَحْدَثَ اللّٰهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

২৯৯০. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বেগানা নারীর প্রতি প্রথম দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথে যদি কোনো মু'মিন ব্যক্তি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হয়, আল্লাহ তা'আলা তার পরিবর্তে তাকে এমন এক ইবাদত করার সুযোগ দান করেন, যার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করতে থাকে। –[আহমদ]

وَعَنْ ٢٩٩١ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ بَلَغَنِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُوْرَ اِلَيْهِ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

২৯৯১. অনুবাদ : বিখ্যাত তাবেয়ী হাসান বসরী হতে মুরসালরূপে [সাহাবীর নামোল্লেখ ব্যতীত] বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট এই হাদীস পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, স্বেচ্ছায় বেগানা নারীকে দর্শনকারী পুরুষ ও স্বেচ্ছায় প্রদর্শনকারিণী নারী উভয়ের উপর আল্লাহ তা'আলার লানত বর্ষিত হয়। –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

পরনারীর প্রতি তাকানোর হুকুম : পরনারীর প্রতি বারবার তাকানো বৈধ নয়। যে মুসলমান তার এ দৃষ্টিকে সংযমিত করতে পারবে, আল্লাহ তা'আলা এর কারণে তার অন্তরকে ইবাদত করার উপযোগী করে দেবেন এবং এতে সে মধুর স্বাদ আস্বাদন

করতে পারবে। পরনারী বা পুরুষ দর্শন হতে চক্ষুকে অবনমিত রাখা অপরিহার্য। এটা নারী-পুরুষ সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। পুরুষদেরকে লক্ষ্য করে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে- قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ অর্থাৎ হে নবী! আপনি মুসলমান পুরুষদেরকে বলে দিন, যেন তারা স্বীয় দৃষ্টি অবনত রাখে এবং নিজ নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করে; এটা তাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কথা। -[সূরা নূর : আয়াত- ৩০]
অনুরূপভাবে মহিলাদের সম্পর্কেও আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ অর্থাৎ আর মুসলমান নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন স্বীয় দৃষ্টি নিম্নমুখি রাখে, আর নিজ নিজ লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে। -[সূরা নূর : আয়াত- ৩১]
অতএব, আমাদের নারী-পুরুষ সকলের একান্তই আবশ্যক যে, নিজ নিজ দৃষ্টিকে হেফাজত করা।

بَابُ الْوَلِيِّ فِى النِّكَاحِ وَاسْتِيْذَانِ الْمَرْأَةِ
পরিচ্ছেদ : বিবাহে অভিভাবক ও কনের অনুমতি গ্রহণ প্রসঙ্গে

اَلْوَلِيُّ শব্দটি সিফাতের সীগাহ একবচন, বহুবচনে اَوْلِيَاءُ শাব্দিক অর্থ হলো- প্রতিপালক, সাহায্যকারী বন্ধু, নিকটতম ব্যক্তি, সন্তান, অভিভাবক ইত্যাদি। পরিভাষায় এর পরিচয় হলো- اَلْوَلِيُّ هُوَ الَّذِىْ يُنْفِذُ قَوْلَهُ عَلَى الْغَيْرِ شَاءَ اَوْ اَبٰى অর্থাৎ 'যার কথা অন্যের উপর প্রযোজ্য হয়, এতে সে সম্মত থাকুক বা না থাকুক।' তবে এখানে وَلِىٌّ দ্বারা বিবাহের অভিভাবককে বুঝানো হয়েছে।
وَلَايَتٌ বা অভিভাবকত্ব দু প্রকার হতে পারে- ১. وَلَايَتِ مَذْهَبْ বা ধর্মীয় বিষয়ে অভিভাবকত্ব। আর তা বয়ঃপ্রাপ্ত মুসলমান ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হবে। ২. وَلَايَتِ اِجْبَارْ বা বলপ্রয়োগে অভিভাবকত্ব। এটা অপ্রাপ্তবয়স্কা, জ্ঞান-বুদ্ধিহীনা ও ক্রীতদাসীর উপর প্রযোজ্য হবে, সে অপ্রাপ্তবয়স্কা বাকিরা [কুমারী] বা ছাইয়িবা [স্বামী বিগতা] হোক না কেন? এটাই হানাফীদের অভিমত; কিন্তু ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে وَلَايَتِ اِجْبَارْ এটা অপ্রাপ্তবয়স্কা, জ্ঞান-বুদ্ধিহীনা ও বাকিরা ক্রীতদাসীর উপর প্রযোজ্য হবে, চাই সে অপ্রাপ্তবয়স্কা হোক বা প্রাপ্তবয়স্কা বালেগা হোক; কিন্তু ছাইয়িবার ক্ষেত্রে উক্ত অভিভাবকত্ব প্রয়োগ হবে না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হাদীসের আলোকে যথাস্থানে করা হবে। এখানে সংক্ষেপে বলা চলে, এ বলপ্রয়োগের অভিভাবকত্ব চারটি উপায়ে সাব্যস্ত হতে পারে- ১. নিকটাত্মীয়তা, ২. স্বত্বাধিকার, ৩. وِلاء বা প্রভুত্ব এবং ৪. ইমামত বা নেতৃত্ব।
اِسْتِيْذَانٌ শব্দটি বাবে اِسْتِفْعَالٌ -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো- অনুমতি প্রার্থনা করা। পরিভাষায় বিবাহের ব্যাপারে নারীদের সম্মতি বা অসম্মতি গ্রহণ করাকে اِذْنٌ বা অনুমতি বলা হয়। বাকিরা বা কুমারীদের অনুমতি চুপ থাকা বা কাঁদাকেই ধরে নিতে হবে। পক্ষান্তরে ছাইয়িবাদের অনুমতি মৌখিকভাবে নিতে হবে, অন্যথায় গ্রহণীয় হবে না।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

২৯৯২ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُنْكَحُ الْاَيِّمُ حَتّٰى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَأْذَنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَكَيْفَ اِذْنُهَا قَالَ اَنْ تَسْكُتَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৯৯২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- স্বামীহীনা নারীর বিবাহ তার অনুমতি ব্যতীত দেওয়া যাবে না, কুমারীর বিবাহ তার সম্মতি ব্যতীত দেওয়া চলবে না। তারা [উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম] জিজ্ঞেস করলেন- হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কুমারীর সম্মতি কিরূপে [নেওয়া যাবে]? উত্তরে তিনি বললেন, তার নীরবতাই সম্মতি। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٢٩٩٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلْاَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَاذَنُ فِيْ نَفْسِهَا وَاِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ الثَّيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَامَرُ وَاِذْنُهَا سُكُوْتُهَا وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ الثَّيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَاذِنُهَا اَبُوْهَا فِيْ نَفْسِهَا وَاِذْنُهَا صُمَاتُهَا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৯৯৩. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, স্বামীহীনা নারী তার [বিবাহের] ব্যাপারে অলী অপেক্ষা বেশি হক রাখে এবং কুমারী তার [বিবাহের] ব্যাপারে অনুমতি নিতে হবে এবং তার অনুমতি নীরব থাকা। অন্য বর্ণনায় বলেন যে, স্বামী বিগতা [বিধবা ও পরিত্যক্তা] তার [বিবাহের] ব্যাপারে অলি অপেক্ষা বেশি কর্তৃত্বের অধিকারিণী এবং কুমারীর মত গ্রহণ করতে হবে, তার সম্মতি নীরব থাকা। অন্য বর্ণনায় বলেন যে, স্বামী বিগতা [বিধবা ও পরিত্যক্তা] তার [বিবাহের ব্যাপারে] অলি অপেক্ষা বেশি কর্তৃত্বের অধিকারিণী এবং কুমারী তার [বিবাহের] ব্যাপারে তার পিতা অনুমতি নেবে, তার অনুমতি নীরব থাকা। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْوَلِيُّ-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْوَلِيُّ শব্দটি একবচন। এটি সিফাতের সীগাহ। এর বহুবচন হচ্ছে- اَلْاَوْلِيَاءُ শব্দটি اَلْوِلَايَةُ মাসদার থেকে উদ্ভূত। অভিধানে এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

১. اَلرَّبُّ বা প্রতিপালক। যেমন কুরআনে এসেছে- "قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا"
২. اَلنَّاصِرُ বা সাহায্যকারী। যেমন কুরআনে এসেছে- "لَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ"
৩. اَلْوَلَدُ বা সন্তান। যেমন কুরআনে এসেছে- "فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا"
৪. اَلصَّدِيْقُ বা বন্ধু। যেমন কুরআনে এসেছে- "كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ"
৫. اَلْوَلِيُّ বা অভিভাবক। যেমন কুরআনে এসেছে- "مَالَكَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ"
৬. اَلْمُحِبُّ বা প্রেমিক। যেমন কুরআনে এসেছে- "اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ"
৭. اَلرَّجُلُ الْاَقْرَبُ বা নিকটতম লোক। যেমন কুরআনে এসেছে- "اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرَاهِيْمَ"
৮. اَلْمَالِكُ বা মালিক। যেমন বলা হয়- فُلَانٌ وَلِيُّ الْاَرْضِ

اَلْوَلِيُّ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. دُرُّالْمُخْتَارِ নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে- اَلْوَلِيُّ هُوَ الَّذِيْ يُنْفِذُ قَوْلَهُ عَلَى الْغَيْرِ شَاءَ اَوْ اَبٰى অর্থাৎ যার কথা অন্যের উপর প্রযোজ্য হয়, এতে সে সম্মত থাকুক বা না থাকুক, তাকেই وَلِيٌّ বলা হয়। যেমন- দাদা, পিতা, চাচা ইত্যাদি।
২. আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) বলেন- اَلْوَلِيُّ هُوَ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ الْوَارِثُ
৩. عُمْدَةُ الرِّعَايَةِ কিতাবে বলা হয়েছে- هُوَ الَّذِيْ يُنْفِذُ قَوْلَهُ عَلٰى اِنْسَانٍ رَضِيَ اَوْ اَبٰى
৪. كِتَابُ الْفِقْهِ -এর গ্রন্থকার বলেন- اَلْوَلِيُّ هُوَ الَّذِيْ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بِدُوْنِهِ

বিবাহের কর্তৃত্ব নিয়ে ইমামদের মতভেদ : বিবাহের মধ্যে কার কর্তৃত্ব বা মতামত প্রধান? নারীর নিজের নাকি তার অভিভাবকের? এটা একটি বিতর্কিত ব্যাপার। এতে আবার কয়েকটি প্রশ্নও হতে পারে। যেমন- ১. নারী কি বিধবা, নাকি কুমারী? ২. সে কি বালেগা, নাকি না-বালেগা? ৩. অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ হলে তা কি শুদ্ধ হবে, নাকি শুদ্ধ হবে না ইত্যাদি। এসব ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

مَذْهَبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, বিবাহের মধ্যে অভিভাবকের চেয়ে নারীর মতামতের প্রাধান্যই বেশি। বিধবার বেলায় তো বটেই। সাবালেগা কুমারীর বেলায়ও। বস্তুত হাদীসের শব্দ يَسْتَاذِنُهَا اَبُوْهَا হতেও প্রমাণিত হয় যে, পিতা তার কন্যাকে বিবাহ দিতে কন্যা হতে সম্মতি নিতে হবে। ফলে পাত্রীর মতের গুরুত্ব প্রমাণিত হচ্ছে। এর সাথে এ কথাটিও বুঝা যায় যে, বালেগা পাত্রীকে বিবাহ দিতে তার সম্মতি নিতে হবে।

مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَ أَحْمَدَ (رح) : ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমদ (র.) ও আরো অনেকেই বলেন, অভিভাবকের মতের প্রাধান্য থাকবে। কেননা, এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ অর্থাৎ অলীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ ঠিক হবে না। সাহেবাইন বলেন– অলী ও কনে উভয়ের সম্মতি আবশ্যক; কারো একক মতে বিবাহ সহীহ হবে না। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) যদিও কনের মতকে প্রাধান্য দিয়াছেন– মূলত তার অভিমত হলো উভয়ের ঐকমত্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। হানাফী ফিক্‌হের কিতাবে এভাবে বলা হয়েছে যে, পাত্রী যদি 'গায়রে কুফু' অর্থাৎ নীচু বংশে স্বেচ্ছায় বিবাহ করে, তবে ইচ্ছা করলে তার অভিভাবক আইন-আদালতের মাধ্যমে উক্ত বিবাহকে নাকচ করে দিতে পারবে।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : তারা যে হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, অলি ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ নয়, সনদের দিক হতে তা যঈফ। অথচ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর ভাই আবদুর রহমানের কন্যা হাফসাকে তার পিতা আবদুর রহমানের অনুপস্থিতিতে মুন্‌যির ইবনে যুবাইরের কাছে বিবাহ দিয়েছেন। সুতরাং উক্ত হাদীসের অর্থ হবে অলি ব্যতীত কোনো মেয়ে নিজের বিবাহ নিজে সমাধা করলে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কল্যাণকর হয় না, কারণ নারী জাতি যে অপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারিণী, অপরিণামদর্শিনী। কিন্তু তাই বলে বিবাহই দুরস্ত হবে না– এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

ইমামদের মতভেদের কারণ : এটা সর্বস্বীকৃত যে, বিবাহ বন্ধন এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যাতে কনের স্বার্থ যেমন বিজড়িত তেমন অলি-অভিভাবকদের স্বার্থও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ফলে অবাঞ্ছিত অবস্থায় উভয়েরই স্বার্থহানীর সমূহ আশঙ্কা বিদ্যমান। কনের স্বার্থ বিজড়িত হওয়া তো সুস্পষ্ট। কেননা, তার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-দুঃখ, ভালোমন্দ বিবাহের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তার জীবন-যৌবন, মঙ্গল-অমঙ্গল বিবাহের অনুকূলে বা প্রতিকূলে হওয়ার উপর নির্ভর করে। কেবলমাত্র বৈষয়িক বা দৈহিক কল্যাণ-অকল্যাণই নয় মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-শান্তির এমনকি ধর্মীয় কার্যকলাপ, নৈতিক অবস্থা ইত্যাদি সব কিছুই বিবাহের ভালোমন্দের উপরই বহুলাংশে নির্ভর করে। অবাঞ্ছিত কিছু ঘটলে তাকেই এর ফল ভোগ করতে হবে। অপাত্রে অর্পিত হলে অনেক সময় তার কবল হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য ভয়াবহ পরিণামের দিকে অগ্রসর হতেও দ্বিধাগ্রস্ত হবে না।

অপর দিকে অলি বা অভিভাবকের স্বার্থকেও খাটো করে দেখা যায় না। কেননা, বিবাহের ফলাফল বর-বধূর দাম্পত্য জীবনে সীমিত নয়; বরং এর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক, নিজের ও বংশের মর্যাদার প্রশ্নও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মেয়ে যদি অনভিজ্ঞতার ফলে কিংবা প্রেমের মোহে সাময়িক উত্তেজনায় কোনো অবাঞ্ছিত কাজ করে ফেলে, এর কুফল তার অলিকেই ভোগ করতে হবে। নিচু বংশে বিবাহ করলে বংশ-মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। এর প্রভাব পরিবারের, বংশের অন্যান্য মেয়েদের বিবাহে প্রকট হয়ে দেখা দেবে। এমনকি অভিভাবক না থাকলে অনেক ক্ষেত্রে বিবাহের নামে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। ফলে অলিগণ সামাজিক, বৈষয়িক ও মানসিক, নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য হয়। তাই ইসলাম অভিভাবককে বলেছে তুমি তোমার ব্যক্তিস্বার্থে অথবা জিদে পড়ে যেমন নিজের খামখেয়ালি মতে মেয়েকে বিবাহ দিতে পারবে না, তেমনি কনেকেও বলেছে– সাবধান! অলির মতের বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছামতো বিবাহ করলে তা নাকচ করার ক্ষমতাও অলির আছে। মোটকথা, ইসলাম উভয় দিকের ভারসাম্য বজায় রেখে এ কাজটি সমাধা করতে পরামর্শ দিয়েছে। আর এটা হলো প্রকৃত ইনসাফ। এরই ভিত্তিতে ইমামদের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক পৃথক হয়ে পড়েছে।

اَلْأَيِّمُ-এর পরিচয় : اَلْأَيِّمُ [আইয়িম] শব্দটি আরবি ভাষায় দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়, প্রথম অর্থ ثَيِّبٌ [ছাইয়িব]-এর সমার্থক, যে নারীর পূর্বে বিবাহ হয়েছিল, স্বামী মারা যাওয়ায় বা তালাক প্রদান করায় বর্তমানে স্বামী বা কারো বিবাহবন্ধনে নেই। অর্থাৎ বিধবা অথবা পরিত্যক্তা উভয়ের উপর প্রযোজ্য সাবালিকা হোক বা নাবালিকা। দ্বিতীয় অর্থ ব্যাপক– স্বামী নেই যার- পূর্বোক্ত [বিধবা বা পরিত্যক্তা] অর্থসহ কুমারীর [সাবালিকা ও নাবালিকা] উপরও প্রযোজ্য। [এমনকি অনেকের মতে, অবিবাহিত ও বিপত্নীক পুরুষের উপর প্রযোজ্য হয়ে থাকে] বহুবচনে أَيَامٰى যেমন, কুরআন মাজীদের বাণী– وَأَنْكِحُوا الْأَيَامٰى مِنْكُمْ (الْآيَةَ) [তোমাদের মধ্যে যারা আইয়িম– যে বর্তমানে বিবাহবন্ধনে নেই, তাদের বিবাহ সম্পাদন কর।] [২৪ : ৩২] হাদীসে পরবর্তী শব্দ بِكْرٌ কুমারী থাকায় ও অন্য রিওয়ায়াতে أَيِّمٌ-এর পরিবর্তে ثَيِّبٌ শব্দ আসায় এর সম-অর্থ গ্রহণ অনেকে যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন। আবার অনেকে بِكْرٌ ও ثَيِّبٌ-এর সম্মতির পার্থক্য বুঝানোর উদ্দেশ্যে بِكْرٌ-এর স্বতন্ত্র উল্লেখ করা হয়েছে– এ যুক্তিতে দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছেন। স্বামীহীনা শব্দ দ্বারা অর্থের ব্যাপকতা বুঝানো হয়েছে।

وَعَنْ ٢٩٩٤ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ (رض) أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذٰلِكَ فَأَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَةَ نِكَاحَ أَبِيْهَا)

২৯৯৪. অনুবাদ : হযরত খানসা বিনতে খিযাম (রা.) বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা তাঁকে ثَيِّبٌ [পূর্বে বিবাহিতা] অবস্থায় [দ্বিতীয়বার] বিবাহ সম্পাদন করেন, তিনি এতে সম্মত ছিলেন না। অতঃপর তিনি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এসে তাঁকে অবহিত করলে তিনি ঐ বিবাহ নাকচ করে দেন। –[বুখারী] ইবনে মাজার রেওয়ায়েতে نِكَاحَ أَبِيْهَا তার পিতার প্রদত্ত বিবাহ বলে উল্লেখ আছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কার জন্য জবরদস্তিমূলক অভিভাকত্ব প্রযোজ্য হবে এবং এ সম্পর্কে মতানৈক্য : কোন নারীর উপর জবরদস্তিমূলক অভিভাবকত্ব গ্রহণ করা যাবে এবং কার উপর তা প্রযোজ্য হবে না, এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইমামদের উক্ত মতানৈক্যের প্রেক্ষিতে একে চারটি অবস্থায় ভাগ করা হয়েছে–

১. **বালিগায়ে ছাইয়িবা :** সর্বসম্মত মতে সাবালিকা ছাইয়্যিবার উপর وَلَايَتِ اِجْبَارْ বা বলপ্রয়োগমূলক অভিভাবকত্ব প্রয়োগ করা যাবে না। বিবাহের ব্যাপারে তার সরাসরি অনুমতির প্রয়োজন হবে।

২. **বাকিরায়ে সগীরাহ :** নাবালিকা বাকিরার উপর জবরদস্তিমূলক বলপ্রয়োগ করা যাবে না। এটাও সর্বসম্মত অভিমত।

৩. **বাকিরায়ে ছাইয়িবায়ে সগীরা :** হানাফীদের মতে ছাইয়িবায়ে সগীরার উপর বলপ্রয়োগ করা যাবে; ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে এ ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করা যাবে না।

৪. **বাকিরায়ে বালিগা :** ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমাদ, ইসহাক (র.) প্রমুখের মতে বাকিরায়ে বালিগার উপর 'বেলায়েতে ইজবার' সাব্যস্ত হবে; কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা, ছাওরী এবং আওযায়ী (র.) প্রমুখের মতে, বাকিরায়ে বালিগার ক্ষেত্রে এটা সাব্যস্ত হবে না।

وَعَنْ ٢٩٩٥ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ وَلُعَبُهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِيْ عَشَرَةَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৯৯৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ৭ বছর বয়ঃক্রমকালে বিবাহ করেন এবং নয় বছর বয়সে তিনি খেলনাসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গৃহে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ১৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ছয় ও সাতের মধ্যে ইমামদের মতভেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিবাহকালীন তাঁর বয়স কত বৎসর ছিল, এ ব্যাপারে হাদীস ও ইতিহাসের বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমীর কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, বিবাহের সময় হযরত আয়েশা (রা.)-এর বয়স ছিল– ছয় বৎসর। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, তখন ছিল সাত বৎসর। এর সমাধানে বলা হয় যে, প্রকৃতপক্ষে তখন তাঁর বয়স ছিল পূর্ণ ছয় বৎসর আরও কয়েক মাস। সুতরাং কোনো কোনো বর্ণনাকারী বাড়তি মাসগুলোকে গোটা বৎসর গণনা করেছেন। পক্ষান্তরে কেউ কেউ একে গণনাই করেননি। ফলে ছয় ও সাতের ব্যবধান হয়ে গেছে। বস্তুত আমরাও নিজেদের কোনো কোনো হিসাবে এরূপ করে থাকি।

قَوْلُهُ وَلُعَبُهَا مَعَهَا -এর ব্যাখ্যা : لُعَبُهَا শব্দ لُعْبَةٌ -এর বহুবচন, অর্থ– খেলনা, পুতুলের বিবাহ নামে বালিকারা যে খেলা করে এবং কাপড় বা তুলা দ্বারা ছেলে বা মেয়েরূপে যা বানায় এখানে তাই অর্থ। মেয়েদের জন্য এরূপ বানানো ও খেলা করার অনুমতি রয়েছে বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন। মূর্তি বানানোর নিষেধাজ্ঞার আওতায় এটা পড়বে না। আবার অনেকের মতে, যেহেতু এটা হিজরতের অব্যবহিত পরের ঘটনা, সেহেতু মূর্তি বানানো বা ছবি আঁকানোর নিষেধাজ্ঞার পূর্বের ঘটনা।

বস্তুত একথা দ্বারা এটাও প্রতীয়মান হলো যে, তাঁর বিবাহের সময় তিনি খুবই অল্পবয়স্কা ছিলেন। ফলে বিবাহ তথা দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কোনো জ্ঞান তাঁর ছিল না।

বাল্যবিবাহের হুকুম : কুরআনুল কারীম ও হাদীসের মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, শরিয়তে বাল্যবিবাহ বৈধ– যদিও উত্তম নয়। সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত। কেননা, কখনও কখনও মানুষ এ ধরনের বিবাহ করাতে সামাজিকভাবে বাধ্য হয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٩٩٦ أَبِيْ مُوْسٰى (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

২৯৯৬ অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অলি ছাড়া কোনো বিবাহ নেই। –[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারিমী।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইমাম শাফেয়ী (র.) ও আহমদ (র.)-এর মাযহাব হলো, অলি ছাড়া বিবাহ হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এ হাদীসের অর্থ হলো– অলি বা অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ উত্তম নয়। অথবা এটা উন্মাদ ও অপ্রাপ্তবয়স্কা সম্পর্কে প্রযোজ্য। অথবা গায়রে কুফূ তথা অসম বিবাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে। পূর্বে মুসলিমের প্রথম পরিচ্ছেদের হাদীসের ব্যাখ্যায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, স্বামী বিগতা প্রাপ্তবয়স্কা নারী তার বিবাহ সম্পর্কেও তার অলি অপেক্ষা সে নিজেই অধিক হকদার এবং প্রাপ্তবয়স্কা কুমারীর অনুমতি নিতে হবে। মূলত বিবাহ হবে কিন্তু তা টেকসই না হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

وَعَنْ ٢٩٩٧ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَاِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَاِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

২৯৯৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোনো নারী অলির অনুমতি ব্যতিরেকে নিজে বিবাহ করবে, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল। যদি এরূপ বিবাহে স্বামী তার সাথে সহবাস করে থাকে, তবে সে যে স্ত্রীকে উপভোগ করল, সেহেতু তাকে স্ত্রীর মোহর দিতে হবে। যদি তার [অলিগণ] আপসে বিরোধ করে, তবে [তাদের কর্তৃত্ব বাতিল হয়ে যাবে, সে ক্ষেত্রে] সুলতান [বা তৎপ্রতিনিধি প্রশাসক, বিচারক প্রভৃতি] যার অলি নেই তার অলি [বলে গণ্য হবে]। –[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَلُّ التَّعَارُضِ **[দ্বন্দ্বের সমাধান]** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো মহিলা নিজ ইচ্ছানুযায়ী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে অভিভাবক ছাড়াই তা শুদ্ধ হবে। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, অভিভাবক ছাড়া তা শুদ্ধ হবে না; বরং বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং হাদীস দুটির মাঝে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। সমাধান নিম্নরূপ–

১. এখানে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসের উপর আমল করতে হবে, আর হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসটি পরিত্যাজ্য হবে। কেননা, হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসটি আয়াতবিরোধী। আয়াতে বলা হয়েছে–

١. فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ -

٢. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

২. হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসটি অপরাপর হাদীসবিরোধী। পক্ষান্তরে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসটি অপরাপর হাদীস দ্বারা সমর্থিত। যেমন–
১. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا .
২. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِامْرَأَةٍ قَدْ حَلَّتْ فَانْكِحِيْ مَنْ شِئْتِ .

৩. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে অভিভাবকের শর্ত সংবলিত হাদীস বর্ণিত। কিন্তু দেখা গেছে তিনি নিজেই নিজের বর্ণনার বিরুদ্ধে কাজ করেছেন, সুতরাং তাঁর হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। এখানে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৪. ইমাম আবূ বকর জাস্সাস (র.) বলেন, শরিয়তের দৃষ্টিতে একজন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা নিজের মাল খরচ করার স্বাধিকার রাখে। সুতরাং সে নিজের নফসের ব্যাপারেও সম্পূর্ণ স্বাধিকার রাখবে।

৫. ইবনে হুমাম (র.) বলেন, একজন প্রাপ্তবয়স্কা স্বাধীনচেতা মহিলাকে যদি নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা না দেওয়া হয়, তবে তা নিঃসন্দেহে হুররিয়াতের অমর্যাদা করা হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিবাহ তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই সম্পাদিত হবে।

৬. হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস নাবালেগা ও দাসীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাদের বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া হবে না। আর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস حُرَّة بَالِغَة -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং কোনো দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না।

৭. অথবা, হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসটি ঐ সকল নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত غَيْر كُفُوْ -এর মধ্যে বিয়ে বসে। সে ক্ষেত্রে তার বাধা প্রদানের অধিকার আছে।

অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের বিবাহ সর্বসম্মতিক্রমে অভিভাবকের অনুমতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কা বা বিধবা নারীর বিবাহে অভিভাবকের অনুমতি লাগবে কিনা, এ সম্পর্কে ইমামগণ মতানৈক্য করেছেন, নিম্নে মতপার্থক্য উপস্থাপন করা হলো–

ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ ও সাহেবাইন (র.)-এর মতে, অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কোনো বিবাহ জায়েজ হবে না, চাই তাতে কুফু থাকুক বা না থাকুক।

দলিল : কুরআন ও হাদীসের দলিল হলো–

১. قَوْلُهُ تَعَالٰى فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَّنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ .
২. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ .
৩. حَدِيْثُ عَائِشَةَ (رضـ) الْمَذْكُوْرَةُ .
৪. عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى (رضـ) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ .

আহনাফের অভিমত : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, জ্ঞানবান প্রাপ্তবয়স্কা নারী নিজের বিবাহের ক্ষমতা রাখে। তবে সে যদি মাহরে মিছিল-এর কমে বা অসম কুফুতে নিজেকে সমর্পণ করে, তাহলে অলি কাজির মাধ্যমে বিবাহ ভেঙ্গে দিতে পারবে।

দলিল : তিনি দলিল দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন–

১. قَوْلُهُ تَعَالٰى وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا .
২. قَوْلُهُ تَعَالٰى فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ .
৩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا .
৪. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) أَنَّهَا زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَعَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ .

হানাফীদের পক্ষ থেকে বিরোধীদের দলিলের উত্তর : হানাফীগণ ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.) প্রমুখের আনীত দলিলের নিম্নরূপ উত্তর দিয়ে থাকেন–

ক. ইমামত্রয়ের উপস্থাপিত কুরআনের আয়াতের উত্তরে বলা যায় যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উক্ত যুক্তি ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা, যে ক্ষেত্রে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়, তা হয় নিষেধাজ্ঞা। আর নিষেধাজ্ঞা অধিকার প্রকাশ করে, অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে না।

ইমামত্রয় দলিল হিসেবে যেসব হাদীস পেশ করেছেন, হানাফী মুহাদ্দিসগণ সেগুলোকে দুর্বল হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন। যথা– হযরত আবূ মূসা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি مُرْسَلٌ ও مُتَّصِلٌ হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। সুতরাং হাদীসশাস্ত্রের নেতা (أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الْحَدِيْثِ) শো'বা, সুফিয়ান ছাওরী (র.) প্রমুখগণ বলেছেন, হাদীসটি আবূ ইসহাক হতে مُرْسَلٌ হিসেবে বর্ণিত আছে। ইমাম ত্বাহাবী (র.) একেই সঠিক হিসেবে অভিহিত করেছেন। আবার ইমাম তিরমিযী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, إِسْرَائِيْل রাবী ইসহাক থেকে مُتَّصِلٌ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এরূপ اِضْطِرَابٌ-এর কারণে হাদীসটি দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

অথবা, এখানে নফী দ্বারা উদ্দেশ্য نَفِى كَمَالٌ অর্থাৎ বিবাহ পূর্ণাঙ্গ হবে না। এ অর্থ নয় যে, বিবাহ শুদ্ধই হবে না।

খ. হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসটি যুহরীর বর্ণনার উপর নির্ভরশীল। ইবনে জুরাইজ এক সাক্ষাৎকালে যুহরীকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তা অস্বীকার করেন।

তদুপরি যুহরী ও হযরত আয়েশা (রা.) এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেননি।

অথবা, উল্লিখিত হাদীসটি দাসীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা, অন্য বর্ণনায় রয়েছে– اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهَا

গ. হযরত মু'আয (রা.)-এর হাদীসকে দারাকুতনী مَتْرُوْك বা পরিত্যক্ত বলেছেন।

وَعَنْ ٢٩٩٨ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلْبَغَايَا الَّتِىْ يَنْكِحْنَ اَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَالْاَصَحُّ اَنَّهُ مَوْقُوْفٌ عَلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ - (رواه الترمذى)

২৯৯৮. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সাক্ষী ছাড়া যে সমস্ত নারী বিবাহ করে, তারা ব্যভিচারিণী। [রাবী বলেন,] প্রকৃতপক্ষে এ হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উপর মাওকূফ [অর্থাৎ তাঁর উক্তি, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নয়]। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লামা তীবী (র.) বলেন, অত্র হাদীসে 'বাইয়িনা' শব্দ দ্বারা বিবাহের সাক্ষীকে বুঝানো হয়েছে। বিবাহকার্য সম্পন্ন হওয়ার জন্য সাক্ষী থাকা শর্ত। এটা ব্যতীত বিবাহ বৈধ হবে না। তাই ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সাক্ষী ব্যতীত বিবাহের মিলন জেনা বা ব্যভিচারের শামিল।

কারো মতে, এখানে 'বাইয়িনা' দ্বারা অলি বা অভিভাবককে বুঝানো হয়েছে; কিন্তু এটা ঠিক নয়। কেননা, পরিভাষায় বা প্রচলিত কোনো অবস্থাতেই 'বাইয়িনা' শব্দটি অলি অর্থে ব্যবহৃত হবে না। অধিকাংশ আলিমের অভিমত হলো, সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ সম্পন্ন হবে না। সাহাবী এবং তাবেয়ীদের মধ্যে এর বিপরীত কোনো মনোভাব পরিলক্ষিত হয়নি; কিন্তু পরবর্তী কোনো কোনো আলিম যেমন আবূ ছাওর প্রমুখের মতে সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ সম্পন্ন হবে। সে যাই হোক, এ অবস্থায় যদি সহবাস হয়ে থাকে তবে মোহর দেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়বে, যা ইতঃপূর্বের হাদীসে আলোচিত হয়েছে; কিন্তু এজন্য তাকে হদ বা শাস্তি দেওয়া যাবে না। আর যদি এ সহবাসের ফলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তবে তা সহবাসকারীর দায়িত্বে অর্পিত হবে।

وَعَنْ ٢٩٩٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْيَتِيْمَةُ تُسْتَامَرُ فِىْ نَفْسِهَا فَاِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ اِذْنُهَا وَاِنْ اَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ و رواه الدارمى عن ابى موسى)

২৯৯৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– এতিম কন্যার [বিবাহের] ব্যাপারে তার মত গ্রহণ করতে হবে, যদি সে নিশ্চুপ থাকে, তবে তাই তার অনুমতি হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি সে অস্বীকার করে, তবে তার উপর জবরদস্তি চলবে না। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী। দারিমী সংকলন করেছেন হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) হতে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইয়াতীমা-এর অর্থ ও ব্যাখ্যা : অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েকে ইয়াতীমা বলে। কিন্তু এখানে অর্থ হলো, পিতৃহীনা সাবালিকা বালেগা হওয়ার পর যদিও সে ইয়াতীমা থাকে না, তবুও পূর্বাবস্থার হিসাবে তাকে ইয়াতীমা বলা হয়েছে। আরবি পরিভাষায় একে (مَجَاز مَا كَانَ) বলা হয়। যেমন, কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ অর্থাৎ এতিমদেরকে তাদের ধনসম্পদ প্রদান কর। অথচ যখন তাদেরকে তাদের মালসম্পদ বুঝিয়ে দেওয়া হবে, তখন তারা ইয়াতীমা নয় বরং বয়ঃপ্রাপ্ত। এখানেও তদ্রূপ: তবে হ্যাঁ ইয়াতীমা শব্দ বলার দ্বারা অলির অনুকম্পা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করা হয়েছে।

ইয়াতীমার বিবাহে ইমামদের মতভেদ : হানাফী ইমামগণ বলেন, পিতৃহীনা নাবালিকা অবস্থার অভিভাবক হিসাবে দাদা তার বিবাহ সম্পাদন করলে তা শুদ্ধ হবে এবং বয়ঃপ্রাপ্তির সময় বিবাহ নাকচ করার অধিকার থাকবে না। দাদা ছাড়া অন্যে সম্পাদন করলে তা নাকচ করার অধিকার থাকবে। কিন্তু শাফেয়ীদের মতে বাপ-দাদা ব্যতীত অন্যের বিবাহ দেওয়াই বৈধ হবে না।

وَعَنْ ٣٠٠٠ جَابِرٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ اِذْنِ سَيِّدِهٖ فَهُوَ عَاهِرٌ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ)

৩০০০. **অনুবাদ :** হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মনিবের অনুমতি ছাড়া যে গোলাম বিবাহ করে সে ব্যভিচারী। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ, দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মনিবের অনুমতি ব্যতীত গোলাম বিবাহ করলে ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে এই বিবাহ বিশুদ্ধ হবে না। কেননা, স্ত্রীর খোরপোশ মনিবকে দিতে হবে; তবে ইমাম আবূ হানীফা ও মালিক (র.)-এর মতে মনিব পরে অনুমতি দিলে শুদ্ধ হয়ে যাবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٠٠١ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اِنَّ جَارِيَةً بِكْرًا اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَتْ اَنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩০০১. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক কুমারী মেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এসে বলল যে– তার অসম্মতিতে পিতা তাকে বিবাহ দিয়েছেন। এটা শুনে তিনি তাকে [বিবাহ বাকি রাখার অথবা নাকচ করে দেবার] অধিকার প্রদান করলেন। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٠٠٢ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْاَةُ الْمَرْاَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْاَةُ نَفْسَهَا فَاِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِيْ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৩০০২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কোনো নারী যেন অপর নারীর বিবাহ সম্পাদন না করে এবং সে নিজেরও বিবাহ যেন সম্পাদন না করে. ব্যভিচারিণীই তো স্বীয় বিবাহ [এর প্রহসন] করে। –[ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٣٠٠٣ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) وَابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنْ اِسْمَهٗ وَاَدَبَهٗ فَاِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَاِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَاَصَابَ اِثْمًا فَاِنَّمَا اِثْمُهٗ عَلٰى اَبِيْهِ ـ

৩০০৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ ও ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তির কোনো সন্তান [ছেলে বা মেয়ে] জন্মগ্রহণ করে, সে যেন তার উত্তম নাম রাখে এবং ভালো আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়, পরে যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন যেন তার বিবাহ সম্পাদন করে। বয়ঃপ্রাপ্তির পর যদি বিবাহ না দেয় আর ঐ সন্তান কোনো পাপ করে, তবে ঐ পাপ পিতার উপর পড়বে। [সন্তানেরও পাপ হবে অবশ্য।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** আলোচ্য হাদীসে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, আর তা হলো উত্তম ও ইসলামি নাম রাখা, শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া এবং প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হলে বিবাহ সম্পাদন করা অন্যথায় ছেলে-সন্তান পাপে লিপ্ত হলে এর দায়দায়িত্ব পিতামাতার উপরও বর্তাবে।

সন্তানের নাম নির্বাচন : সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার উত্তম ইসলামি নাম রাখা একান্ত কর্তব্য। কেননা, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেককে তার নিজের ও পিতার নামসহ ডাকবেন। যার নাম খারাপ ছিল তখন সে লজ্জাবোধ করবে। তা ছাড়া নামের প্রভাব অনেক সময় ব্যক্তির মাঝেও প্রতিফলিত হয়। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে। রাসূল ﷺ কারো খারাপ নাম শুনলে তিনি তা পরিবর্তন করে ভালো নাম রেখে দিতেন। অথচ আমাদের ইসলামি সমাজে মুসলমানরা তাদের সন্তানসন্ততির নাম রাখেন মন্টু, ফন্টু, ঝন্টু, পল্টু, চেরাগ, পরাগ, দিবা, নুন্তী, মুন্তী, জীবন, মরণ প্রভৃতি। যে নামের না আছে কোনো সুন্দর অর্থ, না তা শ্রুতিমধুর। অনেকে আবার বলে থাকেন নামধামের কোনো গুরুত্ব নেই। এটা তাদের চরম মূর্খতারই পরিচায়ক। আবার যে সমস্ত নামের সাথে শিরক মিশ্রিত, তা রাখাও ঠিক নয়। যেমন– আবদুর রাসূল, আবদুন নবী প্রভৃতি। অবশ্য নবী-রাসূলদের নাম রাখা সর্বোত্তম। তবে আল্লাহর সিফাতী নামসমূহের সাথে 'আবদ' যোগ করে রাখতে হবে। যেমন– আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান, আবদুল জাব্বার, আবদুল খালিক, আবদুল মালিক প্রভৃতি।

وَعَنْ ٣٠٠٤ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِى التَّوْرَاةِ مَكْتُوْبٌ مَنْ بَلَغَتْ اِبْنَتُهٗ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً وَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَاَصَابَتْ اِثْمًا فَاِثْمُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ - (رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৩০০৪. **অনুবাদ :** হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ও আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তাওরাতে [হযরত মূসা (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ কিতাবে] লিপিবদ্ধ আছে যে, কারো কন্যা সন্তান বারো বছর বয়সে পৌঁছে সে যদি তার বিবাহ সম্পাদন না করে আর ঐ কন্যা যদি কোনো পাপ করে বসে, তবে সে পাপ ঐ ব্যক্তিরও হবে। –[উভয় হাদীস (৩০০৩-৩০০৪) বায়হাকী শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে সংকলন করেছেন।]

بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ وَالْخُطْبَةِ وَالشَّرْطِ
পরিচ্ছেদ : বিবাহের ঘোষণা, প্রস্তাব ও শর্তাবলি প্রসঙ্গে

إِعْلَانٌ : শব্দটি বাবে إِفْعَالٌ-এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো— ঘোষণা করা, প্রচার করা বা প্রকাশ করা। পরিভাষায়, জনগণ ও আত্মীয়স্বজনকে অবহিত করে আনন্দ-উৎসবের মাধ্যমে বিবাহের কাজ সম্পাদন করা। আলোচ্য পরিচ্ছেদের বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, বিবাহের প্রকাশ্য ঘোষণা দেওয়া সুন্নত।

বিবাহের প্রচার তথা লোকদের মধ্যে জানাশুনার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি বিভিন্ন যুগে অবলম্বন করা হয়েছে। যেমন— ইসলামের প্রাথমিক যুগে 'দফ' [একমুখো ঢোল] পিটানোর কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। বর্তমানে যেমন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাজি পোড়ায় এবং বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ দেওয়া ইত্যাদি। ওলামাগণ ঈদের দিনের জন্যও এরূপ করাকে জায়েজ মনে করেন। তবে বিবাহ অনুষ্ঠানের নির্দোষ, সরল ও সাদাসিধে আমোদ-আনন্দ করা মুবাহ। এর অর্থ এই নয় যে, কানফাটা ভলিয়ম দিয়ে অশ্লীল ও অরুচিসম্পন্ন গানের মাইক বাজানো, কিংবা ব্যাপকভাবে বাজি পোড়ানো শরিয়তসম্মত; বরং এগুলো একদিকে যেমন অপব্যয় অপরদিকে অনৈসলামিক সংস্কৃতি। অবশ্য এমন ছোট বয়সের কচি ছেলেমেয়েদের ইসলামি গান কবিতা কাব্য আবৃতি করাকে শরিয়ত অনুমোদন করে যাদের প্রতি কারো প্রেমাসক্তি সৃষ্টি হয় না।

اَلْخُطْبَةُ : শব্দটিকে দুভাবে পড়া যেতে পারে— خَاءٌ বর্ণের উপর পেশ অথবা এর নিচে যের প্রদান করে। যদি পেশযোগে পড়া হয় তবে অর্থ হবে— বিবাহে খুতবা পাঠ করা। অর্থাৎ বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার মজলিসে বর-কনের দাম্পত্য জীবনে সুখস্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে কুরআন-হাদীস সংবলিত সংক্ষিপ্ত একটি ভাষণ প্রদান করা-এটা মোস্তাহাব। আর যদি 'খা' (خَاءٌ) বর্ণ যেরযোগে পড়া হয়, তবে এর অর্থ হবে— বিবাহের পয়গাম বা প্রস্তাব প্রদান করা। অর্থাৎ বরের পক্ষ হতে কনের পক্ষের কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠানো। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হাদীসের আলোকে যথাস্থানে করা হবে।

اَلشَّرْطُ : শব্দটির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিবাহের সময় কমপক্ষে দু'জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত থাকা, দু'জন সাক্ষী ব্যতীত বিবাহই বিশুদ্ধ হবে না। আলোচ্য অধ্যায়ে এ সব বিষয় সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٠٠٥ - عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ (رضـ) قَالَتْ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ حِيْنَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلٰى فِرَاشِيْ كَمَجْلِسِكَ مِنِّيْ فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ اٰبَائِيْ يَوْمَ بَدْرٍ اِذْ قَالَتْ اِحْدٰهُنَّ وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ فَقَالَ دَعِيْ هٰذِهٖ وَقُوْلِيْ بِالَّذِيْ كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩০০৫. অনুবাদ : হযরত রুবাইয়ি' বিনতে মুআওবিয ইবনে আফরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেদিন আমাকে প্রথম স্বামীর গৃহে পাঠানো হলো সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার গৃহে এসে বিছানার উপর যেমনভাবে তুমি [বর্ণনাকারী রাবী খালিদ ইবনে যাকওয়ান] আমার নিকটে বসেছ ঐভাবে তিনি বসেন। বালিকাগণ দফ বাজিয়ে বদর যুদ্ধে শহীদ আমার পিতা-পিতৃব্যের শোকগাঁথা গাচ্ছিল। ঐ বালিকাগণের একজন গেয়ে উঠল— وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ [আমাদের মাঝে একজন নবী আছেন, যিনি আগামী দিনের খবর রাখেন] এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এগুলো বলো না, ইতঃপূর্বে যা বলছিলে তাই বল। —[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কিভাবে অপরিচিতার গৃহে মহানবী ﷺ -এর প্রবেশ করা বৈধ হলো? হাদীসে উল্লিখিত রুবাইয়ি' বিনতে মুআওবিয (রা.) একজন অপরিচিতা মহিলা। সুতরাং রাসূল ﷺ কিভাবে তার ঘরে প্রবেশ করে তার বিছানায় বসলেন? অথচ অপরিচিতা মহিলার সাথে দেখা দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ প্রশ্নের সমাধানে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত জবাব পেশ করেছেন। যেমন–

১. আল্লামা আইনী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ -এর জন্য পর্দা করার অপরিহার্যতা নেই। কারণ, তিনি উম্মতের শিক্ষক ও রূহানী পিতা। তিনি বলেছেন– أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ

২. অথবা, রাসূল ﷺ এ মহিলার ঘরে তাকে আড়াল করে বসেছিলেন। সুতরাং এভাবে পর্দা লঙ্ঘিত হয় না।

৩. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, এটা ছিল পর্দার আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা।

৪. অথবা, রাসূল ﷺ বিশেষ প্রয়োজনে এভাবে বসেছিলেন। এটা তাঁর জন্য খাস।

৫. কাযী আয়ায (র.) বলেন, "لَاحِجَابَ عَنْهُ لِاَحَدٍ" যেমন অন্য এক হাদীসে এসেছে– "دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ وَنَامَ عِنْدَهَا"

৬. অথবা, উল্লিখিত মহিলা রাসূল ﷺ -এর মুহাররামাত ছিল, তাই পর্দা করার প্রয়োজন ছিল না।

৭. অথবা, রাসূল ﷺ একই বিছানায় বসেছেন তবে মাঝখানে কাপড়ের পর্দা ঝুলানো ছিল।

৮. অথবা, রাসূল ﷺ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চক্ষু নিম্নগামী করে বসেছিলেন।

حُكْمُ الْغِنَاءِ [গান গাওয়ার বিধান] : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে গান গাওয়া জায়েজ। মূলত এ প্রসঙ্গে আইম্মায়ে কেরামের মতামত নিম্নরূপ–

জমহূরের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, যে গানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের গুণকীর্তন করা হয়, যে গানের কথায় ইসলামি তাহযীব-তমদ্দুন ফুটে উঠে এবং সুকুমার বৃত্তি বিকশিত হয় তা জায়েজ।

অশ্লীল, কামোদ্দীপক ও চরিত্র বিধ্বংসী গান গাওয়া এবং শ্রবণ করা হারাম। এমনিভাবে ষোড়শী, রূপসী, তন্বী, তরুণী দ্বারা ভালো কথা সংবলিত গান পরিবেশনও জায়েজ নয়।

দলিল : হাদীসে বলা হয়েছে– اَلْغِنَاءُ وَالتَّغَنِّيْ مِنَ الْفَوَاحِشِ

আহলে জাওয়াহেরের অভিমত : আসহাবে জাওয়াহের বলেন, গান গাওয়া মুবাহ।

কতিপয় আলিমের অভিমত : তাঁদের মতে অশ্লীল গান হারাম এবং গানের কথা যদি রুচিশীল এবং চরিত্র ও সমাজ সংশোধনে সহায়ক হয়, তবে এরূপ গান হারাম নয়।

দফ বাজানোর হুকুম : ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় "دُفٌّ" বলা হয় এমন বাদ্যযন্ত্রকে যার একদিক শক্ত চামড়া দ্বারা বন্ধ থাকে আর অপরদিক খোলা থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এরূপ دُفٌّ বাজানো জায়েজ আছে কিনা? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন–

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, বিবাহ-শাদি, ঈদ, বৌ-ভাত, প্রীতিভোজ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে এরূপ دُفٌّ বাজানো জায়েজ আছে। তাঁর দলিল : قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "أَعْلِنُوْا هٰذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوْهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ".

২. আসহাবে জাওয়াহের বলেন, এরূপ دُفٌّ বাজানো মুবাহ।

৩. কেউ কেউ বলেন, সর্বাবস্থায় এরূপ دُفٌّ বাজানো হারাম।

৪. মোটকথা, এরূপ دُفٌّ বাজানো জায়েজ। তবে ঘুঙ্গুরপূর্ণ উভয়দিকে আবদ্ধ ঢোল ও বাদ্যযন্ত্র সর্বাবস্থায় হারাম।

রাসূল ﷺ -এর নিষেধের কারণ : রুবাইয়ি' বিনতে মুআওবিযের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে বালিকারা গান গাওয়ার এক পর্যায়ে বলে উঠল– وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ অর্থাৎ 'আমাদের মাঝে এমন একজন নবী আছেন যিনি আগামী দিনের সংবাদ জানেন।' এটা শুনে রাসূল ﷺ প্রতিবাদের সুরে বললেন– دَعِيْ هٰذِهٖ وَقُوْلِيْ بِالَّذِيْ كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ অর্থাৎ এটা বলো না, ইতঃপূর্বে যা বলছিলে তা-ই বল।

রাসূল ﷺ এ জন্য নিষেধ করেছেন যে, আগামীকালের সংবাদ তথা ইলমে গায়েব তো শুধুমাত্র আল্লাহই জানেন। তিনি ছাড়া গায়েবের খবর কেউ জানে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

১. وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

২. قُلْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا هُوَ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ.

অতএব, বালিকাটি যখন ইলমে গায়েব জানার বিষয়টি রাসূল ﷺ -এর প্রতিও সম্পৃক্ত করছিল– রাসূল ﷺ তৎক্ষণাৎ থামিয়ে দিয়ে এরূপ বলতে নিষেধ করলেন।

وَعَنْ ٣٠٠٦ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ زُفَّتْ امْرَأَةٌ إِلٰى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْاَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩০০৬. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার গোত্রের জনৈক পুরুষের সাথে জনৈকা রমণীর বিবাহের পরে যখন তাকে পতিগৃহে আনা হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের নিকট কি কোনো [আনন্দবর্ধক] ক্রীড়াকৌতুক-এর [উপকরণ] ছিল না? কেননা আনসারগণ ক্রীড়াকৌতুক প্রিয়। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে ক্রীড়াকৌতুক মানে উল্লিখিত দফ-বাদ্য এবং নির্দোষ গীতি-কবিতা ইত্যাদি। ফলকথা, বিবাহে গান গাওয়া জায়েজ যদি অশ্লীলতাপূর্ণ বা যৌন আবেদনমূলক না হয় এবং যুবতী মেয়ে ও মন আকর্ষণকারী যুবক দ্বারা গাওয়া না হয়। কিন্তু বাদ্য সহকারে যে কোনো গান নিশ্চিতরূপে হারাম।

وَعَنْهَا ٣٠٠٧ قَالَتْ تَزَوَّجَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ شَوَّالٍ وَبَنٰى بِيْ فِيْ شَوَّالٍ فَاَيُّ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اَحْظٰى عِنْدَهُ مِنِّيْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩০০৭. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে শাওয়াল মাসে বিবাহ করেছেন এবং আমার বাসর রজনী হয়েছে শাওয়াল মাসে। রাসূল ﷺ -এর পত্নীগণের মধ্যে আমাপেক্ষা কে অধিক [তাঁর ভালোবাসা লাভে] সৌভাগ্যবতী? –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আয়েশা (রা.)-এর এ কথা বলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক কারণ উল্লেখ করেছেন। সকল কথার সারাংশ হলো, শাওয়াল মাসে বিবাহ সম্পাদন বা পতিগৃহে আগমন অমঙ্গলের কারণ এবং দুর্ভাগ্যের লক্ষণ বলে তৎকালীন যুগে এক কুসংস্কার প্রচলিত ছিল, ঐ কুসংস্কার দূর করার উদ্দেশ্যে তিনি এ উক্তি করেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর সহধর্মিণীগণের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.) সম স্বামীপ্রেমে ধন্য আর কেউ ছিলেন না। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের বহু হাদীসে এটা পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে।

ভাষ্যকার ইমাম নববী (র.) বলেন, হাদীস হতে শাওয়াল মাসে বিবাহ সম্পাদন, পতিগৃহে গমন, বাসর আয়োজন মুস্তাহাব বলে প্রমাণিত হলো।

وَعَنْ ٣٠٠٨ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَقُّ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوْفُوْا بِهٖ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩০০৮. **অনুবাদ :** হযরত উকবা ইবনে আমির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে শর্তের মাধ্যমে তোমরা যৌনাঙ্গ হালাল করেছ, সকল শর্তের মধ্যে পূর্ণ করার হিসেবে তা অগ্রাধিকার রাখে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : শর্ত বা ওয়াদা করলে ইসলামের নির্দেশ অনুসারে তা পূরণ করতে হয় অন্যথা পাপ হবে। আর বিবাহের শর্ত হলো–মোহর, স্ত্রীর ভরণপোষণ, তার ইজ্জত-আবরুর হেফাজত ইত্যাদি প্রদান। সুতরাং যথাসময়ে এগুলো যথাযথভাবে আদায় করতে হবে।

অনেকে মনে করেন, স্ত্রীকে মোহর দিতে হবে না। সুতরাং বিরাট অংকের মোহর নির্ধারণ করতে আপত্তি কিসের? স্মরণ রাখতে হবে- যদি কেউ আকদের সময় এ নিয়ত রাখে যে মোহর দিতে হবে না, এ অবস্থায় বিবাহ শুদ্ধ হবে না। অপর এক হাদীসে এসেছে- مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً بِمَالٍ وَنَوٰى اَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ فَهُوَ زَانٍ وَمَنْ اَخَذَ دَيْنًا وَنَوٰى اَنْ لَا يَقْضِيَهُ فَهُوَ سَارِقٌ . (اَحْمَدُ)
অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো মহিলাকে মালের বিনিময়ে [অর্থাৎ মোহর দ্বারা] বিবাহ করে তা আদায় না করার নিয়ত রাখে- সে ব্যভিচারী। আর যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করে পরিশোধ না করার সংকল্প রাখে-সে চোর। -[আহমদ]

অনুরূপভাবে স্ত্রীর পক্ষ হতে স্বামীকে প্রদত্ত ওয়াদা বা শর্তসমূহ যথা- শরিয়তসম্মতভাবে আনুগত্য, পর্দা রক্ষা করে চলা, তার ঘরসংসারের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির প্রতি তাকে পূর্ণ সচেতন থাকা একান্ত কর্তব্য।

وَعَنْ ٣٠٠٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَنْكِحَ اَوْ يَتْرُكَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩০০৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- কোনো নারীকে কেউ বিবাহের পয়গাম দিলে অন্য কেউ ততক্ষণ পয়গাম দিয়ো না; যতক্ষণ না সে বিবাহ করে [তখন আর পয়গাম দেবার সুযোগ থাকবে না।] অথবা উক্ত পয়গাম পরিত্যাগ করে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

একজনের প্রস্তাবের উপর অন্যের প্রস্তাব প্রদান করা : কেউ যদি কোনো মহিলাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেয় তবে তার উপর অন্যের প্রস্তাব দেওয়া সমীচীন নয়। হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেন, এটা শিষ্টাচার ও সামাজিকতার পরিপন্থি বিধায় নিষেধ করা হয়েছে; কিন্তু অধিকাংশ ফিক্হশাস্ত্রবিদের মতে এটা হারাম। কেননা, হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। ইমাম নববী (র.) বলেন, ইজমা বা সর্ব ঐকমত্যের ভিত্তিতে এটা হারাম। তিনি প্রমাণস্বরূপ ইমাম মুসলিম (র.)-এর সংকলিত একটি হাদীস উল্লেখ করেন-

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَخْطُبَ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অবশ্য কোন অবস্থায় একজনের প্রস্তাবের উপর অন্যের প্রস্তাব দেওয়া হারাম হবে, সে ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। শাফেয়ী এবং হানাবেলাদের মতে, প্রস্তাবিতা মহিলা অথবা তার অভিভাবক যদি কারো প্রস্তাবে সরাসরি সম্মতি জ্ঞাপন করে, তবে এ অবস্থায় ঐ মেয়ের ব্যাপারে অন্যের প্রস্তাব দেওয়া হারাম; কিন্তু যদি পরিষ্কারভাবে অসম্মতি প্রকাশ করে, এ অবস্থায় হারাম নয়। আর যদি দ্বিতীয় পক্ষ এ সম্পর্কে কিছু না জানে, এমতাবস্থায়ও এটা হারাম নয়। মহিলার সম্মতি প্রকাশ যদি রোগগ্রস্ত অবস্থায় হয়ে থাকে, সে সম্পর্কে শাফেয়ীদের সঠিক অভিমত অনুযায়ী তখনও অন্যের প্রস্তাব দেওয়া হারাম নয়। হানাফী এবং মালেকীদেরও এ ধরনের একটি অভিমত পাওয়া যায়। তবে এ সম্পর্কে হানাফীদের সঠিক মতামত হলো, যদি প্রস্তাবিতা মহিলার হৃদয় প্রস্তাবকারীর উপর আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তখন অন্যের প্রস্তাব দেওয়া মাকরূহ; কিন্তু যদি আকৃষ্ট না হয়, তাহলে মাকরূহ হবে না।

আর যদি প্রস্তাবিতা মহিলা উক্ত প্রস্তাব কবুল বা প্রত্যাখ্যান কোনোটাই না করে, এমতাবস্থায় অন্যের প্রস্তাব দেওয়া বৈধ।

لِقَوْلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ خَطَبَنِىْ مُعَاوِيَةُ (رض) وَاَبُوْ جَهْمٍ فَلَمْ يُنْكِرِ النَّبِىُّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمَا بَلْ خَطَبَهَا لِاُسَامَةَ . (اَلْحَدِيْثُ)

وَعَنْهُ ٣٠١٠ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ فَاِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩০১০. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- কোনো নারী [অথবা তার পক্ষ হতে অলি] যেন তার [ধর্মীয়] ভগ্নিকে তালাক প্রদানের জন্য তার স্বামীকে না বলে, উদ্দেশ্য তার পাত্র খালি করে [নিজ পাত্র পূর্ণ করা] এবং তাকে বিবাহ করা, কারণ তার জন্য যা নির্ধারিত তা সে অবশ্য পাবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : কোনো ব্যক্তির এক স্ত্রী থাকা অবস্থায় পরে সে আরেক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে যেন এ শর্ত আরোপ না করে যে, তোমার পূর্বের স্ত্রীকে তালাক দাও, তবে আমি তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবো। এখানে 'ভগ্নি' ধর্মীয় বোন অর্থাৎ পূর্বের স্ত্রী। শরিয়তে এরূপ শর্ত অগ্রাহ্য ও বাতিল। কেননা, তার ভাগ্যে যা আছে তা আবশ্যকীয়ভাবেই পাবে। ফলে অন্যের ক্ষতি সাধনে তার কোনো প্রয়োজন নেই।

وَعَنْ ٣٠١١ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ اَنْ يُّزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهٗ عَلٰى اَنْ يُّزَوِّجَهُ الْاٰخَرُ ابْنَتَهٗ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ قَالَ لَا شِغَارَ فِى الْاِسْلَامِ ـ

৩০১১. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিগার হতে নিষেধ করেছেন। [হাদীসের অন্যতম রাবী নাফে' বলেন যে,] শিগার বলে– একজন তার কন্যাকে অন্যের সাথে এ শর্তে বিবাহ দেয় যে, সে তার কন্যাকে প্রথম ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেবে, উভয় বিবাহে কোনো মোহর থাকে না। –[বুখারী ও মুসলিম] মুসলিমের [স্বতন্ত্র] বর্ণনায় আছে– **ইসলামে** শিগারের স্থান নেই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلشِّغَارُ-এর পরিচয় ও এর বিধান : اَلشِّغَارُ [শিগার] অর্থ– উঠানো, পেশাবের সময় কুকুর পা উঁচু করে, আরবেরা তা প্রকাশ করার জন্য বলত– شَغَرَ الْكَلْبُ بِرِجْلِهٖ আলোচ্য বিবাহে যেহেতু মোহর উঠিয়ে দেওয়া হতো, সেজন্য একেও শিগার বলা হতো। সকল ইমামের মতেই এরূপ বিবাহ হারাম বা নিষিদ্ধ, তাতে কোনো দ্বিমত নেই। সকলেই বলেন, এরূপ বিবাহ সম্পাদন করলে উভয়েই গুনাহগার হবে। অবশ্য বিতর্ক এখানে যে, নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি এরূপ বিবাহ সম্পাদন করে, তবে শরিয়তের দৃষ্টিতে তখন কি ফয়সালা দেওয়া হবে?

নিকাহে শিগার সম্পাদিত হওয়ার পরের বিধান : নিকাহে শিগার হারাম বা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ এরূপ বিবাহ সম্পাদন করে, তখন শরিয়তের দৃষ্টিতে এর বিধান কি হবে? ইমামদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে–

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) প্রমুখের মতে, নিকাহে শিগার সম্পাদন করলে তা বাতিল হয়ে যাবে; কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা, ছাওরী ও মাকহুল (র.) প্রমুখের মতে এটা হারাম হওয়া সত্ত্বেও বিবাহ বহাল থাকবে, অবশ্য 'মাহরে মিছিল' ওয়াজিব হবে। তবে হাদীসে এরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ বর্ণিত হয়েছে বিধায় গুনাহগার হবে। তাঁরা বলেন, যদি কোনো বিবাহ মোহর উল্লেখ না করে সম্পাদিত হয় কিংবা মোহর দিতে হবে না বলে শর্তারোপ করা হয়, সে ক্ষেত্রে মাহরে মিছিল ওয়াজিব হয়ে যায় এবং বিবাহ সিদ্ধ বলা হয়। শিগার বিবাহেও অনুরূপ মাহরে মিছিল ওয়াজিব হয়ে নিকাহ শুদ্ধ হবে। উল্লেখ্য যে, কোনো অর্বাচীন এ কথা যেন মনে না করে যে, হাদীসে নিকাহে শিগার হারাম বা নিষেধ বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও এ সকল ইমামগণ একে উপেক্ষা করেছেন না। বস্তুত গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) সহ প্রমুখ নিকাহে শেগার বাতিল সংশ্লিষ্ট সকলকে স্থায়ীভাবে ব্যভিচারের পাপে লিপ্ত করতে চান। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রমুখগণের ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট লোকটি শরিয়তের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে একটি বিরাট পাপ করেছে বটে, এতে কোনো সন্দেহ নেই, তবুও সংশ্লিষ্ট সকলকে ব্যভিচারের পাপ হতে রক্ষা করেছেন মাত্র। কাজেই হাদীসের শব্দের ব্যবহারিক অর্থ গ্রহণযোগ্য মনে হলেও গভীর চিন্তা করলে ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর মতের যৌক্তিকতা ও তার দূরদর্শিতা ফুটে উঠে।

وَعَنْ ٣٠١٢ عَلِيٍّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩০১২. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার যুদ্ধকালীন নারীদেরকে মুত'আ বিবাহ করতে [সকলকে] এবং পালিত গাধার গোশত খাওয়া হতে নিষেধ করেছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٠١٣ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ (رضـ) قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ اَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلٰثًا ثُمَّ نَهٰى عَنْهَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩০১৩. **অনুবাদ :** হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আওতাস যুদ্ধে তিন দিনের জন্য মুত'আ বিবাহের অনুমতি দান করে পরে স্থায়ীভাবে নিষেধ করেন। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মুত'আ বিবাহ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : 'মুত'আ' অর্থ− যৎকিঞ্চিৎ বা সামান্য কিছু মাল। জাহিলিয়া যুগে সামান্য কিছু মালের বিনিময়ে সময়ের শর্তে সাময়িক বিবাহ করত। এটা মুত'আ বিবাহ নামে প্রচলিত ছিল এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে দূরদূরান্তে সফরে সময়েও মুত'আ বিবাহ মুবাহ ছিল। ৭ম হিজরিতে খায়বার যুদ্ধের সময় এটা হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অতঃপর ৮ম হিজরিতে আওতাস যুদ্ধের সময় মাত্র তিনদিনের জন্য একে মুবাহ করা হয় এরপর চিরদিনের জন্য তা হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। সুতরাং পরবর্তীকালে সমস্ত ইমামমের ঐকমত্য যে, মুত'আ বিবাহ সম্পূর্ণরূপে হারাম।

শিয়া সম্প্রদায় বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত। আকিদা-বিশ্বাসেও তাদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। তাদের মধ্যে এক সম্প্রদায়ের মতে মুত'আ বিবাহ মুবাহ। তারা বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) একে মুবাহ মনে করতেন, তাদের এ দাবি ঠিক নয়। কেননা, বিশ্বস্ত সনদসূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি উক্ত মত হতে ফিরে গেছেন।

এখানে এ কথাটিও স্মরণ রাখতে হবে যে, এটা যখন মুবাহ ছিল তখনও কেবলমাত্র সফরেই মুবাহ ছিল। যেখানে তাদের বিবিগণ তাদের সাথে থাকত না এবং তাদের পক্ষে ধৈর্যধারণ করা কষ্টকর হয়ে পড়ত। তাই সাহাবী হযরত ইবনে আবূ আমর (রা.) বলেন, যেমন মৃত্যু সঙ্কটে পতিত ব্যক্তির পক্ষে মৃত ও শূকর খাওয়া মুবাহ, তদ্রূপ মুত'আ বিবাহও মুবাহ ছিল।

মক্কা বিজয়ের পর পরই আওতাস ও হুনাইনের যুদ্ধ একই বৎসরে হয়েছিল, তাই মুত'আর ঘটনাকে কেউ কেউ মক্কা বিজয়ের সময়ের সাথে জুড়ে দিয়েছেন বস্তুত স্থান দুই হলেও সফর ছিল এক।

اَلْمُتْعَةُ-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْمُتْعَةُ শব্দটি مَتَاعٌ থেকে গঠিত। এর শাব্দিক অর্থ−

১. هُوَ مَا يُتَمَتَّعُ بِهٖ বা যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। ২. اِسْتِمْتَاعٌ বা স্বাদ গ্রহণ করা।

৩. উপভোগ করা। ৪. নিম্নের চারটি অর্থেও ব্যবহার হয়। যথা−

١. مُتْعَةُ الْحَجِّ ٢. اَلنِّكَاحُ اِلٰى اَجَلٍ ٣. مُتْعَةُ الْمُطَلَّقَاتِ ٤. مَتَاعُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِيْ مَالِهَا .

اَلْمُتْعَةُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. হেদায়া গ্রন্থের ভাষায়− هِيَ اَنْ يَّقُوْلَ لِاِمْرَأَةٍ اَسْتَمْتِعُ بِكِ كَذَا مِنْ مُدَّةٍ كَذَا مِنَ الْمَالِ كَذَا

অর্থাৎ পুরুষ কর্তৃক নারীকে এ প্রস্তাব দেওয়া যে, আমি অমুক সময় থেকে অমুক সময় পর্যন্ত এ মালের বিনিময়ে তোমাকে উপভোগ করব।

২. আল্লামা দাকীকুল ঈদ বলেন− هِيَ تَزَوُّجُ الْمَرْأَةِ اِلٰى اَجَلٍ

৩. ড. ইবরাহীম আনিসের মতে− هِيَ اَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً تَمَتَّعَ بِهَا وَقْتًا وَمَالًا

اَلْمُتْعَةُ-এর হুকুম : মুত'আ বিবাহের হুকুম নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ বিদ্যমান। যেমন−

১. আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত ও ওলামায়ে আহনাফের মতে, নিকাহে মুত'আ সর্বাবস্থায় হারাম। ৮ম হিজরিতে জিহাদে আওতাসের সময় রাসূল ﷺ এটাকে চিরকালের জন্য হারাম করেন। তাঁদের দলিল−

١. قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ .

٢. عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২. কতিপয় উগ্রপন্থি শিয়া ও রাফেযীদের মতে, মুত'আ বিবাহ মুবাহ। তাঁদের দলিল–
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاٰتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيْضَةً . (اَلْقُرْاٰنُ)

আসলে এটি বিবাহের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ আয়াত।

মোটকথা, বিবাহের উদ্দেশ্য শুধু কাম চরিতার্থ করা নয়; বরং রাসূল ﷺ -এর সুন্নত, নারী মর্যাদা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার অন্যতম উদ্দেশ্য। অতএব, ইজমা ও কিয়াসের দাবি অনুযায়ী মুত'আ বিবাহ হারাম।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٠١٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّشَهُّدَ فِى الصَّلٰوةِ وَالتَّشَهُّدَ فِى الْحَاجَةِ قَالَ اَلتَّشَهُّدُ فِى الصَّلٰوةِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبٰتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ وَالتَّشَهُّدُ فِى الْحَاجَةِ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ وَيَقْرَأُ ثَلٰثَ اٰيَاتٍ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ

৩০১৪. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নামাজের তাশাহহুদ এবং অন্যান্য কাজে তাশাহহুদ পাঠ শিক্ষাদান করেছেন। তিনি বলেন, নামাজের তাশাহহুদ হলো– اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ .... عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ [অর্থাৎ সকল প্রশংসা, সকল ইবাদত-বন্দেগি, সকল পবিত্রতা আল্লাহর নিমিত্তে, হে নবী! তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত। আমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল] এবং অন্যান্য কাজের তাশাহহুদ এই যে, ... اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ [অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আমরা তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি নিজেদের মনের কুচিন্তা হতে। আল্লাহ যাকে হিদায়েত করেন তাকে কেউ গোমরাহ করতে পারে না এবং যাকে তিনি গোমরাহ করেন তাকে কেউ হিদায়েত করতে পারে না এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।] রাবী ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন এবং তিনি তিন আয়াত পড়তেন– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ [১ম আয়াত–] تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ [অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোনো অবস্থায় মৃত্যুবরণ কর না।] [২য় আয়াত–] يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا [অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে একে অপরের নিকট প্রার্থনা কর এবং সতর্ক থাক আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।] –[৩য় আয়াত] يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَفِيْ جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ فَسَّرَ الْاٰيَاتِ الثَّلٰثَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ زَادَ ابْنُ مَاجَةَ بَعْدَ قَوْلِهٖ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَبَعْدَ قَوْلِهٖ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا وَالدَّارِمِيُّ بَعْدَ قَوْلِهٖ عَظِيْمًا ثُمَّ يَتَكَلَّمُ بِحَاجَتِهٖ وَرُوِىَ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فِيْ خُطْبَةِ الْحَاجَةِ مِنَ النِّكَاحِ وَغَيْرِهٖ)

اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا [অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল, তাহলে তিনি তোমাদের কর্মকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।] -[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারিমী এবং জামে তিরমিযীতে আছে যে, আয়াত তিনটি সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজাহ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ -এর পরে مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا শব্দ এবং نَحْمَدُهٗ -এর পরে وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا [এবং আমাদের পাপকর্ম হতে] বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন। দারিমী عَظِيْمًا -এর পরে ثُمَّ يَتَكَلَّمُ بِحَاجَتِهٖ [অতঃপর নিজের প্রয়োজন উল্লেখ করবে] বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন। শারহুস সুন্নাহ কিতাবে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন- فِيْ خُطْبَةِ الْحَاجَةِ مِنَ النِّكَاحِ وَغَيْرِهٖ [অর্থাৎ অন্যান্য কাজে যথা বিবাহ ও আরো যা কিছুতে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উল্লেখ্য যে, আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতটির উদ্ধৃতিতে 'হাফেযে কুরআন নন' এমন কোনো রাবী ভুল করেছেন। কেননা, সূরা নিসার সূচনাতে রয়েছে যে, يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا অবশ্য মোল্লা আলী কারী (র.) সন্দেহ করে বলেন যে, সম্ভবত এ ভুল সুফিয়ান ছাওরী (র.) হতে সংঘটিত হয়েছে।

আর অত্র হাদীসের প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত তিনটি বিশেষত বিবাহের খুতবায় পাঠ করা হয়ে থাকে, আর এটাই সুন্নত।

وَعَنْ ٣٠١٥ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيْهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

৩০১৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে কোনো খুতবায় [অথবা বিবাহে] আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান থাকে না, তা কর্তিত হস্তের ন্যায় [বরকতশূন্য]। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'তাশাহহুদ'-এর আভিধানিক অর্থ হলো- শাহাদত বা সাক্ষ্য দেওয়া। তবে ইসলামি পরিভাষায় এর অর্থ হলো- আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়ত ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া। এক কথায় আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূলে কারীম ﷺ -এর স্তুতি সহকারে ভাষণ দেওয়া। আর 'কর্তিত হাত' দ্বারা কল্যাণ ও বরকতশূন্য হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ কর্তিত হাত যেমন অর্থহীন, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর স্তুতিবিহীন ভাষণও অন্তঃসারশূন্য।

وَعَنْهُ ٣٠١٦ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ فَهُوَ اَقْطَعُ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৩০১৬. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোনো উত্তম কাজ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার সাথে শুরু না করা হয়, তা বরকতশূন্য। –[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ অর্থাৎ প্রত্যেক উত্তম কাজ। উল্লিখিত بَالٌ শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন, بَالٌ অর্থ– কলব বা অন্তর। তখন হাদীসাংশের অর্থ হবে– এমন কাজ, যার প্রতি অন্তর ধাবিত হয়। আবার কেউ কেউ بَالٌ অর্থ– অবস্থা ও মর্যাদা করেছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক মর্যাদা ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বস্তুত তা দ্বারা এ অর্থই বুঝানো হয়েছে। আলোচ্য পরিচ্ছেদের শিরোনামের সাথে বাহ্যত হাদীসের কোনো যোগসাজস নেই। তবে কি করে তা এখানে স্থান পেল? উত্তরে বলা যেতে পারে, হাদীসের মর্মার্থ হলো, প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন কাজ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার সাথে শুরু না করলে তা বরকতশূন্য হয়। আর বিবাহ মূলত একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন কাজ। সুতরাং তার প্রারম্ভে আল্লাহর নাম স্মরণ করার নির্দেশ পরোক্ষভাবে এ হাদীসে দেওয়া হয়েছে। অতএব, হাদীসটি আলোচ্য পরিচ্ছেদের অধীনে আনা যথাযথ হয়েছে।

وَعَنْ ٣٠١٧ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْلِنُوْا هٰذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوْهُ فِى الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৩০১৭. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা বিবাহ প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে মসজিদে সম্পাদন কর এবং তাতে দফ বাজাও। –[তিরমিযী; তিনি বলেছেন– এ হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বিবাহের ঘোষণা, দফ বাজানো ও শর্ত ইত্যাদি : পূর্বে এক হাদীসের টীকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, তবুও এখানে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হলো যে, প্রকাশ্যে ও মানুষদেরকে অবহিত করার মাধ্যমে বিবাহ সম্পাদন করা জমহূরে ওলামায়ে কেরামের মতে মোস্তাহাব। কেননা, গোপনে বিবাহ ব্যভিচারের পথ পরিষ্কার করে।

অত্র হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম মালিক (র.) বলেন, إِعْلَانٌ বা প্রকাশ্য ঘোষণা প্রদান বিবাহ সম্পাদন বৈধ হওয়ার জন্য শর্তস্বরূপ। অন্যান্য ইমামগণ বলেন, বিবাহ বৈধ হবার জন্য দুজন পুরুষের সাক্ষী শর্ত, প্রকাশ্য ঘোষণা শর্ত নয়।

وَعَنْ ٣٠١٨ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبِ الْجُمَحِىِّ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَالدُّفُّ فِى النِّكَاحِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩০১৮. **অনুবাদ :** হযরত মুহাম্মদ ইবনে হাতিব আল-জুমাহী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বৈধ ও অবৈধের মধ্যে পার্থক্য বিবাহে উচ্চ শব্দ করা ও দফ বাজানো। –[আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের শব্দ اَلصَّوْتُ যার অর্থ– শব্দ বা আওয়াজ। আল্লামা ইবনুল মালিক, মোল্লা আলী কারী ও শায়খ দেহলবী হাদীসের প্রমুখ ভাষ্যকারের মতে বর্ণিত হাদীসে আওয়াজ বা শব্দ করা মানুষের মধ্যে বিবাহের

আলাপ-আলোচনাকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং হাদীসের মর্ম হলো, একজন পুরুষ ও একজন নারীর অবৈধ মিলন সঙ্গোপনেই সাধিত হয়। অথচ বিবাহের মাধ্যমে দম্পত্তির মিলন সম্পর্কে সকলেই অবগত থাকে, এখানে গোপনীয়তার কিছুই নেই। শায়খ মুহাদ্দেসে দেহলবী (র.) বলেন, আওয়াজের সাথে দফের ব্যবহারকরণ এর অর্থ শরিয়তসম্মত গান হওয়াও অসঙ্গত নয়। তবে বর্তমানকালে বিবাহে যে ধরনের সঙ্গীত গাওয়া হয় তা সম্পূর্ণ অবৈধ।

٣٠١٩ وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَتْ عِنْدِيْ جَارِيَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ زَوَّجْتُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ اَلَا تُغَنِّيْنَ فَاِنَّ هٰذَا الْحَيَّ مِنَ الْاَنْصَارِ يُحِبُّوْنَ الْغِنَاءَ . (رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ)

৩০১৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমার তত্ত্বাবধানে এক আনসারী বালিকা ছিল; যার আমি বিবাহ সম্পাদন করেছিলাম। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আয়েশা! তোমরা কি গীত গাইলে না? অথবা তারা গীত গাইল না, আনসারী গোত্রের লোকেরা তো গীত পছন্দ করে। -[ইবনে হিব্বান]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইসলামি শরিয়ত নিরস দীন নয়, আনন্দ-আহ্লাদেরও এতে অনুমতি আছে। তবে যৌন আবেদনমূলক অশ্লীলতাপূর্ণ অরুচিসম্পন্ন গান নিশ্চিতরূপে হারাম। এক সময় বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জে বিবাহ-শাদি ইত্যাদির উৎসবে মহিলারা নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষায় গীত গাইত, যার মধ্যে অশ্লীলতা বা আপবিত্র কিছুই থাকত না। আমার ধারণা নবী করীম ﷺ এ জাতীয় গীত গাওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু আধুনিক যুগে কানফাটা ভলিয়ম দ্বারা রেকর্ডের মাধ্যমে যে সমস্ত অশ্লীল গান পরিবেশন করা হয়, তা অবৈধ ও হারাম হওয়ার মধ্যে ওলামাদের দ্বিমত নেই।

٣٠٢٠ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْاَنْصَارِ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ تُغَنِّيْ قَالَتْ لَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْاَنْصَارَ قَوْمٌ فِيْهِمْ غَزَلٌ فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُوْلُ اَتَيْنَاكُمْ اَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৩০২০. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর এক আত্মীয়া আনসারী রমণীর বিবাহ প্রদান করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [বাইর থেকে] আগমন করে [ঘটনা শুনে] বললেন, তোমরা কি মেয়েটিকে স্বামীর নিকট প্রেরণ করেছ? তারা বলল, জী হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, মেয়েটির সাথে গায়িকাও পাঠিয়েছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আনসার গোত্রের মধ্যে গীতি-প্রিয়তা বেশি, তোমরা যদি তার সাথে এমন কাউকে পাঠাতে যে গাইত- আমরা তোমাদের নিকট এসেছি, আমরা তোমাদের কাছে এসেছি, আমাদের ও তোমাদের কল্যাণ হোক। -[ইবনে মাজাহ]

٣٠٢١ وَعَنْ سَمُرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا امْرَاَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْاَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْاَوَّلِ مِنْهُمَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৩০২১. অনুবাদ : হযরত সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো মেয়েকে যদি তার দুই অলি [দুজনের পরস্পরের অজান্তে ভিন্ন ভিন্ন] বিবাহ সম্পাদন করে, তাহলে প্রথমজনের [বিবাহ] সঠিক হবে, ঐভাবে কোনো জিনিস দুজনের নিকট বিক্রয় করলে প্রথমজনের [বিক্রয়] সঠিক হবে।

-[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদীসটি মূলত بَابُ الْوَلِيِّ فِى النِّكَاحِ وَاسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ -এর অন্তর্ভুক্ত সম্ভবত অত্র পরিচ্ছেদে ভুলক্রমে এসে পড়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٠٢٢ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا اَلَا نَخْتَصِىْ فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا اَنْ نَسْتَمْتِعَ فَكَانَ اَحَدُنَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ اِلٰى اَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللّٰهِ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩০২২. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে থেকে [শত্রুর বিরুদ্ধে] জিহাদের লিপ্ত থাকতাম, ঐ সময়ে আমাদের স্ত্রীগণ সঙ্গে থাকত না, [নিজেদেরকে যৌন-তাড়না হতে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে] আমরা খোঁজা হবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলাম, তিনি তা করতে আমাদেরকে নিষেধ করলেন, অতঃপর আমাদেরকে 'মুত'আ' করার [রাবীর ধারণানুযায়ী] অনুমতি প্রদান করলেন। এতে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কাপড়ের বিনিময়ে নারীকে নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত বিবাহ করত। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কুরআন মাজীদের আয়াত يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ [অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য যে পবিত্র জিনিস হালাল করেছেন, তা তোমরা হারাম করো না] তিলাওয়াত করলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লেখ্য যে, অত্র হাদীসের আলোকে এ কথা ধারণা করা ঠিক হবে না যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) মুত'আ বিবাহকে জায়েজ মনে করতেন; বরং তিনি তখন পর্যন্ত নিষেধের হাদীস সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। মুত'আ বিবাহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

وَعَنْ ٣٠٢٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِىْ اَوَّلِ الْاِسْلَامِ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهٗ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرٰى اَنَّهٗ يُقِيْمُ فَتَحْفَظُ لَهٗ مَتَاعَهٗ وَتُصْلِحُ لَهٗ شَيْئَهٗ حَتّٰى اِذَا نَزَلَتِ الْاٰيَةُ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَاهُمَا فَهُوَ حَرَامٌ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৩০২৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মুত'আ ইসলামের প্রাথমিক যুগে [প্রচলিত] ছিল, প্রয়োজনবশত কেউ কোনো অপরিচিত স্থানে উপস্থিত হলে যত দিন তার ধারণায় সে উক্ত স্থানে থাকবে, তত দিনের জন্য সে বিবাহ করত এবং উক্ত স্ত্রীলোকটি তার সামানাদির দেখাশুনা করত ও তার খানা পাকাত। এভাবে যখন اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ [যারা নিজেদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে তাদের স্ত্রীগণ ও ক্রীতদাসীগণ এর ব্যতিক্রম] এ আয়াত নাজিল হলো হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তখন ঐ দু প্রকারের নারীগণ [-এর যৌনাঙ্গ] ব্যতীত সকল যৌনাঙ্গ হারাম হয়ে গেল। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٣٠٢٤ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى قُرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَ اَبِىْ مَسْعُوْدِنِ الْاَنْصَارِيِّ فِيْ عُرْسٍ وَاِذَا جَوَارٍ يُغَنِّيْنَ فَقُلْتُ اَيْ صَاحِبَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَهْلَ بَدْرٍ يُفْعَلُ هٰذَا عِنْدَكُمْ فَقَالَا اجْلِسْ اِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا وَاِنْ شِئْتَ فَاذْهَبْ فَاِنَّهٗ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ - (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

৩০২৪. **অনুবাদ :** হযরত আমির ইবনে সা'দ (র.) বলেন, আমি এক বিবাহে কারাযা ইবনে কা'ব ও আবূ মাসউদ আনসারী (রা.) সাহাবীদ্বয়ের সমীপে উপস্থিত হই, উক্ত বিবাহে বালিকাগণ গীত গাচ্ছিল। আমি বললাম, হে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর [শ্রদ্ধেয়] সাহাবীদ্বয়! এবং বদর যুদ্ধের মুজাহিদগণ!! আপনাদের সম্মুখে এগুলো [গান গাওয়া] হচ্ছে [আর আপনারা নিষেধ করছেন না]। তাঁরা উভয়ে বললেন, তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে আমাদের সাথে বসে শুনতে পার অন্যথায় চলে যাও। আমাদের জন্য বিবাহে আমোদ-প্রমোদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। -[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

গান ও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে আলিমদের মতামতসমূহ : বর্তমানে দেখা যায় ওলী-আউলিয়াদের মাজারে বাদ্যযন্ত্র সহকারে সঙ্গীত গাওয়া হচ্ছে নির্দ্বিধায় এবং এটাকে তারা শরিয়তের অংশ ধারণা করছে এবং ইবাদত হিসেবে করছে। আবার আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এটাকে শরিয়ত বিরোধী এবং হারাম বলে মত প্রকাশ করেছেন। ফলে বর্তমান সমাজে এটা একটি বিতর্কিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে আমরা সংক্ষিপ্তাকারে যৎকিঞ্চিৎ এখানে আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। সূরা লুকমানে রয়েছে- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (الاية) অর্থাৎ 'মানুষদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যে لَهْوَ الْحَدِيْثِ ক্রয় করে [অর্থাৎ অবলম্বন করে] যাতে লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিপথগামী করতে পারে।' এখানে لَهْو 'লাহব' অর্থ খেলাধুলা বা আনন্দ-উল্লাস ইত্যাদি যার প্রতি মানুষ সহজাত আকৃষ্ট এবং যা মানুষকে সাধারণত আল্লাহমুখি ও কল্যাণকর কাজ হতে ফিরিয়ে রাখে। আর اَلْحَدِيْثُ 'হাদীস' অর্থ- বার্তা বা কথা। একত্রে এ বাক্যের অর্থ হলো- যে কথা মানুষকে বক্তার দিকে আকৃষ্ট করে এবং অন্যদিক হতে ফিরিয়ে রাখে।

এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরআন ও হাদীস হলো আরবি ভাষায় এবং এর প্রথম সম্বোধন ছিল আরবের লোকদের প্রতি। কাজেই কুরআন ও হাদীসের কোনো আয়াত বা বাক্যের অর্থ বা ব্যাখ্যায় তাঁদের তথা সাহাবীদের অভিমতই সর্বাধিক যোগ্য, এতে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়। এরই আলোকে সাহাবীদের মধ্যে বিশিষ্ট জ্ঞানী সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ (রা.) প্রমুখগণ বলেন, এখানে لَهْوَ الْحَدِيْثِ দ্বারা 'গান'-কেই বুঝানো হয়েছে। আর তাবেয়ীদের মধ্যে হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর, কাতাদাহ, নাখয়ী, ইকরিমা, মায়মূন ইবনে মেহরান, মাকহুল ও হাসান বসরী (র.) প্রমুখগণও এর এ অর্থ করেছেন। আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে এটাই হলো সর্বোত্তম ও নির্ভরযোগ্য। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) তো হলফ করে বলেছেন যে, উক্ত ব্যাখ্যাই নির্ভুল। অপর একদল ওলামা বলেছেন- ক্রীড়ামোদী ও খেলাধুলায়মত্ত ব্যক্তিগণ যা নিয়ে মগ্ন থাকে তাই 'লাহবাল হাদীস'। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি আরও ব্যাপকভাবে আলোচনা করে বলেছেন-'গান'ও এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে রোষের সাথে বিদ্রূপ করে বলেছেন- وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ (الاية) [সূরা বনী ইসরাঈল বা ইসরা : আয়াত- ৬২]

অর্থাৎ 'যাও-তুমি তোমার আওয়াজ দ্বারা তাদের মধ্যে যাকে পার গোমরাহ কর।' রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন-এখানেও اَلصَّوْتُ 'আওয়াজ' অর্থে গানকেই বুঝানো হয়েছে।

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন- দুটি আওয়াজ অভিশপ্ত এবং অনাচারের দিকে আহ্বায়ক- বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ ও গানের সুর, এটা আনন্দ প্রকাশকালে শয়তানের আওয়াজ। এখানে সুর-লহরীকে শয়তানের আওয়াজ বলা হয়েছে।

হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মত যখন চৌদ্দটি কাজে লিপ্ত হবে তখন তাদের উপর বিপদ আপতিত হতে থাকবে। তন্মধ্যে 'যখন গায়িকা ও বাধ্যযন্ত্র রাখা হবে।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক প্রসার লাভ করবে তখন তারা বিভিন্নমুখি বিপদের শিকার হবে। [প্রকাশ থাকে যে, এখানে উম্মত (أُمَّةٌ) দ্বারা أُمَّتُ اِجَابَةٌ কালিমা ওয়ালা উম্মতকে বুঝানো হয়েছে।]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) তাঁর সুনান গ্রন্থে হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি গায়ক-গায়িকার নিকট গান শুনতে বসবে, কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত সীসা ঢালা হবে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, গান মানুষের অন্তরে নেফাক তথা কপটতার সৃষ্টি করে অর্থাৎ আল্লাহ হতে দূরে সরিয়ে রাখে।

উল্লিখিত আয়াত, হাদীস ও আছার উদ্ধৃত করার পর বিখ্যাত তাফসীরকার ও ফকীহ আল্লামা কুরতুবী (র.) [মৃত্যু ৬৭১ হিজরি] বলেন, এ সমস্ত কারণেই ওলামায়ে কেরামগণ গানকে হারাম বলেছেন। অবশ্য যে সমস্ত গানে নিষিদ্ধ জিনিসের উল্লেখ থাকে না এবং বাদ্যযন্ত্রও নেই বিবাহ ও ঈদ উৎসবে একে শরিয়ত সম্মতভাবে জায়েজ বলেছেন। কিন্তু বর্তমানকালে যেসব সূফী-সাধকরদের মাজারে বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান পরিবেশনের যে এক নতুন রীতি আবিষ্কার করা হয়েছে এটা একেবারেই হারাম, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

বিবাহের উপকারিতা : মানব জীবনে বিবাহের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। প্রেম-ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা, উন্নত চরিত্র সবকিছুরই পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে। এর গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতাগুলো হলো–

১. বিবাহ দ্বারা উন্নত চরিত্রের বিকাশ ও পবিত্রতা অর্জিত হয়। হাদীসে এসেছে– "فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ"

২. আল্লাহর বান্দা ও নবীর উম্মত বৃদ্ধি পায়। রাসূল ﷺ বলেছেন– تَنَاكَحُوا وَتَكَاثَرُوا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৩. মানসিক তৃপ্তি ও কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ বলেছেন–

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ـ

৪. পরিবার ও সমাজ গঠনে উত্তম মাধ্যম।

৫. সুখ-দুঃখে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশীদার হতে পারে।

৬. পবিত্র প্রেম-ভালোবাসার বিকাশ ঘটে। রাসূল ﷺ বলেছেন– لَمْ تَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ

৭. ব্যভিচার হ্রাস পেয়ে সুষ্ঠু সমাজ গড়ে উঠে।

৮. ইহকালের পরিতৃপ্তি সন্তান লাভ করা যায়।

৯. ব্যক্তির মাঝে মজবুত ঈমান ও দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়।

১০. সর্বোপরি রাসূল ﷺ -এর আদর্শের প্রতিফলন ঘটে।

بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ
পরিচ্ছেদ : বিবাহ নিষিদ্ধ নারীগণ সম্পর্কে

যে সকল নারীকে বিবাহ করা হারাম পবিত্র কুরআনের সূরা নিসায় ২২, ২৩ ও ২৪ আয়াতে সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপকভাবে তাদের বর্ণনা রয়েছে, এটা প্রথমত দু ভাগে বিভক্ত। যথা–

১. مُحَرَّمَاتٌ اَبَدِيَّةٌ অর্থাৎ যাদের সাথে বিবাহ চিরস্থায়ীভাবে হারাম। এরা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা–

ক. নসব বা বংশগত কারণে, যেমন– মাতা, এতে দাদি, নানি উর্ধ্বতন সকলেই অন্তর্ভুক্ত। আবার অধঃস্তন যেমন– কন্যা, কন্যার কন্যা, পুত্রের কন্যা এভাবে নিচের দিকে সকলেই অন্তর্ভুক্ত। আবার উর্ধ্বতনের কন্যা, যথা–পিতার মাতা উভয়ের কন্যা [অর্থাৎ সহোদরা ভগ্নি], পিতার কন্যা, মাতার কন্যা [অর্থাৎ বৈপিত্রেয়ী ভগ্নি ও বৈমাত্রেয়ী ভগ্নি], ভাইঝি ও ভাগ্নি প্রভৃতি এতে অন্তর্ভুক্ত। দাদা ও দাদির কন্যা, যথা– পিতার সহোদরা [অর্থাৎ ফুফু] ও পিতার বৈপিত্রেয়ী ভগ্নি। নানা-নানির কন্যা, যথা– আপন খালা, বৈপিত্রেয়ী ও বৈমাত্রেয়ী খালা প্রভৃতি।

খ. দুধের সম্পর্কের কারণে, যথা– দুধ-মা, দুধ-ভগ্নি ও এ সম্পর্কীয় দাদি-নানি প্রভৃতি। মোটকথা, রক্ত বা বংশগত কারণে যত জন নারী বিবাহ করা হারাম, দুধপান সম্পর্কের কারণেও ততজন নারীকে বিবাহ করা হারাম।

গ. শ্বশুরত্ব বা বৈবাহিক কারণে। যথা– শাশুড়ি, দাদি শাশুড়ি, নানি শাশুড়ি প্রভৃতি। পিতার স্ত্রী-বিমাতা, পুত্রের স্ত্রী-পুত্রবধূ প্রভৃতি এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। সহবাসকৃতা স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর কন্যাও সর্বাবস্থায় হারাম, চাই উক্ত কন্যা তার মায়ের সাথে এসে এ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থেকে পালিত হোক বা অন্য কোথাও পালিত হোক। তবে এ ধরনের কন্যা সাধারণত মায়ের সাথেই চলে আসে, তাই কুরআনে اَلَّتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ বাক্য উল্লেখ করা হয়েছে। [এ কথাটিও স্মরণ রাখতে হবে যে, হানাফী ওলামাদের মতে مَفْهُوْمُ مُخَالِفْ অর্থ নেওয়া জায়েজ নেই।] অর্থাৎ এ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে পালিত না হলে সে ব্যক্তি উক্ত কন্যাকেও বিবাহ করতে পারবে। এ অর্থ নেওয়া জায়েজ হবে না।

২. مُحَرَّمَاتٌ عَارِضِيَّةٌ অর্থাৎ সাময়িকভাবে হারাম। যথা– স্ত্রী ও তার বোন এবং ফুফু ও খালাকে একত্রে বিবাহ করা হারাম। অবশ্য পৃথক পৃথকভাবে বিবাহ করা হারাম নয়। অর্থাৎ স্ত্রী মৃত্যুবরণ করলে বা তাকে তালাক দিলে তার অপর বোনকে বিবাহ করা জায়েজ। অনুরূপভাবে খালা ও ফুফুর ব্যাপারে জায়েজ হবে। অন্যের বিবাহে আবদ্ধ কোনো মহিলাকে বিবাহ করা, কিংবা ইদ্দতের মধ্যে অবস্থানরতা মহিলাকে বিবাহ করা হারাম। তবে ইদ্দতের পরে [চাই ইদ্দত তালাকের হোক বা স্বামীর মৃত্যুর কারণে হোক] বিবাহ করা হারাম নয়। মুশরিক মহিলাকে ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত বিবাহ করা জায়েজ নেই। অবশ্য আহলে কিতাব নারীগণ এর বিপরীত। আর দাসীর বিবাহ ক্ষেত্রবিশেষ হারাম। আলোচ্য পরিচ্ছেদে এ প্রসঙ্গীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

৩০২৫ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩০২৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কোনো নারী ও তার ফুফুকে এবং নারী ও তার খালাকে একত্রে বিবাহ করা যাবে না। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : একই সাথে স্ত্রী হিসাবে ফুফু এবং তার ভাইঝি অথবা খালা ও তার বোনের কন্যাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা বৈধ নয়। অর্থাৎ এমন দুজন মহিলাকে একত্রে বিবাহ করা যাবে না, যাদের একজনকে পুরুষ মনে

করলে উভয়ের মধ্যে বিবাহ হারাম হয়ে যায়। অনুরূপভাবে দাসত্বের ভিত্তিতেও উপরিউক্ত সম্পর্কিত দুজন দাসীর সাথে একত্রে সহবাস করা যাবে না; কিন্তু যদি ফুফু অথবা খালা দুজনের একজন মৃত্যুবরণ করে অথবা তালাক প্রদান করা হয়, তবে অন্যজনকে বিবাহ করা যাবে।

٣٠٢٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩০২৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— বংশগত কারণে যে সকল ক্ষেত্রে বিবাহ হারাম, দুধপানের কারণেও সে সকল ক্ষেত্রে বিবাহ হারাম। —[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বংশগত কারণে যা হারাম দুধ পানের কারণেও তা হারাম, কেননা দুধ দানকারিণীর একটি অংশ হচ্ছে ঐ দুধ যা শিশু নির্দিষ্ট সময়ে পান করে থাকে। উক্ত দুধ সে পানকারী শিশুরই একটি অংশে পরিণত হয়। এ হিসেবেই নবী করীম ﷺ উক্ত বাণী প্রদান করেছেন।

এ হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে ইমাম নববী (র.) লিখেছেন— এ হাদীস দ্বারা শুধু বিবাহ-ই নিষিদ্ধ হয়নি; বরং দৃষ্টিদান, নির্জনবাস ও সফরসঙ্গিনী করারও বৈধতা দেওয়া হয়েছে। তবে নসব দ্বারা যে সমস্ত বিধান প্রয়োগ হয়, দুগ্ধ সম্পর্ক দ্বারা অনুরূপ কোনো বিধান প্রবর্তিত হয় না। যেমন তারা পরস্পর উত্তরাধিকারী হয় না এবং তাদের কারও প্রতি অপরের খোরপোশ প্রদান করাও ওয়াজিব হয় না। এ সমস্ত বিধানের ক্ষেত্রে তারা উভয়ই পরস্পর অপরিচিতের ন্যায়।

শরহুস সুন্নাহ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, উক্ত হাদীসের ভাষ্য দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের ক্ষেত্রে রেযায়ী হুরমতের মান নসবের হুরমতের ন্যায়। তাই কোনো মহিলা কোনো শিশুকে দুধপানের মেয়াদে দুধপান করালে সে শিশুর পক্ষে উক্ত মহিলা এবং তার কন্যাগণসহ নিকটাত্মীয়গণের প্রত্যেকে সেরূপ হারাম হয়ে যায়, যেরূপ তার গর্ভজাত ছেলের জন্য হারাম হয়ে যায়।

٣٠٢٧ - وَعَنْهَا قَالَتْ جَاءَ عَمِّيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ اٰذَنَ لَهُ حَتّٰى اَسْأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِيْ لَهُ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّمَا اَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ وَذٰلِكَ بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩০২৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদা আমার দুধ-চাচা আসল এবং আমার নিকটে প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত অনুমতি প্রদান করতে অস্বীকার করলাম। তিনি আগমন করলে আমি তাঁকে [এ বিষয়ে] জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, সে তো তোমার চাচা, তাকে অনুমতি দাও। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন— আমি বললাম, আমাকে তো নারী দুধ পান করিয়েছে, পুরুষে পান করায়নি। তদুত্তরে তিনি বললেন যে, তোমার চাচা [আপন চাচার ন্যায়] সে তোমার নিকটে আসতে পারে। [হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,] এ ঘটনা আমাদের উপর পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পরে সংঘটিত হয়েছে। —[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : পুরুষের সংশ্রবে বা সহবাসের ফলে নারীর স্তনে যে দুধের সঞ্চার হয়, তাকে হাদীসের ভাষায় لَبَنُ الْفَحْلِ বলে। যদি কোনো শিশু-কন্যা কোনো নারীর দুধ পান করে, তাহলে উক্ত নারীর স্বামীর সাথে বা স্বামীর পিতা কিংবা ভ্রাতার সাথে এ কন্যার বিবাহ হারাম হয়ে যায়। শরিয়তের দৃষ্টিতে এরা সকলেই এ কন্যার পিতা, দাদা ও চাচা

সাদৃশ্য হয়ে যায়। চার মাযহাবের ইমামগণ এতে একমত। আলোচ্য হাদীসই তাদের সমর্থন করে। অবশ্য তাবেয়ী সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, কাসেম, সালেম ও দাউদে জাহেরী এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন বলে কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়।

وَعَنْ ٣٠٢٨ عَلِيٍّ (رض) أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلْ لَكَ فِيْ بِنْتِ عَمِّكَ حَمْزَةَ فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ فِيْ قُرَيْشٍ فَقَالَ لَهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ حَمْزَةَ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩০২৮. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন, আপনি কি আপনার চাচা হামযার কন্যাকে বিবাহ করতে আগ্রহ রাখেন না? কেননা, সে তো কুরাইশ যুবতীগণের মধ্যে পরমা সুন্দরী। তদুত্তরে তিনি বললেন, তুমি কি জান না যে হামযা আমার দুধ-ভাই? আল্লাহ তা'আলা বংশগত কারণে যা হারাম করেছেন, দুগ্ধপান কারণেও তা হারাম করেছেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلرَّضَاعَةُ-এর আভিধানিক পরিচয় : اَلرَّضَاعَةُ শব্দটি বাবে فَتَحَ কিংবা ضَرَبَ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– شُرْبُ اللَّبَنِ مِنْ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ অর্থাৎ নারীর স্তন হতে দুধ পান করা। আরবিতে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে رَضِيْعٌ এবং দুধ দানকারিণীকে مُرْضِعَةٌ বলে। কুরআনে শব্দটির ব্যবহার রয়েছে– وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

اَلرَّضَاعَةُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরিয়তের পরিভাষায় اَلرَّضَاعَةُ হলো– مَصُّ اللَّبَنِ مِنْ ثَدْيِ الْاٰدَمِيَّةِ فِيْ وَقْتٍ مُعَيَّنٍ

দুগ্ধপানের সময়সীমা সম্পর্কে ইমামদের মতানৈক্য : প্রকাশ থাকে যে, দুগ্ধপানের সময়সীমা সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। নিম্নে কুরআন ও হাদীসের আলোকে তা আলোচনা করা হলো–

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে শিশুকে ৩০ মাস বা আড়াই বছর পর্যন্ত দুগ্ধপান করানো বৈধ।

দলিল : তিনি তাঁর মতের সমর্থনে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেছেন– حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُوْنَ شَهْرًا

তিনি বলেন, আয়াতের মধ্যে فِصَالٌ ও حَمْلٌ দুটি বস্তুর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। উভয়টির জন্য একই সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ ৩০ মাস; কিন্তু হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদীস– اَلْوَلَدُ لَا يَبْقٰى فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ হামলের সময়সীমাকে কমিয়ে দিয়েছে এবং তাই দুই বছর সাব্যস্ত হয়েছে; কিন্তু فِصَالٌ বা দুগ্ধ ছাড়ানোর সময়সীমা আড়াই বছরই বহাল থাকল।

ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.)-এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালিক ও আহমদ (র.)-এর মতে দুগ্ধপানের সময়সীমা দু-বছর।

দলিল : তাঁরা নিজেদের মতের অনুকূলে নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীস উপস্থাপন করেছেন–

١. قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ .

٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ . (دَارَقُطْنِيْ)

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে বিপরীত মত পোষণকারীদের দলিলের উত্তর : হানাফীগণ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে বিপরীত মত পোষণকারীদের দলিলের উত্তরে বলা হয়েছে যে, তাঁরা দলিল হিসেবে যে আয়াত পেশ করেছেন সে আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা নারী কর্তৃক স্বীয় ভূমিষ্ঠ শিশুকে দুগ্ধপানের সময়সীমা বর্ণনা করা হয়েছে, যা সে সন্তানের পিতা হতে ভাতা পাওয়ার বিনিময়ে পান করে থাকে। উক্ত আয়াতে দুগ্ধপান করানোর সাধারণ বিধান বর্ণিত হয়নি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসের উত্তরে হেদায়া গ্রন্থকার বলেছেন যে, উক্ত হাদীসে দুগ্ধপান করাবার বিনিময় ভাতা গ্রহণের অধিকার সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ দু-বছর পর দুগ্ধপান করানোর বিনিময় ভাতা গ্রহণের অধিকার থাকে না।

হযরত হামযা (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী :

নাম ও পরিচয় : নাম হামযা, কুনিয়াত আবূ আম্মারা। পিতার নাম আবদুল মুত্তালিব। তিনি রাসূল ﷺ -এর চাচা এবং দুধ-ভাই ছিলেন। কেননা, তাঁরা উভয়ে আবূ লাহাবের দাসী ছুয়াইবিয়্যাহ-এর দুধ পান করেছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ : তিনি নবুয়তের দ্বিতীয় বছর মতান্তরে নবুয়তের ৬ষ্ঠ বছরে ইসলামের সুশীল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ : তিনি রাসূলের সাথে মদিনায় হিজরত করেন এবং ঐতিহাসিক বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধে এমন বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন যে, একাই ৩১ জন কাফির সৈন্যের মস্তক উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

শাহাদাত : উহুদ যুদ্ধে সাময়িক বিপর্যয়ের সময় তিনি ওয়াহশী ইবনে হারব কর্তৃক নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন। অসীম বীরত্বের জন্য রাসূল ﷺ তাঁকে سيد الشهداء খেতাবে ভূষিত করেন। উহুদ প্রান্তরেই অন্যান্য শহীদদের সাথে তাঁকে দাফন করা হয়।

٣٠٢٩ - وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ (رض) قَالَتْ إِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ وَفِيْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ وَفِيْ أُخْرٰى لِأُمِّ الْفَضْلِ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ أَوِ الْإِمْلَاجَتَانِ هٰذِهٖ رِوَايَاتٌ لِمُسْلِمٍ .

৩০২৯. **অনুবাদ :** হযরত উম্মুল ফযল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একবার বা দু-বারের দুগ্ধ পানে হারাম হয় না এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন– একবার বা দু-বার চোষণে হারাম হয় না। উম্মুল ফযল (রা.)-এর অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন– একবার বা দু-বার মুখে প্রবেশ করানোর ফলে হারাম হয় না। –[তিনটি রেওয়ায়েতই মুসলিমের]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

رَضَاعَةٌ সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে ইমামাদের মতভেদ : দুগ্ধপান করা যদি দুগ্ধপানের মুদ্দতের ভেতর হয়, তবে তার দ্বারা رَضَاعَةٌ সাব্যস্ত হবে এবং দুধ-মা ও দুধ-বোনের সাথে বিবাহ চিরদিনের জন্য হারাম সাব্যস্ত হবে। তবে رَضَاعَةٌ সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে শিশুর জন্য কতবার বা কি পরিমাণ দুধপান করাতে হবে এ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো–

দাঊদ যাহিরী, আছ ছাওর ও আবূ ওবায়দা (র.)-এর অভিমত : দাঊদ যাহিরী, আবূ ছাওর এবং আবূ ওবায়দা (র.)-এর মতে তিনবার দুগ্ধপান দ্বারা رَضَاعَةٌ সাব্যস্ত হয়। তাঁদের দলিল উম্মুল ফযল বর্ণিত হাদীস–

إِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ (مُسْلِمٌ)

ইমাম শাফেয়ী, ইসহাক এবং আহমদ (র.)-এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, ইসহাক এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর এক মতে, পাঁচবার দুগ্ধপান দ্বারা رَضَاعَةٌ সাব্যস্ত হয়, এর কম নয়। তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন–

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ : كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ فَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ وَهِيَ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْاٰنِ .

ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, আওযায়ী, ছাওরী (র.)-এর প্রমুখের অভিমত : ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, আওযায়ী, ছাওরী, সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব, আলী ইবনে মাসঊদ (র.) তথা অধিকাংশ হাদীস ও ফিকহ বিশারদের মতে, দুগ্ধপান কম হোক বা বেশি হোক তা দ্বারা رَضَاعَةٌ সাব্যস্ত হবে। তাঁরা নিজেদের মতের অনুকূলে নিম্নোক্ত দলিল উপস্থাপন করেছেন–

١. قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَأُمَّهَاتُكُمُ الّٰتِيْ أَرْضَعْنَكُمْ .

٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ .

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসে رَضَاعَةٌ সাব্যস্ত হওয়ার হুকুম সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে, কোনো সংখ্যার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়নি।

জমহুরের পক্ষ হতে বিরোধীদের দলিলের উত্তর : জমহুর ওলামায়ে কেরাম বিপরীত মত পোষণকারীদের দলিলের উত্তর বলেন–

* দাউদ যাহিরী ও আবূ ছাওর (র.) প্রমুখগণ যে হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন তার উত্তর হলো, উক্ত হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন– وَكَانَ ذٰلِكَ ثُمَّ نُسِخَ

* ইমাম শাফেয়ী ও ইসহাক (র.) হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত যে হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন তার উত্তর হলো, উক্ত হাদীসে যে وَهِيَ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْاٰنِ রয়েছে তা ঐ সমস্ত লোকের কিরাআত যাদের নিকট রহিত হওয়ার খবর পৌঁছেনি। যখন খবর পৌঁছেছে তখন তারা তা পরিত্যাগ করেছে। لِاَنَّ الْقُرْاٰنَ مَحْفُوْظٌ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ ـ

٣٠٣٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ فِيْمَا اُنْزِلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهِيَ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْاٰنِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩০৩০. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআন মাজীদে [প্রথমে] নাজিল হয়েছিল وَاُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِيْ اَرْضَعْنَكُمْ [অর্থাৎ এবং তোমাদের মাতাগণ যারা তোমাদেরকে দুগ্ধপান করিয়েছেন, এ আয়াতের শেষাংশে] عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ [নির্দিষ্ট দশবার দুগ্ধপানে] হারাম করবে, পরে خَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ [নির্দিষ্ট পাঁচবার] পরিবর্তিত হয়ে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাত হয়ে যায় এবং লোকে এটা কুরআন হিসেবে পড়তে থাকে।–[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আয়েশা (রা.)-এর কথার তাৎপর্য হলো, দুধপানের কারণে দুধ-মা উক্ত সন্তানের উপর হারাম হয়ে যায়, এতে সকল ইমাম একমত। এ প্রসঙ্গে কুরআনের আয়াত হলো– وَاُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِيْ اَرْضَعْنَكُمْ এবং এ আয়াতের শেষাংশে প্রথমে عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ সংযোজিত ছিল। কিন্তু কিছু দিন পর এটা মনসুখ বা রহিত হয়ে তদস্থলে خَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ সংযোজিত হয়ে অবতীর্ণ হয়। আর এ পরিবর্তন ঘটে নবী করীম ﷺ -এর ওফাতের অল্প কছু দিন পূর্বে। পুনরায় خَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ এ অংশটিও মনসুখ হয়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয়বারের মনসুখের কথাটি অনেকের কাছে অপ্রকাশ থেকে যায়। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পরেও লোকেরা خَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ এ বাক্যটি যথারীতি কুরআনের মধ্যে পাঠ করতে থাকে। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে উক্ত অংশটি রহিত হয়ে গেছে। ব্যাপকভাবে আলোচিত হওয়ার পর সকলেই তা পড়া হতে বিরত থাকেন। অবশেষে পরবর্তীকালে مُصْحَفٌ عُثْمَانِيْ তথা কুরআন মাজীদ হতেও বাদ দেওয়া হয়। হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসের এটাই সারসংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা বা তাৎপর্য।

দুধপানের সংখ্যা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : দুগ্ধপোষ্য শিশু তার দুধমাতার দুধ স্তন হতে কতবার চোষণ করলে রেযায়াত সাব্যস্ত হবে এবং তার সাথে বিবাহ হারাম হবে– এ সম্পর্কে ওলামাদের মতভেদ রয়েছে।

জমহুরে ওলামা তথা ইমাম আবূ হানীফা, মালিক, আওযায়ী, সুফিয়ান ছাওরী, লাইছ ইবনে সা'দ ও আহমদ (র.) প্রমুখগণ বলেন, দুধপানের কোনো সংখ্যা-সীমা নেই; বরং দুধপান করা সাব্যস্ত হলেই মাহরাম হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহর বাণী– اَللَّاتِيْ اَرْضَعْنَكُمْ এ ব্যাপারে শেষ ও চূড়ান্ত। এখানে কোনো সংখ্যা-সীমার উল্লেখ নেই। কাজেই হযরত আয়েশা (রা.) যে বলেছিলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় خَمْسٌ مَعْلُوْمَاتٌ বাক্যটি পূর্বের বাক্যটির শেষাংশে সংযোজিত ছিল এবং তা পাঠও করা হতো। অতঃপর লোকেরা তা কুরআন হতে বাদ দিয়েছে", এটা একটি অবাস্তব কথা। যুক্তি ও শরিয়তের নীতিমালার বহির্ভূত মন্তব্য বলা যায়। অন্যথা তাঁর কথার প্রেক্ষিতে এ অর্থ দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর কুরআনের আয়াত বা আয়াতাংশের পরিবর্তন ঘটেছে। [নাউযু-বিল্লাহ] অথচ এটা কুরআনের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা ও সর্বযুগের উম্মতের ইজমার সম্পূর্ণ বিপরীত।

আর হযরত আয়েশা (রা.)-এর কথাটি خَبَرْ وَاحِدْ বৈ কিছুই নয়। সুতরাং একে কুরআনের আয়াতের সাথে জুড়ে দেওয়া নীতিমালার বহির্ভূত। এ ছাড়া বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণিত এবং মুসলিমে হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসেও কোনো সংখ্যার উল্লেখ নেই। এটা ছাড়া 'হারাম' হওয়ার কারণ যখন দুধপান করাই, কাজেই এতে সংখ্যা সীমা নির্ধারণ করাই অযৌক্তিক।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী, ইসহাক, ইবনে হাযম ও দাউদে যাহেরী (র.) প্রমুখগণ বলেন, দুগ্ধপানের সংখ্যা সীমা নির্ধারিত। তবে কেউ বলেন, পাঁচবার, আবার কেউ বলেন, তিনবার চুষলে হারাম হবে। কিন্তু তাদের দলিল স্পষ্ট ও বোধগম্য নয়। অবশ্য তারা হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণিত خَمْسُ مَعْلُوْمَاتٌ -কে দলিল হিসাবে গ্রহণ করেন এবং বলেন, উক্ত আয়াতটির পাঠ [তেলাওয়াত] মনসুখ হলেও এর হুকুম বলবৎ রয়েছে– অথচ তাঁদের এ দাবির সমর্থনে কোনো প্রমাণ নেই। পরিশেষে ফকীহ আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেছেন– হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস সনদসূত্রে সহীহ হলেও ভাবগত ও বাস্তবতার নিরিখে সহীহ নয়।

৩০৩১ وَعَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَكَاَنَّهُ كَرِهَ ذٰلِكَ فَقَالَتْ اِنَّهُ اَخِىْ فَقَالَ انْظُرْنَ مِنْ اِخْوَانِكُنَّ فَاِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩০৩১. অনুবাদ : উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার গৃহে প্রবেশ করেন, ঐ সময়ে তিনি আমার নিকট একজন [অপরিচিত] পুরুষকে দেখতে পেয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। আমি বললাম, সে তো আমার [দুধ] ভাই, তদুত্তরে তিনি বললেন–কে তোমার দুধ ভাই, তা সতর্কতার সাথে খেয়াল কর। কেননা, দুধের বিধান দুধপানের ক্ষুধার চাহিদাকালীন প্রযোজ্য হবে, [অর্থাৎ যে বয়স পর্যন্ত শিশুর দুধপানের প্রয়োজনীয়তা থাকে ঐ বয়সের মধ্যে দুধ পানের ফলে বিবাহ হারাম হওয়া ও সামনে আসা-যাওয়ার অনুমতির বিধান প্রযোজ্য হবে, ঐ বয়সের পরে পান করলে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না]। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে ১ম প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, দুগ্ধপানের বিধানের জন্য বয়সের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা পালিত হবে কি? না যে কোনো বয়সে দুগ্ধপান করলে এ বিধান প্রযোজ্য হবে? এতদসম্পর্কে মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামগণ ও প্রায় সকল সাহাবী, তাবেঈন ও ইমামগণের অভিন্ন মত হলো যে, দুগ্ধপানের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে যদি কোনো শিশু কোনো নারীর দুগ্ধ পান করে, তবে এতদসম্পর্কীয় বিধান [বিবাহ হারাম হওয়া, সম্মুখে আসা-যাওয়ার অনুমতি ইত্যাদি] বলবৎ হবে, ঐ নির্দিষ্ট বয়সের পরে যদি কেউ কোনো নারীর দুধপান করে, তবে পান করা বৈধ হবে না এবং এর ফলে এতদসংক্রান্ত বিধানও প্রযোজ্য হবে না। কুরআন মাজীদের ২ : ২৩৩ [২ বছর], ৪৬ : ১৫ [ত্রিশমাস] আয়াতসমূহে দুগ্ধপানের নির্দিষ্ট সময়সীমার উল্লেখ রয়েছে এবং আলোচ্য বুখারী-মুসলিমের বর্ণিত হাদীস, আবূ দাউদে বর্ণিত হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.)-এর হাদীস, তিরমিযীতে বর্ণিত হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর প্রভৃতি হাদীসসমূহ হতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নির্দিষ্ট বয়স সীমার বাইরে দুগ্ধপানে সংশ্লিষ্ট বিধান প্রযোজ্য হবে না। এর বিপরীতে হযরত আয়েশা (রা.), হাফসা (রা.)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক তাবেয়ী ও ইমামগণ এ মতের সমর্থক। তন্মধ্যে দাউদে যাহিরী ও আল্লামা ইবনে হাযমের নাম উল্লেখযোগ্য। তারা দুগ্ধপানের বিধান বলবৎ হওয়ার জন্য বয়সের কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট করতে চান না এবং নিজেদের মতের সমর্থনে বুখারী ও আবূ দাউদ প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হুযায়ফা (রা.)-এর পালিত পুত্র সালিম (রা.)-এর স্ত্রী সাহলাকে প্রদান করেন এবং তদনুযায়ী দুগ্ধপানের বিধান প্রতিপালনের অনুমতি দেন; কিন্তু জমহুরের পক্ষ হতে এ হাদীসের উত্তরে বলা হয় যে, আবূ দাউদের বর্ণনায় পরিষ্কার বুঝা যায়– এ ব্যতিক্রমধর্মী নির্দেশ শুধুমাত্র সালিমের জন্য দেওয়া হয়েছিল, এটা সাধারণ আইন নয়।

আলোচ্য প্রসঙ্গে ২য় প্রশ্ন হচ্ছে যে, দুগ্ধপানের বয়সের সময়সীমার পরিমাণ সম্পর্কে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বিশিষ্ট দুই ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে [ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে এর সমর্থনে একটি উক্তি বর্ণনা করা হয়।] উক্ত সময়সীমা দু-বছর। এ মতের সমর্থনে কুরআন মাজীদের ২ : ২৩৩ আয়াত পেশ করা হয়ে থাকে। উক্ত আয়াতে সুস্পষ্টভাবে দুগ্ধপানের সময়সীমা দু-বছর উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রসিদ্ধ উক্তি [তাঁর অন্যতম ছাত্র ইমাম যুফার (র.) এ মতের সমর্থক] দুগ্ধপানের ঊর্ধ্ব সময়সীমা ত্রিশ মাস [আড়াই বছর]। এ মতের সমর্থনে কুরআন মাজীদের ৪৫ : ১৫ আয়াত পেশ করা হয়, উক্ত আয়াতে গর্ভধারণ ও স্তন্যদান ছাড়াতে ত্রিশ মাসের উল্লেখ আছে। এতে উভয়ের সময়সীমারূপে বর্ণিত হয়েছে। এটা সাহিত্য রীতি ও বর্ণনা রীতির নিয়ম। [অবশ্য গর্ভধারণ সম্পর্কে অপর বর্ণনার দ্বারা দু-বছর সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয়।] ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এ মতের সমর্থকগণ পূর্বোল্লিখিত ২ : ২৩৩ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, উক্ত আয়াতে দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে দুগ্ধপান করাতে পিতার উপর বিনিময় প্রদানের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, সাধারণত দুগ্ধপান সম্পর্কে নয়।

وَعَنْ ٣٠٣٢ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ (رض) اَنَّهُ تَزَوَّجَ اِبْنَةً لِاَبِىْ اِهَابِ بْنِ عَزِيْزٍ فَاَتَتْ اِمْرَاَةٌ فَقَالَتْ قَدْ اَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِىْ تَزَوَّجَ بِهَا فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا اَعْلَمُ اَنَّكِ قَدْ اَرْضَعْتِنِىْ وَلَا اَخْبَرْتِنِىْ فَاَرْسَلَ اِلَى اٰلِ اَبِىْ اِهَابٍ فَسَاَلَهُمْ فَقَالُوْا مَا عَلِمْنَا اَرْضَعَتْ صَاحِبَتُنَا فَرَكِبَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَسَاَلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৩০৩২. অনুবাদ : হযরত ওকবা ইবনুল হারিছ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আবূ ইহাব ইবনে আযীযের কন্যাকে বিবাহ করলে জনৈকা স্ত্রীলোক এসে বলল, আমি ওকবা এবং তার স্ত্রীকে দুধপান করিয়েছি [অর্থাৎ তারা পরস্পর ভাই-বোন, কাজেই তাদের বিবাহ বৈধ নয়]। হযরত ওকবা (রা.) উক্ত স্ত্রীলোকটিকে বললেন, তুমি যে আমাকে দুধ পান করিয়েছ তা আমি জানি না এবং ইতঃপূর্বে তুমি বলনি। অতঃপর তিনি স্ত্রীর গোত্রের নিকট লোক পাঠিয়ে এতদবিষয়ে জানতে চাইলেন, উত্তরে তারা বলল যে, ঐ স্ত্রীলোকটি যে আমাদের কন্যাকে দুধ পান করিয়েছে, তা আমরা জানি না। অতঃপর হযরত ওকবা (রা.) [মক্কা হতে] সওয়ারিযোগে মদিনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমেত উপস্থিত হলেন এবং [বিস্তারিত বিবরণ শুনিয়ে] এতদসম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে চাইলেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কিভাবে [তুমি ঐ স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য জীবনযাপন করবে] যখন একটি কথা [তোমাদের উভয়ের দুধপানের ব্যাপারে] উঠেছে? এতদশ্রবণে ওকবা (রা.) ঐ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করলেন এবং ঐ স্ত্রী অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.) প্রমুখগণ বলেন, কেবলমাত্র স্তন্যদায়িনী একজন মহিলার সাক্ষী ও শপথে 'রিযায়াত' [দুগ্ধপানের] সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য হবে। আলোচ্য হাদীসই তাঁদের দলিল। কিন্তু জমহুর ওলামাগণ বলেন, দুজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুজন নারীর সাক্ষ্য ব্যতীত গ্রহণযোগ্য হবে না।

আলোচ্য হাদীসের উত্তরে বলা যায় এটা আইনত বিধান হিসাবে নয়, বরং তাকওয়া ও পরহেজগারি এবং মনের সন্দেহ নিরসনের দৃষ্টিতেই উক্ত মহিলাটিকে পরিত্যাগ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে লোকেরা অযথা দুর্নাম করতে না পারে। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বর্ণনাভঙ্গিও এর প্রতি ইঙ্গিত করে।

وَعَنْ ٣٠٣٣ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا اِلٰى اَوْطَاسٍ فَلَقُوْا عَدُوًّا فَقَاتَلُوْهُمْ فَظَهَرُوْا عَلَيْهِمْ وَاَصَابُوْا لَهُمْ سَبَايَا فَكَاَنَّ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ تَحَرَّجُوْا مِنْ غَشَيَانِهِنَّ مِنْ اَجْلِ اَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ ذٰلِكَ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اَىْ فَهُنَّ لَهُمْ حَلَالٌ اِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩০৩৩. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইন যুদ্ধের সময় একটি সেনাবাহিনী আওতাস [তায়েফের নিকটবর্তী একটি এলাকার নাম] অভিমুখে প্রেরণ করেন। তারা শত্রুর উপর জয়লাভ করেন এবং [মালে গনীমতের মধ্যে] কিছুসংখ্যক দাসী [পরবর্তীতে দাসীতে রূপান্তরিত হয়] তাদের হস্তগত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতিপয় সাহাবী ঐ সকল দাসীর সাথে সহবাস করতে ইতস্তত বোধ করেন। কেননা, [পরাজিত ও পলাতক শত্রুদের মধ্যে] তাদের মুশরিক স্বামীগণ জীবিত রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাজিল করলেন- وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ অর্থাৎ এবং নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ [৪:২৪]। [বর্ণনাকারী বলেন,] অতঃপর ঐ সমস্ত দাসী তাদের মালিক পক্ষে বৈধ হয়ে গেল, অবশ্য যখন তাদের ইদ্দত [এক ঋতু বা এক মাস] অতিবাহিত হলো। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

যুদ্ধে বন্দিনী মহিলাদের সম্পর্কে বক্তব্যসমূহ :

১. যুদ্ধে বন্দিনীদের উপভোগ করা তথা তাদের যৌনাঙ্গ ব্যবহার করা তখনই বৈধ যখন আমীরুল মু'মিনীন বা সেনাপতি বন্দিনীদেরকে যোদ্ধাদের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বণ্টন করে দেয় এবং বণ্টন দ্বারা তাদের মালিকানা স্থাপিত হয়। অতঃপর যে যার মালিকানায় এসেছে কেবলমাত্র সে তার সাথে যৌনাচার করতে পারবে।

২. তার কাফির স্বামী দারুল হারবে অর্থাৎ অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান করার কারণে তাদের মধ্যকার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, এটাই ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর মত।

৩. স্বামী-স্ত্রী উভয় একত্রে বন্দী হলে তাদের বিবাহ বন্ধন অটুট থাকে।

৪. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বণ্টিত হওয়ার পরও যৌনাঙ্গ ব্যবহার করার অধিকার ঐ মালিকের নেই যে পর্যন্ত সে মুসলমান হয়, ফলে বন্দী হওয়ার কারণে তাদের কাফেরী বিবাহ ছিন্ন হয়ে যায় না, তবে মুসলমান হলেই তা ছিন্ন হয়ে যাবে। তাঁর মতে আলোচ্য কুরআনের আয়াত ও হাদীসে যে সকল বন্দিনীর সাথে যৌনাচার করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে তারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল এবং কুফরি অবস্থায় বিবাহ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

৫. বিবাহ বন্ধন দ্বারা স্ত্রীর উপর স্বামীর যে অধিকার স্থাপিত হয় তা হলো কেবলমাত্র তাকে উপভোগ করার অধিকার, মনোরঞ্জন করার অধিকার, শরীরের অধিকার নয়। ফলে স্বামী আপন স্ত্রীর শুধুমাত্র যৌনাঙ্গ ব্যবহার করতে পারবে, বিক্রয় করতে পারে না, কিন্তু বাঁদি-দাসীর উপর মালিকের যে অধিকার স্থাপিত হয় তা শরীরের অধিকার। অতএব, প্রথম অধিকার অপেক্ষা এ অধিকার সবল ও পূর্ণতর। সুতরাং দাসীর সাথে সহবাস করার জন্য বিবাহের প্রয়োজন হয় না।

৬. দাসী উপভোগ করার ব্যাপারে সংখ্যার সীমাবদ্ধতা নেই। তাই বলে শুধু দাসীর বহর রেখে বিলাসিতা করা ইসলাম সমর্থন করে না। খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবী ও তাবেয়ীনদের মধ্যে কেউই এরূপ করেননি। অধুনা বিশ্বে এ মাসআলার প্রয়োজন না থাকলেও পরবর্তী কোনো সময়ে হতে পারে তাই আলোচনা করা হলো।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٠٣٤ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا اَوِ الْعَمَّةُ عَلٰى بِنْتِ اَخِيْهَا وَالْمَرْأَةُ عَلٰى خَالَتِهَا اَوِ الْخَالَةُ عَلٰى بِنْتِ اُخْتِهَا لَا تُنْكَحُ الصُّغْرٰى عَلَى الْكُبْرٰى وَلَا الْكُبْرٰى عَلَى الصُّغْرٰى - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَ رِوَايَتُهُ اِلٰى قَوْلِهِ بِنْتِ اُخْتِهَا)

৩০৩৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক পুরুষের জন্য ফুফুকে বিবাহ করে ভাইঝিকে, ভাইঝিকে বিবাহ করে ফুফুকে, খালাকে বিবাহ করে তার বোনঝিকে অথবা বোনঝিকে বিবাহ করে খালাকে [একত্রে] বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন; কনিষ্ঠাকে জ্যেষ্ঠার উপরে, জ্যেষ্ঠাকে কনিষ্ঠার উপরে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ, দারিমী ও নাসায়ী শেষ বাক্যটি بِنْتِ اُخْتِهَا পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে 'ছোট' অর্থে ভাইঝি, বোনঝি এবং 'বড়' অর্থে ফুফু বা খালাকে বুঝানো হয়েছে। বস্তুত পূর্বে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞাকে পূর্ণ গুরুত্ব প্রদানের জন্যই এ বাক্যটিকে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ নিষেধাজ্ঞা বা একত্রিকরণ কোনো ব্যক্তি স্ত্রী হিসাবে একই সময়ে বিবাহ বন্ধনে রাখা হারাম। কিন্তু একজনের মৃত্যু বা বিচ্ছেদ হলে স্বতন্ত্রভাবে বিবাহ করা হারাম বা নিষেধ নয়। ফিক্‌হের কিতাবসমূহে এ মাসআলাটির মূলনীতি হিসাবে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'এমন দুই মহিলাকে কোনো ব্যক্তি একই সময়ে বিবাহ করতে পারে না– যাদের কোনো একজনকে পুরুষ সাব্যস্ত করা হলে অপরজনের সাথে বিবাহ শরিয়ত সম্মত নয়।' যেমন– ফুফুকে পুরুষ সাব্যস্ত করলে সে ভাইঝির জন্য হবে চাচা,

আর ভাইঝিকে পুরুষ সাব্যস্ত করলে সে হবে তার জন্য ভাতিজা, অথচ তাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ হারাম। অনুরূপভাবে খালা-বোনঝির মধ্যেও কিয়াস করতে হবে।

وَعَنْ ٣٠٣٥ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) قَالَ مَرَّ بِيْ خَالِيْ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نَيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ فَقُلْتُ اَيْنَ تَذْهَبُ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ اِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةَ اَبِيْهِ اٰتِيْهِ بِرَأْسِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ وَلِلنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيِّ فَاَمَرَنِيْ اَنْ اَضْرِبَ عُنُقَهُ وَاٰخُذَ مَالَهُ وَفِيْ هٰذِهِ الرِّوَايَةِ قَالَ عَمِّيْ بَدَلَ خَالِيْ .

৩০৩৫. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমার মামা আবূ বুরদা ইবনে নায়ারকে পতাকা হাতে কোথাও যেতে দেখলাম, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় চলছেন? উত্তরে বললেন, এক ব্যক্তি তার বিমাতাকে বিবাহ করেছে, তার মাথা আনার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পাঠিয়েছেন। -[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

আবূ দাউদের অপর বর্ণনায় এবং নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারিমীতে উল্লেখ হয়েছে যে, আমাকে তাকে হত্যা করার এবং ধনসম্পদ ছিনিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছেন। এ বর্ণনায় মামার পরিবর্তে আমার চাচার উল্লেখ আছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অত্র হাদীসে হত্যার আদেশ এ জন্য প্রদান করা হয়েছিল যে, অন্ধকার যুগের প্রথানুযায়ী লোকটি বিমাতাকে বিবাহ করা বৈধ মনে করার ফলে মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগী হয়ে গিয়েছিল। ধর্মত্যাগীর শাস্তি তাকে হত্যা করা। অবশ্য কেউ যদি বৈধ মনে না করে নিষিদ্ধ নারীগণের কাউকেও বিবাহ করে, তবে সে ধর্মত্যাগী হবে না। যদি শরিয়তের নির্দেশ জেনেশুনে করে, তবে সে ব্যভিচারী এবং তাকে ব্যভিচারের শাস্তি [বিবাহিতাকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলা, অবিবাহিতাকে একশত বেত্রাঘাত] প্রদান করা হবে, আর মাসআলা না জেনে করলে সঙ্গে সঙ্গে উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। অবশ্য বর্তমানে এরূপ আর অবকাশ কোথায়? সেহেতু কাজি বা বিচারক তাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করতে পারেন।

وَعَنْ ٣٠٣٦ اُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ اِلَّا مَا فَتَقَ الْاَمْعَاءَ فِى الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৩০৩৬. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঐ সময়ের দুগ্ধ পানের ফলে বিবাহ নিষিদ্ধ হবে, যে সময়ের দুগ্ধপান পাকস্থলীতে প্রবেশ করে [অর্থাৎ শিশুর খাদ্যরূপে ব্যবহার হয় এবং দুধপান বন্ধ করার পূর্বে হয়]। -[তিরমিযী]

وَعَنْ ٣٠٣٧ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجِ نِ الْاَسْلَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّيْ مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ فَقَالَ غُرَّةٌ عَبْدٌ اَوْ اَمَةٌ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৩০৩৭. অনুবাদ : হযরত হাজ্জাজ ইবনে হাজ্জাজ আসলামী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে আমি দুধপানের হক আদায় করতে পারি? উত্তরে তিনি বললেন, একটি উত্তম দাস বা দাসী [দান করে তুমি তোমার দুধমাতার দুধের হক আদায় করতে পার]। -[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সে যুগে আরবসমাজে ধাত্রী বা দুধমাতা দ্বারা সন্তানদেরকে দুগ্ধপান করানোর প্রথা প্রচলন ছিল। একদা অত্র হাদীসের রাবী হাজ্জাজ ইবনে হাজ্জাজ আসলামীর পিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আরজ করলেন,

ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি কোন বস্তুর বিনিময় আমার দুধমাতার হক আদায় করতে পারি? রাসূল সাহাবীর প্রশ্নের উত্তরে বললেন, তুমি একটি উত্তম দাস বা দাসী দুধমাতাকে দান করে তার হক আদায় করতে পার। মূলত দুধের যথার্থ হক আদায়যোগ্য নয়। কেননা, দুধের দ্বারাই শিশুর রক্ত-মাংস এবং শারীরিক অবয়ব বেড়ে উঠে। জীবনের বিরাট অংশ দুধের সাথে সম্পৃক্ত। এ দুধের বিনিময় নয় বরং ধাত্রী-মাতাকে কিছু দানের মাধ্যমে শুধু তাঁকে সন্তুষ্ট করা যায় মাত্র। হাদীসে এটাই বুঝানো হয়েছে। আর এজন্যই তো রাসূলুল্লাহ নিজের দুধমাতা হালীমা সাদীয়া (রা.)-এর কথা আমরণ সসম্মানে স্মরণ করে গেছেন।

৩০৩৮ وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ الْغَنَوِيِّ (رض) قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَتْ اِمْرَأَةٌ فَبَسَطَ النَّبِيُّ ﷺ رِدَاءَهُ حَتَّى قَعَدَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا ذَهَبَتْ قِيْلَ هٰذِهِ أَرْضَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩০৩৮. **অনুবাদ** : হযরত আবূ তোফাইল গানাবী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ -এর নিকট বসেছিলাম এমন সময় এক রমণী আগমন করল, রাসূলুল্লাহ তাঁর [শরীরের] চাদর বিছিয়ে দিলেন, উক্ত রমণী তার উপর উপবেশন করল। যখন সে প্রস্থান করল, তখন কেউ বলল, এ রমণী রাসূলুল্লাহ -কে দুগ্ধপান করিয়েছেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাবী পরিচিতি : আবূ তোফাইল কুনিয়াত বা উপনাম। তাঁর প্রকৃত নাম– আমির। সর্বজন স্বীকৃত ঐতিহাসিক তথ্য যে, সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষ সাহাবী যিনি দুনিয়া হতে ইন্তেকাল করেছেন। ১০২ হিজরিতে তিনি মক্কায় মৃত্যুবরণ করেছেন। নবী করীম -এর ওফাতের সময় তাঁর বয়স ছিল ৮ [আট] বৎসর। কথিত আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) হযরত আনাস ও হযরত আবূ তোফাইল আমের (রা.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করে তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

নবী করীম -এর দুধমাতা : মক্কা বিজয়ের পর বনী হাওয়াযিনের সাথে হোনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। নবী করীম -এর দুধমা হালীমা সা'দিয়া ছিলেন উক্ত গোত্রীয়া নারী। উক্ত ঘটনাটি সেই সময়ের। মোটকথা, অত্র হাদীস হতে বুঝা যায় যে, দুধমাকেও যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। আর নবী করীম যে একান্ত বিনয়ী ছিলেন তাও সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

৩০৩৯ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩০৩৯. **অনুবাদ** : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, গায়লান ইবনে সালামা আছ্ ছাকাফী ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর সাথে তাঁর ইসলাম-পূর্ব যুগে বিবাহিতা ১০ জন স্ত্রীও ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ তাঁকে বললেন, তুমি [ঊর্ধ্বে] চারজন স্ত্রীকে রেখে বাকি কয়জন পৃথক কর। –[আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কুরআনের আয়াত ও অত্র হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, একই সময়ে চারজন স্ত্রী রাখা শরিয়তসম্মত। তবে চারো বিবির সাথে সমানভাবে আচরণ করা অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বুজুর্গানে দীনের মতে একাধিক স্ত্রী রাখা শরিয়তে জায়েজ হলেও না রাখাই উত্তম। সুতরাং এক বিবির মনতুষ্টির জন্য অন্য বিবাহ না করলে ছওয়াবের ভাগী হবে।

অত্র হাদীস হতে এটাও স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই একত্রে ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের পূর্বের বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয় না এবং নতুনভাবে বিবাহ পড়াতে হবে না।

٣٠٤٠ وَعَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ (رض) قَالَ اَسْلَمْتُ وَتَحْتِيْ خَمْسُ نِسْوَةٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ فَارِقْ وَاحِدَةً وَ اَمْسِكْ اَرْبَعًا فَعَمَدْتُ اِلَى اَقْدَمِهِنَّ صُحْبَةً عِنْدِيْ عَاقِرٍ مُنْذُ سِتِّيْنَ سَنَةً فَفَارَقْتُهَا . (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৩০৪০. **অনুবাদ :** হযরত নাওফাল ইবনে মুয়াবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যে সময় ইসলাম গ্রহণ করি, তখন আমার ৫ জন স্ত্রী ছিল। এতদসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, একজনকে বিদায় কর এবং ৪ জনকে [ইচ্ছা করলে] রাখ। আমি তাদের মধ্যে যে অধিককাল আমার সাহচর্যে ৬০ বছর যাবৎ বন্ধ্যা অবস্থায় কাটিয়েছে, তাকেই বিদায় করার মনস্থ করে বিদায় করে দিলাম। −[শরহুস সুন্নাহ]

٣٠٤١ وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوْزَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَسْلَمْتُ وَتَحْتِيْ اُخْتَانِ قَالَ اخْتَرْ اَيَّتَهُمَا شِئْتَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩০৪১. **অনুবাদ :** হযরত যাহহাক ইবনে ফিরোয দায়লামী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন, আমি মুসলমান হয়েছি। আমার দু স্ত্রী পরস্পরের সহোদরা। উত্তরে তিনি বললেন, তাদের মধ্যে কোনো একজনকে গ্রহণ কর।

−[তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই একত্রে ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয় না; কিন্তু দুজনের একজন ইসলাম গ্রহণ করলে এবং অপরজন কাফির অবস্থায় থেকে গেলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর যদি একজন স্বামীর বিবাহবন্ধনে দুজন সহোদরা থাকে এবং সকলেই একসাথে ইসলাম গ্রহণ করে, এমতাবস্থায় ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতে স্বামী যাকে ইচ্ছা তাকেই রাখতে পারবে এবং অন্যজনকে তালাক প্রদান করতে হবে। আগে বা পরের সূত্র এখানে ধর্তব্য হবে না। অর্থাৎ যাকে আগে বিবাহ করেছে তাকে রাখতে হবে অথবা যাকে পরে বিবাহ করেছে তাকে রাখতে হবে; কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যদি উভয় বোনকে একই সাথে বিবাহ করে থাকে, তবে যে কোনো একজনকে বিবাহ বন্ধনে রাখা বৈধ হবে না। অর্থাৎ উভয়ের বিবাহই নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি দু বোনকে বিবাহ করা আগে পরে হয়ে থাকে, তবে যাকে আগে বিবাহ করা হয়েছে তাকেই রাখতে হবে এবং পরের জনকে তালাক প্রদান করতে হবে।

٣٠٤٢ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اَسْلَمَتْ اِمْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ قَدْ اَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِاِسْلَامِيْ فَانْتَزَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الْاٰخَرِ وَ رَدَّهَا اِلَى زَوْجِهَا الْاَوَّلِ وَفِيْ رِوَايَةٍ اَنَّهُ قَالَ اِنَّهَا اَسْلَمَتْ مَعِيْ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَ رُوِيَ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ اَنَّ

৩০৪২. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা নারী ইসলাম গ্রহণ করে [নতুন] বিবাহ করে। অতঃপর তার [পূর্ব] স্বামী এসে বলল, আমিও ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং সে [আমার স্ত্রী] আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ রাখে। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত নারীকে তার পরবর্তী স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ববর্তী স্বামীকে প্রদান করলেন। অপর বর্ণনায় আছে, স্বামী বলল, সে আমার সাথে ইসলাম গ্রহণ করে, এতে স্ত্রীকে তার নিকট ফিরিয়ে দিলেন। এটা আবূ দাউদের বর্ণনা। শরহুস সুন্নাহ গ্রন্থের বর্ণনা এরূপ− কিছুসংখ্যক স্ত্রীলোকের স্বামী-স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণের

جَمَاعَةً مِنَ النِّسَاءِ رَدَّهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ بَعْدَ اخْتِلَافِ الدِّيْنِ وَالدَّارِ مِنْهُنَّ بِنْتُ الْوَلِيْدِ بْنِ مُغِيْرَةَ كَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا مِنَ الْإِسْلَامِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ ابْنَ عَمِّهِ وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ بِرِدَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَمَانًا لِصَفْوَانَ فَلَمَّا قَدِمَ جَعَلَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسْيِيْرَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَتّٰى أَسْلَمَ فَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ وَأَسْلَمَتْ أُمُّ حَكِيْمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ إِمْرَأَةُ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِيْ جَهْلٍ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ وَهَرَبَ زَوْجُهَا مِنَ الْإِسْلَامِ حَتّٰى قَدِمَ الْيَمَنَ فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيْمٍ حَتّٰى قَدِمَتْ عَلَيْهِ الْيَمَنَ فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ فَثَبَتَا عَلٰى نِكَاحِهِمَا - (رَوَاهُ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مُرْسَلًا)

ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের পূর্ব বিবাহের কারণে স্বামীগণের নিকট ফিরিয়ে দিলেন। যদিও ধর্ম ও অবস্থানের দিক হতে পার্থক্য সূচিত হয়েছিল। ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে একজন ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার কন্যা ও সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার স্বামী ইসলাম গ্রহণের ভয়ে পলায়ন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফওয়ানকে নিরাপত্তাদানের উদ্দেশ্যে স্বীয় চাদর প্রদান করে তার চাচাতো ভাই ওয়াহাব ইবনে উমাইরকে তার নিকট প্রেরণ করেন। সাফওয়ান প্রত্যাবর্তন করলে তিনি তাকে চারমাস অবাধে যত্রতত্র বিচরণের অবকাশ প্রদান করেন। [যাতে সে মুসলমানদের সাথে মিশে তাদের চরিত্র মাধুর্য দর্শনে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়] এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার স্ত্রী তার নিকটেই থেকে যায়। ঐ স্ত্রীলোকদের মধ্যে অপর একজন হারিছ ইবনে হিশামের কন্যা ইকরিমা ইবনে আবূ জাহিলের স্ত্রী উম্মে হাকীম মক্কা বিজয়ের দিনে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাঁর স্বামী ইকরিমা ইসলাম গ্রহণের ভয়ে পলায়ন করে ইয়ামনে উপনীত হয়। তার স্ত্রী উম্মে হাকীম স্বামীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে ইয়ামনে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং স্বামীকে ইসলামের আহ্বান জানালে সে ইসলাম গ্রহণ করে। এতে তাদের বিবাহ অটুট থাকে। [ইমাম মালিক এটা মুহাম্মদ ইবনে শিহাব যুহরী হতে মুরসালরূপে বর্ণনা করেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

স্বামী-স্ত্রীর ধর্ম বা দেশ বিভিন্ন হওয়া প্রসঙ্গ : সমস্ত ইমামদের ঐকমত্য যে, স্বামী-স্ত্রী উভয় একত্রে ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের পূর্বের বিবাহ ঠিক থাকবে। কিন্তু যদি উভয়ের একজন ইসলাম গ্রহণ করে কিংবা 'দারুল হরব' তথা অমুসলিম দেশ ত্যাগ করে দারুল ইসলাম তথা মুসলিম দেশে চলে আসে, অথবা উভয়ের একজন জিহাদের মুসলমানদের হাতে বন্দী হয় ইত্যাদি অবস্থায় তাদের বিবাহ বহাল থাকা বা না থাকার ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ আছে।

ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.)-এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.) সহ অনেকের মতে একজন মুসলমান হওয়ার পর যদি অপরজন ইদ্দতের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করে তবে বিবাহ অটুট থাকবে, অন্যথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যুদ্ধে বন্দী হওয়ার ব্যাপারও তাই।

ইমাম আ'যম (র.)-এর অভিমত : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, এখানে ইদ্দতের কোনো প্রশ্ন নেই। একজন ইসলাম গ্রহণ করলে অপরজনকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হবে। গ্রহণ করলে বিবাহ অটুট থাকবে, আর গ্রহণ না করলে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, একজনের ইসলাম গ্রহণ করাই বিবাহ ভঙ্গের কারণ নয়, বরং অপরজনের অস্বীকৃতিই বিচ্ছেদের কারণ হয়েছে। আর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বন্দী হয়ে আসলে—'দেশ' পার্থক্য হয় না, তাই বিবাহ অটুট থাকবে।

আলোচ্য হাদীসে- 'ধর্ম' বিভিন্ন হওয়ার উদাহরণ হলো ওয়ালীদের কন্যা ও উম্মে হাকীমের ঘটনা; এরা যখন মুসলমান হয় তখন তাদের স্বামীরা কাফির ছিল অর্থাৎ তাদের উভয়ের মধ্যে ধর্ম বিভিন্ন ছিল। কিন্তু যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাদের ধর্ম এক হয়ে যায়। তাই তাদের বিবাহ বহাল থাকে। আর দেশ বিভিন্ন হওয়ার উদাহরণ হলো, নবী করীম ﷺ -এর কন্যা যয়নব (রা.) ও তাঁর স্বামী আবুল আসের ঘটনা। যয়নব ইসলামের প্রথম যুগেই মক্কায় মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং পরে মদিনায় হিজরত করেন, আর তাঁর স্বামী কাফির দেশ তথা মক্কায় থেকে যায়। বদর যুদ্ধে আবুল আস বন্দী হয়ে আসলে যয়নব নিজের মাল হতে মুক্তিপণ পরিশোধ করে স্বামীকে কয়েদ হতে মুক্ত করে নেন। এতে আবুল আস ইসলাম গ্রহণ করেন। অবশেষে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ধর্ম ও দেশ এক হওয়ায় তাদের বিবাহ অটুট থাকে। তবে কোনো কোনো বর্ণনায় দেখা যায়- তাঁদের বিবাহ দোহরানো হয়েছিল। মোটকথা, স্বামী-স্ত্রীর ধর্ম বা দেশ প্রথমে বিভিন্ন থাকলেও পরে যখন এক হয়ে যায় তখন তাদের পূর্ব বিবাহ অটুট থাকে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٠٤٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ حُرِّمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ ثُمَّ قَرَأَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ اَلْاٰيَةَ. (رواه البخاري)

৩০৪৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাত শ্রেণির নারীর সাথে বংশগত কারণে বিবাহ হারাম হয়েছে এবং বৈবাহিক সূত্রের কারণে সাত শ্রেণির নারীর সাথে বিবাহ হারাম হয়েছে। অতঃপর তিনি কুরআন মাজীদের ৪ : ২৩ আয়াত حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ اَلْاٰيَةَ [তোমাদের উপর তোমাদের মাতাগণকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে] শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করলেন। -[বুখারী]

وَعَنْ ٣٠٤٤ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ اِمْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهٗ نِكَاحُ اِبْنَتِهَا وَاِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا وَاَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ اِمْرَأَةً فَلَا يَحِلُّ لَهٗ اَنْ يَنْكِحَ اُمَّهَا دَخَلَ بِهَا اَوْ لَمْ يَدْخُلْ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ لَا يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ اِسْنَادِهٖ اِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ لَهِيْعَةَ وَالْمُثَنّٰى بْنُ الصَّبَاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَهُمَا يُضَعَّفَانِ فِى الْحَدِيْثِ)

৩০৪৪. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা হতে তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, স্বামী যদি বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তাহলে ঐ স্ত্রীর [পূর্বে স্বামীর পক্ষ হতে] কন্যাকে বিবাহ করা [কখনও] বৈধ নয়; পক্ষান্তরে যদি সে এখনও স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে থাকে, তবে সে [তাকে তালাক প্রদান করে ইদ্দত শেষে] ঐ স্ত্রীর [পূর্ব স্বামীর] কন্যাকে বিবাহ করতে পারে। স্বামী যদি সহবাস করে অথবা না করে উভয় অবস্থায় উক্ত স্ত্রীর মাতা [শাশুড়িকে] বিবাহ করা তার পক্ষে বৈধ নয়। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনান গ্রন্থে সংকলিত করে মন্তব্য করেন যে, বর্ণনার নীতি অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ নয়; কারণ হাদীসটি ইবনে লাহিয়াহ ও মুছান্না ইবনে সাববাহ আমর ইবনে শুয়াইব হতে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে হাদীস বর্ণনায় [বর্ণনাকারীর স্বীকৃত গুণাবলির ত্রুটি-বিচ্যুতিতে] দুর্বল।

بَابُ الْمُبَاشَرَةِ
পরিচ্ছেদ : সহবাস সম্পর্কিত অধ্যায়

اَلْمُبَاشَرَةُ : শব্দটি বাবে مُفَاعَلَةٌ-এর মাসদার। এটি بَشَرٌ মূলধাতু হতে উৎপন্ন, শাব্দিক অর্থ হলো– চামড়া, বাহ্যিকভাবে মানুষের শরীরের চামড়া দেখা যায় বিধায় মানুষকে বাশার বলা হয়, যা অন্যান্য জীবজন্তুর বিপরীত। আর اَلْمُبَاشَرَةُ-এর অর্থ হলো اَلْاِفْضَاءُ بِالْبَشْرَتَيْنِ তথা দুটি চামড়ার পরস্পর মিলন, তবে اَلْمُبَاشَرَةُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো جِمَاعٌ বা সহবাস করা যেমনি পবিত্র কুরআনে এসেছে যে, وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ অর্থাৎ তোমরা মসজিদে অবস্থানকালে সহবাস করো না, তবে আলোচ্য পরিচ্ছেদে সহবাস ও আযল সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٠٤٥ - عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ اِذَا اَتَى الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِىْ قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ اَحْوَلَ فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩০৪৫. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, ইহুদিগণ বলত, পুরুষ যদি পশ্চাৎদিক হতে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে সঙ্গম করে তাহলে সন্তান ট্যারা হয়, [তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের উদ্দেশ্যে] কুরআন মাজীদের এ আয়াত নাজিল হয়– 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব, তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।' [২ : ২২৩] –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ-এর ব্যাখ্যা : আয়াত ও হাদীস হতে প্রমাণিত হলো যে, স্ত্রীসহবাস শুধু কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্যই নয়, বরং সন্তান লাভ এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এতদসঙ্গে এটাও প্রমাণিত হলো যে, মুখ্য উদ্দেশ্য সম্পাদন করার বাধ্যবাধকতা ব্যতীত তোমাদের উপভোগের নিয়ম-পদ্ধতিতে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এ ব্যাপারে তোমাদের অভিরুচির স্বাধীনতা আছে, তবে সাবধান শস্যক্ষেত্র রূপে অর্থাৎ যৌনাঙ্গ সঙ্গম ব্যতীত অন্য কোনোভাবে উপভোগের ইচ্ছা করো না।

قَوْلُهُ اَنّٰى شِئْتُمْ-এর ব্যাখ্যা : অত্র আয়াতাংশ দ্বারা বাহ্যত বুঝা যেতে পারে, স্ত্রীর সর্বস্থানেই পুরুষাঙ্গ সঞ্চালন করে কাম-প্রবৃত্তি নিবারণ করা বৈধ– এটা ঠিক নয়; বরং আয়াতের মর্মার্থ হলো, স্ত্রীর কেবলমাত্র যৌনাঙ্গেই বিভিন্ন পদ্ধতিতে সহবাস করা যেতে পারে। ফিক্‌হের কিতাবে তার বহু পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। রাওয়াফেযদের মতে স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করা মাকরূহের সাথে বৈধ; কিন্তু ইমাম চতুষ্টয়সহ সকল উম্মতের মতে তা হারাম। আল্লামা ইবনুল মালিক (র.) বলেন, অতীত ও বর্তমানের সকল ধর্মেই তাকে হারাম ঘোষণা করেছে। অতএব, স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে সহবাস করা বৈধ নয়।

٣٠٤٦ - وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَزَادَ مُسْلِمٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا -

৩০৪৬. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআন মাজীদ নাজিলকালীন আমরা আযল করতাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

মুসলিমের বর্ণনায় আছে– আমাদের এ কাজের সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট পৌঁছলে তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْعَزْلُ-এর পরিচয় :

اَلْعَزْلُ-এর শাব্দিক অর্থ :

১. اَلْعَزْلُ শব্দটি বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- পৃথক করা, বিরত রাখা, সরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি।

২. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ অভিধানে বাবভেদে এর অর্থ নিরূপণ করা হয়েছে এভাবে-

١. عَزَلَهُ عَزْلًا : اَبْعَدَهُ وَنَحَّاهُ.

٢. اِعْتَزَلَ الشَّيْئَ وَعَنْهُ : بَعُدَ وَتَنَحّٰى . كَمَا فِى التَّنْزِيْلِ الْعَزِيْزِ "وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِىْ فَاعْتَزِلُوْنَ" .

٣. تَعَازَلَ الْقَوْمُ : تَبَاعَدَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ .

اَلْعَزْلُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. পরিভাষায় عَزْل বলা হয়- هُوَ اِخْرَاجُ الذَّكَرِ مِنَ الْفَرْجِ قَبْلَ اَنْ يَنْزِلَ الْمَنِىُّ অর্থাৎ বীর্য বের হওয়ার পূর্বে স্ত্রীর যৌনাঙ্গ হতে পুরুষাঙ্গকে বের করে আনা।

২. ইমাম নববী (র.) বলেন- هُوَ اَنْ يُسْقِطَ الْمَنِىَّ بِاَنْ يُخْرِجَ الذَّكَرَ مِنْ فَرْجِ الْمَرْاَةِ حِيْنَ قَرُبَ الْاِنْزَالُ وَقْتَ الْجِمَاعِ

৩. فِقْهُ الْاِسْلَامِىْ-এর হাশিয়ায় বলা হয়েছে- هُوَ النَّزْعُ بَعْدَ الْاِيْلَاجِ لِيُنْزِلَ الْمَاءَ خَارِجَ الْفَرْجِ

৪. কেউ বলেন- هُوَ اِخْرَاجُ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْاَةِ قَبْلَ خُرُوْجِ الْمَنِىِّ عِنْدَ الْمُجَامَعَةِ

اَلْعَزْلُ সম্পর্কে ওলামাদের মতামত : আযল করা ইসলামি শরিয়তে বিধিসম্মত কিনা, এ ব্যাপারে ওলামাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-

১. ইমাম গাযালী ও আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, অবস্থার আলোকে আযল করা জায়েজ আছে।

২. ইমাম নববী, ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে, আযল করা মাকরূহ। কেননা, এটা قَطْعُ النَّسْلِ-এর পথ।

তাঁদের দলিল :

١. قَوْلُهُ تَعَالٰى "لَاتَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ" .

٢. قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا" .

٣. قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "مَا عَلَيْكُمْ اَلَّا تَفْعَلُوْا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا وَهِىَ كَائِنَةٌ" .

٤. قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْعَزْلِ "ذٰلِكَ الْوَادُ الْخَفِىُّ وَهِىَ وَاِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ" .

৩. আহনাফসহ সর্বস্তরের প্রসিদ্ধ আলিমদের মতে, ইসলামি শরিয়তে আযল জায়েজ।

তাঁদের দলিল :

١. حَدِيْثُ جَابِرٍ "كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ" .

٢. فِىْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ "كُنَّا نَعْزِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَلَغَهُ ذٰلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا" .

٣. عَنْ عُمَرَ (رض) "اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى اَنْ يَعْزِلَ عَنِ الْحُرَّةِ اِلَّا بِاِذْنِهَا" .

৪. মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, দাসীর ক্ষেত্রে আযল করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ। এতে অনুমতির প্রয়োজন নেই। কিন্তু স্বাধীনা স্ত্রীর বেলায় অনুমতি সাপেক্ষে জায়েজ।

৩০৪৭ وَعَنْهُ قَالَ اِنَّ رَجُلًا اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ لِىْ جَارِيَةً هِىَ خَادِمَتُنَا وَاَنَا اَطُوْفُ عَلَيْهَا وَاَكْرَهُ اَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اعْزِلْ عَنْهَا اِنْ شِئْتَ فَاِنَّهُ سَيَأْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ فَقَالَ قَدْ اَخْبَرْتُكَ اَنَّهُ سَيَأْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩০৪৭. অনুবাদ : উক্ত হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকটে এসে বলল, আমার এক দাসী আছে, সে আমাদের কাজকর্ম করে। আমি তার সাথে সহবাস করি; কিন্তু সে গর্ভধারণ করুক এটা আমি চাই না, [এখন আমি কি উপায় করব?] উত্তরে তিনি বললেন, তুমি যদি চাও তবে আযল কর। তবে জেনে রেখ [এতে তোমার অভিপ্রায় অনুযায়ী কোনো ফলোদয় হবে না। কারণ] তার জন্য যা তাকদীরে নির্ধারিত তা অবশ্যই ঘটবে। কিছুকাল পরে উক্ত ব্যক্তি এসে বলল, সে দাসী গর্ভবতী হয়েছে, [আমার আযল করা সত্ত্বেও] তাই তিনি বললেন, আমিতো পূর্বেই বলেছি, তার জন্য যা তাকদীরে নির্ধারিত তা অবশ্যই ঘটবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ওলামাদের অভিমত : আযলের উপর ভিত্তি করে ঠিক একই উদ্দেশ্যে ضَبْطُ التَّوْلِيْدِ প্রণোদিত হয়েছে, যা আধুনিক বিশ্বে Brith contral বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ নামে পরিচিত। জন্ম নিয়ন্ত্রণের হুকুম সম্বন্ধে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যথা–

১. অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম ও ফুকাহায়ে ইযামের অভিমত হচ্ছে, খাদ্যাভাবের আশঙ্কায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও গর্ভনিরোধ সম্পূর্ণ হারাম। কেননা, খাদ্য তথা রিজিকের মালিক আল্লাহ তা'আলা।

তাঁদের দলিল :

١. قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا" .

٢. قَوْلُهُ تَعَالٰى "اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ" .

٣. قَوْلُهُ تَعَالٰى "لَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ" .

٤. قَوْلُهُ ﷺ "اِنَّ مَا قُدِّرَ فِى الرَّحِمِ سَيَكُوْنُ" .

২. একদল ওলামা বলেন, এটা সম্পূর্ণ জায়েজ। তাঁরা এ মাসআলাকে عَزْلٌ-এর উপর কিয়াস করে থাকেন। তাঁরা বলেন, রাসূল ﷺ عَزْلٌ-এর ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং عَزْلٌ-এর অনুরূপ জন্ম নিয়ন্ত্রণ কেন জায়েজ হবে না?

৩. কতিপয় ওলামা বলেন, নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে জন্ম নিয়ন্ত্রণ জায়েজ। শর্তগুলো হচ্ছে–

ক. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ এ কথার উপর পূর্ণ আস্থাশীল হওয়া সাপেক্ষে।

খ. ভ্রান্ত ধারণা ও অন্ধবিশ্বাস সম্পূর্ণ পরিহার করে একান্ত সৎ-সত্য নিয়তের ভিত্তিতে।

গ. চিরদিনের জন্য سِلْسِلَةِ النَّسْلِ-কে বন্ধ না রাখার শর্তে।

ঘ. মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার্থে।

কিন্তু قَطْعُ النَّسْلِ ও خَشْيَةُ الْاِمْلَاقِ-এর উদ্দেশ্যে যদি ضَبْطُ التَّوْلِيْدِ বা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা আদৌ জায়েজ হবে না।

৪. কেউ কেউ বলেন, যেহেতু عَزْلٌ ও ضَبْطُ التَّوْلِيْدِ এক জিনিস নয়; সুতরাং সাময়িকভাবে عَزْلٌ জায়েজ হলেও ضَبْطُ التَّوْلِيْدِ জায়েজ হবে না। কারণ, عَزْلٌ পদ্ধতি ব্যবহারে قَطْعُ النَّسْلِ-এর সম্ভাবনা নেই, কিন্তু ضبط التوليد পদ্ধতি ব্যবহারে قَطْعُ النَّسْلِ-এর সম্ভাবনা থাকে, যা ইসলাম অনুমোদন করে না।

৩০৪৮ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ بَنِى الْمُصْطَلِقِ فَاَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَاَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَاَرَدْنَا اَنْ نَعْزِلَ وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَظْهُرِنَا قَبْلَ اَنْ نَسْاَلَهُ فَسَاَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ اَلَّا تَفْعَلُوْا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اِلَّا وَهِىَ كَائِنَةٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩০৪৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বনূ মুসতালিক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে গমন করি। যুদ্ধে আমরা আরবীয় বংশোদ্ভূত প্রচুর দাসী লাভ করি। বহুকাল নারী সংশ্রবশূন্য থাকায় আমরা অস্বস্তিবোধ করছিলাম, ফলে আমরা নারী সংশ্রবের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে পড়লাম। [দাসীগণ গর্ভবতী হয়ে পড়বে, তাতে আমরা আর্থিক দিক হতে ক্ষতিগ্রস্ত হবো, কারণ ام الولد দাসীকে বিক্রয় করা যাবে না, এ আশঙ্কায়] আমরা আযল করা ভালো মনে করে তা করতে মনস্থ করলাম; কিন্তু আমরা পরস্পর বলাবলি করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকতে তাঁকে জিজ্ঞেস না করে এরূপ করব? অতঃপর এ বিষয় আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তোমরা আযল না করলে তোমাদের ক্ষতি নেই, কারণ কিয়ামত পর্যন্ত যত প্রাণী সৃষ্টি হওয়ার আছে, তা অবশ্যই সৃষ্টি হবে। [কাজেই তোমরা যে ধারণা করছ যে, আযল করলে সন্তান হবে না এবং না করলে সন্তান হবে– এটা অনর্থক চিন্তা।] –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বনী মুস্তালিক যুদ্ধের কাহিনী : ৫ম হিজরি সালের রজব মাসের শেষ দিকে রাসূল ﷺ -এর নিকট সংবাদ এল যে, বনী মুস্তালিকের গোত্রপতি হারিছ মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য রাসূল ﷺ বুরাইদ ইবনে হুসাইবকে সেখানে পাঠালেন। তিনি সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে ঘটনার সত্যতার রিপোর্ট দাখিল করেন।

গুপ্তচরের রিপোর্টের ভিত্তিতে রাসূল ﷺ হারিছের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মনস্থির করেন। শাবানের দু তারিখ রোববার রাসূল ﷺ এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বনী মুস্তালিকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এ অভিযানকালে যায়েদ ইবনে হারিছাকে মদিনার গভর্নরের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

পথিমধ্যে হযরত ওমর (রা.) রাসূল ﷺ -এর সম্মতি নিয়ে কাফির বাহিনীর গুপ্তচরকে হত্যা করেন। তারা এ সংবাদ পেয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। মুসলিম বাহিনী বনী মুস্তালিকে পৌঁছেই তাদের উপর আক্রমণ করেন। প্রথম আক্রমণেই তারা পিছু হটতে থাকে। এ আক্রমণে বনী মুস্তালিকের ১০ জন সৈন্য প্রাণ হারায়। নারী ও শিশুসহ অনেকেই মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয়।

মুসলমানগণ প্রচুর গনিমতের মাল প্রাপ্ত হন। এতে শত্রুবাহিনীর হাতে কোনো মুসলমান শাহাদতবরণ করেনি। পরিতাপের বিষয় হলো, হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.)-এর হাতে হিশাম ইবনে সাবাবাহ (রা.) শাহাদাতবরণ করেন। সবশেষে বিজয়ীর বেশে মুসলিম বাহিনী মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

قَوْلُهُ مَا عَلَيْكُمْ اَنْ لَّا تَفْعَلُوْا -এর **মর্মার্থ :** মহানবী ﷺ -এর বাণী- مَا عَلَيْكُمْ اَنْ لَّا تَفْعَلُوْا -এর বিশ্লেষণে ব্যাখ্যাকারিগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন-

১. মোল্লা আলী ক্বারী (র.) এর মর্ম লিখেছেন- তোমরা আযল না করলে কোনো ক্ষতি হবে না।

২. কেউ কেউ বলেছেন- لَا تَفْعَلُوْا -এর لَا শব্দটি অতিরিক্ত। এমতাবস্থায় বাক্যের অর্থ হবে আযল করাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই।

৩. কাযী আয়ায (র.) বলেছেন- কোনো কোনো বর্ণনায় مَا عَلَيْكُمْ এবং কোনো কোনো বর্ণনায় لَا عَلَيْكُمْ রয়েছে। আর لَا تَفْعَلُوْا -এর لَا অতিরিক্ত। সুতরাং এর অর্থ হবে- لَا بَأْسَ عَلَيْكُمْ فِىْ اَنْ تَفْعَلُوْا অর্থাৎ তোমরা এরূপ করলে কোনো গুনাহ হবে না।

৪. যাদের মতে আযল অবৈধ তারা বলেন, لَا বর্ণটি দ্বারা তাঁদের প্রশ্নের নফী করা হয়েছে এবং وَعَلَيْكُمْ اَنْ لَّا تَفْعَلُوْا বাক্যটি মুসতানিফা। এমতাবস্থায় এর মর্ম হবে- তোমরা এ বিষয়ে কেন জিজ্ঞেস করছ- তোমাদের কর্তব্য হলো তা না করা।

৫. ইমাম নববী (র.) বলেছেন, এ বাক্যের অর্থ হলো- আযল পরিত্যাগ করলে তোমাদের ক্ষতি নেই। কেননা, প্রত্যেকটি জন্ম সম্পর্কে আল্লাহর নির্দিষ্ট কর্মসূচি রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাদেরকে সৃষ্টি করবেন। অতএব, তোমাদের আযল করা না করা সমান কথা।

وَعَنْهُ ٣٠٤٩ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُوْنُ الْوَلَدُ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩০৪৯. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, সবটুকু পানিতে সন্তান সৃষ্টি হয় না। আল্লাহ তা'আলা যখন কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন কিছুই তা রোধ করতে পারে না। অর্থাৎ আযল করার সময় স্ত্রীর যৌনাঙ্গে বীর্যের সামান্য অংশও পতিত হলে সন্তানের জন্ম হবে, তবে কেন অনর্থক আযল করতে চাও? -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : পুরুষের বীর্যের মধ্যে অসংখ্য শুক্রকীট থাকে। এমনকি বিশেষজ্ঞরা বলেন, এক ফোঁটা বীর্যের মধ্যে কয়েক কোটি শুক্রকীট থাকে। এগুলোর আকৃতি ব্যাঙাচির মতো। এর সবগুলো আবার সক্রিয় নয়। শুধুমাত্র একটি সক্রিয় শুক্রকীট নারীর ডিম্বকোষ হতে নির্গত ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হবে, তবেই সন্তানের জন্ম হবে। এটা

আল্লাহ তা'আলার এক মহালীলা খেলা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিতে গর্ভনিরোধের বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলেও সর্বক্ষেত্রে তার সফলতা অর্জিত হয়নি। এমনকি লাইগেশন ও ভেসেকটমী করা সত্ত্বেও দেখা গেছে যে, তারপরও সন্তান জন্মগ্রহণ করে থাকে। আর এর জ্বলন্ত প্রতিধ্বনি হয়েছে আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন কোনো কিছু তা রোধ করতে পারে না।

وَعَنْ ٣٠٥٠ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رض) اَنَّ رَجُلًا جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ اَعْزِلُ عَنْ اِمْرَأَتِىْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَ تَفْعَلُ ذٰلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ اُشْفِقُ عَلٰى وَلَدِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ ذٰلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩০৫০. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আমি আমার স্ত্রীসহবাসের সময় আযল করি। এতে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি এটা কর? উত্তরে সে বলল, আমি তার সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কায় এটা করি। এতে তিনি বললেন, যদি এতে কোনো ক্ষতি হতো তাহলে পারসিক ও রোমকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হতো। [অথচ তাদের কোনো ক্ষতি হয় না। কাজেই তাতে ক্ষতি হবে না, এ ভয়ে তুমি আযল করো না।] -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اُشْفِقُ عَلٰى وَلَدِهَا-এর ব্যাখ্যা : আরবের লোকদের মধ্যে এ কথাটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল যে, কোলের সন্তান যে পর্যন্ত না দুধ ছাড়ায় সে সময়ের মধ্যে উক্ত দুধ প্রদানকারিণী নারী পুনরায় গর্ভ ধারণ করলে কোলের সন্তানটির ক্ষতি হয়, সে শারীরিক দুর্বল ও কাপুরুষ হয়। [আর এ কথাটির প্রমাণস্বরূপ বুখারীতে হযরত সালামা ইবনে আকওয়ার উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। এক যুদ্ধে তিনি নিজের বীরত্ব প্রকাশে বলেছেন- اَلْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ اَنَا ابْنُ الْاَكْوَعِ ভাবার্থ : আজই প্রমাণিত হবে কে কত বেশি মায়ের দুধ পান করেছে তথা কার মা তার সন্তানকে পূর্ণ মুদ্দত দুধ পান করাবার সুযোগ পেয়েছে? কেননা, স্তন্যদান অবস্থায় পুনরায় গর্ভ ধারণ করলে কোলের সন্তানটি পূর্ণ সময় দুধ পান করার সযোগ পায় না। ফলে সে হিরো না হয়ে ভীরু হয়। জেনে রেখ! আমি আকওয়ার পুত্র। তথা যার বীরত্ব সর্বজন স্বীকৃত।

তখন নবী করীম ﷺ তাকে বললেন, তোমার এ ধারণাটি ঠিক নয়। কেননা, ইরানী ও রোমীয়রা তো আযল করে না, অথচ দেখা যায় তাদের কোনো ক্ষতি হয় না। অত্র পরিচ্ছেদের সব কয়টি হাদীসের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখলে এ কথাটিই ফুটে উঠবে যে, 'আযল' করা ইসলাম ও স্বভাব বিরোধী পদক্ষেপ ছাড়া কিছুই নয়।

وَعَنْ ٣٠٥١ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ (رض) قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اُنَاسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَنْهٰى عَنِ الْغِيْلَةِ فَنَظَرْتُ فِى الرُّوْمِ وَفَارِسَ فَاِذَا هُمْ يُغِيْلُوْنَ اَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ اَوْلَادَهُمْ ذٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَاَلُوْهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ الْوَادُ الْخَفِىُّ وَهِىَ وَاِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩০৫১. অনুবাদ : হযরত জুদামা বিনতে ওয়াহাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদল লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বলতে শুনালাম যে, আমি গীলা বা গায়লা করা হতে নিষেধ করতে মনস্থ করেছিলাম; কিন্তু যখন পারসিক এবং রোমকদের অবস্থা জানতে পারলাম যে, তারা তাদের সন্তানের ব্যাপারে গীলা করে অথচ এটা তাদের কোনো ক্ষতি করে না [তখন এ নিষেধাজ্ঞার ইচ্ছা পরিত্যাগ করলাম।] অতঃপর লোকেরা তাঁকে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এটা পরোক্ষভাবে জীবন্ত প্রোথিত করা, যে সম্পর্কে কুরআন মাজীদের আয়াতে রয়েছে- যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? [৮১ : ৮, ৯] -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْغِيْلَةُ-এর পরিচয় : اَلْغِيْلَةُ [আল-গীলাতু] غَيْن অক্ষরে كَسْرَه অর্থ– স্তন্যদায়িনী নারীর সাথে সহবাস করা। কারো মতে, গর্ভাবস্থায় সন্তানকে দুধ পান করানো। অন্ধকার যুগে আরবদের মধ্যে এ সংস্কার বদ্ধমূল ছিল যে, এতে দুগ্ধপোষ্য সন্তানের ক্ষতি হয়। কারণ, তারা মনে করত সহবাসের বা গর্বের ফলে স্ত্রীলোকটির দুধ নষ্ট হয়ে যায়। এ ধারণা তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বদ্ধমূল ছিল, এর উপর ভিত্তি করে প্রথমে তিনি পুরুষদেরকে ঐরূপ স্তন্যদায়িনী নারীর সাথে সহবাস করতে নিষেধাজ্ঞা করার অভিপ্রায় করেছিলেন। কিন্তু যখন আরবের পার্শ্ববর্তী তৎকালীন সভ্য ও উন্নত দুই জাতি পারসিক ও রোমকদের কথা জানতে পারলেন যে, তারা এ ব্যাপারে কোনো সাবধানতা অবলম্বন করে না এবং তাতে তাদের সন্তানের কোনো ক্ষতি হয় না, তখন এ অভিপ্রায় পরিত্যাগ করলেন। যেহেতু এর সাথে শরিয়তের বিধানের কোনো সম্পর্ক ছিল না, নিষেধাজ্ঞা কোনো শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিল না বরং এটা অভিজ্ঞতা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়; সেহেতু নিষেধাজ্ঞার অভিপ্রায়ও পরে পরিত্যাগ করায় নবুয়তি জ্ঞান বা শরিয়তের বিধানের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই।

৩০৫২ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَعْظَمَ الْاَمَانَةِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَفِىْ رِوَايَةٍ اِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ الرَّجُلُ يُفْضِىْ اِلٰى اِمْرَأَتِهٖ وَتُفْضِىْ اِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩০৫২. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [যে আমানতের খিয়ানত করা হয়েছে তন্মধ্যে] কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সর্বাধিক [খিয়ানতকৃত] আমানত তা, অন্য বর্ণনায় কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলার সমীপে নিকৃষ্টতম ব্যক্তিদের অন্যতম ঐ ব্যক্তি– যে তার স্ত্রীর সাথে পরস্পর গোপন মিলনের পরে ঐ গোপনীয়তা [মানুষের মাঝে] প্রকাশ করে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : স্বামী-স্ত্রীর গোপন মিলনটি একটি পবিত্র আমানত। একে লোক সমাজে প্রকাশ করা– আমানতে খেয়ানত করা। এরূপ ব্যক্তির জন্য হাদীসে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে।

আলোচ্য হাদীসে নৈতিকতার মহান শিক্ষা প্রদান করে নির্লজ্জ ও বেহায়াপনার মূলে আঘাত হানা হয়েছে। অনেক তরুণ-তরুণীকে দেখা যায় বন্ধু-বান্ধব ও সমবয়সীদের সাথে এ ধরনের আলোচনায় অভ্যস্ত এবং এতে আনন্দও পায়। অথচ হাদীসের উল্লিখিত এই কঠোর বাণী হতে শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩০৫৩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اُوْحِىَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَلْاٰيَةَ اَقْبِلْ وَاَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ)

৩০৫৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর ওহী [কুরআন মাজীদ] নাজিল হয়– نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ (اَلْاٰيَةَ) [তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। অতএব, তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।] [২ : ২২৩] সম্মুখ দিক হতে গমন কর, পশ্চাৎদিক হতে গমন কর; কিন্তু পশ্চাৎদ্বার ও ঋতুকাল হতে বেঁচে থাক। –[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারিমী]

৩০৫৪ وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِىْ مِنَ الْحَقِّ لَا تَاْتُوا النِّسَاءَ فِىْ اَدْبَارِهِنَّ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ)

৩০৫৪. অনুবাদ : হযরত খোযাইমা ইবনে ছাবিত (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা সত্য প্রকাশে সংকোচবোধ করেন না, তোমরা তোমাদের স্ত্রীগণের পশ্চাৎদ্বারে গমন করো না। –[আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অপর এক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি কোনো জ্যোতিষী বা গণকের কাছে গেল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল এবং যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পশ্চাৎদ্বারে সঙ্গম করল, সে প্রকৃতপক্ষে আবুল কাসিম মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি নাজিলকৃত শরিয়তের বিধানের আওতা হতে বহির্ভূত হয়ে গেল। অর্থাৎ সে মুসলমান থাকল না।

৩০৫৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে ব্যক্তি অভিশপ্ত যে তার স্ত্রীর পশ্চাৎদ্বারে গমন করে। –[আহমদ, আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٠٥٥ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَلْعُوْنٌ مَنْ أَتٰى اِمْرَأَتَهُ فِيْ دُبُرِهَا - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৩০৫৬. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পশ্চাৎদ্বারে গমন করে আল্লাহ তার প্রতি [করুণার] দৃষ্টিপাত করেন না। –[শরহুস সুন্নাহ]

وَعَنْهُ ٣٠٥٦ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الَّذِيْ يَاْتِيْ اِمْرَأَتَهُ فِيْ دُبُرِهَا لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِ. (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৩০৫৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর [করুণার] দৃষ্টিপাত করেন না যে কোনো পুরুষ বা নারীর পশ্চাৎদ্বারে গমন করে। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٣٠٥٧ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلٍ اَتٰى رَجُلًا اَوْ اِمْرَأَةً فِي الدُّبُرِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সমকামিতা ও স্ত্রীর মলদ্বারে সহবাসের শাস্তির মধ্যে পার্থক্য : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সমকামিতা তথা লেওয়াতাতের শাস্তি বিচারকের ইচ্ছাধীন। সুতরাং তিনি যে কোনো প্রকারের শাস্তি দিতে পারেন। যদি তিনি মারধর করেন কিংবা চাবুক মারেন, আর এতে সে মরে যায় তাতেও কোনো আপত্তি চলবে না। অবশ্য শাস্তির মধ্যে কর্তা অপেক্ষা কৃতের শাস্তির পরিমাণ লঘু হবে।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, এ অপরাধের শাস্তির কর্তার জন্য জেনার নির্দিষ্ট শাস্তি [অর্থাৎ চাবুক বা পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা] প্রদান করতে হবে। অবশ্য কৃতের শাস্তি অপেক্ষাকৃত লঘু হবে যাতে সে মরে না যায়।

আর স্ত্রীর পশ্চাৎদ্বারে সহবাসকারীর জন্য কোনো নির্দিষ্ট শাস্তি নির্ধারণ করেনি, তাই উভয় ইমামের মতে এ কাজ হারাম বটে। সুতরাং শরিয়তের 'হদ' বা শাস্তির পরিবর্তে কাজি বা বিচারক অন্য যে কোনো ধরনের শাস্তি দিতে পারবেন।

৩০৫৮. অনুবাদ : হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা তোমাদের সন্তানকে অলক্ষ্যে হত্যা করো না, কেননা, 'গীলা' অশ্বারোহীকে অশ্বপৃষ্ঠ হতে নিচে ফেলে দেয়। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٠٥٨ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ (رضـ) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَاِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বর্তমান যুগের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী ডাক্তারের অভিমত জানতে চাওয়া হলে জনৈক চিকিৎসক বলেছেন, দুগ্ধ পান অবস্থায় স্তন্যদায়িনী যদি গর্ভবর্তি হয় তাহলে কোলের সন্তানের স্বাস্থ্যহানীর খুব একটা আশঙ্কা নেই। তবে গর্ভধারণের তিন মাসের পর দুধে সামান্য পরিবর্তন ঘটে, ফলে শিশুর পেটে পীড়া দেখা দিতে পারে। তাই এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। উপরোক্ত অভিমতের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, জুদামার বর্ণিত হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ স্তন্য দানকালে সহবাস করাকে 'হারাম' ঘোষণা করার মনস্থ করেছিলেন। পরে তা হতে বিরত রয়েছেন। আর আলোচ্য হাদীসে 'তানযীহ' রূপে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ সহবাস না করাই উত্তম, হারাম নয়।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৩০৫৯ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَعْزِلَ عَنِ الْحُرَّةِ اِلَّا بِاِذْنِهَا - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৩০৫৯. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বাধীনা স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত তার সাথে [সঙ্গমকালে] আযল করতে নিষেধ করেছেন। -[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَزْل [আযল]-এর ইতিহাস ও এ বিষয়ে ওলামাদের মতামত : আযল বা বহির্বীর্যপাত। অর্থাৎ স্ত্রী সঙ্গমকালীন বীর্যপাতের প্রাক্কালে যোনি হতে লিঙ্গকে বের করে ফেলা বা স্ত্রীর যোনিতে বীর্যপাত না করে অন্যত্র বীর্যপাত ঘটানো। সে যুগে জন্মনিরোধ বা জন্মনিয়ন্ত্রণের অন্য কোনো পদ্ধতি সম্পর্কে তৎকালীন মানুষ অবহিত ছিল না বলে সন্তান নিতে অনিচ্ছুক হলে তারা এ পদ্ধতি অবলম্বন করত। অধিক সন্তান দরিদ্রতার কারণ হবে সে আশঙ্কায় অথবা কন্যা সন্তান জন্ম নিলে নিজেদের মানসম্মানহানির আশঙ্কায় একদিকে আযল পদ্ধতি অবলম্বন করত এবং অপরদিকে শিশুকে বিশেষত কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করত। এ নির্মম ও নিষ্ঠুর প্রথার প্রতি কুরআন মাজীদ ও হাদীসে রাসূলে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয়েছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়– আইয়ামে জাহেলিয়াতে মানুষ দুটি কারণে 'আযল' করত। একটি অর্থনৈতিক কারণে তথা খাদ্যাভাবের আশঙ্কায়, আর দ্বিতীয়টি হলো আত্মসম্মান লাঘবের চরম অহমিকা। কিন্তু মুসলমানরা তিন কারণে আযল করত।

১. দাসীর গর্ভে নিজের কোনো সন্তান জন্মানোকে তারা পছন্দ করত না।
২. দাসীর গর্ভে সন্তান জন্ম নিলে উক্ত দাসীকে অধিক মূল্যে বিক্রয় করা যাবে না অথচ তাকে স্থায়ীভাবে নিজের কাছে রাখতেও তারা পছন্দ করত না।
৩. দুগ্ধপোষ্য শিশুর মা এ অবস্থায় পুনরায় গর্ভবতী হলে কোলের সন্তানের স্বাস্থ্যের হানি ঘটার আশঙ্কা। মোটকথা, আইয়ামে জাহেলিয়াতে যে সকল কারণে আযল করা হতো মুসলমানরা তথা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা আযল করতেন তাদের সেই প্রবণতার একটি কারণও তাদের মানসিকতায় ছিল না।

'আযল' সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আলোচনা করে ফুকাহায়ে কেরাম এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, 'আযল' করা বৈধ তবে মাকরূহ, শরয়িত এ কাজকে ভালো মনে করেনি। কাজেই এটা হতে বিরত থাকাই উত্তম। যারা আযল করতেন তারা কেবলমাত্র বাঁদির সাথেই করতেন, স্বাধীনা নারী বা স্ত্রীর সাথে করতেন– এ মর্মে একটি হাদীসও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই সকল ওলামা বলেন, স্বাধীনা নারীর সাথে তার অনুমতি ব্যতীত 'আযল' করা বৈধ নয়। কিন্তু ফকীহদের কেউ কেউ বলেন, স্ত্রীর অনুমতি থাকলেও স্বাধীনা নারীতে 'আযল' করা অবৈধ। কেননা, রাসূলে কারীম ﷺ এটাকে "প্রচ্ছন্ন বা গোপনে জীবন্ত প্রোথিত করা হয়" বলে মত প্রকাশ করেছেন। বস্তুত যে বীর্য নষ্ট করা হয় সে বীর্যের মধ্যে এমন কীট থাকার সম্ভাবনা ছিল যার দ্বারা সন্তান লাভ করতে পারত। আর যে বীর্য কীটে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে বীর্যের শুক্রকীটটিও একটি প্রাণী বটে, হাদীসে সে কীটকে نَسَمَةٌ বলা হয়েছে। কুরআনুল কারীমেও অনুরূপ আয়াত উল্লেখ রয়েছে– لَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ (اَلْاٰيَةَ) অর্থাৎ 'তোমরা দারিদ্র্যের আশঙ্কায় তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না।' স্মরণ রাখতে হবে– সন্তান ও যে বীর্য কীট হতে সন্তান জন্মলাভ করবে উভয়ের হুকুম এক ও অভিন্ন। মোটকথা, বস্তু ও বস্তুর উপাদান রূপাকৃতির দিক দিয়ে ভিন্ন হলেও মৌলিক দিক দিয়ে এক ও অভিন্ন। যেমন– আল্লামা ফখরুদ্দীন কাযী খাঁন বলেন, ইহরাম অবস্থায় স্থল প্রাণী শিকার করা যেমন হারাম তার ডিম নষ্ট করাও হারাম। আযলের ব্যাপারটিও অনুরূপ। কাযী খাঁন ফকীহদের অন্যতম এবং তাঁর কিতাব ফিক্‌হশাস্ত্রে সর্বজন স্বীকৃত ফতোয়ার কিতাব। -[তাফসীরে কুরতুবী]

بَابٌ
পূর্ব পরিচ্ছেদের সংশ্লিষ্ট বিষয় সংবলিত পরিচ্ছেদ

কোনো দাসী বা বাঁদি দাসত্বের শৃঙ্খল হতে মুক্তি লাভ করলে তখন তার স্বামী যদি গোলাম হয়, তাহলে উক্ত মহিলার বিবাহ ভঙ্গ করার অধিকার থাকবে। তথা সে ইচ্ছা করলে উক্ত স্বামীকে পরিত্যাগ করতে পারবে এতে সকল ইমামের ঐকমত্য রয়েছে। কিন্তু যদি তার স্বামী স্বাধীন হয় তবে ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে তার এ অধিকার থাকবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তখনও তার এ অধিকার থাকবে না। আলোচ্য পরিচ্ছেদে এ প্রসঙ্গে হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

৩০৬০ - عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا فِىْ بَرِيْرَةَ خُذِيْهَا فَاعْتِقِيْهَا وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩০৬০. **অনুবাদ :** হযরত ওরওয়া [ইবনে যুবাইর (রা) তাঁর খালা] হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বারীরাহ [জনৈকা ক্রীতদাসী] সম্পর্কে তাঁকে [আয়েশাকে] বললেন, তাকে [ক্রয় করে] নাও, অতঃপর মুক্ত করে দাও। বারীরার স্বামী গোলাম ছিল তজ্জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে [বিবাহ বাকি রাখা না রাখার] অধিকার প্রদান করেন, এতে বারীরাহ [বিবাহ ভঙ্গ করে] নিজেকে গ্রহণ করল। [ওরওয়া বলেন,] যদি সে [বারীরার স্বামী] স্বাধীন হতো, তবে তিনি তাকে [বারীরাকে] অধিকার প্রদান করতেন না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : জনৈক আনসারীর বারীরাহ নাম্নী এক ক্রীতদাসী ছিল, সে হযরত আয়েশা (রা)-এর খেদমতে মাঝে মাঝে আসত, তার মাওলা তাকে মুকাতাবা [অর্থাৎ নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করার চুক্তি] করেছিল, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে লোকের কাজকর্ম করত। হযরত আয়েশা (রা)ও পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তার দ্বারা কাজ করাতেন এবং পরবর্তীতে চুক্তি অনুযায়ী সাকুল্য বিনিময় দিয়ে তিনি তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। ক্রীতদাসী থাকাকালীন উক্ত বারীরার মুগীছ নামী এক ঘোর কালো গোলামের সাথে বিবাহ হয়েছিল। পরবর্তীতে উক্ত মুগীছও মুক্তিলাভ করে। বারীরাহ যখন মুক্তি পায়, তখন তার স্বামী ক্রীতদাস, স্বাধীন ছিল না। তৎসম্পর্কে হাদীসে বিপরীতমুখি বর্ণনা রয়েছে; হযরত আয়েশা (রা.) হতে তিনজন বর্ণনাকারীর মধ্যে আসওয়াদ দৃঢ়তার সাথে স্বাধীন হওয়ার উল্লেখ করেছেন, আবদুর রহমানের এক বর্ণনায় নিশ্চয়তার সাথে মুক্ত বলে উল্লেখ আছে, অপর বর্ণনায় সন্দেহ প্রকাশ পেয়েছে। তৃতীয়জন ওরওয়ার বর্ণনায় উভয় অবস্থার উল্লেখ আছে এবং যেহেতু দাসত্বের পরে স্বাধীনতা প্রাপ্তি ঘটতে পারে কিন্তু স্বাধীনতার পরে দাসত্ব হতে পারে না কোনোক্রমেই, সেহেতু ভাষ্যকার ও জ্ঞানীজনের মতে বিপরীতমুখি হাদীসের এভাবে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে যে, যে বর্ণনায় দাসত্বের উল্লেখ আছে, তা পূর্ববর্তী অবস্থার বর্ণনা এবং স্বাধীনতার উল্লিখিত হাদীসে পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। এতে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, বারীরার মুক্তিকালে তার স্বামী [যে পূর্বে দাস ছিল] স্বাধীন ছিল। অতএব, আলোচ্য হাদীসে বর্ণনাকারী ওরওয়ার [নাসায়ী ও আবূ দাউদের হাদীসে এটা ওরওয়ার উক্তি বলে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে] উক্তিটি তার অনুমান মাত্র।

সংশ্লিষ্ট মাস্আলায় ইমামদের মতভেদ : কোনো ক্রীতদাসী মুক্তি লাভ করার পর স্বামী গোলাম হলে সে তার বিবাহধীনে থাকা না থাকার অধিকার লাভ করবে। এ ব্যাপারে ইমামগণ ঐকমত্য পেশ করেছেন। কিন্তু স্বামী স্বাধীন হলে এ অধিকার প্রাপ্ত হবে কিনা এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতপার্থক্য বিদ্যমান। যেমন–

১. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, মালিক (র.) প্রমুখের মতে, স্বামী যদি স্বাধীন হয় তাহলে ক্রীতদাসী মুক্তি লাভ করার পর বিবাহ বাতিলের অধিকার লাভ করবে না। কেননা, বিবাহ বাতিলের অধিকার শুধুমাত্র স্বামী ক্রীতদাস হওয়ার বেলায় প্রযোজ্য।

তাঁদের দলিল : قَوْلُ عَائِشَةَ (رضـ) وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا

২. ইমাম আবূ হানীফা, সাহেবাইন, ছাওরী, মুজাহিদ, নাখয়ী (র.) প্রমুখের মতে, স্বামী স্বাধীন হোক বা গোলাম হোক সর্বাবস্থায় ক্রীতদাসী মুক্তি লাভ করার পর বিবাহ বাতিল করার না করার অধিকার লাভ করবে।

তাঁদের দলিল : রাসূল ﷺ বারীরাহকে বললেন– مَلَكْتِ بُضْعَكِ فَاخْتَارِيْ

এখানে রাসূল ﷺ বারীরাহকে সাধারণভাবেই অধিকার প্রদান করেছেন।

৩০৬১ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ عَبْدًا اَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيْثٌ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ يَطُوْفُ خَلْفَهَا فِىْ سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ يَبْكِىْ وَ دُمُوْعُهُ تَسِيْلُ عَلٰى لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِلْعَبَّاسِ يَا عَبَّاسُ اَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيْثٍ بَرِيْرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيْرَةَ مُغِيْثًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ رَاجَعْتِيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَأْمُرُنِىْ قَالَ اِنَّمَا اَشْفَعُ قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِىْ فِيْهِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৩০৬১. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরার স্বামী মুগীছ [পূর্ব] কালো গোলাম ছিল। আমি সে দৃশ্য এখনও [শাগরিদগণের নিকট বর্ণনাকালীন] অবলোকন করছি, যখন মুগীছ মদিনার অলিগলিতে বারীরার পেছনে পেছনে চোখের পানিতে দাড়ি ভাসিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুরছিল। এমতাবস্থা দর্শনে রাসূলুল্লাহ ﷺ [আমার পিতা] আব্বাসকে বলেন, হে আব্বাস! বারীরার প্রতি মুগীছের গভীর প্রেম এবং মুগীছের প্রতি বারীরার অবজ্ঞা দর্শনে তোমার কি বিস্ময় জাগে না? রাসূলুল্লাহ ﷺ এতদ্দর্শনে বারীরাহকে বললেন, তুমি যদি [মুগীছের করুণ অবস্থার প্রতি সদয় হয়ে] তাকে পুনরায় গ্রহণ কর? [তাহলে কত না সুন্দর হয়]। এতদশ্রবণে বারীরাহ বলল, আপনি কি আমাকে আদেশ করছেন? [তাহলে আপনার আদেশ তো শিরোধার্য] তিনি বললেন, আমি তো সুপারিশ করছি মাত্র [আদেশ নয়]। বারীরাহ বলল, তার কোনো প্রয়োজন [ও আকর্ষণ] আমার নেই। –[বুখারী]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩০৬২ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّهَا اَرَادَتْ اَنْ تُعْتِقَ مَمْلُوْكَيْنِ لَهَا زَوْجٌ فَسَاَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَاَمَرَهَا اَنْ تَبْدَاَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْاَةِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

৩০৬২. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পারস্পরিক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ দুজন দাস-দাসীকে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করায় তিনি নারীর পূর্বে পুরুষকে মুক্ত করবার আদেশ দিলেন। [যাতে স্বাধীনা নারীর ক্রীতদাস স্বামী-অবস্থা না ঘটে।] –[আবূ দাউদ, নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** একবার হযরত আয়েশা (রা) তাঁর দুজন দাস-দাসী [যারা পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিল] আজাদ করে দিতে মনস্থ করলেন। রাসূল ﷺ তাঁকে প্রথমে পুরুষ দাসটিকে আজাদ করে দিতে বলেছিলেন। কেননা, পুরুষটিকে প্রথমে আজাদ করে দিলে উভয়ের মাঝে বিবাহ বিচ্ছেদ ত্বরান্বিত হয় না। স্বভাবত স্বাধীনা রমণী ক্রীতদাস স্বামীর সংসারে থাকা অপছন্দ মনে করে এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ হতে নিজেকে ঘৃণিত মনে করে যা পুরুষের ক্ষেত্রে বিরল। অর্থাৎ দাসত্ব হতে মুক্তিপ্রাপ্ত একজন পুরুষ একজন দাসীকে স্ত্রী হিসেবে রাখা ততটা অপমান মনে করে না। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে পুরুষ দাসকে আজাদ করে দিতে বলেছেন।

৩০৬৩ وَعَنْهَا أَنَّ بَرِيْرَةَ عَتَقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيْثٍ فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ لَهَا إِنْ قَرِبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩০৬৩. অনুবাদ : উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, মুগীছের স্ত্রী বারীরাহ মুক্তি লাভ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে [বিবাহ রাখা আর না রাখার] অধিকার প্রদান করে বলেন যে, যদি সে তোমার নির্জন নৈকট্য লাভ [সহবাস] করতে পারে, তবে তোমার এ অধিকার থাকবে না। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বারীরার স্বামী স্বাধীন ছিল না দাস ছিল? বারীরাহ যখন আজাদি লাভ করে তখন তার স্বামী স্বাধীন ছিল না দাস ছিল, এ সম্পর্কে বিপরীতমুখি বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন–

স্বাধীন ছিল : বারীরাহ সম্পর্কিত হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা) হতে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে হযরত আসওয়াদ (রা.) বললেন, اِنَّهُ كَانَ حُرًّا হযরত ওরওয়াহ ও ইবনুল কাসিম (র.)-এরও এরূপ একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

দাস ছিল : বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত ওরওয়াহ (রা.)-এর একটি রেওয়ায়েতে আছে– اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا

সমন্বয় সাধন : দাসত্বের পর স্বাধীন হতে পারে কিন্তু স্বাধীনের পর দাসত্ব অসম্ভব ঘটনা। যেহেতু বিপরীতমুখি বর্ণনা, সেহেতু বলা যায় দাসত্বের কথা বলা হয়েছে পূর্বের অবস্থা বর্ণনা করতে, আর স্বাধীন বলা হয়েছে ঘটনার সময়ের অবস্থা বুঝাতে।

بَابُ الصَّدَاقِ
পরিচ্ছেদ : মোহর

اَلصَّدَاقُ শব্দটির صَادٌ বর্ণে যবর ও যের উভয় যোগে পড়া যায়। যেরযোগে পড়াই অধিকতর বিশুদ্ধ, তবে যবরযোগে পড়াও অধিক প্রচলিত। এর শাব্দিক অর্থ হলো– মোহর। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে– وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً অর্থাৎ তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্ট চিত্তে মোহর প্রদান কর।

শরিয়তের পরিভাষায় এর পরিচয় হলো– مَا يُعْطِى الزَّوْجُ اِلَى الزَّوْجَةِ عِوَضًا لِمَنَافِعِ بُضْعِهَا مُعَجَّلًا اَوْ مُؤَجَّلًا অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর যৌনাঙ্গ উপভোগ করার বিনিময়ে তাকে দেওয়া নগদ অথবা বাকি অর্থসম্পদকে মোহর বলে। মোহর প্রদানের মাধ্যমে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর গভীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিধায় মোহরকে মোহর নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে, এর দ্বারা মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এ মোহরের ফলেই তারা তাদের অসহায়ত্বের গ্লানি দূরীভূত করে অধিকার আর মর্যাদা নিয়ে সমাজের বুকে টিকে থাকে।

মোহরের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন– قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ 'আমি অবশ্যই অবহিত যা আমি স্বামীদের উপর আবশ্যক করে দিয়েছি।'

অপর আয়াতে আছে– وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ

অর্থাৎ এ সমস্ত নারী ছাড়া অন্য নারী তোমাদের জন্য হালাল করা হলো তোমরা তাদেরকে তোমাদের মাল দ্বারা গ্রহণ করবে। –[সূরা নিসা-২৪] অপর এক আয়াতে এসেছে– وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً অর্থাৎ নারীদেরকে সন্তুষ্টির সাথে মোহর প্রদান কর। –[সূরা নিসা-৪] এ সমস্ত আয়াত হতে ইমামগণ এটাই বুঝেছেন যে, মোহর ব্যতীত বিবাহ করা জায়েজ নেই। তবে মোহরের ন্যূনতম পরিমাণ সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারণ, এ ব্যাপারে হাদীসে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে যে কোনো পরিমাণের হালাল মাল দ্বারাই বিবাহ করা যেতে পারে। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে তিন দিরহামের কম মোহরে বিবাহ জায়েজ হয় না। কিন্তু ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দশ দিরহামের কমে মোহর হতে পারে না। তবে মোহরের উর্ধ্বতম পরিমাণ নির্ধারিত নয়। কুরআনে বলা হয়েছে, অর্থাৎ 'যদি তোমরা নারীদের কাউকে প্রচুর পরিমাণে মোহরও দিয়ে থাক তবুও তোমরা এর কিছুই ফেরত নিও না।' –[সূরা নিসা–২০]

উল্লেখ্য যে, মোহরের পরিমাণ বেশি নির্ধারিত করা উচিত নয়। একে নবী করীম ﷺ কিয়ামতের পূর্ব নিদর্শন বলেছেন। অনেকেই অধিক মোহর নির্ধারণ করাকে নিজেদের মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ মনে করেন। আবার অনেকে মনে করেন যে, মোহর আদায় করা অপরিহার্য নয়। কাজেই সামর্থ্যের অধিক মোহর নির্ধারণ করতে আপত্তি করেন না বা নিজের জন্য ক্ষতিকর কিছু বলে মনে করেন না। মূলত এমন ধারণা করা উচিত নয়। কেননা, এ প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ -এর এ হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মালের বিনিময়ে মোহর নির্ধারণ করে কোনো মহিলাকে বিবাহ করে এবং মনের মধ্যে এই নিয়ত রাখে যে, তা আদায় করবে না– সে ব্যভিচারী। আর যে ব্যক্তি ধার বা ঋণ নিয়ে এ নিয়ত রাখে যে, তা পরিশোধ করবে না, 'সে চোর'।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– নবী করীম ﷺ -এর বিবিদের কারো মোহর ১৩১ তোলা রূপার অধিক ছিল না। হযরত ফাতিমা (রা.)-এর মোহর সম্পর্কে এক বর্ণনানুযায়ী জানা যায় যে, এর পরিমাণ ছিল চারশত মিছকাল তথা ১৫০ তোলা রূপার সমপরিমাণ। অবশ্য বিভিন্ন যুগে রূপার মূল্য বিভিন্ন ছিল। বর্তমান যুগেও সেই মতে হিসাব করতে হবে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٠٦٤ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ وَهَبْتُ نَفْسِيْ لَكَ فَقَامَتْ طَوِيْلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زَوِّجْنِيْهَا إِنْ لَّمْ تَكُنْ لَكَ فِيْهَا حَاجَةٌ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا قَالَ مَا عِنْدِيْ إِلَّا إِزَارِيْ هٰذَا قَالَ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَالْتَمِسْ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْاٰنِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩০৬৪. **অনুবাদ :** হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে জনৈকা নারী এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নিজেকে আপনার নিকট সঁপে দিলাম [বিবাহের উদ্দেশ্যে], রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব রইলেন। সে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। এমন সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার [বিবাহের] প্রয়োজন যদি আপনার না থাকে, তবে তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নিকট এমন কিছু আছে, যা তাকে মোহর হিসেবে দিতে পার? সে বলল, আমার এ তহবন্দ ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি বললেন, কিছু জুটিয়ে আন, লোহার আংটিই হোকনা কেন। সে খুঁজে কিছুই পেল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি কিছু কুরআন [মুখস্থ] আছে? সে বলল, হ্যাঁ, অমুক সূরা, অমুক সূরা। এতে তিনি বললেন, তোমার যে পরিমাণ কুরআন [মুখস্থ] আছে তার বিনিময়ে তোমাকে তার সাথে বিবাহ দিয়ে দিলাম। অন্য বর্ণনায় আছে, যাও, তোমার সাথে তাকে বিবাহ দিলাম, তুমি তাকে কুরআন শিক্ষা দাও। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বিবাহ সম্পাদনের শব্দ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : বিবাহের শব্দ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–
ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেন, শুধু تَزْوِيْج [বিবাহদান] ও نِكَاح শব্দদ্বয়ের দ্বারা বিবাহ সিদ্ধ হবে, অন্য কোনো শব্দ দ্বারা নয়।
ইমাম মালেক (র)-এর মতে, এতদসহ هِبَة [সম্প্রদান], صَدَقَة [দান], بَيْع [বিক্রয়] শব্দ দ্বারাও বিবাহ প্রদান করা যেতে পারে।
ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, যে সমস্ত শব্দে স্থায়ী মালিকানা বুঝা যায়, সে সমস্ত শব্দ দ্বারা বিবাহ সিদ্ধ। কারণ, ভাষায় যেমন প্রত্যক্ষ ও সরাসরি অর্থবোধক শব্দের ব্যবহার প্রচলিত আছে, তদ্রূপ রূপকভাবে পরোক্ষ শব্দ দ্বারাও ভাব প্রকাশ করা হয়ে থাকে। বিবাহে নারীকে ভোগের যে অধিকার জন্মে (اِسْتِمْتَاعُ الْبُضْعِ) তা ক্রীতদাসীর মধ্যে ব্যক্তিসত্তার মালিকানার

কারণে লাভ হয়। কাজেই মালিকানা লাভের মাধ্যমে যখন এ ভোগের অধিকার জন্মে, তখন মালিকানা লাভও এ অধিকারের কারণ (سَبَبٌ) হলো। سَبَبٌ বা কারণ দ্বারা مُسَبَّبٌ [মুসাব্বাব] অর্থ গ্রহণ ভাষার একটি স্বীকৃত ও প্রচলিত পদ্ধতি। অতএব, যে সমস্ত শব্দ স্থায়ী মালিকানা অর্থে ব্যবহৃত হয়, সে সমস্ত শব্দ দ্বারা তার مُسَبَّبٌ [মুসাব্বাব] বিবাহ অর্থ গ্রহণ ভাষার একটি স্বীকৃত নিয়ম ও পদ্ধতিমাত্র। আলোচ্য হাদীসে স্ত্রীলোকটি هِبَةٌ [সম্প্রদান] দ্বারা নিজের বিবাহ অর্থ প্রকাশ করেছে। কুরআন মাজীদের [৩৩-৫০] আয়াতে هِبَةٌ দ্বারা বিবাহের অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য খাস বা নির্দিষ্ট। শাফেয়ীগণের এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য আয়াতে উল্লিখিত নির্দিষ্ট বিধান ছিল মোহর ব্যতীত বিবাহ সিদ্ধ হওয়া, যেহেতু ৪-২৪ আয়াতে বিবাহ সিদ্ধ হবার জন্য মোহরের অপরিহার্যতা ঘোষণা (اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ) করা হয়েছে, সেহেতু উক্ত সাধারণ নীতি ও বিধান হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ব্যতিক্রমধর্মী বিধানের উল্লেখ করে আয়াতে বলা হচ্ছে– خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ [মু'মিনগণ ব্যতীত শুধুমাত্র তোমার জন্য এ বিধান।] আয়াতের পূর্ববর্তী অংশে [৩৩-৫০] যে সমস্ত নারীকে মোহর প্রদান করা হয়েছে তাদের উল্লেখ করত এ আয়াতে মোহর ব্যতীত বিবাহ করার অনুমতি শুধু তাঁকেই প্রদান করা হয়েছে। এ ব্যতিক্রমধর্মী বিধান هِبَةٌ শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট হবার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

যেসব শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয় :

১. اَلتَّمْلِيْكُ বা মালিক করে দেওয়া।
২. اَلْهِبَةُ বা দান করা।
৩. اَلصَّدَقَةُ বা সদকা করা।
৪. اَلْبَيْعُ বা বিক্রয় করা।
৫. اَلشِّرَاءُ বা ক্রয় করা।
৬. اَلْجَعْلُ বা আদান-প্রদান করা।
৭. اَلنِّكَاحُ বা বিবাহ।
৮. اَلتَّزْوِيْجُ বা বিবাহ দেওয়া ইত্যাদি।

যেসব শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না : ইমামগণের ঐকমত্যে যেসব শব্দ দ্বারা তাৎক্ষণিক ও স্থায়ী মালিকানার অর্থ প্রকাশ করে না, তা দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হবে না। যেমন– ক. اَلْاِجَارَةُ [ভাড়া দেওয়া], খ. اَلْاِعَارَةُ [ধার দেওয়া], গ. اَلرَّهْنُ [বন্ধক দেওয়া, রাখা], ঘ. اَلْوَصِيَّةُ [অসিয়ত করা], ঙ. اَلْاِبَاحَةُ [বৈধ করা], চ. اَلْاِحْلَالُ [হালাল করা], ছ. اَلْاِقَالَةُ [উঠিয়ে দেওয়া], জ. اَلْخُلْعُ [দূরীভূত করা], ঝ. اَلتَّمَتُّعُ [উপভোগ করা] ইত্যাদি।

মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ নিয়ে ইমামদের মতভেদ : মোহরের সর্বোচ্চ পরিমাণ নিয়ে ওলামাদের মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই, তবে সর্বনিম্ন পরিমাণ নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে দশ দিরহাম।

তাঁর দলিল :

١. قَوْلُهُ تَعَالٰى "قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ" .

٢. قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ تَفْسِيْرِ هٰذِهِ الْاٰيَةِ "لَا مَهْرَ لِاَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ" .

٣. قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَا مَهْرَ لِاَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ" .

২. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, মোহরের নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নেই। কম হোক বা বেশি হোক যে-কোনো জিনিস মোহর হতে পারে।

তাঁর দলিল :

١. عَنْ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ اَعْطٰى فِيْ صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْأَ كَفَّيْهِ سَوِيْقًا اَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ .

٢. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ "فَالْتَمِسْ وَلَوْ كَانَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ" .

৩. ইমাম মালেক (র)-এর মতে, মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ তিন দিরহাম।

١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ سَارِقًا فِيْ مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ .

৪. হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (র.)-এর মতে, ৫০ দিরহাম।

৫. হযরত ইবরাহীম নখয়ী (র.)-এর মতে, এক দিনার।

৬. ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, সম্পদ হিসেবে পরিগণিত যে কোনো জিনিস কম হোক বা বেশি হোক তা মোহর হতে পারে।

৭. ইবনে শুবরুমা (র.)-এর মতে, ৫ দিরহাম।
৮. কেউ বলেন, ২০ দিরহাম।
৯. কেউ বলেন, ১০ দিরহাম।
১০. আবার কেউ বলেন, ৭ দিরহাম।

মোহর মাল হওয়া না হওয়া প্রসঙ্গে ইমামদের মতভেদ : মোহরের জন্য মাল হওয়া শর্ত কিনা, কুরআন শিক্ষা দেওয়া কিংবা ইসলাম গ্রহণ মোহর হতে পারে কিনা, এ সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান।

১. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে, মোহরের জন্য مَالٌ مُتَقَوَّمٌ [অর্থকরী সম্পদ] হওয়া শর্ত নয়। অর্থকরী সম্পদ নয় এমন কিছুও মোহর হতে পারে। তাঁদের দলিল–

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ـ

দরুদ পড়ার বিনিময়ে আদম ও হাওয়া (আ.)-এর বিবাহ সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং কুরআন শিক্ষাদান ও ইসলাম গ্রহণ মোহর হতে পারে।

২. ইমাম আবূ হানীফা ও মালিক (র.)-এর মতে, মোহর মাল হওয়া শর্ত। সুতরাং কুরআন শিক্ষাদান ও ইসলাম গ্রহণ মোহর হতে পারে না। তাঁদের দলিল–

١ـ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ (الْاٰيَةَ)
٢ـ لَا مَهْرَ لِاَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ (الْحَدِيْثُ)

আহনাফের পক্ষ হতে বিরোধীদের দলিলের উত্তর :

১. হাদীস কুরআনের আয়াতের মোকাবিলায় পরিত্যাজ্য।
২. হাদীসে ব্যবহৃত بِمَا مَعَكَ-এর بَاءٌ টি বিনিময় নয় বরং কারণ বুঝানোর জন্যে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ তোমার নিকট কুরআন থাকার কারণে বিবাহ দিলাম।
৩. হাদীসটি মানসূখ হয়ে গেছে।
৪. এ বিধানটি ঐ ব্যক্তির জন্য খাস ছিল।

زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ-এর মধ্যস্থ بَاء-এর অর্থ : রাসূল ﷺ -এর বাণী– "زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ"-এর মধ্যে "بَا" হরফে জারটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এ ব্যাপারে মোটামুটি দু'টি মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন–

১. ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র) বলেন, এখানে "بَا" হরফে জারটি سَبَبٌ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ হিসেবে বাক্যটির অর্থ হবে– কুরআনের জ্ঞান থাকার কারণে এ মহিলাকে তোমার নিকট বিবাহ দিলাম।

২. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) বলেন, এখানে بَا হরফে জারটি عِوَضٌ বা বিনিময় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ হিসেবে বাক্যটির অর্থ হবে– তোমার নিকট কুরআনের যে শিক্ষা আছে তার বিনিময়ে এ মহিলাকে তোমার নিকট বিবাহ দিলাম।

হানাফীদের মতভেদ করার কারণ : রাসূল ﷺ -এর বাণী– "زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ" দ্বারা বুঝা যায় যে, تَعْلِيْمُ الْقُرْاٰنِ -ও মোহর হতে পারে। কিন্তু আহনাফ এর বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেন– تَعْلِيْمُ الْقُرْاٰنِ মোহর হতে পারে না। কেননা, এটা কোনো মাল বা সম্পদ নয়। সম্পদ বলা হয়– "مَا يَتَمَوَّلُ النَّاسُ" অর্থাৎ মানুষ যা মালরূপে গ্রহণ করে। আর تَعْلِيْمُ الْقُرْاٰنِ-কে কোনো মানুষ সম্পদরূপে গ্রহণ করে না।

তাই এখানে হানাফীগণ রাসূল ﷺ -এর উল্লিখিত বাণীর কয়েকটি তা'বীল পেশ করেছেন। যেমন–

١ـ اِنَّ الْبَاءَ فِيْ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ "زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ" ـ
لِلسَّبَبِيَّةِ فَالْمَعْنٰى : زَوَّجْتُكَهَا بِسَبَبِ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ بِحُرْمَتِهٖ وَبَرَكَتِهٖ ـ
٢ـ اَوْ ـ هٰذَا الْحَدِيْثُ مَنْسُوْخٌ لِحَدِيْثِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ـ
٣ـ اَوْ ـ فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ هٰكَذَا لِاَنَّ الرَّجُلَ كَانَ مُفْلِسًا ـ
٤ـ اَوْ ـ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَعْطَاهَا الْمَهْرَ مِنْهُ ـ
٥ـ اَوْ ـ هٰذَا مِنْ خُصُوْصِيَّاتِ النَّبِيِّ ﷺ ـ

হাদীসে উল্লিখিত মহিলার নাম : যে মহিলা নিজেকে রাসূল ﷺ -এর জন্য সঁপে দিয়েছিলেন, তার নামের ব্যাপারে বেশ কয়েকটি মত পাওয়া যায়। যেমন–

১. ঐতিহাসিক আল্লামা ওয়াকেদী (র)-এর মতে, ওযবা বিনতে জাবির। ২. আল্লামা বাগবী (র.)-এর মতে, খাওলা বিনতে হাকীম।
৩. মুসনাদে আহমদের বর্ণনা মতে, ইবনাতুল জাওনিয়াহ। ৪. আল্লামা কাসতাল্লানী (র.) বলেন, তার নাম উম্মে শারীক।
৫. কারো মতে, লায়লা বিনুতে কায়েসা। ৬. কারো মতে, মায়মূনা।
৭. কারো মতে, هِيَ اِمْرَأَةٌ اَنْصَارِيَّةٌ ৮. কারো মতে, অজ্ঞাত, অখ্যাত এক মুসলিম মহিলা ইত্যাদি।

وَعَنْ ٣٠٦٥ اَبِيْ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صِدَاقُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ صِدَاقُهُ لِاَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ اُوْقِيَّةً وَنَشٌّ قَالَتْ اَتَدْرِيْ مَا النَّشُّ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ اُوْقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَنَشٌّ بِالرَّفْعِ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَفِيْ جَمِيْعِ الْاُصُوْلِ)

৩০৬৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সালাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিবাহে মোহরের পরিমাণ কত ছিল? তিনি বললেন, তাঁর সহধর্মিণীগণের মোহরের পরিমাণ ছিল ১২ উকিয়্যাহ [৪০ দিরহাম সমপরিমাণের মাপের পাত্রবিশেষ] ও এক নাশ। তিনি বললেন, নাশ্ কি তা তুমি জান? বললাম, জানি না। উত্তরের বললেন, অর্ধ উকিয়্যাহ। এই পাঁচশত দিরহাম [৪০ × ১২ = ৪৮০ + ২০]-ই [মোহরের পরিমাণ ছিল]। –[মুসলিম] [নাশ نَشٌّ -এর شِيْن অক্ষরে ضَمَّةٌ শরহুস সুন্নাহ ও সকল মূল গ্রন্থে এরূপই আছে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

টীকা : পাঁচশত দিরহাম, আমাদের দেশীয় পরিমাপ হিসাবে প্রায় ১৩১ তোলা রূপা। আর এক নাশ হলো বারো উকিয়্যার অর্ধেক, অর্থাৎ ৪০ দিরহামের অর্ধেক। এক দিরহাম সমান ৩ মাসা ১ $\frac{১}{৫}$ রতি। সুতরাং সাড়ে বারো উকিয়্যাহ বা পাঁচশত দিরহামে ১৩১ $\frac{১}{৪}$ তোলা রৌপ্য।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٠٦٦ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) قَالَ اَلَا لَا تُغَالُوْا صَدُقَةَ النِّسَاءِ فَاِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوٰى عِنْدَ اللّٰهِ لَكَانَ اَوْلٰكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ مَا عَلِمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا اَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلٰى اَكْثَرَ مِنْ اِثْنَتَيْ عَشَرَةَ اُوْقِيَّةً - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

৩০৬৬. **অনুবাদ :** হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা স্ত্রীদের মোহর প্রদানে বাড়াবাড়ি করো না। যদি মোহর নির্ধারণে আধিক্য মর্যাদা এবং আল্লাহর নিকট তাকওয়ার বিষয় হতো, তাহলে রাসূলে কারীম ﷺ -ই তোমাদের তুলনায় অধিক মোহর নির্ধারণের বেশি উপযুক্ত ছিলেন। অথচ ১২ উকিয়্যার বেশি পরিমাণের মোহরের বিনিময়ে তিনি তাঁর কোনো স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন এবং কোনো কন্যাকে বিবাহ দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। [অর্থাৎ ১২ উকিয়্যাহ ১২×৪০ = ৪৮০ দিরহাম = ১২৭ তোলা রৌপ্যের অধিক মোহর কারও বিবাহে প্রদান করেননি। ৩০৬৫ নং হাদীসে নাশ-এর পরিমাণ ২০ দিরহাম-এর খুচরা অংশ গণনা করেননি, অতএব, কোনো বিরোধ ঘটেনি।]
–[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কুরআন ও হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সমাধান : পবিত্র কুরআনের বাণী- (الاية) لَوْ اٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا অর্থাৎ 'যদি তোমরা নারীদের কাউকে প্রচুর মোহরও দিয়ে থাক, তবু তোমরা এর কিছুই ফেরত নিয়ো না।' [সূরা নিসা- ২০] এ আয়াতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মোহরের পরিমাণ অধিক হওয়ার মধ্যে শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো দোষ নেই। অথচ অত্র হাদীসে অধিক মোহর নির্ধারণ করা হতে পরিষ্কারভাবে নিষেধ রয়েছে। এর সমাধানে বলা হয় যে, অধিক পরিমাণে মোহর নির্ধারণ জায়েজ বটে, কিন্তু উত্তম নয়। আর আমাদের আলোচনার বিষয় হলো, উত্তমতা সম্পর্কে, জায়েজ হওয়া সম্পর্কে নয়। সুতরাং উভয়টি স্ব-স্ব স্থানে সঠিক আছে।

قَوْلُهُ لَا تُغَالُوْا صَدُقَةَ النِّسَاءِ-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসাংশের অর্থ হলো 'তোমরা স্ত্রীদের মোহর প্রদানে বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘন করো না।' স্ত্রীকে মোহর দেওয়া স্বামীর কর্তব্য। স্ত্রী স্বামীর কাছে এটা পান। সুতরাং স্বামী স্ত্রীর নিকট ঋণী হবে। ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তা তার জিম্মায় থেকে যাবে। অনাদায়ী থেকে গেলে সে ঋণ অপরিশোধের অপরাধে অপরাধী হবে। আর এজন্যই রাসূল ﷺ সাধ্যানুযায়ী মোহর নির্ধারণের নির্দেশ দিতেন। অথচ আমাদের সমাজে মোহর বেশি বেশি নির্ধারণ করার প্রতিযোগিতা দেখা যায়। মোহর বেশি নির্ধারণ করাকে তারা গৌরবের বিষয় মনে করে; কিন্তু তা আদায়ের কোনো মানসিকতা বা ইচ্ছা আদৌ থাকে না। মূলত এটা জঘন্য অপরাধ। অতএব, সকলেরই এর প্রতি গুরুত্বারোপ করা অপরিহার্য।

একটি দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন : হযরত ওমর (রা.) বর্ণিত অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ নিজের বিবাহে এবং কন্যাদের বিবাহের ক্ষেত্রেও ১২ উকিয়্যার বেশি মোহর নির্ধারণ **করেননি। উল্লেখ্য, এক উকিয়্যাহ ৪০ দিরহামের সমান।** অতএব, ১২ উকিয়্যাহ সমান ৪০×১২ = ৪৮০ **দিরহাম; কিন্তু** অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসূল ﷺ -এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা বিনতে আবূ সুফিয়ানের মোহর নির্ধারণ করা হয়েছিল চার হাজার দিরহাম। এ উভয় বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য বিদ্যমান। এর সমাধানকল্পে হাদীস বিশারদগণ বলেন−

১. হযরত ওমর (রা.) অত্র হাদীসের মাধ্যমে নিজের অনভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ যে ১২ উকিয়্যার বেশি মোহর নির্ধারণ করেছেন এ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল না। অতএব, সম্ভবত হযরত উম্মে হাবীবার মোহরের সংবাদ তাঁর নিকট পৌঁছেনি।

২. অথবা বলা যেতে পারে, উম্মে হাবীবার মোহরের ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন ধরনের। হযরত উম্মে হাবীবা (রা.)-এর হাবশায় অবস্থানকালে তাঁর স্বামী উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহাশ খ্রিস্টান হয়ে যায় এবং এ অবস্থায়ই সে মৃত্যুবরণ করে। তখন হাবশার সম্রাট নাজাশী হযরত উম্মে হাবীবার চার হাজার দিরহাম অথবা চার হাজার দিনার মোহর উপহার স্বরূপ উম্মে হাবীবাকে প্রদান করেন। এ মোহর রাসূল ﷺ প্রদান করেননি। অতএব, হযরত ওমর (রা.)-এর কথার সাথে এর কোনো সংঘাত বা বৈপরীত্য নেই। নিজে তাঁর স্ত্রীকে ১২ উকিয়্যার বেশি মোহর প্রদান করেননি।

٣٠٦٧ - وَعَنْ جَابِرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْطٰى فِىْ صِدَاقِ امْرَاَتِهٖ مِلْأَ كَفَّيْهِ سَوِيْقًا اَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩০৬৭. **অনুবাদ :** হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি স্ত্রীর মোহর হিসেবে এক আজলা [দুই হাতের মিলিত মুঠি] পরিমাণ ছাতু অথবা খেজুর প্রদান করল, সে তাকে নিজের জন্য বৈধ করে নিল। −[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَقَدِ اسْتَحَلَّ-এর ব্যাখ্যা : অত্র হাদীস দ্বারা শাফেয়ীগণ দলিল পেশ করেন যে, মোহর হিসেবে সামান্য পরিমাণ মাল প্রদান করলেও স্ত্রীর মোহর আদায় হয়ে যাবে। কেননা, বিবাহ জায়েজ হওয়ার জন্য মোহরের কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই।

কিন্তু হানাফী মালিকীগণ বলেন, দশ দিরহামের কমে মোহর নির্ধারণ করা বৈধ নয়। তাঁরা এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, মোহর আদায়ের পদ্ধতি দুটি– ১. مُعَجَّلٌ [মুয়াজ্জাল] নগদ, ২. مُؤَجَّلٌ [মু'আজ্জাল] বাকি। আলোচ্য হাদীসে নগদ মোহরের ব্যাপারেই বলা হয়েছে। অবশ্য অবশিষ্ট মোহর পরবর্তীতে আদায় করা ওয়াজিব। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, আমাদের দেশ ও সমাজের বিবাহ অনুষ্ঠানে বর কনে পক্ষকে যে সমস্ত কাপড়চোপড়, অলঙ্কারাদিসহ যে সমস্ত প্রসাধনী প্রদান করে, তা নগদ মোহরের অন্তর্ভুক্ত। ফলে নির্ধারিত মোহর হতে এর মূল্য উসুল ধরে অবশিষ্ট মোহর পরবর্তীতে আদায়ের জন্য রাখা হয়।

অনেকের মতে আলোচ্য হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইসহাক ও মুসলিম নামের দুজন বর্ণনাকারী মাজহুল বা অজ্ঞাত। সুতরাং হাদীসটি যঈফ। তাই এটা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

وَعَنْ ٣٠٦٨ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ (رض) اَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ بَنِىْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلٰى نَعْلَيْنِ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَضِيْتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ فَاَجَازَهُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৩০৬৮. অনুবাদ : হযরত আমির ইবনে রাবীয়াহ (রা.) বলেন, বনূ ফাযারাহ গোত্রের জনৈকা নারী দু-খানা জুতার [দ্বারা মোহরের] বিনিময়ে বিবাহ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি দু-জুতা পরিমাণ মালের বিনিময়ে তোমাকে সঁপে দিতে রাজি হয়েছ? সে বলল জী হ্যাঁ। তিনি তাঁর বিবাহ বহাল রাখলেন। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

টীকা : আলোচ্য হাদীসের সনদ সম্পর্কে কথা হলো ইমাম তিরমিযী একে সহীহ বললেও ইবনে জাওযী, ইবনে মাঈন ও ইবনে হিব্বানের মতে এর রাবী আসিম ইবনে উবাইদুল্লাহ যঈফ। তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। আর সহীহ হলেও এটা 'নগদ মোহর' সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে বলে মেনে নিতে হবে। অথবা, 'ন্যূনতম পরিমাণ দশ দিরহাম', এ বিধান প্রয়োগ হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা বলতে হবে।

وَعَنْ ٣٠٦٩ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتّٰى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ (رض) لَهَا مِثْلُ صِدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيْرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ نِ الْاَشْجَعِىُّ فَقَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ اِمْرَأَةٍ مِنَّا بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ بِهَا اَبُوْ مَسْعُوْدٍ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ)

৩০৬৯. অনুবাদ : হযরত আলকামা হতে বর্ণিত, তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, উক্ত ব্যক্তি মোহর নির্ধারণ না করে বিবাহ করেছে এবং স্ত্রীর সাথে মিলিত হবার পূর্বেই মারা গেছে [উক্ত ব্যক্তির স্ত্রী সম্পর্কে শরিয়তের বিধান কি?] হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) উত্তরে বললেন, তার সমপর্যায়ের নারীগণের মোহরের সমপরিমাণ মোহর [পরিভাষায় যাকে مَهْرِ مِثْل মাহরে মিছিল বলে] হবে; কমও নয়, বেশিও নয় এবং তাকে ইদ্দাত [৪ মাস ১০ দিন] পালন করতে হবে এবং সে স্বামীর মিরাস [উত্তরাধিকার] লাভ করবে। এতদশ্রবণে আশজা' গোত্রের জনৈক সাহাবী মা'কাল ইবনে সিনান দাঁড়িয়ে বললেন, আমাদের আশজা' গোত্রের জনৈকা স্ত্রীলোক বিরওয়া' বিনতে ওয়াশিক-এর ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ বিধান প্রদান করেছিলেন, যা আপনি বললেন। এতে ইবনে মাসউদ (রা.) অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করলেন। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মোহর নির্ধারণ ব্যতীত যদি কোনো নারীর বিবাহ হয় তবে সে ক্ষেত্রে مَهْر مِثْل [মাহরে মিছিল] বা ঐ স্ত্রীলোকটির মাতা, ভগ্নি, ফুফু, খালা প্রভৃতির বিবাহের যে পরিমাণ মোহর নির্ধারিত ছিল, শরিয়তের বিধানে উক্ত স্ত্রীলোকটির জন্য সমপরিমাণ মোহর হবে, এরূপ ক্ষেত্রে স্বামীর সাথে যৌন মিলন হলে পূর্ণ মোহর পাবে, যৌন মিলনের পূর্বে তালাক প্রদান করলে কোনো মোহর পাবে না। শুধুমাত্র মুত'আ مُتْعَةٌ [উক্ত নারীর পরিধেয় পোশাক, তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থানুসারে একটি জামা, একখানি চাদর ও একটি উড়না] পাবে মাত্র। কুরআন মাজীদ ২:২৩৬ আয়াত দ্রষ্টব্য। পক্ষান্তরে যৌন মিলনের পূর্বে যদি স্বামী মারা যায়, তাহলে পূর্ণ মাহরে মিছিল পাবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.), আহমদ (র), ইসহাক ইবনে আবী লায়লা (র.), ইবনে সিরীন (র.) প্রমুখের অভিমত। আলোচ্য হাদীসে ফকীহ সাহাবী ইবনে মাসউদ (রা.) উক্ত অভিমতই ব্যক্ত করেছেন এবং অপর এক সাহাবী মা'কাল ইবনে সিনান (রা.) এটা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রদত্ত বিধান বলে বর্ণনা করেছেন। যেহেতু বিবাহের শেষ সীমা স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু পর্যন্ত কাজেই বিবাহ তার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছে, ছিন্ন হয়নি; সেহেতু স্ত্রী পূর্ণ মোহরের অধিকারিণী হবে। সহবাস না হওয়া স্বীয় অপরাধ নয়। স্বামী বেঁচে থাকলে সহবাস ঘটত, কাজেই স্ত্রীকে মোহর হতে বঞ্চিত করা বা কম করে দেওয়া সাধারণ যুক্তিও সমর্থন করে না। হাদীসের প্রমাণদৃষ্টে ও যুক্তির দিক হতে এ মত অধিক সমর্থনযোগ্য। পক্ষান্তরে কতিপয় সাহাবী ও ইমাম শাফেয়ী (র.), মালিক (র.), আওযায়ী (র.), লাইস ইবনে সা'দ (র.) প্রমুখের অভিমত হলো, স্ত্রীলোক মিরাস পাবে বটে; কিন্তু মোহর বা মুত'আ কিছুই পাবে না। এরা অত্র হাদীসের সনদ বা গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁদের এ সন্দেহ সনদের বিস্তারিত আলোচনায় টিকে না এবং হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা অটুট থাকে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৩০৭০ - عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ (رض) أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَعَ شُرَحْبِيْلَ بْنِ حَسَنَةَ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৩০৭০. **অনুবাদ :** হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জাহশের বিবাহিতা পত্নী ছিলেন [এবং মক্কায় কুরাইশগণের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হাবশায় (পরবর্তী নাম আবিসিনিয়া, বর্তমান নাম ইথিওপিয়া] হিজরতকারী মুসলমানদের সাথে স্বামীসহ হিজরত করেন।) স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ [বিশুদ্ধ বর্ণনামতে তার নাম উবাইদুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ তার ভাইয়ের নাম, যিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। সেখানে গিয়ে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করত] হাবশায় মারা যায়। হাবশার সম্রাট নাজাশী [যিনি ইসলাম কবুল করেন, অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ না হওয়ায় সাহাবী কিনা তৎসম্পর্কে দ্বিমত রয়েছে] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশে তাঁর সাথে উম্মে হাবীবাহ (রা.)-কে [উকিল হয়ে] বিবাহ দেন এবং তাঁর পক্ষ হতে চার হাজার দিরহাম মোহর হিসেবে দান করেন। অতঃপর শুরাহবীল ইবনে হাসানার সাথে উম্মে হাবীবাহ (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে প্রেরণ করেন। -[আবূ দাউদ, নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَحْشٍ **-এর পরিচিতি :** আলোচ্য হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত উম্মে হাবীবাহ প্রথমে আবুদল্লাহ ইবনে জাহাশের বিবাহ বন্ধনে ছিলেন। ইথিওপিয়ায় আবদুল্লাহর মৃত্যু হলে ইথিওপিয়ার তৎকালীন সম্রাট নাজাশী তাঁকে নবী করীম ﷺ -এর পক্ষ হতে উকিল হয়ে তার সাথে বিবাহ দিয়েছেন। এখানে 'আবদুল্লাহ' এ নামটি সঠিক নয়। আল্লামা কারমানী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেছেন– মিশকাতের অন্যান্য কপিতে লিখা রয়েছে 'উবাইদুল্লাহ', আর এটাই নির্ভুল ও

সঠিক। কেননা, ইতিহাস অধ্যয়নে জানা যায় যে, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.) তৃতীয় হিজরিতে উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং হযরত হাম্যা (রা) ও তাঁকে একই কবরে দাফন করা হয়েছে।

নাজাশীর পরিচিতি : তিনি হাবশার বাদশাহ ছিলেন। 'হাবশা' সে দেশের আদি নাম, বর্তমানে তা আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া নামে পরিচিত। আল্লামা ই'যায আলী (র) [শায়খুল আদব দারুল উলূম, দেওবন্দ] বলেছেন– نَجَّاشِىْ - غِفَّارِىْ ও غَزَّالِىْ - মুশাদ্দাদ উচ্চারণ ভুল। যদিও সর্ব সাধারণের কাছে এভাবেই প্রচলিত আছে বরং নির্ভুল ও সঠিক উচ্চারণ হলো মুখাফ্ফাফ হিসেবে। যথা– نَجَاشِىْ - নাজাশী, غِفَارِىْ - গিফারী ও غَزَالِىْ গাযালী। 'নাজাশী' এটা ব্যক্তির নাম নয় বরং সে দেশের বাদ্শাহর উপাধি। তাঁর নাম ছিল 'আছহামাহ্'। যেমন– মিশরের রাষ্ট্রপ্রধানের উপাধি ফেরআউন, ওমানে সুলতান, কাতার ও কুয়েতে খলীফা, সউদীতে মালিক ও ভারতবর্ষে মহারাজ ইত্যাদি।

وَعَنْ ٣٠٧١ اَنَسٍ (رض) قَالَ تَزَوَّجَ اَبُوْ طَلْحَةَ اُمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الْاِسْلَامَ اَسْلَمَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ قَبْلَ اَبِىْ طَلْحَةَ فَخَطَبَهَا فَقَالَتْ اِنِّىْ قَدْ اَسْلَمْتُ فَاِنْ اَسْلَمْتَ نَكَحْتُكَ فَاَسْلَمَ فَكَانَ صِدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا - (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

৩০৭১. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ ত্বালহা (রা.) উম্মে সুলাইম (রা.)-কে বিবাহ করেন, উভয়ের [বিবাহে] মোহর ছিল ইসলাম। উম্মে সুলাইম (রা.) আবূ ত্বালহা (রা.)-এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন, অতঃপর আবূ ত্বালহা (রা.) তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি; যদি তুমি ইসলাম কবুল কর; তবে তোমাকে বিবাহ করব। এতে আবূ ত্বালহা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। [বর্ণনাকারী স্বীয় ধারণায় বলেন,] এ ইসলাম গ্রহণ তাঁদের মাঝে মোহররূপে পরিগণিত হয়। –[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কোনো বস্তু বা মাল ব্যতীত অন্য কিছু মোহর হতে পারে না। এ সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ইসলাম গ্রহণ করাই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আকর্ষণীয় কারণ ছিল মাত্র। অন্যথা মোহর ছিল বস্তুবিশেষ। আর এটাও সঠিক তথ্য যে, উম্মে সুলাইম মোহর গ্রহণ করেননি; বরং মাফ করে দিয়েছেন। অতএব, বাহ্যিক মাল লেনদেন না হওয়ায় বর্ণনাকারী ইসলামকে মোহর হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

بَابُ الْوَلِيْمَةِ
পরিচ্ছেদ : অলিমা বা বৌভাত প্রসঙ্গে

وَلِيْمَةٌ [অলিমা] অর্থ : وَلِيْمَةٌ শব্দটি মূলত اِلْتِئَامٌ বা اِيْلَامٌ হতে নির্গত হয়েছে। যার আভিধানিক অর্থ– মিলিত হওয়া, সমবেত হওয়া। বিবাহের পর বাসর রজনীতে দম্পতির মিলনের পরদিন লোকজনকে কিছু খাওয়ানোকে طَعَامُ وَلِيْمَةٍ 'তা'আমে অলীমা' বলে। অবশ্য আধুনিক কালে ইসলামি পরিভাষা পরিবর্তন করে এ খানাকে 'বৌভাত' বলার প্রবণতা দেখা যায়। অধিকাংশ ওলামাদের মতে এ আয়োজন বা ব্যবস্থা করা সুন্নত। ব্যক্তির আর্থিক সামর্থ্য ও সচ্ছলতার উপর তার আয়োজনের পরিমাণ নির্ভর করে। সামর্থ্যের বাইরে ঋণ-কর্জ করে এর আয়োজন করা কিংবা অলিমার জন্য কাউকে বাধ্য করা অথবা লোকজনের কাছে সুনাম অর্জন করার উদ্দেশ্যে এটা করা গুনাহের কাজ। শরিয়তের বিধানের বহির্ভূত আড়ম্বর করা ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায়। অথচ আজকাল এর বহু ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন, অপব্যয় ও অপচয় কার্য করতে উৎসাহ দেখা যায়। 'অলিমা' করার জন্য হাদীসে আদেশসূচক বাক্য ব্যবহার হলেও এটা নবী করীম ﷺ ও সাহাবীদের কার্য হতে সুন্নতই প্রমাণিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٠٧٢ - عَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاى عَلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالَ اِنِّيْ تَزَوَّجْتُ اِمْرَاَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩০৭২. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ [বিখ্যাত সাহাবী] আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-এর [কাপড়ের] উপর জাফরানের রং দেখে জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার, কিসের রং এটা? তিনি বললেন, আমি জনৈকা [আনসারী] রমণীকে খেজুরের আঁটির সমান স্বর্ণের বিনিময়ে [মোহরে] বিবাহ করেছি। [উক্ত বিবাহের ফলে এই রং লেগেছে।] রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার বিবাহকে বরকতময় করুন। একটি বকরি দ্বারা হলেও তুমি অলিমা কর। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

পুরুষের জাফরান ব্যবহার করা সম্পর্কে ইমামদের মতানৈক্য : ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, সুফরা তথা জাফরানি রং পুরুষের শরীরে ব্যবহার করা জায়েজ নেই, তবে কাপড়ে ব্যবহার করতে পারবে। তিনি হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত অত্র হাদীসটি স্বীয় অভিমতের অনুকূলে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং তাঁদের সঙ্গী-সাথিদের মতানুসারে পুরুষের জন্য জাফরানি রং ব্যবহার নিষিদ্ধ। তাঁদের দলিল হলো, হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি– عَنْ اَنَسٍ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ

ইমাম মালিক (র.)-এর দলিলের উত্তর : ইমাম মালেক (র.) হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা যে দলিল পেশ করেছেন– এর কয়েকটি উত্তর দেওয়া যেতে পারে

১. হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) যে সুফরা বা জাফরানি রং ব্যবহার করেছিলেন, এটা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের ঘটনা ছিল।

২. অথবা, বলা যেতে পারে, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)-এর শরীরে যে জাফরানি রং ছিল, তা তাঁর স্ত্রীর শরীর হতে লেগেছে। তিনি স্বেচ্ছায় ব্যবহার করেননি। ইমাম নববী (র.) এ ব্যাখ্যাটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইমাম বায়যাবী (র.) একেই মূল সমাধান বলে অভিহিত করেছিলেন।

৩. অথবা, বলা যেতে পারে, হযরত ইবনে আওফ (রা.) স্বীয় স্ত্রীর নিকট গমনের সময় খোশবু ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন; কিন্তু তার নিকট পুরুষের ব্যবহার্য কোনো সুগন্ধি না থাকায় তিনি সামান্য পরিমাণ জাফরানি রং ব্যবহার করেন। আর এজন্য রাসূল ﷺ তাকে নিষেধও করেননি।

تَوْضِيْحُ قَوْلِهِ عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ -এর **বিশ্লেষণ :** খেজুরের আঁটি বড় ছোট বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। কেউ কেউ মনে করেন, তার ওজন তথা তার মূল্য পাঁচ দিরহাম সমান। আবার কেউ কেউ বলেন, একটি খেজুর দানার সমপরিমাণ স্বর্ণের ওজন এক মিছকালের এক-চতুর্থাংশ সমান, যার মূল্য হয় দশ দিরহামের সমান। এটাই হানাফী ইমামদের অভিমত যে, দশ দিরহামের কম মোহর হতে পারে না।

قَوْلُهُ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ -এর **মর্মার্থ :** اَوْلِمْ আদেশসূচক ক্রিয়া হতে কেউ কেউ মনে করেন, অলিমা করা ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক নির্দেশ। কিন্তু জমহুরের মতে এটা সুন্নত বা মোস্তাহাব। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামদের কার্য হতে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং আদেশসূচক ক্রিয়াটি এখানে উৎসাহ প্রদানের জন্য ব্যবহার হয়েছে।

٣٠٧٣ - وَعَنْهُ قَالَ مَا اَوْلَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا اَوْلَمَ عَلٰى زَيْنَبَ اَوْلَمَ بِشَاةٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩০৭৩. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর বিবাহে যে পরিমাণ অলিমার আয়োজন করেন, অন্য কোনো স্ত্রীর বিবাহে ঐ পরিমাণ করেননি। তিনি এক বকরি দ্বারা অলিমা করেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর পরিচিতি : যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) হলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফুফাতো বোন। আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা উমামার মেয়ে। প্রথমে নবী করীম ﷺ স্বীয় আজাদকৃত গোলাম ও পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারিছা (রা.)-এর সাথে যয়নবকে বিবাহ দেন। কিছুদিন পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় হযরত যায়েদ (রা.) তাঁকে তালাক দেন। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ অপর এক বর্ণনায় স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা যয়নবকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বিবাহের ঘোষণা দেন। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যয়নব এ বিবাহ নিয়ে গর্ব করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে তাঁর বিবাহ ৬ষ্ঠ হিজরিতে সম্পাদিত হয়।

٣٠٧٤ - وَعَنْهُ قَالَ اَوْلَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ بَنٰى بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَاَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩০৭৪. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর বিবাহের পরে অলিমার আয়োজন করেন, তিনি লোকদেরকে রুটি ও গোশ্‌ত দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন। -[বুখারী]

٣٠٧٥ - وَعَنْهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صِدَاقَهَا وَاَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩০৭৫. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফিয়্যাহ (রা.)-কে মুক্ত করে বিবাহ করেন। এ মুক্তিদানকে মোহর হিসেবে গণ্য করেন এবং [খেজুর, পনির ও ঘি সহযোগে প্রস্তুত] হায়স নামক খাদ্য দ্বারা অলিমা করেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হযরত সফিয়্যার মুক্তি লাভ ও বিবাহ : হযরত সফিয়্যাহ (রা.) ছিলেন ইহুদি বনী কুরাইযা ও বনী নযীর গোত্রদ্বয়ের সরদার হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা। সপ্তম হিজরিতে খায়বরের যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন সদ্য বিবাহিতা। স্বামীর নাম ছিল কেনানা। সেই যুদ্ধে কেনানা নিহত হয় এবং সফিয়্যাহ বন্দী হয়ে মুসলমানদের হাতে আসেন। এ সময় হযরত দাহীয়া কালবী

(রা.) নবী করীম ﷺ -এর নিকট একটি দাসী চাইলে হুজুর ﷺ হযরত সফিয়্যাহ (রা.)-কে দান করলেন। অতঃপর লোকেরা এসে তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! সফিয়্যাহ হলো একজন সরদারের মেয়ে, একজন সাধারণ লোকের কাছে তাঁকে না দিয়ে আপনার নিজের কাছে রাখলেই তার ইজ্জত-সম্মান রক্ষা পায়। অতঃপর হুজুর ﷺ দাহীয়াকে অন্য একটি বাঁদি প্রদান করে সফিয়্যাহকে নিজের কাছে রাখলেন এবং আজাদ করে বিবাহ করলেন।

قَوْلَهٗ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صِدَاقَهَا-এর ব্যাখ্যা : দাসত্ব হতে মুক্তি লাভ করা বা মুক্তিদান বিবাহের মোহর হতে পারে কিনা, এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফীদের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক ও ইমাম আওযায়ী (র.) সহ কিছু সংখ্যক তাবেয়ীদের মতে 'মুক্তিদান' মোহর হতে পারে। আলোচ্য হাদীসই তাঁদের দলিল।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এক বর্ণনা মতে ইসলাম গ্রহণ বা মুক্তিদান ইত্যাদি মোহর হতে পারে না। কেননা, আল্লাহর নির্দেশ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ হতে বুঝা যায় যে, বিবাহের মোহর বা বিনিময় 'সম্পদ' বা 'অর্থ' জাতীয়, বস্তু হতে হবে, আর ইসলাম বা আজাদি এ জাতীয় বস্তু নয়। [এ বিষয়ে মোহর পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।]

আলোচ্য হাদীসের উত্তরে বলা হয় যে, এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম একটি। অথবা সফিয়্যাহকে তিনি আজাদ করে দিয়েছেন এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সফিয়্যাহ বিবাহের মোহর মাফ করে দিয়েছেন। আর বাহ্যত কোনো জিনিস লেনদেন না হওয়ায় বর্ণনাকারী 'আজাদি লাভ'কেই মোহর রূপে অভিহিত করেছেন।

وَعَنْهُ ٣٠٧٦ قَالَ اَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلٰثَ لَيَالٍ يُبْنٰى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى وَلِيْمَتِهٖ وَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ وَمَا كَانَ فِيْهَا اِلَّا اَنْ اَمَرَ بِالْاَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَاُلْقِىَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالْاَقِطُ وَالسَّمْنُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩০৭৬. অনুবাদ : উক্ত হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফিয়্যাহ (রা.)-এর [বিবাহ] বাসর করার উদ্দেশ্যে খায়বর ও মদিনার পথে [প্রত্যাবর্তনকালে] তিনদিন অবস্থান করেন। আমি [উপস্থিত] মুসলমানগণকে তাঁর অলিমা খাওয়ার জন্য দাওয়াত করি। উক্ত অলিমায় রুটি-গোশ্ত ছিল না। রাসূল ﷺ চর্মনির্মিত দস্তরখান বিছানোর নির্দেশ দিলেন। দস্তরখান বিছানো হলো অতঃপর তাতে খেজুর, পনির ও ঘি রাখা হলো। -[বুখারী]

وَعَنْ ٣٠٧٧ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ (رض) قَالَتْ اَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى بَعْضِ نِسَائِهٖ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩০৭৭. অনুবাদ : হযরত সফিয়্যাহ বিনতে শায়বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জনৈকা সহধর্মিণীর বিবাহে দুই মুদ পরিমাণ যবের [ছাতুর] অলিমা করেন। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

টীকা : ১. মুদ পরিমাণ ২৬০ দিরহাম বা ৬৮ তোলা; অতএব দুই মুদে হলো ১৩৬ তোলা। মুহাদ্দেসীনদের মতে রাসূলে কারীম ﷺ উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর বিবাহে উক্ত পরিমাণ অলিমা করেন।

وَعَنْ ٣٠٧٨ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَاْتِهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ اَوْ نَحْوَهٗ.

৩০৭৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কাউকেও অলিমার [খানায়] দাওয়াত করা হলে সে যেন উপস্থিত হয়। -[বুখারী ও মুসলিম]

মুসলিমের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, সে যেন কবুল করে অলিমা বা ঐ ধরনের দাওয়াত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীসের প্রেক্ষিতে কেউ কেউ মনে করেন– অলিমার দাওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজিব। তাঁদের দলিল হলো– قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের জীবদ্দশায় এ বিষয়ে যে সমস্ত ঘটনা পাওয়া গেছে তাতে দেখা গেছে এটা অপরিহার্য নয়, তাই ইমাম আবূ হানীফা (র.) সহ অনেকে বলেন– অলিমার আয়োজন করা যেমন সুন্নত, এ দাওয়াত কবুল করাও অনুরূপ সুন্নত।

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, প্রায়শ পরিলক্ষিত হয় যে, এ ধরনের অনুষ্ঠানে বহু ধরনের আপত্তিকর কার্য করা হয়, ফকির-মিসকিনদেরকে বিতাড়িত করা হয়, খাদ্য হালাল হওয়ার মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকে, আনন্দ-আহ্লাদের নামে শরিয়ত বিরোধী অনেক কাজকর্ম উৎসাহের সাথে স্থান পায়, কাজেই বর্তমান কালে এসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া অপেক্ষা না হওয়াই শ্রেয়।

٣٠٧٩ - وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلٰى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَاِنْ شَاءَ طَعِمَ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩০৭৯. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কাউকেও খানার দাওয়াত দিলে সে যেন কবুল করে। অতঃপর ইচ্ছা থাকলে সে খাবে অন্যথায় ত্যাগ করবে। –[মুসলিম]

٣٠٨٠ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعٰى لَهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩০৮০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঐ অলিমার খানা অতি নিকৃষ্ট, যে খানায় শুধু ধনীদের দাওয়াত করা হয় এবং গরিবদের ছেড়ে দেওয়া হয় এবং যে [বিনা ওজরে] দাওয়াত প্রত্যাহার করে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি করল। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অলিমা বা বৌভাতের অনুষ্ঠান করা সুন্নত। এটা তখনই সার্থক ও সফল হবে, যখন সে মজলিসে ধনী-গরিব সামগ্রিকভাবে সকলেরই উপস্থিতি ঘটবে। আমাদের পারিপার্শ্বিক সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, বিবাহ অনুষ্ঠানে সাধারণত ধনসম্পদশালী ব্যক্তিবর্গকেই নিমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তাদের বসার জন্য আলাদা উঁচু স্থানের আয়োজন করা হয়– দরিদ্র, গরিব, ভুখা-নাঙ্গা ব্যক্তিরা হয় উপেক্ষিত। তাদের ভাগ্যে শুধু উচ্ছিষ্টই মিলে। এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে নবী করীম ﷺ বলেন, 'ঐ অলিমার খানা অতি নিকৃষ্ট, যে খানায় শুধুমাত্র ধনীদের দাওয়াত করা হয় এবং গরিবদেরকে পরিহার করা হয়।'

٣٠٨١ - وَعَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ (رض) قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يُكْنٰى اَبَا شُعَيْبٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ فَقَالَ اِصْنَعْ لِيْ طَعَامًا يَكْفِيْ خَمْسَةً لَعَلِّيْ اَدْعُو النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَصَنَعَ لَهُ طُعَيْمًا ثُمَّ اَتَاهُ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا اَبَا شُعَيْبٍ اِنَّ رَجُلًا تَبِعَنَا فَاِنْ شِئْتَ اَذِنْتَ لَهُ وَاِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ قَالَ لَا بَلْ اَذِنْتُ لَهُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩০৮১. অনুবাদ : হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারগণের মধ্যে আবূ শুআইব নামক এক ব্যক্তির গোশ্‌ত বিক্রেতা [অথবা বাবুর্চি] গোলাম ছিল, সে তাকে বলল, তুমি আমার জন্য পাঁচজনের মতো খানা তৈরি কর, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে [অপর চারজনসহ] পাঁচজনের মধ্যে একজন হিসেবে দাওয়াত করতে ইচ্ছুক। সে গোলাম সামান্য খানা তৈরি করল। অতঃপর ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এসে তাঁকে দাওয়াত করল। [তাঁরা ৫ জন সকলে চললেন] একজন তাঁদের অনুসরণ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত হয়ে আবূ শুআইবকে ডেকে বললেন, এক ব্যক্তি আমাদের সাথে এসেছে, তুমি ইচ্ছা করলে তাকে অনুমতি দিতে পার, ইচ্ছা করলে ফেরাতে পার। সে বলল, না! না! বরং আমি অনুমতি দিলাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসের আলোকে ইমামগণ বলেছেন, অনাহূত ব্যক্তির জন্য কোনো দাওয়াতে উপস্থিত হওয়া জায়েজ নয়। অনুরূপভাবে আমন্ত্রিত ব্যক্তির মেজবানের বিনানুমতিতে কাউকেও সাথে নেওয়া বৈধ নয়।

তবে হ্যাঁ, স্পষ্টভাবে হোক বা সামাজিক রীতি, নিয়ম-কানুন অনুসারে যদি বুঝা যায় যে অন্য কাউকে নিলে মেজবান অসন্তুষ্ট হবে না, তখন কাউকে সঙ্গে নেওয়া বৈধ। কেননা, বিশেষ ব্যক্তির সাথে দু-একজন লোক থাকা স্বাভাবিক। দাওয়াত ছাড়া যদি কোনো লোক এসে যায়, তাহলে খানা অসুবিধা না হলে তাকে অনুমতি দেওয়া মোস্তাহাব। আর যদি মেজবানের অনুমতি ছাড়া কোনো অনাহূত ব্যক্তি খানা খায় নবী করীম ﷺ এমন ব্যক্তিকে ডাকাত বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা, সে মালিকের অজান্তে তার মাল লুট করেছে।

আর যদি একান্তই এমন লোককে খানা দিতে অপারগ হয় তবে সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে বিদায় করে দিতে হবে যেন তার মনে ব্যথা না লাগে। স্মরণ রাখবে সাথে যাওয়া ব্যক্তির জন্য আমিন্ত্রত ব্যক্তির মেজবানের উপর চাপ সৃষ্টি করা অবৈধ।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٠٨٢ أَنَسٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَمَ عَلٰى صَفِيَّةَ بِسَوِيْقٍ وَتَمْرٍ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩০৮২. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফিয়্যাহ (রা.)-এর বিবাহে ছাতু ও খেজুর দ্বারা অলিমা করেছিলেন।

–[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দুই হাদীসের মধ্যকার সামঞ্জস্য : পূর্বে এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে হযরত সফিয়্যাহ (রা.)-এর বিবাহে 'হায়েস' দ্বারা অলিমা করা হয়েছে অথচ এ হাদীস এর বিপরীত। এর সমাধানে বলা হয় যে, ছাতু, খেজুর ইত্যাদি উপাদান দ্বারাই 'হায়েস' তৈরি করা হয়! **অথবা তার অলিমা দু-বার করা হয়েছে।** প্রথমে খায়বার হতে ফিরে আসার পথে এবং পরে মদিনায়।

وَعَنْ ٣٠٨٣ سَفِيْنَةَ (رضـ) أَنَّ رَجُلًا ضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لَوْ دَعَوْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَكَلَ مَعَنَا فَدَعَوْهُ فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى عِضَادَتَيِ الْبَابِ فَرَأَى الْقِرَامَ قَدْ ضُرِبَ فِيْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَرَجَعَ قَالَتْ فَاطِمَةُ فَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا رَدَّكَ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِيْ أَوْ لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩০৮৩. **অনুবাদ :** হযরত সাফীনাহ (রা.) [উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা.)-এর আজাদকৃত বাঁদি] হতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (রা.)-এর মেহমান হলে তিনি তার জন্য খানা প্রস্তুত করেন। হযরত ফাতিমা (রা.) বললেন, যদি আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দাওয়াত করি আর তিনি আমাদের সাথে খানা খান, তবে কত না ভালো হয়! তারা তাকে দাওয়াত করলেন। তিনি এসে গৃহের দরজায় দুই কপাট ধরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন যে, গৃহকোণে একটি রঙিন নকশার পর্দা ঝুলছে! এটা দেখে ফিরে গেলেন। হযরত ফাতিমা (রা.) বলেন, আমি তাঁর পেছনে পেছনে যেয়ে বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! কী কারণে ফিরে আসলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমার পক্ষে অথবা নবীর পক্ষে রঙিন নকশার কাপড়ে সুসজ্জিত গৃহে প্রবেশ শোভা পায় না।

–[আহমদ, ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : গৃহাভ্যন্তরে সাজসজ্জা, নকশা করা, এমন সরঞ্জাম দ্বারা গৃহাভ্যন্তরকে সুসজ্জিত করা উচিত নয়– যে সরঞ্জাম শরিয়ত সমর্থিত নয়। বিভিন্ন প্রাণীর ছবি দ্বারাও ঘরকে সুসজ্জিত করা বৈধ নয়।

এ হাদীসের আলোকে ইমামগণ আপত্তিকর [কার্য সংঘটিত স্থানের] দাওয়াতে যেতে নিষেধ করেছেন। উক্ত পর্দা সম্পর্কে কেউ জীবজন্তুর ছবি সংবলিত পর্দা বলে মন্তব্য করেছেন। কেউ শুধু রঙিন কাপড়ের সাজসজ্জা করাকেই আপত্তির কারণ বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ হাদীসের আলোকে আমরা উৎসবে, আনন্দ প্রকাশে যা কিছু করে থাকি সে সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক ও বিরত হওয়া অবশ্যকর্তব্য। হাদীসে উল্লেখ না থাকলেও এটাই স্বাভাবিক যে, এ বক্তব্য শুনে হযরত ফাতিমা (রা.) ও আলী (রা.) তাদের গৃহের পর্দা তৎক্ষণাৎ সরিয়ে ফেলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের গৃহে যেয়ে আহার করেন।

٣٠٨٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ دُعِىَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَمَنْ دَخَلَ عَلٰى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيْرًا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩০৮৪. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দাওয়াত পেয়ে [বিনা ওজরে] কবুল করে না সে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের নাফরমানি করল এবং যে ব্যক্তি বিনা দাওয়াতে আসল সে যেন চোর সেজে প্রবেশ করল এবং লুণ্ঠনকারীরূপে বের হলো। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

টীকা : কেউ দাওয়াত প্রদান করলে তা যথাসম্ভব পালন করা উচিত। ইচ্ছাকৃতভাবে দাওয়াতে না যাওয়া গুনাহের কর্ম আর দাওয়াত না পেয়ে সেখানে যাওয়া একেবারেই অনুচিত।

٣٠٨٥ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَاَجِبْ اَقْرَبَهُمَا بَابًا وَاِنْ سَبَقَ اَحَدُهُمَا فَاَجِبِ الَّذِىْ سَبَقَ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৩০৮৫. **অনুবাদ :** রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেন, [সাহাবী যেহেতু নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য সেহেতু নামোল্লেখ না হওয়ায় হাদীসের গ্রহণযোগ্যতায় আপত্তি উঠতে পারে না।] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাকে দু ব্যক্তি [একই সময়ে] দাওয়াত করে, তখন নিকটবর্তীর দাওয়াত কবুল কর। আর উভয়ের মধ্যে যে আগে দাওয়াত করেছে, তার দাওয়াত কবুল কর। -[আহমদ, আবূ দাউদ]

٣٠٨٦ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامُ اَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِىْ سُنَّةٌ وَطَعَامُ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৩০৮৬. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রথম দিনের খানার আয়োজন আবশ্যকীয়, দ্বিতীয় দিনের সুন্নত, তৃতীয় দিন লৌকিকতা এবং যে লৌকিকতা [নিজের বাহাদুরি প্রকাশের জন্য] করে, আল্লাহ তা'আলাও তাকে [কিয়ামত দিবসে] লোক সমক্ষে [রিয়াকারী হিসেবে] ঘোষণা করবেন। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَوْضِيْحُ قَوْلِهِ اَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ :

اَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ -এর ব্যাখ্যা : ইসলামে কোনো ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি স্বীকৃত নয়। মধ্যম পন্থাই ইসলামে পছন্দনীয়। বৌভাত বা বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও বেশি বাড়াবাড়ি করা অবাঞ্ছিত এবং অহংকারের শামিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত অত্র হাদীসের ভাষ্যমতে, বিবাহের প্রথম দিনের খানা পরিবেশন করা আবশ্যকীয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে খাওয়া পরিবেশন করাকে যারা ওয়াজিব বলেন, এ হাদীসের উপর ভিত্তি করেই তারা তা বলে থাকেন। আর দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ মোট দুই দিন খাওয়ার অনুষ্ঠান করা সুন্নত। তবে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা বর্জন করা সমীচীন নয়; বরং মন্দ।

قَوْلُهُ سَمَّعَ اللّٰهُ بِه-এর মর্মার্থ : এ দু'দিন বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পরেও হতে পারে, অথবা একদিন বিবাহের আগে এবং একদিন বিবাহের পর; কিন্তু তিনদিন ধরে এ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা আদৌ সমীচীন নয়; এতে অনুষ্ঠানকারীর মনের অহংকার ও তাকাব্বুরীরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এটা শুধুমাত্র লোক দেখানো এবং নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সুনাম-সুখ্যাতি বৃদ্ধির জন্যই হয়ে থাকে। হাদীসের ভাষ্য মতে– আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কিয়ামতের দিন এ ব্যক্তিকে রিয়াকার হিসেবে লোক সম্মুখে ঘোষণা করবেন। এভাবেই তাকে অপমানিত করা হবে। এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে আল্লামা তীবী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কোনো নিয়ামত দান করলে সেই ব্যক্তির প্রথম আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা আবশ্যক এবং দ্বিতীয় দিন করা মোস্তাহাব। এটা প্রথম দিনের পরিপূরকস্বরূপ; কিন্তু তৃতীয় দিনও করলে এটাকে লৌকিকতা হিসেবেই ধরে নিতে হবে। উল্লেখ্য, ইমাম মালেক (র.)-এর অনুসারীদের মতে সাত দিন পর্যন্ত বৌভাতের আয়োজন করা যাবে; কিন্তু আলোচ্য হাদীসটি এর সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

وَعَنْ ٣٠٨٧ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُّؤْكَلَ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ مُحْيِيُّ السُّنَّةِ وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا.

৩০৮৭. অনুবাদ : হযরত ইকরিমা [স্বীয় উস্তাদ] ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পরস্পরে বাহাদুরির প্রতিযোগিতাকারীদ্বয়ের খানা খেতে নিষেধ করেছেন। –[আবূ দাউদ]

মাসাবীহের গ্রন্থকার মুহীউস্ সুন্নাহ বলেন, প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি ইকরিমা মুরসালভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

টীকা : বস্তুত এরূপ খাবার লোক দেখানো ও লোক শুনানোর জন্য হয়ে থাকে, তাই তাতে কল্যাণের তুলনায় অকল্যাণই বেশি নিহিত। অতএব তা পরিহার করা একান্তই কর্তব্য।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٠٨٨ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُتَبَارِيَانِ لَا يُجَابَانِ وَلَا يُؤْكَلُ طَعَامُهُمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ يَعْنِي الْمُتَعَارِضَيْنِ بِالضِّيَافَةِ فَخْرًا وَرِيَاءً.

৩০৮৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [অহংকার ভরে] পরস্পরে দুই প্রতিযোগীর দাওয়াত কবুল করা উচিত নয় এবং তাদের খানা খাওয়াও ঠিক নয়। [এ হাদীসের ব্যাখ্যায়] ইমাম আহমদ (র.) বলেন, এর অর্থ দুই ব্যক্তি স্বীয় অহমিকা প্রকাশের জন্য দাওয়াত করে।

وَعَنْ ٣٠٨٩ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ إِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقِيْنَ.

৩০৮৯. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাসিকগণের খানার দাওয়াত কবুল করতে নিষেধ করেছেন। –[বায়হাকী]

وَعَنْ ٣٠٩٠ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلٰى أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسْأَلْ وَيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلْ رَوَى الْأَحَادِيْثَ الثَّلٰثَةَ

৩০৯০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, যখন তোমরা কোনো মুসলমান ভাইয়ের গৃহে [দাওয়াত] খাও, তখন তার খানা খাও এবং জিজ্ঞাসাবাদ করো না [খানা কিভাবে কোথা হতে আসল?] আর তার পানীয় পান কর এবং জিজ্ঞাসাবাদ

اَلْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَقَالَ هٰذَا اِنْ صَحَّ فَلِاَنَّ الظَّاهِرَ اَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُطْعِمُهُ وَلَا يَسْقِيْهِ اِلَّا مَا هُوَ حَلَالٌ عِنْدَهُ .

করো না। হাদীসত্রয় বায়হাকী শো'আবুল ঈমান গ্রন্থে সংকলন করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে, হাদীসের অর্থ হলো, মুসলমান ভাই তার অপর মুসলমান ভাইকে হালাল খাদ্য পানীয় ছাড়া অন্য কিছু পানাহার করাবে না, এটাই স্বাভাবিক।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইমাম বায়হাকী (র.) বলেন, যদি হাদীসটি সত্য হয়, তবে এর অর্থ হবে সত্যিকার মুসলমান হালাল বস্তু ছাড়া খায় না এবং অন্যকেও খাওয়ায় না। সুতরাং তার খানায় হালাল-হারামের প্রশ্নই উঠে না। অথবা, প্রশ্ন করলে অহেতুক তার মনে ব্যথা পাবে। অবশ্য ফাসিক বা হারাম উপার্জনকারী হওয়ার নিশ্চিত জানা থাকলে প্রথমত দাওয়াত কবুল করাই ঠিক হবে না। কিংবা ওশর পেশ করে খানা হতে বিরত থাকবে। মোটকথা, অনুমানভিত্তিক সন্দেহ পোষণ করা ঠিক নয়।

بَابُ الْقَسْمِ

পরিচ্ছেদ : স্ত্রীদের মধ্যে অংশ নির্ধারণ প্রসঙ্গে

اَلْقَسْمُ : শব্দটি মাসদার, শাব্দিক অর্থ হলো– বণ্টন করা, এজন্য বণ্টনকারীকে اَلْقَاسِمُ বলা হয়। যেমন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ অর্থাৎ আমি বণ্টনকারী ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং আরবিতে বলা হয় যে اَلْقَاسِمُ مَحْرُوْمٌ তথা বণ্টনকারী বঞ্চিত হয় ও قَسَمَ الْقَاسِمُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ অর্থাৎ বণ্টনকারী অংশীদারদের মধ্যে অংশ ভাগ করেছিল। এখানে এর অর্থ হলো– যে পুরুষের একাধিক স্ত্রী রয়েছে তাদের মধ্যে রাত যাপন, খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য সবকিছু প্রদানে অংশ নির্ধারণ করা। আর এ অংশ নির্ধারণের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা শরিয়তের দৃষ্টিতে ফরজ, কমবেশি করা মহাঅন্যায়। কেননা, কুরআন মাজীদের ৩ : ৪ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রয়োজনে একাধিক বিবাহের অনুমতি সমতা রক্ষা করার শর্তসাপেক্ষে প্রদান করেছেন, সমতা রক্ষা করতে না পারার আশঙ্কার ক্ষেত্রে এক বিবাহ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। এর বিপরীতকে জুলুম বলে আখ্যায়িত করেছেন। এক্ষেত্রে সকল ইমাম ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। অবশ্য নতুন বিবাহ করার পরে অনুরূপভাবে কুমারী ও বিধবা বিবাহ করার পরে হানাফী ও শাফেয়ীদের মধ্যে সামান্য মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। হানাফীদের মতে নতুন ও পুরাতন স্ত্রী, অনুরূপ কুমারী বা বিধবা বিবাহ করলে সর্বাবস্থায় সমতা রক্ষা করা জরুরি। পক্ষান্তরে শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীগণের মতে পূর্ব স্ত্রী এক বা একাধিক থাকাকালীন কুমারীকে বিবাহ করলে প্রথমে ৭ রজনী যাপনের পরে সমতা বিধান করবে এবং ঐরূপ অবস্থায় বিধবা বিবাহ করলে প্রথমে তিন রজনী যাপনের পরে সমতা রক্ষা করবে। এ সমতা বিধানের নির্দেশ রাত্রি যাপন, খাদ্যবস্ত্র প্রদানে জরুরি। প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদিতে অনিচ্ছাকৃত তারতম্যে কোনো অপরাধ বলে গণ্য হবে না। আলোচ্য পরিচ্ছেদে এ প্রসঙ্গীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٠٩١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُبِضَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ وَكَانَ يَقْسِمُ مِنْهُنَّ لِثَمَانٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩০৯১. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের সময় নয়জন স্ত্রী ছিল। তন্মধ্যে আটজনের জন্য অংশ বণ্টিত ছিল। [পরবর্তী হাদীস দ্রষ্টব্য] –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাসূল ﷺ -এর বিবিগণের নাম : রাসূল ﷺ মোট এগারোটি বিবাহ করেছিলেন। এটা তাঁর এক বিশেষ বিশেষত্ব। আর এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ হিকমতও নিহিত ছিল, যা এক আলাদা প্রসঙ্গ। বিবাহের ক্রমানুসারে নিম্নে তাঁদের নামে দেওয়া হলো– ১. হযরত খাদীজা বিনতে খোয়াইলিদ (রা.), ২. হযরত সাওদা বিনতে যাময়া (রা.), ৩. হযরত আয়েশা বিনতে আবূ বকর (রা.), ৪. হযরত হাফসা বিনতে ওমর (রা.), ৫. হযরত উম্মে সালামা বিনতে আবূ আইমান (রা.), ৬. হযরত উম্মে হাবীবা বিনতে আবূ সুফিয়ান (রা.), ৭. হযরত জুয়াইরিয়া বিনতে হারিছ (রা.), ৮. হযরত সফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই (রা.), ৯. হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.), ১০. হযরত মায়মূনা বিনতে হারিছ এবং ১১. হযরত যয়নব বিনতে খোযাইমা (রা.)।

নবী করীম ﷺ -এর বহুবিবাহের হিকমত : রাসূল ﷺ ২৫ বৎসর বয়সে সর্বপ্রথম বিবাহ করেন ৪০ বৎসর বয়স্কা বিধবা হযরত খাদীজা (রা.)-কে। হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে অর্থাৎ নবুয়তের দশম বর্ষে হযরত খাদীজা (রা.) মক্কায় ইন্তেকাল করেন এবং এর এক বৎসর পর বিবাহ করেন ছয় কি সাত বৎসর বয়স্কা কুমারী হযরত আয়েশা (রা.)-কে। তিনি ছাড়া আর কোনো কুমারী নারী বিবাহ করেননি।

রাসূল ﷺ -এর বহু বিবাহের মূলে ছিল বিরাট ও বিভিন্ন মহৎ উদ্দেশ্য। যথা নারী সামাজে জ্ঞান প্রচারের অধিক সুযোগ অর্জন, নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগতি লাভ, নারী বিশেষের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, অসহায় বিধবা নারীদের সহায়তা দান অবশেষে বিভিন্ন গোত্রের সখ্যতা স্থাপন ইত্যাদি।

অবশ্য হযরত আয়েশা (রা.)-কে বিবাহ করার মধ্যে তাঁর তীক্ষ্ণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য ছিল। হযরত আয়েশা (রা.) পরবর্তীকালে যে বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন নারী সমাজে এর নজির খুবই বিরল। তিনি নবী করীম ﷺ হতে ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং নিজের ইজতেহাদ দ্বারা বহু জটিল সমস্যার সূক্ষ্ম সমাধান দিয়েছেন! মোটকথা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হতে যে সাতজন সাহাবী সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতমা একজন।

আর এটা সামাজিকভাবে দূষণীয় ব্যাপারও ছিল না। কেননা, তখন আরবদের সমাজে বহুবিবাহ শুধু প্রচলনই ছিল না, বরং এটা ছিল পুরুষত্ব ও বীরত্বের পরিচায়ক। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমরা ধারণা করতাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জান্নাতের চল্লিশজন যুবকের সমপরিমাণ শক্তি দেওয়া হয়েছিল। আর জান্নাতের এক একজন যুবককে দেওয়া হবে দুনিয়ার একশতজন যুবকের সমপরিমাণ শক্তি। এ হিসাবে বলা যায় তাকে চার হাজার যুবকের, অন্য বর্ণনায় তিন হাজার যুবকের শক্তি প্রদান করা হয়েছিল। এ আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় তিনি নিজের কামশক্তিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। আর যদি তাই না হতো তবে ভোগের জন্য পূর্ণ যৌবনে কেবলমাত্র একজন বিধবা এবং তাও বৃদ্ধা নারী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন না। ইতিহাস সাক্ষ্য যে, পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পরই অন্যান্য বিবাহ করেছেন। অবশেষে এটাও সত্য যে, মক্কার কুরাইশরা তাঁকে আরবের সার্বিক গুণে শ্রেষ্ঠা নারী প্রদানের প্রলোভনও দিয়েছিল। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন কঠোর ভাষায়। মূলকথা, আল্লাহর নবী নারী বা রিপু আসক্ত ছিলেন না; বরং ইসলামের প্রচারের লক্ষ্যে এবং বিভিন্ন জন ও গোত্রের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বমোট ১১টি বিবাহ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য বিবিগণের মধ্যে সমতা রক্ষা করা অপরিহার্য ছিল কিনা? কারো একাধিক স্ত্রী থাকলে সমতা রক্ষা করে তাদের নিকট রাত্রিযাপন করা অপরিহার্য। এটা না করলে সে গুনাহগার হবে। এ সম্পর্কে আলোচ্য পরিচ্ছেদের শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখান প্রশ্ন হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্যও এ সমতা রক্ষা করা অপরিহার্য ছিল কিনা? ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) বলেন, রাসূল ﷺ -এর জন্য স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা অপরিহার্য ছিল না। কেননা, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ -কে স্বাধীনতা দিয়ে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন–

تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُئْوِيْ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ.

অর্থাৎ তাদের [স্ত্রীদের] মধ্যে আপনি যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন, আর যাকে যতদিন ইচ্ছা আপনার নিকটে রাখতে পারেন। –[সূরা আহযাব– ৫১]

স্ত্রীদের নিকট গমনের ব্যাপারে রাসূল ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলা স্বাধীনতা দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁদের মাঝে সমতা রক্ষা করে চলতেন। স্ত্রীদের অন্তরে যেন সামান্য অনুতাপ বা ব্যথার উদ্রেক না হতে পারে, সে ব্যাপারে রাসূল ﷺ যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ আদর্শ উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। এর মধ্যে তাদের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয়।

স্ত্রীদের জন্য পালা নির্ধারণের বিধান : এখানে 'ক্বাসম' অর্থ একাধিক স্ত্রীদের কাছে পালাক্রমে রাত্রি-যাপন করা। শরীয়াহ্ আইনে সাধারণ মুসলমানের জন্য একসাথে চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি আছে, এর অধিক জায়েজ নেই। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের এবং রাত্রি-যাপনের ব্যাপারে সকলের প্রতি সমান ব্যবহার ও আচরণ করা উম্মতের উপর আবশ্যক, এর ব্যতিক্রম করা অন্যায়।

যদি কোনো স্ত্রীর প্রতি এ অনাকাঙ্ক্ষিত অত্যাচার করা হয় তবে তা শোধরানো একান্ত কর্তব্য। এমনকি নির্দিষ্ট স্ত্রীর পালার রাত্রে সেই স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো স্ত্রীর কাছে যাওয়া বৈধ নয়।

নির্ধারিত স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য স্ত্রীর নিকট রাত্রি-যাপন করা শরিয়তে নিষেধ। ফলকথা যার একাধিক স্ত্রী রয়েছে তাদের জন্য এ বিষয়টি পরিপূর্ণ জ্ঞাত হওয়া অপরিহার্য। এর ব্যতিক্রমকারীদের জন্য অপরাপর হাদীসে কিয়ামতে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য কুমারী ও বিধবা, নতুন ও পুরাতন স্ত্রীর সাথে সহ অবস্থান বা রাত্রি-যাপনের ব্যাপারে সামান্য কিছু পার্থক্য আছে। তা ফিকহের কিতাবের সাহায্যে অবগত হতে হবে।

قَوْلُهُ كَانَ يَقْسِمُ مِنْهُنَّ لِثَمَانٍ -এর ব্যাখ্যা : রাসূল ﷺ -এর সর্বমোট বিবি ছিলেন এগারোজন। তাদের মধ্যে নয়জন রাসূল ﷺ -এর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। নবী করীম ﷺ তাদের মধ্যে আটজনের নিকট পালাক্রমে রাত্রিযাপন করতেন। হযরত সাওদা (রা.) নিজের ভাগ্যের রাত্রিটিকে হযরত আয়েশা (রা.)-এর জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি এটা ছিল তার বিশেষ অনুগ্রহ। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-এর জন্য দুই রজনী নির্ধারণ করলেন। এক স্ত্রীর সম্মতিক্রমে তার জন্য নির্ধারিত সময় অন্য স্ত্রীর নিকট অতিবাহিত করা বৈধ।

وَعَنْ ٣٠٩٢ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا كَبِرَتْ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِيْ مِنْكَ لِعَائِشَةَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ . (متفق عليه)

৩০৯২. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহধর্মিণী হযরত সাওদা বার্ধক্যে উপনীত হওয়ায় তিনি রাসূল ﷺ -কে বলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার অংশের দিন [রাত্রি যাপন] আয়েশাকে প্রদান করলাম। অতঃপর তিনি আয়েশার জন্য দুই দিন নির্ধারণ করেন, একদিন তার নিজের আর একদিন সাওদার। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যদি কোনো স্ত্রী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে স্বীয় পালা অন্য স্ত্রীকে ছেড়ে দেয়, তাহলে তা বৈধ; কিন্তু স্ত্রীর উপর স্বামীর কোনো প্রকারের চাপ শাস্তি প্রয়োগের দ্বারা হলে তা সম্পূর্ণ অবৈধ।

রাসূল ﷺ যে কামচরিতার্থ করার জন্য একাধিক বিবাহ করেননি, অত্র হাদীস হতে তা প্রতীয়মান হয়। কেননা, যদি তা-ই হতো তবে কুমারী বিবি আয়েশার জন্য অধিক পালা নির্ধারণ করতেন।

وَعَنْهَا ٣٠٩٣ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا يُرِيْدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُوْنُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِيْ بَيْتِ عَائِشَةَ حَتّٰى مَاتَ عِنْدَهَا - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩০৯৩. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্তিম রোগকালীন [পুনঃপুন] জিজ্ঞেস করতেন, আগামীকাল আমি কোথায়? [কাটাব] আগামীকাল আমি কোথায়? হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এই [পুনঃপুন] জিজ্ঞাসার অর্থ ছিল আয়েশার পালা কবে? এতে তাঁর সকল স্ত্রী তাঁকে যেখানে ইচ্ছা কাটানোর অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-এর গৃহে অবস্থান করেন এবং তার নিকট থাকাকালীন ইন্তেকাল করেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নবী করীম ﷺ -এর উপর পালা-বণ্টন ওয়াজিব কিনা? ইমাম শাফেয়ী (র.) সহ কিছু সংখ্যক ইমামের মতে রাসূল ﷺ -এর উপর পালা-বণ্টন করা ওয়াজিব ছিল। তাঁরা আলোচ্য হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন।

আর হানাফী ইমামগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর এই কাসামাত রক্ষা করা ওয়াজিব ছিল না। কেননা, কুরআনে উল্লেখ আছে– تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيْ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ 'আপনি তাদের [বিবিদের] মধ্যে যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট হতে

দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন।' –[আহযাব] এ আয়াতের আলোকে বুঝা যায় বিবিদের নিকট রাত্রির যাপনের ব্যাপারে মহানবী ﷺ স্বেচ্ছা ও স্বাধীন ছিলেন। তবে তিনি উম্মতের তা'লীম ও অনুগ্রহ বশত কাসামত রক্ষা করে চলতেন। আলোচ্য হাদীস কুরআনের মোকাবিলায় গ্রহণযোগ্য নয়।

وَعَنْهَا ٣٠٩٤ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩০৯৪. অনুবাদ : উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফরে বের হতেন তখন তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে লটারি করতেন, যার নাম উঠত তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সফরের সময় লটারি দ্বারা হক বণ্টন করার বিধান : স্বামী সফরে যাওয়ার কালে একাধিক স্ত্রীর কোনো একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য লটারি করা জরুরি নয়, যে কোনো একজনের সঙ্গে নিতে পারে, তবে লটারি করে নিলে কারো মনঃক্ষুণ্ন হওয়ার সুযোগ থাকে না বিধায় তা করা মোস্তাহাব। এটা হানাফীগণের অভিমত। শাফেয়ীগণ আলোচ্য হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে ঐরূপ ক্ষেত্রে লটারি করা ওয়াজিব বলেন। হানাফীগণ এর জবাবে বলেন যে, কেউ মনঃক্ষুণ্ন যাতে না হয়, তজ্জন্য লটারি করা হতো, ওয়াজিব হিসেবে নয়।

উল্লেখ্য যে, যে সমস্ত হকের মীমাংসায় দাবিদারগণের মতৈক্য হতে পারে, সেক্ষেত্রে লটারি জায়েজ এবং যে সমস্ত ক্ষেত্রে হক বা প্রাপ্য অংশ শরিয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট অথবা যা হওয়ার পর্যায়ে পড়ে সে সকল ক্ষেত্রে লটারী দ্বারা হক নির্ধারণ নিষিদ্ধ।

وَعَنْ ٣٠٩٥ أَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلٰثًا ثُمَّ قَسَمَ قَالَ أَبُوْ قِلَابَةَ وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩০৯৫. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত আবূ কিলাবা হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, সুন্নত তরীকা এই যে, কোনো ব্যক্তি পূর্ব বিবাহিতা স্ত্রী থাকতে কুমারী বিবাহ করলে তার নিকট ৭ দিন অবস্থান করে পরে অংশ নির্ধারণ করবে এবং বিধবা [বা তালাকপ্রাপ্তা] বিবাহ করলে তার নিকট ৩ দিন অবস্থান করে পরে বণ্টন করবে। আবূ কিলাবা (রা.) বলেন, যদি আমি বলতে ইচ্ছা করি তবে বলব যে, হাদীসটি হযরত আনাস (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন [তাহলে যথার্থ বলব, মিথ্যা কথন হবে না]। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : শাফেয়ীগণ এ ধরনের হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন যে, এক বা একাধিক স্ত্রী বর্তমান থাকতে কুমারী বিবাহ করলে বাসর রজনীসহ সাত দিন তার নিকট অবস্থান, অনুরূপভাবে বিধবা বিবাহ করলে তার নিকট তিনদিন অবস্থান বণ্টন করবে। পক্ষান্তরে হানাফীগণ নতুন, পুরাতন, কুমারী ও পূর্ব বিবাহিতা সকলের জন্য সমানভাবে রাত্রিযাপনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কুরআন মাজীদের ৪ : ৩ আয়াতে সমতা বিধানের নির্দেশে কোনো ব্যতিক্রম পর্যায়ের উল্লেখ নেই; বরং সাধারণভাবে সমতা বিধানের জোর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য হাদীসে– কুমারীর নিকট সাতদিন, পূর্ব বিবাহিতার জন্য তিনদিন-এর উল্লেখের পরে বণ্টন করবে– কথার অর্থ অন্যদের বেলায়ও সাতদিন বা তিনদিনের হিসেবে বণ্টন করবে।

আবূ কিলাবার কথার তাৎপর্য : হযরত আনাস (রা.) কিভাবে এটা বর্ণনা করেছেন, তা সঠিকভাবে মনে না থাকায় এবং এ ধরনের বিধান কিয়াস বা যুক্তির দ্বারা বলেননি; বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শুনেই বলেছেন। যেহেতু সঠিক কথা মনে নেই, 'তাই আমি এভাবে বলছি', এ বক্তব্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ব্যতীত আনাস (রা.)-এর নিজের নয়। আবূ কিলাবার এ বর্ণনার যথার্থ কারণ– হাদীসটি আরো অনেকে হযরত আনাস (রা.) হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুস্পষ্ট উল্লেখ করত মারফূ'ভাবে বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ٣٠٩٦ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا لَيْسَ بِكِ عَلٰى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَ دُرْتُ قَالَتْ ثَلِّثْ وَفِىْ رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ لَهَا لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلٰثٌ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩০৯৬. **অনুবাদ :** হযরত আবূ বকর ইবনে আব্দুর রহমান (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মে সালামাকে বিবাহ করার পর যখন তিনি তার খেদমতে আসেন, তখন তাকে বললেন, তুমি তোমার আপনজনের নিকট হেয় নও; যদি তুমি ইচ্ছা কর তবে আমি তোমার নিকট সাতদিন কাটাব। এমতাবস্থায় অন্য স্ত্রীগণের নিকটও সাতদিন করে কাটাব। আর যদি তুমি চাও তবে তোমার নিকট তিনদিন কাটাব এবং তিনদিন করে পালা নির্ধারণ করব। হযরত উম্মে সালামা (রা.) বললেন, তিনদিনের পালা নির্ধারণ করুন। অপর বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন, কুমারীর জন্য সাতদিন, পূর্ব বিবাহিতার জন্য তিনদিন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَيْسَ بِكِ عَلٰى أَهْلِكِ هَوَانٌ-**এর মর্মার্থ :** 'তোমার কারণে তোমার বংশের অমর্যাদা হবে না।' অর্থাৎ তোমার নিকট আমার তিনরাত যাপন করায় তোমার বা তোমার বংশের প্রতি আমার পক্ষ হতে অবহেলা বা অমর্যাদা প্রদর্শন বুঝাবে না। কেননা, তুমি বিধবা, বিবাহিতার নিকট তিনরাত থাকাই শরয়িতের বিধান।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٠٩٧ عَائِشَةَ (رضـ) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِىْ فِيْمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِىْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ)

৩০৯৭. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের মাঝে ইনসাফের সাথে [রাত্রি-যাপন ইত্যাদি] বণ্টন করতেন ও আল্লাহ তা'আলার দরবারে বলতেন, ইয়া আল্লাহ! এই আমার আয়ত্তাধীন [বিষয়]-এর বণ্টন, আর যে বিষয় তোমার আয়ত্তে ও আমার আয়ত্তের বাইরে [মনের টান ও ভালোবাসা] সে বিষয়ে তুমি আমার অপরাধ নিও না। -[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ-**এর ব্যাখ্যা :** রাসূল ﷺ আল্লাহর নিকট এই বলে ফরিয়াদ করতেন যে, স্ত্রীদের মাঝে বাহ্যিক সমতা রক্ষা করে চলা যেহেতু আমার আয়ত্তাধীন, সেহেতু তা আমি করে আসছি। পক্ষান্তরে কোনো কোনো স্ত্রীর প্রতি বিশেষভাবে হৃদয়ের টান, গভীর ভালোবাসার উদ্রেক ঘটে। এ হৃদয়ের উপর মানুষের কোনো হাত নেই। কেননা, আল্লাহ তা'আলাই হলেন কলব বা হৃদয়ের পরিবর্তনের মালিক। অতএব, রাসূল ﷺ বলেন, হৃদয় যদি কোনো স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে যায়, তবে হে প্রভু! তুমি একে অপরাধ মনে করে আমাকে তিরস্কার করো না।

وَعَنْ ٣٠٩٨ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ)

৩০৯৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোনো পুরুষের দুই স্ত্রী থাকলে তাদের মাঝে যদি ন্যায়ের সাথে সমতা রক্ষা না করে, তবে সে কিয়ামত দিবসে একপার্শ্ব ভঙ্গ অবস্থায় উঠবে [অর্থাৎ একপাশ অবশ হয়ে যাবে]। -[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কারো একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের খাদ্য, বস্ত্র এবং তাদের কাছে রাত্রি-যাপনের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব। এটা যে না করবে, সে গুনাহগার হবে। হাদীসে বলা হয়েছে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিবসে এক পার্শ্ব ভঙ্গ অবস্থায় উঠবে। এটা হবে তার জন্য লজ্জাজনক ব্যাপার। হাদীসে যেমন স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষার কঠোর নির্দেশ রয়েছে, অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনেও এ ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ পাওয়া যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন- فَإِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً (اَلنِّسَاء) অর্থাৎ যদি তোমাদের আশঙ্কা থাকে যে, তোমরা সমতা রক্ষা করতে পারবে না, তবে এক স্ত্রী গ্রহণ করবে। -[সূরা নিসা]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٠٩٩ عَطَاءٍ (رضـ) قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُوْنَةَ بِسَرِفَ فَقَالَ هٰذِهٖ زَوْجَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوْهَا وَلَا تُزَلْزِلُوْهَا وَارْفِقُوْا بِهَا فَاِنَّهٗ كَانَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ كَانَ يَقْسِمُ مِنْهُنَّ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ قَالَ عَطَاءٌ اَلَّتِيْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَقْسِمُ لَهَا بَلَغَنَا اَنَّهَا صَفِيَّةُ وَكَانَتْ اٰخِرَهُنَّ مَوْتًا مَاتَتْ بِالْمَدِيْنَةِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَقَالَ رَزِيْنٌ قَالَ غَيْرُ عَطَاءٍ هِيَ سَوْدَةُ وَهُوَ اَصَحُّ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ حِيْنَ اَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَاقَهَا فَقَالَتْ لَهٗ اَمْسِكْنِيْ قَدْ وَهَبْتُ يَوْمِيْ لِعَائِشَةَ لَعَلِّيْ اَكُوْنُ مِنْ نِسَائِكَ فِي الْجَنَّةِ -

৩০৯৯. অনুবাদ : বিখ্যাত তাবেয়ী [হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বিশিষ্ট ছাত্র] আতা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সারিফ নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহধর্মিণী হযরত মায়মূনা (রা.)-এর জানাজায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সাথে উপস্থিত হলাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) উপস্থিত লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দেখ, সাবধান! ইনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহধর্মিণী, তোমরা যখন তাঁর লাশ বহনের জন্য উঠাবে, তখন ঝাঁকি দিও না, হেলাইও না, খুব সন্তর্পণে [তাযীমের সাথে] উঠাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নয়জন স্ত্রী ছিল, তন্মধ্যে আটজনের জন্য অংশ বণ্টন করতেন এবং একজনের জন্য করতেন না। বর্ণনাকারী আতা (র.) বলেন, যে স্ত্রীর জন্য অংশ বণ্টন করতেন না, আমার জানা মতে তিনি সফিয়্যাহ (রা.)। তিনি সহধার্মিণীগণের মধ্যে সর্বশেষ মদিনায় ইন্তেকাল করেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

[মেশকাত গ্রন্থকার বলেন,] এতদসম্পর্কে হাদীসের বিখ্যাত ইমাম রাযীন বলেন, আতা ব্যতীত অন্য [বর্ণনাকারী] হাদীস বিশারদগণ বলেছেন, উক্ত সহধর্মিণীর নাম হযরত সাওদা (রা.), এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। কোনো কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তালাক প্রদানের অভিপ্রায় প্রকাশ করলে তিনি নিজের অংশ হযরত আয়েশা (রা.)-কে দান করে বলেন যে, আপনি আমাকে আপনার পত্নীতে রাখুন, [এ মর্যাদা হতে আমাকে বঞ্চিত করবেন না] যাতে জান্নাতে আমি আপনার পত্নীগণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। [তালাক দিলে এই এই সৌভাগ্য অর্জন করতে পারব না।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

টীকা : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহধর্মিণীগণের ওফাতের সন- ১. হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)- ২০ হিজরি, ২. হযরত উম্মে হাবীবা (রা.)- ৪৪ হিজরি, ৩. হযরত হাফসা (রা.)- ৪৫ হিজরি, ৪. হযরত সফিয়্যাহ (রা.)- ৫০ হিজরি, ৫. হযরত জুয়াইরিয়্যা (রা.)- ৫০ হিজরি, ৬. হযরত মায়মূনা (রা.) - ৫১ হিজরি, ৭. হযরত সাওদা (রা.)- ৫৪ হিজরি, ৮. হযরত আয়েশা (রা.)- ৫৭ হিজরি, (৯) হযরত উম্মে সালামা (রা.)- ৫৯ হিজরি সনে ও ১০. প্রথমা স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা.) তাঁর জীবদ্দশায় হিজরতের তিন বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেন এবং ১১. যয়নব বিনতে খুযাইমা (রা.) রাসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় ৪র্থ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْحُقُوْقِ

পরিচ্ছেদ : স্ত্রীগণের সাথে সদ্ব্যবহার এবং স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক হক ও কর্তব্য

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣١٠٠ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلْعِ اَعْلَاهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩১০০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা নারীদের সম্পর্কে আমার অসিয়ত [নির্দেশ] গ্রহণ কর, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের পাঁজরের হাড় হতে সৃষ্টি করা হয়েছে, পাঁজরের হাড়ের মধ্যে সর্বাধিক বাঁকা উপরের হাড়খানা [আদম (আ.)-এর এ হাড় হতে মা হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল– বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ] যদি তুমি ঐ হাড়কে সোজা করতে যাও, তবে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি রেখে দাও, তবে সব সময় বাঁকা থাকবে। অতএব, তোমরা নারীদের সম্পর্কে আমার উপদেশ গ্রহণ কর। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নারী জাতির আদি তথা হযরত হাওয়া (আ.)-কে হযরত আদম (আ.)-এর পাঁজরের বাঁকা হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, সম্ভবত এ কারণে তাদের স্বভাব-চরিত্রেও বক্রভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তুচ্ছ ব্যাপারকে তারা অনেক সময় তালগোল পাকিয়ে ফেলে। কথায় কথায় পুরুষদের সাথে চটে যায়। অত্র হাদীসে রাসূল ﷺ এ ক্ষেত্রে পুরুষদেরকে একটি কৌশল শিক্ষা প্রদান করেছেন। স্ত্রীদেরকে সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে বশে আনতে বলেছেন। তাদেরকে বেশি শাসাতে গেলে সংঘাত-সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেবে, যা পরবর্তীতে বিচ্ছেদের কারণও হতে পারে। আর তাদেরকে স্বেচ্ছারিতার মধ্যেও ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। এতে তারা বেয়াড়া ও বেপরোয়া হয়ে উঠবে। নারী জাতি শাঁখের করাত। অতএব, কৌশলে সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের নিকট হতে কার্য সমাধা করিয়ে নিতে হবে।

٣١٠١ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ لَنْ تَسْتَقِيْمَ لَكَ عَلٰى طَرِيْقَةٍ فَاِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩১০১. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নারীকে পাঁজরের হাড় হতে সৃষ্টি করা হয়েছে, কখনও সে তোমার জন্য সোজা হবে না। যদি তুমি তার নিকট হতে উপকার ভোগ করতে চাও, তবে ঐ বক্রাবস্থায় উপকার ভোগ কর। তুমি যদি সোজা করতে যাও, তবে ভেঙ্গে ফেলবে, ভেঙ্গে ফেলা অর্থ তাকে তালাক প্রদান করা। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীসের মর্মার্থ এটা নয় যে, 'নারীর অনুগত হয়ে চলতে হবে'; বরং দম্পতির মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ বিদ্যমান থাকাই সবচেয়ে উত্তম। তাদের স্বভাব প্রকৃতিই যখন বক্র সুতরাং জোর করে তাকে সোজা করার মানসিকতা পরিহার করতে হবে; বরং সদুপদেশ, সৌহার্দপূর্ণ আচরণ ও সদ্ব্যবহার দ্বারা তাকে গাইড করতে হবে, ফলে আস্তে আস্তে তার বক্রতা শিষ্টাচারে রূপ নেবে। অনেক অবচীন স্ত্রীকে জোর করে স্বীয় অনুগত করতে চায় বিধায় তাদের মধ্যে তালাক-বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়ে যায়।

وَعَنْهُ ٣١٠٢ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا اٰخَرَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩১০২. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলিম পুরুষ মুসলিম নারীকে যেন ঘৃণা না করে, যদি তার এক ব্যবহারে সে অসন্তুষ্ট হয় তবে অন্য আর এক ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : স্বীয় স্বভাব বিরোধী স্ত্রীর কোনো কাজ কিংবা ব্যবহার দেখে হঠাৎ রাগান্বিত হওয়া ঈমানদারের জন্য শোভনীয় নয়। কেননা, মু'মিন স্ত্রীর সব কাজই খারাপ বা অপছন্দনীয় হতে পারে না। সুতরাং ক্রমান্বয়ে তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করবে।

وَعَنْهُ ٣١٠٣ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلَا بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ اُنْثٰى زَوْجَهَا الدَّهْرَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩১০৩. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বনী ইসরাঈল না হলে গোশ্‌ত পঁচে যেত না, হাওয়া [বিবি হাওয়া] না হলে কখনো কোনো নারী স্বামীর খেয়ানত করত না। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বনী ইরসাঈলগণ 'তীহ' ময়দানে অবস্থানকালে প্রতিদিন 'মান্না' নামক এক প্রকার মিষ্টি দ্রব্য এবং 'সালওয়া' নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র পাখির গোশ্‌ত রান্না করা অবস্থায় তাদের জন্য আকাশ হতে দান করা হতো এবং খাওয়ার প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমা করে রাখতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা লোভে পড়ে জমা করে রাখতে লাগল, ফলে শাস্তিস্বরূপ তাতে পচন ধরে গেল। গোশ্‌ত পচনের সূচনা এখান হতে শুরু হয়েছে।

কথিত আছে যে, হযরত হাওয়া (আ.) হযরত আদম (আ.)-এর পূর্বেই নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলেন এবং পরে তা খাওয়ার জন্য হযরত আদম (আ.)-কে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এখান হতে নারী কর্তৃক স্বামীর খেয়ানত বা অবাধ্যতার সূচনা হলো। মূলত এটা তার বক্র স্বভাবের কারণেই হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, হাদীসটি রিওয়ায়াতগত সহীহ হলেও দেরায়াতগত তা বিবেচনার যোগ্য।

وَعَنْ ٣١٠٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَجْلِدْ اَحَدُكُمْ اِمْرَاَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِيْ اٰخِرِ الْيَوْمِ وَفِيْ رِوَايَةٍ يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ اِمْرَاَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا فِيْ اٰخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِيْ ضِحْكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ فَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ اَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩১০৪. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যামআ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন গোলামের ন্যায় স্ত্রীকে না মারে, অথচ দিনের শেষে তার সাথে সহবাস করবে। অপর বর্ণনায় আছে- কেউ যেন স্ত্রীকে গোলামের ন্যায় মারতে উদ্যত না হয়, হয়তো দিন শেষে তার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতে চাইবে আর সে এতে এগিয়ে আসবে না। অতঃপর তাদের বায়ু নিঃসরণে হাসার কারণে উপদেশ দিলেন যে, যে কাজ তুমি কর অন্যের সে কাজে কেন হাস! -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : স্ত্রী হলো স্বামীর সহধর্মিণী, মধুর রাত্রি যাপনের একান্ত সাথি, ফুলশয্যার আনন্দ বিহারিণী, সর্বাবস্থায় স্বামীর সুখ-দুঃখের সমভাগী। অতএব, এ স্ত্রীর সাথে সদা-সর্বদা সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করা বাঞ্ছনীয়। স্ত্রীকে বেদম প্রহার করা, দাস-দাসীর ন্যায় আচরণ করা, তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখা-এটা হীনম্মন্যতার পরিচায়ক। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, যে স্ত্রীর সাথে দিবসে অসদাচরণ করা হলো, তাকে প্রহার করা হলো, সে স্ত্রীর সাথে রাত্রি যাপন করা, মধুর আলিঙ্গনে মিলিত হওয়া লজ্জাকর ঘটনা বৈ কি! এহেন ঘৃণিত কার্য হতে বিরত থাকাই আলোচ্য হাদীসের শিক্ষা। তবে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে মৃদু প্রহার করা শরিয়ত সমর্থিত।

قَوْلُهُ الضَّحِكُ مِنَ الضَّرْطَةِ -এর ব্যাখ্যা : মানুষের উদর হতে বায়ু নিঃসরণ হওয়া একটি প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত ব্যাপার। আর এটা নিঃসরণকালে হাসাও মানুষের একটি স্বভাব। কিন্তু এ কারণে হাসা একটি ঘৃণিত কাজ। কেননা, এটা হতে কেউই মুক্ত নয়। তাই রাসূল ﷺ কোনো এক মজলিসে সাহাবীগণকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, 'যে কাজ তুমিও কর, অন্যের সে কাজে কেন হাস।' আল্লামা তীবী (র.) বলেন, অত্র হাদীস দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জ্ঞানী ব্যক্তিদের প্রথমে উচিত যখন সে অন্য মুসলমান ভাই-এর সমালোচনা করতে উদ্যত হয়, তখন সে অপরাধ তার মধ্যে আছে কিনা এটা নিরীক্ষণ করা। যদি সে তা হতে মুক্ত না হয়, তবে সে ব্যাপারে অন্যের সমালোচনা করা হতে বিরত থাকাই শ্রেয়। মানুষ স্বভাবত অন্যের দোষ-ত্রুটিই বেশি বেশি দেখে থাকে এবং নিজের দোষকে দোষ বলে মনে হয় না। যেমন, কোনো আরবি কবি বলেন–

أَرٰى كُلَّ اِنْسَانٍ يَرٰى عَيْبَ غَيْرِهٖ * وَيَعْمٰى عَنِ الْعَيْبِ الَّذِىْ هُوَ فِيْهِ.

অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ অন্যের দোষই দেখে থাকে এবং নিজের দোষের ব্যাপারে সে হয় অন্ধ।

وَعَنْ ٣١٠٥ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كُنْتُ اَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ لِيْ صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِيْ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ يَنْقَمِعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ اِلَىَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِيْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩১০৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি আমার খেলার পুতুল মেয়েদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গৃহে খেলতাম [ঐ সময়ে তাঁর বয়স মাত্র ৯ বছর ছিল] এবং আমার সখীগণ আমার সাথে খেলতে আসত। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ গৃহে প্রবেশ করতেন, তখন তারা লুকিয়ে যেত। অতঃপর তিনি তাদেরকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিতেন এবং তারা আমার সাথে খেলত। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আয়েশা (রা.) নয়-দশ বৎসর বয়সে সমবয়সী সখীদের সাথে পুতুল দ্বারা খেলতেন। যেমন– আমাদের সামাজের ছোট ছোট মেয়েরা কাপড় দ্বারা পুতুল তৈরি করে খেলা করে। ছোট বয়সে এ জাতীয় খেলা করা জায়েজ। বস্তুত শিশুকালের পর বেশি বড়রা পুতুল নিয়ে খেলা করে না। তবে স্মরণ রাখতে হবে– হযরত আয়েশার পুতুল খেলা বর্তমান যুগের তৈরি পুতুল মূর্তি ছিল না। আধুনিক কালের তৈরি বিভিন্ন প্রাণী মূর্তির পুতুল দ্বারা ঘরকে সাজানোর যে প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে এটা মূর্তি পূজারই নামান্তর। অতএব, এটা রাখা হারাম।

অত্র হাদীসের আলোকে ওলামাগণ বলেছেন– জায়েজ পন্থায় বিবির মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করা উত্তম। আর নবী করীম ﷺ যে বিবিদের সাথে সদাচরণ ও মনোরঞ্জনময় ব্যবহার করতেন তা প্রমাণের জন্য এ হাদীসের দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

وَعَنْهَا ٣١٠٦ قَالَتْ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْمُ عَلٰى بَابِ حُجْرَتِيْ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ بِالْحِرَابِ فِى الْمَسْجِدِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتُرُنِيْ بِرِدَائِهٖ لِاَنْظُرَ اِلٰى لَعِبِهِمْ بَيْنَ اُذُنِهٖ وَعَاتِقِهٖ ثُمَّ يَقُوْمُ مِنْ اَجْلِيْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَنَا الَّتِيْ اَنْصَرِفُ فَاقْدُرُوْا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيْثَةِ السِّنِّ الْحَرِيْصَةِ عَلَى اللَّهْوِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩১০৬. অনুবাদ : উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমার হুজরার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি, যে সময়ে [ঈদের দিনে] হাবশী [কাফরি] যুবকগণ মসজিদ প্রাঙ্গনে নেযা নিয়ে খেলা করছিল, আমি যাতে তাঁর ঘাড় ও কানের ফাঁক দিয়ে তাদের খেলা দেখতে পারি তজ্জন্য তিনি তাঁর চাদর দ্বারা আমাকে আবৃত করে রেখেছিলেন এবং আমার খাতিরে ঐ সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলেন যতক্ষণ না আমি নিজে সরে আসলাম। [হযরত আয়েশা (রা.) হাদীস শ্রবণকারী শিষ্যদের উদ্দেশ্য করে বলেন,] একজন কচি বয়সের মেয়ে যার খেলা দেখার প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে, সে কতক্ষণ এভাবে খেলা দেখতে উৎসুক থাকবে, সে সময়ের দৈর্ঘ্য তোমরা নিজেরাই অনুমান করতে পার। [অর্থাৎ বহু দীর্ঘ সময় আমি এ খেলা দেখছিলাম এবং এ দীর্ঘ সময় তিনি আমার খাতিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।]– [বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَلْعَبُوْنَ بِالْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ -এর মর্মার্থ : আলোচ্য হাদীসাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, হাবশী যুবকগণ মসজিদ প্রাঙ্গনে বর্শা-নেযা দ্বারা খেলা করত। এটা অবৈধ কোনো খেলাও ছিল না; বরং এটা ছিল সামরিক ট্রেনিং, ইসলাম বৈরীদের আক্রমণকে প্রতিহত করার কৌশল শিক্ষা মাত্র। হাদীসাংশের মর্মার্থ এটাও হতে পারে যে, হাবশী যুবকগণ মসজিদের মধ্যেই উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করত। فِيْ অব্যয়টিই এটা প্রমাণ করে। বস্তুত মসজিদে নববীর বাইরের জায়গার সংকীর্ণতার কারণে সম্ভবত এটা হয়েছিল। মূলত কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার প্রশিক্ষণ এক প্রকার ইবাদতেরই অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন- وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ

অর্থাৎ আর এ কাফিরদের [সাথে মোকাবিলার] জন্য তোমাদের সাধ্যানুযায়ী অস্ত্রাদি দ্বারা এবং প্রতিপালিত অশ্বাদি দ্বারা সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখ, যা দ্বারা তোমরা প্রভাব বিস্তার করে রাখতে পার, সে সকল লোকের উপর, যারা আল্লাহ তা'আলার শত্রু এবং তোমাদেরও শত্রু। -[সূরা আনফাল : আয়াত- ৬০]

অতএব, মসজিদ প্রাঙ্গনে এ ধরনের খেলা শরিয়ত সমর্থিত; কিন্তু এর উপর ভিত্তি করে পার্থিব অবৈধ খেলাকে বৈধ বলে ফতোয়া দেওয়া জায়েজ হবে না।

হযরত আয়েশা (রা.) কিভাবে পরপুরুষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন? মহিলাদের প্রতি দৃষ্টি ফেরানো পুরুষদের জন্য যেমন হারাম, অনুরূপভাবে মহিলাদেরও পুরুষদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হারাম, তবে হযরত আয়েশা (রা.)-এর জন্য কিভাবে বৈধ হলো খেলায় মত্ত হাবশী যুবকদের দিকে তাকানো?

এর উত্তরে বলা যেতে পারে, হযরত আয়েশা (রা.)-এর এ ব্যাপারেটি পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের ঘটনা ছিল। আল্লামা তুরপুশতী (র.) এ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন।

অথবা, বলা যেতে পারে, এ ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার সময় হযরত আয়েশা (রা.) নাবালিকা ছিলেন। আর নাবালিকার জন্য অন্য পুরুষের দিকে তাকানো হারাম নয়।

অথবা, এটাও বলা যেতে পারে যে, খেলায় রত হাবশী ছেলেগুলোও ছিল অল্প বয়সের। তাই নাবালেগ ছেলেদের দিকে তাকানো হারাম নয়। সুতরাং হযরত আয়েশা (রা.) হতে শরিয়ত গর্হিত কোনো কাজ সংগঠিত হয়নি।

٣١٠٧ وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ لَاَعْلَمُ اِذَا كُنْتِ عَنِّيْ رَاضِيَةً وَاِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبٰى فَقُلْتُ مِنْ اَيْنَ تَعْرِفُ ذٰلِكَ فَقَالَ اِذَا كُنْتِ عَنِّيْ رَاضِيَةً فَاِنَّكِ تَقُوْلِيْنَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَاِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبٰى قُلْتِ لَا وَرَبِّ اِبْرَاهِيْمَ قَالَتْ قُلْتُ اَجَلْ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَهْجُرُ اِلَّا اسْمَكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩১০৭. অনুবাদ : উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আয়েশা! তোমার মন যখন আমার প্রতি প্রসন্ন থাকে এবং যখন অপ্রসন্ন হয় উভয় অবস্থা আমি বুঝতে পারি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিভাবে আপনি এটা বুঝতে পারেন? উত্তরে তিনি বললেন, যখন তোমার মন আমার প্রতি প্রসন্ন থাকে, তখন কথা প্রসঙ্গে শপথের প্রয়োজনে তুমি বল لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ [না, মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রভুর শপথ অর্থাৎ আমার নাম উচ্চারণে আনন্দ পাও] পক্ষান্তরে যখন তোমার মন আমার প্রতি অপ্রসন্ন থাকে তখন [কথা প্রসঙ্গে শপথের প্রয়োজনে] তুমি বল لَا وَرَبِّ اِبْرَاهِيْمَ [না, ইবরাহীম (আ.)-এর প্রভুর শপথ! অর্থাৎ তুমি আমার নাম উচ্চারণ কর না]। আমি বললাম, জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে আমি শুধু আপনার নামই পরিত্যাগ করি। [অর্থাৎ শুধু মুখে আপনার নাম উচ্চারণ করি না, কিন্তু অন্তরে আপনার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা, প্রেম-ভালোবাসা পূর্ণ মাত্রায় বজায় থাকে।] -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি যে অসন্তুষ্টির ভাব দেখাতেন, তা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম ও ভালোবাসা জনিত মান-অভিমান হিসাবে হতো। অন্যথা রাসূল হিসাবে হতো না। তাই তিনি স্পষ্টত বলে দিয়েছেন–আমি মুখে যা বলি তা অন্তরের কথা নয়।

وَعَنْ ٣١٠٨ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَى الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَاَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَتْهَا الْمَلٰئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُوْ اِمْرَأَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَتَاْبٰى عَلَيْهِ اِلَّا كَانَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتّٰى يَرْضٰى عَنْهَا -

৩১০৮. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন স্বামী তার স্ত্রীকে তার বিছানার দিকে আহ্বান করে আর স্ত্রী সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে এবং স্বামী অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত যাপন করে, তখন এ স্ত্রী এভাবে রাত্রি যাপন করে যে, ফেরেশতাগণ তার উপর লানত করতে থাকে রাত্রি ভোর হওয়া পর্যন্ত।–[বুখারী ও মুসলিম]

বুখারী ও মুসলিম উভয়ের অপর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কসম করে বলেন, যার হাতে আমার প্রাণ [অর্থাৎ আল্লাহর] তাঁর শপথ! কোনো পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে নিজের বিছানার দিকে আহ্বান করে আর স্ত্রী তা অস্বীকার করে, তবে আসমানের অধিকারী [আল্লাহ তা'আলা] তার উপর ক্রুদ্ধ হন যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট না হয়। [এ অসন্তুষ্টি ঐ অবস্থায় হবে যখন স্বামীর আহ্বানে সাড়া দিতে শরিয়তগত কোনো বাধা থাকবে না।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত বা অসন্তুষ্টি হবে তখন যখন স্বামীর আহ্বানে সাড়া দিতে শরিয়তের কোনো প্রকার বাধ্য না থাকে। অবশ্য অনেক সময় অসুস্থতার কারণে সাড়া নাও দিতে পারে। মূলত হাদীসের অর্থ হলো– কোনো প্রকারের ওজর ছাড়াই স্বামীর আহ্বানে সাড়া না দিলে তার উপর আল্লাহর পক্ষ হতে অভিশাপ বর্ষণ হতে থাকবে।

وَعَنْ ٣١٠٩ اَسْمَاءَ (رضـ) اَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ ضَرَّةً فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ اَنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِىْ غَيْرَ الَّذِىْ يُعْطِيْنِىْ فَقَالَ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطِ كَلَابِسِ ثَوْبَىْ زُوْرٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩১০৯. **অনুবাদ** : হযরত আসমা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, জনৈকা স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল, আমার এক সতীন আছে, এমতাবস্থায় আমি যদি স্বামী প্রদত্ত সামগ্রী অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণ লাভ করেছি এরূপভাব প্রকাশ করি, তাতে কি আমার গুনাহ হবে? তদুত্তরে তিনি বললেন, না পেয়েও পাওয়ার ভাব প্রকাশকারী যেন মিথ্যার দু-খানা পোশাক পরিধানকারী। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মিথ্যার দু-খানা কাপড় হয়তো জোর প্রদান বা আধিক্য বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে, অথবা মিথ্যা কথন ও ক্ষতিসাধনকে দু-খানা বলা হয়েছে। শব্দের ব্যাপকতার আওতায় ভিন্নধর্মী পোশাক পরিধানও এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে। যেমন– পীর-মাশায়েখের আবা-জোব্বা সাধারণ মানুষের পরিধান করা, অথবা পরের দামি পোশাক চেয়ে পরিধান করা ইত্যাদি।

وَعَنْ ٣١١٠ - أَنَسٍ (رضـ) قَالَ اٰلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَاَقَامَ فِيْ مَشْرَبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اٰلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ اِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩১১০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পতীগণের সাথে এক মাসের ঈলা করেছিলেন এবং সওয়ারি হতে পড়ে গিয়ে তাঁর [বাম] পায়ের হাড়ের জোড়া ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, ফলে তিনি উঁচু কুঠরিতে ঊনত্রিশ দিন অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর নেমে আসলে লোকেরা বলল, আপনি এক মাসের ঈলা করেছিলেন [অথচ উনত্রিশ দিনে নেমে আসলেন?] উত্তরে তিনি বললেন, মাস [চান্দ্রমাস] কখনও ঊনত্রিশ দিনেও হয়। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِيْلَاء-এর পরিচয় ও এর হুকুম : اِيْلَاء -এর শাব্দিক অর্থ হলো- শপথ করা। আর শরিয়তের পরিভাষায় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম না করার শপথ করা। 'ঈলা' দু প্রকার। مُؤَقَّتْ তথা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শপথ করা। مُؤَبَّدْ তথা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য শপথ করা। চার মাসের কম মুদ্দতের জন্য শপথ করলে এতে স্ত্রীর প্রতি কোনো প্রকারের তালাক পড়বে না। অবশ্য কসমের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। পক্ষান্তরে চার মাস বা তদূর্ধ্ব সময়ের জন্য কসম করলে চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই এক তালাক 'বায়েন' হয়ে যাবে। চার মাসের মধ্যে সহবাস করলে তালাক হবে না, তবে কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, চার মাসের কম মুদ্দতের জন্য সহবাস বর্জন করার শপথ করলে শরিয়তের দৃষ্টিতে ঈলা হবে না, অবশ্য শাব্দিক অর্থে ঈলা বলা হয়। শপথ ব্যতীত বহু বৎসরও স্ত্রীসহবাস বর্জন করলে তাতে যেমন তালাক হবে না, অনুরূপভাবে কাফ্ফারাও আদায় করতে হবে না। এ হিসাবে হুজুর ﷺ যে এক মাসের জন্য স্ত্রীদের নিকট হতে দূরে সরে ছিলেন তাতে শপথ বাক্য ছিল না বিধায় কসমের কাফ্ফারা আদায় করার যেমন প্রয়োজন হয়নি, তদ্রূপ চার মাসের কম মুদ্দতের কারণে বিবিদের উপর তালাকও পড়েনি।

مَشْرَبَة-এর পরিচয় : মসজিদে নববীর সাথে একখানা ছোট উঁচু কুঠরি ছিল। কোনো কোনো এলাকায় একে টোঙ বলে। সাধারণত মাছ ধরার উদ্দেশ্যে খাল বা বিলের ধারে মানুষ এগুলো তৈরি করে। মসজিদে নববীর সাথেও সাহাবীগণ সে রকম কুঠরি তৈরি করেছিলেন। একটি খেজুর গাছের কাণ্ড সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহারের জন্য তার গায়ে লাগানো ছিল। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনার অভ্যন্তরে গাধা বা খচ্চরের পিঠে চড়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ পড়ে গিয়ে পায়ের গিরার জোড়া বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে চলতে ফিরতে অক্ষম হওয়ায় উক্ত কুঠরিতে দীর্ঘদিন বিশ্রাম নিয়েছিলেন। অনেকে এ ঘটনাকে 'ঈলা'র ঘটনার সাথে এক করে একই সময়ে বলেছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনা পঞ্চম হিজরির এবং ঈলার ঘটনা নবম হিজরির। যেহেতু উভয় ঘটনায় উক্ত কুঠরিতে অবস্থান করেছিলেন বলে বর্ণনাকারী একই সঙ্গে বর্ণনা করেছেন, ঘটনা দুটি একই সময়ের নয়।

قَوْلُهُ وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ-এর ব্যাখ্যা : একদা মহানবী ﷺ মদিনার অভ্যন্তরে গাধা বা খচ্চরে সওয়ার হয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পড়ে যাওয়ার ফলে তাঁর পায়ের গিরা মচকে গিয়েছিল। এ অবস্থায় তিনি নামাজের জন্য মসজিদে হাজির হতে পারতেন না; বরং তিনি মাজুর অবস্থায় উক্ত কোঠায় নামাজ আদায় করতেন। তাঁর এই এক মাসের অবস্থান যদিও বিবিদের সাহচর্য হতে দূরে ছিল কিন্তু এটা শরয়ী ঈলা ছিল না। এক মাস আর ৩০ দিন এক কথা নয়। কেননা, ২৯ দিনেও চান্দ্রমাস পূর্ণ হয়ে থাকে। পরবর্তী হাদীস হতে বুঝা যায় যে, হুযূর ﷺ -এর পা মচকে যাওয়ার ঘটনা ও ঈলার ঘটনা এক নয়।

وَعَنْ ٣١١١ جَابِرٍ (رض) قَالَ دَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوْسًا بِبَابِهِ لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ قَالَ فَأُذِنَ لِأَبِيْ بَكْرٍ فَدَخَلَ ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ فَوَجَدَ النَّبِيَّ ﷺ جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ وَاجِمًا سَاكِتًا قَالَ فَقَالَ لَأَقُوْلَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ هُنَّ حَوْلِيْ كَمَا تَرٰى يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ فَقَامَ أَبُوْ بَكْرٍ إِلٰى عَائِشَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا وَقَامَ عُمَرُ إِلٰى حَفْصَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا كِلَاهُمَا يَقُوْلُ تَسْأَلِيْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ فَقُلْنَ وَاللّٰهِ لَا نَسْأَلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا أَبَدًا لَيْسَ عِنْدَهُ ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ ثُمَّ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ حَتّٰى بَلَغَ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا قَالَ فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا أُحِبُّ أَنْ لَا تَعْجَلِيْ فِيْهِ حَتّٰى تَسْتَشِيْرِيْ أَبَوَيْكِ قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَتَلَا

৩১১১. **অনুবাদ :** হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হবার মানসে অনুমতি প্রার্থনা করে দেখতে পেলেন যে, বহু লোক তাঁর গৃহদ্বারে উপবিষ্ট, তাদের প্রবেশানুমতি দেওয়া হয়নি। [রাবী বলেন,] তিনি হযরত আবূ বকর (রা.)-কে অনুমতি দিলেন এবং তিনি প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পরে হযরত ওমর (রা.) এসে অনুমতি চাইলে তাঁকেও অনুমতি দেওয়া হলো এবং তিনিও প্রবেশ করলেন। তিনি প্রবেশ করে দেখতে পেলেন তাঁর আশপাশে তাঁর সহধর্মিণীগণ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বিমর্ষ ও নীরব অবস্থায় বসা। হযরত ওমর (রা.) মনে মনে ঠিক করলেন যে, আমি এমন একটি উক্তি করব যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুশি হয়ে হেসে দেন। অতঃপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আপনি দেখতেন খারেজার দুহিতা [তদীয় পত্নী] আমার নিকট [মাত্রাতিরিক্ত] ভরণপোষণের খরচ চাইত, তবে আমি উঠে তার গলা [মুখ] চেপে ধরতাম। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে ফেললেন এবং বললেন, এরা আমার চারদিকে আছে দেখুন এরা আমার নিকট ভরণপোষণের [বেশি পরিমাণ] খরচ চাচ্ছে। এতে হযরত আবূ বকর (রা.) উঠে গিয়ে [স্বীয় কন্যা] আয়েশার ঘাড় চেপে ধরলেন। অনুরূপভাবে হযরত ওমর (রা.) [স্বীয় কন্যা] হাফসার ঘাড় চেপে ধরলেন এবং উভয়ে [আপন আপন কন্যাকে] বলতে লাগলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট যা নেই তা চেয়ে থাক। [এতদূর স্পর্ধা তোমার! আমার কন্যা হয়ে।] তখন সকলেই [সমস্বরে] বলল, আল্লাহর কসম! আমরা আর কখনও যা নেই তা তাঁর নিকট চাইব না [পূর্ব শপথ একমাস তোমাদের নিকট আসব না এর কারণে] তাদের হতে একমাস অথবা উনত্রিশ দিনের জন্য দূরে সরে রইলেন। অতঃপর এ আয়াত [৩৩ : ২৮, ২৯] নাজিল হয় অর্থাৎ 'হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বল, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদের ভোগ সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আখিরাত কামনা কর তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।' রাবী বলেন, [আয়াত নাজিলের পরে আয়াতের নির্দেশ শুনাবার উদ্দেশ্যে স্ত্রীগণের মধ্যে] হযরত আয়েশা (রা.) হতে প্রথম আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, হে আয়েশা! আমি তোমার সম্মুখে এমন এক বিষয় উত্থাপন করছি, যে বিষয়ে তোমার পিতামাতার সাথে পরামর্শ না করে তাড়াতাড়ি উত্তর দাও– তা আমি পছন্দ করি না [বরং পিতামাতার সাথে পরামর্শ করে উত্তর দাও। বুখারীর বর্ণনায় আছে– হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিশ্চিত বিশ্বাস

عَلَيْهَا الْآيَةَ قَالَتْ أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَسْتَشِيْرُ أَبَوَيَّ بَلْ أَخْتَارُ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَأَسْأَلُكَ أَلَّا تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِيْ قُلْتُ قَالَ لَا تَسْأَلُنِيْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَبْعَثْنِيْ مُعَنِّتًا وَلَا مُتَعَنِّتًا وَلٰكِنْ بَعَثَنِيْ مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

ছিল– পিতামাতা কখনও তাঁর হতে বিচ্ছিন্নতার পরামর্শ দেবেন না।] হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, কি সে বিষয়? ইয়া রাসূলাল্লাহ! অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে আয়াত তিলাওয়াত করে শুনালেন। এতদশ্রবণে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আপনার সম্পর্কে আমি পিতামাতার সাথে কি পরামর্শ করব, আমি তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাতের জীবন গ্রহণ করলাম। [আমি প্রাণ থাকতে আপনার বিচ্ছেদ চিন্তাও করব না।] অতঃপর তিনি নিবেদন করলেন, আমি যা বললাম, তা আপনার স্ত্রীগণের কাউকেও শোনাবেন না। তিনি বললেন, স্ত্রীগণের মধ্যে যে কেউ জিজ্ঞেস করবে, আমি তাকেই [তোমার উত্তর] শুনাব। আল্লাহ তা'আলা আমাকে কষ্ট প্রদানকারী এবং কারো অসুবিধায় সুযোগ গ্রহণকারীরূপে প্রেরণ করেননি; বরং আমাকে সুযোগদানকারী শিক্ষাদাতারূপে প্রেরণ করেছেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উল্লেখ্য যে, খায়বরের যুদ্ধে হুজুর ﷺ -এর হাতে গনিমতের কিছু মাল-আসবাব আসলে তাঁর বিবিগণ কিছু অতিরিক্ত খোরপোশ চাইলেন। তাঁদের দাবি হলো, এখন তো মালসম্পদ আছে সুতরাং অন্যান্যদের মধ্যে যেরূপ সচ্ছলতা এসেছে আমরা বিবিগণ কেন তা হতে বঞ্চিত হবো? বরং দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণ হতে আমাদেরও কিছুটা পরিত্রাণ লাভ করা উচিত। কিন্তু হুজুর ﷺ অতিরিক্ত কিছু দিতে রাজি ছিলেন না। কেননা, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্নরূপ। নবীর বিবিগণ ত্যাগ-তিতিক্ষা, কৃচ্ছ-সাধনার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করবে, এটাই তো তাকওয়ার সুউচ্চ মাকাম। পার্থিব সম্পদ তাদের নিকট তুচ্ছ বলে প্রতিভাত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ প্রসঙ্গে আয়াত নাজিল হওয়ার সাথে সাথে বিবিদের মতের পরিবর্তন ঘটেছে এবং নবীর কাছে তাঁদের উত্থাপিত দাবি যে উচিত হয়নি, তা সহজেই বুঝতে পেরেছেন। অবশেষে হুজুর ﷺ তাঁদের অশোভন আচরণের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বিবিদের নিকট হতে এক মাসের জন্য পৃথক থাকার প্রতিজ্ঞা করলেন। অত্র হাদীস হতে রাবী এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, বিভিন্ন সময় নবী করীম ﷺ বিবিদের উপর নাখোশ হতেন তা প্রকাশ করা; বস্তুত এ ঘটনার মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য বহু শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত রয়েছে।

وَعَنْ ٣١١٢ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِيْ وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيْ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ قُلْتُ مَا أَرٰى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِيْ هَوَاكَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَحَدِيْثُ جَابِرٍ اِتَّقُوا اللّٰهَ فِي النِّسَاءِ ذُكِرَ فِيْ قِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ـ

৩১১২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব নারী নিজেদেরকে স্বেচ্ছায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য উৎসর্গ করত, আমি তাদের এ কাজকে নিন্দনীয় মনে করতাম। মনে মনে বলতাম, নারী কি এত বেহায়া হতে পারে যে, নিজেকে স্বেচ্ছায় কোনো পুরুষের নিকট উৎসর্গ করবে? কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত [৩৩ : ৫১] অর্থাৎ 'তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হতে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পার এবং তুমি যাকে দূরে রেখেছ, তাকে কামনা করলে তোমার কোনো অপরাধ নেই।' নাজিল করলেন, তখন আমি তাঁকে [রহস্যচ্ছলে] বললাম– আমি তো দেখি আপনার প্রভু আপনার বাসনা পূরণে বড়ো তৎপর। –[বুখারী ও মুসলিম]

হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে 'মহিলাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর' বর্ণিত আছে এবং তিনি এ ঘটনাকে বিদায় হজের সময়কার ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীসের প্রেক্ষিতে কোনো কোনো আলিম বলেন, এ আয়াতটি স্বেচ্ছায় নিজেকে নবী করীম ﷺ -কে উৎসর্গকারিণী নারীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশের মতে বিবিদের সাথে রাত যাপনে সমতা বিধানের বাধ্যবাধকতা হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। যদিও তিনি সে স্বাধীনতা ভোগ করেননি; বরং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তিনি উক্ত সমতা পালন করেছেন।

মূলকথা, হযরত আয়েশা (রা.)-এর কথার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ যাঁকে এরূপ অধিকার দিয়েছেন, তাঁর প্রতি কোনো নারীর নিজেকে উৎসর্গ করার মধ্যে আশ্চর্যের কি আছে?

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣١١٣ - عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ قَالَتْ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلٰى رِجْلَيَّ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِيْ قَالَ هٰذِهِ بِتِلْكِ السَّبْقَةِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩১১৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, এক সফরে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলেন। তিনি বলেন, [উক্ত সফরে লোকজন হতে দূরে] আমি তাঁর সাথে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করে দৌড়ে এগিয়ে গেলাম। অতঃপর আমার শরীরে গোশত [মেদ] বৃদ্ধি পেলে পুনরায় দৌড় প্রতিযোগিতায় তিনি আমাকে পেছনে ফেলে আগে বেড়ে গেলেন এবং বললেন, পূর্বেকার [দৌড় প্রতিযোগিতার] পরাজয়ের প্রতিশোধ এটা। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ জাতীয় হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী করীম ﷺ আপন বিবিদের সাথে কিভাবে খোশ জীবনযাপন করতেন। মূলত এটা বেলায়েত বা দরবেশীর পক্ষে তো নয় এমনকি নবুয়তের পক্ষেও ক্ষতিকর বা অশোভনীয় নয়। আর তাঁদের এ দৌড়ের প্রতিযোগিতা লোকজনের সম্মুখে হয়েছিল বলেও ধারণা করা ঠিক হবে না। কেননা, হাদীসে এর কোনো ইঙ্গিত নেই।

٣١١٤ - وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهٖ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوْهُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلٰى قَوْلِهٖ لِأَهْلِيْ)

৩১১৪. অনুবাদ : উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজের পরিবারের নিকট উত্তম এবং আমি তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারের সাথে ব্যবহারে সর্বোত্তম এবং যখন তোমাদের কেউ মারা যায়, তখন তার নিন্দা করা পরিহার কর। -[তিরমিযী, দারিমী এবং ইবনে মাজাহ হযরত ইবনে আব্বাস হতে لِأَهْلِيْ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهٖ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসাংশের অর্থ হলো, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি, যে নিজের পরিবারের নিকট উত্তম।" মানুষের ভালোমন্দের বিকাশ তার পারিবারিক পরিবেশের ভেতর হতেই প্রচলিত ও প্রসারিত হয়। কেননা, মানুষ সবচেয়ে নিবিড় ও গভীরভাবে স্বীয় পরিবারের সাথেই একাকার হয়ে যায়। আর এখানেই তার আসল চরিত্রের পরিস্ফুটন ঘটে এবং ভেতরের মানুষটির খোলস উন্মোচিত হয়। পরিবারই হলো মানুষের ভালোমন্দের মাপকাঠি। কেননা, বাহ্যিক আচরণ, ক্ষণিকের বন্ধুত্ব, সাময়িক সম্পর্ক এবং পারিপার্শ্বিক সমাজের সাথে মেলামেশার দ্বারা মানুষের আসল চরিত্র ও স্বভাব অনুধাবনীয় ও বোধগম্য নয়। সম্ভব নয় ভালোমন্দের সিদ্ধান্ত দেওয়া। এ সিদ্ধান্তের জন্য পারিবারিক অবস্থার

দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কেননা, যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজনের সাথে উত্তম আচরণ ও সদ্ব্যবহার করে, অবশ্যম্ভাবীভাবে সে বাইরের মানুষের সাথেও উত্তম আচরণ করবে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ যথার্থই বলেছেন, সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজের পরিবারের নিকট উত্তম।

উল্লেখ্য যে, এখানে أَهْل শব্দ দ্বারা নিজ স্ত্রী, নিকটাত্মীয় এবং প্রতিবেশী সকলকেই বুঝানো যেতে পারে।

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَدَعُوهُ **-এর ব্যাখ্যা :** 'যে মৃত্যুবরণ করেছে তাকে পরিহার কর'- এ বাক্যের কয়েকটি অর্থ হতে পারে-

১. যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে, তোমরা তার কুৎসা, বদনাম ও সমালোচনা পরিহার কর। আর এটা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সে ব্যক্তির ভালো দিকগুলো বেশি বেশি আলোচনা করতে হবে।

২. অথবা, এর অর্থ হতে পারে, যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছেন, মিছামিছি তার ভালোবাসায় বুকফাটা ক্রন্দনে কোনো লাভ নেই; বরং তা পরিহার কর। আর তাকে আল্লাহর কুদরতের হাতে ছেড়ে দাও। কেননা, আল্লাহর নিকটই রয়েছে সর্বোত্তম ঠিকানা।

উল্লেখ্য যে, মূলত এখানে হাদীস দুটি হযরত আয়েশা (রা.)-এর পরবর্তী কোনো রাবী উভয় হাদীসকে একসাথে করে ফেলেছেন।

وَعَنْ ٣١١٥ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَاَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ نُعَيْمٍ فِى الْحِلْيَةِ)

৩১১৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, রমজানের রোজা রাখে, যৌনাঙ্গের পবিত্রতা রক্ষা করে, স্বামীর নির্দেশ পালন করে, তখন সে জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করুক। [অর্থাৎ যে নারী উল্লিখিত দায়িত্বসমূহ পালন করবে, তার জন্য কিয়ামত দিবসে জান্নাতে প্রবেশের অবাধ অধিকার দেওয়া হবে।] -[আবূ নুয়াইম হিলয়াতুল আবরার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন]

وَعَنْ ٣١١٦ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ اٰمُرُ اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৩১১৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যদি আমি কোনো মানুষকে অপরের সিজদা করার নির্দেশ প্রদান করতাম, তবে স্ত্রীকে হুকুম করতাম যেন সে তার স্বামীকে সিজদা করে। [এরূপ সিজদার হুকুম দেওয়াতো দূরের কথা বরং কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছি।] -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** আলোচ্য হাদীস হতে স্বামীর প্রতি কি পরিমাণ আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন স্ত্রীর কর্তব্য তা সহজেই বুঝা যায়। একদিকে এত খোলামেলা বন্ধুত্ব অপর দিকে কি বিরাট অধিকার। স্বামী হলো স্ত্রীর সবচেয়ে বড় সম্পদ। স্ত্রীর যাবতীয় ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা পাওয়ার অধিকারী হলো একমাত্র স্বামী। তাই আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, যদি আমি কোনো মানুষকে অপরের প্রতি সিজদা করার নির্দেশ প্রদান করতাম, তবে স্ত্রীকে হুকুম করতাম, যেন সে তার স্বামীকে সিজদা করে; কিন্তু কোনো মানুষকে সিজদা করা বৈধ নয়। আল্লামা কাযীখান বলেন, ইবাদতের লক্ষ্যে নয়; বরং সম্মান প্রদর্শনার্থে যদি কোনো বাদশাহকে সিজদা করা হয়, তবে তা কুফরি হবে না। তিনি স্বীয় বক্তব্যের অনুকূলে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন মাটির মানুষ হযরত আদম (আ.)-কে ফেরেশতাদের সিজদা করার এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তাঁর ভাইদের সিজদা করার ঘটনাটিকে।

وَعَنْ ٣١١٧ اُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا امْرَاَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৩১১৭. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে স্ত্রীলোক নিজের স্বামীর সন্তুষ্ট অবস্থায় মারা যায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যে মহিলা শরিয়তের বিধান পালনের সাথে সাথে স্বামীর পূর্ণ অনুগত ছিল এবং স্বামী তার উপরে আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট ছিল, এমতাবস্থায় উক্ত মহিলা মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহর রাসূল তাকে জান্নাতবাসিনী বলে ঘোষণা করেছেন। তবে স্বামীর আনুগত্য প্রকাশ শরিয়তের আওতাধীন হতে হবে। স্বামী শরিয়ত গর্হিত কোনো কাজের নির্দেশ দিলে স্ত্রী যদি তা পালন না করে এবং এ কারণে স্বামী যদি তার উপর অসন্তুষ্ট হয়, তাতে কোনো দোষ হবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ 'সৃষ্টিকর্তার অবাধ্য হয়ে কোনো সৃষ্টিকুলের আনুগত্য প্রকাশ বৈধ নয়।'

وَعَنْ ٣١١٨ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৩১১৮. অনুবাদ : হযরত ত্বালাক ইবনে আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন স্বামী নিজ প্রয়োজনে স্ত্রীকে ডাকে তখন সে যেন তৎক্ষণাৎ চলে আসে, যদিও সে চুলার পাশে [রান্নার কাজে] থাকে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : স্বামী নিজ প্রয়োজনে স্ত্রীকে আহ্বান করলে সে আহ্বানে সাড়া দেওয়া স্ত্রীর জন্য অপরিহার্য। এ প্রয়োজন কামপ্রবৃত্তি নিবারণ অথবা অন্য কোনো কারণে হোক না কেন। তবে প্রয়োজন যে প্রথমটা, সে ইঙ্গিত হাদীসে পাওয়া যায়। এমনটি রাসূল ﷺ বলেছেন, স্ত্রী যদি উনুনের কাছে রান্নাবান্নার কাজে নিয়োজিত থাকে এবং চলে গেলে খাদ্য–সামগ্রী নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবুও স্বামীর আহ্বানে সাড়া দিতে হবে। ইবনে মালিক বলেন, এটা শুধুমাত্র সে সময়ের জন্যই প্রযোজ্য, যখন স্ত্রী স্বামীর খাদ্য প্রস্তুতে নিমগ্ন থাকবে। কেননা, সে মুহূর্তে স্বামীর আহ্বান দ্বারা বুঝা যায় যে, সে নিজ খাদ্য নষ্ট করে দিতে আগ্রহী আছে। হাদীসে স্ত্রীকে তড়িঘড়ি করে স্বামীর প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপারটিকে এত গুরুত্ব দেওয়ার তাৎপর্য সম্ভবত এটাই হবে যে, স্বামীর প্রবল কামোত্তেজনার সময় স্ত্রী কাছে না গেলে হয়তো বা স্বামী অন্য কোনো মহিলার সাথে অবৈধ যৌনাচারে মিলিত হতে পারে, যা উভয়ের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনবে।

وَعَنْ ٣١١٩ مُعَاذٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُؤْذِيْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ لَا تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللّٰهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৩১১৯. অনুবাদ : হযরত মু'আয (রা.) রাসূলে কারীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট দেয় [অবাধ্যতা ইত্যাদির দ্বারা] তখন উক্ত স্বামীর জান্নাতের হুর বিবি বলতে থাকে আল্লাহ তোকে ধ্বংস করুক। তুই ওকে কষ্ট দিস না। সে তো তোর নিকট দুদিনের মেহমান, অতি শীঘ্রই তোকে ছেড়ে আমার নিকট চলে আসবে। –[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। তিরমিযীর মন্তব্য এ হাদীস গরীব [একক বর্ণনাকারীর বর্ণনা।]

وَعَنْ ٣١٢٠ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩১২০. অনুবাদ : হযরত হাকীম ইবনে মুয়াবিয়া কুশাইরী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের স্ত্রীগণের আমদের উপর কি অধিকার রয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, যখন তুমি খাও, তখন তাকে খাওয়াও, তুমি পরলে তাকেও পরিধেয় দাও, [প্রয়োজনে মারতে হলে] মুখে মেরো না। তাকে গালি দিও না, প্রয়োজনে বিছানা ভিন্ন করা ছাড়া তাকে একাকিনী ফেলে রেখ না। –[আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো দিন কোনো কারণে কোনো বিবিকে মারধর করেছেন– হাদীস বা সীরাত গ্রন্থে কোথাও এর উল্লেখ নেই; বরং স্ত্রীকে মারধর করা যে একটি ঘৃণিত ও অপছন্দনীয় কাজ বিভিন্ন হাদীসে এর উল্লেখ রয়েছে। এমনকি বেশি প্রহার করার কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অবশ্য অপরিহার্য প্রয়োজন দেখা দিলে সামান্য মারধর করার অনুমতি আছে।

স্ত্রীকে চার কারণে হালকা ধরনের মারধর করা যায় : ফকীহগণ বলেন, চার কারণে স্ত্রীকে সামান্য মারা যায়। স্বামীর মনতুষ্টির জন্য শরিয়তসম্মত পোশাক পরিধানের অনীহা প্রকাশ করলে। ওজর ব্যতীত যৌনমিলনে অস্বীকৃতি জানালে। শরিয়তের বরখেলাফ চললে। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘরবাড়ি হতে বের হলে। উল্লিখিত কারণ চারটিকে সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়– শরিয়তের হুকুম অমান্য করলে বা স্বামীর শরিয়তসম্মত নির্দেশের অবাধ্য হলে।

স্ত্রীর বিছানা পৃথক করা : কুরআনে বলা হয়েছে, যাদের তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের প্রথমে নসিহত করবে। পরবর্তীতে বিছানা পৃথক রাখবে। অতঃপর আবশ্যক হলে হালকাভাবে মারবে। অতঃপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তবে তাদেরকে অযথা কষ্ট দেওয়ার পথ তালাশ কর না। –[সূরা আন-নিসা : ৩৫] বিছানায় পৃথক রাখবে, কিন্তু ঘর হতে বের করে দেবে না।

স্ত্রীর মুখমণ্ডলে মারা যাবে না : অর্থাৎ মারবে, তবে হালকাভাবে মারবে, কিন্তু মুখের উপর প্রহার করবে না। তাতে মুখের শ্রী-অবয়ব নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

٣١٢١ - وَعَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِيْ اِمْرَأَةً فِيْ لِسَانِهَا شَيْءٌ يَعْنِي الْبَذَاءَ قَالَ طَلِّقْهَا قُلْتُ إِنَّ لِيْ مِنْهَا وَلَدًا وَلَهَا صُحْبَةٌ قَالَ فَمُرْهَا يَقُوْلُ عِظْهَا فَإِنْ يَكُ فِيْهَا خَيْرٌ فَسَتَقْبَلُ وَلَا تَضْرِبَنَّ ظَعِيْنَتَكَ ضَرْبَكَ أُمَيَّتَكَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩১২১. অনুবাদ : হযরত লাকীত ইবনে সাবিরা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে আরজ করলাম, আমার স্ত্রী অত্যন্ত মুখরা। উত্তরে তিনি বললেন, [যদি বরদাশত না করতে পার] তবে তালাক দাও। আমি বললাম, উক্ত স্ত্রীর ঘরে আমার সন্তান রয়েছে এবং দীর্ঘ দিনের দাম্পত্য জীবন তার সাথে কেটেছে। [যার ফলে তার প্রতি প্রেম-ভালোবাসা জন্মেছে এবং সন্তানেরও অসুবিধা দেখা দেবে, এদিকে তার কথার ঝাঁজও বরদাশত করতে পারি না, এ উভয় সঙ্কটে কি করব?] উত্তরে তিনি বললেন, তাকে বুঝাও, উপদেশ দাও। যদি তার মধ্যে সামান্যতম সুবুদ্ধি থাকে, তবে সে তোমার উপদেশ গ্রহণ করবে, খবরদার স্ত্রীকে দাসীর মতো মেরো না। –[আবূ দাউদ]

٣١٢٢ - وَعَنْ اَيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَضْرِبُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ فَجَاءَ عُمَرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلٰى اَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِيْ ضَرْبِهِنَّ فَاَطَافَ بِاٰلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ اَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ طَافَ بِاٰلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ اَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ اُولٰئِكَ بِخِيَارِكُمْ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

৩১২২. অনুবাদ : হযরত আয়াস ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা আল্লাহ তা'আলার বান্দীগণকে অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীগণকে [ক্রীতদাসী নয়] মেরো না। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) এসে বললেন, [আপনার নিষেধাজ্ঞায়] স্বামীদের উপর নারীগণের স্পর্ধা বেড়ে গেছে। এতে তিনি তাদেরকে প্রহারের অনুমতি প্রদান করেন। ফলে নারীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণীগণের নিকট পুনঃপুন এসে স্বামীদের [অত্যাচারের] অভিযোগ করতে লাগল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ [সাধারণ ঘোষণায়] বললেন, দেখ! আমার পরিবার-পরিজনের নিকট স্ত্রীগণ স্বামীদের [অত্যাচারের] অভিযোগ নিয়ে পুনঃপুন আসছে। [শুনে রাখ] তোমাদের মধ্যে যারা এরূপে স্ত্রীদেরকে প্রহার করে তারা কখনো ভালো মানুষ নয়। –[আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারিমী]

وَعَنْ ٣١٢٣ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلٰى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلٰى سَيِّدِهِ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩১২৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে, মালিকের বিরুদ্ধে গোলামকে প্ররোচনা দেয়, সে আমার দলভুক্ত নয়। -[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣١٢٤ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَاَلْطَفُهُمْ بِاَهْلِهِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৩১২৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও পরিবার-পরিজনের সাথে সদ্ব্যবহারকারী সর্বোত্তম মু'মিনগণের অন্তর্ভুক্ত। -[তিরমিযী]

وَعَنْ ٣١٢٥ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَرَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ اِلٰى قَوْلِهِ خُلُقًا)

৩১২৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঈমানের হিসেবে সর্বোত্তম মু'মিন ঐ ব্যক্তি, যে চরিত্রের দিক হতে সর্বোত্তম। তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম। -[তিরমিযী] তিরমিযী মন্তব্য (র.) করেন এটা একটি হাসান ও সহীহ হাদীস, আবূ দাউদ 'চরিত্রের দিক হতে উন্নত' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন, পরবর্তী বাক্য বর্ণনা করেননি।]

وَعَنْ ٣١٢٦ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اَوْ حُنَيْنٍ وَ فِىْ سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتْ رِيْحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا عَائِشَةُ قَالَتْ بَنَاتِىْ وَ رَاٰى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهٗ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ مَا هٰذَا الَّذِىْ اَرٰى وَسْطَهُنَّ قَالَتْ فَرَسٌ قَالَ وَمَا هٰذَا الَّذِىْ عَلَيْهِ قَالَتْ جَنَاحَانِ قَالَ فَرَسٌ لَهٗ جَنَاحَانِ قَالَتْ اَمَا سَمِعْتَ اَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا اَجْنِحَةٌ قَالَتْ فَضَحِكَ حَتّٰى رَاَيْتُ نَوَاجِذَهٗ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩১২৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবূক বা হুনায়নের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করে [গৃহে প্রবেশকালে] তাঁর গৃহ কোণে পর্দা ঝুলানো অবস্থায় দেখতে পেলেন, বাতাসে পর্দা সরে যাওয়ার ফলে পর্দার প্রান্ত দিয়ে হযরত আয়েশা (রা.)-এর খেলনাগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়ল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আয়েশা! এগুলো কী? উত্তরে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আমার [খেলনা] কন্যাগণ। এতদসঙ্গে তিনি খেলনাগুলোর মাঝে কাপড়ের দুই পাখাবিশিষ্ট [খেলনার] ঘোড়া দেখতে পেয়ে বললেন, এগুলো মাঝে যা দেখছি, তা কী? হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, ঘোড়া। তিনি বললেন, তার উপরে ঐ দুটি কী? আমি বললাম, দুটি পাখা। তিনি [বিস্ময়ে] বললেন, ঘোড়ারও কি আবার দুটি পাখা হয়? হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আপনি কি শুনেননি [হযরত] সুলাইমান (আ.)-এর ঘোড়ার অনেকগুলো পাখা ছিল। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এতদশ্রবণে তিনি এত বেশি হেসে ফেললেন যে, আমি তাঁর মাড়ির দাঁতগুলো পর্যন্ত দেখতে পেলাম। -[আবূ দাউদ]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣١٢٧ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ اَتَيْتُ الْحِيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُوْنَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَقُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَقُّ اَنْ يَسْجُدَ لَهُ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنِّىْ اَتَيْتُ الْحِيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُوْنَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَاَنْتَ اَحَقُّ بِاَنْ يَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ لِىْ اَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِىْ اَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ لَا تَفْعَلُوْا لَوْ كُنْتُ اٰمُرُ اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ النِّسَاءَ اَنْ يَسْجُدْنَ لِاَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَقٍّ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَ رَوَاهُ اَحْمَدُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ)

৩১২৭. অনুবাদ : হযরত কায়েস ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি [স্বীয় প্রয়োজনে ইরাকে অবস্থিত, কূফার সন্নিকটে] 'হীরা' শহরে গিয়েছিলাম, সেখানে আমি দেখতে পেলাম যে, সেখানের লোকজন তাদের নেতাকে সম্মানার্থে সিজদা করে। এটা দেখে আমি মনে মনে বললাম, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ -ই সিজদা করার সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত ব্যক্তি। অতঃপর [প্রয়োজন শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে] আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম, আমি হীরা'র সফরে দেখতে পেয়েছি যে, তথাকার লোক তাদের নেতাকে সিজদা করে। আমি স্থির করেছি যে, [সম্মানার্থে] সিজদা করার আপনি অধিক উপযুক্ত। একথা শুনে তিনি [আশ্চর্যবোধে] জিজ্ঞেস করলেন [আমার মৃত্যুর পরে] তুমি যদি আমার কবরের পার্শ্ব দিয়ে গমন কর, তাহলে কি তুমি কবরকে সিজদা করবে? উত্তরে আমি বললাম, না [তা করব না]। তিনি বললেন, না [খবরদার!] করো না। কারণ, যদি আমি [আল্লাহ ব্যতিরেকে] অপর কাউকে সিজদা করতে বলতাম তবে নারীদের উপর আল্লাহ তা'আলা স্বামীগণের যে অধিকার প্রদান করেছেন তার কারণে তাদেরকে তাদের স্বামীগণকে সিজদা করার আদেশ প্রদান করতাম [কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কাউকেও সিজদা করা যায় না, সেজন্য আমি এরূপ আদেশ প্রদান করিনি]। –[আবূ দাউদ এবং হযরত আহমদ মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَقَالَ لَا تَفْعَلُوْا الخ -এর ব্যাখ্যা : একবার সাহাবী হযরত কায়েস ইবনে সা'দ (রা.) ইরাকের অন্তর্গত কূফা প্রদেশের হীরা নামক শহরে গিয়ে তথাকার অধিবাসীদেরকে দেখতে পেলেন যে, তারা তাদের অশ্বারোহী সেনাপতিকে সিজদা করছে। সাহাবী মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে রাসূল ﷺ -এর নিকট আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনিই তো এ সিজদা পাওয়ার বেশি উপযুক্ত।' রাসূল ﷺ উত্তরে যা বলেছিলেন তার ভাবার্থ হলো– পৃথিবীতে কোনো মানুষের কাছে মানুষের মস্তক অবনত করা সিদ্ধ নয়। বৈধ নয় কোনো বস্তুর কাছে মাথা অবনত করা। কেননা, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ .

অর্থাৎ তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, আর চন্দ্রকেও না; বরং সে আল্লাহকেই সিজদা কর, যিনি এ নিদর্শনসমূহকে সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা আল্লাহর ইবাদত করতে চাও। –[সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ : ৩৭]

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ -এর উক্ত বাণীর মর্মার্থ হলো, তুমি সেই মহান সত্তার কাছে শির অবনত কর, যিনি চিরঞ্জীব এবং যিনি অক্ষয় প্রভুত্বের অধিকারী। কেননা, তুমি যদি এখন আমার মর্যাদা ও সম্মানে অভিভূত হয়ে আমাকে সিজদা কর; কিন্তু যখন আমি কবরবাসী হবো তখন আমি আমার প্রভাব হতে বিরত থাকব। তখন সিজদা করার প্রয়োজনবোধও হবে না; সুতরাং অস্থায়ী বস্তুর প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে সর্বদা চিরঞ্জীব সত্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছেই মাথা অবনত করবে।

হারাম ও হারামের সাদৃশ্য : শরিয়তের বিধান হলো, হারাম ও হারামের সাদৃশ্য উভয়টি নিষিদ্ধ। এ কারণে ফকীহগণ কোনো মানুষকে যে কোনো নিয়তে বা উদ্দেশ্যে সিজদা করাকে সম্পূর্ণ হারাম বলেছেন। নবী করীম ﷺ সৃষ্টির সেরা হয়ে তাঁকে সিজদা করার ব্যাপারে যেভাবে নিষেধ করেছেন এরপরও যে সমস্ত পীর তাদের মুরিদ হতে সিজদা গ্রহণ করে এবং এর

বৈধতার জন্য ফেরেশতাদের হযরত আদম (আ.)-কে আর হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পিতামাতা ও ভাইগণ তাঁকে সিজদা করেছেন, এ সমস্ত ঘটনা ও আয়াত হতে দলিল গ্রহণ করে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন– নবী করীম ﷺ কি এসব আয়াত ও ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিফ ছিলেন না? সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, যারা জিন্দা কিংবা মুর্দা পীরকে তথা খানকার আস্তানায় বা গোরস্থানের কবরে গিয়ে সিজদা করে তা সম্পূর্ণ ভণ্ডামী ও গোমরাহি। এ সমস্ত বে-শরাহ ও বে-ইল্‌ম পীরদের এ কথা জানা উচিত যে, পূর্ববর্তী নবীদের শরিয়ত ও আমাদের নবীর প্রবর্তিত শরিয়ত বহুলাংশে এক নয়। এক আল্লাহ ব্যতীত আর কারো সম্মুখে একজন ঈমানদার মুসলমানের শির নত হওয়া বা করা যে হারাম, এ ব্যাপারে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত ওলামা ফকীহদের মধ্যে কারো দ্বিমত নেই।

পরিশেষে আমাদের কথা হলো, বর্তমানে আমাদের সমাজে ও দেশে প্রচলিত কদমবুচি যা ইসলামি শিক্ষা ও ঐতিহ্যের পরিপন্থি এটাও নিষিদ্ধ সিজদার আওতায় পড়বে কিনা? এ বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। কেননা, কদমবুচি বা পদধূলি ভারত বর্ষের হিন্দু মহাজনদের আবিষ্কৃত একটি অনৈসলামিক সংস্কৃতি। বস্তুত ইসলামে সম্মান প্রদর্শনার্থে সালাম, মুসাফাহা ও মুয়ানাকা এই তিনটি ব্যতীত আর কিছুরই স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। কাজেই সিজদা করা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

وَعَنْ ٣١٢٨ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيْمَا ضَرَبَ اِمْرَأَتَهُ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩১২৮. অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, [শরিয়তসম্মত কারণে] স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করলে তৎসম্পর্কে [কিয়ামতে] জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। –[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না' –যদি শিষ্টাচার-ভদ্রতা শিক্ষার জন্য শরিয়তের নির্ধারিত গণ্ডির ভেতর প্রহার করে, তবে আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসিত হবে না বা কৈফিয়ত দিতে হবে না। যেমন– মুখমণ্ডলে যদি প্রহার না করে, অন্যায়ভাবে না মারে ইত্যাদি। এ ধরনের প্রহারের দরুন দুনিয়ার আদালতে তার বিরুদ্ধে নালিশ করা যাবে না। যেমন– শিক্ষক তার ছাত্রকে, উস্তাদ তার শাগরেদকে মারে। কিন্তু এর ব্যতিক্রম প্রহার করলে দুনিয়া-আখিরাত উভয় আদলতে জবাবদিহি করতে হবে।

وَعَنْ ٣١٢٩ اَبِيْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ زَوْجِيْ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِيْ اِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِيْ اِذَا صُمْتُ وَلَا يُصَلِّي الْفَجْرَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِيْ اِذَا صَلَّيْتُ فَاِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُوْرَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَتْ سُوْرَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ قَالَ وَاَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِيْ اِذَا صُمْتُ فَاِنَّهَا تَنْطَلِقُ تَصُوْمُ وَاَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا اَصْبِرُ فَقَالَ

৩১২৯. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমরা একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময়ে জনৈকা স্ত্রীলোক এসে বলল, আমার স্বামী সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল যখন আমি নামাজ পড়ি তখন আমাকে মারে, যখন আমি রোজা রাখি তখন রোজা ভেঙ্গে দেয় এবং সূর্যোদয়ের [নিকটবর্তী সময়ের] পূর্বে ফজরের নামাজ পড়ে না। রাবী বলেন, সাফওয়ান তথায় উপস্থিত ছিলেন তখন রাসূল ﷺ [স্ত্রীলোকটির অভিযোগ সম্পর্কে] তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার [প্রথম] অভিযোগ– 'আমি যখন নামাজ পড়ি তখন আমাকে মারে' এর উত্তর হলো, সে নামাজে [এত লম্বা] দু সূরা পাঠ করে, যা আমি তাকে [এত লম্বা সূরা পাঠ করতে] নিষেধ করেছি। রাবী বলেন, এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, [ওহে! এত বড় লম্বা সূরা] এর একটিই তো লোকের [নামাজে পড়ার] জন্য যথেষ্ট। আর তার [দ্বিতীয়] অভিযোগ– 'আমি যখন রোজা রাখি তখন ভেঙ্গে দেয়– এর উত্তর হলো, সে ক্রমাগত [নফল] রোজা রাখতে থাকে, অথচ আমি যুবক পুরুষ এত ধৈর্য

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَصُوْمُ اِمْرَأَةٌ اِلَّا بِاِذْنِ زَوْجِهَا وَاَمَّا قَوْلُهَا اِنِّىْ لَا اُصَلِّىْ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَاِنَّا اَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لَانَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ فَاِذَا اسْتَيْقَظْتَ يَا صَفْوَانُ فَصَلِّ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

ধারণ করতে পারি না। [অর্থাৎ রোজাবস্থায় তার সাথে যৌন ক্ষুধা মেটাতে পারি না]। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোনো স্ত্রীলোক স্বামীর অনুমতি ব্যতীত [নফল] রোজা যেন না রাখে। আর তার [তৃতীয়] অভিযোগ– 'আমি সূর্যোদয়ের [নিকটবর্তী সময়ের] পূর্বে ফজরের নামাজ পড়ি না।' এর উত্তর হলো, আমরা এমন পরিবারের লোক যারা দীর্ঘ রাত পর্যন্ত কাজকর্মে [জমির পানি সিঞ্চনে] লিপ্ত থাকার কারণে প্রায়ই সূর্যোদয়ের [নিকটবর্তী সময়ের] পূর্বে ঘুম হতে জাগতে পারি না। একথা শ্রবণে তিনি বললেন, সাফওয়ান তুমি যখনই ঘুম হতে জাগো তখনই নামাজ পড়। –[আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَا اَصْبِرُ -এর ব্যাখ্যা : হযরত সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল (রা.)-এর স্ত্রী একবার রাসূল ﷺ -এর নিকট নিজ স্বামী সম্পর্কে তিনটি অভিযোগ করেন। তার দ্বিতীয়টি হলো, স্ত্রী দিনের বেলা রোজা রাখা সত্ত্বেও স্বামী তার রোজা ভেঙ্গে দেন। এ অভিযোগের উত্তরে সাফওয়ান রাসূল ﷺ -এর নিকট বললেন, আমি যুবক মানুষ, স্ত্রীসহবাস হতে ধৈর্যধারণ করা আমার পক্ষে খুবই দুরূহ ব্যাপার। তাই আমার স্ত্রী রোজা রাখা সত্ত্বেও আমি তার সাথে দিনের বেলায়ও মিলিত হই। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন কোনো স্ত্রীকে তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল রোজা রাখতে নিষেধ করলেন। তবে এ নিষেধাজ্ঞা ফরজ রোজার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এর উপরই ইমামগণ ফতোয়া প্রদান করেছেন।

قَوْلُهُ فَاِذَا اسْتَيْقَظْتَ يَا صَفْوَانُ فَصَلِّ -এর ব্যাখ্যা : ঘুম বা নিদ্রা মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি বিরাট নিয়ামত। ঘুমন্ত ব্যক্তির উপর শরিয়ত অনেক আহকাম হালকা করে দিয়েছে। কেউ যদি গভীর ঘুমে বিভোর থাকে এমতাবস্থায় যে, নামাজের সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, তবে উক্ত নামাজ জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে আদায় করে দিলেই চলবে। ঘুম একটি ওজর। আর ওজরের কারণে নামাজকে বিলম্বিত করা বৈধ। রাসূল ﷺ -এর ক্ষেত্রেও এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কোনো এক যুদ্ধাভিযানের সময় রাসূল ﷺ সহ সকল সাহাবী এমন গভীর নিদ্রা গিয়েছিলেন যে, তাঁদের জাগ্রত হওয়ার পূর্বেই সূর্যোদয় হয়েছিল। তখনই তারা জামাতের সাথে ফজরের নামাজ পড়েছিলেন। হযরত সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তালের বেলায়ও গ্রহণযোগ্য কারণ ছিল। কেননা, তিনি অধিক রাত্র জেগে পানি সিঞ্চনের কাজে লিপ্ত থাকতেন। তাই রাসূল ﷺ তাঁকে জাগ্রত হওয়ার পর নামাজ পড়ার অনুমতি প্রদান করেছেন; কিন্তু কেউ যদি স্বেচ্ছায় বা অলসতার কারণে ঘুমিয়ে থাকে, তবে তার ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না।

٣١٣٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ فِىْ نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ فَجَاءَ بَعِيْرٌ فَسَجَدَ لَهُ فَقَالَ اَصْحَابُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَنَحْنُ اَحَقُّ اَنْ نَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَكْرِمُوْا اَخَاكُمْ وَلَوْ كُنْتُ اٰمُرُ اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ

৩১৩০. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাজির ও আনসার উভয় দলের কিছু সংখ্যক লোকের মাঝে উপস্থিত ছিলেন, এমতাবস্থায় একটি উট এসে তাঁকে সিজদা করল। এটা দেখে উপস্থিত সাহাবীগণ বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে জীব-জানোয়ার, তরু-লতা সিজদা করে, অথচ আপনাকে আমাদের সিজদা করা অধিক কর্তব্য। এতে তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের [সিজদা প্রভৃতির দ্বারা] ইবাদত কর [অন্য কারো নয়] এবং তোমাদের ভাইকে সম্মান কর। যদি আমি কোনো মানুষকে

لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَمَرَهَا أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَصْفَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَبْيَضَ كَانَ يَنْبَغِيْ لَهَا أَنْ تَفْعَلَهُ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

অপরকে সিজদা করার আদেশ করতাম, তাহলে স্ত্রীলোককে তার স্বামীকে সিজদা করার আদেশ করতাম। স্বামী যদি স্ত্রীকে হলুদ বর্ণের পাহাড় হতে কালো বর্ণের পাহড়ে এবং কালো বর্ণের পাহাড় হতে সাদা বর্ণের পাহাড়ে পাথর সরানোর [ন্যায় অনর্থক ও দুঃসাধ্য কাজের] হুকুম করে, তবে তার উচিত হবে এটা সম্পাদন করা। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ -এর ব্যাখ্যা : এখানে ইবাদত অর্থ সিজদা করা। কেননা, ইবাদতের শেষ প্রান্তর হলো সিজদা এবং দাসত্ব বা বন্দেগিরও শেষসীমা হলো সিজদা করা। আর এটা অনস্বীকার্য যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ মা'বূদ নেই এবং কোনো মানুষই আল্লাহ ব্যতীত কারো 'আব্দ' নয়। কোনো কোনো জাহিল বিদ্আতি আলিম قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ এ আয়াতের মধ্যে عِبَادِيْ দ্বারা عِبَادُ مُحَمَّدٍ ﷺ অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর আব্দ বা বান্দা অর্থ করেছে [না'উযুবিল্লাহ] অথচ আল্লাহর পাক কালামে স্পষ্টভাবে এর বিরুদ্ধে ঘোষণা রয়েছে– وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلُ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ (اَلْاٰيَةُ) 'কোনো মানুষ যাকে আল্লাহ কিতাব, ক্ষমতা বা রাজত্ব এবং নবুয়ত দান করেছেন তার এ অধিকার নেই যে, সে মানুষদেরকে বলতে পারে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমরই আব্দ বা বান্দা হয়ে যাও।' তবে জীব-জানোয়ার বা গাছ-গাছালী রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সিজদা করেছেন এটা শরিয়তের আওতাভুক্ত ঘটনা নয়; বরং একে মহানবী ﷺ -এর মু'জিযা ও অলৌকিক ব্যাপার বলতে হবে। আর এরাও আল্লাহর নির্দেশে হুজুর ﷺ -কে সিজদা করেছে, যেমন আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতাকুল হযরত আদম (আ.)-কে সিজদা করেছেন। ফলকথা হলো, জীব-জানোয়ারের সিজদা আর মানুষের সিজদা এক সমান নয়।

قَوْلُهُ وَاَكْرِمُوْا اَخَاكُمْ -এর ব্যাখ্যা : সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সিজদা করার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে সীমাতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শনের আগ্রহ দেখালে আধ্যাত্মিক চিকিৎসাস্বরূপ নিজেকে তাদের ভাই প্রকাশ করে [যেহেতু সকলেই আদম সন্তান] একদিকে যেমন তাদের এ মাত্রাতিরিক্ত ভক্তির আতিশয্যের উপর আঘাত হানলেন, তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা ও সম্মানের সামনে নিজের দীনতার চরম প্রকাশ ঘটালেন। অন্যথায় মহানবী ﷺ তো উম্মতের পিতা সদৃশ। মানবতার প্রতি সম্মান ও সাম্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাঁর অনুসারীগণকে সাহাবী বা সাথি নামে আখ্যায়িত করেছেন। প্রভু-ভৃত্য, উস্তাদ-শাগরিদ, পীর-মুরিদ ইত্যাদি কোনো শব্দ ব্যবহার না করে সাথি-সহচর শব্দ প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি চরম বিনয় ও অনুপম সাম্যের শিক্ষা দান করেছেন। আমরা কি এ আদর্শের সামান্যতমও নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়েছি?

٣١٣١ - وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يُقْبَلُ لَهُمْ صَلٰوةٌ وَلَا تَصْعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ اَلْعَبْدُ الْاٰبِقُ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلٰى مَوَالِيْهِ فَيَضَعُ يَدَهُ فِيْ أَيْدِيْهِمْ وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَالسَّكْرَانُ حَتّٰى يَصْحُوَ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৩১৩১. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন ব্যক্তির নামাজ কবুল হয় না এবং তাদের নেক কাজ উর্ধ্বমুখি হয় না। প্রথম পলাতক গোলাম, যতক্ষণ না সে মালিকের নিকট ফিরে আত্মসমর্পণ করে। দ্বিতীয় যে স্ত্রীর উপর তার স্বামী অসন্তুষ্ট। তৃতীয় মাতাল ব্যক্তি যতক্ষণ না তার চৈতন্য ফিরে আসে। –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন]

وَعَنْ ٣١٣٢ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِيْ تَسُرُّهُ اِذَا نَظَرَ وَتُطِيْعُهُ اِذَا اَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِيْ نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ - (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৩১৩২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, সর্বোত্তম নারী কে? উত্তরে তিনি বলেন, যে নারীর স্বামী তার দিকে তাকালে তাকে ব্যবহারে সন্তুষ্ট করে দেয়, স্বামী কোনো আদেশ করলে তা পালন করে এবং নিজের এবং টাকাপয়সার ব্যাপারে স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করে না। −[নাসায়ী ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]

وَعَنْ ٣١٣٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ مَنْ اُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ اُعْطِيَ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ قَلْبٌ شَاكِرٌ وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ وَ زَوْجَةٌ لَا تَبْغِيْهِ خَوْنًا فِيْ نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৩১৩৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তিকে চারটি নিয়ামত দান করা হয়েছে, তাকে দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ দান করা হয়েছে− ১. কৃতজ্ঞ হৃদয়, ২. জিকিরে রত রসনা, ৩. বিপদে ধৈর্যশীল শরীর, ৪. নিজের ব্যাপারে ও স্বামীর ধনসম্পদে খিয়ানত না করতে সংকল্পবদ্ধা স্ত্রী। −[হাদীসটি ইমাম বায়হাকী শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে সংকলন করেছেন]

بَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ
খোলা ও তালাকের বর্ণনা প্রসঙ্গে

اَلْخُلْعُ-এর পরিচয় : خُلْعٌ শব্দটি বাবে فَتَحَ হতে اِسْم مَصْدَرْ শাব্দিক অর্থ হলো− খুলে ফেলা, বের করা, টেনে নেওয়া ইত্যাদি। যেমন পবিত্র কুরআনে হযরত মূসা (আ.)-কে তূর পাহাড়ে গমনের জন্য জুতা খুলে প্রবেশের আদেশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে− فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ অর্থাৎ তুমি তোমার জুতাদ্বয় খুলে ফেল।

শরিয়তের পরিভাষায় স্ত্রী স্বামীকে কিছু অর্থ দিয়ে তার বন্ধন হতে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়াকে خُلْع বলে। তবে তখন এ শব্দটি বাবে مُفَاعَلَة অথবা اِفْتِعَالٌ হতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যেমন বলা হয়− خَالَعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا বা اِخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ অর্থাৎ স্ত্রীলোকটি অর্থের বিনিময়ে স্বামী হতে তালাক নিয়েছে। এরূপ করা জায়েজ; কেননা পবিত্র কুরআন এসেছে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ (بَقَرَة) তথা তাদের উপর কোনো পাপ হবে না যদি স্ত্রী স্বামীকে কিছু মাল দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। উল্লেখ্য যে, খোলা'তে মোহরের অতিরিক্ত সম্পদ গ্রহণ করা পাপ।

اَلطَّلَاقُ-এর পরিচয় : طَلَاقٌ শব্দটি اِسْم مَصْدَرْ বা ক্রিয়া বিশেষ্য। অর্থ− বন্ধন ছিন্ন করা। ক্রিয়াপদে বাবে نَصَرَ হতে− طَلَقَتِ الْمَرْأَةُ فَهِيَ طَالِقٌ [স্ত্রীলোকটি তালাকপ্রাপ্ত হলো] অনেকের মতে تَطْلِيْقٌ-এর অর্থে مَصْدَرْ রূপে ব্যবহৃত হয়। بَاب تَفْعِيْل হতে طَلَّقَ অর্থ− তালাক প্রদান করা بَاب اِفْعَال হতে অর্থ− বন্ধন ছিন্ন করা যেমন−

أَطْلَقَ النَّاقَةَ অর্থাৎ উটের বন্ধন খুলে দিল। এর পরিভাষিক পরিচয় সম্পর্কে আল্লামা কারামানী (র.) বলেন– هُوَ رَفْعُ الْقَيْدِ الثَّابِتِ بِالنِّكَاحِ بِالْأَلْفَاظِ الْمَخْصُوصَةِ অর্থাৎ নির্দিষ্ট কতগুলো শব্দ দ্বারা বিয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বন্ধনকে বিচ্ছিন্ন করা।

হেদায়া গ্রন্থের হাশিয়াতে এসেছে– هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ يَرْفَعُ الْقَيْدَ النِّكَاحِيَّ بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ

أَقْسَامُ الطَّلَاقِ وَأَحْكَامُهَا [তালাকের প্রকারভেদ ও তার হুকুম] : তালাক ও তার হুকুম কয়েকভাবে বিভক্ত–

১. أَقْسَامُ الطَّلَاقِ بِاعْتِبَارِ الصِّفَةِ : সিফাতের দিক থেকে তালাক তিন প্রকার। যেমন–

ক. أَحْسَنُ : যে তুহুরে সহবাস করা হয়নি, এমন তুহুরে এক তালাক দেওয়া।

حُكْم **বা বিধান** : এ জাতীয় তালাক-এর হুকুম হলো ইদ্দত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাকে এ অবস্থায় রেখে দেওয়া।

খ. حَسَنٌ : সঙ্গমকৃতা স্ত্রীকে তিন طُهْر -এ তিন তালাক প্রদান করা। সে সমস্ত طُهْر -এ সহবাস করা যাবে না। সঙ্গমকৃতাকে এক তালাক দেওয়া যদিও তা হায়েযের মধ্যে হোক। আর অতি বৃদ্ধা, অপ্রাপ্তবয়স্কা ও গর্ভবতীকে তিন মাসে তিন তালাক প্রদান করা।

গ. بِدْعَةٌ : অর্থাৎ একই সঙ্গে তিন তালাক বা দুই তালাক একই তুহুরে প্রদান করা, যার মধ্যে رَجْعَتْ করা হয়নি। কিংবা ঐ طُهْر -এ তালাক দেওয়া যাতে সহবাস করা হয়েছে। অথবা مَوْطُوْئَةٌ স্ত্রীকে حَيْض -এর মধ্যে তালাক প্রদান করা।

২. أَقْسَامُ الطَّلَاقِ بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ : حُكْم হিসেবে তালাক তিন প্রকার। যথা–

ক. طَلَاق رَجْعِيَّة : তালাকে রেজয়ী- এরপর স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকে।

খ. طَلَاق بَائِنَة : তালাকে বায়েনাহ-এর ফলে رَجْعَةٌ -এর অধিকার থাকে না, তবে বিয়ে নবায়ন করার সুযোগ থাকে।

গ. طَلَاق مُغَلَّظَة : তালাকে মুগাল্লাযা- এরপর حِيْلَة ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে স্ত্রীকে পুনরায় আনার সুযোগ থাকে না।

৩. أَقْسَامُ الطَّلَاقِ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ : শব্দের দৃষ্টিতে তালাক দু প্রকার। যথা–

ক. طَلَاق صَرِيْح : এমন শব্দ দ্বারা তালাক দেওয়া, যেসব শব্দ তালাকের ক্ষেত্র ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না।

حُكْم **বা বিধান** : এর দ্বারা এক তালাক পতিত হবে, এসব শব্দের বেলায় নিয়তের আবশ্যকতা নেই।

খ. طَلَاق كِنَايَة : তথা এমন শব্দ দ্বারা طَلَاقٌ দেওয়া যেগুলো সাধারণত তালাকের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না।

حُكْم **বা বিধান** : এ সমস্ত শব্দের মধ্যে নিয়ত পাওয়া গেলে তালাক পতিত হবে।

তালাক প্রদানে পুরুষের একক অধিকার : নারী স্নেহপরায়ণা, মমতাময়ী, দরদে ভরা তার মন, সহজেই গলে যায় তার হৃদয়, সামান্য কিছুতেই তার মন-মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, চিত্ত-চাঞ্চল্য তার মধ্যে প্রবল। পক্ষান্তরে পুরুষ-প্রকৃতি কঠোর, ইস্পাত-কঠিন। সামান্য আঘাতে তার মনের কাঠিন্য ভাঙে না, স্বল্প বর্ষণে তার ঊষর হৃদয় সিক্ত হয় না, সহজে তার মধ্যে চিত্ত-চাঞ্চল্য দেখা যায় না। তাই নারী মহৎ গুণাবলির দ্বারা মহিয়ষী-গরীয়সী হলেও ধৈর্য-সহ্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিচার-বিবেচনায় পুরুষ প্রধানের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। সংসার জীবনের চড়াই-উৎসরাই অত্যন্ত ধীরস্থির পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হয়। বাস্তবের সমস্যা সঙ্কুল পরিস্থিতিতে বিচলিত-বিহ্বল না হয়ে স্থির চিত্তে জীবন তরীর হাল ধরার জন্য পুরুষের শক্ত-কঠিন হস্তের প্রয়োজন, অন্যথায় ভরাডুবি নিশ্চিত। তাই اَلَّذِيْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ। [যার হাতে বিবাহ বন্ধন রয়েছে] আল-কুরআন ২:২৩৭ আয়াতে ঘোষণা প্রদান করেছে যে, ইসলামে নর-নারীর বিবাহ বন্ধনের রশি পুরুষের শক্ত-কঠোর হস্তে তুলে দিয়েছে। আলোচ্য আয়াতে অর্ধেক মোহর মাফ করার

অধিকার স্ত্রীকে প্রদানের মোকাবিলায় 'যার হাতে বিবাহ বন্ধন রয়েছে' বলে নিশ্চিতভাবে স্বামীকে বুঝিয়েছে। এ আয়াতের ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশের কোনো অবকাশ নেই।

অবশ্য নারী যদি পুরুষের জুলুম-অত্যাচারের আশঙ্কা বোধ করে, বা তার হাতে নির্যাতিত হওয়ার অবস্থা হতে পরিত্রাণ লাভ করতে চায়, সেক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে অর্থের বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করার সুযোগ প্রদান করেছে। স্বামী রাজি না হলে স্ত্রীকে আইনের আশ্রয় গ্রহণের অধিকারও প্রদান করা হয়েছে। একে শরিয়তের পরিভাষায় খোলা' বলা হয়।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣١٣٤ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ ابْنِ قَيْسٍ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا اَعْتِبُ عَلَيْهِ فِىْ خُلُقٍ وَلَا دِيْنٍ وَلٰكِنِّىْ اَكْرَهُ الْكُفْرَ فِى الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৩১৩৪. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, জনৈক আনসারী সাহাবী ছাবিত ইবনে কায়িস [ইবনে শুমাস, যার উপাধি ছিল খতীবে রাসূলুল্লাহ ﷺ] তার স্ত্রী [হাবীবা বিনতে সাহল] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! [আমার স্বামী] ছাবিত ইবনে কায়িস-এর উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি না এবং তাঁর চরিত্র ও ধর্মীয় আচরণের উপরে আমি অভিযোগ করছি না; কিন্তু [কি করব আমি তো তাকে পছন্দ করতে পারছি না, এমতাবস্থায়] ইসলামের মধ্যে কুফর বা স্বামীর অবাধ্যতা আমি ঘৃণার চোখে দেখছি। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন– তুমি কি [মোহরে প্রাপ্ত তার] খেজুরের বাগানে তাকে ফিরিয়ে দিতে রাজি আছ? সে বলল– জী হ্যাঁ [আমি রাজি আছি], তখন তিনি তার স্বামী ছাবিতকে বললেন, যাও [তোমার] খেজুরের বাগান ফেরত নিয়ে তাকে এক তালাক প্রদান কর। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

খোলার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে কিছুটা মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

ইমাম আবূ হানীফা, মালেক (র.) সহ প্রমুখ ইমামগণ বলেন, খোলা' শুধু বিবাহ ভঙ্গ বা বিচ্ছেদ নয় বরং স্বতন্ত্র তালাকই। আলোচ্য হাদীস হতে এটাই প্রমাণিত হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও সঠিক মত এই যে, খোলার দ্বারা তালাকে বায়েন হয়ে যায়।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন, খোলা' তালাক নয়; বরং 'বিচ্ছেদ'। তিনি বলেন, আল্লাহর কালামে বলা হয়েছে– اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ..... فَاِنْ طَلَّقَهَا ..... مِنْۢ بَعْدُ অর্থাৎ 'তালাক দু-বার', 'অতঃপর যদি সে তালাক দেয়'। এ শেষ বাক্যের পূর্বে খোলার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, 'খোলা' তালাক নয়। কেননা, প্রথমে ২ তালাক, খোলা ১ তালাক এবং পরের বাক্যের ১ তালাক, একত্রে ৪ তালাক হয়ে যায়। অথচ এটা কারো কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই 'খোলা' তালাক নয় বরং ফস্খ তথা বিবাহভঙ্গমাত্র। অবশ্য খোলার কথাটি তালাকের ধারাবাহিক বর্ণনার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র।

জবাবে বলা যায় যে, প্রথমে দুই তালাক কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়া হয়েছে এবং পরবর্তীতে অর্থের বিনিময়ে তালাকে খোলাকে বর্ণনা করা হয়েছে। আর সর্বশেষ আয়াতের তাৎপর্য হলো, উল্লিখিত উভয় প্রকারের যে কোনো প্রকারের তালাকের পর যদি তৃতীয় তালাক দেয় তখন স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে তালাকপ্রাপ্তা না হয়ে প্রথম স্বামীর কাছে যেতে পারবে না। সুতরাং 'যদি সে পরে তালাক দেয়' এ বাক্য দ্বারা তৃতীয় তালাকের আলোচনা করা হয়েছে– চতুর্থ তালাকের নয়।

وَعَنْ ٣١٣٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ فَتَطْهُرَ فَاِنْ بَدَا لَهُ اَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ اَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ اَمَرَ اللّٰهُ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَفِيْ رِوَايَةٍ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا اَوْ حَامِلًا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩১৩৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি স্বীয় স্ত্রীকে ঋতুস্রাব অবস্থায় তালাক প্রদান করেন, [তাঁর এ কার্যে মনে সন্দেহ ও আপত্তি জাগায় পিতা] হযরত ওমর (রা.) ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গোচরীভূত করেন। এটা শ্রবণে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন ও পরে বললেন, যাও তাকে গিয়ে বল, সে যেন প্রত্যাহার করে নেয় এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত যেন তাকে নিজের কাছে রেখে দেয়। হ্যাঁ, যদি তার একান্তই তালাক দেবার দরকার দেখা দিয়ে থাকে, তবে এর পরে এক ঋতুস্রাব অতিবাহিত হয়ে পবিত্রাবস্থায় যেন সে তালাক প্রদান করে। এটাই উক্ত ইদ্দত যা আল্লাহ তা'আলা তালাক প্রদানান্তে পালনের আদেশ করেছেন। অপর বর্ণনায় আছে- তাকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার আদেশ দাও। অতঃপর সে [প্রয়োজন পড়লে] পবিত্রাবস্থায় তালাক প্রদান করুক [যাতে ইদ্দত দীর্ঘায়িত না হয়] অথবা গর্ভাবস্থায় তালাক প্রদান করুক, [এতে প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে।] -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِيُرَاجِعْهَا -এর ব্যাখ্যা : হায়েয বা ঋতু অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম, তাই হুজুর ﷺ রাগান্বিত হয়েছেন। তবে এ অবস্থায় তালাক দিলে তা প্রয়োগ হবে। কিন্তু রাজয়াত করে নেওয়া ওয়াজিব। কেননা, হুজুর ﷺ দৃঢ়তার সাথেই এর নির্দেশ দিয়েছেন। এতদ্ভিন্ন ঋতু অবস্থায় তালাক দেওয়া যখন হারাম বা গুনাহের কাজ, তখন তা প্রত্যাহার করাই যুক্তিসঙ্গত।

একটি প্রশ্ন ও তার জওয়াব : যে ঋতু অবস্থায় তালাক দেওয়া হয়েছে সে ঋতুর পরে যে তোহ্‌র বা পবিত্রতা আসবে এতে তালাক দেওয়ার নির্দেশ না দিয়ে পরবর্তী ঋতুর পরের তোহ্‌রে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিলেন কেন? অথচ এ পর্যায়ে সময় দীর্ঘায়িত হয়ে যায়।

এর জওয়াবে বলা হয় যে, মূলত তালাক প্রদান একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা বলা যায়, সম্ভবত সাময়িক কোনো কারণে স্ত্রীর উপর ক্রোধ বা ক্ষুব্ধ হয়ে বিরক্তিবোধে তালাক দেওয়া হয়েছে- কিছু সময় ব্যবধান হলে এটাও অস্বাভাবিক নয়, তাদের মধ্যকার মন-মালিন্য দূরীভূত হয়ে পুনরায় মিল-মহব্বত সৃষ্টি হয়ে যাবে, ফলে আর তালাক দেওয়ার মানসিকতাও থাকবে না। বস্তুত একটি ঘরকে ভাঙ্গার চাইতে গড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করাই ইসলামি শরিয়তের উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ -এর ব্যাখ্যা : কুরআনে উল্লিখিত আয়াতটির ব্যাখ্যায় ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। মূলত উক্ত মতভেদের প্রধান কারণ হলো, তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত- হায়েয নাকি তোহ্‌র? ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) বলেন যে, তালাকপ্রাপ্তা নারীর যে ইদ্দত পালনের কথা কুরআনে বলা হয়েছে তা এই তোহর বা পবিত্রতা।

কিন্তু হানাফী ও মালেকীগণ বলেন, এমন নারীর ইদ্দত হলো হায়েয বা ঋতু। উক্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের মতে তালাকের ইদ্দত ও হায়েযের ইদ্দত উভয়টির ইদ্দত একই।

قَوْلُهُ طَاهِرًا اَوْ حَامِلًا -এর ব্যাখ্যা : শাফেয়ীদের মতে, কোনো নারীর গর্ভাবস্থায়ও হায়েয হতে পারে। তাই তারা উক্ত বাক্যের ব্যাখ্যায় বলেন- 'সে যেন পবিত্রাবস্থায় তালাক দেয় যদি না গর্ভ থাকে'। আর যেহেতু প্রসবান্তে ইদ্দত শেষ হয়ে যায়, কাজেই গর্ভাবস্থায় হায়েযের সময়ও তালাক প্রদান করতে পারে। কিন্তু হানাফী ইমামগণ বলেন, গর্ভাবস্থায় যে রক্ত দেখা যায় তা হায়েয বা ঋতুর রক্ত নয়; বরং তা ইস্তিহাযা বা রোগের রক্ত। সুতরাং তাঁরা এর ব্যাখ্যা বলেন, 'সে যেন পবিত্র অবস্থায় তালাক দেয় তবে হায়েয গণনা দ্বারা ইদ্দত পালন করবে।' আর গর্ভাবস্থায় তালাক দিলে প্রসবান্তে ইদ্দত শেষ হবে। সারকথা হলো, সে যেন এমনভাবে তালাক দেয় যাতে ইদ্দত পালনে অসুবিধা দেখা না দেয় বা দীর্ঘায়িত না হয়।

وَعَنْ ٣١٣٦ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَرْنَا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ فَلَمْ يَعُدْ ذٰلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩১৩৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে অধিকার প্রদান করেন, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গ্রহণ করি, তিনি এটা আমাদের উপর [কোনো তালাক] হিসেবে গণ্য করেননি। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

স্ত্রীকে তালাকের অধিকার প্রসঙ্গ : কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলে– 'ইচ্ছা করলে তুমি আমার কাছে থাকতে পার, ইচ্ছা হলে চলে যেতে পার।' এ চলে যাওয়ার এখতিয়ার বা অধিকার দেওয়াতে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যায়নি। হযরত আয়েশা (রা.) এখানে এ কথাটিই বলেছেন।

স্ত্রীকে তালাক প্রদানের অধিকার সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও শাফেয়ী বলেন, স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদানের অধিকার দান করলে সে যদি তালাক না দিয়ে স্বামীকে গ্রহণ করে তবে কোনো তালাক হয় না, যেমন আযওয়াজে মুতাহ্হারাত গ্রহণ করেছিলেন। আর স্ত্রী যদি নিজেকে গ্রহণ করে অর্থাৎ তালাকের অধিকার প্রয়োগ করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এক তালাকে বায়েন হবে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এক তালাকে রেজয়ী হবে। ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, স্ত্রী স্বামীকে গ্রহণ করলে (অধিকার প্রদান করায়) এক তালাকে রেজয়ী হবে, আর নিজেকে গ্রহণ করলে এক তালাকে বায়েন হবে। কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম এ মত পোষণ করতেন বলে হযরত আয়েশা (রা.) তাদের প্রতিবাদে এ বর্ণনা প্রদান করেন।

وَعَنْ ٣١٣٧ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ فِى الْحَرَامِ يُكَفِّرُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩১৩৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো কিছু নিজের উপর হারাম করলে [পালনে ব্যর্থ হলে] কাফ্ফারা প্রদান করবে, তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের [জীবনীতে] কর্মে উত্তম আদর্শ রয়েছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** যদি কেউ নিজের স্ত্রীকে বলে 'তুমি আমার জন্য হারাম।' এ বক্তব্য দ্বারা যদি তালাক নিয়ত করে, তখন 'তালাকে বায়েন' হবে। আর যদি 'সহবাস করবে না' নিয়ত করে থাকে, তখন 'ঈলা' হবে এবং ঈলার মুদ্দতের মধ্যে সহবাস করলে কাফ্ফারা দিতে হবে। কেননা, সে হালালকে হারাম করেছে। বস্তুত হালাল বস্তুকে হারাম করলে কাফ্ফারা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। নবী করীম ﷺ কর্তৃক হালালকে হারাম করার এক ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা কাফ্ফারার নির্দেশ দিয়েছেন [পরবর্তী হাদীসে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে] 'রাসূলের জীবনীতে উত্তম আদর্শ দ্বারা সেই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।'

وَعَنْ ٣١٣٨ عَائِشَةَ (رضـ) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَشَرِبَ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِىُّ ﷺ فَلْتَقُلْ إِنِّىْ أَجِدُ مِنْكَ

৩১৩৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ [দৈনন্দিন পরিদর্শন কালে] তার অন্যতম পত্নী যয়নব বিনতে জাহশের নিকট [প্রতি দিনের নিয়ম ও অভ্যাস অপেক্ষা কিছু সময় বেশি] অবস্থান করেন এবং তাঁর নিকট মধু পান করেন। এতে আমি ও [অপর পত্নী] হযরত হাফসা উভয়ে মিলে পরমার্শ করলাম যে, আমাদের মধ্যে যার নিকট তিনি উপস্থিত হবেন, সে যেন বলে, আমি

رِيْحَ مَغَافِيْرَ اَكَلْتَ مَغَافِيْرَ فَدَخَلَ عَلٰى اَحَدِهِمَا فَقَالَتْ لَهٗ ذٰلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَلَنْ اَعُوْدَ لَهٗ وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبِرِيْ بِذٰلِكَ اَحَدًا يَبْتَغِيْ مَرْضَاةَ اَزْوَاجِهٖ فَنَزَلَتْ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ (اَلْاٰيَةَ) - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

আপনার [মুখ] হতে মাগাফিরের [একপ্রকার দুর্গন্ধবিশিষ্ট ফল যার রস মধুমক্ষিকা আহরণ করে] গন্ধ পাচ্ছি, আপনি কি মাগাফির খেয়েছেন? তিনি তাঁদের [আয়েশা ও হাফসা] কোনো একজনের নিকট পৌঁছলে সে [পরামর্শানুযায়ী] বললেন। উত্তরে তিনি বললেন, কিছু না, আমি যয়নব বিনতে জাহশের নিকট মধু পান করেছি। আর কখনো পান করব না। শপথ করলাম, তুমি কাউকেও এটা বল না। এটা [শপথ] দ্বারা তিনি পত্নীগণের সন্তুষ্টি কামনা করেছিলেন। এতে কুরআন মাজীদের আয়াত নাজিল হয়– 'হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন তুমি তা নিষিদ্ধ করছ কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ?' –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ-এর ব্যাখ্যা : কোনো হালাল বস্তুকে 'হারাম করা' আর 'হারাম জানা' দু'টি এক নয়। প্রথমটি জায়েজ, দ্বিতীয়টি নাজায়েজ। যেমন চিকিৎসকের পরামর্শানুযায়ী অনেক হালাল বস্তুকে বর্জন করতে হয় এ বর্জনও হারাম সাদৃশ্য। আর দ্বিতীয়টি হলো– আকিদা-বিশ্বাস রাখা। কেননা, কোনো হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল আকিদা-বিশ্বাস রাখা কুফরি।

এখানে নবী করীম ﷺ হালাল বস্তুকে বর্জন করার শপথ করেছিলেন, এটা শরিয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েজ বা নিষিদ্ধ নয় বটে, কিন্তু নবীর জন্য শোভনীয় নয়। কেননা, এতে উম্মতের জন্য বিভ্রান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

ইমামদের মতভেদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যে কোনো হালাল বস্তুকে নিজের জন্য হারাম করলে তা ইয়ামীন বা কসম হবে– চাই শপথ বাক্য উচ্চারণ করুক আর নাই করুক।

কিন্তু ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.) বলেন, শপথ বাক্য ছাড়া হারাম করলে কিছুই হবে না; বরং নিরর্থক কথার অন্তর্ভুক্ত হবে। কুরআনের আয়াত হতে ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর মাযহাবের সমর্থন পাওয়া যায়, যথা শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। স্ত্রীকে যদি এরূপ হারাম করে এবং নিয়তে হারাম হওয়ার ইচ্ছা রাখে এটা যিহার (ظِهَارٌ) হবে। তালাকের নিয়ত করলে এক তালাক বায়েন হবে এটাই ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, স্ত্রীকে হারাম করলে এবং নিয়তে কোনো কিছু না থাকলে শুধু শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।

مَغَافِيْرُ-এর অর্থ : مَغَافِيْرُ শব্দটি বহুবচন, একবচনে مَغْفُوْرٌ বা مَغْفَرٌ বা مِغْفَرٌ মিগফার একপ্রকার দুর্গন্ধ ফলবিশেষ, যার রস মধুমক্ষিকা আহরণ করে থাকে।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষে কিভাবে এই ফন্দি আঁটা বৈধ হলো? প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্ত্রীগণের মধ্যে দুটি দল ছিল। এক দলের নেত্রী ছিলেন হযরত আয়েশা (রা.)। অপর দলের নেত্রী ছিলেন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)। হযরত আয়েশা (রা.) কিছুটা সতীনসুলভ মনোভাব নিয়ে কৌতুকবশত রাসূল ﷺ -এর ব্যাপারে এই ফন্দি গ্রহণ করেছিলেন, যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূষণীয় নয়।

মহানবী ﷺ-এর শপথের কারণ : রাসূলুল্লাহ ﷺ মধু পান করার পর জনৈক বিবি যখন তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 'হে রাসূল! আপনি কি মাগাফীর পান করেছেন? আপনার মুখ হতে তার গন্ধ নিঃসরণ হচ্ছে।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ শপথ করে বললেন, আমি আর মধু পান করব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ শপথের উদ্দেশ্যে ছিল অন্য স্ত্রীদের সন্তুষ্টি কামনা করা।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣١٣٩ ثَوْبَانَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِيْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

৩১৩৯. অনুবাদ : হযরত ছাওবান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোনো নারী অনন্যোপায় হওয়া ব্যতীত স্বামীর নিকট তালাকের দাবি করে, সে জান্নাতের গন্ধ পাবে না। -[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ, দারিমী]

وَعَنْ ٣١٤٠ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ الطَّلَاقُ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩১৪০. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাপেক্ষা অপছন্দনীয় বৈধ কার্য তালাক। -[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বিবাহ একটি স্বর্গীয় বন্ধন, নারী-পুরুষের দুটি হৃদয়ের মধুর মিলন; কিন্তু এটা যখন তিক্ততায় পর্যবসিত হয়, উভয়ের মধুর সম্পর্কে ফাটল ধরে এবং একে অপরের ঘরসংসার করা দুরূহ হয়ে পড়ে, তখন সে অবস্থা নিরসনকল্পে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদের ব্যবস্থা স্বরূপ তালাক প্রথার প্রবর্তন করেন। এর মাধ্যমে উভয়ের সম্পর্ক ও মিলনের অবসান ঘটে। পূর্বের ন্যায় একে অপরের অপরজন হিসেবে বিবেচিত হয়। তালাক প্রথা শরিয়তে বৈধ স্বীকৃত হলেও এটা সর্ব নিকৃষ্ট বিধান। অত্র হাদীসে একে আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাপেক্ষা অপছন্দনীয় কার্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে; কিন্তু এতদসত্ত্বেও পারিবারিক, সাংসারিক ও সামাজিক অবস্থাকে নিষ্কলুষ, নির্ভেজাল ও পরিমল রাখার তাগিদে এহেন ঘৃণার্হ কাজটিকে বৈধ রাখা হয়েছে।

وَعَنْ ٣١٤١ عَلِيٍّ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتَاقَ اِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ وَلَا وِصَالَ فِيْ صِيَامٍ وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا رِضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ اِلَى اللَّيْلِ ـ (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৩১৪১. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিবাহের পূর্বে তালাক নেই, মালিকানা ব্যতীত মুক্তিদান হয় না, রোজার মধ্যে বেসাল [ইফতার ব্যতীত ক্রমাগত রোজা রাখা] নেই, বয়ঃপ্রাপ্তির পরে ইয়াতিমী নেই, [দুগ্ধপানের সময় পূর্ণ করে] দুধ ছাড়ানোর পরে দুধের সম্পর্ক স্থাপিত হয় না, দিন হতে রাত পর্যন্ত একটানা নীরবতা পালনের কোনো ইবাদত নেই। -[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ-এর ব্যাখ্যা : অর্থাৎ কোনো নারীকে বিবাহের পূর্বে তালাক প্রদানের ঘোষণা দিয়ে পরে তাকে বিবাহ করলে পূর্বোক্ত তালাক কার্যকরী হবে না। যেমন- যদি কেউ বলে 'যদি আমি অমুক নারীকে বিবাহ করি, তবে তাকে তালাক।' এরূপ ক্ষেত্রে যেহেতু তালাক বিবাহের পরে পাওয়া গেছে তাই এ ক্ষেত্রে তালাক প্রয়োগ হবে। এটা আলোচ্য হাদীসেরও বিপরীত নয়। আর এটাই হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) সহ বহু সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ীর অভিমত। তাদের নিকট নারী নির্দিষ্ট হোক বা অনির্দিষ্ট হোক, কোনো অবস্থাতেই বিবাহের আগে তালাক দিলে তা প্রয়োগ হবে না। কিন্তু ইমাম মালিক (র.) বলেন, অনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তালাক হবে না, নির্দিষ্টের বেলায় তালাক হবে।

পূর্ববর্তী কোনো কোনো শরিয়তে সারাদিন কথা না বলে চুপচাপ বসে থাকাও একটি ইবাদত ছিল এবং একে রোজা বলে গণ্য করা হতো। কিন্তু এটা আমাদের শরিয়তে গণ্য নয়।

وَعَنْ ٣١٤٢ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا نَذْرَ لِابْنِ اٰدَمَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ فِيْ مَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَاقَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَزَادَ أَبُوْ دَاوُدَ وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيْمَا يَمْلِكُ)

৩১৪২. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা হতে তিনি তাঁর দাদা [আব্দুল্লাহ ইবনে আমর] হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের যে বিষয় [বা বস্তু]-এর উপর অধিকার বা মালিকানা নেই, সে বিষয়ে তার নযর [মানত] হয় না, যে গোলামের মালিক নয়, তার মুক্তি প্রদানও হয় না। যার উপর অধিকার নেই, তার উপর তালাক নেই। –[তিরমিযী। আর ইমাম আবূ দাউদ (র) বর্ণনায় আর একটি বাক্য সংযোজন করেছেন যে, মালিকানা ব্যতীত ক্রয়বিক্রয় নেই।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যদি কেউ বলে যে 'আমি এটা আল্লাহর রাস্তায় দান করব' অথচ সে তার মালিক নয়, এতে মানত হবে না। কিন্তু যদি বলে– যদি আমি এর মালিক হই, তবে আল্লাহর রাস্তায় দান করব, মানত হবে। ইমাম ত্বাহাবী (র.) হানাফী মাযহাবের সমর্থনে বলেন, কুরআন মাজীদের আয়াত অর্থ 'তাদের মধ্যে অনেকে আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় যে, যদি আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দান করেন, তবে আমরা অবশ্যই দান-খয়রাত করব।' পরে দেখা যায় যে, তারা সম্পদের মালিক হয়ে দান-সদকা না করায় তাদের নিন্দা ও তিরস্কার করা হয়েছে। অথচ দান-সদকা করার অভিপ্রায় প্রকাশের সময় তারা সম্পদের মালিক ছিল না। সুতরাং বুঝা গেল পূর্বেকার অভিপ্রায় অনুযায়ী দান-সাদকা করা জরুরি ছিল। যদি বলে 'যদি আমি বিবাহ করি, তবে সে তালাক এবং যদি আমি গোলামের মালিক হই, তবে সে আজাদ'; বিবাহ করা ও মালিকানা লাভের পর তালাক ও আজাদ হয়ে যাবে এতে কারো দ্বিমত নেই।

وَعَنْ ٣١٤٣ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيْدَ (رض) أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ فَأَخْبَرَ بِذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ وَاللّٰهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رُكَانَةُ وَاللّٰهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِيْ زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِيْ زَمَانِ عُثْمَانَ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ)

৩১৪৩. অনুবাদ : হযরত রুকানা ইবনে আবদ ইয়াযীদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, তিনি স্বীয় স্ত্রী সুহাইমাকে জোরদার তালাক [আররিতে اَلْبَتَّةَ শব্দ প্রয়োগে] প্রদান করেন, অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে [এসে] তাঁকে এতদসম্পর্কে অবহিত করে বললেন, আল্লাহর কসম! আমি এক তালাকের নিয়ত করেছি, অন্য কিছুর নয়। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি এক তালাক ছাড়া অন্য কিছু নিয়ত করনি। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! এক তালাক ছাড়া অন্য কিছু নিয়ত করিনি। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার বিধান দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, রুকানা স্ত্রীকে হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে দ্বিতীয় এবং হযরত ওসমান (রা.)-এর যুগে তৃতীয় তালাক দেন। –[আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারিমী। কিন্তু শেষোক্ত তিন ব্যক্তি দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাকের উল্লেখ করেননি।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তালাক সম্পর্কে কতিপয় মাসআলা : আলোচ্য হাদীসে তালাক সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে–

১. কেউ যদি তার স্ত্রীকে জোরদার [আরবিতে اَلْبَتَّةَ] বিশ্লেষণে তালাক দেয়, তবে ইমাম শাফেয়ী (রা.)-এর নিকট এক তালাকে রেজয়ী [প্রত্যাহারযোগ্য তালাক] হবে, দুই বা তিন তালাকের নিয়ত করলে তাই হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) اَلْبَتَّةَ বা 'অবশ্য' শব্দের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করত বলেন যে, এক তালাকে বায়েন হবে। অবশ্য তিন তালাকের নিয়ত করলে তিন তালাক হবে। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে তিন তালাক হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে হাদীসে উল্লিখিত স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার অর্থে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট সাধারণভাবে ফিরিয়ে নেওয়া এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, নতুনভাবে বিবাহে মাধ্যমে ফিরিয়ে নেওয়া অর্থ গ্রহণ করতে হবে।

২. কেউ যদি স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক প্রদান করে, তাহলে কি হবে? ইমাম চতুষ্টয় এবং জমহুরে উম্মতের নিকট তিন তালাক হয়ে যাবে। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (র.) এ একই সময়ে তিন তালাক প্রদান করা মুবাহ বা কোনোরূপে বৈধ বলেছেন। ইমাম বুখারীও এ মত সমর্থন করেন। তাঁর নিকটও একসঙ্গে তিন তালাক প্রদান বিদআত নয়; বরং বৈধ। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-সহ অন্য সকলেই একে বিদআত বা কঠিন গুনাহের কার্য বলে উল্লেখ করেছেন। দাউদ যাহিরী প্রমুখের মতে, একই সঙ্গে তিন তালাক প্রদান করলে এক তালাক হবে। [আমাদের দেশের আহলে হাদীস নামে পরিচিত সম্প্রদায় এই মত পোষণ করেন।] মুসলিম শরীফে আবূ সাহাবা কর্তৃক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা এরা নিজেদের মত সপ্রমাণের চেষ্টা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা হাদীসের প্রকৃত অর্থ অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন। আমল বিল হাদীস বা হাদীসের উপর আমল করার জন্য যেরূপ হাদীসের সনদ শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন তদ্রূপ তার যথার্থ মর্ম অনুধাবনও অবশ্য প্রয়োজনীয়। উক্ত হাদীসে 'একসঙ্গে তিন তালাকের' অর্থ এক শব্দে নয়; বরং একবার তালাক বলে দ্বিতীয় তৃতীয়বার তালাক বলে পূর্বের এক তালাকের উপর জোর প্রদানের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে ব্যবহার করা হতো। যেহেতু এরূপ ক্ষেত্রে তিন তালাকের অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনাও থাকে বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ কসম গ্রহণ করে ফয়সালা প্রদান করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামের সততা, সত্যবাদিতার কারণে তাঁদের নিয়ত সম্পর্কে দাবির সততা স্বীকার করে নেওয়া হতো। যেরূপ আলোচ্য রুকানার দাবি শপথের মাধ্যমে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীতে মানুষের সততার মধ্যে দুর্বলতা আসায় তিনবার তালাক বলে এক তালাক জোরদার করার দাবির ঘটনা অধিক পরিমাণে হতে থাকায়, হযরত ওমর (রা.) তাঁর খেলাফতকালে তিনবারের উচ্চারণকে তিন তালাকের অর্থে গ্রহণের ফয়সালা প্রদান করেন, যা উপস্থিত সকল সাহাবী সমর্থন করেন, ফলশ্রুতিতে এটা ইজমার রূপ গ্রহণ করে। স্বয়ং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ মতের সমর্থন করেন, যেমন আবূ দাউদে উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত বহু প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ ও সাহাবায়ে কেরামের স্পষ্ট উক্তি এ মতের সমর্থনে মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, দারুকুতনী, আবূ দাউদ, মুয়াত্তা মালিক, মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত রয়েছে। চার মাযহাবের ইমামগণ ও তাঁদের অনুসারী সকল ওলামায়ে কেরাম এমনকি ইমাম বুখারীও এ মত গ্রহণ করেন। সাহাবায়ে কেরামের ইজমা, তাবেঈনগণ ও ইমামগণের ঐকমত্যের খেলাফ একটি দ্ব্যর্থবোধক হাদীসের অস্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করাকে কখনো হাদীসের উপর আমল করা বলে অভিহিত করা যায় না। তাকওয়া ও দীনের চাহিদার দাবিদারগণের এতদসম্পর্কে নিজেদের জিদ পরিহার করা অবশ্যকর্তব্য।

৩১৪৪. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثَلٰثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ اَلنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

৩১৪৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তিন বিষয়ে হাসি-ঠাট্টার উক্তি ও প্রকৃত উক্তি, উভয়ই প্রকৃত উক্তি রূপে গণ্য হবে। বিবাহ, তালাক ও প্রত্যাহার [এক তালাকান্তে]। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ। তিরমিযীর মন্তব্যে এটা হাসান গরীব হাদীস]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** আলোচ্য হাদীসে جِدّ ও هَزْل এ দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মিরকাত প্রণেতা বলেন, جِدّ শব্দ দ্বারা শব্দের সে অর্থ উদ্দেশ্য যে অর্থ বুঝানোর জন্যই একে প্রণয়ন করা হয়েছে। আর هَزْل শব্দ দ্বারা এমন

অর্থ উদ্দেশ্য যা দ্বারা মূলত সে অর্থ বুঝানোর জন্য শব্দটিকে প্রণয়ন করা হয়নি এমন কিছু ব্যাপার আছে, যা ইচ্ছা বা অনিচ্ছায়, অথবা হাসি-ঠাট্টার বশবর্তী হয়ে করলে বা বললেও বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। যেমন অত্র হাদীসে বিবাহ, তালাক ও রাজয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো যুবক-যুবতী যদি দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে কৌতুকের বশবর্তী হয়েও ইজাব কবুল করে নেয়, তবে তাদের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি কোনো সজ্ঞান ব্যক্তি সুস্থ মস্তিষ্কে রাগের বশবর্তী হয়ে অথবা ঠাট্টাস্বরূপ স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে, তবুও তালাক হয়ে যাবে। এরপর যদি সে বলে, আমি স্ত্রীর সাথে হাসি-ঠাট্টা করেছি, এতে কোনো কাজ হবে না। কেননা, তা যদি গ্রহণযোগ্যই হয়, তবে শরিয়তের বিধানকে বাতিল বলে মেনে নিতে হবে। আর বিক্রয় (بَيْع) ও দান (هِبَة) ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এ একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। হাদীসে নিকাহ, তালাক ও রাজয়াত– এ তিনটি বিষয়কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, এ ধরনের যত বিষয় আছে তন্মধ্যে এ তিনটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই বিশেষভাবে এ তিনটিকে উল্লেখ করা হয়েছে।

٣١٤٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِىْ إِغْلَاقٍ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ قِيْلَ مَعْنَى الْاِغْلَاقِ الْاِكْرَاهُ)

৩১৪৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, জবরদস্তিতে তালাক ও [গোলাম ও বাঁদি] মুক্ত করা হয় না। –[আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ, কেউ কেউ বলেন, ইগলাক অর্থ ভীতি প্রদর্শনে জবরদস্তি]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জবরদস্তিতে তালাকের বিধান সম্পর্কে ইমামদের মতামত : জোরপূর্বক তালাকের বিধান সম্পর্কে ইমামদের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

ইমাম শাফেয়ী, মালিক ও আহমদ (র.) প্রমুখের মতে জবরদস্তির তালাক কার্যকরী হয় না। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, তা কার্যকরী হবে। উভয় মতের অনুকূলে সাহাবায়ে কেরামদের অভিমত পাওয়া যায়। জবরদস্তিমূলক তালাকে তালাকদাতার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বহাল থাকে কিনা? এটা নির্ণয়ের উপর এ মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রমুখ মুজ্তাহিদগণ বলেন, জবরদস্তিতে ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাধীনতা বাকি থাকে না। কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তালাক প্রদান করলে তা কার্যকরী হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, তালাক কার্যকরী হওয়ার জন্য স্বাধীনতা নয়; বরং জ্ঞান ও সচেতনতা থাকা আবশ্যক। অথচ জবরদস্তির সময় জ্ঞান-বুদ্ধি কিছুই বিলুপ্ত হয় না। কাজেই সে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি পরিচালনা করেই তালাক দেয়। কেননা, সে জবরদস্তির সময় দেখতে পায় যে, তার সম্মুখে দুটি সমস্যা উপস্থিত হয়েছে যথা স্ত্রীকে তালাক দিলে নিজের প্রাণ রক্ষা পায়, আর তালাক না দিলে প্রাণে মারা যায়। এমতাবস্থায় সে জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করে সেচ্ছায় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচায়। সুতরাং এ অবস্থায় তালাক দিলে তা কার্যকরী হবে। হ্যাঁ, সে ব্যক্তি জবরদস্তির সময় ছলচাতুরী বা দ্ব্যর্থবোধক বাক্য ব্যবহার করে উভয়টি রক্ষা করতে পারে। উপরের আলোচনা হতে পরোক্ষভাবে এটাও বুঝা যায় যে, তালাক প্রদানে ইচ্ছা-অনিচ্ছা কার্যকরী হওয়া না হওয়ার কারণ নয়, বরং জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পাওয়া না পাওয়া এর কারণ। তাই পূর্বের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাসি-ঠাট্টা করে তালাক দিলেও তা কার্যকরী হবে।

٣١٤٦ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوْهِ وَالْمَغْلُوْبِ عَلٰى عَقْلِهِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَعَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ الرَّاوِىْ ضَعِيْفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيْثِ)

৩১৪৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সর্বপ্রকার তালাক কার্যকরী হয়ে থাকে; কিন্তু বুদ্ধিহীন ও জ্ঞানশূন্য ব্যক্তির তালাক কার্যকরী হয় না। –[তিরমিযী। তিনি হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, হাদীসটি গরীব এবং হাদীসের জনৈক বর্ণনাকারী আতা যঈক ও হাদীস সংরক্ষণে অক্ষম।]

وَعَنْ ٣١٤٧ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلٰثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتّٰى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَعْتُوْهِ حَتّٰى يَعْقِلَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْهُمَا)

৩১৪৭. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন ব্যক্তি [হিসাব-নিকাশের কলম উঠিয়ে নেওয়ার ফলে] দায়দায়িত্বমুক্ত। নিদ্রিত ব্যক্তি জাগরিত না হওয়া পর্যন্ত, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালেগ না হওয়া পর্যন্ত এবং অজ্ঞান ব্যক্তি জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত। -[তিরমিযী, আবূ দাউদ। আর দারিমী হযরত আয়েশা (রা.) হতে এবং ইবনে মাজাহ উভয় হতে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী তিন ব্যক্তির উপর শরিয়তের বিধান হালকা করে দেওয়া হয়েছে-

১. **ঘুমন্ত ব্যক্তি :** যিনি গভীর নিদ্রায় বিভোর, এমন ব্যক্তির নিদ্রাবস্থায় যদি কোনো নামাজের ওয়াক্ত চলে যায়, তবে সে যখন জাগ্রত হবে, তখনই সে উক্ত নামাজ আদায় করে নেবে। শরিয়ত এ ব্যাপারে তাকে অনুমতি দিয়েছে। এমনিভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তি যদি নিদ্রাবস্থায় স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে, তবে সর্বসম্মত মতে তার এ তালাক গ্রহণযোগ্য হবে না।

২. **অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক :** যে বালক এখনও যৌবনে পদার্পণ করেনি, তার উপর শরিয়তের হুকুম প্রযোজ্য হবে না। নাবালক ছেলের তালাক সম্পর্কে ইমাম আহমদ (র.) বলেন, তা কার্যকরী হবে; কিন্তু হিদায়া গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, জমহূর ওলামায়ে কেরামের মতে, নাবালকের তালাক গ্রহণযোগ্য নয় যদিও সে আকেল হোক না কেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ اِلَّا طَلَاقَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ

৩. **অজ্ঞান ব্যক্তি (اَلْمَعْتُوْهُ) :** অভিধানে عته **অর্থ করা হয়েছে জ্ঞানের স্বল্পতা।** অতএব اَلْمَعْتُوْهُ দ্বারা স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী বা অজ্ঞান ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। আরো একটু বিশ্লেষণ করে বলা যায়, যে ব্যক্তি মাঝে মাঝে হুঁশ হারিয়ে ফেলে, আবার মাঝে মাঝে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, সে ব্যক্তিকেই مَعْتُوْه বলা হয়। এমন ব্যক্তি যদি অজ্ঞান অবস্থায় স্বীয় স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে, তবে তা কার্যকর হবে না। অবশ্য কেউ কেউ اَلْمَعْتُوْهُ-এর অর্থ করেছেন এমন ব্যক্তি, যার জ্ঞানের মধ্যে কোনো কারণে শূন্যতা বিরাজ করেছে। এটা হয়তো শরাব বা মদ পান করার কারণেও হতে পারে। আর এ বেহুঁশির কারণে সে নারী-পুরুষ বা আসমান-জমিনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে সক্ষম নয়। সংক্ষেপে এ ব্যক্তিকে মাতাল বলা যেতে পারে। এমন ব্যক্তি যদি মাতাল অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে তা কার্যকর হবে কিনা সে ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম কারখী, ত্বাহাবী, ইসহাক, আতা, তাউস (র.) এবং হযরত ওসমান ও জাবির (রা.)-এর মতে উক্ত ব্যক্তির তালাক কার্যকর হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও এটার অনুকূলে একটি অভিমত পাওয়া যায়। তাঁদের যুক্তি হলো, উদ্দেশ্য শুদ্ধ হওয়ার জন্য জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া পূর্বশর্ত, আর সে ব্যক্তি হলো জ্ঞানহীন। অতএব, তার তালাক কার্যকর হতে পারে না।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ছাওরী, নাখয়ী, আওযায়ী, যুহরী (র.) প্রমুখ সহ ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর একটি মতানুযায়ী মাতাল ব্যক্তির তালাক কার্যকর হবে। কেননা, তার এ জ্ঞান এমন এক কারণে তিরোহিত হয়েছে, যে কারণটা ছিল অপরাধমূলক। কাজেই তার শাস্তিস্বরূপ তাকে ভালো মনে করে তালাক কার্যকর হওয়ার হুকুম প্রদান করতে হবে।

وَعَنْ ٣١٤٨ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ طَلَاقُ الْاَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

৩১৪৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বাঁদি স্ত্রীর তালাক [সর্বোচ্চ] দুটি এবং তার ইদ্দত [এর সর্বোচ্চ সীমা] দুই ঋতুস্রাব।
-[তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَسْئَلَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ [সংশ্লিষ্ট মাসআলা] : তালাক ও ইদ্দতের ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে এ মতভেদ রয়েছে যে, এ দুটি কাজের ব্যাপারে পুরুষের অবস্থা [আজাদ বা গোলাম] গ্রহণীয়, নাকি স্ত্রীর অবস্থা [স্বাধীনা বা বাঁদি] গ্রহণীয়?

ইমাম শাফেয়ী, মালিক ও আহমদ (র.) বলেন, তালাক ও ইদ্দতের সংখ্যা পুরুষের অবস্থা [তথা আজাদ বা গোলাম] হিসেবে গণনা করা হবে। অনুরূপভাবে ইদ্দত গণনা করা হবে হায়েযের পরে তোহর বা পবিত্রাবস্থা দ্বারা।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, তালাক ও ইদ্দত উভয়টি স্ত্রীর অবস্থা দ্বারা গণনা করা হবে। আলোচ্য হাদীসে حَيْضَتَانِ শব্দ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ইদ্দত গণনা হায়েয তথা ঋতুর দ্বারাই হবে। বহুসংখ্যক সাহাবী, তাবেয়ীও এই মত পোষণ করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣١٤٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ . (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

৩১৪৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিবাহ বন্ধন হতে মুক্তির অভিলাষিণী এবং [বিনা ওজরে] খোলার প্রস্তাবকারিণী মুনাফিক [সদৃশ্য]। –[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْخُلْعُ-এর আভিধানিক অর্থ : خُلْع শব্দটি اِسْم مَصْدَرْ বা ক্রিয়া বিশেষ্য। ক্রিয়াপদে خُلْع বাবে فَتَحَ হতে ব্যবহৃত হয়। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে এর অর্থ– টেনে বের করা, খুলে ফেলা, বিচ্ছিন্ন করা ইত্যাদি। যেমন– خَلَعَ ثَوْبَهٗ عَنْ بَدَنِهٖ [সে তার শরীর হতে কাপড় টেনে বের করেছে], فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ [তোমার জুতাদ্বয় খোল]।

اَلْخُلْعُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরিয়তের পরিভাষায় خُلْع -এর অর্থ হলো–

اِزَالَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ الْمَوْقُوْفَةِ عَلٰى قَبُوْلِهَا بِلَفْظِ الْخُلْعِ وَفِىْ مَعْنَاهُ

অর্থাৎ বিবাহের মালিকানা, যা স্ত্রীর স্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল তা খোলা' বা এর সমার্থবোধক শব্দ দ্বারা দূর করে দেওয়া।

খোলা' কখন বৈধ : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক না থাকলে খোলা' করা যায়। তবুও খোলা' না করাই উত্তম কাজ। স্বামী-স্ত্রীর খোরপোশ অথবা স্ত্রী স্বামীর গৃহকাজের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আদায় না করতে পারলে এ সময় স্ত্রীর জন্য স্বামীকে মাল দিয়ে বিবাহ বন্ধন হতে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়া বৈধ।

খোলা'র হুকুম : খোলা' দ্বারা এক তালাকে বায়েন হয়। খোলা'র বিনিময় অপরিহার্য। স্বামীর দুর্ব্যবহারের দরুন খোলা' করলে বিনিময় গ্রহণ করা মাকরূহ। আর মালের বিনিময়ে বা মাল দেওয়ার শর্তে তালাক দিলে এক তালাক বায়েন হবে। স্ত্রী তা গ্রহণ করলে মাল দেওয়া আবশ্যক হবে, আর মদ বা শূকরের উপর খোলা' বা তালাক দিলে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

وَعَنْ ٣١٥٠ نَافِعٍ عَنْ مَوْلَاةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِىْ عُبَيْدٍ اَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَىْءٍ لَهَا فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ . (رواه مالك)

৩১৫০. **অনুবাদ :** হযরত নাফে' 'সাফিয়্যা বিনতে আবী উবাইদ'-এর মুক্ত দাসী হতে বর্ণনা করেন যে, সাফিয়্যা (রা.) তাঁর স্বামী [আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)] হতে নিজের সব কিছুর বিনিময়ে খোলা' করার প্রস্তাব দেন। এতে [স্বামী] আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) কোনো আপত্তি করেননি। –[ইমাম মালেক (র.) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মোহরের অতিরিক্ত সম্পদ দ্বারা স্ত্রীর খোলা' করা সম্পর্কে মতানৈক্য : স্বামী স্ত্রীকে যে পরিমাণ মোহর দিয়েছে, স্ত্রী ইচ্ছা করলে এর চেয়ে বেশি পরিমাণ সম্পদের বিনিময় খোলা' করতে পারবে কিনা সে সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

مَذْهَبُ الْمَالِكِ وَالشَّافِعِىْ وَاللَّيْثِ وَالنَّخْعِىْ وعِكْرِمَةَ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম মালেক (র.), শাফেয়ী (র.), লাইছ (র.), নাখয়ী (র.), ইকরিমা (র.), মুজাহিদ (র.), হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর মতে, মোহরের চেয়ে বেশি সম্পদের বিনিময়ে স্ত্রীর খোলা' করা বৈধ আছে। তাঁদের দলিল হলো কুরআনের এ আয়াতটি–

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ .... اَلْاٰيَةَ .

এ আয়াতের মধ্যে مَا হলো মাওসূলাহ যার অর্থ 'আম বা সাধারণ। অর্থাৎ এটা দ্বারা কমবেশি উভয়ই বুঝানো যেতে পারে।

مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আহমদ, ইসহাক, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, 'আতা (র.) প্রমুখের মতে, মোহরের অতিরিক্ত মালের বিনিময়ে খোলা' করা বৈধ নয়। তাঁদের দলিল হলো নিম্নের হাদীসটি–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ جَمِيلَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ مَا أَعْتِبُ عَلٰى ثَابِتٍ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلٰكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ وَ زِيَادَةً فَقَالَ النَّبِيُّ مَا الزِّيَادَةُ فَلَا . (أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

مَذْهَبُ الْأَحْنَافِ : ওলামায়ে আহনাফ বলেন, স্বামীর নাফরমানি ও দীনহীনতার কারণে যদি স্ত্রী খোলা' করে, তবে স্বামীর পক্ষে বৈধ হবে না স্ত্রীর নিকট হতে কিছু বিনিময় গ্রহণ করা। দলিল পবিত্র কুরআনের আয়াত–

لِقَوْلِهِ تَعَالٰى : وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا .

কিন্তু নাফরমানি ও অবাধ্যতা যদি স্ত্রীর পক্ষ হতে হয় এবং সে খোলা' করার প্রস্তাব দেয়, তবে স্বামী যে পরিমাণ মোহর তাকে দিয়েছে শুধু সে পরিমাণ নেওয়াই বৈধ হবে। এর চেয়ে বেশি নেওয়া জায়েজ হবে না।

প্রতিপক্ষের দলিলের উত্তর : ইমাম মালেক (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রমুখ নিজেদের অভিমতের অনুকূলে দলিলস্বরূপ যে আয়াত উপস্থাপন করেছেন, এর উত্তরে বলা যেতে পারে, আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে পরিমাণ মোহর দেওয়া হয়েছে, খোলা' করার সময় স্ত্রীর নিকট হতে সে পরিমাণই বিনিময়স্বরূপ নিতে পারবে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে যে পরিমাণ মোহর দেওয়া হয়েছে, সে পরিমাণ ফেরত নেওয়ায় উভয়ের কোনো অপরাধ হবে না।

ইমাম আহমদ (র.) সহ অন্যান্যরা ছাবিত ইবনে কায়েসের স্ত্রীর ঘটনাকে উল্লেখ করে বলেছেন যে, বিনিময় মোহরের বেশি নেওয়া যাবে না। তার উত্তরে বলা যেতে পারে, উক্ত ঘটনাটি সাধারণভাবে ধরে নেওয়া যাবে না; বরং ঘটনাটি ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যে, যদি নাফরমানি বা অবাধ্যতা স্ত্রীর পক্ষ হতে হয়, তবে মোহরের চেয়ে বেশি নেওয়া যাবে না; বরং এর সমপরিমাণ নিতে পারবে। উল্লেখ্য, নাফরমানি যদি স্বামীর পক্ষ হতে হয়, তবে বিনিময়স্বরূপ স্বামীর কিছু নেওয়া বৈধ হবে না।

وَعَنْ ٣١٥١ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ (رض) قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلٰثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتّٰى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَلَا أَقْتُلُهُ . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

৩১৫১. **অনুবাদ :** হযরত মাহমূদ ইবনে লবীদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক প্রদানের সংবাদ পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিতভাবে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন– আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকাবস্থায় আল্লাহর কিতাব [বিধান]-এর সাথে খেলা [অবজ্ঞা-অবহেলা] আরম্ভ হয়ে গেল? এতদশ্রবণে জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি তাকে হত্যা করব? –[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى -এর ব্যাখ্যা : একই সাথে তিন তালাক প্রদান করা আল্লাহ তা'আলার কিতাবের [বিধানের] বিপরীত। কেননা, পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হলো– اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ অর্থাৎ ইসলামের বিধান হলো– দুই তুহরে পৃথক পৃথক দুই তালাক প্রদান করা, তিন তালাক একই সাথে দেওয়া কুরআনের বিধানের বিপরীত। সুতরাং এটা গুনাহের কাজ তথা হারাম। তাই রাসূলে কারীম ﷺ অত্যধিক ক্রোধান্বিত হয়ে উক্ত বাক্যটি বলেছেন। কারণ, এতে পবিত্র কুরআনের বিধানের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা প্রদর্শন করা হয়। তবে হারাম হওয়ার কারণে ফলাফলের কার্যকারিতায় কোনো বিঘ্ন ঘটবে না; বরং তালাক হয়ে যাবে। জমহূরে সাহাবা, তাবেয়ী ও ইমামগণের এটাই অভিমত।

একত্রে তিন তালাক দেওয়ার বিধান : যদি কেউ তার স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক প্রদান করে এর বিধান কি হবে? এ সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। সমস্ত ইমামগণ এতে একমত যে, তিন তালাক হয়ে যাবে, তবে তাবেয়ী তাউস (র.) বলেন, এক তালাক হবে, ইবনে মোকাতেল বলেছেন– কোনো তালাকই পড়বে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, একত্রে

তিন তালাক দেওয়া জায়েজ আছে, তবে পৃথক পৃথকভাবে দেওয়া উত্তম। ইমাম আবূ হানীফা (র.) সহ অন্যান্য সকল ইমামগণ বলেন, এটা বিদ্‌আত ও গুনাহের কাজ, তবে তিন তালাক হয়ে যাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত আবূ বকর (রা.)-এর পুরা খেলাফত আমলে এবং হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতের দুই বৎসর কাল পর্যন্ত একসাথে তিন তালাককে এক তালাক বলে গণ্য করা হতো। অতঃপর যখন দেখলেন যে, নিত্যই এ পর্যায়ের তালাকের ঘটনা অনেক বেশি ঘটছে তখন তিনি অন্যান্য সাহাবীদের সমন্বয়ে পূর্বের মতো পরিবর্তন করে তিন তালাকের রায় দিলেন। এটার উপরেই ইজমা হয়েছে। [আমাদের দেশে আহলে হাদীস নামে পরিচিত সম্প্রদায় আজও একে এক তালাক বলে গণ্য করে আসছে। তাঁদের উচিত, হারাম-হালালের মতো ঝুঁকিপূর্ণ মাসআলায় ইজমার অনুকূলে নিজেদের জিদ পরিবর্তন করে ফেলা।]

وَعَنْ ٣١٥٢ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اِنِّىْ طَلَّقْتُ اِمْرَأَتِىْ مِائَةَ تَطْلِيْقَةٍ فَمَاذَا تَرٰى عَلَىَّ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طُلِّقَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَبْعٌ وَتِسْعُوْنَ اِتَّخَذْتَ بِهَا اٰيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا - (رَوَاهُ فِى الْمُوَطَّا)

৩১৫২. অনুবাদ : ইমাম মালেক (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর নিকট [বিশ্বস্ত সূত্রে] পৌঁছেছে যে, [এ ধরনের মারফূ', মাওকূফ ও মাকতূ' হাদীসগুলোকে যা মুয়াত্তা গ্রন্থে তিনি বর্ণনা করেছেন, বালাগাতে মালিক বলা হয়] জনৈক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করল, আমি স্বীয় স্ত্রীকে একশত তালাক প্রদান করেছি, এতদসম্পর্কে আমার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? উত্তরে তিনি বললেন, স্ত্রীলোকটি তোমা কর্তৃক তিন তালাক প্রাপ্তা হয়েছে। বাকি সাতানব্বইটি দ্বারা তুমি আল্লাহর আয়াত [বিধান] -এর সাথে বিদ্রূপ করেছ। –[মুয়াত্তা]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মুসান্নাফে ইবনে শায়বা ও দারাকুত্‌নীতে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর ঘটনায় বর্ধিতভাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমি তাকে একসাথে তিন তালাক দিতাম? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি তোমার রবের নাফরমানি করতে, তবে তোমার স্ত্রীর উপর তিন তালাকই পড়ত। এ হাদীস হতেও বুঝা যায় যে, একসাথে তিন বা ততোধিক যত তালাকই দেওয়া হোক না কেন তিন তালাক কার্যকর হবে।

এ ধরনের مَرْفُوْع - مَوْقُوْف - مَقْطُوْع হাদীসসমূহ যা ইমাম মালেক (র.) তাঁর মুয়াত্তা কিতাবে বর্ণনা করেছেন, হাদীসবিদগণ একে بَلَاغَتْ مَالِكْ (رح) নামে আখ্যায়িত করেছেন এবং সহীহ্ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

وَعَنْ ٣١٥٣ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ شَيْئًا عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الْعِتَاقِ وَلَا خَلَقَ اللّٰهُ شَيْئًا عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَبْغَضَ اِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ - (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِىُّ)

৩১৫৩. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে মু'আয! আল্লাহ তা'আলা জমিনের উপর [মানুষের জাগতিক কাজকর্মের মধ্যে] ক্রীতদাস মুক্ত করা হতে অধিক পছন্দনীয় কোনো কার্য সৃষ্টি করেননি। –[দারাকুতনী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও তার কার্যেরও স্রষ্টা। বস্তু ও তার গুণাগুণেরও স্রষ্টা। তাঁর সৃষ্টিতে উপকরণ ও মূল উপাদানের প্রয়োজন হয় না। কাজেই তিনি যেরূপ জড়পদার্থের স্রষ্টা, তদ্রূপ সকল গুণাগুণেরও স্রষ্টা। সৃজন একমাত্র তাঁর জন্য নির্ধারিত, তৎসহ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা। اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ আলোচ্য হাদীস হতে ক্রীতদাস মুক্তির গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুধাবনযোগ্য।

بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا
পরিচ্ছেদ : তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর বর্ণনা

ওলামায়ে কেরাম এ কথার উপর সর্বসম্মত যে স্বাধীনা নারীর জন্য তিন তালাকই চূড়ান্ত এবং দাসীর জন্য হলো দুই তালাক। হানাফী মাযহাব মতে তালাক স্ত্রীর মর্যাদা অনুযায়ী পতিত হয় যেমন কোনো স্বাধীন পুরুষের স্ত্রী যদি বাঁদি হয় তখন দুই তালাকই সর্বশেষ তালাক হিসাবে গণ্য হবে। এমনিভাবে তিন তালাকপ্রাপ্তা স্বাধীনা নারী যদি তার প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে যেতে চায় তবে তার জন্য অপর পুরুষের সাথে দ্বিতীয় বিবাহ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন– فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ এটাই সকল ইমামের ঐকমত্য সিদ্ধান্ত, নিম্নে এ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣١٥٤ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ جَاءَتْ اِمْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّىْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِىْ فَبَتَّ طَلَاقِىْ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَمَا مَعَهُ اِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ اَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِىْ اِلٰى رِفَاعَةَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَا حَتّٰى تَذُوْقِىْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩১৫৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রিফাআ কুরাযী নামক জনৈক সাহাবীর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, আমি রিফা'আর বিবাহিতা স্ত্রী ছিলাম, সে আমাকে সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন অর্থাৎ তিন তালাক প্রদান করেছে। অতঃপর আমি আবদুর রহমান ইবনে যুবাইর (রা.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই, কিন্তু তাঁর কাছে এই কাপড়ের কিনারার সদৃশ ব্যতীত আর কিছুই নেই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রিফাআর নিকট ফিরে যেতে চাও? সে বলল, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, না [তুমি ফিরে যেতে পার না] যতক্ষণ না তুমি তার স্বাদ গ্রহণ কর এবং সে তোমার স্বাদ গ্রহণ করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তিন তালাকের বিধান প্রসঙ্গে ইমামদের মতভেদ : তিন তালাকের বিধান সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সকল ইমাম একমত যে, একসঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাক প্রদানই হবে, অবশ্য সুন্নতের ব্যতিক্রম হওয়ায় গুনাহগার হবে। তবে সে যদি পুনরায় এ স্বামীর নিকট ফিরে যেতে চায় তাহলে সকল ইমাম এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, তার অন্য এক ব্যক্তিকে বিবাহ করে তার সাথে সহবাস করতে হবে, অতঃপর দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিলে বা মরে গেলে ইদ্দত শেষে প্রথম স্বামীর কাছে নতুন বিবাহের মাধ্যমে যেতে পারবে, অন্যথা নয়।

قَوْلُهُ حَتّٰى تَذُوْقِىْ عُسَيْلَتَهُ الخ -এর ব্যাখ্যা : এর দ্বারা ইঙ্গিত হলো সহবাস করা। উল্লেখ্য যে, শুধু আকদ বা নিকাহই যথেষ্ট নয়; বরং সহবাস শর্ত– বীর্যপাত শর্ত নয়। সহবাসের পূর্বে দ্বিতীয় স্বামী ছেড়ে দিলে বা সে মৃত্যুবরণ করলে প্রথম বা পূর্বের স্বামীর পক্ষে তাকে বিবাহ করা হালাল হবে না। একে সাধারণভাবে 'হালালা' বলা হয়।

প্রকাশ থাকে যে, এ দ্বিতীয় বিবাহ সম্পূর্ণরূপে শর্তমুক্ত হতে হবে। যেমন বিবাহের পর তালাক দিতে হবে, এরূপ শর্তারোপ করলে এ বিবাহই শুদ্ধ হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, এরূপ শর্তারোপ করা হারাম। এরূপ বিবাহকারীর উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ লানত করেছেন এবং হিলাকারী ব্যক্তিকে اَلتَّيْسُ الْمُسْتَعَارُ ধার করা ষাঁড় বলে তিরস্কার করেছেন। তাবেয়ী সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (র.) বলেন, শুধু বিবাহ করলেই হালাল হয়ে যাবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِیْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣١٥٥ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهٗ . (رَوَاهُ الدَّارِمِیُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَلِیٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ)

৩১৫৫. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হালাল [বা হীলাকারী] অর্থাৎ ২য় স্বামী ও যার উদ্দেশ্যে হীলা করা হয় অর্থাৎ প্রথম স্বামী উভয়ের উপর লানত করেছেন। –[দারিমী, ইবনে মাজাহ, আলী ইবনে আব্বাস ও উকবা ইবনে আমির (রা.) হতে।] মিশকাত গ্রন্থকার হাদীসটির সঠিক হাওয়ালা প্রদানের কিছুটা ভুল করেছেন। হাদীসটির সঠিক হাওয়ালা এরূপ হবে যথা– হযরত আলী (রা.) হতে আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে তিরমিযী ও নাসায়ী, হযরত জাবির (রা.) হতে তিরমিযী এবং হযরত উকবা ইবনে আমির (রা.) হতে ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শর্তের সাথে হালাল করার বিধান : তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী যাতে তার প্রথম স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করতে পারে সেজন্য যদি কেউ এমন শর্তে বিবাহ করে যে, ঐ নারীকে সহবাস করে ছেড়ে দেব তাহলে এমন ব্যক্তিকে 'মুহাল্লিল' বা হালালকারী বলে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এরূপ বিবাহ বৈধ, তবে মাকরূহে তাহরীমী। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (রা.)-এর একমত হলো, এরূপ বিবাহ ফাসেদ। ইমাম আহমদ (র.)-এরও এ অভিমত। সুতরাং তাঁরা বলেন, শর্তে হালালকৃতা নারী প্রথম স্বামীর পক্ষে বিবাহ করা বৈধ নয়। হ্যাঁ, শর্তে আবদ্ধ না হয়ে যদি কোনো ব্যক্তি প্রথম স্বামীর উপকারার্থে বিবাহ করে এবং পরে ছেড়ে দেয়, তখন এ ব্যক্তি ছওয়াব পাবে।

٣١٥٦ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (رض) قَالَ اَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَقُوْلُ يُوْقَفُ الْمُوْلِیْ . (رَوَاهُ فِیْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৩১৫৬. **অনুবাদ :** [প্রসিদ্ধ ফকীহ তাবেয়ী] সুলাইমান ইবনে ইয়াসার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দশের অধিক সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছি, তাঁদের প্রত্যেকেই বলেন যে, ঈলাকারীকে অপেক্ষা করতে হবে। –[শরহুস সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاِيْلَاءُ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ : اِيْلَاء শব্দের আভিধানিক অর্থ– শপথ বা কসম। শরিয়তের পরিভাষায়– اَلْاِيْلَاءُ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَنْعِ النَّفْسِ عَنْ قُرْبَانِ الْمَنْكُوْحَةِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مَنْعًا مُؤَكَّدًا بِالْيَمِيْنِ অর্থাৎ আপন বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে শপথ সহ চার মাস বা ততোধিক সময় পর্যন্ত সঙ্গম হতে বিরত থাকাকে اِيْلَاء বলা হয়।

اَلْاِيْلَاءُ-এর সময়সীমা সম্পর্কে ইমামদের মতানৈক্য : ঈলার সময়সীমা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ রয়েছে–

مَذْهَبُ اَهْلِ الظَّوَاهِرِ وَقَتَادَةَ وَحَمَّادٍ وَالنَّخْعِیْ وَغَيْرِهِمْ : আহলে যাহির, কাতাদাহ, হাম্মাদ, নাখয়ী (র.) প্রমুখের মতে, ঈলার জন্য কমবেশি নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই। তাঁদের দলিল হলো নিম্নোক্ত আয়াত– قَوْلُهٗ تَعَالٰى لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ এ আয়াতে 'ঈলা' যে চার মাস অথবা তার চেয়ে বেশি হবে, তা শর্তযুক্ত করা হয়নি; বরং চার মাস যে অপেক্ষা করতে হবে, তাই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রথমত এ ধরনের একটি অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন; কিন্তু পরে তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

مَذْهَبُ اَئِمَّةِ اَرْبَعَةٍ : পক্ষান্তরে ইমাম চতুষ্টয় এবং অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে চার মাসের কমে ঈলা হতে পারে না। তাঁরা নিম্নোক্ত দলিল উপস্থাপন করেন–

١. اِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ (رض) لَا اِيْلَاءَ فِيْمَا دُوْنَ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ . (رَوَاهُ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ فِىْ مُصَنَّفِهِ)

٢. وَاَخْرَجَ الْبَيْهَقِىُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كَانَ اِيْلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَاَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَوَقَّتَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ فَاِنْ كَانَ اَقَلَّ مِنْ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِاِيْلَاءٍ .

ঈলার সময়সীমা নির্ধারণে এটা হলো হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সুস্পষ্ট বক্তব্য। যার বিপরীত অভিমত প্রকাশ করতে কাউকে দেখা যায়নি। প্রথম পক্ষের দলিলের উত্তরে বলা যায়, আয়াতে ঈলা ও অপেক্ষা করা উভয়টির মুদ্দতই চার মাস। মূলত আয়াতটি ছিল এরূপ– لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ এখানে প্রথম اَرْبَعَةَ اَشْهُرٌ-কে দ্বিতীয়টার উপর ভিত্তি করে পরিত্যাগ করা হয়েছে।

حُكْمُ الْاِيْلَاءِ – **ঈলার হুকুম :** ঈলার দুটি সুরত হতে পারে, প্রথম সুরতে ঈলার কাফ্ফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে। যেমন, যদি স্বামী স্ত্রীকে লক্ষ্য করে আল্লাহর নামে শপথ করে বলে– وَاللّٰهِ لَا اَقْرُبُكِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ 'আল্লাহর শপথ! আমি চার মাস তোমার নিকটবর্তী হবো না।' এমতাবস্থায় স্বামী যদি শপথ ভঙ্গ করে এবং চার মাসের ভিতর স্ত্রীসহবাসে লিপ্ত হয়, তবে তার উপর শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। আর যদি শপথ ভঙ্গ না করে এবং চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে স্ত্রীর উপর এক তালাক বায়েন পতিত হবে। اِيْلَاءٌ مُؤَقَّتٌ বা সময় নির্ধারিত ঈলার এটাই প্রতিবিধান।

দ্বিতীয় সুরত হলো, যদি সময় অনির্ধারিতভাবে ঈলা করা হয় এবং স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়– وَاللّٰهِ لَا اَقْرُبُكِ 'আল্লাহর শপথ! আমি তোমার নিকটবর্তী হবো না।' তবে এ ক্ষেত্রে স্বামী যদি শপথ ভঙ্গ করে স্ত্রীসহবাসে মিলিত হয়, তবে তার উপর শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। তবে তাতে পুনঃ বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত পুনঃ তালাক পতিত হবে না; বরং শপথ ভঙ্গ না করার কারণে সে এক তালাকপ্রাপ্তা হবে। অতঃপর যদি স্বামী উক্ত স্ত্রীকে পুনঃ বিবাহ করে, তবে ঈলা পুনঃ প্রত্যাবর্তন করবে। এক্ষণে সে যদি সহবাসে লিপ্ত হয়, তবে ঈলা ভঙ্গ হবে ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। আর যদি শপথ ভঙ্গ না করে, তবে চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আরেকটি তালাকে বায়েন পতিত হবে। কারণ, এখনও শপথ বহাল রয়েছে। যেহেতু তা অনির্দিষ্ট কালের জন্য করা হয়েছে। অতঃপর সে যদি উক্ত স্ত্রীকে তৃতীয়বার বিবাহ করে, তবে পুনঃ ঈলা প্রত্যাবর্তন করবে এবং যদি তার সাথে সহবাসে লিপ্ত না হয়, তবে চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে।

আর যদি উক্ত ঈলাকৃত স্ত্রীকে স্বামী গ্রহণের পর সে স্বামী কর্তৃক তালাক দান বা তার মৃত্যুজনিত কারণে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হওয়ার পর তাকে ঈলাকারী পুনঃ বিবাহ করে, তবে তাতে ঈলা পুনঃ প্রত্যাবর্তন করবে না।

আর যদি আল্লাহর নামে শপথ করা ভিন্ন নিজের উপর কোনো দায়িত্ব চাপানোর শপথ করে, যেমন– স্বামী তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলল– اِنْ قَرُبْتُكِ فَعَلَىَّ حَجٌّ 'আর যদি তোমার নিকটবর্তী হই, তবে আমার উপর একটি হজ আবশ্যক হবে।' এ জাতীয় ঈলার ক্ষেত্রে শপথ ভঙ্গ করা হলে তার উপর চাপানো দায়িত্ব ওয়াজিব হবে। যেমন উল্লিখিত ক্ষেত্রে তার উপর হজ ওয়াজিব হবে।

উল্লেখ্য যে, যিহার ও ঈলা একমাত্র স্বামী কর্তৃক আপন বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে শুদ্ধ হয়ে থাকে। সুতরাং যদি কেউ অপর মহিলার সাথে যিহার বা ঈলা করে, তবে তা শুদ্ধ হবে না। এমনকি যদি সে অতঃপর সে মহিলাকে বিবাহ করে, তথাপি সে ব্যক্তি যিহারকারী বা ঈলাকারী হবে না। কারণ, এটা উচ্চারণকালে উক্ত মহিলা তার বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল না।

ঈলা কিভাবে সহীহ হবে? আল্লাহর নামে শপথ করলে مُوْلِىٌ বা শপথকারীর শপথ সহীহ হবে। আর এমন প্রত্যেক শব্দ দ্বারা اِيْلَاءٌ সহীহ হবে যেসব শব্দ দ্বারা يَمِيْن অর্থাৎ শপথ সাব্যস্ত হয়। আর যদি নামাজ বা রোজার শপথ করে, তাহলে اِيْلَاءٌ গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, এ অবস্থায়ও اِيْلَاءٌ গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম ইবনে হাযম (র.) বলেন– مَنْ حَلَفَ ذٰلِكَ بِطَلَاقٍ اَوْ صَوْمٍ اَوْ صَدَقَةٍ فَلَيْسَ بِمُوْلٍ সুতরাং এ সকল অবস্থায় مُوْلِىٌ অর্থাৎ শপথকারীর اِيْلَاءٌ সহীহ হবে না।

كَفَّارَةُ الْاِيْلَاءِ – **ঈলার কাফ্ফারা :** ঈলা বা শপথের কাফফারা হলো দশজন মিসকিনকে এরূপ মানের খাদ্য প্রদান করতে হবে, যেরূপ মানের খাদ্য নিজের পরিবার-পরিজনকে প্রদান করা হয়ে থাকে। তা মধ্যম ধরনের হবে। অথবা, একজন দাস বা দাসী আজাদ করে দেবে। যে ব্যক্তি এর কোনো একটিতেও সক্ষম হবে না, সে তিনটি রোজা রাখবে।

وَعَنْ ٣١٥٧ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ (رض) وَيُقَالُ لَهُ سَلَمَةُ بْنُ صَخْرٍ الْبَيَاضِىُّ جَعَلَ اِمْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ اُمِّهِ حَتّٰى يَمْضِىَ رَمَضَانَ فَلَمَّا مَضٰى نِصْفٌ مِنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلًا فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَا اَجِدُهَا قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا اَسْتَطِيْعُ قَالَ اَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لَا اَجِدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِفَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو اَعْطِهِ ذٰلِكَ الْعَرَقَ وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا اَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا لِيُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَ رَوٰى اَبُوْ دَاؤُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ نَحْوَهُ قَالَ كُنْتُ اِمْرَأً اُصِيْبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيْبُ غَيْرِىْ وَفِىْ رِوَايَتِهِمَا اَعْنِىْ اَبَا دَاؤُدَ وَالدَّارِمِىَّ فَاَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا .

৩১৫৭. **অনুবাদ :** বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত আবূ সালামা সাহাবী হযরত সালমান ইবনে সাখর (রা.) যার অপর নাম সালামা ইবনে সাখর বায়াযীও ছিল, তাঁর ঘটনা বর্ণনা করেন যে, তিনি রমজান মাসে স্বীয় স্ত্রীকে নিজের জন্য মায়ের পিঠের ন্যায় [সম্মানিতা] বলে ফেললেন, কিন্তু রমজানের অর্ধেক অতিবাহিত না হতেই এক রাত্রে তার সাথে সহবাস করে বসলেন। অতঃপর [পেরেশান হয়ে] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এসে সবিস্তারে ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, একটি গোলাম আজাদ কর। তিনি বললেন, আমার তো গোলাম নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করলেন, তবে একটানা দুই মাস রোজা রাখ। সালমান বললেন, আমার সাধ্যে কুলাবে না। তখন তিনি আদেশ করলেন, তবে ষাটজন মিসকিনকে খাওয়াও। সালমান বললেন, আমার সামর্থ্য নেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফারওয়া ইবনে আমর নামক জনৈক সাহাবীকে বললেন, তাকে [খেজুরের] টুকরিটি দান কর যাতে সে ষাটজন মিসকিনকে খাওয়াতে পারে। [বর্ণনাকারী হাদীসে উল্লিখিত عَرَقٌ শব্দের অর্থ করতে বলেন যে,] আরাক [খেজুরের পাতার বোনা] এতবড় টুকরী যাতে ১৫ অথবা ১৬ সা' পরিমাণ খেজুর ধরে। [এক সা' সামান তিন সের নয় ছটাক পরিমাণ, ১৫ সা'র পরিমাণ ১ মণ ১৩ সের সাত ছটাক, ১৬ সা' পরিমাণ একমণ ১৭ সের] এটা তিরমিযীর বর্ণনা, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারিমী সুলাইমান ইবনে ইয়াসারের মাধ্যমে সালামা ইবনে সাখর হতে প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন যে, সালামা বলেন, আমার মধ্যে নারী সংসর্গের প্রবল আসক্তি ছিল, যা সাধারণত অন্যের মধ্যে দেখা যেত না [এর পরে উল্লিখিত ঘটনা শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন এবং আবূ দাউদ ও দারিমীর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ৩য় নির্দেশ দানের সময় বলেন যে,] তবে তুমি এক ওয়াসাক খেজুর ষাট মিসকিনের মধ্যে বণ্টন করে দাও। এক ওয়াসাক সাট সা' পরিমাণ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

যিহারের পরিচয় : ظِهَارٌ অর্থ– সর্বদার জন্য বিবাহ হারাম এমন কোনো মাহরাম নারীর সাথে বা তার পিঠের সাথে বা যেসব অঙ্গ দেখা নিষিদ্ধ সেই অঙ্গের সাথে নিজের স্ত্রীকে তুলনা করা। যেমন, বলল– 'তুমি আমার মায়ের মতো বা ঝিয়ের মতো।' বা 'তুমি আমার নিকট আমার মায়ের পিঠের মতো।' তবে এ ধরনের উক্তির দরুন স্ত্রীর উপর তালাক হয় না। কিন্তু এর কাফফারা আদায় না করা পর্যন্ত উক্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস করা বা তাকে স্পর্শ করা ইত্যাদি সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যায়।

كَفَّارَةُ الظِّهَارِ **যিহারের কাফ্ফারা :** যিহারের কাফ্ফারা হলো স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করার পূর্বে ১. গোলাম (ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রমুখের মতে মুসলমান গোলাম, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মুসলিম-অমুসলিম, পুরুষ-স্ত্রী সব ধরনের) আজাদ করতে হবে, ২. যদি সাধ্যে না কুলায় তবে সঙ্গম করার পূর্বে বিরতিহীন দু'মাস রোজা রাখতে হবে (কাজেই এ দু'মাসের মধ্যে রমজান মাস বা উভয় ঈদের দিন ইত্যাদি হলে একটানা হবে না)। ৩. এটা করতে না পারলে ষাটজন মিসকিনকে (এক একজনকে সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ) খানা প্রদান করতে হবে। [ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সঙ্গম করার পূর্বে, ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে এখানে পূর্বের শর্ত নয়।]

وَاقِعَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ **সংশ্লিষ্ট ঘটনা :** জাহিলিয়া যুগে এরূপ 'যিহার' করলে একে নিশ্চিত তালাক গণ্য করা হতো। ইসলামি যুগে খাওলা নাম্নী জনৈকা মহিলাকে তার স্বামী এ ধরনের উক্তি করলে পূর্বের ধারণানুযায়ী খাওলা একে তালাক ধারণা করল এবং ছোট ছোট সন্তানদের প্রতিপালনে চরম দুরবস্থা হতে দেখে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে স্বামীর এই কর্ম-কাণ্ডের অভিযোগ জানাল, কিন্তু হুযূর ﷺ বললেন, আমার কাছে তার নতুন বা বিকল্প কোনো সমাধান নেই। পূর্বের প্রথা অনুযায়ী তোমার উপর তালাক কার্যকর হয়ে গেছে। কিন্তু সন্তানদের বাৎসল্যে সে অস্থির হয়ে বারবার আল্লাহর নবীকে অনুরোধ করতে থাকল—যেন তিনি এর একটি উপায় করে দেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নতুন বিধানের এ আয়াত নাজিল করেন— قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا (الآية) এতে যিহারের কাফ্ফারা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে এবং এতে তালাক হবে না বলে জানানো হয়েছে। চার মাযহাবের সকলেই এ কথার উপর ঐকমত্য।

وَعَنْ ٣١٥٨ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ اَنْ يُكَفِّرَ قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩১৫৮. অনুবাদ : হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াসার, সালামা ইবনে সাখর (রা.) হতে এবং তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, যিহারকারী কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে সহবাস করলে তার উপর একটি কাফ্ফারাই ওয়াজিব হবে।
—[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣١٥٩ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ اِمْرَأَتِهِ فَغَشِيَهَا قَبْلَ اَنْ يُكَفِّرَ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلٰى ذٰلِكَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْتُ بَيَاضَ حَجْلَيْهَا فِي الْقَمَرِ فَلَمْ اَمْلِكْ نَفْسِيْ اَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَرَهُ اَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتّٰى يُكَفِّرَ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَرَوٰى اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا وَقَالَ النَّسَائِيُّ الْمُرْسَلُ اَوْلٰى بِالصَّوَابِ مِنَ الْمُسْنَدِ)

৩১৫৯. অনুবাদ : হযরত ইকরিমা হতে বর্ণিত। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে যিহার করে কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে তার সাথে সহবাস করে বসে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এসে ঘটনা বিবৃত করে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিসে তোমাকে এ কার্যে উদ্বুদ্ধ করল? সে বলল, আমি চাঁদের আলোয় তার পায়ের শুভ্রতা দেখে নিজেকে স্থির রাখতে পারিনি। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে ফেললেন এবং কাফ্ফারা প্রদানের পূর্বে সহবাস করা হতে বিরত থাকার আদেশ দিলেন। —[এটা ইবনে মাজার বর্ণনা। তিরমিযীও অনুরূপ বর্ণনা করে মন্তব্য করেছেন— হাদীসটি হাসান, সহীহ, গরীব। আবূ দাউদ ও নাসায়ী মুসনাদ ও মুরসালরূপে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং নাসায়ী বলেন, হাদীসটি মুসনাদ অপেক্ষা মুরসাল হওয়াই সঠিক।]

মাসাবীহের সম্মানিত গ্রন্থকার কোনো কোনো পরিচ্ছেদের শিরোনাম প্রদান করেননি, এর কারণ হলো হয়তো শিরোনাম দেওয়ার ইচ্ছা ছিল সময়ের অভাবে দিতে পারেননি বা ভুলে গেছেন অথবা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের আলোচিত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বিধায় নতুন শিরোনাম দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣١٦٠ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ (رض) قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ جَارِيَةً كَانَتْ لِيْ تَرْعٰى غَنَمًا لِيْ فَجِئْتُهَا وَقَدْ فَقَدَتْ شَاةً مِنَ الْغَنَمِ فَسَاَلْتُهَا عَنْهَا فَقَالَتْ اَكَلَهَا الذِّئْبُ فَاَسِفْتُ عَلَيْهَا وَكُنْتُ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ فَلَطَمْتُ وَجْهَهَا وَعَلَيَّ رَقَبَةٌ اَفَاُعْتِقُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيْنَ اللّٰهُ فَقَالَتْ فِي السَّمَاءِ فَقَالَ مَنْ اَنَا فَقَالَتْ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْتِقْهَا (رَوَاهُ مَالِكٌ) وَفِيْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ قَالَ لِيْ جَارِيَةٌ تَرْعٰى غَنَمًا لِيْ قِبَلَ اُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَاِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا وَاَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ اٰسَفُ كَمَا يَاْسَفُوْنَ لٰكِنْ صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَظَّمَ ذٰلِكَ عَلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا اُعْتِقُهَا قَالَ ائْتِنِيْ بِهَا فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا

৩১৬০. **অনুবাদ :** হযরত মুয়াবিয়া ইবনুল হাকাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম– ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার জনৈকা দাসী আমার মেষ পাল চড়াত, একদিন আমি মেষ পালের নিকট উপস্থিত হয়ে একটি মেষ দেখতে পেলাম না। দাসীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, নেকড়ে খেয়ে ফেলেছে। এতে আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলাম। আমি সাধারণ একজন মানুষ [ধৈর্য ধরতে পারিনি, রাগের বশে] তার মুখে এক থাপ্পড় মেরে দিলাম। ইতঃপূর্বে কোনো কারণে আমার উপর একজন দাস বা দাসী মুক্ত করা শরিয়তের বিধানে জরুরি হয়েছে, এজন্য উক্ত দাসীকে মুক্তি দান করলে চলবে কি? অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন– বলতো আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আকাশে। আবার জিজ্ঞেস করলেন, বলতো! আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুয়াবিয়াকে বললেন, হ্যাঁ, ওকে আজাদ কর। [এটা মুয়াত্তা মালিকের বর্ণনা] মুসলিমের বর্ণনায় আছে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এসে বললেন, আমার এক দাসী উহুদ পাহাড় ও জাওয়ানিয়া [উহুদের নিকটে একটি স্থানের নাম]-এর মধ্যবর্তী স্থানে মেষ পাল চড়াত। একদিন আমি দেখতে পেলাম যে, একটি মেষ নেকড়ে ধরে নিয়ে গেছে। আমি একজন সাধারণ মানুষ তাদের মতো আমিও ক্রোধের শিকার হই, আমি তাকে এক মুষ্ট্যাঘাত করলাম। অতঃপর আমি [ব্যথিত হৃদয়ে] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি আমার এ প্রহারকে মারাত্মক অপরাধ বলে গণ্য করলেন। এতে আমি আরজ করলাম ওকে আমি মুক্ত করে দেব কি? তিনি

أَيْنَ اللّٰهُ قَالَتْ فِى السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ـ

বললেন, ওকে আমার নিকট নিয়ে আস। আমি নির্দেশ পালন করলাম। তিনি ওকে জিজ্ঞেস করলেন, বলতো আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আকাশে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বলতো আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি আমাকে বললেন, হ্যাঁ, ওকে আজাদ করতে পার। কারণ, সে মু'মিনা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীস হতে জানা যায় যে, দাস-দাসী ও চাকর-চাকরানীকে প্রহার করা [শরিয়তের নির্দেশ ব্যতীত] কত বেশি মারাত্মক অপরাধ। ক্রীতদাসী যার কোনো মানবীয় মূল্য তৎকালীন সামজে ছিল না, তদুপরি একটি মেষ নষ্ট করার কারণে শুধুমাত্র একটি চড় বা মুষ্ট্যাঘাতের দরুন মালিক হযরত মুয়াবিয়া (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে ছুটে এসেছেন অত্যন্ত অনুতপ্ত হৃদয়ে, কি করে এ অন্যায় কার্যের পাপ হতে মুক্তি পেতে পারেন– সে আশায়। মহানবী ﷺও তাঁর এ প্রকার কার্যকে মারাত্মক অন্যায় বলে অভিহিত করলেন। এর প্রতিকারে তিনি উক্ত দাসীকে মুক্ত করে দিলেন। পরবর্তী [৩২০৮ নং] হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– গোলামকে থাপ্পড় মারার কাফ্ফারা বা প্রতিকার হলো তাকে মুক্ত-স্বাধীন করে দেওয়া। মহানবী ﷺ মানবতার প্রতি কি অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ জাগরিত করতে চেয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম অক্ষরে অক্ষরে এ শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। আর আজ আমরা কোথায়? আমাদের এ শিক্ষা গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য।

আলোচ্য হাদীসে– আল্লাহ কোথায়? প্রশ্নের উত্তরে 'আকাশে' বলার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করছেন; বরং প্রশ্নোত্তরের অর্থ আল্লাহ সম্পর্কে এর সাধারণ বোধ আছে কিনা, তা নির্ণয় করা। সাধারণভাবে মনে করা হয়, উর্ধ্বে আল্লাহর অবস্থান এবং আল্লাহর আরশ সর্ব উর্ধ্বে ও সর্বব্যাপী। দাসীটি মু'মিনা কিনা তা জানার জন্য তিনি এ প্রশ্ন করেছিলেন ও তার উত্তর সঠিক হয়েছে মনে করেছেন। শাস্ত্রীয় কূটতর্ক ও জটিল আলোচনা পণ্ডিতজনের জন্য, সাধারণের জন্য একটি সাধারণ বিশ্বাসই যথেষ্ট।

بَابُ اللِّعَانِ
পরিচ্ছেদ : লি'আনের বর্ণনা

لِعَانٌ শব্দটি বাবে مُفَاعَلَة -এর মাসদার, শাব্দিক অর্থ হলো– দূরে নিক্ষেপ করা বা সরিয়ে দেওয়া বা অন্যকে অভিশাপ প্রদান করা।

শরিয়তের পরিভাষায় যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে অথচ চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে সক্ষম হয়নি এবং স্ত্রী তা অস্বীকার করল এমতাবস্থায় কাজির দরবারে প্রথমে স্বামী চারবার আল্লাহর নামে সাক্ষ্য প্রদান করে বলবে– আমি যে অভিযোগ এনছি তা সত্য। পঞ্চমবারে বলতে হবে– আমি যদি মিথ্যাবাদী হই, তবে আমার উপর আল্লাহর লানত। অনুরূপভাবে স্ত্রীও চারবার আল্লাহর নাম করে স্বামীর দাবি মিথ্যা বলে সাক্ষ্য দেবে, পঞ্চমবার বলতে হবে– যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে আল্লাহর ক্রোধ আমার উপর পতিত হোক। যেহেতু লি'আনের পরে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সেহেতু অথবা স্বামীর বাক্যে পঞ্চমবারে লা'নত শব্দের উল্লেখ থাকায় একে لِعَانٌ [লি'আন] নামে অভিহিত করা হয়েছে।

লি'আনের বিধানের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা : কোনো ব্যক্তি যদি কারও উপর ব্যভিচারের অভিযোগ আনয়ন করে শরিয়তের নির্দেশে তাকে আরো তিনজন চাক্ষুষ সাক্ষীসহ চারজনের সাক্ষ্য কাজির দরবারে পেশ করতে হবে। এটা করতে সমর্থ হলে উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর ব্যভিচারের শাস্তি [১০০ শত দোররা অথবা পাথর নিক্ষেপে হত্যা] প্রদান করা হবে। পক্ষান্তরে সে যদি চারজনের চাক্ষুষ সাক্ষ্য প্রদানে সমর্থ না হয়, তবে তার [উক্ত অভিযোগকারীর]

উপর حَدِّ قَذْفٍ বা অপবাদ আনয়নের শাস্তি [৮০ দোররা] বর্তাবে এবং চিরতরে তার সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে। কুরআন মাজীদের ২৪ : ২ ও ২৪ : ৪ আয়াতে এ সমস্ত বিধানের উল্লেখ রয়েছে। [অবশ্য পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার আয়াত বর্তমানে বাকি না থাকলেও সকল হাদীসের কিতাবে বহু সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক বর্ণিত একাধিক হাদীসে এ শাস্তির উল্লেখ রয়েছে– যার ফলে এটা নিশ্চিত রূপে প্রমাণিত হয়েছে]। উপরোল্লিখিত অভিযোগ ও শাস্তি সকল পুরুষ ও নারীর জন্য। অবশ্য এখানে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষেত্র রয়েছে। তা হচ্ছে– স্বামী যদি তার স্ত্রীর ব্যভিচার প্রত্যক্ষ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত কতে সক্ষম না হয়, তবে সে কি করবে? যদি সে অভিযোগ উত্থাপন করে, তবে তাকে ৮০ দোররা খেতে হবে। পক্ষান্তরে অভিযোগ আনয়ন ব্যতীত সে নীরবে কেমন করে এটা হজম করে যাবে? অপর নারী-পুরুষের বেলায় সাক্ষী না থাকায় নীরব হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। বিশেষত ৮০ দোররার ভয়ে; কিন্তু যে স্ত্রীকে স্বামী স্বচক্ষে ব্যভিচার করতে দেখেছে সে স্ত্রীকে নিয়ে কিভাবে জীবনযাপন করবে? অভিযোগ করলে বিপদ– ৮০ দোররা খেতে হবে। না করে নীরবে সহ্য করে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। আবার শুধু স্বামীর দাবিতে স্ত্রীকে ব্যভিচারের শাস্তি প্রদান করলে স্ত্রীর উপর জুলুম হবে। শত শত নারীর জীবন [স্ত্রীর দাবি ও ধারণানুযায়ী] স্বামীর মিথ্যা দাবিতে বিপন্ন হবে। এ ত্রিশংকু অবস্থা ও কঠিন সমস্যা হতে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে লি'আনের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। স্বামী যদি স্ত্রীর ব্যভিচার প্রত্যক্ষ করে তার আত্মাভিমানে আঘাত বোধ না করে নীরব থেকে যায়, তবে তা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। অনুরূপভাবে স্ত্রী যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে স্বামীকে শান্ত করতে সক্ষম হয়, তাতে কারও কিছু বলার নেই; কিন্তু গোল বেঁধেছে যখন স্বামী সহ্য করবে না, স্ত্রীও স্বীকার করবে না, তখন সাধারণত কোনো স্বামী এ সময়ে চারজন সাক্ষী জোটাতে চাইবে না; বরং সম্ভব হলে উভয়কে হত্যা করে ফেলবে। তাছাড়া চারজন সাক্ষী সংগ্রহ করতে করতে তারও কাজ সম্পন্ন করে ফেলবে, আভাস পেলে সর্তক হয়ে যাবে, ইত্যাকার নানা ধরনের বাস্তব অসুবিধার দরুন স্বামীর পক্ষে তখন নীরব থাকা অথবা স্ত্রীর উপর অভিযোগ আনয়ন ছাড়া গত্যান্তর থাকবে না। তার আত্মমর্যাদা তাকে কিছুতেই নীরব থাকতে দেবে না, সে তো মর্ম যাতনায় জ্বলে পুড়ে মরছে। তার পৌরুষে আঘাত লেগেছে, সে সিংহ বিক্রমে স্ত্রীর টুটি চেপে ধরবে; কিন্তু হত্যার বদলে হত্যা এবং নরহত্যার মহাপাপের ভয়ে তার বজ্রমুষ্টি আপনা-আপনি শিথিল হয়ে আসবে। তার প্রতিহিংসা এ বিশ্বাসঘাতকিনীকে নীরবে তালাক দিয়ে বিদায় করে দিতেও তাকে বাধা দিচ্ছে। তা ছাড়া তালাক দিলে নানা প্রশ্ন, নানা সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। কাজেই সে তখন বাধ্য হয়ে ছুটবে কাজির দরবারে, শরণাপন্ন হবে আদালতের, আশ্রয় গ্রহণ করবে আইনের।

চিত্রের অপর দিক দেখুন– হতে পারে সকল ঘটনা বানোয়াট, স্বামী তার মনের আক্রোশ মেটানোর জন্য স্ত্রীর উপর এ অপবাদ লাগিয়েছে, কোনো আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ভদ্র ঘরের কন্যা মুহূর্তের তরেও নিজের উপর এ অপবাদ সহ্য করবে না, সে তার নিজের পিতামাতা, বংশের মুখে চুনকালী মাখানোর কঠিন বিপদ হতে রক্ষা পাবার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে অত্যাচারী কুটিল স্বামীর এ আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করবে। কাজেই আদালত প্রাঙ্গনে, সর্বসমক্ষে সে তার সতীত্ব প্রমাণের, ব্যভিচারের কঠিন শাস্তি [প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যু] হতে রক্ষা পাবার, বংশের মানমর্যাদা রক্ষার এবং জালিম কুচক্রী স্বামীর ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করতে আল্লাহর নামে শপথ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করবে না। লি'আনের বিধান প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা এখানে এভাবে।

حُكْمُ اللِّعَانِ – **লি'আনের বিধান :** লি'আনের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আপনা-আপনিই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে যায়। কাজি বা বিচারকের নির্দেশের অপেক্ষা রাখে না, ইমাম শাফেয়ী, মালিক ও বিভিন্ন ফকীহদের অভিমত। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, বিবাহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য কাজির নির্দেশ লাগবে যা বায়েন তালাকের সমপর্যায়ের শক্তি রাখে। তবে তাদের মধ্যে এ বিচ্ছিন্নতা চিরদিনের জন্য বলবৎ থাকবে। আবার কেউ কেউ বলেন, লি'আনের বাক্যে 'শাহাদাত' রয়েছে, তাই তা يَمِيْن বা শপথের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, বাঁদি-গোলামের উপর লি'আনের বিধান প্রযোজ্য হবে না। কুরআন মাজীদের شَهَادَةٌ [শাহাদাত] শব্দ ইমাম আ'যম (র.)-এর অভিমতকেই সমর্থন করে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣١٦١ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ (رضـ) قَالَ إِنَّ عُوَيْمِرَ الْعَجْلَانِيَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ اِمْرَاَتِهِ رَجُلًا اَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُوْنَهُ اَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُنْزِلَ فِيْكَ وَفِيْ صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَاَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ اَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْظُرُوْا فَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَسْحَمَ اَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيْمَ الْاَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَلَا اَحْسِبُ عُوَيْمِرًا اِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا وَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اُحَيْمِرَ كَاَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا اَحْسِبُ عُوَيْمِرًا اِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِيْ نَعَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ تَصْدِيْقِ عُوَيْمِرٍ فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ اِلٰى اُمِّهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩১৬১. অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে সা'দ সাইদী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উয়াইমির আজলানী' নামক সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অপর পুরুষকে [ব্যভিচারে] দেখতে পায় এবং সে [ক্রোধের বশবর্তী হয়ে] যদি তাকে হত্যা করে বসে, তবে কি তারা [নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশান শরিয়তের বিধানে, অপর বর্ণনায় তোমরা] তাকে হত্যা করবে? [যদি হত্যা না করে] তবে সে [স্বামী] কি করবে? [এই লজ্জা-অপমান কি করে বরদাশত করবে?] রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার এবং তোমার স্ত্রীর সম্পর্কে ওহী নাজিল হয়েছে, [অর্থাৎ তোমাদের উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে] যাও, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে আস। বর্ণনাকারী সাহল (রা.) বলেন, অতঃপর তারা উভয়ে [উয়াইমির ও তার স্ত্রী] মসজিদে লি'আন করল, আমিও অন্যান্য লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকটে উপস্থিত থেকে ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিলাম। উভয়ে যখন লি'আন শেষ করল, তখন 'উয়াইমির' বলল, আমি যদি তাকে আমার বিবাহ বন্ধনে আটকে রাখি, তাহলে আমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছি, এটা বলে সে তাকে তিন তালাক দিয়েছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা অপেক্ষায় থাক– যদি স্ত্রী লোকটি কালো রংয়ের এবং কালো চক্ষুবিশিষ্ট, বড় বড় নিতম্ব, মোটা মোটা পা-বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তবে মনে করব, উয়াইমির তার সম্পর্কে সত্য বলেছে। আর যদি রক্তিম বর্ণের ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় লাল বর্ণের সন্তান প্রসব করে, তবে মনে করব উয়াইমির মিথ্যা বলেছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর স্ত্রীলোক এমন রঙের সন্তান প্রসব করল যেরূপ রাসূল ﷺ বর্ণনা করেছেন– যা দ্বারা 'উয়াইমিরের দাবির সত্যতার ধারণা জন্মে।' এরপর হতে সন্তানটিকে [পিতার পরিবর্তে] মাতার দিকে সম্বন্ধ করে ডাকা হতো।–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দুই হাদীসের দ্বন্দ্ব এবং তার সমাধান : আলোচ্য হাদীস হতে প্রমাণিত হয় যে, লি'আনের আয়াত উয়াইমিরের ঘটনায় নাজিল হয়েছিল। অথচ বুখারীতে বর্ণিত অপর একটি হাদীস যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, তা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, লি'আনের আয়াত হিলাল ইবনে উমাইয়া নামক সাহাবীর ঘটনায় নাজিল হয়েছিল।

মুহাদ্দিসগণ এ দ্বন্দ্ব নিরসনে বলেন যে, উভয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত নাজিল হয়েছিল, কেউ এক ঘটনার উল্লেখ করেছেন, আবার কেউ অপরজনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আয়াতে বর্ণিত বিধান উভয় ঘটনার সমাধান করেছে বিধায় উভয় ঘটনাকেই এ আয়াত অবতীর্ণের সাথে সঙ্গত বলা যেতে পারে। এতে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

লি'আনের পর তালাক দেওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, লি'আনের পর তালাকের প্রয়োজন নেই, তবে কাজি উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী, মালেক (র.) সহ অন্যান্য ইমামগণ বলেন– তালাক দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না এবং এর কার্যকরী ফলও হয়নি। সুতরাং লি'আন করার সাথে সাথেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, কাজির নির্দেশের প্রয়োজন নেই। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, স্বামীর লি'আনের পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, উভয়ের লি'আনের পর বিচ্ছিন্ন হবে।

উল্লেখ্য যে, উওয়াইমির ছিলেন– লাল গৌর বর্ণের। আর ঐ ব্যভিচারী লোকটি ছিল আগত সন্তানের যেরূপ আকৃতি হুজুর ﷺ বর্ণনা দিয়েছেন সেই বর্ণনানুযায়ী। কাউকে ব্যভিচারী সাব্যস্ত করার জন্য সন্তানের বর্ণ আকৃতি যথেষ্ট নয়, আর তা দলিলও নয়। অবশ্য একটা সাধারণ ধারণা প্রবল হয়। আলোচ্য হাদীসের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, হুজুর ﷺ বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তাই তা সঠিক হয়েছে। আর 'ওহরা' লাল রংয়ের একপ্রকার কীট।

٣١٦٢ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفٰى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ حَدِيْثِهِ لَهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ .

৩১৬২. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মাঝে লি'আনের বিধান কার্যকরী করেন এবং পুরুষটি স্ত্রীলোকটির সন্তানকে নিজের সন্তান বলে অস্বীকার করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলেন এবং সন্তানটিকে তার মায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দিলেন।–[বুখারী ও মুসলিম]

ইবনে ওমরের এ হাদীসে এ বিষয়েরও উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষটিকে উপদেশ দিলেন [যে, মিথ্যা অপবাদ কত বড় মারাত্মক অপরাধ] ও ভীতি প্রদর্শন করলেন [যে, আখিরাতের আজাব কত কঠিন] এবং তাকে সতর্ক করলেন যে, পার্থিব শাস্তি [অপবাদের ৮০ কোড়া] আখিরাতের আজাব [যা লি'আনের মিথ্যা শপথ ও লানত কামনার দ্বারা আসতে পারে] হতে অতি সামান্য। অতঃপর স্ত্রীলোকটিকে ডেকে অনুরূপভাবে উপদেশ দিলেন, ভীতি প্রদর্শন করলেন ও সতর্ক করে দিলেন যে, আখিরাতের আজাব হতে পার্থিব শাস্তি অতি লঘু; কিন্তু তারা উভয়ে স্বীয় দাবি ও জিদের উপর অনড় থাকল, ফলে লি'আন করার প্রয়োজন দেখা দিল।

٣١٦٣ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللّٰهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالِيْ قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩১৬৩. অনুবাদ : উক্ত হযরত ইবনে ওমর (রা.) আরো বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বললেন– তোমাদের মধ্যে প্রকৃত দোষী নির্দোষীর বিচার আল্লাহই করবেন, নিঃসন্দেহে তোমাদের একজন মিথ্যাবাদী [কিন্তু আমরা তা নির্ণয় করতে পারছি না]। স্বামীকে বললেন, তোমার তার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, স্বামী চিৎকার করে উঠল [মোহরে প্রদত্ত] আমার ধনসম্পত্তির কি হবে? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি কোনো কিছুই পাবে না, যদি তুমি [ব্যভিচারের দাবিতে] সত্য বলে থাক, তবে ইতঃপূর্বে স্ত্রীকে যে উপভোগ করেছ তার বিনিময়ে তোমার [মোহরে প্রদত্ত] মাল গেল। আর যদি মিথ্যা অপবাদ লাগিয়ে থাক, তবে তো মাল ফেরত পাওয়া তো দূরের কথা, ফেরতের কথাই উল্লেখ করতে পার না।
–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীস হতে প্রমাণিত হলো যে, স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের দাবি করলে যেরূপ লি'আন-এর বিধান কার্যকর করতে হয়, তদ্রূপ বিবাহিতা স্ত্রী সন্তান প্রসব করলে স্বামী যদি উক্ত সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করে সে ক্ষেত্রেও লি'আনের বিধান কার্যকরী করতে হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, পিতৃত্ব অস্বীকারের সাথে প্রকাশ্য ব্যভিচারের দাবি করলে লি'আন কার্যকর করা হবে।

হাদীস হতে এটাও প্রমাণিত হলো যে, লি'আন দ্বারা فُرْقَتْ বা বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে এবং উক্ত বিচ্ছেদ কাজি কর্তৃক হবে; যেমন– অত্র হাদীসে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলেন। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত।

হাদীস দ্বারা এটাও প্রমাণিত হলো যে, লি'আন কার্যকর করার পূর্বে প্রথমে স্বামীকে ও পরে স্ত্রীকে উপদেশ দান, সতর্ক করা কাজির কর্তব্য। এ ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন। হাদীস হতে প্রমাণিত হলো যে, লি'আনের ফলে বিচ্ছেদ ঘটলে স্ত্রীকে মোহরে প্রদত্ত মাল স্বামী ফেরত পাবে না। এটাও সকলের অভিমত। অবশ্য যদি স্বামী স্ত্রীকে উপভোগ না করে থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও শাফেয়ী (র.) বলেন, অর্ধেক মোহর ফেরত পাবে। হাদীসে মোহর ফেরত না পাওয়ার কারণরূপে উপভোগের কথা উল্লেখ রয়েছে।

হাদীস হতে জানা গেল, লি'আন সমাপ্ত হলে নিশ্চিতভাবে স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী অথবা স্বামীকে অপবাদ আরোপকারী বলা যাবে না।

٣١٦٤ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ هِلَالَ بْنَ اُمَيَّةَ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْبَيِّنَةَ اَوْ حَدًّا فِيْ ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا رَاٰى اَحَدُنَا عَلٰى اِمْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اَلْبَيِّنَةَ وَاِلَّا حَدٌّ فِيْ ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ اِنِّيْ لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللّٰهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِيْ مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرَئِيْلُ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ فَقَرَأَ حَتّٰى بَلَغَ اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ

২১৬৪. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হিলাল ইবনে উমাইয়া (রা.) নামক জনৈক সাহাবী তার স্ত্রীর উপর শরীক ইবনে সাহমা কর্তৃক ব্যভিচারের অভিযোগ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উত্থাপন করেন। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হয় তোমার দাবির সমর্থনে [শরিয়তসম্মত] সাক্ষী পেশ কর, অন্যথায় তোমার পিঠে [অপবাদ আরোপের] শাস্তি প্রদান করা হবে। উত্তরে হিলাল (রা.) বললেন, যখন স্বামী নিজের স্ত্রীর সাথে কোনো পুরুষকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখবে, তখন কি সে সাক্ষী-প্রমাণের তালাশে যাবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতে লাগলেন, সাক্ষী-প্রমাণ নিয়ে এস নতুবা তোমার পিঠে [অপবাদ লাগানোর] শাস্তি। হিলাল (রা.) বললেন, সেই আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন। আমার দাবিতে আমি নিশ্চয়ই সত্যবাদী। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই এমন বিধান অবতীর্ণ করবেন, যার ফলে আমার পিঠ অপবাদের কোড়া হতে রক্ষা পাবে। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) অবতরণ করলেন এবং আল্লাহর আয়াত নাজিল করলেন– وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ اَلْاٰيَةَ [এবং যারা নিজের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে ....] রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠ করতে করতে اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ [তার স্বামী সত্যবাদী হলে ....] পর্যন্ত পৌঁছলেন [সূরা নূর ১৮ পারা] ২৪ : ৬, ৭, ৮ ও ৯ আয়াত]। [আয়াত নাজিলের সংবাদ শুনে] হিলাল [দৌড়ে] আসল এবং [স্ত্রীসহ] লি'আনের জন্য প্রস্তুত হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয়কে সম্বোধন করে বললেন– দেখ! আল্লাহ নিশ্চিত জানেন যে, তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী, তোমাদের মধ্যে কেউ কি তওবা করতে প্রস্তুত? [উভয়ে অনড় রইল, প্রথমে হিলাল (রা.) লি'আন করলেন] অতঃপর তার স্ত্রী

عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَفُوْهَا وَقَالُوْا اِنَّهَا مُوْجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لَا اَفْضَحُ قَوْمِىْ سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَبْصِرُوْهَا فَاِنْ جَاءَتْ بِهٖ اَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْاَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهٖ كَذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْلَا مَا مَضٰى مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ لَكَانَ لِىْ وَلَهَا شَاْنٌ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

উঠে দাঁড়াল [ও যথা নিয়মে] লি'আনের সাক্ষ্য দিল। পঞ্চমবারে যখন সে উদ্যত হলো তখন উপস্থিত লোকজন তাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করে বলল– সাবধান! এবারের শপথে শাস্তি ও আল্লাহর ক্রোধ অবধারিত [অতএব বিরত হও]। এতে স্ত্রীলোকটি থেমে গেল ও পিছে হটে গেল। আমাদের ধারণা হতে লাগল যে, স্ত্রীলোকটি স্বীয় দাবি হতে ফিরে যাচ্ছে। [অর্থাৎ স্বামী কর্তৃক ব্যভিচারের অভিযোগ মেনে নেবে]। পরক্ষণেই আগে বেড়ে বলল, চিরকালের জন্য আমি আমার বংশের অপমান করব না, একথা বলে সে পঞ্চমবারের শপথও শেষ করল। [ঘটনা শেষে উপস্থিত লোকজনকে উদ্দেশ্য করে] রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা স্ত্রীলোকটির প্রতি দৃষ্টি রাখবে যদি সে কালো ভ্রূযুক্ত এবং মাংসল নিতম্ববিশিষ্ট এবং মোটা নলাযুক্ত সন্তান প্রসব করে, তবে সন্তানটি শরীক ইবনে সাহমার [যার প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ আনা হয়েছে]। স্ত্রীলোকটি এ বর্ণনার অনুরূপ সন্তানটি প্রসব করল। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি আল্লাহর বিধান না থাকত [যে লি'আন করার পরে শাস্তি প্রদান করা যাবে না], তবে আমি ঐ স্ত্রীলোকটিকে অন্যের জন্য শিক্ষাপ্রদ শাস্তি প্রদান করতাম। –[বুখারী]

٣١٦٥ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ (رض) لَوْ وَجَدْتُّ مَعَ اَهْلِىْ رَجُلًا لَمْ اَمَسَّهُ حَتّٰى اٰتِىَ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ قَالَ كَلَّا وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ اِنْ كُنْتُ لَاُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذٰلِكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْمَعُوْا اِلٰى مَا يَقُوْلُ سَيِّدُكُمْ اِنَّهُ لَغَيُوْرٌ وَاَنَا اَغْيَرُ مِنْهُ وَاللّٰهُ اَغْيَرُ مِنِّىْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩১৬৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিশিষ্ট সাহাবী [খাযরাজ গোত্রের নেতা] হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, যদি কোনো অপর পুরুষকে আমার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখি, তবে চারজন সাক্ষী সংগ্রহ না করা পর্যন্ত তাকে কিছু বলব না? তিনি বললেন– হ্যাঁ, কিছু বলবে না। হযরত সা'দ বললেন, না! না! যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, সেই সত্তা-আল্লাহর শপথ! আমি তো চারজন সাক্ষী সংগ্রহের পূর্বেই তাকে তালোয়ার দ্বারা শেষ করে ফেলব। [নিজের আত্মমর্যাদার তীব্র অনুভূতিতে এরূপ বললেন, নির্দেশ অমান্য করার স্পর্ধায় নয়।] এটা শ্রবণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, শুন! শুন! তোমাদের নেতা কি বলে? সে অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশীল, আমি তার অপেক্ষা অধিক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এবং আল্লাহ তা'আলা আমা অপেক্ষাও অধিক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হযরত সা'দের উক্তি كَلَّا -এর ব্যাখ্যা : হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা.)-এর উক্তি : 'এটা কখনো সম্ভব নয়'; রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশের বিরুদ্ধে ধৃষ্টতা নয়; বরং নিজের আত্মমর্যাদার তীব্র অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অথবা সা'দের এ উক্তি ছিল আরো সহজ বিধানের জন্য। এজন্য হুজুর ﷺ তার এ ওজরের প্রশংসাই করেছেন। আর আল্লাহর আত্মমর্যাদা অর্থ– বান্দাকে পাপকার্য ও অশ্লীলতা হতে বিরত থাকার কঠোর নির্দেশ প্রদান মাত্র।

উল্লেখ্য যে, হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা.) ছিলেন আনসারী খাযরাজ গোত্রীয় সরদার।

وَعَنْ ٣١٦٦ الْمُغِيْرَةِ (رضـ) قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللّٰهِ لَاَنَا اَغْيَرُ مِنْهُ وَاللّٰهُ اَغْيَرُ مِنِّيْ وَمِنْ اَجْلِ غَيْرَةِ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللّٰهِ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ بَعَثَ الْمُنْذِرِيْنَ وَمُبَشِّرِيْنَ وَلَا اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللّٰهِ وَمِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ وَعَدَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩১৬৬. **অনুবাদ :** হযরত মুগীরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, খাযরাজ নেতা সা'দ ইবনে উবাদাহ প্রসঙ্গত বললেন, যদি আমি কোনো পুরুষকে আমার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখতে পাই, তবে তাকে শাণিত তরবারি দ্বারা হত্যা করে ফেলব। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট সংবাদ পৌছলে তিনি বলেন, তোমরা কি সা'দের আত্মমর্যাদাবোধে বিস্ময় প্রকাশ করছ? আল্লাহর কসম! আমি তো তার অপেক্ষা বেশি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন এবং আল্লাহ তা'আলা আমা অপেক্ষাও অধিক আত্মমর্যাদাশীল। তাঁর আত্মসম্ভ্রমের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল প্রকার অশ্লীল কার্য হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন এবং মানুষের ওজর-আপত্তি দূর করা অপেক্ষা অন্য কিছু তাঁর নিকট অধিক প্রিয় না হওয়া বিধায় তিনি মানুষের মাঝে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং আল্লাহ সর্বাপেক্ষা নিজের প্রশংসা-স্তুতি শুনতে ভালোবাসেন বলে [প্রশংসাকারীর জন্য] জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣١٦٧ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَغَارُ وَاِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللّٰهِ اَنْ لَا يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩১৬৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন; মু'মিনও আত্মমর্যাদা প্রিয়। আল্লাহর আত্মমর্যাদা এই যে, যা তিনি হারাম করেছেন, মু'মিন যেন তা হতে বিরত থাকে। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهُ ٣١٦٨ اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ امْرَأَتِيْ وَلَدَتْ غُلَامًا اَسْوَدَ وَاِنِّيْ اَنْكَرْتُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا اَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيْهَا مِنْ اَوْرَقَ قَالَ اِنَّ فِيْهَا لَوُرْقًا قَالَ فَاَنّٰى تُرٰى ذٰلِكَ جَاءَهَا قَالَ عِرْقٌ نَزَعَهَا قَالَ فَلَعَلَّ هٰذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الْاِنْتِفَاءِ مِنْهُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩১৬৮. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, জনৈক বেদুইন এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জানাল যে, আমার স্ত্রী এক কালো পুত্রসন্তান প্রসব করেছে, আমি তাকে অবাঞ্ছিত [অর্থাৎ আমার সন্তান নয়] মনে করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি উট আছে? সে বলল, জী হ্যাঁ। তিনি বলেন, উটগুলো কি বর্ণের? সে বলল, লাল বর্ণের। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এর মধ্যে কি ছাই বর্ণেরও উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ ছাই বর্ণেরও উট আছে। তিনি বললেন, আচ্ছা বলতো ঐ বর্ণ কিভাবে আসল? [লাল বর্ণের উটের মধ্যে ছাই বর্ণের উট কিভাবে জন্ম নিল?] সে বলল, বংশের রক্তধারায় এসেছে। তিনি বললেন, তোমার সন্তানও তো বংশের রক্তধারায় কালো বর্ণ লাভ করতে পারে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাকে এ কারণে সন্তানের অস্বীকৃতির অনুমতি প্রদান করলেন না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, নিশ্চিত কারণ ব্যতীত শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সন্তানের পিতৃত্বের অস্বীকৃতি বৈধ নয়। বর্ণ বা রংয়ের পার্থক্যের কারণে স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের সন্দেহ পোষণ করা অপরাধ। উয়াইমির বা হিলালের স্ত্রী সম্পর্কে বর্ণের ও গঠন প্রকৃতির সাদৃশ্যের উল্লেখ প্রমাণ হিসেবে নয়; বরং উল্লিখিত ঘটনা দুটিতে স্বামীর অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে বিশেষ কোনো কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ধারণা জন্মায় এবং এ ধারণার সমর্থন লাভের জন্য তিনি সাদৃশ্যের উল্লেখ করেন। আগে ধারণা জন্মানোর ফলে তাদের উপর কোনো বিধান জারি করেননি, কোনো শাস্তিও প্রদান করেননি, কোনো দাবি প্রমাণিত করেননি। আলোচ্য হাদীসে বেদুঈন তো সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সন্তানের জারজ হওয়ার দাবি করতে চাচ্ছিলেন। অতএব উভয় হাদীসের প্রতিপাদ্য বিষয় এক নয়।

وَعَنْ ٣١٦٩ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلٰى اَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ مِنِّىْ فَاقْبِضْهُ اِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ اَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ اِنَّهُ ابْنُ اَخِىْ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَخِىْ فَتَسَاوَقَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَخِىْ كَانَ عَهِدَ اِلَىَّ فِيْهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَخِىْ وَابْنُ وَلِيْدَةِ اَبِىْ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ اِحْتَجِبِىْ مِنْهُ لِمَا رَاٰى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَاٰهَا حَتّٰى لَقِىَ اللّٰهَ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ هُوَ اَخُوْكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ مِنْ اَجَلِ اَنَّهُ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِ اَبِيْهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩১৬৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশ নেতা ওতবা ইবনে আবী ওয়াক্কাস [কাফির অবস্থায় মক্কা বিজয়ের পূর্বে মারা যায়, উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দান্দান মুবারক শহীদ করেছিল] সে তার ভাই বিখ্যাত সাহাবী হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর নিকট মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত করে যায় যে, কুরাইশ সরদার যামআর বাঁদির গর্ভজাত সন্তান আমার ঔরসের, তুমি তাকে [স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্ররূপে] গ্রহণ করবে [এবং প্রতিপালন করবে]। মক্কা বিজয়ের সময়ে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস [মৃত কাফির ভ্রাতা ওতবার অসিয়ত অনুযায়ী] উক্ত ছেলেটিকে এই বলে গ্রহণ করেন যে, এ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, এদিকে যামআর আবদ নামক পুত্র [এতে বাধা দিয়ে দাবি করল যে,] এ তো আমার ভাই। অতঃপর উভয়ে [ফয়সালার উদ্দেশ্যে] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমীপে উপস্থিত হলো; হযরত সা'দ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ভাই একে গ্রহণ করার জন্য আমাকে অসিয়ত করে গেছে। এর প্রতিবাদে আবদ বলল, আমার ভাই, আমার পিতার বাঁদির গর্ভজাত সন্তান, আমার পিতার শয্যাসঙ্গিনীর ক্রোড়ে জন্মেছে। এটা শ্রবণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সন্তান হবে তার, অংকশায়িনী ছিল যার। আর ব্যভিচারীর দাবি অসার। হে আবদ! এ সন্তানটি তোমার প্রাপ্য। অতঃপর তিনি স্বীয় সহধর্মিণী সওদাহ বিনতে যামআ (রা.)-কে সম্বোধন করে বললেন, হে সওদাহ! তুমি ঐ পুত্রসন্তান হতে পর্দার বিধান পালন করবে, সে তোমার ভাই নয়। কারণ তিনি পুত্রটির মাঝে [যামআর পরিবর্তে ব্যভিচারী] ওতবার সাদৃশ্য দেখতে পান। এর ফলে এ ছেলেটি মৃত্যু পর্যন্ত সওদার সামনে আসেনি। অপর এক বর্ণনায় আছে– হে আবদ ইবনে যামআ! ঐ ছেলেটি তোমার ভ্রাতা, কারণ সে তার পিতার শয্যাসঙ্গিনীর ক্রোড়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছে।–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

পিতৃত্ব প্রমাণে জাহিলিয়া যুগের রীতি : অন্ধকার যুগে কুরাইশ ও অন্যান্য আরব গোত্রের লোকেরা নিজেদের দাসীগণের দ্বারা ব্যভিচার করিয়ে অর্থ উপার্জন করত। এ ধরনের দাসীগণ গর্ভধারণ করলে সন্তানের পিতৃত্ব নির্ধারণে গোল বাঁধত। কখনও মালিকের, কখনও ব্যভিচারীর পিতৃত্ব স্বীকৃত হতো। আবার কখনও গণকের দ্বারা শারীরিক সাদৃশ্যের মাধ্যমে পিতৃত্ব নির্ণীত

হতো। কুরাইশ সরদার যামআর এরূপ এক দাসীর সাথে ওতবা ইবনে আবী ওয়াক্কাস ব্যভিচার করলে গর্ভের সঞ্চার হয়। ওতবা মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় ভ্রাতা সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর নিকট মদিনায় এ সংবাদ পাঠায়– যাকে অসিয়ত বলা হয়, যামআর বাঁদির গর্ভজাত সন্তান আমার। তুমি তাকে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্ররূপে গ্রহণ করে লালনপালন কর। মক্কা বিজয়ের সময় এ সুযোগ লাভ করে হযরত সা'দ (রা.) মৃত ভ্রাতার অসিয়ত অনুযায়ী উক্ত সন্তানকে গ্রহণ করতে উদ্যত হন; কিন্তু যামআর পুত্র আবদ তার পিতার বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণের ফলে হযরত সা'দ (রা.)-এর এ গ্রহণে বাধাদান করত তাকে নিজের ভাই বলে দাবি করে। উভয়ে বিরোধ নিরসনের উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট বিচারপ্রার্থী হন। তিনি জাহেলিয়াত যুগের নিয়ম- 'ব্যভিচারের ফলে ভূমিষ্ঠ সন্তানের পিতৃত্ব ব্যভিচারীর' বাতিল করে এক সাধারণ নীতি ঘোষণা করেন– اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ [সন্তান মিলিবে তার শয্যাসঙ্গিনী ছিল যার, ব্যভিচারীর দাবি অসার]। فِرَاشٌ [ফিরাশ] অর্থ– শয্যা, ভাবার্থে শয্যাসঙ্গিনী, অংকশায়িনী।

اَقْسَامُ الْفِرَاشِ – **ফিরাশ বা শয্যাসঙ্গিনীর প্রকারভেদ :** ইসলামি আইনের দৃষ্টিতে ফিরাশ বা শয্যাসঙ্গিনী তিন প্রকার। যথা– ১. বিবাহিতা স্ত্রী, ২. اُمُّ الْوَلَدِ মালিকের ঔরসে পূর্বভূমিষ্ঠ সন্তানের জননী-দাসী, ৩. اَمَةٌ বা দাসী, যার গর্ভে মালিকের ঔরসে কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। বিবাহিতা স্ত্রীর অংকশায়িনী হবার অধিকার আইনে স্বীকৃত এবং বিবাহের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য সন্তান লাভ বিধায় তার গর্ভজাত সন্তানের পিতৃত্ব নিশ্চিতভাবে তার স্বামীর। তার দাবি বা স্বীকৃতির উপর তা নির্ভর করে না। অবশ্য সে যদি অস্বীকার করে, তবে লি'আন করা ব্যতীত তার এ অস্বীকৃতি গ্রহণযোগ্য নয়। اُمُّ الْوَلَدِ বা পূর্বভূমিষ্ঠ ও স্বীকৃত সন্তানের জননী দাসীর ফিরাশ বা অংকশায়িনী হবার অধিকার স্ত্রীর তুলনায় দুর্বল, [ক্রীতদাসী গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য সন্তান লাভ নয়; খেদমত গ্রহণ বা ব্যবসা করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য হতে পারে]। সন্তানের জননীর মর্যাদা লাভ করায় শয্যাসঙ্গিনী হবার অধিকার তার যথেষ্ট সবল হয়েছে। সেহেতু তার গর্ভজাত ২য়, ৩য় সন্তানের পিতৃত্বের জন্য মালিকের স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই। অবশ্য মালিক যদি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তবে তা লি'আন ছাড়াই গ্রহণযোগ্য হবে।

তৃতীয় শ্রেণির ফিরাশ বা শয্যাসঙ্গিনী হলো সাধারণ ক্রীতদাসী, যে মালিকের সন্তানের জননী হবার মর্যাদা লাভ করেনি, তার শয্যাসঙ্গিনী হবার অধিকার সর্বাপেক্ষা দুর্বল [কারণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে] বিধায় তার গর্ভজাত সন্তানের পিতৃত্বের স্বীকৃতির জন্য মালিকের দাবির প্রয়োজন; মালিক অস্বীকার করলে উক্ত পিতৃত্ব স্বীকৃত হবে না।

শাফেয়ীদের ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লিখিত ঘটনায় যামআর বাঁদি তার ফিরাশ বা অংকশায়িনী, ইসলামি আইনের দৃষ্টিতে এটা স্বীকৃত হেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ মালিক-পুত্র আবদের দাবির পক্ষে রায় প্রদান করে উল্লিখিত ইসলামি বিধান জারি করলেন এবং ব্যভিচারী ওতবার ভ্রাতা হযরত সা'দ (রা.)-এর দাবি অগ্রাহ্য করে অন্ধকার যুগের কুপ্রথার অবসান ঘটালেন।

এ সিদ্ধান্ত শুধু আইনের দৃষ্টিতে প্রদান করা হয়েছে, বাস্তবে কারও জানা নেই বা জানার উপায়ও নেই; কিন্তু বাহ্যদৃষ্টিতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাদৃশ্যে সন্তানটি ব্যভিচারী ওতবার বলে প্রতিভাত হচ্ছিল, যাতে সন্তানটি মালিক যামআর হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ ছিল। কিন্তু ইসলামি আইনের দৃষ্টিতে যেহেতু যামআর স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান-পুত্র-কন্যা এর ভ্রাতা হওয়ার নিশ্চয়তা ছিল, তজ্জন্য যামআর কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত সওদাহ (রা.)-কে উক্ত সন্তানটিকে স্বীয় ভ্রাতা মনে করে তার সম্মুখে যেতেন। কিন্তু উক্ত দাবি উত্থাপিত হওয়ার পরে রাসূলে কারীম ﷺ তাকে তার সম্মুখে যাওয়া হতে নিষেধ করেন। এটা সন্দেহমুক্ত তাকওয়ার বিধান– ফতোয়া বা সাধারণ আইনের বিধান নয়।

হানাফীদের ব্যাখ্যা : অবশ্য আলোচ্য ঘটনার উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যা সম্পর্কে হানাফী আলিমগণ এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, যামআর বাঁদির ফিরাশ বা অংকশায়িনী হবার অধিকার তৃতীয় পর্যায়ের, যা অত্যন্ত দুর্বল। এরূপ ফিরাশের গর্ভজাত সন্তানের পিতৃত্বের স্বীকৃতির জন্য মালিকের দাবির অপরিহার্যতা সর্বজন স্বীকৃত। আলোচ্য ঘটনায় বাঁদির মালিক যামআর দাবি বা স্বীকৃতির উল্লেখ কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। যামআর পুত্র আবদের দাবিতে যামআর সন্তান বলে স্বীকৃত হতে পারে না। অতএব, আলোচ্য ক্ষেত্রে সন্তানটি যামআর কিনা তার ফয়সালা না দিয়ে আবদের দাবি অনুযায়ী তাকে উক্ত সন্তানের কর্তৃত্ব প্রদান করেন, অথবা তার দাবি অনুযায়ী [মানুষের দাবি তার উপর আইনত প্রযোজ্য] তার ভাই বলে স্বীকৃতি দিলেন, [যামআর সন্তানরূপে নয়, যেহেতু তার স্বীকৃতি নেই]; কিন্তু যামআর কন্যা সওদা (রা.) দাবি করেনি বিধায় তাঁর ভ্রাতা বলে গণ্য হলো না। আবদের ভ্রাতৃত্বের স্বীকৃতি, যামআর সন্তানের স্বীকৃতি প্রদানকে অপরিহার্য করে না। এ ফয়সালা সমস্তটুকুই আইনের দৃষ্টিতে প্রদত্ত হয়েছে। এতদসঙ্গে অনুরূপ ঘটনার সাধারণ নীতি اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ [শয্যাসঙ্গিনীর গর্ভজাত সন্তান তার শয্যাসঙ্গিনীর মর্যাদা লাভ হয়েছে যার] বর্ণনা করে অন্ধকার যুগের নিয়ম 'ব্যভিচারীর অধিকার' বাতিল বলে ঘোষণা প্রদান করলেন।

وَعَنْهَا ٣١٧٠ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُوْرٌ فَقَالَ اَىْ عَائِشَةُ اَلَمْ تَرَى اَنَّ مُجَزِّزَ الْمُدْلِجِىَّ دَخَلَ فَلَمَّا رَاٰى اُسَامَةَ وَ زَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيْفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوْسَهُمَا وَبَدَتْ اَقْدَامُهُمَا فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩১৭০. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত প্রফুল্ল চিত্তে আমার গৃহে প্রবেশ করত বললেন, জান আয়েশা! মুজাযযায মুদলিজী কি বলেছে? সে মসজিদে প্রবেশ করে দেখে যে, উসামা ও যায়েদ একটি চাদরে মাথাসহ শরীর আবৃত করে শুয়ে আছে, উভয়ের পা বাইরে রয়েছে, এটা দেখে সে বলে কিনা এ পদরাজি একে অপরের অংশ। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

যায়েদ ও উসামার পরিচিতি : হযরত বিবি খাদীজা (রা.) স্বীয় গোলাম যায়েদ ইবনে হারিছা (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতের জন্য হেবা বা দান করেন এবং হুজুর ﷺ তাকে দাসত্ব হতে আজাদ করে দেন। আজাদ হয়েও যায়েদ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে যান। অতঃপর হুজুর ﷺ তাকে নিজের পালকপুত্র রূপে গ্রহণ করেন এবং পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। লোকে তাকে যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ বলত। এক সময় হুজুর ﷺ নিজের ধাত্রী উম্মে আয়মানকে তার সাথে বিবাহ দেন। তার গর্ভে উসামা জন্মগ্রহণ করে। লোকে তাকে "হিববু রাসূলিল্লাহ" বা রাসূলুল্লাহর প্রিয় মাহবুব বলে ডাকত। পরে তিনি এ উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। বিভিন্ন যুদ্ধে তাঁরা পিতা পুত্র সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খুশির কারণ : হযরত যায়েদ (রা.) ছিলেন গোরা ও সুন্দর, আর পুত্র উসামা (রা.) ছিলেন মাতা উম্মে আয়মনের ন্যায় কালো বর্ণের। এজন্য কাফির ও মুনাফিকগণ উসামার পিতৃত্বে সন্দেহ করত এবং অপবাদ দিত। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্তরে ব্যথা পেতেন। জাহিলিয়া যুগে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাদৃশ্য দ্বারা গণক কর্তৃক কে কার সন্তান তা নির্ধারণের ব্যাপক প্রচলন ছিল। মুদলিজ বংশের লোকদের সমগ্র আরব ভূখণ্ডে এ বিষয়ে খ্যাতি ছিল। সকলেই এ ব্যাপারে তাদের মন্তব্যকে মেনে নিত। এমনই এক মুদলিজী যায়েদ ও উসামার শুধু পদযুগল দেখে মন্তব্য করে যে, এ চরণরাজি পরস্পরের সাথে রক্তের সম্পর্কে জড়িত। এতে যায়েদ সম্পর্কে উসামার পিতৃত্বে কাফির-মুনাফিকদের যে সন্দেহ-অপবাদ ছিল তা খণ্ডন হয়ে যাওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে হযরত আয়েশার কাছে উক্ত কথাটি ব্যক্ত করলেন।

রেখা রাশি গণনা বিদ্যা সম্পর্কে মতামত : শরীরের গঠন আকৃতি বা রেখা দেখা অর্থাৎ নৃতত্ত্বিক পন্থায় বংশ পরিচয় দানের জ্ঞান বা বিদ্যাকে আরবি পরিভাষায় 'ইলমে কিয়াফা' বলে। আর এ বিষয়ে পারদর্শী জ্ঞানবান ব্যক্তিকে বলা হয় قَيَّافٌ [কাইয়াফ]। উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে কেউ কেউ বলেছেন, ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রমুখের মতে 'ইলমে কিয়াফা' বা রাশি বিদ্যার দ্বারা পিতৃত্ব নির্ণয় করা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এটা শরিয়তে অনুমোদিত নয়। সুতরাং এটা আইনগত দলিল নয়। তবে মুদলিজীর কথায় হুজুর ﷺ -এর খুশি প্রকাশ করার কারণ হলো, কাফির মুনাফিকদের নিকট এরা শুধু অনুমোদিতই ছিল না, বরং তারা একে চূড়ান্ত ফয়সালাকারীরূপে গণ্য করত। আর মুদলিজ বংশের লোকদের এ ব্যাপারে দক্ষতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন স্বীকৃত ছিল। অতএব, তার কথায় সমাজের লোকদের অনেক দিনের ভ্রান্ত ধারণার অবসান হলো। কাজেই একে দলিল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। আর হুযূর ﷺ ও একে দলিল হিসাবে গ্রহণ করেননি।

وَعَنْ ٣١٧١ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَاَبِىْ بَكْرَةَ (رض) قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ ادَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩১৭১. **অনুবাদ :** হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ও আবূ বাকরা (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জেনেশুনে নিজের পিতাকে ছেড়ে অন্যকে পিতা বলে দাবি করে, জান্নাত তার জন্য হারাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣١٧٢ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ اَبِيْهِ فَقَدْ كَفَرَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَقَدْ ذُكِرَ حَدِيْثُ عَائِشَةَ مَا مِنْ اَحَدٍ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ فِىْ بَابِ صَلٰوةِ الْخُسُوْفِ -

৩১৭২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা নিজের পিতাকে অস্বীকার করো না। যে স্বীয় পিতাকে অস্বীকার করল, সে কুফরি করল। –[বুখারী ও মুসলিম]

এখানে উল্লিখিত হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে– যার প্রথমে আছে, আল্লাহ অপেক্ষা কেউ বেশি আত্মমর্যাদা সম্পন্ন নয়– সালাতুল খুসূফ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣١٧٣ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَمَّا نَزَلَتْ اٰيَةُ الْمُلَاعَنَةِ اَيُّمَا اِمْرَأَةٍ اَدْخَلَتْ عَلٰى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَيْءٍ وَلَنْ يُّدْخِلَهَا اللّٰهُ جَنَّتَهٗ وَاَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهٗ وَهُوَ يَنْظُرُ اِلَيْهِ اِحْتَجَبَ اللّٰهُ مِنْهُ وَفَضَحَهٗ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ فِى الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৩১৭৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, লি'আন সম্পর্কিত আয়াত নাজিল হলে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, যে নারী কাউকে ব্যভিচারে সন্তান লাভ করে তাকে স্বামীর বা মালিকের বলে অন্য বংশের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়, যে বংশের রক্তধারায় সে নয়, দীনের কোনো কিছুই তার নিকট নেই এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেবেন না এবং যে পুরুষ নিজের সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করে অথচ সন্তান তার মুখপানে চেয়ে আছে [স্নেহমায়া উদ্রেকসূচক বাক্য]–আল্লাহ তাকে [দয়া মায়ার] পর্দার অন্তরালে রাখবেন এবং [কিয়ামত দিবসে] অগ্র-পশ্চাতের সমগ্র মানবমণ্ডলীর সম্মুখে লাঞ্ছিত করবেন। –[আবূ দাউদ, নাসায়ী ও দারিমী]

وَعَنْ ٣١٧٤ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ لِىْ اِمْرَأَةً لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ طَلِّقْهَا قَالَ اِنِّىْ اُحِبُّهَا قَالَ فَاَمْسِكْهَا اِذًا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ النَّسَائِيُّ رَفَعَهُ اَحَدُ الرُّوَاةِ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَحَدُهُمْ لَمْ يَرْفَعْهُ قَالَ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ)

৩১৭৪. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে অভিযোগ করল– আমার স্ত্রী স্পর্শকারীর হস্ত ফিরিয়ে দেয় না। তিনি বললেন, তবে তাকে তালাক দাও। সে বলল, আমি যে তাকে ভালোবাসি। তিনি বললেন, তাহলে তাকে বিরত রাখ। –[আবূ দাউদ, নাসায়ী]

নাসায়ীর মন্তব্য– কোনো রাবী ইবনে আব্বাস (রা.) পর্যন্ত এর সনদ বর্ণনা করেছেন, কোনো রাবী করেননি। তিনি আরো বলেন, এ হাদীস অবিচ্ছিন্নসূত্রে প্রমাণিত নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ -এর ব্যাখ্যা : ব্যাখ্যাকারগণ "স্পর্শকারীর হস্ত ফিরিয়ে দেয় না" বাক্যের দুই অর্থ করেছেন– ১. অর্থাৎ অধিকতর গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হলো– ব্যভিচারীর হস্ত ফিরিয়ে দেয় না অর্থাৎ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিরত রাখার অর্থ ব্যভিচার হতে বিরত রাখা অথবা তালাক প্রদান বিরত রাখা। ২. দ্বিতীয় অর্থ আমার ধনসম্পত্তি স্পর্শকারীর হস্ত অর্থাৎ আমার টাকাপয়সা উড়িয়ে দেয়। এ অর্থে বিরত রাখার অর্থ অপব্যয় হতে অথবা তালাক প্রদান হতে বিরত রাখা।

وَعَنْ ٣١٧٥ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضٰى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اُسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيْهِ الَّذِيْ يُدْعٰى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضٰى أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيْرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيْبُهُ وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوْهُ الَّذِيْ يُدْعٰى لَهُ أَنْكَرَهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِيْ يُدْعٰى لَهُ هُوَ الَّذِي ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩১৭৫. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, পিতার মৃত্যুর পরে [দাসীর গর্ভজাত] যে সন্তানকে উক্ত পিতার পিতৃত্বের স্বীকৃতি তার ওয়ারিশগণের দাবি অনুসারে প্রদান করা হয়েছে [যেমন– ৩১৬৯ নং হাদীসে উল্লিখিত ঘটনায় যামআর দাসীর গর্ভজাত সন্তানকে তার পুত্র আবদের দাবি অনুসারে যামআর সন্তান বলা হয়েছে] উক্ত সন্তানের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফয়সালা প্রদান করেন যে, উক্ত ব্যক্তি যদি তার দাসীকে সহবাস করার সময় তার মালিক থাকে তবে তার গর্ভজাত সন্তান ঐ মালিকের সন্তান হবে। অবশ্য ইতঃপূর্বে বণ্টিত সম্পত্তি হতে এ সন্তান মিরাস পাবে না, তবে বণ্টিত হওয়ার পূর্বে যা সে পেয়েছে তার মিরাস এ সন্তান পাবে। ঐ পিতা যাকে সন্তানের পিতা বলে দাবি করা হচ্ছে সে যদি স্বীয় দাসীর গর্ভজাত অথবা ব্যভিচারিণী স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করে, তবে তার সন্তান বলে স্বীকৃতি পাবে না। আর যদি সন্তান এমন দাসীর ঘরে জন্ম নেয় সে তার মালিক ছিল না। অথবা, এমন স্বাধীনা নারীর সন্তান যার সাথে সে জেনা করেছে; তবে সে সন্তান ঐ ব্যক্তির সাথে সংযোজিত হবে না যদিও সে তাকে নিজ সন্তান বলে দাবি করে। কেননা, এটা হলো জেনার সন্তান, স্বাধীনার ঘরে হোক বা দাসীর ঘরে হোক।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : اِلْحَاقٌ অর্থ– মিলিয়ে দেওয়া, এখানে কোনো বংশের সাথে অন্য কোনো সন্তানকে সংযোজন করা। জাহিলিয়া যুগে আরবের মানুষ কোনো স্বাধীনা নারী অথবা কোনো দাসীর সঙ্গে ব্যভিচার করে যদি মৃতুর পূর্বে বলে যেত– অমুকের অমুক সন্তান আমার সন্তান, তখন তার ওয়ারিশগণ উক্ত সন্তানটি নিজেদের আত্মীয় বলে মেনে নিত এবং তাকে মিরাসের অংশ দিত। [যেমন– যামআর দাসীর গর্ভজাত সন্তানকে তার পুত্র আবদের দাবি অনুসারে যামআ'র সন্তান বলা হয়েছে] পরবর্তীতে ইসলাম এ কুপ্রথাকে রহিত করে দেয় এবং মূলনীতি নির্ধারণ করে দেয় যে, কোনো নারীর সন্তানকে স্বীয় সন্তান বলে দাবি করার জন্য ঐ নারী তার বৈধ স্ত্রী বা বৈধ দাসী হতে হবে। অর্থাৎ ব্যভিচারের সন্তানের দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। আর মিরাস সম্পর্কে বলা হলো, বৈধ দাসীর সন্তান হলেও জাহিলিয়া যুগে তার ইলহাকের পূর্বে যা বণ্টিত হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে সে তার হিস্যা পাবে না।

وَعَنْ ٣١٧٦ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ (رض) أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللّٰهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللّٰهُ فَأَمَّا الَّتِيْ يُحِبُّهَا اللّٰهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيْبَةِ وَأَمَّا الَّتِيْ يُبْغِضُهَا اللّٰهُ فَالْغَيْرَةُ فِيْ غَيْرِ رِيْبَةٍ وَإِنَّ مِنَ الْخُيَلَاءِ مَا يُبْغِضُ اللّٰهُ وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللّٰهُ فَأَمَّا الْخُيَلَاءُ

৩১৭৬. অনুবাদ : হযরত জাবির ইবনে আতীক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আত্মমর্যাদাবোধ কোনো কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় হয়, আবার কখনও অপ্রিয় হয়। যে আত্মমর্যাদাবোধ আল্লাহ পছন্দ করেন তা হলো সন্দেহজনক কার্য করা হতে [আত্মমর্যাদাবোধে] বিরত থাকা। পক্ষান্তরে সন্দেহমুক্ত ভালো কার্য হতে [আত্মমর্যাদাবোধে] বিরত থাকা আল্লাহর নিকট অপ্রিয়। অনুরূপভাবে বাহাদুরি দেখানো কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহ পছন্দ করেন এবং কোনো ক্ষেত্রে অপছন্দ করেন।

الَّتِى يُحِبُّ اللّٰهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَاخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ وَاَمَّا الَّتِىْ يُبْغِضُ اللّٰهُ فَاخْتِيَالُهُ فِى الْفَخْرِ وَفِىْ رِوَايَةٍ فِى الْبَغْىِ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

আর যে বীরত্ব আল্লাহ পছন্দ করেন তা হলো, যুদ্ধক্ষেত্রে ও দান-খয়রাতে বীরত্ব প্রকাশ আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়। আর যে বীরত্ব আল্লাহ অপছন্দ করেন তা হলো অহংকারের উদ্দেশ্যে বীরত্ব প্রকাশ আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ঘৃণ্য। অন্য বর্ণনায় অহংকারের পরিবর্তে অত্যাচার শব্দ এসেছে।
–[আহমদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'দান-খয়রাতে বীরত্ব প্রকাশ করা'-এর অর্থ হলো– যা দান করে তাকে অল্প ও সামান্য মনে করে আরো অধিক দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করা।

আত্মমর্যাবোধ এবং বাহাদুরি বা বীরত্ব প্রদর্শন মানুষর দুটি স্বভাব। আল্লাহর নিকট এটা কখনও হয় নন্দিত, আবার কখনও হয় নিন্দিত। আল-গায়রাত বা আত্মমর্যাদাবোধ বলতে স্বর্গীয় সত্তার উপলব্ধি ও আপন ব্যক্তিত্ববোধকে বুঝায়। সংশয়, সন্দেহ এবং অপরাধমূলক কার্যকলাপ হতে যে ব্যক্তিকে তার আত্মমর্যাদাবোধ বিরত রাখে, এহেন গুণটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট অতীব পছন্দনীয়। আর যা অযথা অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করে অথচ তা ভালো কাজ, এমন ভালো কাজ হতে যে আত্মমর্যাদাবোধ মানুষকে বিরত রাখে, তা আল্লাহর নিকট সত্যিই অপছন্দনীয়।

হাদীসে দ্বিতীয় আলোচনা করা হয়েছে বাহাদুরি বা বীরত্ব প্রদর্শন সম্পর্কে। এটা কখনও আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় হয়, আবার কখনও পছন্দনীয় হয়। যে বীরত্ব প্রদর্শন যুদ্ধের ময়দানে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের বিরুদ্ধে হয়, উদ্দেশ্য হয় শত্রুদের মূলোৎপাটন করা এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করা, এরূপ বীরত্ব আল্লাহর নিকট অতীব প্রশংসনীয় ও পছন্দনীয়। এহেন অহংকার ও গর্ববোধ আল্লাহর নবীও প্রকাশ করেছেন। যেমন তিনি অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ঘোষণা করেছিলেন– اَنَا النَّبِىُّ لَا كَذِبْ * اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ অর্থাৎ আমি কোনো অসত্য নবী নই, আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣١٧٧ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فُلَانًا اِبْنِىْ عَاهَرْتُ بِاُمِّهٖ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَادِعْوَةَ فِى الْاِسْلَامِ ذَهَبَ اَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩১৭৭. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে উঠে দাঁড়িয়ে বলল– ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক আমার সন্তান। জাহেলিয়াত কালে [ইসলাম-পূর্ব যুগে] আমি তার মাতার সাথে ব্যভিচার করেছিলাম। এতদশ্রবণে তিনি বললেন, জাহেলিয়াতের প্রথা খতম হয়ে গেছে, ইসলামের বিধানে কোনো পিতৃত্বের দাবি নেই, ইসলামি বিধান হলো– اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ [সন্তান হবে তার অংকশায়িনী ছিল যার, ব্যভিচারীর দাবি অসার] –[আবূ দাউদ]

٣١٧٨ - وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُوْدِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوْكِ وَالْمَمْلُوْكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৩১৭৮. অনুবাদ : উক্ত হযরত আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, চার শ্রেণির নারীর তার স্বামীর সাথে লি'আন গ্রহণযোগ্য নয়– ১. মুসলিম পুরুষের খ্রিস্টান স্ত্রী, ২. মুসলিম পুরুষের ইহুদি স্ত্রী, ৩. দাস স্বামীর স্বাধীনা স্ত্রী এবং ৪. স্বাধীন পুরুষের দাসী স্ত্রী। –[ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٣١٧٩ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ رَجُلاً حِيْنَ اَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ اَنْ يَّتَلاَعَنَا اَنْ يَّضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلٰى فِيْهِ وَقَالَ اِنَّهَا مُوْجِبَةٌ ـ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

৩১৭৯. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ স্বামী-স্ত্রীকে লি'আন করার আদেশ দানকালে এক ব্যক্তিকে হুকুম করলেন- পুরুষটির লি'আন চলাকালীন পঞ্চমবার যখন বলতে উদ্যত হবে তখন তার মুখের উপর হাত চেপে ধর। কারণ, পঞ্চামবারের উক্তি 'আমি যদি মিথ্যাবাদী হই, তবে আল্লাহর লা'নত অভিসম্পাত আমার উপর হোক' নিজের উপর অপরিহার্য করে নেয়। -[নাসায়ী]

وَعَنْ ٣١٨٠ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلاً قَالَتْ فَغِرْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ فَرَاٰى مَا اَصْنَعُ فَقَالَ مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ اَغِرْتِ فَقُلْتُ وَمَا لِىْ لَا يُغَارُ مِثْلِىْ عَلٰى مِثْلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَعِىْ شَيْطَانٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَمَعَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ وَلٰكِنْ اَعَانَنِىَ اللّٰهُ عَلَيْهِ حَتّٰى اَسْلَمَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩১৮০. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, একদা রাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার গৃহ হতে নীরবে বের হয়ে যান। তিনি বলেন, এতে আমার মনে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হয় [ফলে আমার চেহারার পরিবর্তন ঘটে, কার্যে অস্থিরতা প্রকাশ পায়]। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি ফিরে এসে আমার পরিবর্তিত অবস্থা দেখতে পেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মনে ক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠছে? আমি বললাম, আপনার ন্যায় ব্যক্তির [সাহচর্য হতে বঞ্চিত হয়ে] আমার ন্যায় [সতীনে ঘেরা] নারী কি করে ঈর্ষানল হতে বাঁচতে পারে? এতদশ্রবণে তিনি বললেন, তোমাকে তোমার শয়তানে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আমি [বিস্ময়ের সুরে] জিজ্ঞেস করলাম- আমাকে শয়তান প্রভাবান্বিত করতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নিকটও শয়তান আসতে পারে? তিনি বললেন- হ্যাঁ, তবে তার উপর আল্লাহ আমাকে সাহায্য করায় আমি [তার কুমন্ত্রণা হতে] নিরাপত্তা লাভ করেছি। [বাক্যের ২য় অর্থ সে আমার অনুগত হয়ে গেছে।] -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : চির অভিশপ্ত শয়তান প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে আদম সন্তানকে সর্বদা প্ররোচিত ও কুমন্ত্রণা দানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সে কাউকে এটা হতে রেহাই দেয়নি। এমনকি উম্মুল মু'মিননীন হযরত আয়েশা (রা.)-কেও একবার সে কুমন্ত্রণা দিয়ে এক সংশয় ও সন্দেহের মধ্যে নিপতিত করেছিল। অত্র হাদীসের ভাষ্য মতে, কোনো এক রাতে রাসূল ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-এর গৃহে রাত যাপন করেছিলেন। অপর এক বর্ণনা মতে, এটা ছিল শাবান মাসের চৌদ্দ তারিখ 'লাইলাতুল বারাত'। রাসূল ﷺ মধ্য রজনীতে অত্যন্ত সন্তর্পণে আয়েশার বিছানা ত্যাগ করে মদিনার প্রসিদ্ধ 'বাকী' (بَقِيْع) কবরস্থান জেয়ারত করার জন্য গিয়েছিলেন; কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.) ভেবেছিলেন, সম্ভবত নবী অন্য কোনো বিবির গৃহে গমন করেছেন। এতে তাঁর মনে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং এর বহিঃপ্রকাশ তাঁর মুখমণ্ডল ও কার্যে প্রকাশ পায়। রাসূল ﷺ প্রত্যাবর্তন করে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, নবুয়তের মহিমায় ভাস্বরিত আপনার মতো মহান মর্যাদাশীল ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শ হতে বঞ্চিত থাকা আমার জন্য সত্যিই হৃদয়বিদারক ও মর্মান্তিক ব্যাপার। তাই আপনার বিরহের কারণে আমার এ অবস্থা। অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) ভেবেছিলেন যে, রাসূল ﷺ তাঁর বিছানা ত্যাগ করে অন্য বিবির গৃহে গমন করেছেন। এ শুনে রাসূল ﷺ বললেন, শয়তান তোমাকে এ প্ররোচনা দিয়েছে। অথচ এমন তো হতে পারে না যে, আমি তোমার প্রতি অন্যায় করব। আর এ সন্দেহ করারও কোনো অবকাশ নেই।

بَابُ الْعِدَّةِ
পরিচ্ছেদ : ইদ্দত

عِدَّةٌ শব্দটি যাবে نَصَرَ -এর মাসদার, শাব্দিক অর্থ হলো– গণনা করা বা হিসাব করা। শরিয়তের পরিভাষায়, কোনো নারীর বিবাহবিচ্ছেদের পর দ্বিতীয় বিবাহের জন্য এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, একে عِدَّةٌ বলে। এই সময় গণনা বিভিন্ন নারীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়, যা নিম্নরূপ–

১. যে নারীর ঋতু-স্রাব চালু আছে তার ইদ্দত হলো তিন কুরূ। আল্লাহর কালামে বর্ণিত রয়েছে যে, اَلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ তিন কুরূ অপেক্ষা করবে। –[সূরা বাক্বারা : ২২৮] তবে قُرُوْءٌ কুরূ শব্দের অর্থের মধ্যে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। শাফেয়ী ও মালেকীদের মতে এর অর্থ– 'তিন তোহর' বা তিন পবিত্রাবস্থা অতিবাহিত হওয়া। আর হানাফীদের মতে এর অর্থ তিন হায়েজ বা ঋতু। ইতঃপূর্বে বর্ণিত এক হাদীসের বর্ণনায় قُرُوْءٌ কুরূ শব্দের অর্থ যে হায়েয বা ঋতুস্রাব, এরই সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন বলা হয়েছে– عِدَّةُ الْاَمَةِ حَيْضَتَانِ অর্থাৎ বাঁদি-দাসীর ইদ্দত হলো দুই হায়েয বা ঋতু। অতএব, স্বাধীনা নারীর ইদ্দতও হবে তিন হায়েয।

২. বার্ধক্যের কারণে যার ঋতু বন্ধ হয়ে গেছে, অথবা বাল্যের কারণে ঋতু এখনও আসেনি, তাদের ইদ্দত তিন মাস। যেমন আল্লাহর বাণী– وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰئِىْ لَمْ يَحِضْنَ অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ঋতু হতে নিরাশ হয়ে গেছে বা যাদের এখনও ঋতু আসেনি, তাদের ইদ্দত হলো তিন মাস। –[সূরা তালাক্ব : ৪]

৩. যারা তালাকের সময় গর্ভবতী, তাদের ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত। চাই উক্ত সময় বেশি হোক বা কম হোক। وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ অর্থাৎ আর গর্ভধারিণীদের ইদ্দত [সময়] হলো সন্তান প্রসব করা। –[সূরা তালাক্ব : ২২৮]

৪. বিবাহের পরে সহবাসের পূর্বে যাকে তালাক দেওয়া হয়েছে তার কোনো ইদ্দত নেই। যেমন আল্লাহর বাণী– ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا অর্থাৎ অতঃপর যখন তোমরা স্পর্শের পূর্বে তাদেরকে তালাক দেবে, তখন তাদের উপর কোনো ইদ্দত নেই, যা তোমরা গণনা করবে। –[সূরা আহযাব : ৪৯]

৫. যাদের স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে তাদের ইদ্দত চারমাস দশদিন। যেমন–
وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا .
অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা মরে যায় এবং স্ত্রী রেখে যায় তারা [স্ত্রীগণ] অপেক্ষা করবে– চারমাস দশদিন। [সূরা বাক্বারা : ২৩৪] তবে ঐ সময় স্ত্রী গর্ভবতী হলে তাদের ইদ্দত হবে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। মূলত এ ৫মটি হলো শোক পালন। শরিয়তের পরিভাষায় একে حِدَادٌ 'হোদাদ' বলা হয়। স্বামী মারা যাওয়ার পর এ শোক পালনের প্রচলন প্রত্যেক জাতিতেই রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣١٨١ - عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّ اَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَارْسَلَ

৩১৮১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সালামা বিখ্যাত ফকীহ তাবিয়ী কুরাইশ বংশীয় রমণী ফাতিমা বিনতে কায়েস হতে বর্ণনা করেন যে, তার স্বামী আবূ আমর ইবনে হাফস তাকে তিন তালাক প্রদান করে, ঐ সময়ে সে মদিনায় উপস্থিত ছিল না [অপর বর্ণনায় তালাক দিয়ে পরে হযরত আলী (রা.)-এর সাথে

إِلَيْهَا وَكِيلَهُ الشَّعِيرَ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِيْ بَيْتِ أُمِّ شَرِيْكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِيْ اعْتَدِّيْ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمٰى تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِيْنِيْ قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ ابْنَ أَبِيْ سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِيْ فَقَالَ أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوْكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِيْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكِحِيْ أُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْهَا فَأَمَّا أَبُوْ جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلٰثًا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنِيْ حَامِلًا)

ইয়ামন চলে যায় এবং রওয়ানা হওয়ার পরে তালাকের সংবাদ প্রকাশ পায়] স্বামীর প্রতিনিধি [আইয়াস ইবনে আবী রাবিয়া এবং হারিছ ইবনে হিশাম] আমার নিকট সামান্য কিছু যব পাঠিয়ে দেয়, যা আমি অতি তুচ্ছ মনে করে [বিরক্ত হই]। প্রতিনিধি বলল, আল্লাহর কসম! আমাদের নিকট তোমার আর কিছু পাওনা নেই। [কারণ, তুমি তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা অথবা অর্থ হবে যব ছাড়া আর কিছুই তোমার স্বামী রেখে যায়নি।] এতে ফাতিমা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে এসে নালিশ জানালে তিনি বললেন, তোমার কোনো খোরপোশ খরচ মিলবে না। [বাক্যের ভিন্ন অর্থ হতে পারে যা পরে বর্ণনা করা হবে।] তিনি তাকে উম্মে শরীকের গৃহে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দেন; কিন্তু একটু পরেই বললেন; ঐ নারীর গৃহে তো লোকজনের গমনাগমন বেশি হয়। [কারণ সে অত্যন্ত দানশীলা ও অতিথিবৎসলা।] বরং তুমি ইবনে উম্মে মাকতূমের গৃহে ইদ্দত পালন কর, সে অন্ধ ব্যক্তি, তুমি পোশাক ছাড়লে তোমাকে দেখতে পাবে না। [অর্থাৎ তুমি সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা, উঠা-বসা করতে পারবে।] অতঃপর যখন তোমার ইদ্দতকাল শেষ হবে, তখন আমাকে সংবাদ জানাবে। ফাতিমা বলেন, আমার ইদ্দতকাল শেষ হলে আমি তাঁকে অবহিত করলাম যে, মুয়াবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান ও আবূ জাহম উভয়ে আমার নিকট বিবাহের পয়গাম [ইদ্দত অন্তে] পাঠিয়েছে। তদুত্তরে তিনি বললেন, আবূ জাহম তো তার কাঁধ হতে লাঠি নামিয়ে রাখে না, [অর্থাৎ সে স্ত্রীকে বেশি মারে অথবা বেশি সফর করে।] আর মুয়াবিয়া তো ফকির মানুষ, তার কোনো ধনসম্পত্তি নেই। [অত্র ঘটনার সময় হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর এরূপ অভাব ছিল; পরবর্তীতে আর্থিক সচ্ছলতার অধিকারী হয়েছিলেন।] তুমি উসামা ইবনে যায়েদকে বিবাহ কর। [সে দীনদারি, স্বভাব-চরিত্র ও আচার-ব্যবহারে অতি উত্তম ব্যক্তি।] ফাতিমা বলেন, [উসামা কালো কুৎসিত ক্রীতদাস পুত্র হওয়ার কারণে] আমি তাকে পছন্দ করলাম না। তিনি পুনরায় উসামাকে বিবাহ করতে বললে আমি তাকেই বিবাহ করলাম। এ বিবাহের ফলে আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন এবং আমি অন্য রমণীর ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হলাম। অপর বর্ণনায় আছে, আবূ জাহম তো স্ত্রীকে খুব বেশি মারে। –[মুসলিম। অপর বর্ণনায় طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ শব্দের পরিবর্তে طَلَّقَهَا ثَلٰثًا শব্দ রয়েছে এবং আরো আছে যে, অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে জানালে তিনি বললেন, তোমার কোনো খরচ মিলবে না, অবশ্য তুমি গর্ভবতী হলে খরচ মিলত।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ" দ্বারা উদ্দেশ্য : تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ 'তুমি তোমার পোশাক খুলতে পারবে' -এর দ্বারা কয়েকটি অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে–

১. ইদ্দত পালনের সময় মহিলাদের চিত্তাকর্ষক বস্ত্রাদি পরিধান না করাই উচিত।

২. অথবা, এ শব্দ দ্বারা পরোক্ষভাবে বুঝানো হয়েছে যে, ইদ্দতপালনকারিণী মহিলার উক্ত সময়ে বাইরে গমনাগমন বৈধ নয়।
৩. অথবা, এটা দ্বারা পরোক্ষভাবে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, ইদ্দতপালনের এ সময় ইদ্দতপালনকারিণী মহিলার পর্দায় থাকা খুব একটা প্রয়োজন নয়।

قَوْلُهُ "فَلَايَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ"-এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ জাহম সম্পর্কে ফাতিমা বিনতে কায়েসের নিকট বলেন, "সে তো [আবূ জাহম] তার কাঁধ হতে লাঠি নামিয়ে রাখে না।" এ বাক্য দ্বারা দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে–

প্রথমত এটা দ্বারা রূপকভাবে তার বেশি বেশি ভ্রমণের কথা বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয়ত এটা দ্বারা এ অর্থও হতে পারে যে, সে নিজ স্ত্রীদেরকে নির্মমভাবে অধিক প্রহার করে থাকে। এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই যথার্থ। ইমাম নববীর অন্য এক বর্ণনা এর সমর্থন করে। রেওয়ায়েতটি হলো– إِنَّهُ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ অত্র হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কাউকে উত্তম উপদেশ ও পরামর্শ দিতে গিয়ে অন্যের বাস্তব অপরাধ ও দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা দূষণীয় নয় এবং এটা গিবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

وَعَنْ ٣١٨٢ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِىْ مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيْفَ عَلٰى نَاحِيَتِهَا فَلِذٰلِكَ رَخَّصَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ تَعْنِىْ فِى النُّقْلَةِ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ اِلَّا تَتَّقِى اللّٰهَ تَعْنِىْ فِىْ قَوْلِهَا لَا سُكْنٰى وَلَا نَفَقَةَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৩১৮২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) উপরে বর্ণিত ফাতিমার ঘটনায় মন্তব্য করেন যে, ফাতিমা একাকিনী এক নির্জন গৃহে অবস্থান করায় তার সম্পর্কে আশঙ্কার ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে [ইদ্দতকাল কাটানোর জন্য] গৃহ-ত্যাগের অনুমতি দান করেন। অপর বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, ফাতিমার কি হয়েছে? সে কি আল্লাহকে ভয় করে না যে, সে বলে বেড়াচ্ছে যে, [ইদ্দাতকালে] ভরণপোষণ ও অবস্থানের বিধান তার জন্য করা হয়নি? [বুখারী]

وَعَنْ ٣١٨٣ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (رحـ) قَالَ اِنَّمَا نُقِلَتْ فَاطِمَةُ لِطُوْلِ لِسَانِهَا عَلٰى اَحْمَائِهَا . (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৩১৮৩. অনুবাদ : বিখ্যাত তাবেয়ী সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব [ফাতিমা (রা.)-এর ঘটনা] সম্পর্কে বলেন যে, স্বামীর আপনজনের সাথে মুখরা হয়ে ঝগড়া করার কারণে তাকে গৃহ ত্যাগের অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। –[শরহুস সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

স্ত্রীর ইদ্দতকালে আবাসস্থল ও ভরণপোষণ প্রসঙ্গে ইমামদের মতামত : তালাকপ্রাপ্তা নারী স্বামীর পক্ষ হতে খোরপোশ পাবে কিনা? এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, সে আবাসস্থল ও খোরপোশ উভয়টি পাবে।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন, তালাকপ্রাপ্তা নারী ইদ্দত পালনকালে স্বামীর নিকট হতে আবাসস্থল ও খোরপোশ কিছুই পাবে না।

ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (র.) বলেন, সে থাকার আবাসস্থল পাবে, কিন্তু খোরপোশ পাবে না।–[মিরকাত]

এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা : তালাকে রেজয়ীপ্রাপ্তা নারী ইদ্দত পালনকালে খোরপোশ ও আবাসস্থল উভয়টি পাবে। এতেই সকল ইমামের ঐকমত্য। তবে তিন তালাক বায়েনপ্রাপ্তা নারীর ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে চরম মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

ক. ইমাম আহমদ (র.) বলেন, এ উভয়টির কিছুই সে পাবে না, যা আমরা পূর্বেই বলেছি।

খ. ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র.) বলেন, খোরপোশ পাবে না, তাবে তাকে বাসস্থান দিতে হবে।

গ. ইমাম আবূ হানীফা ও সুফিয়ান ছাওরী (র.) প্রমুখগণ বলেন, তাকে খোরাকি ও বাসস্থান উভয়টি দিতে হবে এটাই হযরত ওমর ও ইবনে মাসউদ (রা.)-এর অভিমত।

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) প্রমুখগণ নিজেদের দাবির সমর্থনে উপরে বর্ণিত ফাতিমা বিনতে কায়েসের হাদীস ও ঘটনাটি উপস্থাপন করেছেন। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (র.) বাসস্থান প্রদানে কুরআনের আয়াতকে পেশ করেছেন।

ইমামা আবূ হানীফা (র.) সহ কতিপয় ইমাম বলেন, বিবাহিতা স্ত্রীর খোরপোশ ও বাসস্থান প্রদান করা স্বামীর উপর অপরিহার্য। এতে সকলেরই ঐকমত্য রয়েছে। এটা কুরআন, হাদীস ও এজমা দ্বারা প্রমাণিত। ফলে এতে দ্বিমত নেই। স্বামীর ইজ্জত-সম্মান অক্ষুণ্ন রাখার এবং তার মনতুষ্টির জন্য স্ত্রীকে আয়-উপার্জনের উদ্দেশ্যে বাইরে ছুটাছুটি করা হতে নিবৃত্ত করত গৃহাভ্যন্তরে রাখার অধিকার স্বামী লাভ করেছে। বস্তুত তার ভরণপোষণ ও বাসস্থান প্রদানের শর্তে তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। অনুরূপভাবে ইদ্দতকালেও একদিকে যেমন– স্বামীর ইজ্জত-সম্মানের প্রশ্ন আছে, অপর দিকে অন্য স্বামী গ্রহণ করা হতেও সে আটকা পড়ে আছে। ফলে সে আয়-উপার্জনের কোনো পথ পাবে না। কাজেই যে কোনো প্রকারের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর খোরাকি ও বাসস্থান স্বামীর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তারা বলেন, কুরআন মাজীদের যে সমস্ত আয়াতে ইদ্দতকালে বাসস্থান প্রদানের নির্দেশ রয়েছে তাতে তালাকপ্রাপ্তার কোনো শ্রেণিবিভাগ করা হয়নি; বরং উক্ত আয়াতে বাসস্থানের সাথে হযরত ইবনে মাসউদের কিরআতে খোরাকি প্রদানের কথাও উল্লেখ রয়েছে। যাকে আয়াতের সংক্ষিপ্তের বিস্তারিত বর্ণনা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। এছাড়া গৃহাভ্যন্তরে অবস্থানের নির্দেশের অর্থ–খোরাকি প্রদানের নির্দেশও বহন করে, অন্যথা সে গৃহাভ্যন্তরে খাবে কোথা হতে? এর বিপরীত আয়াতে গর্ভবতীকে প্রসব পর্যন্ত খোরাকি প্রদানের নির্দেশের مَفْهُوْمْ مُخَالِفْ বা বিপরীত অর্থ 'গর্ভবতী না হলে তার জন্য খোরাকি নেই', দ্বারা দললি পেশ করা ঠিক হবে না। কারণ এটা সমার্থক বোধক দলিলের সমকক্ষতা করতে পারে না।

প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব : ফাতিমা বিনতে কায়সের হাদীস বিভিন্ন কারণে দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়–

ক. উক্ত হাদীস সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর সুস্পষ্ট মন্তব্য, জনৈকা নারীর কথায় আমরা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহর সুন্নত পরিত্যাগ করতে পারি না। আমরা জানি না সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রকৃত কথাটি স্মরণ রাখতে পেরেছে, না ভুলে গেছে, না ভুল বুঝেছে। উক্ত হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদসহ প্রায় সকল হাদীসগ্রন্থে সহীহ সনদের সাথে বর্ণিত হয়েছে। এখানে 'আল্লাহর কিতাব' দ্বারা যে সমস্ত আয়াতে খোরাকি ও বাসস্থান প্রদানের নির্দেশ অথবা হযরত ইবনে মাসউদের ব্যাখ্যামূলক কিরআতকে বুঝানো হয়েছে। মোটকথা, এ ব্যাপারে হযরত ওমর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ হতে যা শুনেছেন, তা গ্রহণযোগ্য হবে। হযরত ওমরের অপর এক বর্ণনায় আছে– 'একজন নারীর কথায় আমরা দীনের মধ্যে পরিবর্তন করতে পারি না।'

খ. একজন সাহাবীর কোনো উক্তি এমনিতেই গ্রহণযোগ্য। সে ক্ষেত্রে হযরত ওমরের দৃঢ়তার সাথে বহু সংখ্যক সাহাবীদের সম্মুখে– سُنَّةُ نَبِيِّنَا 'আমাদের নবীর সুন্নত' শপথের সাথে বলা, এতে কারো প্রতিবাদ না হওয়া নিঃসন্দেহে এটাই প্রমাণ করছে যে, এটা حَدِيْثْ مَرْفُوْعْ হাদীসে মারফূ' হুকমীর অন্তর্ভুক্ত।

গ. ফাতিমা বিনতে কায়সের হাদীসের উপর হযরত আয়েশা (রা.)-এর কঠোর মন্তব্য বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদসহ সকল হাদীসের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। তাঁর মন্তব্য হলো– 'সে [ফাতিমা] তো মানুষদেরকে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করছে'। কেননা, তাকে স্বামীর ঘর ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল–সামাজিক কোনো অঘটন এড়ানোর জন্য মাত্র, সুতরাং এ বিধান অন্য কোনো নারীর বেলায় প্রযোজ্য হবে না।

ঘ. হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যাবের বর্ণনা হতে দেখা যায়– ফাতিমার সাথে স্বামীর আত্মীয়দের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হওয়ার কারণে তাকে সেই ঘর ত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর 'তোমার জন্য খোরাকি নেই।' এ বাক্যের অর্থ হলো, তোমার স্বামী এখন এখানে উপস্থিত নেই। অতএব, সে যে সামান্য যব রেখে গেছে– এখন তুমি এর অধিক কিছুই পাবে না। কেননা, তার অনুপস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না। শরিয়তের পরিভাষায় একে قَضَا عَلَى الْغَيْبِ বলা হয়, তা বৈধ নয়। এ ছাড়া স্বামীর আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে স্ত্রীর খোরাকি প্রদানের বিধান। মোটকথা, ফাতিমার হাদীস ও ঘটনা অন্য কোনো নারীর বেলায় প্রযোজ্য নয়।

অবশ্য ফাতিমার হাদীসের আলোকে এটাই বুঝা যায় যে, স্বামীর গৃহে থেকে ইদ্দত পালনে অসুবিধা হলে অন্যত্রে চলে যেতে পারে। তিন তালাক বায়েন দেওয়া হলে বর্তমান যুগে অন্যত্র চলে যাওয়াই সমীচীন বলে আমরা মনে করি।

٣١٨٤ - وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ طُلِّقَتْ خَالَتِيْ ثَلَاثًا فَارَادَتْ اَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ اَنْ تَخْرُجَ فَاَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ بَلٰى فَجُدِّيْ نَخْلَكِ فَاِنَّهُ عَسٰى اَنْ تَصَدَّقِيْ اَوْ تَفْعَلِيْ مَعْرُوْفًا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩১৮৪. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমার খালাকে তিন তালাক দেওয়া হয়েছিল, এমতাবস্থায় তিনি স্বীয় বাগানের খেজুর কর্তনের ইচ্ছা করলে জনৈক ব্যক্তি তাকে বের হতে নিষেধ করে, এতে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এসে অবস্থা জানালে তিনি বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি বের হও, তোমার বাগানের খেজুর পাড়িয়ে আন। কারণ, তুমি তো তোমার খেজুর সদকা করবে বা লোককে আহার করিয়ে পুণ্য অর্জন করবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তালাকপ্রাপ্তা মহিলার গৃহ হতে বহির্গমন সম্পর্কে ইমামদের মতামত : রেজয়ী অথবা বায়েন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ইদ্দত পালনকালীন সময় গৃহাভ্যন্তর হতে বের হতে পারবে কিনা সে সম্পর্কে সারসংক্ষিপ্ত কথা হলো, যদি সে উক্ত গৃহ হতে বের হওয়ার জন্য বাধ্য হয়, যেমন ঘর বিধ্বস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, অথবা সে যদি কারো হিংসার কোপানলে পতিত হয়, অথবা গৃহকর্তা তাকে সেখান থেকে বের করে দেয়, অথবা সে যদি ঘরের ভাড়া মেটাতে অক্ষম হয়– এ সমস্ত অবস্থায় সে মহিলা উক্ত ঘর হতে বের হতে পারবে; কিন্তু এ সকল কারণ না থাকলে বের হওয়া বৈধ নয়। এ সম্পর্কে ইমামদের পক্ষ হতে আরো কিছু ভিন্নধর্মী অভিমত পরিলক্ষিত হয়।

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَاَحْمَدَ وَثَوْرِيِّ (رحـ) وَغَيْرِهِمْ : ইমাম মালিক (র.), শাফিয়ী (র.), আহমদ (র.), ছাওরী (র.), লাইছ (র.) প্রমুখের মতে, বায়েন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের দিনের বেলা ঘর হতে বের হওয়া বৈধ– কোনো প্রয়োজন থাকুক আর না-ই থাকুক। তাঁরা অত্র হাদীসটি দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) : ইমাম আ'যমের অভিমত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, রেজয়ী ও বায়েন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের দিনে বা রাত্রে কোনো সময়ই ঘর হতে বের হওয়া বৈধ নয়। দলিল হলো আল্লাহর বাণী–

وَلَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ .

হ্যাঁ, যদি কোনো প্রয়োজন পড়ে অথবা যদি কোনো কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্য থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও কাসেম (র.)-এর মতে বায়েন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার দিনের বেলা গৃহের বাইরে বের হওয়া বৈধ।

ৣ১৮৫ وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ (رضـ) اَنَّ سُبَيْعَةَ الْاَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَاْذَنَتْهُ اَنْ تَنْكِحَ فَاَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩১৮৫. অনুবাদ : হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা.) বর্ণনা করেন, সুবাইয়াহ আসলামী তার স্বামীর [সা'দ ইবনে খাওয়াল] মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পরে সন্তান প্রসব করেন। [তার ইদ্দতকাল সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিল যে, গর্ভবতী হিসেবে ধরলে প্রসব করা আর ইদ্দত গ্রহণ করলে ৪ মাস ১০ দিন অপেক্ষা করতে হবে।] প্রশ্নের মীমাংসার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বিবাহের অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দেন। অতঃপর তিনি অন্যত্র বিবাহ করেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَقْوَالُ الْاَئِمَّةِ فِيْهِ এ বিষয়ে ইমামদের মতামত : রাসূলে কারীম ﷺ -এর তিরোধানের পর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এ ব্যাপারে দ্বিমত দেখা দেয়। বিশেষভাবে হযরত আলী (রা.)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বলতেন– اَبْعَدُ الْاَجَلَيْنِ অর্থাৎ দু ইদ্দতের মধ্যে যেটি দীর্ঘায়িত সেটিই এখানে গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ ৪ মাস ১০ দিনের কম সময়ে প্রসব করলে– মৃত্যুর ইদ্দত, আর ঐ মুদ্দতের পরে প্রসব করলে প্রসবের ইদ্দত পালন করতে হবে। কিন্তু হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) সহ কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম দৃঢ়তার সাথে তাদের মতামত প্রকাশ করেছেন যে, সূরা বাক্বারায় তালাক ও মৃত্যুর ইদ্দতের বিধান সংবলিত অবতীর্ণ নাজিল হওয়ার পরে সূরা তালাকে বর্ণিত গর্ভবতীর বিধান সংবলিত আয়াত وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ পরবর্তীতে নাজিল হয়েছে– অর্থাৎ 'আর গর্ভধারিণীদের ইদ্দাত হলো সন্তান প্রসব।' সুতরাং গর্ভবতীর জন্য সর্বাবস্থায় [অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা হোক বা স্বামীর মৃত্যু হোক] প্রসব করা মাত্রই ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। অতএব, সূরা তালাকের আয়াত নাসেখ এবং বাকারার আয়াত মানসূখ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তীতে সকল সাহাবী ও তৎপরবর্তীতে সকল ইমাম এর উপর ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

وَعَنْ ٣١٨٦ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ ابْنَتِيْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا أَفَنَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلٰثًا كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لَا ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِيْ بِالْبَعْرَةِ عَلٰى رَأْسِ الْحَوْلِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩১৮৬. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এক মহিলা এসে বলল যে, আমার কন্যার স্বামী মারা গেছে, [সে এখন ইদ্দতকাল কাটাচ্ছে]। তার চোখে অসুখ দেখা দিয়েছে, [চিকিৎসার্থে] আমি কী তার চোখে সুরমা লাগাতে পারব? তিনি উত্তর দিলেন– না, পারবে না। স্ত্রীলোকটি দু-বার বা তিনবার অনুমতি চাইল, প্রতিবারেই তিনি বললেন– না। অতঃপর বললেন– দেখ! মাত্র ৪ মাস ১০ দিন [এর বিধি-নিষেধ পালন করতে তোমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠছ] অথচ অন্ধকার যুগে তোমাদের এক একজন নারীকে ইদ্দতপালন এক বছর পূর্ণ হলে উটের গোবর ফেলতে হতো। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জাহেলিয়াত যুগের রেওয়াজ : বিধবাকালীন নারী জাতির প্রতি অমানুষিক জুলুম-অত্যাচার করা প্রায় সকল সমাজে প্রচলিত ছিল। যেমন– নিকট অতীতকালে ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজে সতীদাহ বা সহমরণ, বিধবার উপবাস ব্রত পালন ইত্যাদি ধরনের আরো বহু কুপ্রথা প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানেও আছে। আর জাহেলিয়াত যুগে আরবীয় নারীগণকে এক বৎসর যাবৎ ভিন্ন একটি জীর্ণ ঘরে রাখা হতো, সর্বনিকৃষ্ট ময়লাযুক্ত কাপড় পরিধান করানো হতো, কোনো প্রকারের সুগন্ধি জিনিস ব্যবহার করতে পারত না, অখাদ্য-কুখাদ্য খেতে দেওয়া হতো। পূর্ণ এক বৎসর পর তার নিকট উট, গাধা প্রভৃতির কোনো পশু আনা হতো। সে নিজের গুপ্তাঙ্গ উক্ত পশুর গায়ে লাগাত। অতঃপর তাকে উটের বিষ্টা [গোবর] দেওয়া হতো তখন সে তা চতুর্দিকে স্বহস্তে নিক্ষেপ করতো। তবেই তার শোক পালন [ইদ্দত] শেষ হতো। অতঃপর তাকে ঘরে তোলা হতো। এ জাতীয় আরো বহু কুপ্রথা তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অত্র হাদীসে এর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, সে তুলনায় ইসলামের নির্ধারিত পরিমাণ সময় কিছুই নয়। অপরদিকে এ ইদ্দত পালনকারিণী শুধুমাত্র সাজসজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারে না– [যা অন্যের আকর্ষণের কারণ হতে পারে] অন্যথা খাদ্য-পানীয় পোশাক-পরিচ্ছদে কোনো প্রকার বিধি-নিষেধ নেই। অথচ ইসলামের এ বিধান খুব সহজ ও স্বাভাবিক বিধান। হুজুর ﷺ উক্ত মহিলাটিকে এদিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এ সামান্য কয়দিন ধৈর্যধারণ করা কি অসম্ভব?

وَعَنْ ٣١٨٧ أُمِّ حَبِيْبَةَ وَزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلٰى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩১৮৭. অনুবাদ : হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) ও যয়নব বিনতে জাহশ (রা.) উভয় উম্মুল মু'মিনীন বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো মু'মিনা যে আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে তার পক্ষে কোনো মৃতের জন্য তিন দিনের বেশি শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়। অবশ্য নারী তার স্বামীর মৃত্যুতে ৪ মাস ১০ দিনের জন্য শোক প্রকাশ করবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣١٨٨ أُمِّ عَطِيَّةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلٰثٍ إِلَّا عَلٰى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا

৩১৮৮. অনুবাদ : হযরত উম্মে আতিয়্যা [নুসাইবা নাম] (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো মৃতের উপর নারী যেন তিনদিনের বেশি শোক প্রকাশ না করে, অবশ্য স্বামীর মৃত্যুতে ৪ মাস ১০ দিন করবে, লাল গোলাপি কাপড় পরিধান করবে না, অবশ্য লালপাড় বিশিষ্ট সাদা কাপড় পরতে পারে। সুরমা লাগাবে না, সুগন্ধি ব্যবহার করবে না, অবশ্য মাসিক স্রাব হতে পাক

تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا اِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيْبًا اِلَّا اِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ اَوْ اَظْفَارٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَ زَادَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَا تَخْتَضِبُ .

হওয়াকালীন [গোসলের সময়ে] কুসত ও আযফার জাতীয় কাঠের সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারে [অর্থাৎ গোসলের সময় শরীরের স্রাবের দুর্গন্ধ দূর করতে আজকালকার সাবানের ন্যায় ব্যবহৃত কুসত ও আযফার জাতীয় কাঠ হতে প্রস্তুত একপ্রকার সুগন্ধি ব্যবহারের অনুমতি ছিল। কাজেই সাবান মাখার অনুমতি থাকলেও আজকালকার উগ্র গন্ধের সেন্ট বা প্রসাধনী ব্যবহারের অনুমতি নেই।] -[বুখারী ও মুসলিম] আবূ দাউদের বর্ণনায় মেহেদি লাগানোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত উম্মে আতিয়্যা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, স্বামী মারা গেলে চারমাস দশদিন স্ত্রীর শোক প্রকাশ করা ওয়াজিব, যা অন্যকোনো নিকটাত্মীয়দের বেলায় প্রযোজ্য নয়। মূলত এ চারমাস দশদিন হলো বিধবা স্ত্রীর ইদ্দতপালনের মেয়াদ। স্বামীর জন্য বিধবার শোক প্রকাশের ব্যাপারে মৌলিকভাবে সকল ইমামই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে তার বিশ্লেষণে কিছুটা বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও জমহুরের মতে, যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়েছে অথবা হয়নি, চাই সে স্বল্প বয়সী বা বালেগা হোক অথবা বাকেরা হোক বা ছাইয়্যিবা অথবা সাধীনা বা দাসী মুসলমান হোক অথবা আহলে কিতাব– সকল নারীর জন্য শোক প্রকাশ করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) কূফাবাসী এবং কতক মালেকী মাযহাবের অনুসারীদের মতে কিতাবী বিধবা মহিলাদের শোক প্রকাশ করা অপরিহার্য নয়; বরং এটা শুধু মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা, হাদীসে ঘোষিত হয়েছে–

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَحِلُّ لِاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ .

ইমাম আবূ হানীফা (র.) আরো বলেন, অনুরূপভাবে নাবালিকা ও দাসীদের ক্ষেত্রেও তাদের মৃত স্বামীর জন্য শোক প্রকাশ করা অপরিহার্য নয়।

যে সকল বিধবা মহিলা মাস হিসেবে তাদের ইদ্দত পালন করবে, তাদের শোক প্রকাশের সময় হলো চারমাস দশদিন, যা হাদীসে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু যে বিধবা মহিলা গর্ভধারিণী, তার ইদ্দত হলো গর্ভ প্রসব পর্যন্ত এবং এটাই হলো তাদের শোক প্রকাশের সময়, গর্ভ প্রসবের সময় কমবেশি যাই হোক না কেন।

ইদ্দতের সময় নিষিদ্ধ কর্মসমূহ : অত্র হাদীসে বিধবা মহিলাদের ইদ্দতপালনকালীন সময় কিছু কিছু কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে– ১. এ সময় লাল-গোলাপি বর্ণের কাপড় পরিধান করা নিষেধ। এ নিষেধাজ্ঞা তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি তা সৌন্দর্য প্রকাশার্থে হয়; কিন্তু যদি সতর ঢাকার অন্যকোনো কাপড় না থাকে, এমতাবস্থায় তা পরিধান করতে পারবে। ২. এ সময় চোখে সুরমা ব্যবহার করতে পারবে না। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, বিশেষ প্রয়োজনের তাকিদে তা ব্যবহার করতে পারবে। এটাই অধিকাংশ আলিমের অভিমত; কিন্তু যাহেরীগণ বলেন, কোনো অবস্থাতেই ইদ্দতপালনের সময় তা ব্যবহার করতে পারবে না। ৩. এ সময় সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে না। অবশ্য মাসিক স্রাব হতে গোসল করে পাক হওয়ার সময় কুসত ও আযফার জাতীয় কাঠের সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে। উল্লেখ্য, বর্তমানকালের সাবানের ন্যায় কুসত ও আযফার জাতীয় কাঠ হতে প্রস্তুত একপ্রকার সুগন্ধি তৎকালে ব্যবহারের অনুমতি ছিল। ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে এ কাঠ পাওয়া যায়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣١٨٩ - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ (رضـ) اَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ اُخْتُ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ اَخْبَرَتْهَا اَنَّهَا جَاءَتْ اِلَى

৩১৮৯. অনুবাদ : হযরত যয়নব বিনতে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ সাঈদ খুদরীর ভগ্নি ফুরাইয়া বিনতে মালিক ইবনে সিনান আমাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজের পিতৃকুলের খুদরা বংশীয়

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَسْأَلُهُ اَنْ تَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِهَا فِىْ بَنِىْ خُدْرَةَ فَاِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِىْ طَلَبِ اَعْبُدٍ لَهُ اَبَقُوْا فَقَتَلُوْهُ قَالَتْ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِىْ فَاِنَّ زَوْجِىْ لَمْ يَتْرُكْنِىْ فِىْ مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةَ فَقَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ فَانْصَرَفْتُ حَتّٰى اِذَا كُنْتُ فِى الْحُجْرَةِ اَوْ فِى الْمَسْجِدِ دَعَانِىْ فَقَالَ اُمْكُثِىْ فِىْ بَيْتِكِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ)

লোকজনের নিকট প্রত্যাবর্তনের প্রার্থনা জানালেন। কারণ, তাঁর স্বামী পলাতক দাসগণের পেছনে ধাওয়া করলে তারা তাকে হত্যা করে ফেলেছে। ফুরাইয়া বলেন, আমি রাসূল ﷺ -এর নিকট আমার পিত্রালয়ে ফিরে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। কারণ, স্বামী কোনো গৃহ এবং কোনো খোরাকির ব্যবস্থা করে যায়নি। এতে তিনি হ্যাঁ বলে অনুমতি দিলেন, আমি ফিরে আসছিলাম, হুজরা বা মসজিদ এখনও অতিক্রম করিনি, এ সময়ে তিনি পুনরায় ডাক দিয়ে বললেন, তুমি যেই গৃহে অবস্থান করছ তথায় ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত অবস্থান কর, [পিত্রালয়ে যেয়ো না]। ফুরাইয়া বলেন, আমি উক্ত গৃহেই ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দতকাল কাটালাম। –[মালিক, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَاعْتَدَدْتُ فِيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا : যদি স্বাধীনা নারীর স্বামী মারা যায় তবে তার ইদ্দত হলো চারমাস দশদিন। আর যে দাসীর স্বামী মারা গেছে তার ইদ্দত স্বাধীনা নারীর ইদ্দতের অর্ধ পরিমাণ। এর প্রমাণ সূরা বাকারাতে উদ্ধৃত আল্লাহর বাণী– اَلَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا অর্থাৎ তোমাদের মধ্য হতে যারা মৃত্যুবরণ করবে আর তারা তাদের স্ত্রীগণ রেখে যাবে সেসব স্ত্রীগণ নিজেদেরকে চারমাস দশদিন পর্যন্ত বিবাহ হতে বিরত রাখবে। আর ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত কষ্ট করে হলেও স্বামীর বাড়িতে ইদ্দত পালন করা উচিত, যদি তথায় মানইজ্জতের ভয় না থাকে।

وَعَنْ ٣١٩٠ اُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّىَ اَبُوْ سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَىَّ صَبِرًا فَقَالَ مَا هٰذَا يَا اُمَّ سَلَمَةَ قُلْتُ اِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ لَيْسَ فِيْهِ طِيْبٌ فَقَالَ اِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيْهِ اِلَّا بِاللَّيْلِ وَتَنْزِعِيْهِ بِالنَّهَارِ وَلَا تَمْتَشِطِىْ بِالطِّيْبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ فَاِنَّهُ خِضَابٌ قُلْتُ بِاَىِّ شَىْءٍ اَمْتَشِطُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِيْنَ بِهِ رَأْسَكِ – (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

৩১৯০. **অনুবাদ :** হযরত উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমার স্বামী আবূ সালামার মৃত্যুর পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ [সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে] আমার নিকটে গমন করে দেখতে পেলেন যে, আমি মুখে সাবের মেখেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী [তুমি মেখেছ অথচ তুমি ইদ্দতপালন করছ?] আমি বললাম, এটা গন্ধহীন সাবের। তিনি বললেন, এটা মুখকে উজ্জ্বল করে; অতএব, তুমি রাত্রে মেখো, দিনে মেখো না এবং খোশবু বা মেহেদি মেখে কেশ-বিন্যাস করো না। কারণ, মেহেদি রং। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তবে কী মেখে চুল আঁচড়াব? তিনি বললেন, কুলের পাতা দিয়ে তোমার মাথায় ঢাকনী করে নাও। –[আবূ দাউদ, নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বিধবা মহিলাদের ইদ্দতপালনকালীন সময় অনেক জিনিস ব্যবহারে শরিয়তে বাধা-নিষেধ আছে। ইতঃপূর্বে হাদীসে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। অত্র হাদীসে 'সাবের' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। সাবের হলো একপ্রকার তিক্ত ঔষধবিশেষ। হযরত উম্মে সালামার প্রথম স্বামী মারা যাবার পর ইদ্দতপালনের সময় তিনি স্বীয় মুখমণ্ডলে ঔষধ হিসেবে তা ব্যবহার করেছিলেন। তা ছিল মুখ উজ্জ্বলকারী বস্তু, বিধায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, চেহারা উজ্জ্বলকারী স্নো, পাউডার, লিপিস্টিক, সেন্ট ইত্যাদি প্রসাধনী ব্যবহার করা নিষেধ। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকেই তা মেনে চলে না।

ইদ্দত পালনকালীন নিষিদ্ধ কার্যাদি : যে স্ত্রীলোক ইদ্দতকালীন সময়ে শোক পালন করবে, সে জাফরানি ও কুসুম রঙের পোশাক পরিধান করতে পারবে না। মেহেদি, সুগন্ধি, তৈল ও সুরমা লাগাবে না। তবে হ্যাঁ, এ সকল নিষিদ্ধ বস্তু ওজরবশত ব্যবহার করতে পারবে। কারণ, প্রসিদ্ধ কায়দা আছে– اَلضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ অর্থাৎ প্রয়োজনের তাকিদে নিষিদ্ধ বস্তুও মোবাহ হয়ে যায়। সুতরাং যদি নারীর চোখে কোনো অসুখ হয় এবং সুরমা লাগালে তা ভালো হবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সুরমা লাগানো জায়েজ। শরীরের স্কীন ডিজিজ বা ত্বক জনিত রোগ হলে রেশমি কাপড় ব্যবহার করা বৈধ। মাথায় অসুবিধা অনুভূত হলে তৈল লাগাতে পারবে এবং বড় চিরুনি দ্বারা মাথা আঁচড়াতে পারবে। অনুরূপভাবে তার নিকট যদি জাফরানি রং কিংবা কুসুম রং কিংবা কুসুম রং-এর বস্ত্র ব্যতীত যদি কোনো বস্ত্র না থাকে তবে সতর ঢাকার জন্য তা ব্যবহার করা জায়েজ আছে।

٣١٩١ - وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৩১৯১. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত উম্মে সালামা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে নারীর স্বামী মারা গেছে, সে [ইদ্দতকালে] গোলাপি রংয়ের অদ্রূপ গেরুয়া রংয়ের কাপড় পরিধান করবে না, গহনা পরবে না, মেহেদি লাগাবে না, সুরমা লাগাবে না। –[আবূ দাঊদ, নাসায়ী]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣١٩٢ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ الْاَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِيْنَ دَخَلَتْ اِمْرَاَتُهُ فِى الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ اِلٰى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رض) يَسْاَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَكَتَبَ اِلَيْهِ زَيْدٌ اَنَّهَا اِذَا دَخَلَتْ فِى الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا لَا يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ. (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৩১৯২. **অনুবাদ :** হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াসার তাবেয়ী বর্ণনা করেন যে, [কূফার অধিবাসী তাবেয়ী] আহওয়াস যখন শামে মারা যায়, তখন তার পূর্ব তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর [ইদ্দতপালনরতা অবস্থায়] তৃতীয় মাসিক স্রাব আরম্ভ হয়। এ ঘটনায় শরিয়তের বিধান জানার উদ্দেশ্যে হযরত মু'আবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান (রা.) [মদিনায় অবস্থানরত প্রসিদ্ধ সাহাবী] যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.)-এর নিকট এর সমাধান চেয়ে পত্র লেখেন। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) হযরত মু'আবিয়াকে পত্রযোগে জানালেন যে, [তালাকপ্রাপ্তা] স্ত্রীর যখন তৃতীয় মাসিক আরম্ভ হলো, তখনই সে স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং স্বামীও তার হতে সম্পর্কশূন্য হয়ে গেছে সেও স্বামীর ওয়ারিশ হবে না, স্বামীও তার ওয়ারিশ হবে না। –[মালিক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : শরিয়তের বিধান হলো, তিন তালাক বায়েন দেওয়ার পর স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তার সম্পত্তির অংশীদার হয় না; যদিও তার এক ঋতুও অতিবাহিত না হয়। আলোচ্য হাদীসে যে তৃতীয় ঋতুর কথা বলা হয়েছে– এ অবস্থায় সম্পত্তির অংশীদার হওয়ার তো কোনো প্রশ্নই উঠে না। আর সম্ভবত হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পত্রে এ কথাও উল্লেখ ছিল যে, তার স্ত্রী এখন ঐ স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত পালন করবে কিনা? সুতরাং এখানে শরিয়তের বিধান হলো তার মৃত্যুর ইদ্দত পালন করতে হবে। বস্তুত হাদীসটি এ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করার কারণ এটাই।

٣١٩٣ وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَيُّمَا اِمْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً اَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رُفِعَتْهَا حَيْضَتُهَا فَاِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ اَشْهُرٍ فَاِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذٰلِكَ وَاِلَّا اِعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ الْاَشْهُرِ ثَلٰثَةَ اَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ . (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৩১৯৩. অনুবাদ : হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, তালাকপ্রাপ্তা নারীর এক বা দুই মাসিক স্রাবের পরে যদি স্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তবে সে নয় মাস অপেক্ষা করবে। ইতোমধ্যে যদি গর্ভ প্রকাশ পায়, তবে তার ইদ্দত প্রসবান্তে, অন্যথায় নয় মাস পরে তিন মাসের ইদ্দত পালন করবে। অতঃপর সে ইদ্দত অতিক্রম করবে। –[মালিক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ঘটনাটি এরূপ– ঋতুমতী নারীর তালাকের ইদ্দত তিন মাসিককাল, এখন এক বা দুই মাসিকের পরে স্রাব বন্ধ হলে বন্ধের কারণ নিশ্চিত হবার জন্য নয় মাস পর্যন্ত প্রসবের অপেক্ষায় থেকে যখন দেখা গেল যে, গর্ভের কারণে মাসিক বন্ধ হয়নি; বরং বার্ধক্যের কারণে স্রাব বন্ধ হয়েছে তাহলে তিন মাসের ইদ্দত পালন করতে হবে।

قَوْلُهُ حَاضَتْ حَيْضَةً اَوْ حَيْضَتَيْنِ-এর ব্যাখ্যা : স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিল, তখন স্ত্রী ঋতুমতী ছিল। অতঃপর তালাকের পরে তার এক বা দুই হায়েয আসার পর স্ত্রীর হায়েয বন্ধ হয়ে গেল। এ অবস্থায় স্ত্রীর উপর ওয়াজিব হলো যে, মাস হিসেবে ইদ্দত পালন করবে, যাতে বদল ও মুবদাল মিনহুর মধ্যে সংমিশ্রণ না হয়। যেমন– হেদায়া গ্রন্থ এর কারণ বর্ণিত আছে– যার বাহ্যিক অর্থ এই যে, অতীতকালীন বোধগম্যের কোনো ধর্তব্য নেই এ জন্য দুই হায়েয, অর্থাৎ দুই মাসের সময়ে এক হায়েযের ধর্তব্য হবে না। যদি তার এক হায়েয আসার পর বঞ্চিতের বয়স এসে থাকে এবং এক হায়েয অর্থাৎ এরপর একমাস সময়ে দুই হায়েযের সাথে ধর্তব্য হবে না; বরং তার উপর পৃথক তিনটি মাস ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। যাতে বদল মুবদাল মিনহু সমাবেশ সৃষ্টি না করে। কেননা, তিনমাস মূলত তিন হায়েযেরই বদল বা পরিবর্তন।

بَابُ الْاِسْتِبْرَاءِ
পরিচ্ছেদ : জরায়ু মুক্ত প্রসঙ্গে

اَلْاِسْتِبْرَاءُ শব্দটি বাবে اِسْتِفْعَالٌ-এর মাসদার, শাব্দিক অর্থ হলো– পবিত্রতা বা মুক্তি তালাশ করা। শরিয়তের পরিভাষায়, দাসীর জরায়ু বা গর্ভাশয় সন্তান হতে মুক্ত বা পবিত্র কিনা তা জানবার চেষ্টা করা। দাসীর সাথে বিবাহ ব্যতীত মালিক হলেও সহবাস করা জায়েজ, চাই তা ক্রয় সূত্রে বা হেবা বা মালে গনিমত সূত্রে হাতে আসুক। কিন্তু হাতে আসা মাত্রই তার সাথে সহবাস করা জায়েজ নেই। তার গর্ভাশয়ে পূর্ব মালিক বা স্বামীর সন্তান আছে কিনা তা জানার জন্য অন্তত এক ঋতুর অপেক্ষা করা আবশ্যক। যদি সে ঋতুমতী হয়, ঋতুস্রাব দেখা দিলে তখন বুঝতে হবে তার গর্ভমুক্ত আছে। আর যদি অল্প বয়স্কা বা বৃদ্ধা হয় যদ্দরুন তার ঋতুস্রাব হয় না, তখন এক মাস অপেক্ষা করতে হবে। গর্ভবতী হলে প্রসব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। উল্লিখিত বিধান না মেনে সদ্য মালিকানাধীন দাসীর সাথে সহবাস করলে তখন শরিয়তের দৃষ্টিতে এক মারাত্মক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে যথা– যদি পূর্ব মালিকের বা স্বামীর সন্তান তার গর্ভে থাকে তাকে নিজের সন্তান বলা এবং ওয়ারিশ করা জায়েজ নেই। আবার নিজের সন্তান হলে তাকে অন্যের সন্তান মনে করে দাস বানানো এবং নিজের মিরাস হতে বঞ্চিত করা, এটাও জায়েজ নেই। তাই জরায়ু মুক্ত কিনা তা জানার বিধান মেনে চলা একান্তই অপরিহার্য। আলোচ্য পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣١٩٤ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالُوْا اَمَةٌ لِفُلَانٍ قَالَ اَيُلِمُّ بِهَا قَالُوْا نَعَمْ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ فِيْ قَبْرِهِ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ اَمْ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩১৯৪. অনুবাদ : হযরত আবুদ দারদা (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আসন্ন প্রসবা নারীর নিকট দিয়ে গমনকালে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে উপস্থিত লোকজন উত্তর করল, অমুকের বাঁদি, [যুদ্ধবন্দিনী হিসেবে সে লাভ করেছে। কোনো কারণে সন্দেহ দেখা দেওয়ায় তিনি প্রশ্ন করলেন] উক্ত ব্যক্তি কী এ অবস্থায় এর সাথে উপগত হয়ে থাকে? তারা বলল, [ঐ ব্যক্তির নিকট হতে জানার কারণে] হ্যাঁ। এতে তিনি [অত্যন্ত ক্রুদ্ধ স্বরে] বললেন, আমার মন চাচ্ছে যে। তাকে এমনভাবে অভিসম্পাত করি যে, এ অভিসম্পাত তার সাথে কবরে পর্যন্ত প্রবেশ করে, সে কি স্পর্ধায় এরূপ গর্ভাবস্থায় সহবাস করে, সন্তান প্রসব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারল না? [অথচ এ অবস্থায় সহবাসের ফলে দুই মারাত্মক অপরাধের একটি অবশ্যম্ভাবী। হয়তো তার সহবাসের ফলে সন্তান গর্ভে আসবে অথচ এ সন্তানকে সে পূর্বের গর্ভের মনে করে গোলাম বানাবে] কিন্তু কিরূপে সে তার [নিজ সন্তান] থেকে গোলামের মতো খেদমত গ্রহণ করবে? [স্বাধীন সন্তানকে গোলাম বানানো হারাম] [আর যদি উক্ত দাসী ছয়মাস পরে সন্তান প্রসব করে তবে সহবাসের কারণে সে নিজের সন্তান মনে করবে অথচ গর্ভ তো পূর্ব হতে সঞ্চারিত হয়েছিল, এমতাবস্থায় সন্তান তো অন্য ব্যক্তির] সে কিরূপে অপরের সন্তানকে নিজের ওয়ারিশ বানাবে? –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] : মাসআলা :** কোনো ব্যক্তি ক্রয়, হেবা অথবা মালে গনিমত হিসেবে দাসীর মালিক হলে তার সাথে সহবাস করতে পারবে, এতে বিবাহের প্রয়োজন হবে না; কিন্তু তার জরায়ু মুক্ত কিনা অর্থাৎ তার গর্ভে কোনো

সন্তান আছে কিনা, তা নিশ্চিতভাবে জানার পূর্ব পর্যন্ত সহবাস করা হতে বিরত থাকতে হবে। দাসীদের অবস্থার প্রেক্ষাপটে তা জানার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যদি ঋতুমতী হয়, তবে মাসিক স্রাব দেখা দিলে বুঝতে হবে যে, সে গর্ভবতী নয়। আর যদি অল্প বয়স্কা বা বার্ধক্যের কারণে ঋতুমতী না হয়, তবে একমাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর গর্ভবতী হলে যতক্ষণ সন্তান প্রসব না করে, ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। এ পদ্ধতির কোনো একটি গ্রহণ না করে দাসীর সাথে সহবাস করলে দুটি মারাত্মক ও ক্ষমাহীন অপরাধের যে কোনো একটি অপরাধ সংঘটিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

প্রথমত যদি মালিক দাসীর পেটের বাহ্যিক অবস্থা দেখে পূর্বের গর্ভ মনে করে তার সাথে সহবাস করে, অথচ এ গর্ভ তার সহবাসের কারণেই হয়েছে, যা তার ধারণার বহির্ভূত ছিল, এমতাবস্থায় সে ভূমিষ্ঠ নিজের প্রকৃত স্বাধীন সন্তানটিকে পূর্ব মালিকের সন্তান মনে করে গোলাম বানাবে এবং গোলাম সুলভই আচরণ তার সাথে করবে, এটি একটি মারাত্মক অপরাধ। কেননা, কোনো স্বাধীন সন্তানকে গোলাম বানানো সম্পূর্ণ হারাম।

দ্বিতীয়ত দাসীর সাথে সহবাসের ছয়মাস পর যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তবে মালিক সহবাসের কারণে সে নিজের সন্তান মনে করবে অথচ গর্ভে এ সন্তান পূর্ব মালিকের ছিল। এমতাবস্থায় সে অন্যের একটি গোলাম সন্তানকে স্বাধীন সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি দিল এবং তাকে নিজের একজন ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য করল। বস্তুত অন্য ব্যক্তির সন্তানকে নিজের ওয়ারিশ বানানোও হারাম। আর এজন্যই হাদীসে দাসীর মালিক হওয়ার সাথে সাথে তার সাথে সহবাস করতে নিষেধ করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣١٩٥ أَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِىْ سَبَايَا أَوْطَاسٍ لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتّٰى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتّٰى تَحِيْضَ حَيْضَةً - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِىُّ)

৩১৯৫. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উদ্ধৃতিতে তাঁর উক্তি বর্ণনা করেন যে, আওতাস যুদ্ধে লব্ধ বন্দী দাসীগণ সম্পর্কে তিনি ঘোষণা করেন যে, গর্ভবতীর সাথে সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত এবং ঋতুমতীর সাথে এক পূর্ণ মাসিক স্রাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন উপগত না হয়। –[আহমদ, আবূ দাঊদ, দারিমী]

وَعَنْ ٣١٩٦ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يَّسْقِىَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهٖ يَعْنِىْ اِتْيَانَ الْحَبَالٰى وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يَّقَعَ عَلٰى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْىِ حَتّٰى يَسْتَبْرِئَهَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يَّبِيْعَ مَغْنَمًا حَتّٰى يُقْسَمَ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ اِلٰى قَوْلِهٖ زَرْعَ غَيْرِهٖ)

৩১৯৬. অনুবাদ : হযরত রুওয়াইফা ইবনে ছাবিত আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়ন যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে, তার পক্ষে অপরের শস্যক্ষেত্রে নিজের পানি সিঞ্চন করা অর্থাৎ গর্ভবতীর সাথে সহবাস করা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের উপরে ঈমান রাখে, তার পক্ষে اِسْتِبْرَاءْ [জরায়ুমুক্ত জানা] ব্যতীত যুদ্ধবন্দিনী নারীর সাথে সহবাস করা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের উপরে ঈমান রাখে, তার পক্ষে বণ্টনের পূর্বে মালে গনিমতের বিক্রয় করা বৈধ নয়। –[আবূ দাঊদ। ইমাম তিরমিযী (র.) শুধুমাত্র অপরের শস্যক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রথমাংশ বর্ণনা করেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হুনাইন যুদ্ধের ঘটনা : মহানবী ﷺ মক্কা বিজয়ের পর সবে মাত্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, এমন সময় সংবাদ পেলেন যে, মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী হুনাইন নামক স্থানে হাওয়াযেন ও ছাকীফ সম্প্রদায় বিরাট এক বাহিনীসহ নবী করীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়েছে। নবী করীম ﷺ কালবিলম্ব না করে নিজেদের সঙ্গী দশ হাজার এবং মক্কার নওমুসলিম দুই হাজার মোট বার হাজারের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে হুনাইন অভিমুখে প্রতিপক্ষকে দমন করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ইসলামি বাহিনী হুনাইনে গিয়ে শিবির স্থাপন করলেন। মুসলমানের মধ্যে কেউ কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল ফলে তারা নিজেদের উপর আস্থাশীল হয়ে পড়ল এবং মনে করল যে কেউ তাদেরকে পরাভূত করতে পারবে না। হাওয়াযেন সম্প্রদায় ছিল তীরান্দাজীতে আরবের বিখ্যাত সম্প্রদায়। তারা পূর্বেই পাহাড়ের গোপন ঘাঁটিতে ওতপেতে বসেছিল। রাতের শেষ প্রহরে হাওয়াযেন সম্প্রদায় মুসলমানদের উপর অতর্কিত হামলা শুরু করে। অসংখ্য তীর বর্ষণের ফলে মুসলমান সৈন্যরা দিশাহারা হয়ে গেল। ফলে তারা পালাতে শুরু করল। এ সময় নবী করীম ﷺ -এর নিকট মাত্র কয়েকজন সাহাবী ব্যতীত কেউই ছিল না। তিনি আনসার, মুহাজির ও বায়'আতে রেযওয়ানে অংশগ্রহণকারীগণকে নাম ধরে ডাকতে থাকলেন এবং হযরত আব্বাস ও আবূ সুফিয়ান (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন। যখন ৮০ হতে ১০০ জন লোক এসে জমায়েত হলেন তখন নবী করীম ﷺ এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বললেন, তোমরা আল্লাহর নামে অগ্রসর হও, কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত কর। তখনই প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করার কাজ শুরু হয়ে গেল। দুই দলের প্রচণ্ড লড়াই হওয়ার পরিশেষে কাফির দলের পরাজয় ঘটল। মুসলমানদের রণসম্ভার গনিমতরূপে হস্তগত হলো। অবশেষে হাওয়াযেন ও ছাকীফ সম্প্রদায়ের বহু লোক এসে নবী করীম ﷺ -এর হাতে মুসলমান হলেন। আর গনিমতের সম্পদ সাহাবীগণের মধ্যে ইসলামের বিধান মোতাবেক বণ্টন করে দিলেন।

قَوْلُهُ حَتّٰى يَسْتَبْرِئَهَا-এর মর্মার্থ : দাসীর জরায়ু বা গর্ভাশয় সন্তানমুক্ত কিনা, তা জানার যে নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করার বিধান দেওয়া হয়েছে, পরিভাষায় তাকে اِسْتِبْرَاءٌ বলে। যুদ্ধবন্দিনী নারীর জরায়ু সন্তানমুক্ত কিনা, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা বৈধ নয়। অবশ্য এটা জানার পদ্ধতি ইতঃপূর্বের হাদীসে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَنْ يَّبِيْعَ مَغْنَمًا حَتّٰى يَقْسِمَ-এর ব্যাখ্যা : مَغْنَمٌ শব্দটির আভিধানিক অর্থ– যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। পরিভাষায়, মুসলিম শাসক বা নেতা যদি যুদ্ধের মাধ্যমে বিজাতীয় ভূখণ্ড দখল করে বা যুদ্ধে শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করত যে ধনসম্পদ, অস্ত্রশস্ত্র ও জমিজমা মুসলমানদের করতলগত হয়, তাকেই মাগনাম বা গনিমত নামে আখ্যায়িত করা হয়। মুসলিম শাসকের কর্তব্য তা মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে শরিয়ত নির্ধারিত নিয়মে বণ্টন করে দেওয়া। মালে গনীমত বণ্টনের পূর্বে বিক্রয় করা বৈধ নয়।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣١٩٧ - عَنْ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُ بِاسْتِبْرَاءِ الْاِمَاءِ بِحَيْضَةٍ اِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيْضُ وَثَلٰثَةِ اَشْهُرٍ اِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيْضُ وَيَنْهٰى عَنْ سَقْىِ مَاءِ الْغَيْرِ -

৩১৯৭. অনুবাদ : হযরত ইমাম মালেক (র.) বলেন, [তাবেয়ী ও সাহাবীগণের মাধ্যমে আমার নিকট এ হাদীস পৌঁছেছে] রাসূলুল্লাহ ﷺ দাসী ঋতুমতী হলে এক মাসিক দ্বারা 'ইসতিবরা' করার নির্দেশ দিতেন, আর ঋতুমতী না হলে তিন মাসের অপেক্ষা দ্বারা এবং অপরের পানিতে নিজের পানি সিঞ্চন করতে নিষেধ করতেন।

٣١٩٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّهُ قَالَ اِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيْدَةُ الَّتِىْ تُوْطَأُ اَوْ بِيْعَتْ اَوْ عُتِقَتْ فَلْتَسْتَبْرِأْ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ وَلَا تَسْتَبْرِأُ الْعَذْرَاءُ - (رَوَاهُمَا رَزِيْنٌ)

৩১৯৮. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে দাসীর সাথে সহবাস করা হয় ঐরূপ দাসী কাউকে দান, বিক্রয় অথবা মুক্ত করে দিলে এক মাসিক দ্বারা তার জরায়ু মুক্ত জানতে হবে। কুমারীর 'ইসতিবরা' বা জরায়ু মুক্ত কিনা, তা জানতে হবে না। –[উভয় হাদীস রাযীন বর্ণনা করেছেন।]

بَابُ النَّفَقَاتِ وَحَقِّ الْمَمْلُوْكِ
পরিচ্ছেদ : স্ত্রীর ভরণপোষণ ও দাস-দাসীর অধিকার প্রসঙ্গে

اَلنَّفَقَةُ শব্দটি اَلنُّفُوْقُ হতে নির্গত, শাব্দিক অর্থ হলো– اَلْهَلَاكُ বা ধ্বংস হওয়া। যেমন বলা হয়– نَفَقَتِ الدَّابَّةُ نُفُوْقًا অথবা এটি اَلنِّفَاقُ হতে উদ্ভূত যার অর্থ اَلرَّوَاجُ বা প্রচলিত নিয়ম-রীতি। যেমনি বলা হয়– نَفَقَتِ السِّلْعَةُ نِفَاقًا শরিয়তের পরিভাষায়, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান প্রদান করাকে নাফাকাহ বলে। নাফাহকাহ শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপকার্থবোধক। স্ত্রীর ভরণপোষণ যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, অনুরূপভাবে সন্তানসন্ততি, পিতামাতা, নিকটাত্মীয় প্রমুখের ভরণপোষণও এর অন্তর্ভুক্ত। আর এজন্যই اَلنَّفَقَاتُ শব্দটিকে বহুবচন নেওয়া হয়েছে। আর حَقُّ الْمَمْلُوْكِ দ্বারা গোলামের খাদ্য ও বস্ত্রাদি প্রদান করা এবং যে কাজ করতে সে সক্ষম নয়, এমন কাজ করতে বাধ্য না করাকে বুঝানো হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, কারো নিকট হক বা অধিকার থাকলে সে যদি দিতে না চায়, তবে তার অগোচরে তার সম্পদ হতে 'হক' পরিমাণ উসুল করা জায়েজ। তবে ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র.)-এর মতে এটা সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক নয়; বরং কেবলমাত্র স্ত্রীর খোরপোশ ও সন্তানের ব্যয়ের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ। এ পরিচ্ছেদের হাদীস তাই প্রমাণ করবে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣١٩٩ - عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ اِنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعْطِيْنِيْ مَا يَكْفِيْنِيْ وَ وَلَدِيْ اِلَّا مَا اَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَ وَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩১৯৯. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। [আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী, মু'আবিয়া (রা.)-এর মাতা] হিন্দা বিনতে 'উতবা [মক্কা বিজয়কালে] রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! [আমার স্বামী] আবূ সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। আমার এবং আমার সন্তানের প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য প্রদান করে না, ফলে আমি তার অজ্ঞাতসারে কিছু কিছু উঠিয়ে নেই। এর উত্তরে তিনি বললেন, তোমার এবং তোমার সন্তানের প্রয়োজন পরিমাণ নিয়মমাফিক গ্রহণ কর। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

স্ত্রীর ভরণপোষণে উভয়ের অবস্থা ধর্তব্য হওয়া সম্পর্কে মতভেদ : স্ত্রীকে ভরণপোষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কার অবস্থা ধর্তব্য হবে, সে ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যথা–

১. **ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব :** ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এক্ষেত্রে স্বামীর অবস্থাই ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ স্বামী যদি ধনী হয়, তবে স্ত্রীর ভরণপোষণ প্রাচুর্য অনুযায়ী হবে। আর যদি স্বামী গরিব হয়, তবে স্ত্রীর ভরণপোষণও গরিবী অনুযায়ী হবে। ইমাম কারখী (র.) এ অভিমত পোষণ করেছেন। এটা আহনাফের প্রকাশ্য বর্ণনা। দলিল হলো কুরআনের নিম্নোক্ত বাণী– قَوْلُهُ تَعَالٰى : لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتٰهُ اللّٰهُ
অত্র আয়াতে ধনী-গরিব উভয় ক্ষেত্রেই স্বামীর অবস্থা ধরা হয়েছে।

২. হেদায়া গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, ভরণপোষণের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। আল্লামা খাসসাফ (র.)ও এ অভিমত পোষণ করেছেন এবং এর উপরই ফতোয়া প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী উভয় যদি ধনী হয় অথবা উভয়ই গরিব হয়, তবে ধনীর ক্ষেত্রে নাফাকাহ ধরা হবে– ধনী হলে ধনাঢ্যতা অনুযায়ী এবং গরিব হলে দরিদ্রতা অনুযায়ী আর যদি স্ত্রী গরিব এবং স্বামী ধনী হয়, তবে স্ত্রীকে মাঝামাঝি ধরনের নাফাকাহ প্রদান করতে হবে। তাঁদের দলিল হলো– قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ এ আয়াতে স্বামীর অবস্থা ধরা হয়েছে।

আর হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اِنَّ هِنْدًا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ زَوْجِىْ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعْطِيْنِىْ مَا يَكْفِيْنِىْ وَ وَلَدِىْ اِلَّا مَا اَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ خُذِىْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

এ হাদীসে নাফাকাহ-এর ব্যাপারে স্ত্রীর অবস্থা ধরা হয়েছে, যা পূর্বের আয়াতের পরিপন্থি। অতএব, যারা বলেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অবস্থাই ধর্তব্য হবে, তারা অত্র আয়াত এ হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করত উক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ভরণপোষণের বিধান : বিবাহ বন্ধন, বংশ এবং মিলকিয়াত তথা কারো উপর অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ভিত্তিতে একের উপর অন্যের ভরণপোষণ প্রদান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এটা আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে এসেছে– لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ আরো উল্লেখ আছে– وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন– وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

উল্লিখিত প্রমাণাদি দ্বারা বুঝা যায় যে, খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান প্রদান করা ওয়াজিব।

٣٢٠٠ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَعْطَى اللّٰهُ اَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩২০০. **অনুবাদ :** হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাউকে ধনসম্পত্তি দান করেন, তখন তা প্রথমে নিজের ও পরিজনের [আবশ্যিক] প্রয়োজনে ব্যয় কর। –[মুসলিম]

٣٢٠١ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهٗ وَكِسْوَتُهٗ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا يُطِيْقُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩২০১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দাস-দাসীকে খাদ্য-বস্ত্র প্রদান [মালিকের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত] করতে হবে এবং তাকে সাধ্যাতীত পরিশ্রমের কার্যের আদেশ করা যাবে না। –[মুসলিম]

٣٢٠٢ - وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ اَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفْهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهٗ فَاِنْ كَلَّفَهٗ مَا يَغْلِبُهٗ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩২০২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ যর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তারা [দাসগণ] তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। অতএব, যে ব্যক্তির অধীনে আল্লাহ তার কোনো ভাইকে অধীন করে দিয়েছেন, সে যেন নিজে যা খায়, তাই তাকে খাওয়ায়; নিজে যা পরিধান করে, তাকেও তা পরিধান করায়। তাদের ক্ষমতার বাইরের কার্যের জন্য যেন নির্দেশ না দেয়। যদি ক্ষমতার বাইরের কাজের দায়িত্ব দেয়, তবে নিজেও যেন তাকে সাহায্য করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

٣٢٠٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) جَاءَهٗ قَهْرَمَانٌ لَهٗ فَقَالَ لَهٗ اَعْطَيْتَ الرَّقِيْقَ قُوْتَهُمْ قَالَ لَا قَالَ فَانْطَلِقْ فَاَعْطِهِمْ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَفٰى بِالرَّجُلِ اِثْمًا اَنْ يَّحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوْتَهٗ وَفِىْ رِوَايَةٍ كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩২০৩. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার নিকট তার ম্যানেজার আসলে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি দাসদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দিয়েছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, যাও এক্ষুণি দিয়ে দাও। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের পাপের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, অধীনস্থ দাসকে তার প্রাপ্য না দেওয়া, অন্য বর্ণনায় মানুষের পাপের জন্য যথেষ্ট যে, পাওনাদারের প্রাপ্য নষ্ট করে দেয়। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٢٠٤ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا صَنَعَ لِاَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَاكُلْ فَاِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوْهًا قَلِيْلًا فَلْيَضَعْ فِيْ يَدِهِ مِنْهُ اُكْلَةً اَوْ اُكْلَتَيْنِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩২০৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের খাদেম তোমাদের জন্য খাদ্য তৈরি করে তা নিয়ে আসে, আর সে-ই তো খাদ্য তৈরির উত্তাপ ও ধোঁয়ার কষ্ট সহ্য করেছে, তবে তাকে যেন নিজের সাথে বসিয়ে খাওয়ায়। যদি খাদ্য গ্রহণকারীর সংখ্যা বেশি হয় ও খাদ্যের পরিমাণ কম হয়, তবে তার হাতে এক-দুই লোকমা যেন তুলে দেয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অত্র হাদীসে খাদেম বলতে সেসব খাদেমকে বুঝানো হয়েছে যারা খেদমত করে। চাই গোলাম হোক বা ক্রীতদাস হোক, অন্যের অধীনস্থ হোক বা স্ত্রীর নিজেরই হোক অথবা স্বামীর হোক বা উভয়ের মালিকানাধীন হোক, খাদেমকে নফ্কা দিতে হবে। যদি স্ত্রীর মালিকানাভুক্ত হয়, আর স্বামী যদি ধনী হয় তবে এ ধরনের খাদেমের নফ্কা দেওয়া ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মানুষের পাপের জন্য এটাই যথেষ্ট যে অধীনস্থ দাস-দাসীকে তার প্রাপ্য না দেওয়া।

وَعَنْ ٣٢٠٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَاَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ فَلَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩২০৫. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কোনো গোলাম তার মালিকের শুভাকাঙ্ক্ষী হয় ও আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগি উত্তমরূপে আদায় করে, তখন তার দ্বিগুণ ছওয়াব মিলে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** 'যখন কোনো গোলাম মালিকের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়'-এর অর্থ হলো গোলাম যখন মালিকের যাবতীয় কাজ আন্তরিকভাবে সম্পাদন করে, তার নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করে। অথবা এর অর্থ হলো, সে তার কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করে আর এর সাথে সেই গোলাম প্রকৃত মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হুকুম পালন করে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যা নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করে এবং যা নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকে– এমন গোলামের জন্য দুটি ছওয়াব রয়েছে। একটি হলো তার দুনিয়ার অস্থায়ী মালিকের খেদমত করার কারণে এবং দ্বিতীয়টি হলো প্রকৃত মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যাবতীয় নির্দেশ পালনের কারণে। গোলামের দুটি কষ্ট সাধনের কারণে দুটি ছওয়াব মিলবে। মূলত মালিকের আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্যের নামান্তর। কেননা, মালিকের আনুগত্যের নির্দেশ রয়েছে। গোলাম স্বাধীন ব্যক্তির চেয়ে অতিরিক্ত একটি দায়িত্ব পালনে নির্দেশিত। তাই তাকে এ অতিরিক্ত ছওয়াব প্রদান করা হবে। সুতরাং অত্র হাদীসের আলোকে বলা চলে, অন্তত এ ব্যাপারে স্বাধীন ব্যক্তির চেয়েও দাসের মর্যাদা অধিক।

وَعَنْ ٣٢٠٦ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعِمَّا لِلْمَمْلُوْكِ اَنْ يَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ بِحُسْنِ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَطَاعَةِ سَيِّدِهِ نِعِمَّا لَهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩২০৬. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গোলামের জন্য কত না উত্তম যে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত সুন্দরভাবে আদায় এবং মালিকের আনুগত্যের সাথে মারা যায়। এটা তার জন্য কত না উত্তম কথা। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٢٠٧ جَرِيْرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلٰوةٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَعَنْهُ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيْهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩২০৭. **অনুবাদ :** হযরত জারীর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কোনো গোলাম পালিয়ে যায়, তখন তার নামাজ কবুল হয় না। অপর বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেছেন– পলাতক গোলামের উপর [ইসলামের] কোনো দায়দায়িত্ব থাকে না। অপর বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে গোলাম তার মনিব হতে পালিয়ে যায়, সে কুফরি করে যতক্ষণ মালিকের নিকট ফিরে না আসে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মালিকের খেদমত করা, তার দায়দায়িত্ব পালন করা গোলামের অপরিহার্য করণীয় কাজ। শরিয়তের পক্ষ হতে এ ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ রয়েছে। এর উত্তম বিনিময়ের কথাও ইতঃপূর্বের হাদীসে বিধৃত হয়েছে; কিন্তু যে হতভাগা কৃতঘ্ন গোলাম মালিকের সাথে গাদ্দারী করে, তার অনুগ্রহ-অনুকম্পাকে বিসর্জন দিয়ে তার নিকট হতে পালিয়ে যায়, সে গোলাম সম্পর্কে হাদীসে বিভিন্ন ঘোষণা বিঘোষিত হয়েছে। এক বর্ণনায় এ ধরনের গোলাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তার নামাজ কবুল হবে না'। এর অর্থ হলো, তার নামাজ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লামা তীবী (র.) এ সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট তার নামাজ কবুল হবে না।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, 'পলাতক গোলামের উপর কোনো দায়দায়িত্ব থাকে না' হাদীস বিশারদগণ এর কয়েকটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

মিরকাত প্রণেতা এর ব্যাখ্যা করেন– যে গোলাম পালিয়ে গেছে তার ব্যাপারে ইসলামের কোনো দায়দায়িত্ব নেই।

কেউ কেউ বলেন, এর মর্মার্থ হলো– পালানো গোলামকে পলায়নকালীন সময় তার মালিকের খরচাদি দেওয়া অপরিহার্য নয়।

আল্লামা মাযহার এর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় বলেন, যখন গোলাম কাফিরদের রাজ্যে পালিয়ে যায় এবং ধর্মচ্যুত হয়, তখন ইসলামের কোনো দায়-দায়িত্ব তার উপর থাকে না। এ অবস্থায় তাকে হত্যা করা বৈধ; কিন্তু যদি সে কোনো মুসলিম দেশে পলায়ন করে এবং ধর্মচ্যুত হওয়ার কোনো মানসিকতা না থাকে, তখন তাকে হত্যা করা বৈধ হবে না। এ অবস্থায় হাদীসটি গোলামকে শাসানো এবং বেশি জোরে তাকে প্রহার করা বৈধ– এ অর্থে ব্যবহৃত হবে।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, 'যে গোলাম পালিয়ে যায়, সে কুফরি করে যতক্ষণ মালিকের নিকট ফিরে না আসে।' হাদীস বিশারদগণ এরও কয়েকটি ব্যাখ্যা করেছেন– ১. সে কুফরির নিকটবর্তী হলো। ২. তার অর্থ হলো, তার উপর কুফরি অর্পিত হওয়ার ভয় রয়েছে। ৩. বলা যেতে পারে, সে কাফিরের ন্যায় কাজ করেছে। ৪. তার দ্বারা ধমক ও শাসানো উদ্দেশ্য এবং ৫. আল্লামা মাযহার তার অর্থ বর্ণনায় বলেন, সে এহেন কাজের মাধ্যমে মালিকের অনুগ্রহকে ঢেকে দিল, যা অকৃতজ্ঞতার নামান্তর।

وَعَنْ ٣٢٠٨ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ وَهُوَ بَرِيْءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ كَمَا قَالَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩২০৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম [রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কুনিয়াত]-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নিজের গোলামের উপর ব্যভিচারের অপবাদ লাগায় অথচ সে এ দোষ হতে মুক্ত, তাকে কিয়ামত দিবসে কোড়া লাগানো হবে, অবশ্য যদি গোলাম তার অপবাদ অনুযায়ী হয় [তবে সে কোড়া হতে বেঁচে যাবে]। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٢٠٩ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩২০৯. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিজের গোলামের উপর অন্যায়ভাবে 'হদ' লাগায় অথবা থাপ্পড় মারে, তার এ কাজের কাফফারা বা সংশোধন হলো গোলামকে আজাদ করে দেওয়া। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٢١٠ أَبِى مَسْعُوْدِ نِ الْاَنْصَارِىِّ (رض) قَالَ كُنْتُ اَضْرِبُ غُلَامًا لِىْ فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِىْ صَوْتًا اِعْلَمْ اَبَا مَسْعُوْدٍ اَللّٰهُ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللّٰهِ فَقَالَ اَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ اَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩২১০. অনুবাদ : হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার গোলামকে প্রহার করছিলাম, এমন সময় আমার পেছন হতে আওয়াজ শুনতে পেলাম, সাবধান! হে আবূ মাসঊদ! তুমি তোমার গোলামের উপর যতটুকু ক্ষমতা রাখ আল্লাহ তদপেক্ষা বেশি তোমার উপর ক্ষমতাশালী। অতঃপর আমি ফিরে তাকিয়ে দেখি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন। আমি বললাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত। তখন তিনি বললেন, দেখ যদি তুমি এটা না করতে হবে দোজখের আগুন তোমাকে জ্বালাত [বা স্পর্শ করত বললেন]।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : গোলামের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রদর্শন, একজন মানুষ হিসেবে তার সাথে মানবীয় আচরণ করা, অত্যাচার, অবিচার আর নির্যাতনের স্টীম রোলার তার উপর না চালানোই আলোচ্য হাদীসের শিক্ষা। চাকরবাকর গোলামেরই ন্যায়; অতএব তাদেরকে প্রহার করা, অন্যায়ভাবে তাদের উপর জুলুম করা বৈধ নয়। একবার হযরত আবূ মাসঊদ (রা.) নিজ গোলামকে প্রহার করছিলেন। এটা দেখে রাসূল ﷺ ধমকের সুরে তাঁকে বলেছিলেন, হে আবূ মাসঊদ! জেনে রাখ, তুমি তোমার গোলামের উপর যতটুকু ক্ষমতা রাখ আল্লাহ তদপেক্ষা বেশি তোমার উপর ক্ষমতাশীল। আবূ মাসঊদ অনুতপ্ত হয়ে সাথে সাথে গোলামটিকে আজাদ করে দিয়েছিলেন। এটা তাঁর আন্তরিক সহানুভূতিরই পরিচায়ক। মূলত প্রহারের কারণে গোলামকে আজাদ করা ওয়াজিব নয়। তবে এটা মোস্তাহাব। এ ব্যাপারে সকল মুসলমান ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অবশ্য আজাদ করার মাধ্যমে অপবাদের অবসান ঘটবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٢١١ عَمْرِوْ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ لِىْ مَالًا وَاِنَّ وَالِدِىْ يَحْتَاجُ اِلٰى مَالِىْ قَالَ اَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ اِنَّ اَوْلَادَكُمْ مِنْ اَطْيَبِ كَسْبِكُمْ كُلُوْا مِنْ كَسْبِ اَوْلَادِكُمْ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩২১১. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শুআইব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এসে বলল, আমার নিকট টাকাপয়সা আছে এবং আমার পিতা অভাবী। আমার টাকাপয়সার প্রয়োজন তার রয়েছে [এমতাবস্থায় আমার কি কর্তব্য?] তিনি বললেন, তুমি এবং তোমার টাকাপয়সা সমস্তই তোমার পিতার। তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের উত্তম উপার্জন। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানের উপার্জন হতে ভোগ কর। -[আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ]

وَعَنْهُ ٣٢١٢ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ فَقِيْرٌ لَيْسَ لِىْ شَيْءٌ وَلِىْ يَتِيْمٌ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيْمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَاثِّلٍ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩২১২. অনুবাদ : উক্ত হযরত আমর ইবনে শুআইব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আমি একজন দরিদ্র ব্যক্তি, আমার কিছু নেই এবং আমার তত্ত্বাবধানে একজন এতিম প্রতিপালিত হচ্ছে [যার ধনসম্পদ আছে] এতে তিনি বললেন, তুমি অপব্যয় বা অতিরিক্ত ব্যয় না করে অথবা সঞ্চয় না করে তোমার প্রতিপালিত এতিমের মাল হতে খেতে পার। -[আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ওলামায়ে আহনাফের মতে ফকির বা দরিদ্র বলা হয় সে ব্যক্তিকে যে নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ফকির হলো এমন ব্যক্তি যার কিছুই নেই, সম্পূর্ণ নিঃস্ব। সে যাই হোক, এমন দরিদ্র ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে যদি কোনো এতিম প্রতিপালিত হয় যার ধনসম্পদ রয়েছে– এটা ভক্ষণ করা সেই ব্যক্তির জন্য বৈধ হবে, তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয় এবং অপব্যয়ও করতে পারবে না। আর নিজের জন্য সঞ্চয় করেও রাখতে পারবে না। প্রয়োজনের পূর্বে তা ভক্ষণ করা বৈধ হবে না।

আল্লামা ইবনুল মালিক হাদীসে উল্লিখিত 'মুবাদির' শব্দের অর্থ এটাই করেছেন। 'মুবাদির' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এতিমের বালেগ ও বড় হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তার ধনসম্পদ তাড়াহুড়া করে ভক্ষণ করা। এহেন কর্মের নিষিদ্ধতায় মহান রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন– وَلَا تَأْكُلُوْهَا إِسْرَافًا وَّبِدَارًا أَنْ يَّكْبَرُوْا অর্থাৎ আর তোমরা ঐ সমস্ত সম্পত্তি ভক্ষণ কর না অপব্যয়ে এবং তাড়াতাড়ি করে, এ ধারণায় যে– তারা বালেগ হয়ে যাবে। –[সূরা নিসা] তারা বড় হয়ে গেলে সাথে সাথে তাদের সম্পত্তি তাদেরই নিকট হস্তান্তর করতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন– فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ অর্থাৎ যদি তাদের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণ বুদ্ধিমত্তা দেখ, তবে তাদের ধনসম্পত্তি তাদেরকে সমর্পণ করে দাও। –[সূরা নিসা] মূলত একেবারে অসহায়ের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেলে, শুধুমাত্র জীবন বাঁচানোর তাগিদে প্রয়োজন মাফিক এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা তার তত্ত্বাবধায়কের জন্য বৈধ– নচেৎ নয়।

وَعَنْ ٣٢١٣ أُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ مَرَضِهِ الصَّلٰوةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَ رَوٰى أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ)

৩২১৩. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, অন্তিম শয্যায় তিনি পুনঃপুন বলছিলেন, তোমরা নামাজের এবং তোমাদের দাস-দাসীগণের প্রতি খেয়াল রেখ। –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে। আর আহমদ ও আবূ দাউদ আলী (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন]।

وَعَنْ ٣٢١٤ أَبِيْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩২১৪. অনুবাদ : হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন– দাস-দাসীর সাথে অসদাচরণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٣٢١٥ رَافِعِ بْنِ مَكِيْثٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ حُسْنُ الْمَلَكَةِ يُمْنٌ وَسُوْءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ) وَلَمْ أَرَ فِيْ غَيْرِ الْمَصَابِيْحِ مَا زَادَ عَلَيْهِ فِيْهِ مِنْ قَوْلِهِ وَالصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مَيْتَةَ السُّوْءِ وَالْبِرُّ زِيَادَةٌ فِى الْعُمُرِ -

৩২১৫. অনুবাদ : হযরত রাফে' ইবনে মাকীছ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দাস-দাসীর সাথে সদ্ব্যবহার বরকতময় এবং দুর্ব্যবহার করা বে-বরকতের কারণ। –[আবূ দাউদ] মিশকাত গ্রন্থকার বলেন, মাসাবীহ গ্রন্থ ব্যতীত অন্যত্র হাদীসের এ অতিরিক্ত বাক্য আমার দৃষ্টিগোচরে আসেনি [মাসাবীহতে আছে–] দান-খয়রাত অপমৃত্যু প্রতিরোধ করে এবং নেককাজ বয়স বৃদ্ধি করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দান-খয়রাত অপমৃত্যু প্রতিরোধ করে : দান-খয়রাত করা একটি উত্তম কাজ। এতে আত্মার প্রশান্তি লাভ হয়। অত্র হাদীসে এর গুরুত্বপূর্ণ একটি ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– 'দান-খয়রাত অপমৃত্যু প্রতিরোধ করে'। 'অপমৃত্যু' বলতে বুঝানো হয়েছে এমন অবস্থায় হঠাৎ মৃত্যুবরণ করা যে, তওবা করার সুযোগ পর্যন্ত মিলে না। এটা অত্যন্ত খারাপ মৃত্যু।

দান-খয়রাত মানুষকে এ অপমানজনক মৃত্যু হতে রেহাই প্রদান করে। অতএব, এ ঘৃণিত ও অপমানজনক মৃত্যু হতে পরিত্রাণের লক্ষ্যে আল্লাহর রাস্তায় বেশি বেশি দান-খয়রাত করা উচিত।

قَوْلُهُ اَلْبِرُّ زِيَادَةٌ فِى الْعُمُرِ-এর মর্মার্থ : সৎকাজ বয়স বৃদ্ধি করে এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে–

১. বাক্যটি তার হাকীকতের উপর প্রয়োগ হতে পারে এবং এ বৃদ্ধি হওয়া অনুভবও করা যেতে পারে। আর তা এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা লিখে রেখেছেন– অমুক ব্যক্তির বয়স এত বছর, সাথে সাথে তিনি এটাও লিখে রেখেছেন যে, যদি এ ব্যক্তি উত্তমভাবে আল্লাহর আনুগত্য করে, অথবা সে যদি কোনো কল্যাণ সাধন করে, তবে তার বয়স আরো এত বছর বাড়িয়ে দেওয়া হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা লিখে রেখেছেন– যদি কেউ রোগাক্রান্ত হয় এবং চিকিৎসা করে, তবে তার রোগ আরোগ্য করে দেওয়া হবে।

২. অথবা, 'সৎকাজ বয়স বৃদ্ধি করে'– এ বৃদ্ধি রূপকভাবে হবে। অর্থাৎ সে ব্যক্তি তার জীবনে প্রতিটি কাজে বরকত অনুভব করবে। আল্লাহর রহমতে সে একদিনের কাজে এত বরকত অনুভব করবে যা অন্যরা এক বছরেও করতে পারবে না।

৩. সৎকাজের জন্য মৃত্যুর পরও সে মানুষের নিকট এত প্রশংসিত হবে যে, যেন সে মরেও অমর, চির ভাস্বর– হাদীসাংশ দ্বারা রূপকভাবে এটাও বুঝানো যেতে পারে।

وَعَنْ ٣٢١٦ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ضَرَبَ اَحَدُكُمْ خَادِمَهٗ فَذَكَرَ اللّٰهَ فَارْفَعُوْا اَيْدِيَكُمْ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ) لٰكِنَّ عِنْدَهٗ فَلْيُمْسِكْ بَدَلَ فَارْفَعُوْا اَيْدِيَكُمْ -

৩২১৬. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার খাদেমকে প্রহার করে ঐ সময়ে সে যদি আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, তখন তোমরা হাত সরিয়ে নাও। –[তিরমিযী ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে] অবশ্য সেখানে হাত সরানোর পরিবর্তে থেমে যাও রয়েছে।

وَعَنْ ٣٢١٧ اَبِىْ اَيُّوْبَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَ وَلَدِهَا فَرَّقَ اللّٰهُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اَحِبَّتِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ)

৩২১৭. অনুবাদ : হযরত আবূ আইয়ূব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি [দান, বিক্রয় ইত্যাদির মাধ্যমে দাস-দাসীর মধ্যে] মাতা ও তার সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায় আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তার ও তার আপনজনের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাবেন। –[তিরমিযী ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লামা তীবী (র.) বলেন, হাদীসে 'মাতা ও তার সন্তান' দ্বারা দাসী ও তার সন্তানকে বুঝানো হয়েছে। এরা উভয় যদি কারো মালিকানাধীন থাকে, তবে একজনকে বিক্রি বা দান করার মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জঘন্য অপরাধ। সন্তানের প্রতি মায়ের হৃদয়ের টান, গভীর স্নেহ, মায়া-মমতা এবং মায়ের প্রতিও সন্তানের ভালোবাসা ও নির্ভরশীলতা প্রকৃতিগত। সাধারণ জীব-জানোয়ার ও পশু-পাখির মধ্যেও এই আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়। পাখির বাসা হতে যদি তার বাচ্চাকে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে সে অব্যক্ত বেদনা নিয়ে সারাদিন কিচিরমিচির করতে থাকে। অনুরূপভাবে মায়ের কোল হতে যদি তার সন্তানকে, অথবা সন্তানের নিকট হতে যদি তার মাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়, তবে তাদের অন্তরেও বিচ্ছেদের আগুন জ্বলে উঠে। চাই সে দাসীই হোকনা কেন। এহেন নির্মম ও নিষ্ঠুর কাজ যে করবে তার সম্পর্কে আল্লাহর নবী বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার ও তার প্রিয়জনদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবেন। অর্থাৎ আখিরাতে তার জন্য প্রিয়জনদের সুপারিশদের সুযোগ তিরোহিত করা হবে। সে হবে তখন একটি নিঃস্ব।

দুটি গোলামের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো সম্পর্কে ইমামদের মতানৈক্য : কেউ যদি এমন দুজন গোলামের মালিক হয়, যারা রক্ত-সম্পর্কে আবদ্ধ, যেমন তার একজন দাসী এবং অপরজন তার সন্তান, এমতাবস্থায় বিক্রয় বা দানের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো বৈধ হবে কিনা সে ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাযহাব : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, গোলাম দুটির মধ্যে যদি জন্মসূত্রে সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে তবে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো বৈধ হবে না; কিন্তু এ সম্পর্ক বিদ্যমান না থাকলে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো বৈধ। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে আরো একটি অভিমত পাওয়া যায় যে, কোনো আপন দুজন গোলামের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো বৈধ নয়। এ সত্যের উপর তিনি নিম্নের হাদীসটি দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন–

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَهَبَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غُلَامَيْنِ اَخَوَيْنِ فَبِعْتُ اَحَدَهُمَا فَقَالَ لِي النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ غُلَامُكَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رُدَّهُ رُدَّهُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

তরফাইন (র.)-এর মাযহাব : ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যদিও গর্হিত কাজ, তবুও যদি কেউ তাদের একজনকে বিক্রয় করে তবে এ বিক্রয় শুদ্ধ ও বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। কেননা, বিক্রয়ের রোকন ইজাব ও কবূল এ ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে। এ ছাড়া বিক্রয়ের জন্য আরো যে শর্তাবলি রয়েছে তাও এখানে বিদ্যমান। অতএব, বিক্রয় সহীহ হয়ে যাবে; কিন্তু এটা মাকরূহ হবে। এ ধরনের মাকরূহ বিক্রয়কে ফাসিদ করে না। যেমন– ফাসিদ করে না জুমার নামাজের আজানের সময় বিক্রয়কে, যদিও তা মাকরূহ।

وَعَنْ ٣٢١٨ عَلِيٍّ (رض) قَالَ وَهَبَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غُلَامَيْنِ اَخَوَيْنِ فَبِعْتُ اَحَدَهُمَا فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ غُلَامُكَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رُدَّهُ رُدَّهُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩২১৮. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দুটি গোলাম দান করেন, যারা পরস্পরে ভাই ছিল। আমি ওদের একজনকে বিক্রি করে দেই। এখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অপর গোলামটি কই? আমি তাঁকে ঘটনা বললে তিনি আদেশ করলেন, ফিরিয়ে নাও, ফিরিয়ে নাও। –[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অত্র হাদীসের প্রেক্ষিতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, মূলত এ বিক্রি জায়েজ নেই। সম্ভবত এরা অল্প বয়স্ক ছিল। সুতরাং তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো ঠিক হয়নি। আর এভাবে ফিরিয়ে নেওয়াকে ফকীহদের পরিভাষায় بَيْعُ اِقَالَةٍ 'বাইয়ে-একালাহ' বলে। অর্থাৎ পূর্ব মূল্যে ফিরিয়ে নেওয়া। এটা জায়েজ। আর কিছু বেশি মূল্যে ফিরিয়ে নেওয়াকে بَيْعُ تَوْلِيَةٍ 'বাইয়ে তাওলিয়া' বলে। এটাও জায়েজ আছে।

وَعَنْهُ ٣٢١٩ اَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَ وَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَرَدَّ الْبَيْعَ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ مُنْقَطِعًا)

৩২১৯. অনুবাদ : উক্ত হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন যে, তিনি এক দাসী ও তার সন্তানের মাঝে একজনকে [বিক্রয় করে] বিচ্ছেদ ঘটালে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করলেন এবং বিক্রয় প্রত্যাহার করলেন। –[আবূ দাউদ বিচ্ছিন্ন সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** মাতা ও সন্তান, পিতা ও সন্তান, দুই ভাই, দুই ভগ্নি অথবা এক ভাই ও এক ভগ্নি এদের মাঝে দান-বিক্রয়ের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটানোর ব্যাপারে প্রায় সকল ইমামই নিষেধ বলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন– এ বিক্রি অবৈধ, এটা কার্যকর হবে না। তরফাইন তথা ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, ক্রেতা হস্তগত করলে ক্রয়বিক্রয় কার্যকর হবে, তবে এটা মাকরূহে তাহরীমী। অতএব, প্রত্যাহার করা ওয়াজিব।

وَعَنْ ٣٢٢٠ جَابِرٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلٰثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ يَسَّرَ اللّٰهُ حَتْفَهٗ وَاَدْخَلَهٗ جَنَّتَهٗ رِفْقٌ بِالضَّعِيْفِ وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَاِحْسَانٌ اِلَى الْمَمْلُوْكِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৩২২০. **অনুবাদ :** হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিনটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান আল্লাহ তা'আলা তার মৃত্যু সহজ করে দেবেন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। দুর্বলের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন, পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ও দাস-দাসীর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন। –[তিরমিযী] তিনি হাদীসটিকে গরীব বলেছেন।]

وَعَنْ ٣٢٢١ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهَبَ لِعَلِيٍّ غُلَامًا فَقَالَ لَا تَضْرِبْهُ فَاِنِّىْ نُهِيْتُ عَنْ ضَرْبِ اَهْلِ الصَّلٰوةِ وَقَدْ رَاَيْتُهٗ يُصَلِّىْ هٰذَا لَفْظُ الْمَصَابِيْحِ وَفِى الْمُجْتَبٰى لِلدَّارَقُطْنِىْ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّيْنَ -

৩২২১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ উমামা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে একটি গোলাম দান করে বলেন, একে মেরো না। কেননা, আল্লাহ নামাজিদেরকে প্রহার করতে আমাকে নিষেধ করেছেন, আমি তাকে নামাজ পড়তে দেখেছি। এটা মাসাবীহের বাক্য, দারাকুতনীর মুজতবা গ্রন্থে আছে যে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজিদেরকে প্রহার করা হতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

وَعَنْ ٣٢٢٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَمْ نَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ فَسَكَتَ ثُمَّ اَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ فَصَمَتَ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ قَالَ اُعْفُوْ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو)

৩২২২. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! খাদেমকে তার অপরাধের উপর কতবার আমরা ক্ষমা করব? তিনি নীরব রইলেন। সে ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তিনি নীরব রইলেন। তৃতীয়বার প্রশ্নের পরে বললেন, তাকে ক্ষমা কর, প্রত্যহ ৭০ বার [অপরাধ করলেও] ক্ষমা কর। –[আবূ দাঊদ। আর তিরমিযী (র.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় দাস-দাসীকে যথাসম্ভব ক্ষমা করে দেওয়াই মহত্ত্বের লক্ষণ। পবিত্র কুরআনেও এসেছে– وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ আর এখানে ৭০ বার দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। তবে বড় অন্যায় করলে সংশোধনের লক্ষ্যে প্রহার করাও জায়েজ আছে। অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষমা করতে থাকো।

وَعَنْ ٣٢٢٣ أَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَاءَمَكُمْ مِنْ مَمْلُوْكِيْكُمْ فَاَطْعِمُوْهُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ وَاكْسُوْهُ مِمَّا تَكْسُوْنَ وَمَنْ لَا يُلَائِمُكُمْ مِنْهُمْ فَبِيْعُوْهُ وَلَا تُعَذِّبُوْا خَلْقَ اللّٰهِ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩২২৩. অনুবাদ : হযরত আবূ যর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের অনুগত দাস-দাসীকে নিজেরা যা খাও, তাই খাওয়াও; নিজেরা যা পরিধান কর, তাই পরিধান করাও এবং যারা তোমাদের অনুগত নয়, তাদের বিক্রয় করে দাও, আর তোমরা আল্লাহর বান্দাকে শাস্তি দিও না। –[আহমদ, আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٢٢٤ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ (رضـ) قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَعِيْرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَاتْرُكُوْهَا صَالِحَةً. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩২২৪. অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে হানযালিয়্যাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ চলার পথে একটি উটের পার্শ্ব দিয়ে গমন করতে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তার পিঠ পেটের সাথে মিশে গেছে। তখন তিনি বললেন, তোমরা এ সমস্ত বাকহীন পশুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। পরিশ্রান্ত না করে ওদের পিঠে অরোহণ কর এবং অবতরণ কর। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কাযী আয়ায (র.) বলেন, বাকশক্তিহীন পশুকে আরবিতে মুজামাহ বলে, এসব প্রাণী নিজেদের ব্যথা-বেদনা ক্ষুত-পিপাসা বা অন্ন হাল-অবস্থাই ব্যক্ত করতে পারে না, ওদের সবকিছুই অব্যক্ত থেকে যায়। তারা শুধু বোবা চিৎকারের মাধ্যমেই তাদের ক্ষুধা-পিপাসার জ্বালা মালিকদের নিকট প্রকাশ করে থাকে। এ কারণেই মহানবী ﷺ অত্র হাদীসের মাধ্যমে এসব পশুদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে বলেছেন এবং তাদেরকে অনাহারে রেখে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন। আর তাদের পিঠে সাধ্যের বাইরে আরোহণ এবং সক্ষম নয় এমন বোঝা বহনের ব্যাপারে কষ্ট দিতেও নিষেধ করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٢٢٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ وَقَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا (اَلْاٰيَةَ) اِنْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيْمٌ فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ فَاِذَا فَضَلَ مِنْ طَعَامِ الْيَتِيْمِ وَشَرَابِهِ شَىْءٌ حُبِسَ لَهُ حَتّٰى يَاْكُلَهُ اَوْ يَفْسُدَ فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ

৩২২৫. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কুরআন মাজীদের আয়াত وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ (اَلْاٰيَةَ) [তোমরা এতিমের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না সদুদ্দেশ্য ছাড়া] এবং এ আয়াত اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى (اَلْاٰيَةَ) [যারা এতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে] নাজিল হলো, তখন যাদের প্রতিপালনে এতিম ছিল, তারা তাদের আহার্য হতে তার আহার্য, তাদের পানীয় হতে তার পানীয় পৃথক করতে লাগল, এভাবে যখন এতিমের আহার্য ও পানীয় হতে যা উদ্বৃত্ত হতে লাগল, তা তাদের জন্য রেখে দিতে লাগল, পরে এতিম খেত অথবা নষ্ট হতে লাগল। ফলশ্রুতিতে এতিমদের অভিভাবকগণকে পীড়া দিতে লাগল। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত

ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَيَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فَخَلَطُوْا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِمْ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِمْ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

করল। তারপর আল্লাহ তা'আলা নাজিল করলেন- يَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ (اَلْاٰيَةُ) [লোকে তোমাকে এতিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে; বল, তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্রিত থাক, তবে তারা তো তোমাদের ভাই]। অতঃপর তারা তাদের আহার্য নিজেদের আহার্যের সাথে, তাদের পানীয় নিজেদের পানীয়ের সাথে মেশাল। -[আবূ দাউদ, নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : পিতৃহীন অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে শরিয়তের পরিভাষায় এতিম বলা হয়। এতিমদের সম্পর্কে আল্লাহর বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তাদের অভিভাবকরা তাদের সম্পত্তিকে নিজেদের মনে করে ভক্ষণ করত, অপচয় করত। এমনকি নষ্টও করে দিত। এরূপ ঘৃণ্য অপকর্ম হতে বিরত থেকে যথাযথভাবে তাদের মালসম্পদ সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের অভিভাবকদেরকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, তোমরা সদুদ্দেশ্য ব্যতীত এতিমের সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না। তিনি আরো ইরশাদ করেন, যারা এতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা যেন অগ্নি ভক্ষণ করে, তারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে যে সমস্ত এতিম সন্তান ছিল, তারা তাদের ধনসম্পদ নিজের ধনসম্পদ হতে পৃথক করতে লাগলেন। এতে এতিমদের সম্পত্তি অভিভাবকের অভাবে নষ্ট হতে লাগল। ব্যাপারটি রাসূল ﷺ অবগত হলে, পুনঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন- "লোকে আপনাকে এতিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে- আপনি বলুন, তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে একসাথে থাক তবে তারাতো তোমাদেরই ভাই।"

এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম পুনরায় এতিমের সম্পত্তির তত্ত্বাবধান শুরু করলেন।

আলোচ্য হাদীসে এতিমদের ধনসম্পদ সংরক্ষণের বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। অভিভাবকগণ যদি ফকির বা নিঃস্ব হয় তবে ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর জন্য এতিমের সম্পদ হতে ভক্ষণ করা তার জন্য বৈধ হবে। নচেৎ বৈধ হবে না।

وَعَنْ ٣٢٢٦ اَبِىْ مُوْسٰى (رض) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَ وَلَدِهٖ وَبَيْنَ الْاَخِ وَبَيْنَ اَخِيْهِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارَقُطْنِىْ)

৩২২৬. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পিতা পুত্রের মাঝে এবং দুই ভাইয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে লানত করেছেন। -[ইবনে মাজাহ, দারাকুতনী]

وَعَنْ ٣٢٢٧ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اُتِىَ بِالسَّبْىِ اَعْطَى اَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيْعًا كَرَاهِيَةَ اَنْ يُّفَرِّقَ بَيْنَهُمْ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৩২২৭. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট যুদ্ধবন্দী আসলে তাদের মাঝে যাতে বিচ্ছেদ না ঘটে, তজ্জন্য আমাদের একজনকে পুরা পরিবার দিয়ে দিতেন। -[ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٣٢٢٨ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِشِرَارِكُمُ الَّذِىْ يَاْكُلُ وَحْدَهٗ وَيَجْلِدُ عَبْدَهٗ وَيَمْنَعُ رِفْدَهٗ ـ (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

৩২২৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- আমি কি তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট ব্যক্তির পরিচয় প্রদান করব না? [সে ঐ ব্যক্তি] যে একাকী খায়, গোলামকে মারে এবং দান-খয়রাত বন্ধ রাখে। -[রাযীন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বস্তুত অধীনস্থ ও গোলামকে অভুক্ত রেখে যে পানাহার করে এবং অভাবীদেরকে দান-খয়রাত করা হতে বিরত থাকে সে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ব্যক্তি। তার নিকট মানবিক কোনোই মূল্যবোধ নেই।

وَعَنْ ٣٢٢٩ أَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ اَخْبَرْتَنَا اَنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ اَكْثَرُ الْاُمَمِ مَمْلُوْكِيْنَ وَيَتَامٰى قَالَ نَعَمْ فَاَكْرِمُوْهُمْ كَكَرَامَةِ اَوْلَادِكُمْ وَاَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ قَالُوْا فَمَا تَنْفَعُنَا الدُّنْيَا قَالَ فَرَسٌ تَرْتَبِطُهٗ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَمْلُوْكٌ يَكْفِيْكَ فَاِذَا صَلّٰى فَهُوَ اَخُوْكَ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৩২২৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দাস-দাসীর সাথে দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাদেরকে ইতঃপূর্বে বলেননি যে, সকল উম্মত অপেক্ষা এ উম্মত অধিক দাস-দাসীর মালিক হবে এবং এতিমের অভিভাবক হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, বলেছি। তবে তোমরা যদি জান্নাতে প্রবেশ করতে চাও, তাহলে তাদেরকে আপন সন্তানের ন্যায় আদর-যত্ন কর, যা নিজেরা খাও তাই খাওয়াও। তারা জিজ্ঞেস করল, পার্থিব কোন বস্তু আমাদের উপকারে আসবে? তিনি বললেন, ঘোড়া, যা তুমি আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বেঁধে রাখ, দাস যা তোমার জন্য যথেষ্ট যখন সে নামাজ পড়ে তখন সে তোমার ভাই [হয়ে গেল]।-[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসটির শিক্ষা ও তার বাস্তব প্রয়োগ : আলোচ্য পরিচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসসমূহের প্রতি গভীর দৃষ্টিকরণে দেখতে পাই যে, এ বাণী ও নির্দেশ এমন সমাজে ও এমন সময়ে প্রদান করা হয়েছিল, যে সময়ে ও যে সমাজে দাস-দাসীর সামাজিক মর্যাদা তো দূরের কথা, মানবীয় মর্যাদাও ছিল না। তাদের সম্বন্ধে মহানুভবতা ও উদারতার কি অনুপম শিক্ষাদান করলেন! শুধু কথায় নয়, কার্যেও মহানবী ﷺ যায়েদ (রা.)-কে আজাদ করে দিলেন, পুত্রসম স্নেহমায়া করলেন। তার পুত্র উসামাকে হাসান হুসাইন (রা.)-এর ন্যায় সমানভাবে স্নেহপ্রীতির ডোরে বেঁধে প্রতিপালন করলেন। মানবতা ও মনুষ্যত্বের মর্যাদা এটা অপেক্ষা কে-কবে-কোথায় দেখাতে পেরেছে? শুধু মুখে মানবতার শ্লোগানে মানবতার মর্যাদা লাভ হয় না। এ মহান শিক্ষা মুকুরে আমাদের আখলাক-চরিত্রকে একবার প্রত্যক্ষ করি ও অনুধাবন করি আমরা কতটুকু মুসলমান আছি।

بَابُ بُلُوْغِ الصَّغِيْرِ وَحَضَانَتِهٖ فِى الصِّغَرِ

পরিচ্ছেদ : শিশুর বয়ঃপ্রাপ্তি হওয়া ও শিশুকালে তার প্রতিপালন প্রসঙ্গে

বয়ঃপ্রাপ্তির সময়সীমা : بُلُوْغٌ শব্দটি বাবে نَصَرَ-এর মাসদার, অর্থ– পৌঁছা। এখানে অর্থ শিশু কিভাবে প্রাপ্তবয়স্কা বা যৌবনের সীমারেখায় পৌঁছবে তার আলোচনা। বালকের যখন স্বপ্নদোষ হয় অথবা তার মধ্যে বীর্যের সঞ্চার হয়, তখন তাকে বয়ঃপ্রাপ্ত বলা হবে। এর সূচনা ১২ বছর বয়ঃক্রমকাল হতে গণনা করা হবে। মেয়েদের যখন ঋতুস্রাব দেখা দেয়, তখন তাকে সাবালিকা ধরা হবে। এর সূচনা ৯ বছরকাল হতে। যদি বালক-বালিকা কারও বয়ঃপ্রাপ্তির কোনো লক্ষণ প্রকাশ না পায়, তবে বয়সের হিসেবে প্রাপ্তবয়স্ক ধরা হবে। এর সময়সীমা সকলের ঐকমত্যে উভয়ের ক্ষেত্রে ১৮ বছর। এটাই হানাফী মাযহাবের গ্রহণযোগ্য অভিমত, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর এ মত। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এ উক্তি এবং এর উপরেই ফতোয়া। অবশ্য তাঁর অপর এক উক্তি বালকের বেলায় ১৫ বছর ও বালিকার বেলায় ১৭ বছর গণ্য হবে।

حَضَانَةٌ বা প্রতিপালনের অর্থ : حَضَانَةٌ শব্দটির حَاء বর্ণে যবর ও যের সহকারে এটি বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ– حَضَنَهٗ اَلصَّبِىَّ جَعَلَهٗ فِىْ حِضْنِهٖ 'সন্তানকে কোলে তুলে নেওয়া' এবং جَعَلَهٗ فِىْ صَدْرِهٖ সন্তানকে বক্ষে ধারণ করা।

শরিয়তের দৃষ্টিতে পিতামাতার মধ্যকার বিবাহ বন্ধন স্থির থাকা অবস্থায় অথবা তালাক বা মৃত্যুর কারণে তাদের বিবাহ নষ্ট হওয়ার অবস্থায় সন্তানের প্রতিপালনের অধিকার লাভ করাকে حَضَانَةٌ বলা হয়।

সন্তানের প্রতিপালনের জন্য কে সর্বাধিক অগ্রাধিকারী : সন্তান প্রতিপালনের জন্য সর্বাধিক অগ্রাধিকারী হলেন প্রথমত সন্তানের মাতা। চাই তার পিতামাতার মধ্যকার বিবাহ বন্ধন স্থির থাকুক অথবা তালাক বা মৃত্যুর কারণে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক, সর্বাবস্থায় সন্তানের মাতাই সর্বাধিক হকদার। কিন্তু তার উপর কোনো জোর-জবরদস্তি করা যাবে না। চাই সে তালাকপ্রাপ্তা হোক অথবা তালাকপ্রাপ্তা না হোক। তারপর তার মায়ের মা অর্থাৎ নানি আর নানি না থাকলে নানির মা, এমনিভাবে যত উপরে যাবে। যদি তাদের কেউই না থাকে, তবে সন্তানের পিতার মা অর্থাৎ দাদি। যদি দাদি না থাকে তবে দাদির মা, এমনিভাবে যতদূর যাবে। যদি তাদের কেউই না থাকে, তবে সন্তানের সহোদরা বোন। সহোদরা বোন না থাকলে বৈপিতৃয়ী বোন অতঃপর বৈমাতৃয়ী বোন। যদি এদেরও কেউ না থাকে, তবে সন্তানের খালা ক্রমানুসারে। অর্থাৎ সহোদরা খালা, তারপর বৈমাতৃয়ী খালা, তারপর বৈপিতৃয়ী খালা। যদি তাদের মধ্যেও কেউ না থাকে, তবে সন্তানের ফুফু ক্রমানুসারে। তবে শর্ত হলো এরা আজাদ হতে হবে। কারণ দাসী ও উম্মে ওয়ালাদের সন্তান লালনপালনের ভার গ্রহণ করার অধিকার নেই।

শিশুর অধিকার কি? ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে শিশুকে এ ব্যাপারে স্বাধীনতা দেওয়া যাবে না যে, সে তার পিতার সাথে যাবে– না মাতার সাথে যাবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে শিশুকে এ ব্যাপারে স্বাধীনতা দেওয়া যাবে। কোনো শিশু যখন স্বহস্তে পানাহার, জামা-কাপড় পরিধান এবং শৌচ ক্রিয়া ইত্যাদি করতে শিখে বা পারে তখন অন্যের প্রতিপালনের প্রয়োজন থাকে না। বয়সের হিসেবে এর জন্য ৭ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। আর এটাই সকলের গ্রহণযোগ্য মত। এর পূর্বে অগ্রাধিকার মায়ের, তার অবর্তমানে নানির। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে দাদির। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে খালার, তারপরে ভগ্নির, তারপরে ফুফুর। অবশ্য ৭ বছর বয়স পেরিয়ে যাবার পরে সকলের ঐকমত্যে অগ্রাধিকার পিতার। এ পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহে আলোচ্য বিষয়ের উপর মোটামুটি বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٢٣٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ عُرِضْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ اُحُدٍ وَاَنَا ابْنُ اَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً فَرَدَّنِيْ ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ وَاَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً فَاَجَازَنِيْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ هٰذَا فَرْقٌ مَا بَيْنَ الْمُقَاتِلَةِ وَالذُّرِّيَّةِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩২৩০. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বয়স যখন ১৪ বছর তখন উহুদ যুদ্ধে শরিক হবার উদ্দেশ্যে আমি নিজেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে পেশ করলাম; কিন্তু তিনি ফিরিয়ে দিলেন, পরে ১৫ বছর বয়সে খন্দকের যুদ্ধে পেশ করলে তিনি অনুমতি দিলেন। এ হাদীস শ্রবণে পরবর্তীকালে খলীফায়ে রাশিদ ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র.) বলেন, এ বয়স মুজাহিদ ও বালকের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী। –[বুখারী ও মুসলিম]

٣٢٣١ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) قَالَ صَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَشْيَاءَ عَلٰى اَنَّ مَنْ اَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ رَدَّهُ اِلَيْهِمْ وَمَنْ اَتَاهُمْ مِنَ

৩২৩১. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদাইবিয়ার সন্ধিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার কুরাইশগণের সাথে তিনটি বিষয়ে চুক্তি করেন। ১ম. মুশরিকগণের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তি মুসলমানদের নিকট উপস্থিত হলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে; কিন্তু মুসলমানদের কেউ কাফিরদের নিকট চলে গেলে তারা ফেরত পাঠাবে না। ২য়. পরবর্তী বছর ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ ও তিনদিন তথায় অবস্থান করতে

الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يَرُدُّوْهُ وَعَلٰى اَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ وَيُقِيْمَ بِهَا ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضٰى الْاَجَلُ خَرَجَ فَتَبِعَتْهُ اِبْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِيْ يَا عَمِّ يَا عَمِّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَاَخَذَ بِيَدِهَا فَاخْتَصَمَ فِيْهَا عَلِيٌّ وَ زَيْدٌ وَجَعْفَرٌ فَقَالَ عَلِيٌّ اَنَا اَخَذْتُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّيْ وَقَالَ جَعْفَرٌ بِنْتُ عَمِّيْ وَخَالَتُهَا تَحْتِيْ وَقَالَ زَيْدٌ بِنْتُ اَخِيْ فَقَضٰى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِخَالَتِهَا وَقَالَ اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْاُمِّ وَقَالَ لِعَلِيٍّ اَنْتَ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْكَ وَقَالَ لِجَعْفَرٍ اَشْبَهْتَ خَلْقِيْ وَخُلُقِيْ وَقَالَ لِزَيْدٍ اَنْتَ اَخُوْنَا وَمَوْلَانَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

পারে। [৩য়. আরবের যে কোনো গোত্র যে কোনো পক্ষের সাথে সন্ধি করতে পারবে।] সন্ধির শর্তানুযায়ী যখন পরবর্তী বছর তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন ও তথায় অবস্থানের সময়সীমা পার হলো, তখন তিনি মক্কা হতে রওয়ানা হলেন, ঐ সময়ে হযরত হামযা (রা.)-এর শিশুকন্যা চাচা চাচা বলে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করল। হযরত আলী (রা.) তাকে হাত ধরে তুলে নিলেন। ঐ কন্যার প্রতিপালনে হযরত আলী (রা.), হযরত যায়েদ (রা.) ও হযরত জা'ফর (রা.) তিনজনে বিবাদ বাঁধালেন। হযরত আলী (রা.) বললেন, আমি তাকে উঠিয়েছি এবং সে আমার চাচাতো ভগ্নি। [অতএব! আমি তার প্রতিপালনে অগ্রাধিকার রাখি।] হযরত জা'ফর (রা.) বললেন, আমার চাচাতো ভগ্নি এবং তার খালা আমার স্ত্রী। [অতএব, আমি তাকে প্রতিপালন করব।] হযরত যায়েদ (রা.) বললেন, আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী, [কাজেই আমি তাকে গ্রহণ করব।] রাসূলুল্লাহ ﷺ এ মাসআলায় খালার পক্ষে রায় দিয়ে বললেন, খালা মাতৃসমা। অতঃপর [সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে] আলীকে বললেন, তুমি আমার [আপনজন], আমি তোমার [আপনজন]; জা'ফরকে বললেন, তুমি আমার শারীরিক গঠন ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য লাভে ধন্য হয়েছ এবং যায়েদকে বললেন, তুমি আমাদেরই ভাই, আমাদের বন্ধু। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উক্ত কন্যাটির নাম ছিল উমামা। হযরত হামযা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন পরস্পর দুধ ভাই, এজন্যই মেয়েটি রাসূল ﷺ -কে চাচা বলেছিল। আবূ লাহাবের দাসী সুওয়াইবা উভয়কে আগে-পরে নিজের স্তনের দুধ পান করিয়েছিলেন। যায়েদকে ভাই বলার কারণে হলো, হয়তো ইসলামি ভাই অথবা দুধ ভাই। আর হুজুর ﷺ যায়েদ ও হামযার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করেছিলেন। এ হিসেবে যায়েদ– হযরত হামযার কন্যাকে ভাইঝি বলে দাবি করেছিলেন। আর হযরত জা'ফরের স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস এবং হযরত হামযার স্ত্রী সালমা বিনতে উমাইস ছিলেন পরস্পরা সহোদরা ভগ্নি। তবে এখানে এ কথাটি স্মরণ রাখতে হবে যে, এ কন্যাটির জন্য দাদি, নানি বা সহোদরা ভগ্নির পক্ষ হতে কোনো দাবি না থাকায় খালার পক্ষে রায় দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য হাদীসের প্রেক্ষিতে সর্বাবস্থায় খালার দাবি বা হক অগ্রাধিকার এ দলিল পেশ করা ঠিক হবে না।

হুদায়বিয়ার সন্ধি : মদিনায় হিজরতের ছয় বছর পর হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম একান্ত মনের ইচ্ছা ও হৃদয়ের অদম্য আগ্রহ নিয়ে পুণ্যভূমি ও নিজ বাড়িঘর দর্শন এবং ওমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে চৌদ্দশত সঙ্গী-সাথিদের এক বিশাল কাফেলা নিয়ে মদিনা হতে মক্কার পথে যাত্রা করেন। তাঁদের আগমনের সংবাদ জানতে পেরে কুরাইশগণ মুসলমানদের অগ্রগতি রোধ করার উদ্দেশ্যে খালিদ ও ইকরিমার নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করে। মক্কার সন্নিকটে খুযায়া গোত্রের বুদাইল ইবনে ওরাকার নিকট কুরাইশদের যুদ্ধাভিযানের সংবাদ পেয়ে তিনি অন্য পথ ধরলেন এবং মক্কার ৯ মাইল অদূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন।

মহানবী ﷺ বুদাইল মারফত কুরাইশগণকে একথা জানালেন যে, তাঁরা ওমরা করতে এসেছেন– যুদ্ধ করতে আসেননি। তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সততায় বিশ্বাস স্থাপন করে আবওয়া ইবনে মাসউদকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে মহানবী ﷺ -এর নিকট পাঠান; কিন্তু আবওয়ার দুর্ব্যবহারের জন্য আলোচনা ব্যর্থ হয়। এরপর হযরত মুহাম্মদ ﷺ কুরাইশদের নিকট সন্ধি করার জন্য প্রথমে খোবাস এবং পরে হযরত ওসমান (রা.)-কে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে কুরাইশ নেতাদের নিকট পাঠান। হযরত ওসমান (রা.)-কে তারা আটক করে রাখলে জনরব উঠে যে, কুরাইশগণ তাঁকে হত্যা করেছে। জীবন উৎসর্গ করে মুসলিম যোদ্ধাগণ হযরত ওসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য রাসূলের হাতে হাত রেখে বায়'আত নিলেন। একে 'বায়'আতুর

রিযওয়ান' বলা হয়। এ সংবাদ অবহিত হয়ে ভয়ে কুরাইশগণ হযরত ওসমান (রা.)-কে মুক্তি দেয় এবং সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে সুহাইলকে পাঠায়। হযরত মুহাম্মদ ﷺ সানন্দে এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অবশেষে অনেক বাকবিতণ্ডা ও আলাপ-আলোচনার পর উভয়পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধিপত্র সম্পাদিত হয়। ইসলামের ইতিহাসে এটাই 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' নামে খ্যাতি লাভ করে।

شُرُوْطُ الصُّلْحِ [সন্ধির শর্তাবলি] : হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রধান প্রধান শর্তাবলি নিম্নে উল্লিখিত হলো–

১. এ বৎসর মুসলমানগণ হজ সম্পাদন না করেই মদিনায় প্রত্যাবর্তন করবে।
২. কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে আগামী দশ বছরের মধ্যে যে কোনো প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকবে।
৩. যদি মুসলমানগণ ইচ্ছা করে, তবে তিনদিনের জন্য পরের বছর মক্কায় হজপালনের উদ্দেশ্যে আগমন করতে পারবে। মুসলমানদের অবস্থানকালে কুরাইশগণ মক্কা নগরী ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেবে।
৪. আগমনকালে মুসলমানগণ শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্য কোষবদ্ধ তরবারি ব্যতীত অন্যকোনো মারণাস্ত্র সঙ্গে আনতে পারবে না।
৫. আরবদের যে কোনো গোত্রের লোক হযরত মুহাম্মদ ﷺ অথবা কুরাইশদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে কোনো বাধা-নিষেধ থাকবে না।
৬. চুক্তির মেয়াদকালে জনসাধারণের পূর্ণ নিরাপত্তা রক্ষিত হবে এবং একে অপরের ক্ষতিসাধন করবে না। কোনো প্রকার লুণ্ঠন অথবা আক্রমণ চলবে না।
৭. কোনো মক্কাবাসী মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করলে মদিনার মুসলমানগণ তাকে আশ্রয় দিতে পারবে না। পক্ষান্তরে কোনো মুসলিম মদিনা হতে মক্কায় আগমন করলে মক্কাবাসী তাকে প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য থাকবে না।
৮. হজের সময় মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করতে এবং মক্কার বণিকগণ নির্বিঘ্নে মদিনার পথ ধরে সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করতে পারবে।
৯. মক্কার কোনো নাবালক তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে মুসলমানদের দলে যোগদান করতে পারবে না, করলে তাকে ফেরত দিতে হবে।
১০. মক্কায় অবস্থিত যে কোনো গোত্র উক্ত সন্ধির আওতায় কুরাইশ অথবা মুসলমান যে কোনো দলের সাথে যোগদান করতে পারবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٢٣٢ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ ابْنِيْ هٰذَا كَانَ بَطْنِيْ لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِيْ لَهُ سِقَاءً وَحَجْرِيْ لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِيْ وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِيْ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

৩২৩২. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শুআইব তাঁর পিতা– তিনি তাঁর [শুআইবের] দাদা আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন, জনৈকা নারী এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এ আমার পুত্র, আমার পেট তাঁর জন্য পাত্র ছিল, আমার বুক তাঁর জন্য মশক বা পানপাত্র স্বরূপ, আমার ক্রোড় তার জন্য দোলনা স্বরূপ। তার পিতা আমাকে তালাক দিয়েছে এবং এখন তাকে আমার নিকট হতে ছিনিয়ে নিতে চায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত নারীকে বললেন, ঐ সন্তান পালনে তোমার অগ্রাধিকার যতক্ষণ তুমি অন্যত্র বিবাহ না কর। –[আহমদ, আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সন্তান প্রতিপালনে কে অগ্রাধিকারী? সন্তানের লালনপালনের ব্যাপারে পিতামাতার মধ্যে সবচেয়ে বেশি অধিকারী কে? সে সম্পর্কে ইমামদের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

১. হযরত হাসান বসরী (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর এক বর্ণনানুযায়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে, আর তার প্রথম স্বামীর ঔরসে কোনো সন্তান থেকে থাকে, তবে ঐ সন্তানের লালনপালনের অধিকারী এ মহিলাই হবে। তাঁদের দলিল হলো, এ হাদীসটি– رُوِيَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ تَزَوَّجَتْ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَبَقِيَ وَلَدُهَا فِيْ كَفَالَتِهَا

আল্লামা ইবনুল মুনযির বলেন, সকল আলিম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ হয়ে গেলে মহিলার পূর্ব ঘরের সন্তান পালনের কোনো অধিকার থাকে না। হযরত আমর ইবনে শু'আইব বর্ণিত অত্র হাদীসটিই উক্ত অভিমতের ভিত্তিতে। ইমাম শাফেয়ী (র.)ও এ মতেরই প্রবক্তা।

২. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, মহিলার দ্বিতীয় বিবাহ যদি সন্তানের গায়রে মাহরামের সাথে হয়, তবে তার সন্তান পালনের কোনো অধিকার থাকবে না। পক্ষান্তরে মহিলার বিবাহ যদি সন্তানের কোনো মাহরাম যেমন সন্তানের চাচার সাথে তার মায়ের বিবাহ হয়, তবে সন্তান পালনের অধিকার হতে সে বঞ্চিত হবে না। নিম্নে হাদীসটি তিনি স্বীয় অভিমতের অনুকূলে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন–

عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ (رضـ) اَنَّهُ قَالَ جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ اَبِىْ اَنْكَحَنِىْ رَجُلًا لَا اُرِيْدُهُ وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِىْ فَاَخَذَ مِنِّىْ وَلَدِىْ فَدَعَا النَّبِىُّ اَبَا هَاشِمٍ ثُمَّ قَالَ لَهَا اِذْهَبِىْ فَانْكِحِىْ عَمَّ وَلَدِكِ -

وَعَنْ ٣٢٣٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ اَبِيْهِ وَاُمِّهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৩২৩৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক বালককে তার পিতা ও মাতার মধ্যে একজনকে [প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে] বেছে নেওয়ার অধিকার প্রদান করেন। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

পিতামাতার কোনো একজনকে সন্তানের গ্রহণ করার ব্যাপারে ইমামদের মতানৈক্য : উল্লেখ্য যে, কোনো সন্তান যখন নিজে নিজেই খাওয়া-দাওয়া, পানাহার, বস্ত্রাদি পরিধান এবং অজু-গোসল করতে সক্ষম হয় তখন তাকে অন্যের অমুখাপেক্ষী বলে অবহিত করা যাবে। ইমাম খাস্সাফ (র.) বলেন, সাধারণত এটা সাত বছরের সময়ই অর্জিত হয় এবং এর উপর ফতোয়া। সে যাহোক, সন্তানের সাত বছর বয়সে যদি তার পিতামাতার মাঝে তালাক বা অন্য কোনো কারণে বিচ্ছেদ ঘটে, তবে এমতাবস্থায় এ সন্তানের লালনপালনের দায়িত্ব কার উপর অর্পিত হবে, অথবা সন্তানই বা কাকে বেছে নিতে পারবে এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ اِسْحَاقَ (رحـ) : ইমাম ইসহাক (র.) বলেন, এমতাবস্থায় সন্তানের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিতে হবে। সে পিতা অথবা মাতার কোনো একজনকে পছন্দমতো নির্বাচন করে নিতে পারবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) আরো একটু বাড়িয়ে বলেন, সেই সন্তান যদি দাস ও দাসী হয় তবুও তার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিতে হবে। তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ اَبِيْهِ وَاُمِّهِ এ হাদীসকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, সন্তানের সাত বছর পূর্ণ হলে এবং এ সময় তার পিতামাতার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটালে তাদের কোনো একজনকে পছন্দমতো গ্রহণ করার অধিকার সন্তানের থাকবে না। পিতাই সেই সন্তানের সার্বিক তত্ত্বাবধানের অধিকারী হবে। কেননা, সন্তানের ইচ্ছার উপর যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তবে জ্ঞান ও বুদ্ধির অপরিপক্বতার কারণে সে এমন একজনকে বেছে নেবে যার নিকট এসে সে খেলাধুলা এবং দুষ্টামি করার সুযোগ পাবে। যা হবে তার জীবন নষ্টের কারণ। আর এজন্যই সন্তানকে এ ব্যাপারে স্বাধিকার দেওয়া যাবে না।

وَعَنْهُ ٣٢٣٤ قَالَ جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ زَوْجِىْ يُرِيْدُ اَنْ يَّذْهَبَ بِابْنِىْ وَقَدْ سَقَانِىْ وَنَفَعَنِىْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هٰذَا اَبُوْكَ وَهٰذِهِ اُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ اَيِّهِمَا شِئْتَ فَاَخَذَ بِيَدِ اُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ)

৩২৩৪. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা নারী এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলল, আমার স্বামী আমার সন্তানকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ সে আমাকে পানাহার করায়, আমার কাজে আসে। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত বালককে বললেন, এ তোমার পিতা, ঐ তোমার মাতা, তুমি যাকে ইচ্ছা গ্রহণ কর। সে তার মায়ের হাত ধরে চলে গেল।

–[আবূ দাউদ, নাসায়ী, দারিমী]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৩২৩৫ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ سُلَيْمَانَ مَوْلًى لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَادَّعَيَاهُ فَرَطَنَتْ لَهُ تَقُوْلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ زَوْجِيْ يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِيْ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ اِسْتَهِمَا عَلَيْهِ رَطَنَ لَهَا بِذٰلِكَ فَجَاءَ زَوْجُهَا وَقَالَ مَنْ يُحَاقُّنِيْ فِيْ ابْنِيْ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ لَا أَقُوْلُ هٰذَا إِلَّا أَنِّيْ كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ زَوْجِيْ يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِيْ وَقَدْ نَفَعَنِيْ وَسَقَانِيْ مِنْ بِئْرِ أَبِيْ عِنَبَةَ وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ مِنْ عَذْبِ الْمَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقُّنِيْ فِيْ وَلَدِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا أَبُوْكَ وَهٰذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ ـ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ لٰكِنَّهُ ذَكَرَ الْمُسْنَدَ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ)

৩২৩৫. অনুবাদ : হযরত হেলাল ইবনে উসামা মদিনার কারও মুক্ত দাস আবূ মায়মূনা সুলাইমান হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, একদা আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর নিকটে বসেছিলাম, এমন সময় পুত্রসন্তান [কোলে করে] এক অনারবীয় স্ত্রীলোক আসল, যাকে তার স্বামী তালাক দিয়ে পুত্রটি গ্রহণের দাবি করছে ও সে দিতে অস্বীকার করছে। স্ত্রীলোকটি ফারসিতে বলল, হে আবূ হুরায়রা! আমার স্বামী আমার সন্তানকে নিয়ে যেতে চায়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) তাদেরকে বললেন, তোমরা উভয়ে লটারি কর। তাকে এটা ফারসীতে বুঝিয়ে দিলেন। তার স্বামী এসে বলল, আমার পুত্রের ব্যাপারে কে আমার সাথে বিবাদ করতে চায়? হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, ইয়া আল্লাহ! আমি এ ফয়সালা এ জন্যই দিয়েছি যে, একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে বসাছিলাম। ঐ সময়ে তাঁর খেদমতে এক নারী এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামী আমার এ পুত্রকে নিয়ে যেতে চায়। অথচ সে আমার খেদমত করে এবং আবূ উতবার কূপ হতে [নাসায়ীর বর্ণনায় মিষ্টি পানি] এনে আমাকে পান করায়। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা উভয়ে লটারি কর। এতে তার স্বামী বলল, আমার পুত্রের ব্যাপারে কে আমার সাথে বিরোধ করে? এ কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ তোমার পিতা, এ তোমার মাতা, তুমি যাকে ইচ্ছা গ্রহণ কর, সে মায়ের হাত ধরল। -[আবূ দাউদ, নাসায়ী]

কিন্তু মুসনাদ গ্রন্থপ্রণেতা এ হাদীসকে উল্লেখ করেছেন এবং দারিমী হেলাল ইবনে উসামা হতে রেওয়ায়েত করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : যাকে ইচ্ছা গ্রহণের অধিকার পুত্রকে ঐ সময় প্রদান করা হয়েছে, যে সময়ে তার বুদ্ধি-বিবেচনা এসে গেছে। আলোচ্য হাদীসে পানি পান করানো ও খেদমত করা হতে এটাই বুঝা যাচ্ছে। পক্ষান্তরে সন্তান যদি এত অল্প বয়সের হয়, তখন তার জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা হয়নি, সে সময়ে মায়ের অগ্রাধিকার যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে কয়েক প্রকারের ফয়সালা দানের বিরোধের হানাফীগণ এভাবে সামঞ্জস্য প্রদান করেছেন। পরস্পরবিরোধী হাদীসের মধ্যে সমন্বয়ন সাধন করত সকল হাদীসের বিধান মেনে নেওয়া আমল বিল হাদীস বা হাদীসের নির্দেশের উপর আমল করা ও পালন করার উত্তম পন্থা। হানাফীগণ পরস্পরবিরোধী হাদীসের নির্দেশ পালনে সাধারণত এ পন্থা-ই গ্রহণ করেছেন।

كِتَابُ الْعِتْقِ
অধ্যায় : দাস মুক্ত করা

اَلْعِتْقُ-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْعِتَاقُ বা اَلْعِتْقُ এ শব্দদ্বয়ের আভিধানিক অর্থ হলো– শক্তি, প্রাবল্য বা দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়া। দাস থাকা অবস্থায় মানুষ অসহায় ও অক্ষম। তাই দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করাটাই তার জন্য শক্তি ও প্রাবল্য।

اَلْعِتْقُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : عِتْق শরিয়ত কর্তৃক প্রদত্ত ঐ শক্তিকে বলা হয়, যার মাধ্যমে মানুষ কোনো বস্তুর মালিক হওয়া, সাক্ষ্য প্রদান করা, অভিভাবক হওয়া এবং নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকারী হয়।

শরিয়তে আজাদির মর্যাদা : عِتْق বা আজাদি মানুষকে তার জন্মগত অধিকার প্রদান করে। গোলামির শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকার কারণে যার এ জন্মগত অধিকার খর্ব হয়েছে– عِتْق বা আজাদির দ্বারা তার এ অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে সে কোনো বস্তুর মালিক হওয়া, অভিভাবক হওয়া ও সাক্ষ্য দেওয়ার অধিকারী হয়। নিজ কন্যা বিবাহ দেওয়া ও মালের মাঝে تَصَرُّف [খরচ] করা সহ জুমার নামাজ, ঈদের নামাজ, হজ করা, জিহাদ করা ইত্যাদি ইবাদতের জন্য সে উপযুক্ত হয়। মোটকথা, সে স্বাধীন আজাদ লোকদের কাতারে এসে দাঁড়ায়। একজন স্বাধীন মানুষের যে সকল জন্মগত ও মৌলিক অধিকার রয়েছে তার জন্যও সে সকল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

দাস মুক্ত করার শর্ত : দাস মুক্ত করার জন্য শর্ত হলো, আজাদকারীর স্বাধীন স্বজ্ঞান ও প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে এবং ঐ দাসের মালিক হতে হবে।

اَقْسَامُ الْإِعْتَاقِ [আজাদ করার প্রকারসমূহ] : দাস মুক্ত করা সাধারণত পাঁচ প্রকার–

১. **ওয়াজিব :** যেমন কাফফারা আদায় করার জন্য দাস মুক্ত করা।

২. **মাসিয়াত :** যদি এমন প্রবল ধারণা হয় যে, যদি এ গোলামকে আজাদ করা হয়, তাহলে দারুল হরবে ভেগে যাবে অথবা মুরতাদ হয়ে যাবে অথবা চুরি ডাকাতি করবে, তখন আজাদ করার কারণে গুনাহগার হতে হবে।

৩. **মুবাহ :** যেমন কারো সম্মানার্থে অথবা কাউকে ছওয়াব পৌছানোর জন্য দাস মুক্ত করা।

৪. **ইবাদত :** যেমন শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কল্পে দাস মুক্ত করা।

৫. **মোস্তাহাব :** আবার কখনো কখনো দাস মুক্ত করা মোস্তাহাব।

ইসলামের উপর বিরুদ্ধবাদীদের একটি প্রশ্ন : ইসলাম বিদ্বেষীরা বলে থাকে ইসলামই দাসপ্রথার জন্ম দিয়েছে। আর মুসলমানরাই তাকে নিজেদের সভ্যতা সংস্কৃতির অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্নের উত্তর : ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় পূর্বেকার সকল উন্নত ও সভ্য জাতির মাঝে দাসপ্রথা বিদ্যমান ছিল। ইউরোপের প্রতিটি সম্প্রদায়ের মাঝে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। আর এ দাসপ্রথা উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এরপর তারা একমত হয়ে দাসপ্রথা বাতিল করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু অপার করুণার আধার মানবতার মহান মুক্তির দিশারী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -ই সর্বপ্রথম দাস-দাসী বানানোর সকল পুরনো প্রথা ও প্রচলনকে বাতিল ঘোষণা করেন। তিনি কেবল একটি পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দান করেন, তা হচ্ছে যারা যুদ্ধে বন্দি হয়ে দারুল ইসলামে আসে তাদেরকে গোলাম বানানো যাবে। তবে এটিও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুমতি সাপেক্ষ।

নবী করীম ﷺ এসব যুদ্ধবন্দিদের থেকে নাম মাত্র কিছু মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়াকে ভালো মনে করতেন। নবী করীম ﷺ এসব দাস মুক্ত করে দেওয়ার জন্য লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। নবী করীম ﷺ নিজে তেষট্টিটি দাস মুক্ত করে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

সুতরাং একথা প্রমাণিত হলো যে, ইসলামই সর্বপ্রথম দাসপ্রথা বিলুপ্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। আর আশরাফুর মাখলুকাত বা মানুষ হয়েও যারা গোলামি ও দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল ইসলামের বদৌলতে তারা মানুষের মর্যাদা ফিরে পায়।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٢٣٦ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً اَعْتَقَ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتّٰى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩২৩৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান দাসকে মুক্ত করবে আল্লাহ তা'আলা তার [আজাদকৃত দাসের] প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তার প্রতিটি অঙ্গকে দোজখের অগ্নি থেকে মুক্তি দান করবেন। এমনকি এ ব্যক্তির লজ্জাস্থানও তার [আজাদকৃত দাসের] লজ্জাস্থানের বিনিময়ে মুক্তি দেবেন। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উক্ত হাদীসের মধ্যে দুটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে−

১. **মুসলমান দাস মুক্ত করা :** বস্তুত মুসলমান দাস মুক্ত করা শর্ত নয়। যে কোনো দাস মুক্ত করলেই হাদীসে বর্ণিত ফজিলত লাভ করা যাবে। কিন্তু মুসলমান হওয়া শর্তের দ্বারা একথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুসলমান দাস মুক্ত করলে অমুসলিম দাসের তুলনায় অধিক ছওয়াব লাভ করা যাবে।

২. **প্রত্যেক অঙ্গ উল্লেখ করার পরও বিশেষভাবে লজ্জাস্থানের কথা উল্লেখ করার কারণ :** فَرْجٌ অর্থ− লজ্জাস্থান। এটা যৌনকর্মের অঙ্গ। এ অঙ্গের মাধ্যমে মানুষ জেনা করে থাকে। শিরকের পর জেনাই সবচেয়ে জঘন্য পাপ। এ হাদীসের মাঝে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা শরীরের এ অঙ্গকেও দোজখের আগুন থেকে মুক্তি দেবেন।

এ হাদীসের আলোকে কোনো কোনো আলেম মনে করেন যে, যে দাস মুক্ত করবে সে দাস পুরুষত্বহীন ও লিঙ্গবিহীন না হওয়া মোস্তাহাব। আবার কেউ কেউ বলেন, পুরুষের জন্য দাস ও নারীর জন্য দাসী মুক্ত করা মোস্তাহাব, যাতে পরিপূর্ণভাবে এক অঙ্গ অপর অঙ্গের বিনিময় হয়ে যায়।

وَعَنْ ٣٢٣٧ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَجِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِهٖ قَالَ قُلْتُ فَاَىُّ الرِّقَابِ اَفْضَلُ قَالَ اَغْلَاهَا ثَمَنًا وَاَنْفَسُهَا عِنْدَ اَهْلِهَا قُلْتُ فَاِنْ لَمْ اَفْعَلْ قَالَ تُعِيْنُ

৩২৩৭. অনুবাদ : হযরত আবূ যর গেফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন কাজ সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। হযরত আবূ যর (রা.) বলেন, আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, কোন দাস মুক্ত করা উত্তম? তিনি বললেন, যার মূল্য অধিক এবং যে তার মনিবের নিকট অধিক প্রিয়। আমি আরজ করলাম, যদি আমি এমনটি না করতে পারি। [আমার সামর্থ্য না থাকে] তিনি বললেন,

صَانِعًا اَوْ تَصْنَعُ لِاَخْرَقَ قُلْتُ فَاِنْ لَمْ اَفْعَلْ قَالَ تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلٰى نَفْسِكَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

তাহলে কোনো কর্মজীবীকে সাহায্য করবে অথবা কোনো অদক্ষ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কাজ করে দেবে। আমি পুনরায় আরজ করলাম, যদি আমি [এটাও করতে] সক্ষম না হই। [তখন কি করব?] তিনি বললেন, তুমি মানুষের কোনো ক্ষতি করবে না। কেননা এটাও একটি সদকা যা তুমি নিজের জন্য করতে পার। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] :

কর্মজীবীকে সাহায্য করার অর্থ : এখানে কর্ম দ্বারা ঐ কাজ উদ্দেশ্য যা মানুষের উপার্জনের মাধ্যম। তা কারিগরি হোক অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য হোক। কেউ যদি এমন কোনো পেশায় লেগে থাকে যা তার পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন মিটাতে পারে না, অথবা সে দুর্বল বা অক্ষমতার কারণে ঐ কর্ম সুচারু রূপে পরিচালনা করতে পারে না– উক্ত হাদীসে সে ব্যক্তিকে সাহায্য করতে বলা হয়েছে।

اَخْرَقُ-এর অর্থ : অদক্ষ, নির্বোধ বা উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে اَخْرَقُ বলা হয়। এখানে উদ্দেশ্য হলো যদি কেউ অনভিজ্ঞতা, অদক্ষতা বা অক্ষমতার দরুন নিজের পেশাগত কাজ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিতে সক্ষম না হয় তাহলে সে ব্যক্তিকে এ কাজ সমাধা করে দিতে বলা হয়েছে, যাতে তোমার সাহায্যে সে জীবিকা উপার্জনের প্রয়োজন মিটাতে পারে। অবশেষে নবী করীম ﷺ তাকে উপদেশ দিয়েছেন– যদি অপরকে এভাবে সাহায্য করা তোমার দ্বারা সম্ভব না হয়, তাহলে তোমার দ্বারা যেন কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٢٣٨ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عَلِّمْنِيْ عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ لَئِنْ كُنْتَ اَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ اَعْرَضْتَ الْمَسْئَلَةَ اَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ قَالَ اَوَ لَيْسَا وَاحِدًا قَالَ لَا عِتْقُ النَّسَمَةِ اَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا وَفَكُّ الرَّقَبَةِ اَنْ تُعِيْنَ فِيْ ثَمَنِهَا وَالْمِنْحَةَ الْوَكُوْفَ وَالْفَيْءَ عَلٰى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ فَاِنْ لَمْ تُطِقْ ذٰلِكَ فَاَطْعِمِ الْجَائِعَ وَاسْقِ الظَّمْاٰنَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَاِنْ لَمْ تُطِقْ ذٰلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ اِلَّا مِنْ خَيْرٍ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৩২৩৮. **অনুবাদ :** হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর দরবারে এসে বললেন, আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যে আমলটি করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। রাসূল ﷺ বললেন, যদিও তুমি অল্প কথায় প্রশ্ন করেছ কিন্তু তুমি ব্যাপক বিষয় জানতে চেয়েছ। [আচ্ছা যাও] তুমি একটি প্রাণী আজাদ কর এবং দাস মুক্ত কর। গ্রাম্য লোকটি বলল, এ উভয়টি কি একই কাজ নয়? নবী করীম ﷺ বললেন, না [উভয়টি এক নয়]। কেননা প্রাণী আজাদ করার অর্থ হলো তুমি একাকী একটি প্রাণী আজাদ করে দেবে। আর দাস মুক্ত করার অর্থ হলো তুমি তার মুক্তির মধ্যে কিছু মূল্য প্রদান করে সাহায্য করবে। [এছাড়াও জান্নাতে প্রবেশকারী আমলের মধ্যে আরো কিছু হলো] প্রচুর দুগ্ধ প্রদানকারী পশু দান করা এবং এমন অত্যাচারী নিকটাত্মীয়ের প্রতি অনুগ্রহ করা যে তোমার প্রতি জুলুম করে। যদি তুমি এসব কাজ করতে সক্ষম না হও তাহলে ক্ষুধার্তকে আহার করাও এবং পিপাসুকে পান করাও। সৎকর্মের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ হতে বারণ কর। আর যদি তুমি একাজ করতেও সক্ষম না হও তাহলে [অন্তত] উত্তম কথা ব্যতীত তোমার জিহ্বাকে বন্ধ রাখ। –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

প্রাণী আজাদ করা এবং দাস মুক্ত করার মাঝে পার্থক্য : عِتْقُ النَّسَمَةِ বা প্রাণী আজাদ করার অর্থ হলো– একান্ত মালিকানাধীন দাস বা গোলাম আজাদ করা। আর فَكُّ الرَّقَبَةِ বা দাস মুক্ত করার অর্থ হলো অন্য কারো দাস মুক্তিতে সহযোগিতা করা। যেমন কোনো গোলাম তার মনিবের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। যদি সে নির্দিষ্ট অংকের টাকা পরিশোধ করতে পারে তাহলে সে গোলামি থেকে মুক্তি পাবে। হাদীসের পরিভাষায় এ জাতীয় গোলামকে 'মুকাতাব' বলা হয়। উক্ত হাদীসে এ জাতীয় গোলামকে তার মুক্তির জন্য সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوْفُ**-এর অর্থ :** مِنْحَةٌ - مِيْم-এর নিচে যের সহকারে অর্থ– দান, এখানে উদ্দেশ্য ঐ ছাগল বা উষ্ট্রী যা কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে দেওয়া হয়– তার দুধ, পশম ইত্যাদির মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার জন্য।

وَكُوْفٌ : প্রচুর দুগ্ধবতী জানোয়ারকে বলা হয়।

قَوْلُهُ فَكُفَّ لِسَانَكَ اِلَّا مِنْ خَيْرٍ**-এর মর্মার্থ :** অন্যত্র এ জাতীয় আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে– مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে তার উচিত উত্তম কথা বলা অথবা চুপ থাকা।' এ দুটি হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিজ জিহ্বাকে পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখবে। কখনো যেন মুখ দিয়ে অন্যায়, অশ্লীল ও অযথা কথা বের না হয়। যখনই কথা বলবে তখনই যেন মুখ দিয়ে কল্যাণকর ও ভালো কথা বের হয়। কেননা মুখ সংযত রাখাতে পারলে এমনিই বহু গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায়।

وَعَنْ ٣٢٣٩ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ بَنٰى مَسْجِدًا لِيُذْكَرَ اللّٰهُ فِيْهِ بُنِيَ لَهٗ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ وَمَنْ اَعْتَقَ نَفْسًا مُسْلِمَةً كَانَتْ فِدْيَتُهٗ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৩২৩৯. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে কোনো ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করল যে, সেখানে আল্লাহ তা'আলার জিকির [নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির ইত্যাদি] করা হবে। তার জন্য জান্নাতে একটি [বিশাল] গৃহ নির্মাণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান গোলামকে আজাদ করবে তার এ কাজ তার জন্য দোজখ হতে মুক্তিপণ হিসেবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে [জিহাদ, হজের সফরে, ইলম অর্জনে ব্যস্ত থেকে] বৃদ্ধ হয়েছে। তার এ বৃদ্ধ হওয়া কিয়ামতের দিবসে তার জন্য নূর হবে। –[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ : মাসাবীহ-এর সংকলক এ রেওয়ায়েত তার নিজ সনদে শরহে সুন্নাহ-এর মাঝে উল্লেখ করেছেন। رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মেশকাত শরীফের সংকলক এ হাদীস শরহে সুন্নাহ ব্যতীত অন্য কোনো হাদীসের কিতাবে পাননি।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٢٤٠ الْغَرِيْفِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ اَتَيْنَا وَاثِلَةَ بْنَ الْاَسْقَعِ فَقُلْنَا حَدِّثْنَا حَدِيْثًا لَيْسَ فِيْهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ فَغَضِبَ وَقَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَقْرَأُ وَمَصْحَفُهُ مُعَلَّقٌ فِيْ بَيْتِهِ فَيَزِيْدُ وَيَنْقُصُ فَقُلْنَا اِنَّمَا اَرَدْنَا حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ صَاحِبٍ لَنَا اَوْجَبَ يَعْنِى النَّارَ بِالْقَتْلِ فَقَالَ اَعْتِقُوْا عَنْهُ يَعْتِقِ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৩২৪০. **অনুবাদ :** হযরত গারীফ ইবনে দায়লামী [তাবেয়ী] বলেন, একবার আমরা হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রা.)-এর নিকট গিয়ে বললাম, আমাদেরকে একটি হাদীস বর্ণনা করুন যার মধ্যে কমবেশি যেন না হয়। [একথা শুনে] তিনি ভীষণ রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, তোমাদের মাঝে কোনো ব্যক্তি [দিনরাত] কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করে আর কুরআন মাজীদ তার গৃহে ঝুলন্ত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। তা সত্ত্বেও [ভুলবশত] কমবেশি হয়ে যায়। আমরা আরজ করলাম, আমাদের উদ্দেশ্য কেবল এই যে, আপনি সরাসরি নবী করীম ﷺ থেকে যে হাদীস শুনেছেন [তা আমাদেরকে শুনান]। তখন তিনি বললেন, আমরা [একদিন] আমাদের এমন এক সঙ্গীর ব্যাপারে নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসলাম যে ব্যক্তি অন্য এক লোককে হত্যা করে নিজের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করে ফেলেছিল। তখন তিনি আমাদেরকে বললেন, ঐ ব্যক্তির পক্ষ হতে একটি গোলাম আজাদ করে দাও। আল্লাহ তা'আলা গোলামের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময় তার [হত্যাকারীর] প্রতিটি অঙ্গকে দোজখের আগুণ থেকে মুক্তি দেবেন। -[আবূ দাউদ, নাসাঈ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রা.) মনে করেছেন, গারীফ ইবনে দায়লামী (র.) তাঁর নিকট হুবহু ঐ শব্দে হাদীস শুনতে চেয়েছেন যে শব্দে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন, তাই তিনি রাগান্বিত হয়েছেন এবং এভাবে উত্তর দিয়েছেন– তোমরা দিনরাত কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত কর। তেলাওয়াত কালে তোমাদের গৃহে বা তোমাদের নিকট কুরআন মাজীদ খুলে দেখে নিতে পার। এতদসত্ত্বেও তোমরা তেলাওয়াতে ভুল কর। কোথাও কোনো শব্দ ছেড়ে দাও আবার কোথাও কোনো শব্দ বৃদ্ধি কর। সুতরাং পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও শব্দ কমবেশি হয়ে যায়। তখন হযরত গারীফ ইবনে দায়লামী (র.) পরিষ্কার করে বললেন, আমাদের উদ্দেশ্য তা নয় যা আপনি বুঝেছেন; বরং আমাদের উদ্দেশ্য হলো, আমাদের নিকট এমনভাবে হাদীস বর্ণন করুন যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বক্তব্য ও উদ্দেশ্য কমবেশি না হয়। শব্দ কমবেশি হয় হোক।

قَوْلُهُ اَوْجَبَ يَعْنِى النَّارَ بِالْقَتْلِ-এর অর্থ : এ বাক্যে কোনো মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং সম্ভবত নিহত লোকটি ছিল معاهد [নিরাপত্তাপ্রাপ্ত]। ভুলবশত তাকে হত্যা করা হয়েছে। আর হত্যাকারীর ওলী ও ওয়ারিশরা এই ধারণা পোষণ করেছিল যে, নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ভুলবশত হত্যা করলেও জাহান্নাম অবধারিত। কেননা অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে– دِمَائُهُمْ كَدِمَائِنَا 'তাদের রক্ত আমাদের রক্তের ন্যায় [হারাম]।' সুতরাং নবী করীম ﷺ তাদেরকে একটি গোলাম আজাদ করার নির্দেশ দিয়ে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এমন লোককে হত্যা করাও মহাগুনাহ। তবে এমন লোকের মুক্তির জন্য একটি গোলাম আজাদ করাই যথেষ্ট।

وَعَنْ ٣٢٤١ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الشَّفَاعَةُ بِهَا تُفَكُّ الرَّقَبَةُ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৩২৪১. অনুবাদ : হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এমন সুপারিশ করা সর্বোত্তম সদকা যে সুপারিশের দরুন কোনো লোক দাসত্ব হতে মুক্তি লাভ করতে পারে।

–[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সুপারিশ করে কোনো গোলামকে আজাদ করে দেওয়া অথবা কেউ তার গোলামকে হত্যা করতে চাইলে সুপারিশ করে তাকে বাঁচিয়ে দেওয়া সর্বোত্তম সদকা। এখানে সর্বোত্তম বলার অর্থ এই নয় যে, সব ধরনের কাজের মাঝে এটিই একমাত্র উত্তম; বরং হাদীসটির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো উত্তম কাজের মধ্যে এটাও একটি উত্তম কাজ।

بَابُ اِعْتَاقِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ وَشَرْيِ الْقَرِيْبِ وَالْعِتْقِ فِى الْمَرَضِ

পরিচ্ছেদ : অংশীদারি দাস মুক্ত করা ও নিকটাত্মীয়কে ক্রয় করা এবং অসুস্থাবস্থায় দাস মুক্ত করা

অংশীদারির ভিত্তিতে কোনো কোনো বস্তুর মালিক যেমন একাধিক ব্যক্তি হতে পারে তদ্রূপ অংশীদারির ভিত্তিতে একজন গোলামের মালিকও একাধিক ব্যক্তি হতে পারে। যৌথ মালিকদের থেকে কেউ যদি তার অংশ আজাদ করে দেয় তখন ঐ গোলামের বাকি অংশও আজাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিস্তারিত আলোচনা হাদীসের ব্যাখ্যায় আছে। আর কেউ যদি তার কোনো নিকটাত্মীয়কে গোলামরূপে ক্রয় করে তাহলে ক্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে সে আজাদ হয়ে যাবে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٢٤٢ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ فَاُعْطِيَ شُرَكَائَهُ حِصَصَهُمْ وَعُتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَاِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩২৪২. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো [যৌথ মালিকানাধীন] গোলামের মধ্যে নিজের মালিকানাধীন অংশটুকু আজাদ করল [তার জন্য উত্তম হলো] যদি তার নিকট কোনো ন্যায়পরায়ণ লোকের নিরূপিত মূল্য অনুযায়ী দাসটির পূর্ণ মূল্য পরিমাণ সম্পদ থাকে, তখন সে অপরাপর অংশীদারদেরকে তাদের নিজ নিজ অংশের মূল্য পরিশোধ করে দেবে। সেই গোলাম তার পক্ষ থেকে আজাদ হয়ে যাবে। অন্যথায় সে যতটুকু অংশ আজাদ করেছে ততটুকু অংশই আজাদ হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

যৌথ মালিকানাধীন গোলাম আজাদ করার মাসআলা : যৌথ মালিকানাধীন গোলামের কোনো এক অংশীদার যদি তার অংশ আজাদ করে দেয় তাহলে বাকি অংশগুলোও আজাদ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ মাসআলার মধ্যে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে–

১. مَذْهَبُ إِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে যদি কেউ যৌথ গোলামের নিজ অংশ আজাদ করে দেয় তাহলে আজাদকারী যদি ধনী হয় [অর্থাৎ তার নিকট যদি পূর্ণ গোলাম আজাদ করার মতো, সম্পদ থাকে] তাহলে ঐ গোলাম তার পক্ষ থেকে আজাদ হয়ে যাবে এবং অন্যান্য শরিকদেরকে তাদের স্ব-স্ব অংশের মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

আর যদি আজাদকারী দরিদ্র হয় তাহলে যে অংশ সে আজাদ করেছে কেবল ততটুকুই আজাদ হবে। আর বাকি অংশগুলো গোলাম হিসেবে অবশিষ্ট থাকবে। অন্যদেরকে তাদের অংশ আজাদ করতে বাধ্য করা যাবে না।

২. مَذْهَبُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) : ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যদি আজাদকারী ব্যক্তি ধনী হয় তাহলে অন্যান্য শরিকদেরকে সে ক্ষতিপূরণ দিয়ে গোলাম আজাদ করে দেবে। আর যদি দরিদ্র হয় তাহলে "ইসতিসআ" করাবে অর্থাৎ গোলামকে শ্রমে খাটিয়ে প্রত্যেক অংশীদারগণ তাদের অংশের মূল্য পরিমাণ উসুল করে নেবেন।

৩. مَذْهَبُ إِمَامِ أَبِي حَنِيْفَةَ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যদি আজাদকারী ব্যক্তি ধনী হয়, তাহলে অন্যান্য শরিকরা হয়তোবা সাথে সাথে তাদের অংশ আজাদ করে দেবে অথবা আজাদাকারী থেকে স্ব-স্ব অংশের ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করবে অথবা গোলামকে শ্রমে খাটিয়ে যার যার অংশের মূল্য পরিমাণ উসুল করে নেবে।

আর যদি আজাদকারী ব্যক্তি দরিদ্র হয় তাহলে শরিকরা হয়তোবা নিজ নিজ অংশ আজাদ করে দেবে অথবা গোলামকে শ্রমে খাটিয়ে স্ব-স্ব অংশের মূল্য উসূল করে নেবে।

দাস মুক্ত করার মধ্যে বিভক্তি হতে পারে কি? হ্যাঁ দাস মুক্ত করার মধ্যে বিভক্তি হতে পারে। অর্থাৎ কিছু অংশ আজাদ হবে এবং কিছু অংশ আজাদ হবে না। এটা সম্ভব ও বৈধ। মূলত আমাদের আইম্মায়ে ছালাছার উল্লিখিত মতবিরোধ দুটি উসুলের উপর নির্ভরশীল–

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট গোলাম আজাদের মাঝে বিভক্তি হতে পারে পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর নিকট বিভক্তি হতে পারে না।

২. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট আজাদকারী ব্যক্তির ধনী হওয়া গোলামকে শ্রমে খাটাতে নিষিদ্ধ করে না; কিন্তু সাহেবাইনের নিকট নিষিদ্ধ করে।

গোলাম আজাদের মধ্যে تَجَزِّىْ বা বিভক্তির দলিল :

১. আমাদের আলোচিত হাদীসের মাঝে إِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ বাক্য দ্বারা স্পষ্টভাবে تَجَزِّىْ বা বিভক্তি প্রমাণিত হয়।

২. عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كَانَ لَهُمْ غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ طَهْمَانُ أَوْ ذَكْوَانُ فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَهُ فَجَاءَ الْعَبْدُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَعْتِقُ فِي عِتْقِكَ وَتَرِقُّ فِي رِقِّكَ . (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ بَيْهَقِيْ)

تَجَزِّىْ বা বিভক্তি বৈধ না হওয়ার দলিল :

عَنْ أَبِي الْمُلَيْحِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ غُلَامٍ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَيْسَ لِلّٰهِ شَرِيْكٌ فَأَجَازَ عِتْقَهَا . (أَبُو دَاوُدَ . مِشْكٰوة جـ٢ ٢٩٥)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি তার গোলামের একাংশ আজাদ করল। রাসূল ﷺ -কে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি বললেন, আল্লাহর কোনো শরিক নেই। এরপর তিনি পূর্ণ গোলাম আজাদ করে দিতে বললেন।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিলের জবাব : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট সাহেবাইন (র.)-এর উল্লেখিত হাদীসের অর্থ হলো, নবী করীম ﷺ মালিককে পূর্ণ গোলাম আজাদ করে দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন।

গোলামকে শ্রমে খাটানোর ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল :

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ شِقْصًا فِىْ عَبْدٍ اُعْتِقَ كُلُّهُ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ اُسْتُسْعِىَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

উক্ত হাদীসের মাঝে فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اُسْتُسْعِىَ الْعَبْدُ مِنْ غَيْرِ مَشْقُوْقٍ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল। এখানে বলা হয়েছে, যদি আজাদকারীর নিকট সম্পদ না থাকে তাহলে গোলামকে শ্রমে খাটানো হবে। দরিদ্র হওয়ার সময় "ইসতিসআ" প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে খুবই স্পষ্ট। আর আজাদকারী ধনী হলে যদিও ইসতিসআ সম্পর্কে হাদীসের মাঝে কিছু উল্লেখ নেই, কিন্তু কোনো হাদীসে তা নাকচও করা হয়নি।

"ইসতিসআ" নাকচ করে সাহেবাইন (র.)-এর দলিল : উক্ত হাদীসে مَنْ اَعْتَقَ شِقْصًا فِىْ عَبْدٍ اُعْتِقَ كُلُّهُ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ দিয়ে সাহেবাইন (র.) দলিল পেশ করেছেন। অর্থাৎ আজাদকারী যদি ধনী হয় তাহলে অন্যান্য শরিকদেরকে তাদের স্ব-স্ব অংশের মূল্য পরিশোধ করে দেবে। সুতরাং এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যদি আজাদকারী ধনী হয় তাহলে ইসতিসআ বা শ্রমে খাটানো যাবে না।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিলের জবাব : উক্ত হাদীসের মাঝে ইসতিসআকে আজাদকারী দরিদ্র হওয়ার উপর শর্তারোপ করা হয়েছে। তবে আজাদকারী ধনী হওয়ার সময় ইসতিসআকে নাকচ করে না। কেননা যে বস্তুকে কোনো শর্তের সাথে যুক্ত করা হয় শর্ত পাওয়ার সময় তা বিদ্যমান হওয়া জরুরি হয়; কিন্তু শর্ত না পাওয়া গেলে তা না হওয়া জরুরি নয়; উদাহরণস্বরূপ কেউ তার গোলামকে বলল– اِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَاَنْتَ حُرٌّ 'যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর তাহলে আজাদ।' সুতরাং ঘরে প্রবেশ করার সাথে সাথে গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ঘরে প্রবেশ না করলে আজাদ না হওয়া জরুরি নয় বরং এ অবস্থায়ও আজাদ হতে পারে। যেমন– মনিব কোনো শর্ত ব্যতীত اَنْتَ حُرٌّ 'তুমি আজাদ' বলে দিল। তদ্রূপভাবে আজাদাকারী ধনী হওয়া সত্ত্বেও গোলামকে ইসতিসআ বা শ্রমে খাটানো যেতে পারে।

وَعَنْ ٣٢٤٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ شِقْصًا فِىْ عَبْدٍ اُعْتِقَ كُلُّهُ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ اُسْتُسْعِىَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩২৪৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি যৌথ মালিকানাধীন গোলামের মাঝে নিজের অংশ আজাদ করে দেয়। আর তার নিকট যদি [অন্যান্য অংশীদারদের অংশের মূল্য পরিশোধ করার মতো] সম্পদ থাকে তাহলে তার পক্ষ থেকে গোলামটি পুরাপুরিভাবে আজাদ হয়ে যাবে। আর যদি তার মালসম্পদ না থাকে তখন গোলামটিকে তার সাধ্যমতো শ্রমে খাটানো হবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٢٤٤ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضـ) اَنَّ رَجُلًا اَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوْكِيْنَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَزَّاهُمْ اَثْلَاثًا ثُمَّ اَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَاَعْتَقَ اِثْنَيْنِ وَاَرَقَّ اَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيْدًا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ النَّسَائِىُّ عَنْهُ وَذَكَرَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ لَا اُصَلِّىَ عَلَيْهِ

৩২৪৪. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে তার ছয়টি গোলামকে আজাদ করে দিল। অথচ ঐগুলি ব্যতীত তার অন্য কোনো সম্পদ ছিল না। [সে ব্যক্তির মৃত্যুর পরে রাসূল ﷺ যখন বিষয়টি জানতে পারলেন] রাসূলুল্লাহ ﷺ সে গোলামদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং তিন ভাগে বিভক্ত করলেন। অতঃপর লটারির মাধ্যমে তাদের দুজনকে আজাদ করে দিলেন এবং চারজনকে [পূর্বের ন্যায়] গোলামই রেখে দিলেন। পরে তিনি আজাদকারী ব্যক্তিকে কঠোর বাক্য বললেন [তিরস্কার করলেন]। এটা মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত। আর উক্ত বর্ণনাকারী থেকেই ইমাম নাসাঈ (র.) বর্ণনা করেছেন। সেখানে তিনি 'কঠোর বাক্য'

بَدَلَ وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيْدًا وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ دَاوُدَ وَقَالَ لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ اَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِيْ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ .

বলার স্থানে 'আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে, আমি তার জানাজার নামাজ পড়ব না' উল্লেখ করেছেন। আর আবূ দাউদের রেওয়ায়েতে আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন 'যদি আমি তাকে দাফন করার পূর্বে সেখানে পৌঁছতাম তাহলে তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হতো না।'

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَاَعْتَقَ اِثْنَيْنِ : নবী করীম ﷺ তাদের দুজনকে আজাদ করে দিলেন। অর্থাৎ নবী করীম ﷺ ছয়জন গোলামকে দুজন দুজন করে তিন ভাগ করে লটারি দিলেন। লটারিতে যে দুজনের নাম উঠল সে দুজনকে আজাদ করে দিলেন আর বাকি চারজনকে গোলামই রেখে দিলেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যদি কেউ মৃত্যুকালে তার সকল গোলাম আজাদ করে দেয় তাহলে তা কেবল এক তৃতীয়াংশের মধ্যে কার্যকরী হবে। কেননা মৃত্যু রোগের সময় তার সম্পদের সাথে ওয়ারিশদের হক সম্পৃক্ত হয়। শুধু গোলামই নয় বরং ঐ সময় তার দান, সদকা, অসিয়ত ও হেবার মধ্যে কেবল এক তৃতীয়াংশের মধ্যে তার কথা কার্যকরী হবে।

উল্লিখিত মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে প্রতিটি গোলামের এক তৃতীয়াংশ আজাদ হয়ে যাবে। অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশের জন্য গোলাম শ্রমে খেটে ওয়ারিশদের মালিকানা থেকে মুক্তি লাভ করবে। আর এ হাদীসটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা। তখন লটারির মাধ্যমে কোনো বিষয়ের মীমাংসা করা জায়েজও ছিল। পরবর্তীতে লটারিকে জুয়ার সদৃশ বলে নাজায়েজ ঘোষণা করা হয়। তখন এ বিধানও রহিত হয়ে যায়।

কঠোর কথা বলার কারণ : নবী করীম ﷺ দাস মুক্তকারী ব্যক্তির উপর চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কারণ সে তার ছেলে সন্তান তথা ওয়ারিশদেরকে বঞ্চিত করে তার সমুদয় সম্পদ তথা ছয়টি গোলামই আজাদ করে দিয়েছিল। এটা ছিল ওয়ারিশদের উপর জুলুম। তাই নবী করীম ﷺ দুটি গেলামকে আজাদ করে বাকি চারজনকে গোলাম হিসেবে রেখে দিয়ে তার ওয়ারিশদের উপর অনুগ্রহ করেন।

وَعَنْ ٣٢٤٥ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَجْزِيْ وَلَدٌ وَالِدَهُ اِلَّا اَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩২৪৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো সন্তান তার পিতার প্রতিদান দিতে পারবে না। হ্যাঁ যদি তার পিতাকে সে দাস অবস্থায় পায় এবং ক্রয় করে আজাদ করে দেয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالِدَهُ : এ হাদীসের মাঝে وَالِدَهُ শব্দ দ্বারা পিতাকে বুঝানো হয়নি; বরং পিতামাতা উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। পিতামাতার হক অপরিসীম। সন্তান কখনো তার পিতামাতার ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না। তবে পিতামাতা যদি কারো দাসত্বে থাকে আর সন্তান ক্রয় করে আজাদ করে দেয় তাহলে পিতামাতার ঋণ পরিশোধ করতে পারবে।

নিকটতম আত্মীয়কে ক্রয় করা : যদি কেউ তার পিতামাতা বা মাহরাম আত্মীয়কে ক্রয় করে তাহলে আজাদ করা ব্যতীতই তারা আজাদ হয়ে যাবে। তবে হাদীসের প্রকাশ্য ভাষ্য দ্বারা মনে হচ্ছে ক্রয় করার পর আজাদ করতে হবে অন্যথায় আজাদ হবে না।

নিকটতম আত্মীয়কে শুধু ক্রয় করার দ্বারা আজাদ হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ :

مَذْهَبُ اَصْحَابِ الظَّوَاهِر : আসহাবে যাওয়াহেরের মতে যদি কেউ ক্রয় সূত্রে বা অন্য কোনো কারণে মাহরাম আত্মীয়ের মালিক হয় তাহলে তাকে আজাদ করা ব্যতীত তারা আজাদ হবে না। আসহাবে যাওয়াহের দলিল হিসেবে উল্লিখিত হাদীসকে পেশ করে থাকেন।

مَذْهَبُ الْجُمْهُوْر : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে মাহরাম তথা নিকটতম আত্মীয়দের মালিক হওয়া মাত্রই তারা আজাদ হয়ে যাবে; নতুনভাবে আজাদ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

জমহুরের দলিল : عَنْ سَمُرَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার কোনো মাহরাম তথা নিকটতম আত্মীয়দের মালিক হয় তখন সাথে সাথে সে আজাদ হয়ে যায়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইসহাক (র.), ছাওরী (র.) ও ইমাম শা'বী (র.)-এর নিকট উক্ত হাদীস عَامٌ বা ব্যাপক অর্থ বুঝানোর কারণে প্রত্যেক এমন নিকটতম আত্মীয় অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের একজনকে পুরুষ ও অপরজনকে নারী ধরে নেওয়া হলে স্থায়ীভাবে হারাম হয়। জন্মগত কারণে হোক বা অন্য কোনো কারণে হোক। ক্রয় বা অন্য কোনো সূত্রে কেউ এসব নিকট-আত্মীয়ের মালিক হলে সাথে সাথে তারা আজাদ হয়ে যাবে।

তাই ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (র.)-এর নিকট এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী যাদের সাথে মালিকের জন্মগত সম্পর্ক থাকে যেমন– পিতামাতা, দাদা, নানি প্রমুখ কেবল তারাই আজাদ হবে– ভাই বোন প্রমুখের মালিক হওয়ার দ্বারা আজাদ হবে না।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ :

১. এভাবে উল্লিখিত হাদীসে فَيُعْتِقَهُ -এর মাঝে فَاء সববিয়্যাতের অর্থ দেওয়ার জন্য এসেছে। অর্থাৎ কেউ যদি তার পিতাকে দাস অবস্থায় পায় এবং আজাদ করার জন্য ক্রয় করে, তাহলে শুধু ক্রয় করার দ্বারাই আজাদ হয়ে যাবে।

২. সূরা বাকারায় উল্লিখিত فَتُوْبُوْآ اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْآ اَنْفُسَكُمْ -এর মাঝে فَاء যে অর্থের জন্য এসেছে فَيُعْتِقَ -এর মাঝেও সেই অর্থ দেবে। অর্থাৎ এ আয়াতের মাঝে তওবা দ্বারা হত্যা উদ্দেশ্য। তদ্রূপ উক্ত হাদীসের মাঝে ক্রয় দ্বারা আজাদ করা উদ্দেশ্য।

وَعَنْ ٣٢٤٦ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوْكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّيْ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَفَعَهَا اِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَاِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِاَهْلِكَ فَاِنْ فَضَلَ عَنْ اَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِيْ قَرَابَتِكَ فَاِنْ فَضَلَ عَنْ ذِيْ قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهٰكَذَا وَهٰكَذَا يَقُوْلُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِيْنِكَ وَشِمَالِكَ.

৩২৪৬. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, এক আনসারী সাহাবী তার একটি দাসকে মুদাব্বারে পরিণত করলেন। অথচ ঐ একটি মাত্র দাস ব্যতীত তার অন্য কোনো সম্পদ ছিল না। পরে নবী করীম ﷺ-এর নিকট সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন, আমার নিকট হতে এ গোলামটি কে ক্রয় করবে? তখন হযরত নুআঈম ইবনে নাহ্হাম (রা.) আটশত দিরহামের বিনিময় তাকে ক্রয় করে নিলেন। –[বুখারী ও মুসলিম] আর মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে, নুআঈম ইবনে আব্দুল্লাহ আল আদাভী আটশত দিরহামের বিনিময় তাকে ক্রয় করলেন এবং আটশত দিরহাম নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে পেশ করলেন। অতঃপর নবী করীম ﷺ [যার গোলাম ছিল] তাকে দিরহামগুলি দিয়ে বললেন, এগুলি তুমি প্রথমে নিজের প্রয়োজনে ব্যয় কর। যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ কর। তারপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে তোমার নিকটাত্মীয়দের জন্য ব্যয় কর। এরপরও যদি কিছু বেঁচে যায় তাহলে তা এভাবে এভাবে খরচ কর। অর্থাৎ তোমার সম্মুখে ও ডানে বামের লোকদের জন্য খরচ কর। [অর্থাৎ তোমার আশ-পাশের দরিদ্র লোকাদের জন্য খরচ কর।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُدَبَّرُ-এর পরিচয় : مُدَبَّرٌ শব্দটি تَدْبِيْرٌ থেকে উদ্‌গত অর্থ– মৃত্যুর পর দাস মুক্ত করা। মুদাব্বার দু প্রকার– মুদাব্বারে মুতলাক, মুদাব্বারে মুকাইয়্যাদ।

مُدَبَّرٌ مُطْلَقٌ বলা হয় কোনো ব্যক্তি তার গোলামকে বলল, আমার মৃত্যুর পর তুমি আজাদ। আর مُدَبَّرٌ مُقَيَّدٌ বলা হয় কোনো ব্যক্তি তার গোলামকে বলল, আমি যদি এই রোগে বা এই সফরে মৃত্যুবরণ করি তাহলে তুমি আজাদ। সকলের ঐকমত্য অনুযায়ী مُدَبَّرٌ مُقَيَّدٌ-কে বিক্রি করা জায়েজ; কিন্তু مُدَبَّرٌ مُطْلَقٌ-কে বিক্রি করার ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে–

مَذْهَبُ إِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَإِمَامِ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর মতে প্রয়োজনের সময় مُدَبَّرٌ مُطْلَقٌ-কে বিক্রি করা জায়েজ আছে। মুজাহিদ এবং তাউস (র.) থেকেও এটা বর্ণিত আছে। তাঁদের দলিল এ বাবে উল্লিখিত হাদীস।

مَذْهَبُ الْأَحْنَافِ وَالْمَوَالِكِ وَجُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ : হানাফী, মালেকী ও জমহুর ওলামায়ে কেরামের নিকট مُدَبَّرٌ مُطْلَقٌ-কে বিক্রি করা জায়েজ নেই। হযরত ওমর (রা.), হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখদের থেকেও এটা বর্ণিত আছে। তাঁদের দলিল–

١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ

অর্থাৎ মুদাব্বার গোলামকে বিক্রি করা যাবে না, হিবা করা যাবে না এবং ওয়ারিশ চালু হবে না; বরং সে মালিকের রেখে যাওয়া সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে আজাদ হয়ে যাবে।

٢. وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ.

বিরোধীদের দলিলের জবাব :

১. এ বাবে উল্লিখিত হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস مُدَبَّرٌ مُقَيَّدٌ-এর উপর প্রযোজ্য।

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষ অধিকার ছিল সেই অধিকার বলেই তিনি বিক্রি করেছেন। অন্য কারো জন্য মুদাব্বার বিক্রি করা জায়েজ নেই।

৩. হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে মুদাব্বারের সত্তাকে বিক্রি করা উদ্দেশ্য নয়, বরং তার খেদমত ও শ্রমকে বিক্রি করা উদ্দেশ্য।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٢٤٧ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩২৪৭. অনুবাদ : হযরত হাসান বসরী (র.) হযরত সামুরা (রা.) হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি তার কোনো মাহরাম তথা নিকটতম আত্মীয়ের মালিক হয় [ক্রয়, দান, অসিয়ত কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে] তখন সাথে সাথেই সে স্বাধীন হয়ে যাবে। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٣٢٤٨ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ الرَّجُلِ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ أَوْ بَعْدَهُ. (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

৩২৪৮. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি কারো দাসী তার থেকে সন্তান জন্মদান করে, তাহলে সে লোকের মৃত্যুর পশ্চাতে অথবা বলেছেন মৃত্যুর পর উক্ত দাসী আজাদ হয়ে যাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মনিবের ঔরসে যে দাসীর গর্ভে সন্তান জন্ম লাভ করে ইসলামি পরিভাষায় উক্ত দাসীকে ام الولد [উম্মুল ওয়ালাদ] বলা হয়। এ ধরনের দাসীকে দান, হিবা, বিক্রয় বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করা জায়েজ নেই। উক্ত মনিবের ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গেই সে আজাদ হয়ে যাবে।

وَعَنْ ٣٢٤٩ جَابِرٍ (رض) قَالَ بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَبِىْ بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا عَنْهُ فَانْتَهَيْنَا ـ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩২৪৯. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ও হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সময়কালে উম্মুল ওয়ালাদ [সন্তানের মা] ক্রয়বিক্রয় করেছি। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) খলিফা হয়ে তিনি আমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করলেন। অতঃপর আমরা বিরত থাকলাম। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : পূর্বের হাদীসে বলা হয়েছে 'উম্মুল ওয়ালাদ' [দাসী]-কে বিক্রি করা যায়। পক্ষান্তরে এ হাদীস তার বিপরীত। এর সমাধান হলো, প্রাক-ইসলামি যুগ হতে অন্যান্য দাস-দাসীর ন্যায় 'উম্মুল ওয়ালাদ'-এর ক্রয়বিক্রয়ও সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল।
কিন্তু নবী করীম ﷺ 'উম্মুল ওয়ালাদ'-এর ক্রয়বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। কিন্তু নবী করীম ﷺ -এর নির্দেশ সর্ব এলাকার জনসাধারণের নিকট ব্যাপকভাবে পৌঁছেনি। তাই হযরত আবূ বকর (রা.)-এর যুগ পর্যন্ত কোনো কোনো এলাকায় তা বেচাকেনা হয়েছে। হযরত ওমর ফারূক (রা.) যখন খলিফা হন তখন তিনি সম্পূর্ণভাবে এ জাতীয় দাসীর ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করে দেন এবং তার ক্রয়বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার উপর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা সংঘটিত হয়।

উম্মুল ওয়ালাদ ক্রয়-বিক্রয় করার ব্যাপারে মতবিরোধ :

مَذْهَبُ دَاوُدَ ظَاهِرِىْ وَبِشْرِ مُرَيْسِىْ : দাউদে যাহেরী এবং বিশর মুরাইসী (র.)-এর নিকট 'উম্মে ওয়ালাদ' [দাসী] ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েজ। দলিল বাবের হাদীস।

مَذْهَبُ جُمْهُوْرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ : জমহুর সাহাবী, তাবেয়ী ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনদের নিকট উম্মুল ওয়ালাদ [দাসী] ক্রয়বিক্রয় করা জায়েজ নেই। দলিল–

١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ إِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ الرَّجُلِ فَهِىَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ أَوْ بَعْدَهُ ـ (دَارِمِىْ، مِشْكٰوة ج ٢ ص٢٩٥)

٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) نَهَى النَّبِىُّ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ ـ (دَارَقُطْنِىْ)

৩. إِجْمَاعٌ : হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি মিম্বরের উপর উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করলেন 'উম্মুল ওয়ালাদ' [দাসী] ক্রয়বিক্রয় করা হারাম। যদি দাসী তার মনিবের ঔরসে সন্তান জন্ম দেয় তাহলে সে আজাদ হয়ে যাবে। তখন সে দাসী থাকবে না। তিনি মিম্বরে এ ধরনের বয়ান করার পর কোনো সাহাবী তাঁর বিরোধিতা করেননি। সুতরাং এর দ্বারা ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

দাউদ যাহেরী ও বিশর মুরাইসী (র.)-এর দলিলের জবাব :

১. সম্ভবত নবী করীম ﷺ -এর নিকট উম্মুল ওয়ালাদ বিক্রয় হওয়ার খবর পৌঁছেনি।
২. সম্ভবত এটা 'উম্মুল ওয়ালাদ' ক্রয়বিক্রয় মনসুখ বা রহিত হওয়ার পূর্বের ঘটনা। আর হযরত আবূ বকর (রা.) -এর খেলাফতকাল ছিল স্বল্প, তাই তিনি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত ছিলেন যার ফলে তিনি এ বিষয়টি সম্পর্কে জানতেন না। জানলে অবশ্যই তিনি লোকদেরকে এর থেকে বিরত রাখতেন।
হযরত ওমর (রা.) খলিফা হওয়ার পর লোকদেরকে এর থেকে বিরত রাখেন। কেননা তিনি জানতেন নবী করীম ﷺ 'উম্মুল ওয়ালাদ' [দাসী] বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

وَعَنْ ٣٢٥٠ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ اِلَّا اَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩২৫০. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার গোলামকে আজাদ করে এবং সেই গোলামের যদি কিছু মালসম্পদ থাকে তাহলে মালিক নিজেই ঐ সম্পদের অধিকারী হবে। তবে হ্যাঁ মনিব যদি শর্ত করে। [অর্থাৎ মনিব যদি সে মাল গোলাম পাওয়ার কথা উল্লেখ করে তাহলে গোলামই পাবে।] –[আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٣٢٥١ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلًا اَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ غُلَامٍ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لَيْسَ لِلّٰهِ شَرِيْكٌ فَاَجَازَ عِتْقَهُ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩২৫১. অনুবাদ : হযরত আবুল মালীহ (র.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি তার এক গোলামের কিছু অংশ আজাদ করে দিল। অতঃপর বিষয়টি নবী করীম ﷺ -কে জানান হলো। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার কোনো শরিক নেই। এরপর পূর্ণ গোলামটি আজাদ করে দিতে বললেন। –[আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ٣٢٥٢ سَفِيْنَةَ (رضـ) قَالَ كُنْتُ مَمْلُوْكًا لِاُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ اُعْتِقُكَ وَاَشْتَرِطُ عَلَيْكَ اَنْ تَخْدِمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا عِشْتَ فَقُلْتُ اِنْ لَمْ تَشْتَرِطِىْ عَلَىَّ مَا فَارَقْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا عِشْتُ فَاَعْتَقَتْنِىْ وَاشْتَرَطَتْ عَلَىَّ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩২৫২. অনুবাদ : হযরত সাফীনা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর মালিকানাধীন ছিলাম। [একদা] তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমাকে এ শর্তে আজাদ করতে চাই যে, তুমি যত দিন বেঁচে থাকবে ততদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমত করবে। তখন আমি আরজ করলাম, আপনি এ শর্ত আরোপ না করলেও আমি যতদিন বেঁচে থাকি ততদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহচর্য হতে দূরে থাকব না। অতঃপর তিনি আমাকে আজাদ করে দিলেন এবং আমার উপর নবী করীম ﷺ -এর খেদমতের শর্তারোপ করলেন। –[আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

نَبْذَةٌ مِنْ حَيَاةِ سَفِيْنَةَ (رضـ) [হযরত সাফীনা (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী] : হযরত সাফীনা (রা.) নবী করীম ﷺ -এর আজাদকৃত গোলাম। কারো কারো মতে তিনি নবী করীম ﷺ -এর পুণ্যবতী স্ত্রী হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর গোলাম ছিলেন। আজীবন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমত করার শর্ত দিয়ে তিনি তাকে আজাদ করেন।

নাম : তাঁর প্রকৃত নাম মিহরান অথবা রোমানা অথবা রিবাহ ছিল। কুনিয়াত আবূ আব্দুর রহমান অথবা আবুল বাখতারী। সাফীনা তাঁর উপাধি। আর এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

সাফীনা উপাধি হওয়ার কারণ : سَفِيْنَةٌ অর্থ– নৌযান। নৌযানের মাধ্যমে যেভাবে মালামাল বহন করা হয় তদ্রূপ তিনিও মানুষের বোঝা বহন করে দিতেন। যুদ্ধাভিযানের সময় তিনি পিঠে করে মানুষের মালসামান বহন করে দিতেন। এ কারণেই তাঁর উপাধি "সাফীনা" হয়ে যায়।

বর্ণিত আছে, একবার হযরত সাফীনা (রা.) এক অভিযানে মুসলিম বাহিনীতে ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেন এবং পেরেশান হয়ে রাস্তা খুঁজতে থাকেন। ইত্যবসরে নিকবর্তী বন থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে আসে এবং তাঁর সামনে এসে যায়। বাঘ আসতে দেখে তিনি বলেন, "হে আবুল হারিছ" আমি সাফীনা, রাসূল ﷺ -এর আজাদকৃত গোলাম। একথা শোনামাত্র বাঘ লেজ নাড়াতে লাগল এবং আগে আগে হেঁটে তাঁকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিল।

وَعَنْ ٣٢٥٣ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهٖ دِرْهَمٌ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩২৫৩. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রা.) তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে আর তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, মুকাতাব সেই পর্যন্ত গোলামই থাকবে যে পর্যন্ত তার উপর শর্তকৃত একটি দিরহামও বাকি থাকবে। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُكَاتَبُ-এর পরিচয় : যে গোলাম নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময় তার মনিবের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তাকে 'মুকাতাব' বলা হয়। এ বিনিময় কয়েক কিস্তিতে পরিশোধ করা যেতে পারে। চুক্তি অনুযায়ী সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ না করা পর্যন্ত সে গোলামই থেকে যাবে।

'মুকাতাব'-এর ব্যাপারে আলেমগণের মতবিরোধ :

مَذْهَبُ اِمَامِ النَّخْعِىِّ وَغَيْرِهٖ : ইমাম নাখয়ী (র.) প্রমুখদের নিকট 'মুকাতাব' গোলাম যে পরিমাণ অর্থ আদায় করবে তার সে পরিমাণ অংশ দাসত্ব থেকে মুক্ত হবে। আর অনাদায় অর্থের পরিমাণ অংশ দাসত্বের মাঝে আবদ্ধ থাকবে।

তাঁর দলিল : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا اَوْ مِيْرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِهٖ مَا عُتِقَ مِنْهُ.

অর্থাৎ 'মুকাতাব' যে পরিমাণ আজাদ হয়েছে সে পরিমাণ অনুযায়ী ওয়ারিশ প্রাপ্ত হবে।

مَذْهَبُ جُمْهُوْرِ الصَّحَابَةِ وَالْفُقَهَاءِ : জমহুরে সাহাবা (রা.) এবং ফকীহগণের মতে, মুকাতাব গোলামের একটি দিরহাম অনাদায় থাকা পর্যন্ত দাসই থেকে যাবে।

তাঁদের দলিল :

১. اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِىَ مِنْ مُكَاتَبَتِهٖ دِرْهَمٌ - (حديث الباب)

২. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهٗ عَلٰى مِائَةِ اُوْقِيَةٍ فَاَدَّاهَا اِلَّا عَشَرَةَ اَوَاقٍ اَوْ قَالَ عَشَرَةَ دَنَانِيْرَ ثُمَّ عَجِزَ فَهُوَ رَقِيْقٌ. (اَبُوْ دَاوُدَ، تِرْمِذِىْ مِشْكٰوة جـ ٢ صـ ٢٩٥

বিরুদ্ধবাদীদের দলিলের জবাব :

১. ইমাম তিরমিযী (র.) উল্লিখিত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসকে যঈফ বলেছেন। সুতরাং এটা কোনো মাযহাবের বুনিয়াদ হতে পারে না।
২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস উল্লিখিত দুটি হাদীসেরই বিপরীত সুতরাং এটা দলিলযোগ্য নয়।

وَعَنْ ٣٢٥٤ اُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ اِحْدٰكُنَّ وَفَاءٌ فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩২৫৪. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের কারো মুকাতাব গোলামের নিকট এ পরিমাণ সম্পদ থাকে যার দ্বারা সে চুক্তিকৃত অর্থ আদায় করতে পারে, তখন অবশ্যই তার থেকে পর্দা করবে। -[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মুকাতাব পরিপূর্ণ অর্থ আদায় না করা পর্যন্ত সে গোলাম এবং মাহরাম তার সাথে পর্দা করা জরুরি নয়। তবে হ্যাঁ তার যদি এ পরিমাণ সম্পদ অর্জিত হয় যার দ্বারা সে চুক্তিকৃত অর্থ পরিশোধ করতে পারে তখন তাকওয়ার ভিত্তিতে সতর্কতামূলক তার সাথে পর্দা করা উচিত। সবচেয়ে বিশুদ্ধ কথা হলো নবী করীম ﷺ বিশেষভাবে

আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের জন্য এ নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলার এ ঘোষণা لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ অনুযায়ী নবী করীম ﷺ -এর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের পর্দাও অন্যান্য নারীদের অপেক্ষা কঠিন।

وَعَنْ ٣٢٥٥ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهٗ عَلٰى مِائَةِ اُوْقِيَّةٍ فَاَدَّاهَا اِلَّا عَشَرَةَ اَوَاقٍ اَوْ قَالَ عَشَرَةَ دَنَانِيْرَ ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقِيْقٌ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩২৫৫. **অনুবাদ :** হযরত আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা [শুয়াইব] থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার গোলামের সাথে একশত "উকিয়্যায়"[১] মুক্তিপণ সম্পাদন করেছে অতঃপর সে তা আদায় করল; কিন্তু কেবল দশ উকিয়্যা অথবা বলেছেন দশ দিনার বাকি রইল যা আদায় করতে সে অক্ষম হয়ে গেল, তাহলে সে গোলামই থেকে যাবে। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

টীকা : ১. চল্লিশ দিরহামে এক "উকিয়্যা" হয়। এটা আরবদের একটি পরিমাপ।

وَعَنْ ٣٢٥٦ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا اَوْ مِيْرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهٗ قَالَ يُؤَدَّى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا اَدّٰى دِيَةَ حُرٍّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ وَضَعَّفَهٗ .

৩২৫৬. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, যদি কোনো মুকাতাব [গোলাম] দিয়ত [রক্তপণ] অথবা মিরাস [উত্তরাধিকার] এর অধিকারী হয় তাহলে সে যে পরিমাণ আজাদ হয়েছে সে পরিমাণ দিয়ত বা মিরাস পাবে। –[আবূ দাউদ, তিরমিযী] তিরমিযীর অন্য রেওয়ায়েতে আছে, তিনি বলেছেন, মুকাতাবের দিয়ত তার পরিশোধকৃত অংশ পরিমাণ স্বাধীন লোকের দিয়ত হিসেবে আর বাকি অংশের দিয়ত গোলাম হিসেবে আদায় করতে হবে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি যঈফ বলেছেন।

وَعَنْ ٣٢٥٧ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ عُمْرَةَ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ اُمَّهٗ اَرَادَتْ اَنْ تُعْتِقَ فَاَخَّرَتْ ذٰلِكَ اِلٰى اَنْ تُصْبِحَ فَمَاتَتْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَيَنْفَعُهَا اَنْ اُعْتِقَ عَنْهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ اَتٰى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُمِّيْ هَلَكَتْ فَهَلْ يَنْفَعُهَا اَنْ اُعْتِقَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ . (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৩২৫৭. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবূ ওমরা আনসারী [তাবেয়ী] হতে বর্ণিত, তাঁর মাতা [একদিন] একটি গোলাম আজাদ করার সংকল্প করলেন। কিন্তু তিনি এটা বাস্তবায়ন করতে সকাল পর্যন্ত বিলম্ব করলেন। অতঃপর [রাতেই] তিনি ইন্তেকাল করলেন। আব্দুর রহমান বলেন, আমি কাসিম ইবনে মুহাম্মদ-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা! এখন যদি আমি আমার মাতার পক্ষ থেকে গোলাম আজাদ করি তাহলে তাঁর কোনো উপকার হবে কি? কাসিম বললেন, [একবার] সা'দ ইবনে উবাদা নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমার আম্মা মৃত্যুবরণ করেছেন, এখন যদি আমি তাঁর পক্ষ থেকে গোলাম আজাদ করি তাহলে তিনি তার ছওয়াব পাবেন কিনা? নবী করীম ﷺ বললেন, হ্যাঁ তিনি তার ছওয়াব পাবেন। –[মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর পৌত্র। তখন মদিনা শরীফে সাতজন প্রসিদ্ধ ফকীহ ছিলেন, তন্মধ্যে তিনিও একজন।

نَعَمْ হ্যাঁ ছওয়াব পাবে। এ কথার মর্ম হলো, তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে যে গোলাম আজাদ করবে তার ছওয়াব তোমার মা পাবে। সকল ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্য অনুযায়ী মালী ইবাদতের ছওয়াব মৃত ব্যক্তি পেয়ে থাকেন। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির নিকট জীবিত লোকের দান-সদকা ইত্যাদির ছওয়াব পৌছে। তবে শারীরিক ইবাদতের ছওয়াব পৌছে কিনা এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধতম অভিমত হলো, শারীরিক ইবাদতের ছওয়াবও মৃত ব্যক্তির নিকট পৌছে থাকে।

وَعَنْ ٣٢٥٨ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ فِيْ نَوْمٍ نَامَهُ فَاَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ اُخْتُهُ رِقَابًا كَثِيْرَةً ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৩২৫৮. **অনুবাদ :** হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ [তাবেয়ী] বলেন, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রা.) ঘুমিয়ে ছিলেন এবং ঘুমের মাঝেই [হঠাৎ] ইন্তেকাল করলেন। পরে তাঁর বোন হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর পক্ষ থেকে অনেকগুলি গোলাম আজাদ করলেন। –[মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক অনেকগুলি গোলাম আজাদ করার কারণ : হযরত আয়েশা (রা.) মনে করেছেন হয়তোবা কোনো কারণে তাঁর ভাইয়ের উপর গোলাম আজাদ করা ওয়াজিব ছিল। কিন্তু তিনি সে ওয়াজিব আদায় করতে পারেননি। আর হঠাৎ মৃত্যুবরণ করার কারণে অসিয়তও করার সুযোগ পাননি। সুতরাং হযরত আয়েশা (রা.) নিজে তার পক্ষ থেকে গোলাম আজাদ করে দিয়েছেন।

অথবা হঠাৎ মৃত্যু হওয়াকে অশুভ মনে করা হয়, তাই হযরত আয়েশা (রা.) অত্যন্ত চিন্তিত ও ব্যথিত হয়েছেন। এ কারণে তিনি অনেকগুলি গোলাম আজাদ করে দিয়েছেন।

وَعَنْ ٣٢٥٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اشْتَرٰى عَبْدًا فَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ ـ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

৩২৫৯. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি গোলাম ক্রয় করার সময় তার [গোলামের] মালসম্পদের শর্ত করেনি, তাহলে সে গোলামের সম্পদ হতে কিছুই পাবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যে ব্যক্তি কোনো গোলাম ক্রয় করল, কিন্তু সে গোলামের মালসম্পদের শর্তারোপ করেনি– যে মাল গোলামের সাথে আছে, তাহলে সে ঐ মালের অধিকারী হবে না। কেননা এ মাল ঐ মনিবের মালিকানায় রয়েছে যার থেকে সে ক্রয় করেছে।

بَابُ الْاَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ
পরিচ্ছেদ : কসম ও মান্নত

اَلْاَيْمَانُ-এর আভিধানিক অর্থ : اَيْمَانٌ শব্দটি يَمِيْنٌ-এর বহুবচন, অর্থ– ডান হাত। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ –[সূরা হা-ক্কাহ : আয়াত– ৪৫]

يَمِيْن-এর আরো অর্থ – শক্তি, শপথ, কসম।

اَلْيَمِيْنُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : সত্য মিথ্যার যে কোনো একটিকে, আল্লাহ তা'আলার নাম অথবা সিফাত তথা গুণবাচক নাম উল্লেখ করে শক্তিশালী করাকে يَمِيْن বলা হয়।

وَجْهُ التَّسْمِيَةِ বা নামকরণের কারণ :

১. আহলে আরব কসম করার সময় একে অপরের হাতে হাত মারে, এজন্য তাকে يَمِيْن বলা হয়।

২. ডান হাত দিয়ে যেভাবে কোনো বস্তুকে হেফাজত করা হয় তদ্রুপভাবে কসমের মাধ্যমেও কসমকৃত বস্তুকে হেফাজত করা হয়।

৩. আল্লাহ তা'আলার নামের উপর কসম করার দ্বারা শক্তি ও দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়, এজন্য তাকে يَمِيْن বলা হয়।

اَلنُّذُوْرُ - এর অর্থ : نُذُوْرٌ শব্দটি نَذْرٌ-এর বহুবচন, অর্থ– মানত করা। অর্থাৎ এমন কিছু নিজের উপর ওয়াজিব করে নেওয়া, যা ওয়াজিব ছিল না। যেমন– কেউ বলল, যদি আমার অমুক কাজ হাসিল হয়, তাহলে আমি পাঁচটি রোজা রাখব।

ইমাম রাগিব (র.) বলেন– اَلنَّذْرُ اَنْ تُوْجِبَ عَلٰى نَفْسِكَ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِحُدُوْثِ اَمْرٍ

ইমাম রাযী (র.) বলেন, নজর বা মানত বলা হয়, যা মানুষ নিজের উপর আবশ্যক করে নেয়। –[তাফসীরে কাবীর]

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٢٦٠ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ اَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْلِفُ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩২৬০. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ অধিকাংশ সময় 'মুকাল্লিবুল কুলূবি' [অন্তর পরিবর্তনকারী] বলে কসম করতেন। –[বুখারী]

وَعَنْ ٣٢٦١ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْلِيَصْمُتْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩২৬১. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করতে নিষেধ করেন। সুতরাং কেউ কসম করলে সে যেন আল্লাহ তা'আলার নামেই কসম করে অথবা যেন চুপ থাকে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বাপ-দাদার নামে কসম না করার কথা উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে। আসল উদ্দেশ্য হলো আমাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেওয়া যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কারো নামে কসম করা যাবে না। এখানে

বিশেষভাবে বাপ-দাদার কথা বলার কারণ হলো, মানুষ সাধারণত বাপ-দাদার নামে শপথ করে থাকে। সারকথা, আল্লাহ তা'আলার নাম ও সিফাত ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নামে কসম করা জায়েজ নেই। এর কারণ হলো, কসম مُقْسَمٌ بِهٖ [কসমকৃত সত্তা বা বস্তু]-এর সমান প্রমাণ করে। আর সম্মান প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য। তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সুমহান মর্যাদা ও বড়ত্ব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন মাখলুকের নামে কসম করে থাকেন।

একটি প্রশ্ন : নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত আছে– إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أَفْلَحَ وَأَبِيْهِ অর্থাৎ নবী করীম ﷺ তাঁর পিতার নামে কসম করেছেন। সুতরাং হাদীস দুটির মাঝে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

জবাব : ১. নবী করীম ﷺ -এর পিতার নামে শপথ করা এ নিষেধাজ্ঞার পূর্বের ঘটনা।

২. এখানে مُضَافٌ উহ্য আছে অর্থাৎ- أَيْ وَرَبِّ أَبِيْهِ

৩. নবী করীম ﷺ ইচ্ছাকৃতভাবে কসম করেননি বরং পুরানো অভ্যাস অনুযায়ী কসমের শব্দ এমনিই মুখ দিয়ে বের হয়ে গেছে। সুতরাং হাদীস দুটির মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

وَعَنْ ٣٢٦٢ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَحْلِفُوْا بِالطَّوَاغِيْ وَلَا بِاٰبَائِكُمْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩২৬২. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা প্রতিমার নামে ও তোমাদের বাপ-দাদাদের নামে কসম করো না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بِالطَّوَاغِيْ : طَاغِيَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– দেব-দেবী, প্রতিমা। জাহিলি যুগে লোকেরা দেব-দেবী ও বাপ-দাদার নামে ব্যাপকভাবে কসম করত। নবী করীম ﷺ লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণের পর ঐ ধরনের শপথ করতে নিষেধ করেছেন, যাতে সাবেক অভ্যাস অনুযায়ী কেউ যেন ভুলবশত ঐ ধরনের কসম না করে বসে।

وَعَنْ ٣٢٦٣ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِيْ حِلْفِهٖ بِاللَّاتِ وَالْعُزّٰى فَلْيَقُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهٖ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩২৬৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কসম করে এবং তার কসমের মধ্যে লাত ও উয্যার নাম উচ্চারণ করে, সে যেন [সাথে সাথেই] 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে। আর যে তার সঙ্গীকে বলে, 'আস, আমরা জুয়া খেলি।' সে যেন সদকা করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'লাত ও উযযা' দুটি প্রতিমার নাম। কুরাইশরা এ দুটি প্রতিমার পূজা করত। উল্লিখিত দুটি প্রতিমা ছাড়াও মুশরিকরা আরো অসংখ্য প্রতিমার পূজা করত। মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম ﷺ সকল প্রতিমা ও প্রতিমাগৃহ ধ্বংস করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ فَلْيَقُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ : এর উদ্দেশ্য হলো, সে যেন আল্লাহ তা'আলার নিকট তওবা ও ইসতিগফার করে। এ হুকুমের দুটি অর্থ হতে পারে–

১. যদি কোনো নও-মুসলিমের মুখ দিয়ে ভুলবশত লাত ও উযযার নাম বের হয়ে যায় তাহলে সে যেন কাফফারাস্বরূপ কালিমা পাঠ করে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ সুতরাং এ সুরতে গাফলত ও ভুলের জন্য তওবা হবে।

২. যদি কোনো মুসলমানের মুখ দিয়ে সম্মানার্থে লাত ও উযযার নাম প্রকাশ হয়, তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। সুতরাং পুনরায় ঈমান গ্রহণ করার জন্য কালিমা পাঠ করতে হবে। এ সুরতে গুনাহ থেকে তওবা করা হবে।

قَوْلُهُ فَلْيَتَصَدَّقْ : দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে তার সঙ্গীকে জুয়া খেলার জন্য আহ্বান করে, সে অবশ্যই বড় অন্যায় করেছে। সুতরাং সে কাফফারাস্বরূপ কিছু মাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে।

অনেক আলেমগণ বলেছেন, যে সম্পদ দ্বারা জুয়া খেলার ইচ্ছা করেছিল, সে সম্পদ দান করে দেবে। বিষয়টি চিন্তা করা উচিত। জুয়া খেলার জন্য শুধু আহ্বান করলেই যদি তওবা করতে হয়, তাহলে জুয়া খেললে কি হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

وَقَالَ الْعَيْنِيُّ (رحـ) اَلْأَمْرُ بِالصَّدَقَةِ مَحْمُوْلٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَلَى النَّدْبِ وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ اَنَّ الْاَصَحَّ اَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لَهُ مِقْدَارٌ فَيَتَصَدَّقُ بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ .

وَعَنْ ٣٢٦٤ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى مِلَّةٍ غَيْرِ الْاِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ نَذْرٌ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنِ ادَّعٰى دَعْوٰى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللّٰهُ اِلَّا قِلَّةً . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩২৬৪. অনুবাদ : হযরত ছাবিত ইবনে যাহহাক (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের নামে মিথ্যা কসম করে তাহলে সে তদ্রূপ হয়ে যায় যা সে বলেছে। কোনো আদম সন্তানের জন্য ঐ মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়, যার সে মালিক নয়। যে ব্যক্তি কোনো বস্তু দ্বারা দুনিয়াতে আত্মহত্যা করল, কিয়ামত দিবসে তাকে উক্ত বস্তু দ্বারাই শাস্তি দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে অভিসম্পাত করল, সে যেন তাকে হত্যা করল। আর যে কোনো মুমিনকে কাফের বলে অপবাদ দিল, সে যেন তার জীবন হরণ করল। যে ব্যক্তি মালসম্পদ বৃদ্ধির জন্য মিথ্যা দাবি করে, আল্লাহ তা'আলা তার সম্পদ বৃদ্ধির পরিবর্তে আরও কমিয়ে দেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَنْ حَلَفَ عَلٰى مِلَّةٍ غَيْرِ الْاِسْلَامِ -এর মর্মার্থ : ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের নামে কসম করা। যেমন- কেউ কসম করল, যদি আমি অমুক কাজ করি তাহলে আমি ইহুদি অথবা খ্রিস্টান হয়ে যাব, অথবা আমি ইসলাম ধর্ম বা কুরআন থেকে বের হয়ে যাব। এরপর যদি সে কসম ভেঙ্গে ঐ কাজ করে তাহলে সে অনুরূপভাবে ইহুদি বা খ্রিস্টান হয়ে যাবে অথবা ইসলাম ধর্ম বা কুরআন থেকে বের হয়ে যাবে। হাদীসের এ প্রকাশ্য ভাষ্য অনুযায়ী শাফেয়ী মাযহাবের কিছু আলেমের মতে, উক্ত ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। কেননা, সে কসম ভঙ্গ করে সন্তুষ্ট চিত্তে আগ্রহের সাথে কাফের হওয়াকে গ্রহণ করেছে।

পক্ষান্তরে হানাফী মাযহাবের মতে এবং জমহুর ফকীহগণের নিকট, সে কাফের হবে না। বরং হাদীসের উদ্দেশ্য হলো নবী করীম ﷺ ধমকি ও সতর্কতামূলক একথা বলেছেন যে, সে ব্যক্তি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ন্যায় শাস্তিযোগ্য হবে। যেমন- مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ فَقَدْ كَفَرَ -এর উদ্দেশ্য ইহাই। তবে এজন্য কাফফারা ওয়াজিব হবে কিনা এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে।

ইমামগণের মাযহাব :

عِنْدَ اِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَاَبِيْ عُبَيْدَةَ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও আবূ উবাইদাহ (র.) প্রমুখদের নিকট ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের উপর কসম করলে কসম সংগঠিত হবে না। সুতরাং কাফফারাও ওয়াজিব হবে না। তবে গোনাহগার হবে। প্রমাণ- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِيْ حِلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزّٰى فَلْيَقُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عِنْدَ الْاَحْنَافِ وَاَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ وَنَخْعِىْ وَاَوْزَاعِىْ وَثَوْرِىْ (رحـ) : আহনাফ, ইমাম আহমদ, ইসহাক, নাখয়ী, আওযায়ী, ছাওরী (র.) প্রমুখদের নিকট কসম সংঘটিত হবে এবং কসম ভঙ্গ করলে কাফফারাও ওয়াজিব হবে।

দলিল : لِاَنَّ الْعُرْفَ شَائِعٌ بِذٰلِكَ وَبَنِىَ الْاَيْمَانُ عَلَى الْعُرْفِ .

সাহেবে হেদায়া حِلْفٌ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْاِسْلَامِ -এর ক্ষেত্রে কসম হওয়া ও তা ভঙ্গ করার কারণে কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে নিম্নরূপ দলিল পেশ করেন–

لَوْ قَالَ اِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَهُوَ يَهُوْدِىٌّ يَكُوْنُ يَمِيْنًا فَاِذَا فَعَلَهُ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ قِيَاسًا عَلٰى تَحْرِيْمِ الْمُبَاحِ بِالنَّصِّ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا حَرَّمَ مَارِيَةَ قِبْطِيَّةَ (رضـ) عَلٰى نَفْسِهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ . (اَلْاٰيَةُ)

অর্থাৎ, নবী করীম ﷺ যখন মারিয়া কিবতিয়াকে নিজের জন্য হারাম করেন, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন। এ আয়াতে تَحْرِيْمُ الْمُبَاحِ -কে يَمِيْن সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়েছেন। তা হচ্ছে, যদি কেউ বলে, اِنْ دَخَلْتُ الدَّارَ فَاَنَا يَهُوْدِىٌّ এখানে ঘরে প্রবেশ করার মতো একটি মুবাহ কাজকে নিষিদ্ধ কাজের সাথে যুক্ত করে হারাম করা হয়েছে। আর প্রত্যেক تَحْرِيْمُ الْمُبَاحِ উল্লিখিত আয়াত অনুযায়ী يَمِيْن সুতরাং تَحْرِيْمُ دُخُوْلِ دَارٍ ও يَمِيْن হবে।

সারকথা : উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম حِلْفٌ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْاِسْلَامِ তথা ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের নামে কসম করলে কসম সাব্যস্ত হবে। আর অন্যান্য কসম ভঙ্গ করলে যেমন কাফফারা ওয়াজিব হয়, এখানেও তদ্রূপভাবে কাফফারা ওয়াজিব হবে।

বিরোধী পক্ষের দলিলের জবাব : মোল্লা আলী কারী (র.) মিরকাত ব্যাখ্যাগ্রন্থের মাঝে এর জবাব দিয়েছেন–

اَلظَّاهِرُ الْمُسْتَفَادُ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ الْحِلْفَ بِالْاَصْنَامِ مَذْمُوْمٌ فَيَنْبَغِىْ اَنْ يَتَدَارَكَ بِاَمْرٍ مَعْلُوْمٍ (وَهُوَ كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ) وَلَيْسَ فِيْهِ دَلَالَةٌ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا .

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের মাঝে, প্রতিমার নামে কসম করাকে নিন্দনীয় সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং কালিমায়ে তাওহীদ উচ্চারণ করে তার প্রতিকার করতে বলা হয়েছে। এর অতিরিক্ত কিছু এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় না। এ হাদীসের মাঝে উক্ত হলফ কসম সাব্যস্ত হওয়া বা না হওয়ার উপর কোনো দিক নির্দেশনা নেই। অনুরূপভাবে কাফফারা ওয়াজিব হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারেও কোনো আলোচনা এ রেওয়ায়েত নেই। সুতরাং এ হাদীস তাদের দলিল হতে পারে না।

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ نَذْرٌ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ : মানুষ যে বস্তুর মালিক নয়, তার মানত করলে তা আদায় করা ওয়াজিব নয়। যেমন– কেউ বলল, যদি আমার অমুক আত্মীয় সুস্থ হয়, তাহলে আমি অমুক গোলাম আজাদ করে দেব। অথচ এ গোলামের সে মালিক নয়। এ ধরনের মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়।

وَعَنْ ٣٢٦٥ اَبِىْ مُوْسٰى (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَا اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَاَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِىْ وَاَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩২৬৫. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর শপথ! আমি যদি কোনো বস্তুর উপর কসম করি, অতঃপর ঐ কসমের ব্যতিক্রম করা উত্তম মনে করি তখন ইনশাআল্লাহ আমি আমার কসমের কাফফারা আদায় করে দেব এবং যে কাজটি উত্তম তাই করব।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যদি কেউ গুনাহের কাজের উপর কসম করে। যেমন, আল্লাহর কসম! আমি আমার পিতা বা পুত্রের সাথে কথা বলব না, আমি নামাজ পড়ব না, অমুককে হত্যা করব ইত্যাদি। এ জাতীয় কসম ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব। তবে ভেঙ্গে ফেলার পর কাফফারাও দিতে হবে, এ ব্যাপারে সকল ওলামায়ে কেরাম একমত। তবে কসম ভঙ্গ করার পূর্বে সকল কাফফারা দেওয়া জায়েজ হবে কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

কসম ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে কাফফারা দেওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ :

مَذْهَبُ إِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ (رح) : হযরত ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর নিকট কসম ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে কাফফারা[১] দেওয়া জায়েজ আছে। ইমাম রবীয়া, আওযায়ী, লাইছ, ছাওরী, ইবনুল মোবারক, হাসান, ইবনে সীরীন (র.) প্রমুখ থেকেও এটা বর্ণিত আছে। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কসম ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে মালসম্পদ দিয়ে কাফফারা দেওয়া জায়েজ হবে, কিন্তু রোজা রেখে কাফফরা দেওয়া জায়েজ হবে না। ইমাম মালেক (র.) বলেন, কসম ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে গোলাম আজাদ কিংবা সদকা দিয়ে কাফফারা দেওয়া জায়েজ হবে না। কিন্তু রোজা রেখে কাফফারা দেওয়া জায়েজ হবে।

তাঁদের দলিল :

١. عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّيْ وَاللّٰهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَا أَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَأَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِيْ وَأَتَيْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

উক্ত হাদীসের মাঝে প্রথম কাফফারা ও পরে উত্তম কাজটি করে কসম ভঙ্গ করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং কসম ভঙ্গ করার পূর্বেই কাফফারা দেওয়া উচিত।

٢. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) مَرْفُوْعًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَفِّرْتُ يَمِيْنِيْ - (أَبُوْ دَاوُدَ)

এখানে কাফফারাকে يَمِيْن -এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, حِنْث -এর সাথে সংযুক্ত করা হয়নি। সুতরাং কসম ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে কাফফারা দেওয়া জায়েজ হবে।

٣. وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهٗ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ - (مَائِدَة - ٨٨)

এ আয়াতের মাঝে فَاء এনে কসমের পরে কাফফারা আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে কসম ভঙ্গ হওয়ার কথা উল্লেখ নেই।

٤. ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ -

এখানে কসম করার কারণে কাফফারা আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতে কসম ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে কাফফারা আদায় করা জায়েজ হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

مَذْهَبُ إِمَامِ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَدَاوُدَ ظَاهِرِيْ وَأَشْهَبَ مَالِكِيْ (رح) : ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.), দাউদে যাহেরী এবং আশহাব মালেকী (র.) -এর নিকট কসম ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে কোনোভাবেই কাফফারা আদায় করা জায়েজ নয়। ইবনে কাসিম মালেকীর তৃতীয় قَوْل [উক্তি]ও এটাই।

তাঁদের দলিল :

١. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ مَرْفُوْعًا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ -(بُخَارِيْ - ج٢ ص٩٩٥)

এ হাদীসের মাঝে فَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ দ্বারা কসম ভঙ্গ হওয়ার পর কাফফারা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কসম ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে কাফফারা দেওয়া জায়েজ হবে না।

٢. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَأٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهٖ - (مُسْلِمْ ج٢ - ص ٤٨)

টীকা : ১. কসমের কাফফারা : দশজন মিসকিনকে মধ্যম পর্যায়ের খাদ্য দেওয়া অথবা বস্ত্র দেওয়া অথবা একটি গোলাম আজাদ করা। যদি এর কোনোটির সমর্থ না থাকে, তাহলে তিনি দিন রোজা রাখবে।

আভিধানিক ও যৌক্তিক দলিল : كَفَّارَةٌ শব্দটি كَفْرٌ থেকে নির্গত। অর্থ– পর্দা, যার মাধ্যমে অপরাধের উপর পর্দা টানা হয়। সকলের ঐকমত্য অনুযায়ী কসম ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে কোনো অপরাধই হয় না। সুতরাং অপরাধের উপর পর্দা টানারও প্রশ্ন আসে না। ওয়াক্ত আসার পূর্বে যেমন নামাজ হয় না, রমজান মাস আসার পূর্বে যেমন রমজানের রোজা হয় না, তদ্রূপভাবে কসম ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে কসমের কাফফারাও আদায় হবে না।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلَائِلِ الْمُخَالِفِيْنَ :

১. এভাবে উল্লিখিত হাদীসে "وَاٰتِيْتُ"-এর মধ্যকার وَاوْ একত্রকরণের জন্য এসেছে। এর দ্বারা পূর্বে বা পরে হওয়া বুঝায় না এবং বাস্তবিকপক্ষেও تَقْدِيْم বা تَاخِير-এর উপর প্রমাণ বহন করে না।

২. হাদীসসমূহের মাঝে تَعَارُضْ [দ্বন্দ্ব] হওয়ার সময় ঐ হাদীস প্রাধান্য লাভ করে যে হাদীস উসূল এবং কিয়াসের অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আর হানাফীদের উল্লিখিত রেওয়ায়েত কিয়াস, ভাষা ও কায়েদার অধিক মোয়াফেক। সুতরাং কসম ভঙ্গ হওয়ার পর কাফফারা দেওয়ার হাদীসগুলো প্রাধান্য পাবে।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الثَّانِىْ : কাফফারাকে يَمِيْن-এর সাথে সংযুক্ত করার দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, يَمِيْن সবব বা কারণ হবে। যেমন– كَفَّارَةُ فِطْر-এর ইযাফত صِيَامْ-এর দিকে এবং كَفَّارَةُ دَمْ-এর ইযাফত হজের দিকে করা হয়। কিন্তু সকলের ঐকমত্য অনুযায়ী صِيَامْ এবং حَجّ কাফফারার সবব হয় না। তদ্রূপ يَمِيْن ও কাফফারার সবব হবে না।

اَلْجَوَابُ عَنِ الْاٰيَةِ الْكَرِيْمَةِ :

ক. আইম্মায়ে ছালাছার নিকট কসম ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে কাফফারা দেওয়া জায়েজ এবং কসম ভঙ্গ হওয়ার পর দেওয়া মুস্তাহাব। কিন্তু কারো নিকট কসম ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে কাফফারা দেওয়া ওয়াজিব নয়।

খ. হযরত আবূ বকর রাযী (র.) প্রমুখগণ বলেছেন, এখানে حَنِثْتُمْ শব্দ উহ্য মানতে হবে।

এমনিভাবে ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ اَىْ اِذَا حَلَفْتُمْ وَحَنِثْتُمْ কুরআন ও হাদীসের মাঝে এভাবে উহ্য মানার বহু নজির রয়েছে। যেমন– مَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ এখানে সকলের ঐকমত্য অনুযায়ী "فَاَفْطَرَ" শব্দ উহ্য আছে। অর্থাৎ مَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَاَفْطَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ইমাম শাফেয়ী (র.) كَفَّارَةٌ بِالصَّوْمِ এবং كَفَّارَةٌ بِالْمَالِ-এর মাঝে যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন তা সঙ্গত নয়। কেননা, তিনি كَفَّارَةٌ بِالْمَالِ-কে জাকাতের উপর কিয়াস করে বলেন, নেসাব পরিমাণ মালের উপর পূর্ণ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে। যেমন– জাকাত দেওয়া জায়েজ, তদ্রূপ কসম ভঙ্গ হওয়ার পূর্বেই মালের মাধ্যমে কসমের কাফফারা দেওয়া জায়েজ হবে।

আমরা বলব, এ কিয়াস অসঙ্গত কিয়াস। কেননা কাফফারা অপরাধের কারণে ওয়াজিব হয়। আর জাকাতের মাঝে কোনো অপরাধ নেই। সুতরাং كَفَّارَةٌ بِالْمَالِ-কে জাকাতের উপর কিয়াস করা যাবে না।

وَعَنْ ٣٢٦٦ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لَاتَسْأَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا وَاِنْ اُوْتِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا وَاِذَا حَلَفْتَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَاْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَأْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩২৬৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, হে আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা! নেতৃত্ব চেয়ে নিও না। কেননা, যদি চাওয়ার কারণে তোমাকে নেতৃত্ব দেওয়া হয়, তাহলে তোমাকে তার উপর ন্যস্ত করা হবে। আর যদি চাওয়া ব্যতীত তোমাকে নেতৃত্ব দেওয়া হয়, তাহলে তার উপর তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর যখন কোনো কসম কর এবং পরে তার বিপরীত করা ভালো মনে কর, তখন তোমার কসমের কাফফারা আদায় কর এবং সেই ভালো কাজটি কর। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, প্রথমে সেই ভালো কাজটি কর এবং পরে তোমার কসমের কাফফারা আদায় কর। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تَسْأَلِ الْاِمَارَةَ : নেতৃত্ব চেয়ে নিও না। অর্থাৎ নেতৃত্ব ও রাজনীতি কোনো স্বাভাবিক বিষয় নয়; বরং খুবই কঠিন বিষয়। নেতৃত্বের হক আদায় করা সবার দ্বারা সম্ভব নয়। সকলের মাঝে এ যোগ্যতাও নেই। সুতরাং লোভ-লালসার শিকার হয়ে নেতৃত্ব চেও না। যদি তোমার চাওয়ার কারণে নেতৃত্ব দেওয়া হয়, তাহলে তোমার উপর তা ন্যস্ত করা হবে। তুমি এ দায়িত্ব পালনে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য পাবে না। ফলে তুমি লাঞ্ছিত, অপমানিত হবে ও সকলের চোখে অযোগ্য প্রমাণিত হবে। পক্ষান্তরে চাওয়া ব্যতীত যদি তুমি নেতৃত্ব পেয়ে যাও, তাহলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাকে সাহায্য করা হবে। ফলে তোমার সকল কাজ সুশৃঙ্খল ও সুব্যবস্থাপনার সাথে সম্পন্ন হবে এবং তুমি মানুষের চোখে সম্মানিত ও প্রশংসিত হবে।

وَعَنْ ٣٢٦٧ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاٰى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَلْيَفْعَلْ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩২৬৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি কেউ কোনো কসম করে এবং পরে তার বিপরীত করা উত্তম মনে করে তখন তার উচিত কসমের কাফফারা দেওয়া এবং [উত্তম] কাজটি করা। –[মুসলিম]

وَعَنْهُ ٣٢٦٨ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لَاَنْ يَلَجَّ اَحَدُكُمْ بِيَمِيْنِهٖ فِىْ اَهْلِهٖ اٰثَمُ لَهٗ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ اَنْ يُعْطِىَ كَفَّارَتَهُ الَّتِىْ افْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩২৬৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর কসম! যদি তোমাদের মাঝে কেউ পরিবার-পরিজন সম্পর্কে কসম করে এবং সে কসমের উপর অটল থাকে। [কসম পূর্ণ করার জিদ করে] সে আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক গুনাহগার হবে [ঐ কসম ভেঙ্গে দিয়ে] কাফফারা আদায় করার চেয়ে যা আল্লাহ তা'আলা তার উপর ফরজ করেছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কসম ভঙ্গ করলে যদিও বাহ্যিকভাবে আল্লাহ তা'আলার নামের ইজ্জত ও মর্যাদার অবমাননা হয় এবং কসমকারীও তা অন্যায় মনে করে; কিন্তু যদি পরিবার-পরিজনের হক নষ্ট হয় তখন কসমের উপর অটল থাকা অধিক গুনাহের কাজ। উক্ত হাদীসের মাঝে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য যে, কসমের বিপরীত কাজটি যদি উত্তম মনে হয় তখন কসম ভেঙ্গে দিয়ে কাফফারা আদায় করা কর্তব্য।

وَعَنْهُ ٣٢٦٩ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمِيْنُكَ عَلٰى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩২৬৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমার কসম ঐ সময় সহীহ হবে, যখন তোমার সঙ্গী [কসম প্রদানকারী] তোমাকে সত্য মনে করবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কসম সত্য প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে ঐ ব্যক্তির নিয়ত ও ইচ্ছা গ্রহণযোগ্য হবে, যে কসম দিয়েছে। এক্ষেত্রে কসমকারীর নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তার তাওরিয়া [একটি বলে অন্যটি উদ্দেশ্য নেওয়া] ও

তাবীল [ব্যাখ্যা] ও গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন– শরীফ মামুনের নিকট কিছু টাকা পায়, কিন্তু মামুন তা অস্বীকার করে। আর শরীফের নিকট কোনো সাক্ষীও নেই। সুতরাং শরীফ মামুনকে কসম খেতে বলে তখন মামুন কসম খেয়ে বলে আমার নিকট তোমার কোনো টাকা নেই। কিন্তু কসম খাওয়ার সময় মামুন নিয়ত بِالْفِعْلِ করে। অর্থাৎ এই মুহূর্তে তোমার কোনো টাকা আমার নিকট নেই। এটা তাওরিয়া ও তাবীলের একটি উদাহরণ। এ অবস্থায় শরীফের নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে; মামুনের নিয়ত গ্রহনযোগ্য হবে না। হ্যাঁ যদি কারো হক নষ্ট না হয় অথবা কোনো কাজি বা হাকিম কসম প্রদানকারী না হয়, পক্ষান্তরে এর দ্বারা উপকার হয় তখন তাওরিয়া করাতে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন– হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর স্ত্রী সারাকে জালিমদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বলেছিলেন, এ আমার ভগ্নি। সারাকে ভগ্নি বলার দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উদ্দেশ্য ছিল দীনি ভগ্নি।

وَعَنْهُ ٣٢٧٠ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْيَمِيْنُ عَلٰى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩২৭০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ কছেন, কসমের গ্রহণযোগ্যতা কসম প্রদানকারীর নিয়তের উপর হবে। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٢٧١ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْٓ اَيْمَانِكُمْ فِىْ قَوْلِ الرَّجُلِ لَا وَاللّٰهِ وَبَلٰى وَاللّٰهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَفِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ لَفْظُ الْمَصَابِيْحِ وَقَالَ رَفَعَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ .

৩২৭১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াত لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْٓ اَيْمَانِكُمْ [তোমাদের নিরর্থক কসমের জন্য আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দায়ী করবেন না।] ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। যে لَا وَاللّٰهِ এবং بَلٰى وَاللّٰهِ বলে। –[এটা বুখারীর রেওয়ায়েত। আর শরহে সুন্নাহের মাঝে এ রেওয়ায়েত মাসাবীহ গ্রন্থকারের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। শরহে সুন্নাহের মাঝে আরও বলা হয়েছে যে, কোনো কোনো রাবী এ হাদীস হযরত আয়েশা (রা.) থেকে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। [অর্থাৎ হাদীসটি নবী করীম ﷺ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কসম তিন প্রকার। যথা– ১. লাগব, ২. গুমূছ,৩. মুনআকিদাহ।

১. লাগব : অতীতের বা বর্তমানের কোনো কাজকে সত্য ধারণা করে শপথ করল অথচ ঘটনাটি এর বিপরীত। যেমন– গতকাল বৃষ্টি হয়নি, কিন্তু আব্দুল করিমের ধারণা গতকাল বৃষ্টি হয়েছে। তাই সে বলল, আল্লাহর কসম গতকাল বৃষ্টি হয়েছে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট কথায় কথায় لَا وَاللّٰهِ . تَاللّٰهِ . بِاللّٰهِ ইত্যাদি শব্দ দিয়ে শপথ করার নাম يَمِيْن লাগব। সকলের ঐকমত্য অনুযায়ী এ জাতীয় কসম দ্বারা কোনো গুনাহ হবে না এবং কাফফারাও দিতে হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ

২. গুমূছ : অতীতের বা বর্তমানের কোনো ব্যাপারে মিথ্যা শপথ করার নাম গুমূছ। যেমন– আব্দুর রহিম জানে অমুক ব্যক্তি আসেনি। কিন্তু সে মিথ্যা শপথ করে বলল, আল্লাহর কসম অমুক ব্যক্তি এসেছে। এ কসম দ্বারা শপথকারী গুনাহগার হবে কিন্তু কোনো কাফফারা দিতে হবে না। তবে এজন্য তওবা ও ইসতিগফার করতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ

৩. মুনআকিদাহ : ভবিষ্যতে কোনো কাজ করা বা না করার সংকল্প করে শপথ করাকে মুনআকিদাহ বলা হয়। এ প্রকারের কসম ভঙ্গ করলে সকলের ঐকমত্য অনুযায়ী কাফফারা ওয়াজিব হবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ এছাড়াও বহু হাদীস দ্বারা يَمِيْن মুনআকিদাহ সংঘটিত হওয়ার পর তা ভঙ্গ করার কারণে কাফফারা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত আছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٢٧٢ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ وَلَا بِاُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْاَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوْا بِاللّٰهِ اِلَّا وَاَنْتُمْ صَادِقُوْنَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৩২৭২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদা, মা এবং দেব-দেবীর নামে শপথ করো না। আর আল্লাহ তা'আলার নামেও তোমরা শপথ করোনা, যতক্ষণ না তোমরা তাতে সত্যবাদী হও। –[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

وَعَنْ ٣٢٧٣ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৩২৭৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করল, সে শিরক করল। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যদি পুরানো অভ্যাস অনুযায়ী অনিচ্ছাকৃতভাবে গাইরুল্লাহর নামে শপথ বাক্য উচ্চারিত হয়ে যায়, আর সে বস্তুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে বাহ্যিকভাবে এটা শিরক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা শিরক নয় এবং এজন্য কোনো গুনাহও হবে না। কিন্তু যদি সম্মান প্রদর্শন ও তাজীমের নিয়তে গাইরুল্লাহর নামে শপথ করে, তাহলে তা অবশ্যই শিরক হবে।

সাধারণ মানুষের মাঝে রেওয়াজ আছে যে, অধিক ভালোবাসার কারণে তার প্রিয় ভাজনের নামে শপথ করে থাকে। যেমন বলে, আমার পুত্রের শপথ অথবা তার মাথার শপথ, তার জীবনের শপথ। এ জাতীয় শপথও গুনাহ থেকে মুক্ত নয়। যদিও এর উপর শিরকের হুকুম আরোপিত হয় না।

وَعَنْ ٣٢٧٤ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِالْاَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩২৭৪. অনুবাদ : হযরত বুরাইদা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমানত শব্দের দ্বারা কসম করল,সে আমাদের দলভুক্ত নয়। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : শরিয়তে আল্লাহ তা'আলার নাম অথবা সিফাতের সাথে কসম করার অনুমতি দিয়েছে। আর اَمَانَة আল্লাহ তা'আলার নাম বা সিফাত কোনোটিই নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা ব্যতীত শুধু আমানতের শপথ করবে, সে নবী করীম ﷺ -এর দলভুক্ত নয়। কেননা, তা আহলে কিতাব তথা অমুসলিমদের অভ্যাস। আর এটা গাইরুল্লাহর কসমের মাঝে গণ্য হবে।

কোনো কোনো আলেম বলেন, এখানে "আমানত" দ্বারা উদ্দেশ্য ফারায়েজ। অর্থাৎ নবী করীম ﷺ নামাজ, রোজা, হজ ইত্যাদির শপথ করতে নিষেধ করেছেন। উভয় অবস্থায় এ কসম ভঙ্গ করার দ্বারা কোনো কাফফারা ওয়াজিব হবে না।
হ্যাঁ যদি কেউ আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধ করে أُقْسِمُ بِأَمَانَةِ اللّٰهِ বলে শপথ করে, তাহলে এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে।
ক. ইমাম শাফেয়ী (র.) ও অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের নিকট কসম সংঘটিত হবে না এবং কাফফারা ওয়াজিব হবে না।
দলিল : عَنْ بُرَيْدَةَ مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا হাদীসটি এখানে মুতলাক বা স্বাধীন। এর দ্বারা গাইরুল্লাহর কসম বুঝায়। সুতরাং কসম সংঘটিত হবে না। আর কসম যেহেতু সংঘটিত হবে না, তাই কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।
খ. ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, কসম সংঘটিত হবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নামের মাঝে একটি হলো أَمِيْنٌ সুতরাং أَمَانَةُ اللّٰهِ -এর সাথে শপথ করা আল্লাহ তা'আলার সিফাতের সাথে কসম করার ন্যায়।
উল্লিখিত হাদীসের জবাব : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট উক্ত হাদীসের অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধ করা ব্যতীত শুধু أَمَانَةٌ -এর কসম খাওয়া নিষিদ্ধ।

وَعَنْهُ ٣٢٧٥ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ إِنِّيْ بَرِيْءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩২৭৫. **অনুবাদ :** হযরত বুরায়দা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বলল [যদি আমি এ কাজটি করি] "আমি ইসলাম হতে বিচ্ছিন্ন" যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে সে যা বলছে তাই হবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবুও সে অক্ষত অবস্থায় ইসলামের দিকে ফিরে আসতে পারবে না।
–[আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যদি কোনো ব্যক্তি এভাবে কসম করে যে, যদি আমি অমুক কাজ করি, তাহলে আমি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাব। এরপর যদি সে তার কথার মাঝে মিথ্যাবাদী হয়। অর্থাৎ বাস্তবিকপক্ষে ঐ কাজ করে, তাহলে সে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে এ জাতীয় কসমের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রকাশ করার জন্য এভাবে সতর্ক করা হয়েছে।
আর যদি সে তার কথায় সত্যবাদী হয়। অর্থাৎ বাস্তবিকপক্ষে সে ঐ কাজ না করে তবু সে গুনাহগার হবে। কেননা মুসলমানদেরকে এ ধরনের কসম করতে নিষেধ করা হয়েছে।

وَعَنْ ٣٢٧٦ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِيْنِ قَالَ لَا وَالَّذِيْ نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهٖ . (رواه ابو داود)

৩২৭৬. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কসমকে মজবুত করতে চাইতেন, তখন বলতেন– لَا وَالَّذِيْ نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهٖ অর্থাৎ না! কসম ঐ পবিত্র সত্তার, যাঁর হাতে আবুল কাসেম [মুহাম্মদ ﷺ] -এর প্রাণ। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٢٧٧ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ كَانَتْ يَمِيْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذَا حَلَفَ لَا وَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩২৭৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কসম করতেন। [তখন কখনও কখনও বলতেন] لَا وَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ অর্থ– এটা নয়; এবং আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। –[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মূল বাক্যের পূর্বে لَا বর্ণ ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হলো, পূর্বের বক্তব্য থেকে ফিরে যাওয়া অথবা এটি কথা বলার একটি ব্যবহারিক প্রচলন মাত্র। মূল বাক্যের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ বাক্যটি কোনো কসমের বাক্য নয়। সুতরাং এর দ্বারা কসম সংঘটিত হবে না। কিন্তু কসমের সাথে সাদৃশ্য রাখার কারণে এ জাতীয় বাক্যকে কসম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَعَنْ ٣٢٧٨ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ) وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ جَمَاعَةً وَقَفُوْهُ عَلٰى ابْنِ عُمَرَ .

৩২৭৮. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি কেউ কোনো কসম করে এবং [সঙ্গে সঙ্গে] ইনশাআল্লাহ বলে, সে উক্ত কসমের ব্যতিক্রম করলে গুনাহগার হবে না। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী] তবে ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, মুহাদ্দিসীনদের একটি জামাত হাদীসটিকে হযরত ইবনে ওমরের উপর মওকুফ করেছেন। অর্থাৎ হাদীসটি নবী করীম ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেনি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْحِنْثُ-এর পরিচিতি : "حِنْث" অর্থ–গুনাহ এবং কসম ভঙ্গ করা। সুতরাং কসম ভঙ্গকারীকে হানেছ বলা হয়। হাদীসের মর্ম হলো, যদি কেউ শপথ বাক্য উচ্চারণ করার সাথে সাথে ইনশাআল্লাহ বলে, তাহলে কসম সংঘটিত হবে না। সুতরাং তা ভঙ্গ করলে কাফফারাও ওয়াজিব হবে না। সকল আকদ ও মুআমালার একই হুকুম।

উল্লিখিত মাসআলার মাঝে ওলামাদের মতবিরোধ :

مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَالثَّوْرِيِّ وَأَبِيْ عُبَيْدَةَ وَإِسْحَاقَ : চার ইমাম, ছাওরী, আবূ উবাইদা ও ইসহাক (র.) তথা জমহুর ওলামায়ে কেরামের নিকট শপথ বাক্যের পরে مُتَّصِلًا [সঙ্গে সঙ্গে] অথবা সামান্য বিরতির [শ্বাস গ্রহণ করা, ঢেকুর দেওয়া, সোজা হয়ে দাঁড়ানো ইত্যাদির] পর যদি ইনশাআল্লাহ বলে, তাহলে কসম সংঘটিত হবে না। সুতরাং শপথের ব্যতিক্রম করলে কাফফারাও দিতে হবে না।

তাঁদের দলিল :

١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ .

আল্লামা তীবী (র.) বলেন– اَلْفَاءُ فِيْ قَوْلِهِ ﷺ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ يُشْعِرُ بِالْإِتِّصَالِ فَإِنَّهَا مَوْضُوْعَةٌ لِغَيْرِ التَّرَاخِيْ

٢. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنٰى فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ .

مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট مُنْفَصِلًا [পরবর্তীতে] ইনশাআল্লাহ বললেও কসম সংঘটিত হবে না।

উত্তর :

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উপরিউক্ত কথা আমলযোগ্য নয়। কেননা তাঁর কথার উপর আমল করলে সকল আক্দ বাতিল হওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। কেননা, আকদ সংঘটিত হওয়ার পর যখন তখন "ইনশাআল্লাহ" বলে দেবে।

২. ইমাম গাযালী (র.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এটা বর্ণনা করা সহীহ নয়।

مُتَّصِلْ ও مُنْفَصِلْ-এর সীমা : শপথ বাক্য বলার পর অন্য কথায় লিপ্ত হওয়া ব্যতীত সঙ্গে সঙ্গে إِنْ شَاءَ اللّٰهُ বললে مُتَّصِلْ হবে। আর অন্য কথার মাঝে লিপ্ত হওয়ার পর إِنْ شَاءَ اللّٰهُ বললে مُنْفَصِلْ হবে। –[মাযাহেরে হক খ. ৪, পৃ. ২৫৩]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٢٧٩ اَبِى الْاَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ ابْنَ عَمٍّ لِىْ اٰتِيْهِ اَسْاَلُهُ فَلَا يُعْطِيْنِىْ وَلَا يَصِلُنِىْ ثُمَّ يَحْتَاجُ اِلَىَّ فَيَأْتِيْنِىْ فَيَسْأَلُنِىْ وَقَدْ حَلَفْتُ اَنْ لَّا اُعْطِيَهُ وَلَا اَصِلَهُ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰتِىَ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَاُكَفِّرَ عَنْ يَمِيْنِىْ . رَوَاهُ النَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَأْتِيْنِىْ ابْنُ عَمِّىْ فَاَحْلِفُ اَنْ لَّا اُعْطِيَهُ وَلَا اَصِلَهُ قَالَ كَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ .

৩২৭৯. **অনুবাদ :** হযরত আবুল আহওয়াস আওফ ইবনে মালেক তাঁর পিতা [মালেক (রা.)] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে আমার চাচাতো ভাই সম্পর্কে কি আদেশ দেন? যখন আমি [কোনো প্রয়োজনে] তার নিকট যাই এবং কিছু [সাহায্য] চাই, তখন সে আমাকে [কিছুই] দেয় না এবং সদ্ব্যবহার করে না। [সুতরাং আমি এখন কি করব?] অতঃপর তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেন ঐ কাজ করি যা উত্তম। [অর্থাৎ তার জরুরত পূর্ণ করি এবং তার সাথে ভালো ব্যবহার করি।] আর আমার কসমের কাফফারা আদায় করে দেই। –[নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ] অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, ইমাম মালেক (র.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! [এক সময়] আমার চাচাতো ভাই আমার নিকট [সাহায্যের জন্য] আসে। তখন আমি শপথ করি, আমি তাকে [কিছুই] দেব না এবং তার সাথে সদ্ব্যবহার করব না। নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি তোমার কসমের কাফফারা আদায় কর।

بَابٌ فِى النُّذُوْرِ
পরিচ্ছেদ : মানত

اَلنُّذُوْرُ : শব্দটি نَذْرٌ -এর বহুবচন। অর্থ– মানত। নজর বিভিন্ন প্রকারের হওয়ার কারণে বহুবচন আনা হয়েছে। কসম পরিচ্ছেদে প্রাসঙ্গিকভাবে নজরের আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এ পরিচ্ছেদের মাঝে নজর সম্পর্কিত বিশেষ রেওয়ায়েতগুলো উল্লেখ করা হবে। ইমাম রাগেব (র.) বলেন, নজর বলা হয়, কোনো কারণবশত এমন কোনো কাজকে নিজের উপর ওয়াজিব করে নেওয়া, যা ওয়াজিব ছিল না। আমাদের যথাসম্ভব মানত না করা উচিত। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা মানত করো না। কারণ মানত তাকদীরকে পরিবর্তন করতে পারে না। তবে মানত করে ফেললে তখন তা অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٢٨٠ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَنْذُرُوْا فَاِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْقَدْرِ شَيْئًا وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩২৮০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা মানত করো না। কেননা মানত তাকদীরের কিছুই পরিবর্তন করতে পারে না। তবে এর দ্বারা কৃপণের কিছু খরচ হয় মাত্র। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মানতের দ্বারা তাকদীর পরিবর্তন হয় এ বিশ্বাসে মানত করা নিষেধ। এ ছাড়াও সাধারণত মানুষের অভ্যাস হলো বিপদ হতে বাঁচা অথবা কোনো কিছু লাভ করার জন্য মানত করে থাকে অথচ এটা কৃপণ স্বভাবের পরিচায়ক। সুতরাং এ ধরনের উদ্দেশ্যে মানত করতে নিষেধ করা হয়েছে। কাজি ইয়ায (র.) ও মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.) বলেন, ঐ মানত করতে নিষেধ করা হয়েছে, যে মানতের মাঝে নজরকে مُؤَثِّرْ حَقِيْقِىْ মনে করা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যা তাকদীরে রাখেননি, তা ঐ নজর দ্বারা হয়ে যাবে এমন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা হয়। হ্যাঁ যদি আল্লাহ তা'আলাকে প্রকৃত লাভ ক্ষতির মালিক বিশ্বাস করে নজরকে শুধুমাত্র অসিলা হিসেবে গ্রহণ করে। তাহলে এ ধরনের নজর জায়েজ আছে এবং এ ধরনের নজর পূর্ণ করা ইবাদত।

ইবনুল আছীর, আবূ উবাইদ এবং খাতাবী (র.) বলেন, "لَا تَنْذُرُوْا" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানত করার পর তা পূর্ণ করার ক্ষেত্রে বিলম্ব ও অলসতা না করা উচিত। কেননা তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে গেছে।

হাদীসের শেষাংশ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় খরচ করার ক্ষেত্রে দানশীল ও কৃপণের মাঝে একটি চমৎকার সূক্ষ্ম পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। দানশীল ব্যক্তি কোনো নজর ও মানত ছাড়াই আল্লাহর রাস্তায় মাল ব্যয় করে। কিন্তু কৃপণের সে তাওফীক হয় না। যদি সে মাল খরচ করতে চায়, তাহলে মানতকে মাধ্যম বানায়। আর সে বলে যদি আমার অমুক কাজ সাধিত হয়, তাহলে আমি এতটুকু মাল খরচ করব।

এমনিভাবে দানশীল ব্যক্তি সহমর্মিতার উদ্দেশ্যে ব্যয় করে। পক্ষান্তরে কৃপণ লোক নিজের কোনো উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য দান করে।

وَعَنْ ٣٢٨١ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُّطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَّعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩২৮১. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করার মানত করে, সে যেন অবশ্যই তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি তাঁর নাফরমানি করার মানত করে সে যেন তাঁর নাফরমানি না করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মানত দু-ধরনের হতে পারে। যথা– ভালো এবং নেক কাজের মানত অথবা খারাপ এবং গুনাহের কাজের মানত। তবে ভালো এবং নেক কাজের মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব। কিন্তু মন্দ ও গুনাহের কাজের মানত পূর্ণ করা জায়েজ নেই। তবে এ ক্ষেত্রে মানতের ব্যতিক্রম করে কাফফারা দিতে হবে।

وَعَنْ ٣٢٨٢ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيْ مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيْمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لَا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ .

৩২৮২. **অনুবাদ :** হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, গুনাহর কাজের মানত পূরা করতে নেই। আর বান্দা যে বস্তুর মালিক নয় এমন জিনিসের মানত করলে তাও পূর্ণ করতে হয় না। –[মুসলিম] অন্য রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহর নাফরমানি হয় এমন কাজে মানত শুদ্ধ হয় না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যদি কেউ গুনাহের কাজের মানত করে। যেমন– বলল, যদি আমার অমুক প্রয়োজন পূর্ণ হয় তাহলে আমি নাচ গানের অনুষ্ঠান করব। অথবা আমার ছেলেকে জবাই করব। সকল ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্য অনুযায়ী এ ধরনের মানত গ্রহণযোগ্য নয়। এটা পুরা করা হারাম ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে কাফফারা ওয়াজিব হবে কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে–

গুনাহের মানতের মাঝে কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ :

مَذْهَبُ اِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَزُفَرَ وَاَحْمَدَ (رحـ) فِيْ رِوَايَةٍ : ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম যুফার ও ইমাম আহমদ (র.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী গুনাহের মানত সংঘটিত হবে না; বরং তা অনর্থক হয়ে যাবে। সুতরাং এ মানত পুরা করা জরুরি নয় এবং কাফফারাও ওয়াজিব নয়।

তাঁদের দলিল : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيْ مَعْصِيَةٍ .

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যদি গুনাহের মানত পূর্ণ না করলে কাফফারা ওয়াজিব হতো, তাহলে নবী করীম ﷺ অবশ্যই বর্ণনা করতেন। কিন্তু নবী করীম ﷺ যেহেতু বলেননি সেহেতু বুঝা গেল, এ জাতীয় মানত পুরা না করার দ্বারা কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

مَذْهَبُ اِمَامِ اَحْمَدَ (رحـ) فِيْ رِوَايَةٍ مَشْهُوْرٍ : ইমাম আহমদ (র.)-এর প্রসিদ্ধ মাযহাব মতে, তার উপর কসমের কাফফারা ওয়াজিব হবে।

তাঁর দলিল :

১. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِيْ مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ . (اَبُوْ دَاوُدَ)

২. عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ . (تِرْمِذِيْ، نَسَائِيْ)

৩. فِيْ حَدِيْثِ عِمْرَانَ (رض) وَمَنْ كَانَ نَذَرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ فَذٰلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلَا وَفَاءَ فِيْهِ وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِيْنَ .

উল্লিখিত তিনটি হাদীসের মাঝেই গুনাহের মানতে কাফফারা দিতে বলা হয়েছে।

(رحـ) مَذْهَبُ اِمَامْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَصَاحِبَيْنِ : ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.)-এর মতে, যদি গুনাহের মানত حَرَامٌ بِعَيْنِهَا [হুবহু হারাম] হয়। যেমন– হত্যা, মদ্যপান, ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদি তাহলে মানত সংঘটিত হবে না; সুতরাং কাফফারাও ওয়াজিব হবে না।

আর যদি গুনাহের মানত حَرَامٌ بِغَيْرِهَا [অন্য কোনো কারণে হারাম] হয়। যেমন– কুরবানির দিবস ও আইয়ামে তাশরীকে রোজা রাখা ইত্যাদি। তাহলে মানত সংঘটিত হবে। কিন্তু পূর্ণ করা হারাম। কেননা এতে আল্লাহ তা'আলার দাওয়াতকে অস্বীকার করা হয়। সুতরাং মানতকারী পরবর্তীতে ঐ রোজাগুলো কাজা করবে। আর যদি কাজা না করে, তাহলে কাফফারা দিতে হবে। তবে যদি মানত দ্বারা কসমের ইচ্ছা করে তখন حُرِمَتْ لِعَيْنِهَا এবং حُرِمَتْ بِغَيْرِهَا উভয় অবস্থায় কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং কাফফারা দেওয়া ওয়াজিব হবে।

দলিল : গুনাহের মানত حَرَامٌ لِعَيْنِهَا হওয়া অবস্থায় হানাফীগণ শাফেয়ীদের পেশকৃত দলিল দিয়ে দলিল প্রদান করেন। অর্থাৎ যে সকল হাদীসে কাফফারার কথা উল্লেখ নেই, সেগুলো পেশ করেন। আর গুনাহের মানত حَرَامٌ لِغَيْرِهَا হওয়া অবস্থায় ইমাম আহমদ (র.) কর্তৃক দলিল পেশ করেন।

وَعَنْ ٣٢٨٣ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩২৮৩. অনুবাদ : হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, মানতের কাফফারা কসমের কাফফারার মতো। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٢٨٤ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ اِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوْا اَبُوْ اِسْرَائِيْلَ نَذَرَ اَنْ يَّقُوْمَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُوْمَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مُرُوْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩২৮৪. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত নবী করীম ﷺ বক্তৃতা করতেছিলেন। হঠাৎ দেখলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। নবী করীম ﷺ তার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। [সে কে? কেনইবা সে দাঁড়িয়ে আছে?] লোকেরা বলল, আবূ ইসরাঈল। সে মানত করেছে যে, দাঁড়িয়ে থাকবে বসবে না, ছায়া গ্রহণ করবে না এবং কথা বলবে না এবং [সর্বদা] রোজা রাখবে। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তাকে বলে দাও, সে যেন কথা বলে এবং ছায়া গ্রহণ করে ও বসে, আর রোজা পূর্ণ করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সামর্থ্য থাকলে সর্বদা রোজা রাখা উত্তম। কিন্তু নিষিদ্ধ পাঁচদিন রোজা রাখা যাবে না। কিন্তু যদি ঐ পাঁচদিনসহ মানত করে তবুও এ পাঁচদিন রোজা না রাখা ওয়াজিব। হানাফীদের নিকট উক্ত দিনগুলোর রোজা ভঙ্গ করার কাফফারাও দেওয়া ওয়াজিব হবে।

যে কাজগুলো করা অসম্ভব ছিল নবী করীম ﷺ সেগুলো করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন– কথাবার্তা না বলা শরয়ীভাবেই অসম্ভব। কেননা কখনও কখনও বলা ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন– সালামের উত্তর দেওয়া, নামাজে ক্বেরাআত পড়া ইত্যাদি। এজন্য তাকে কথা বলার আদেশ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে, না বসা এবং ছায়া গ্রহণ না করা সম্ভব নয়। এজন্য নবী করীম ﷺ তাকে বসতে বলেছেন ও ছায়া গ্রহণ করতে বলেছেন।

وَعَنْ ٣٢٨٥ اَنَسٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادِيْ بَيْنَ اِبْنَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ هٰذَا قَالُوْا نَذَرَ اَنْ يَّمْشِيَ اِلَى بَيْتِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَنْ تَعْذِيْبِ هٰذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ وَاَمَرَهُ اَنْ يَّرْكَبَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِرْكَبْ اَيُّهَا الشَّيْخُ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ .

৩২৮৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ এক বৃদ্ধকে তার দুই পুত্রের কাঁধে ভর করে চলতে দেখলেন। তখন জিজ্ঞেস করলেন, লোকটির কি হয়েছে? লোকেরা বলল, সে মানত করেছে যে, বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাবে। তিনি বললেন, এই লোককে কষ্ট দেওয়া আল্লাহ তা'আলার কোনো প্রয়োজন নেই। অতঃপর তিনি তাকে সওয়ারিতে আরোহণ করার নির্দেশ দিলেন। –[বুখারী ও মুসলিম] হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে মুসলিমের অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, নবী করীম ﷺ ঐ বৃদ্ধকে বললেন, হে বৃদ্ধ তুমি সওয়ারিতে আরোহণ কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা তোমার ও তোমার মানতের মুখাপেক্ষী নন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : পায়ে হেঁটে বায়তুল্লাহ শরীফে যাওয়ার মানত করা সকলের ঐকমত্য অনুযায়ী জায়েজ আছে। কিন্তু পায়ে হেঁটে যাওয়া জরুরি নয়; বরং সওয়ারিতে আরোহণ করে যাবে এবং কাফফারা আদায় করবে।

বায়তুল্লাহ শরীফে পায়ে হেঁটে যাওয়ার মানতের মাঝে ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ :

مَذْهَبُ اِمَامِ الشَّافِعِيِّ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, যদি মানতকারী পায়ে হেঁটে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে, তাহলে পায়ে হেঁটে যেতে হবে। আর যদি পায়ে হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা না রাখে, তাহলে সওয়ারিতে আরোহণ করে যাবে এবং কাফফারাস্বরূপ একটি প্রাণী [ছাগল বা দুম্বা] জবাই করে দেবে। হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তার উপর একটি উট জবাই করা ওয়াজিব। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন– وَلْتُهْدِ بُدْنَةً

مَذْهَبُ اِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاَصْحَابِهٖ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং তাঁর অনুসারীদের মতে, সে পায়ে হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা রাখুক বা না রাখুক– উভয় অবস্থায় সওয়ারিতে চড়ে সফর করবে এবং কাফফারাস্বরূপ "দম" তথা একটি প্রাণী জবাই করবে। "দম" সম্বন্ধে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন– وَلْيُهْدِ هَدْيًا وَاَقَلُّهُ شَاةٌ تَكُوْنُ مَكَانَ الْمَشْيِ আর যে রেওয়ায়েতে وَلْتُهْدِ بُدْنَةً রয়েছে, তা দ্বারা মুস্তাহাব বুঝানো হয়েছে। যদি কেউ বলে, على المشى الى بيت الله অর্থাৎ বায়তুল্লাহ শরীফে পায়ে হেঁটে যাওয়ার মানত করে, তাহলে তার উপর হজ বা ওমরার যে কোনো একটি ওয়াজিব হবে তখন সে তার নিয়ত অনুযায়ী যে কোনো একটি আদায় করবে। –[মিরকাত খ. ৭, পৃ. ৩৭; তানযীমুল আশতাত খ. ২ পৃ. ২৩১]

وَعَنْ ٣٢٨٦ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِيْ نَذْرٍ كَانَ عَلٰى اُمِّهٖ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهُ فَاَفْتَاهُ اَنْ يَّقْضِيَهُ عَنْهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩২৮৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত সাদ ইবনে উবাদা (রা.) হযরত নবী করীম ﷺ-এর নিকট ফতোয়া জানতে চাইলেন যে, তার মাতার উপর একটি মানত ছিল, কিন্তু তা পূর্ণ করার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তখন নবী করীম ﷺ ফতোয়া দিলেন, তাঁর পক্ষ থেকে তুমি তা আদায় করবে।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত সাদ ইবনে উবাদা (রা.)-এর মাতা কিসের মানত করেছিলেন? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি "মুতলাক" [স্বাধীন] মানত করেছেন। কেউ বলেন, তিনি রোজা রাখার মানত করেছিলেন। আবার কেউ বলেন, তিনি গোলাম আজাদ করার মানত করেছিলেন। কারো মতে, সদকা করার মানত করেছিলেন। তবে বিশুদ্ধ কথা হলো তিনি মাল সংক্রান্ত মানত করেছিলেন অথবা তাঁর মানত মুবহাম বা অস্পষ্ট ছিল।

ওয়ারিশদের উপর মান্নত পূর্ণ করা কর্তব্য হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ :

مَذْهَبُ اَصْحَابِ الظَّوَاهِرِ : আসহাবে যাওয়াহেরদের নিকট মৃত ব্যক্তির মানতের কাজা ওয়ারিশদের পক্ষ থেকে আদায় করা ওয়াজিব।

তাঁদের দলিল :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِيْ نَذْرٍ كَانَ عَلٰى اُمِّهٖ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهُ فَاَفْتَاهُ اَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

مَذْهَبُ اِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَجُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ : আবূ হানীফা (র.) ও জমহুর ওলামায়ে কিরামের নিকট যদি মৃত ব্যক্তির মানত "ইবাদতে বদনিয়্যাহ" অর্থাৎ শারীরিক ইবাদত সম্পর্কে হয়, তাহলে ওয়ারিশদের জন্য তা কাজা করা জায়েজ নেই।

দলিল :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا صَوْمَ اَحَدٍ عَنْ اَحَدٍ وَلَا يُصَلِّيْ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

আর যদি ঐ মানত কোনো "ইবাদতে মালিয়া" অর্থাৎ মাল সংক্রান্ত হয়। আর মৃত ব্যক্তি মালসম্পদ রেখে যায় এবং এজন্য অসিয়ত করে যায়, তাহলে "ছুলুছে মাল" [মালের এক তৃতীয়াংশ] থেকে মানত পুরা করা ওয়ারিশদের উপর ওয়াজিব। আর যদি মৃত ব্যক্তি অসিয়ত না করে থাকে এবং মালসম্পদ রেখে না যায়, তাহলে ওয়ারিশদের উপর মানত পুরা করা ওয়াজিব নয়। কেননা ওয়ারিশরা এ মানতকে নিজেদের জন্য আবশ্যকীয় করে নাই। সুতরাং এটা ওয়ারিশদের জন্য বেশির চেয়ে বেশি মোস্তাহাব হতে পারে। ওয়াজিব কিভাবে হবে?

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِ : সম্ভবত উম্মে সা'দ (রা.)-এর মালসম্পদ অবশিষ্ট ছিল এবং তিনি এজন্য নির্দেশও দিয়েছিলেন।

وَعَنْ ٣٢٨٧ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ اَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَالِيْ صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ فَاِنِّيْ اُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِيْ بِخَيْبَرَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَهٰذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيْثٍ مُطَوَّلٍ .

৩২৮৭. অনুবাদ : হযরত কাব ইবনে মালেক (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই আমার তওবার মাঝে এটাও আছে যে, আমি আমার মালসম্পদ হতে পুরাপুরিভাবে পৃথক হয়ে যাব, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সম্পদের কিয়দংশ তোমার নিকট রেখে দাও। তাই হবে তোমার জন্য উত্তম। আমি আরজ করলাম, [আচ্ছা] আমি আমার খায়বারের অংশটি নিজের জন্য রেখে দেব। −[বুখারী ও মুসলিম] উল্লিখিত রেওয়ায়েতটি একটি হাদীসের অংশবিশেষ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের বাহ্যিক শব্দের মাঝে মানতের কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) মনে মনে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, যদি তওবা কবুল হয় তাহলে তিনি এরূপ করবেন। সুতরাং এটাই ছিল মানত। অথবা এক বিশেষ অবস্থায় অর্থাৎ তওবা কবুল হওয়ার কারণে ওয়াজিব নয়, এমন বস্তুকে হযরত কাব (রা.) নিজের উপর ওয়াজিব করে নিয়েছেন। এদিক দিয়ে এটি মানতের সাথে সাদৃশ্য রাখে। আর সাদৃশ্যের কারণে হাদীসটি মানত পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.)-এর ঘটনা : নবম হিজরিতে নবী করীম ﷺ তাবুক অভিযান করেন। নবী করীম ﷺ সকল সক্ষম মুসলমান মুজাহিদদেরকে তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। অতঃপর ত্রিশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তাবুক অভিমুখে রওয়ানা করেন। তাবুকে বিশ দিন অবস্থান করার পর নবী করীম ﷺ বিজয়ীবেশে মদিনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। এ যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেনি, তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৮০ জন। তাদের প্রায় সকলেই মুনাফিক ছিল। নবী করীম ﷺ তাদের বাহ্যিক ওজর গ্রহণ করেন। পিছনে রয়ে যাওয়া লোকদের মাঝে তিনজন খাঁটি মুসলমানও ছিলেন। তাঁরা হলেন, হযরত কা'ব ইবনে মালেক, হযরত মুরারা ইবনে রবী, হযরত হেলাল ইবনে উমাইয়া।

নবী করীম ﷺ এদের উপর অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং তাদের সাথে কাউকে কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন। তাঁরা এজন্য অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল এবং অপরাধের জন্য খুব কান্নাকাটি করে আল্লাহ তা'আলার নিকট ইসতেগফার করতে লাগল। অতঃপর এভাবে পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর, তাঁদের তওবা কবুল করা হয় এবং তাঁদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়- وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا الخ

দীর্ঘ যন্ত্রণা ভোগের পরে এ সুসংবাদ অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত কা'ব (রা.) নবী করীম ﷺ-এর নিকট আরজ করলেন, আমার তওবাকে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়ার জন্য শুকরিয়া স্বরূপ আমার সকল মাল সদকা করে দিতে চাই। তখন নবী করীম ﷺ তাকে বললেন, কিছু মাল তোমার নিজের জন্য রেখে দাও, তাই তোমার জন্য উত্তম। তখন তিনি খায়বারে প্রাপ্ত অংশ রেখে অবশিষ্ট মালসম্পদ সদকা করে দেন।

সকল মাল সদকা করার মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি তার সকল মালসম্পদ সদকা করে দেওয়ার মানত করে, তাহলে তার হুকুম হলো, সে তার নিজের ও পরিবারবর্গের খরচ রেখে অবশিষ্ট মাল সদকা করবে।

একটি প্রশ্ন : হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) যখন তাঁর সকল মালসম্পদ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় সদকা করে দিলেন। তখন নবী করীম ﷺ তা কবুল করলেন। পক্ষান্তরে হযরত কা'ব (রা.)-কে কিছু মাল রেখে দেওয়ার নির্দেশ কেন দিলেন?

জবাব : হযরত আবূ বকর (রা.) ও কা'ব-এর মাঝে অনেক ব্যবধান আছে। যদি হযরত কা'ব (রা.) তাঁর সকল সম্পদ দান করে দেন, তাহলে অভাব-অনটনের কারণে পরিণামে তাঁর সবর ও ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে, এমন সম্ভাবনা ছিল। পক্ষান্তরে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি ছবর, ধৈর্য ও তায়াক্কুলের অতি উচ্চ স্তরে আসীন ছিলেন। তার ব্যাপারে এমন কল্পনাও করা যেত না যে, তিনি যে কোনো কঠিন থেকে কঠিনতর মুহূর্তে ধৈর্য হারিয়ে বসবেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٢٨٨ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

৩২৮৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গুনাহের কাজে মানত নেই। আর তার কাফফারা হলো কসমের কাফফারার মতো। গুনাহের কাজের মানত করলে তা পুরা করবে না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

وَعَنْ ٣٢٨٩ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِيْ مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيْقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا اَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَوَقَّفَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ)

৩২৮৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো অনির্দিষ্ট জিনিসের মানত করল, তার কাফফারা কসমের কাফফারার ন্যায়। আর যে ব্যক্তি কোনো গুনাহের কাজের মানত করল, তার কাফফারাও কসমের কাফফারার ন্যায়। আর যে ব্যক্তি এমন কাজের মানত করল যা পুরা করার সে ক্ষমত রাখে না, তার কাফফারাও কসমের কাফফারার মতো। আর যে ব্যক্তি এমন কাজের মানত করল যা পুরা করার ক্ষমতা রাখে, তাহলে সে যেন তা অবশ্যই পূর্ণ করে। -[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ। কোনো কোনো রাবী এ হাদীসটিকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উপর মওকুফ বলেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ : অর্থাৎ অনির্দিষ্ট মানত। যেমন, কেউ বলল– نَذَرْتُ نَذْرًا অথবা عَلَىَّ نَذْرٌ এবং নামাজ রোজা বা অন্য কিছু আবশ্যক করল না, তাহলে তার কাফফারা হবে কসমের কাফফারার ন্যায়। যেমন বলা হয়েছে– فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ আল্লামা নববী (র.) বলেন, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে–

مَذْهَبُ الشَّوَافِعِ : শাফেয়ীদের নিকট এর দ্বারা نَذْرُ لِجَاجٍ উদ্দেশ্য। যেমন কেউ বলল, إِنْ كَلَّمْتُ زَيْدًا فَلِلّٰهِ عَلَىَّ حَجَّةٌ যদি এই نَذْرُ لِجَاجٍ-এর সুরতে মানতকারী যায়েদের সাথে কথা বলে, তাহলে কসমের কাফফারা আদায় করবে অথবা মানতকৃত জিনিস অর্থাৎ হজ আদায় করবে।

مَذْهَبُ اِمَامِ اَحْمَدَ (رحـ) : ইমাম আহমদ (র.)-এর নিকট এর দ্বারা نَذْرُ مَعْصِيَتٍ উদ্দেশ্য। এর বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ وَمَوَالِكْ (رحـ) : হানাফী ও মালেকীদের নিকট এর দ্বারা نَذْرٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ [অনির্দিষ্ট মানত] উদ্দেশ্য। যেমন– কেউ বলল, لِلّٰهِ عَلَىَّ نَذْرٌ এখানে রোজা বা হজ কোনো কিছু নির্দিষ্ট করা হয়নি। এই মানতের কাফফারা কসমের কাফফারার ন্যায়।

تَرْجِيْحُ مَذْهَبِ الْاَحْنَافِ وَمَوَالِكْ :

১. হাদীসে উল্লিখিত لَمْ يُسَمِّهِ বাক্যটি نَذْرٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ হওয়ার উপর স্পষ্টভাবে প্রমাণ বহন করে।

২. এ রেওয়ায়েত মুসলিম শরীফে এভাবে আছে– كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ

তিরমিযী শরীফে আছে– كَفَّارَةُ النَّذْرِ اِذَا لَمْ يُسَمِّهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ

তাবারানীর মধ্যে আছে– اَلنَّذْرُ يَمِيْنٌ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ

এ সকল রেওয়ায়েত আমাদের উল্লিখিত হাদীসের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা نَذْرٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ তথা অনির্দিষ্ট মানতই উদ্দেশ্য; نَذْرُ لِجَاجٍ ইত্যাদি উদ্দেশ্য নেওয়া সঙ্গত নয়। আর وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِىْ مَعْصِيَةٍ -কে مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ-এর উপর আতফ করা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এর দ্বারা نَذْرُ مَعْصِيَتٍ ও উদ্দেশ্য নেওয়া সঠিক হবে না।

৩২৯০. وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ (رضـ) قَالَ نَذَرَ رَجُلٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَنْحَرَ اِبِلًا بِبُوَانَةَ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ كَانَ فِيْهَا وَثَنٌ مِنْ اَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ قَالُوْا لَا قَالَ فَهَلْ كَانَ فِيْهَا عِيْدٌ مِنْ اَعْيَادِهِمْ قَالُوْا لَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْفِ بِنَذْرِكَ فَاِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلَا فِيْمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩২৯০. অনুবাদ : হযরত ছাবিত ইবনে যাহহাক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে এই মানত করল যে, সে বুওয়ানাহ [মক্কার নিম্নাঞ্চল] নামক স্থানে একটি উট জবাই করবে। অতঃপর সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে তা জানাল। তখন নবী করীম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, জাহিলি যুগে কি সেখানে কোনো প্রতিমা ছিল? যার পূজা করা হতো। সাহাবীগণ বললেন, না। তিনি আরো জিজ্ঞেস করলেন, সেখানে কি কাফেরদের কোনো মেলা বসত। সাহাবীগণ বললেন, না। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর। কেননা, যে কাজে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি হয়, এমন মানত পুরা করতে নেই। আদম সন্তান যে বস্তুর মালিক নয়, সেই বস্তুর মানত করলে তা পূর্ণ করতে হয় না। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٢٩١ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (رضـ) عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنِّيْ نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلٰى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ قَالَ أَوْفِيْ بِنَذْرِكِ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ) وَزَادَ رَزِيْنٌ قَالَتْ وَنَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا مَكَانٌ يَذْبَحُ فِيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ هَلْ كَانَ بِذٰلِكَ الْمَكَانِ وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ قَالَتْ لَا قَالَ هَلْ كَانَ فِيْهِ عِيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ قَالَتْ لَا قَالَ أَوْفِيْ بِنَذْرِكِ -

৩২৯১. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শুআইব তাঁর পিতা থেকে, আর তিনি তাঁর দাদা [হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)] থেকে বর্ণনা করেন, এক মহিলা আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি মানত করেছি যে, [যখন আপনি জিহাদ থেকে আগমন করবেন তখন] আমি আপনার সামনে দফ বাজাব। তিনি বললেন, তোমার মানত পুরা কর। –[আবূ দাউদ] আর রাযীন কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। মহিলাটি বলল, আমি অমুক অমুক স্থানে জানোয়ার জবাই করার মানত করেছি। জাহিলি যুগে যেখানে লোকেরা পশু জবাই করত। তখন নবী করীম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, সেখানো জাহিলি যুগে কোনো দেব-দেবী ছিল কি? যেগুলোর পূজা করা হতো। মহিলা বলল, না। তিনি আরও জিজ্ঞেস করলেন, সেখানে কি কাফেরদের কোনো মেলা বসত? মহিলাটি বলল, না। এবার তিনি বললেন, তোমার মানত পুরা কর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : دَفٌّ [দফ] এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র একদিক হতে বাজান যায়। বর্তমানে আমরা তাকে তবলার সাথে তুলনা করতে পারি। তৎকালীন সময় আরবে এর রেওয়াজ ছিল। বিভিন্ন আনন্দ-উৎসবে তা বাজানো হতো। উল্লিখিত হাদীসের মাঝে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, জনৈক দাসী মানত করেছিল, নবী করীম ﷺ যদি যুদ্ধ থেকে বিজয় হয়ে নিরাপদে ফিরে আসেন, তাহলে সে নবী করীম ﷺ -এর সামনে দফ বাজাবে। নবী করীম ﷺ ঘটনা শুনে তাকে অনুমতি দিলেন। নবী করীম ﷺ কর্তৃক উক্ত দাসীকে দফ বাজানোর অনুমতি দেওয়ার কারণে দফ বাজানো মুবাহ প্রমাণিত হয়। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, বিবাহ-শাদি ইত্যাদি উৎসবে সকল অবৈধ ও নাজায়েজ উপকরণ থেকে বেঁচে থেকে দফ বাজানো মুবাহ।

وَعَنْ ٣٢٩٢ أَبِيْ لُبَابَةَ (رضـ) أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِيَ الَّتِيْ أَصَبْتُ فِيْهَا الذَّنْبَ وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِيْ كُلِّهِ صَدَقَةً قَالَ يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ - (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

৩২৯২. অনুবাদ : হযরত আবূ লুবাবা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ -কে বললেন, আমার পরিপূর্ণ তওবা এটাই হবে যে, আমি স্বীয় খানদানি গৃহখানা পরিত্যাগ করব, যেখানে থেকে আমি এ পাপাচারে লিপ্ত হয়েছি। আমি আমার সমস্ত মালসম্পদ সদকাস্বরূপ বর্জন করব। নবী করীম ﷺ বললেন, তোমার জন্য এক তৃতীয়াংশ যথেষ্ট। –[রাযীন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হযরত আবূ লুবাবা (রা.)-এর ঘটনা এবং এক তৃতীয়াংশের অধিক মাল সদকা করার উপর নিষেধাজ্ঞা : হযরত আবূ লুবাবা (রা.)-এর ঘটনা ইসলামি ইতিহাসে এক বেনজির ও আশ্চর্যজনক ঘটনা। হযরত আবূ লুবাব আনসারী (রা.)-এর পরিবারবর্গ ও মালসম্পদ ইহুদি এলাকায় ছিল। তাই ইহুদি সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর বাহ্যিক ভালোবাসা ছিল। নবী করীম ﷺ

যখন বনী কুরাইযাকে অবরোধ করলেন তখন তারা দূত মারফত নবী করীম ﷺ -এর নিকট পয়গাম পাঠাল, আপনি আপনার সাহাবী আবূ লুবাবাকে আমাদের নিকট প্রেরণ করুন। এ ব্যাপারে আমরা তাঁর সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। নবী করীম ﷺ তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং হযরত আবূ লুবাবাকে তাদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তারা আবূ লুবাবার নিকট জানতে চাইল, যদি আমরা আত্মসমর্পণ করি, তাহলে মুহাম্মদ ﷺ আমাদের সাথে কি আচরণ করবেন? তখন আবূ লুবাবা "হলক" [গলদেশ]-এর উপর হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বুঝালেন, তোমাদের সকলকে হত্যা করে ফেলবেন। হযরত আবূ লুবাবা (রা.)-এর মালসম্পদ ও পরিবারপরিজন যেহেতু তাদের নিকট ছিল তাই মানবিক প্রবৃত্তির কারণে তিনি এ গোপনীয়তা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। হযরত আবূ লুবাব (রা.) বলেন, আমি এ কথা বলার পর সেখান থেকে পা উঠানোর পূর্বেই উপলব্ধি করলাম আমি আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ -এর সাথে খেয়ানত করেছি। তখন আমি অত্যন্ত লজ্জিত হলাম। অতঃপর এ আয়াত নাজিল হয়– يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمٰنٰتِكُمْ অর্থাৎ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ﷺ আমানতের খেয়ানত করো না এবং তোমরা নিজেদের আমানতের খেয়ানত করো না।' হযরত আবূ লুবাবা (রা.) তার এ কর্মের জন্য অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সাথে নিজেকে বেঁধে ঘোষণা দিলেন– আমার জন্য পানাহার করা হারাম। হয়তোবা আল্লাহ তা'আলা আমার তওবা কবুল করবেন অথবা এ অবস্থায়ই আমার মৃত্যু এসে যাবে। শুধু নামাজের সময় তাঁর এক মেয়ে এসে বাঁধন খুলে দিত। নামাজ শেষ হলে আবার বেঁধে দিত। এভাবে তিনি সাতদিন ছিলেন। অবশেষে ক্ষুধার যন্ত্রণায় বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানি হলো এবং তাঁর তওবা কবুল হলো। অতঃপর লোকজন এসে বলল, আল্লাহ তা'আলা তোমার তওবা কবুল করেছেন। এখন বাঁধন খুলে ফেল। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত নবী করীম ﷺ এসে নিজ হাত দিয়ে বাঁধন না খুলবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বাঁধন খুলব না। এরপর নবী করীম ﷺ এসে নিজ হাতে তাঁর বাঁধন খুলে দেন।

قَوْلُهُ اَنْ اَهْجُرَ دَارَ قَوْمِيْ : ঐ গৃহ সম্পর্কে নবী করীম ﷺ কি নির্দেশ দিয়েছেন, তা হাদীসে উল্লেখ নেই। তবে বাহ্যিকভাবে হাদীসের ভাষ্য দ্বারা মনে হচ্ছে, আবূ লুবাবার ঐ ঘর পরিত্যাগ করা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই নবী করীম ﷺ তা বহাল রেখেছেন। অবশ্য সদকার ব্যাপারে নবী করীম ﷺ বলেছেন, সমস্ত মাল সদকা করার প্রয়োজন নেই; বরং সকল সম্পদের এক তৃতীয়াংশ সদকা করাই উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে।

وَعَنْ ٣٢٩٢ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) اَنَّ رَجُلًا قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ اَنْ اُصَلِّ فِيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ صَلِّ هٰهُنَا ثُمَّ اَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ صَلِّ هٰهُنَا ثُمَّ اَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ شَاْنَكَ اِذًا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ)

৩২৯৩. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি মক্কা বিজয়ের দিন দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট এই মানত করেছি যে, যদি আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মক্কা বিজয় দান করেন, তাহলে আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে দু রাকাত নামাজ পড়ব। নবী করীম ﷺ বললেন, এখানে [মসজিদে হারামে] নামাজ পড়ে নাও। লোকটি আবার এ আরজ করল। তিনি এবারও বললেন, এ জায়গায় নামাজ পড়ে নাও। লোকটি তৃতীয়বার সে কথা পুনরাবৃত্তি করল। এবার নবী করীম ﷺ বললেন, তোমার মনে যা চায় কর। –[আবূ দাউদ, দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ صَلِّ هٰهُنَا : এ জায়গায় নামাজ পড়ে নাও। বায়তুল্লাহ শরীফ যেহেতু সকল মসজিদের চেয়ে উত্তম স্থান তাই নবী করীম ﷺ এ নির্দেশ দিয়েছেন। অথবা কোনো বিশেষ স্থানের মানত করলে যে কোনো স্থানে আদায় করলেই যথেষ্ট হবে। তবে এ মাসআলার মাঝে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে।

مَذْهَبُ الشَّوَافِعِ শাফেয়ীদের নিকট যদি কোনো বিশেষ স্থানে নামাজ পড়ার মানত করে এবং ঐ নামাজ যদি অন্য কোনো স্থানে পড়ে, যা তার চেয়ে উত্তম তাহলে মানত পুরা হয়ে যাবে।

তাঁদের দলিল :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) اَنَّ رَجُلًا قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اِنْ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ اَنْ اُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ صَلِّ هٰهُنَا ثُمَّ اَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ صَلِّ هٰهُنَا ثُمَّ اَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ شَاْنُكَ اِذًا - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِىُّ)

মসজিদে হারামে নামাজ পড়া যেহেতু বায়তুল মুকাদ্দাসে নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম, তাই নবী করীম ﷺ বলেছেন, এখানে নামাজ পড়ে নাও।

مَذْهَبُ اِمَامِ زُفَرَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رح) : ইমাম যুফার এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী যে স্থানের জন্য মানত করেছে, সে স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও মান্নত পুরা করা জায়েজ হবে না।

দলিল :

اِنَّ اِيْجَابَ الْعَبْدِ يُعْتَبَرُهَا بِاِيْجَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَا اَوْجَبَ اللّٰهُ تَعَالٰى مُقَيَّدًا بِمَكَانٍ لَا يَجُوْزُ اَدَاءً فِىْ غَيْرِهٖ كَالنَّحْرِ فِى الْحَرَمِ وَالْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ وَالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْىِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كَذَا مَا اَوْجَبَ الْعَبْدُ -

مَذْهَبُ اِمَامِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَالصَّاحِبَيْنِ (رح) : হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর নিকট যদি কোনো বিশেষ স্থানে নামাজ পড়ার মানত করে এবং তার চেয়ে কম ফজিলতপূর্ণ স্থানে নামাজ আদায় করে, তাহলেও মানত পুরা হয়ে যাবে।

দলিল :

اِنَّ الْمَقْصُوْدَ مِنَ النَّذْرِ هُوَ التَّقَرُّبُ اِلَى اللّٰهِ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ نَذْرِهٖ اِلَّا مَا هُوَ قُرْبَةٌ وَالْمَكَانُ اِنَّمَا هُوَ مَحَلُّ اَدَاءِ الْقُرْبَةِ فَلَمْ يَكُنْ لِنَفْسِهٖ قُرْبَةٌ فَلَا يَدْخُلُ الْمَكَانُ تَحْتَ نَذْرِهٖ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِهٖ فَكَانَ ذِكْرُهٗ وَالسُّكُوْتُ عَنْهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ -

তাঁদের দলিলের জবাব : নবী করীম ﷺ বলেছেন- صَلِّ هٰهُنَا এখানে নামাজ পড়। অর্থাৎ মসজিদে হারামে নামাজ পড়। এখানে নামাজ পড়া বায়তুল মুকাদ্দাসের তুলনায় সহজ ও সুবিধাজনক হওয়ার কারণে নবী করীম ﷺ এ নির্দেশ দিয়েছেন; ফজিলতপূর্ণ হওয়ার কারণে এ নির্দেশ দেননি। আর হাদীসের বিপরীত কোনো কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়।

وَعَنْ ٣٢٩٤ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ اُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً وَاِنَّهَا لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنْ مَشْىِ اُخْتِكَ فَلْتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ بُدْنَةً - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِىُّ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِاَبِىْ دَاوُدَ فَاَمَرَهَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِىَ هَدْيًا وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهٗ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ اُخْتِكَ شَيْئًا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَحُجَّ وَتُكَفِّرْ يَمِيْنَهَا -

৩২৯৪. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, উকবা ইবনে আমের (রা.)-এর বোন মানত করল যে, সে পায়ে হেঁটে হজ করবে অথচ তার সে শক্তি-সামর্থ্য নেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা এর মুখাপেক্ষী নন যে, তোমার বোন পায়ে হেঁটে যাক। সুতরাং সে যেন সওয়ারিতে আরোহণ করে যায় এবং [কাফফারাস্বরূপ] একটি উট জবাই করে। -[আবূ দাউদ ও দারেমী] অবশ্য আবূ দাউদের অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, নবী করীম ﷺ সে মহিলাকে সওয়ার হয়ে যাওয়ার এবং পরে একটি কুরবানি করার নির্দেশ দিলেন। আবূ দাউদের অন্য আরেকটি রেওয়ায়েত আছে, নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার বোনকে এ কষ্টের জন্য কোনো ছওয়াব দেবেন না। সুতরাং সে যেন সওয়ারির উপর আরোহণ করে হজ করে এবং কাফফারা আদায় করে।

وَعَنْ ٣٢٩٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ (رض) اَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ اُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ مُرُوْهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

৩২৯৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) [হজের সফরের মাঝে] নবী করীম ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর বোন এই মানত করেছে যে, সে খালি পায়ে এবং খোলা মাথায় হজ করবে। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তাকে বল, সে যেন মাথা ঢেকে নেয় এবং সওয়ার হয়ে হজ আদায় করে ও তিনটি রোজা রাখে। -[আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَنْ تَحُجَّ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ : হযরত উকবা ইবনে আমেরের বোনের নাম ছিল "উম্মে হেব্বান"। হাদীসে বর্ণিত মানত তিনিই করেছিলেন। তিনি খালি মাথায় ও খালি পায়ে হজ করার মানত করেছিলেন। কিন্তু নবী করীম ﷺ মাথা ঢাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ মহিলাদের মাথা ও চুল সতর। অর্থাৎ মহিলাদের জন্য তার শরীরের এ অংশ আবৃত করে রাখা ওয়াজিব। তা খুলে রাখা গুনাহ। আর তাকে সওয়ারির উপর আরোহণ করে যেতে বলেছেন। কেননা, তিনি পায়ে হেঁটে যেতে অক্ষম ছিলেন। তদুপরি তিনি পায়ে হেঁটে হজের সফর করলে তার সীমাহীন কষ্ট ও দুর্ভোগ পোহাতে হতো। পূর্বের হাদীসে একটি পশু কুরবানি করতে বলা হয়েছে। কিন্তু এ হাদীসে তিন দিন রোজা রাখতে বলা হয়েছে। সুতরাং হাদীস দুটির মাঝে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

দ্বন্দ্ব নিরসন : যদি পশু কুরবানি করতে অক্ষম হয়, তাহলে তিন দিন রোজা রাখবে। অথবা কসমের কাফফারা কয়েকভাবে আদায় করা যায়। তন্মধ্যে রোজা রেখে কাফফারা আদায় করাও একটি। সুতরাং যদি কেউ মালের মাধ্যমে কসমের কাফফারা দিতে অক্ষম হয়, তাহলে সে একাধারে তিনটি রোজা রাখবে।

وَعَنْ ٣٢٩٦ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ (رض) اِنَّ اَخَوَيْنِ مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيْرَاثٌ فَسَأَلَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ اِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِيْ الْقِسْمَةَ فَكُلُّ مَالِيْ فِيْ رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ كَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَكَلِّمْ اَخَاكَ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَمِيْنَ عَلَيْكَ وَلَا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةِ الرَّبِّ وَلَا فِيْ قَطِيْعَةِ الرَّحِمِ وَلَا فِيْمَا لَا يَمْلِكُ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩২৯৬. অনুবাদ : হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রা.) হতে বর্ণিত, দুই আনসারী ভাই কারো থেকে মিরাস পেল। অতঃপর এক ভাই অপর ভাইয়ের নিকট তা বন্টন করার আবেদন করল। তখন সে বলল, যদি তুমি আমার নিকট পুনরায় বণ্টনের প্রশ্ন তোল, তাহলে আমার সমস্ত মাল কা'বা শরীফের জন্য ব্যয় করে দেব। [হযরত ওমর (রা.) যখন এটা জানতে পারলেন] তখন হযরত ওমর (রা.) তাকে বললেন, কা'বা শরীফ তোমার মালের মুখাপেক্ষী নয়। সুতরাং তুমি তোমার কসমের কাফফারা দাও। আর তোমার ভাইয়ের সাথে এ ব্যাপারে কথাবার্তা বল। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি তোমার কসম এবং মানত পুরা করতে নেই, প্রতিপালকের নাফরমানির কাজে, আত্মীয়তা ছিন্ন করার ব্যাপারে এবং এমন বস্তুর বেলায়, তুমি যার মালিক নও। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ رِتَاجُ الْكَعْبَةِ : অর্থ– কা'বা শরীফের দরজা। رِتَاجٌ অর্থ– বড় দ্বার, ফটক। এখানে উদ্দেশ্য হলো বায়তুল্লাহ শরীফের জন্য সমস্ত মাল ওয়াক্ফ করে দেওয়া।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٢٩٧ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ النَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَنْ كَانَ نَذَرَ فِىْ طَاعَةٍ فَذٰلِكَ لِلّٰهِ فِيْهِ الْوَفَاءُ وَمَنْ كَانَ نَذَرَ فِىْ مَعْصِيَةٍ فَذٰلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلَا وَفَاءَ فِيْهِ وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِيْنَ . (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

৩২৯৭. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, মানত দু প্রকার। সুতরাং যে ব্যক্তি ইবাদতের জন্য মানত করবে, তা আল্লাহর জন্য হবে। আর যে ব্যক্তি গুনাহের কাজের জন্য মানত করে তা শয়তানের জন্য হবে। এ ধরনের মানত পুরা করতে হয় না। সুতরাং কসম ভঙ্গ করলে যেরূপ কাফফারা দিতে হয় অনুরূপ কাফফারা দেবে। –[নাসায়ী]

٣٢٩٨ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ (رض) قَالَ إِنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ إِنْ نَجَّاهُ اللّٰهُ مِنْ عَدُوِّهِ فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ سَلْ مَسْرُوْقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ لَا تَنْحَرْ نَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ مُؤْمِنًا قَتَلْتَ نَفْسًا مُؤْمِنَةً وَإِنْ كُنْتَ كَافِرًا تَعَجَّلْتَ إِلَى النَّارِ وَاشْتَرِ كَبْشًا فَاذْبَحْهُ لِلْمَسَاكِيْنِ فَإِنَّ إِسْحَاقَ خَيْرٌ مِنْكَ وَفُدِىَ بِكَبْشٍ فَأُخْبِرَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ هٰكَذَا كُنْتُ أَرَدْتُّ أَنْ أُفْتِيَكَ . (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

৩২৯৮. অনুবাদ : হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনতাশির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মানত করল, যদি আল্লাহ তা'আলা তাকে শত্রু হতে মুক্তি দান করেন, তাহলে সে নিজেকে কুরবানি করে দেবে। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন, মাসরূক (র.) [তাবেঈ]-এর নিকট জিজ্ঞেস কর। সে ব্যক্তি মাসরূক (র.)-এর নিকট জিজ্ঞেস করল। তখন তিনি বললেন, তুমি নিজেকে কুরবানি করো না। কেননা তুমি যদি মুমিন হও তাহলে এক মুমিনজনকে হত্যা করলে। আর যদি কাফের হও, তাহলে জাহান্নামে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করলে। বরং তুমি একটি দুম্বা ক্রয় কর এবং মিসকিনদের জন্য জবাই করে দাও। কেননা, হযরত ইসহাক (আ.) তোমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। অথচ তাঁর বিনিময়ে একটি দুম্বাই কুরবানি করা হয়েছে। পরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জানানো হলে তিনি বললেন, আমিও অনুরূপ ফতোয়া দিতে চেয়েছিলাম। –[রাযীন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত মাসরূক (র.) উচ্চ পর্যায়ের তাবেঈ ছিলেন। তৎকালীন জমানায় তিনি একজন উচু মানের আলেম ও ফকীহ ছিলেন। নবী করীম ﷺ -এর ওফাতের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নবী করীম ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পাননি। তিনি খোলাফায়ে রাশেদীন এবং হযরত আয়েশা (রা.) থেকে ইলম হাসিল করেছেন। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) নিজে অনেক বড় ফকীহ হওয়া সত্ত্বে মাসরূক (র.) -এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করতে বলেছেন। এর দ্বারা অবশ্যই হযরত মাসরূক (র.)-এর ফজিলত প্রমাণিত হয়। সাথে সাথে হযরহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সতর্কতা ও দিয়ানতদারিও প্রমাণিত হয়।

হযরত মাসরূক (র.)-এর ফতোয়ার সারমর্ম : হযরত মাসরূক (র.)-এর ফতোয়ার সারমর্ম হলো, নিজেকে নিজে হত্যা করা শুধু শরিয়তেই নিষিদ্ধ নয় বরং যুক্তিযুক্তও নয়। সুতরাং যদি কেউ নিজেকে হত্যা করার মানত করে, তাহলে অবশ্যই এ মানত অনর্থক হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট এমতাবস্থায় একটি ছাগল জবাই করা ওয়াজিব হবে। তিনি দলিল হিসেবে উল্লিখিত হাদীস পেশ করেন।

যবীহুল্লাহ কে ছিলেন?

قَوْلُهُ فَاِنَّ اِسْحَاقَ خَيْرٌ مِنْكَ : হযরত ইসহাক (আ.) তোমার চেয়ে উত্তম। তাঁর বিনিময়ে একটি দুম্বা কুরবানি দেওয়া হয়েছে। হাদীসের এ বাক্য দ্বারা বুঝা যায়, যবীহুল্লাহ ছিলেন হযরত ইসহাক (আ.)। কিন্তু সকলের নিকট প্রসিদ্ধ ও সহীহ মত অনুযায়ী হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে স্বপ্নযোগে যে পুত্রকে কুরবানি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তিনি ছিলেন হযরত ইসমাইল (আ.)। কেননা নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- اَنَا ابْنُ الذَّبِيْحَيْنِ 'আমি দুজন জবাইকৃত ব্যক্তির সন্তান।' একজন তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ এবং অপরজন হযরত ইসমাঈল (আ.)।

হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) বলেন, ইহুদিরা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর নাম বাদ দিয়ে ইসহাক (আ.)-এর নাম যুক্ত করে দিয়েছে। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) ইহুদিদের নিকট জিজ্ঞেস করেছিলেন যবীহুল্লাহ কে ছিলেন? তখন তারা উত্তর দিয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে যবীহুল্লাহ হলেন হযরত ইসমাঈল (আ.), কিন্তু আমরা বিকৃত সাধন করে হযরত ইসহাক (আ.) -এর নাম সংযুক্ত করে দিয়েছি। সুতরাং বুঝা গেল, যবীহুল্লাহ হলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)।

كِتَابُ الْقِصَاصِ
অধ্যায় : কেসাস

اَلْقِصَاصُ : অর্থ– হত্যাকারীর জীবন হরণ করা, গুনাহের শাস্তি, যতটুকু জুলুম করেছে ততটুকু প্রতিশোধ গ্রহণ করা। শরিয়তের পরিভাষায় কেসাস বলা হয়, নিহত অথবা আহত ব্যক্তির অভিভাবক কর্তৃক হত্যাকারী বা আঘাতকারী হতে প্রতিশোধ নেওয়া। قِصَاصٌ শব্দটি قَصَصٌ বা قَصٌّ ধাতু হতে নির্গত। অর্থ– কারো পিছনে পিছনে যাওয়া। যেহেতু নিহত ব্যক্তির অভিভাবক হত্যার বদলা নেওয়ার জন্য হত্যাকারীর পিছু নেয় তাকে হত্যা করার জন্য, এ কারণে হত্যাকারীর প্রাণ হরণ করাকে কেসাস বলা হয়।

قِصَاصٌ- এর বিধান দেওয়ার কারণ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاۤ اُولِى الْاَلْبَابِ . অর্থাৎ মানুষকে যুদ্ধবিগ্রহ ও ফিতনা-ফ্যাসাদ থেকে বিরত রাখার জন্য কেসাসের বিধান দেওয়া হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٢٩٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَّا بِاِحْدٰى ثَلٰثٍ اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِىْ وَالْمَارِقُ لِدِيْنِهٖ التَّارِكُ بِالْجَمَاعَةِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩২৯৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে মুসলমান বান্দা একথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, তার রক্ত তিনটি কারণের যে কোনো একটি কারণ পাওয়া ব্যতীত হালাল নয়– ১. জানের বদলে জান হরণ করা, ২. বিবাহিত ব্যভিচারীকে রজম করা, ৩. দীন ইসলাম পরিত্যাগকারী, যে মুসলমানদের জামাত হতে পৃথক হয়ে গিয়েছে তাকে হত্যা করা হালাল। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ : অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে রক্তের বদলা রক্ত তথা কেসাস গ্রহণ করা জায়েজ।

اِخْتِلَافُ الْاِمَامِ الشَّافِعِىِّ وَمَالِكٍ وَاَحْمَدَ (رحـ) وَغَيْرِهِمْ : ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ (র.) প্রমুখের মতে কেসাসের হুকুম হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি দুজনই আজাদ [স্বাধীন] হওয়ার সাথে খাস। সুতরাং আজাদ ব্যক্তিকে গোলামের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না এবং পুরুষকে নারীর বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না; বরং দিয়ত তথা মুক্তিপণ গ্রহণ করবে।

তাঁদের দলিল : قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى .

অর্থাৎ স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায়, নারী নারীর বদলায়। –[সূরা বাক্বারা : আয়াত– ১৭৮]

এ আয়াতের মাফহুমে মুখালিফ দ্বারা বুঝা যায় স্বাধীন ব্যক্তিকে দাসের বিনিময়ে এবং পুরুষকে নারীর বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না।

مَذْهَبُ اِمَامِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যেভাবে স্বাধীন ব্যক্তির বিনিময়ে দাসকে হত্যা করা হয় এবং পুরুষের বিনিময়ে নারীকে হত্যা করা হয় তদ্রূপভাবে স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলামের বিনিময়ে ও নারীর বিনিময়ে পুরুষকে হত্যা করা হবে এবং মুসলমানকে জিম্মির বিনিময়ে হত্যা করা হবে।

দলিল :

١. قَوْلُهُ تَعَالَى : وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ . (سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ . ٤٥)

٢. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى . (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ . ٧٨)

٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَّا بِاِحْدٰى ثَلَاثٍ اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِىْ وَالْمَارِقُ لِدِيْنِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

তাঁদের দলিলের জবাব :

১. মাফহুমে মুখালিফ [বিপরীত উপলব্ধি]-এর মাধ্যমে দলীলে যন্নী [ধারণাপ্রসূত] হয়, নিশ্চিত হয় না। সুতরাং উল্লিখিত সরীহ [সুস্পষ্ট] 'নস'-এর বিপরীতে ঐ দলিল গ্রহণযোগ্য হবে না।

২. اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ الخ এ আয়াতের মাঝে স্বাধীন ব্যক্তিকে স্বাধীন ব্যক্তির বদলায় এবং দাসকে দাসের বদলায় ও নারীকে নারীর বদলায় হত্যা করতে বলা হয়েছে। এ আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার পরিপেক্ষিতে নাজিল করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণ : ইসলাম আগমণের কিছুকাল পূর্বে আরবের দুই গোত্রের মাঝে যুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষের গোলাম-আজাদ, নারী-পুরুষ সহ বহু সংখ্যক লোক নিহত হয়। অতঃপর ইসলামের আগমন ঘটে এবং উভয় পক্ষ ইসলাম গ্রহণ করে। ইসলাম গ্রহণের পর তারা পরস্পরে কেসাসের ব্যাপারে আলোচনা করে। তখন তাদের মাঝে শক্তিশালী গোত্রটি বলল, আমরা যুদ্ধে নিহত আমাদের দাসের বিনিময়ে তোমাদের স্বাধীন ব্যক্তিকে এবং আমাদের নারীর বদলায় তোমাদের পুরুষকে হত্যা করব। অন্যথায় আমরা রাজি হবো না, যদিও ঐ পুরুষ হত্যা না করে থাকে।

তাদের এ বর্বরতা ও জুলুমকে প্রতিরোধ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন। তাই এখানে খাস বা নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে। সূরা মায়েদার اِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الخ এ আয়াতের মাঝে আম বা ব্যাপকভাবে স্বাধীন-গোলাম, নারী-পুরুষ সকলের জন্য একই হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ হত্যার বদলায় হত্যা করা হবে। নিহত ব্যক্তি দাস না নারী বিবেচ্য নয়; বরং তার হত্যাকারী স্বাধীন বা পুরুষ হলে তাকে হত্যা করা হবে।

قَوْلُهُ اَلثَّيِّبُ الزَّانِىْ : বিবাহিতা, স্বজ্ঞান, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন কোনো মুসলমান নারী বা পুরুষ যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তাকে রজম তথা পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে। রজম যেহেতু একটি কঠিন শাস্তি তাই তা প্রয়োগ করার জন্য উল্লিখিত চারটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْمَارِقُ لِدِيْنِهِ التَّارِكُ بِالْجَمَاعَةِ : অর্থাৎ যে মুসলমান দীন ইসলামকে পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় তাকে হত্যা করা হালাল। আল্লামা ইবনে হাজার (র.) বলেন, اَلْجَمَاعَةُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِيْنَ এখানে اَلتَّارِكُ بِالْجَمَاعَةِ সিফাত হয়েছে اَلْمَارِقُ-এর। অর্থাৎ যে মুরতাদ হওয়ার কারণে মুসলমানদের জামাত থেকে পৃথক হয়ে গেছে। তাই কোনো মুসলমান পুরুষ মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। তবে যদি সে তওবা করে তাহলে হত্যা করা হবে না।

মুরতাদ নারীর হুকুম : কোনো নারী মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে গ্রেফতার করে জেলখানায় রাখা হবে এবং বারবার তাকে তওবা করতে বলা হবে। তাকে হত্যা করা যাবে না।

মুরতাদ নারীর হুকুমের ব্যাপারে ইমামগণের মতপার্থক্য :

مَذْهَبُ اَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَلَيْثٍ وَزُهْرِىْ وَنَخْعِىْ وَحَمَّادٍ وَمَكْحُوْلٍ (رح) وَغَيْرِهِمْ : আইম্মায়ে ছালাছা, লাইছ, যুহরী, ইমাম নাখয়ী, হাম্মাদ (র.) ও মাকহুল প্রমুখের মতে যদি কোনো মহিলা মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। দাসী হোক বা স্বাধীনা হোক এতে কোনো ব্যবধান নেই।

তাঁদের দলিল :

১. উল্লিখিত হাদীসটি আম তথা ব্যাপকভিত্তিক।

২. مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ.

مَذْهَبُ اِمَامِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, মুরতাদ নারীকে হত্যা করা হবে না; বরং তাকে গ্রেফতার করে জেলখানায় আবদ্ধ রেখে বারবার তওবা আহ্বান করা হবে।

দলিল :

١. اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ . (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ اِلَّا ابْنَ مَاجَةَ)

২. وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَيُّمَا رَجُلٍ اِرْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَادْعُهُ فَإِنْ تَابَ فَاقْبَلْ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ اِرْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ فَادْعُهَا فَإِنْ تَابَتْ فَاقْبَلْ تَوْبَتَهَا وَإِنْ أَبَتْ فَاسْتَتِبْهَا . (طَبَرَانِيْ)

دَلِيلٌ عَقْلِيٌّ : নারীরা হলো نَاقِصَاتُ الْعَقْلِ [কম বিবেক-বুদ্ধি-সম্পন্না] তাই তাদেরকে মাজুর মনে করে হত্যা না করাই বাঞ্ছনীয়। হিদায়া কিতাবের মুসান্নিফ বলেন, প্রকৃতপক্ষে শাস্তি পরকালের জন্য বিলম্বিত করা উচিত। কেননা পার্থিব জীবনে শাস্তি দেওয়া আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক পরীক্ষার মাঝে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এরপরও পৃথিবীর যুদ্ধবিগ্রহ ও বিশৃঙ্খলা বন্ধ করার জন্য দণ্ডবিধি নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে মানুষ শাস্তি ও দণ্ডের ভয়ে অন্যায়-অপরাধ থেকে বিরত থাকে। কিন্তু নারীদেরকে সৃষ্টিগতভাবে যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষমতা ও যোগ্যতা দেওয়া হয়নি। ফলে নারীদের থেকে যুদ্ধবিগ্রহের আশঙ্কা নেই। সুতরাং মুরতাদ নারীরা অক্ষম কাফের পুরুষদের ন্যায় হয়ে গেল। তদ্রূপভাবে মুরতাদ নারীকেও হত্যা করা যাবে না, তবে গ্রেফতার করে রাখতে হবে।

তাঁদের দলিলের জবাব : যে সকল হাদীসের عُمُوْمٌ [ব্যাপকতা] দ্বারা মুরতাদ পুরুষের সাথে মুরতাদ নারীকেও হত্যা করা প্রমাণিত হয় ঐ সকল হাদীসের জবাব হলো, অন্য হাদীসে نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ বর্ণিত আছে। অর্থাৎ নবী করীম ﷺ নারীদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। আর উসূলের কায়দা অনুযায়ী যখন একই ঘটনার মধ্যে خَاصّ ও عَامّ একত্রিত হয় তখন خَاصّ -কে عَامّ -এর জন্য مَخْصُوْص বা নির্দিষ্টকারী সাব্যস্ত করা হয়। সুতরাং উল্লিখিত হাদীসে مَنْ مَوْصُوْلَةٌ عَامَّةٌ দ্বারা বিশেষভাবে পুরুষই উদ্দেশ্য হবে।

৩৩০০. وَعَنْ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِيْ فُسْحَةٍ مِنْ دِيْنِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৩০০. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, একজন মুমিন তার দীনের ব্যাপারে পূর্ণ প্রশান্ত থাকে যে পর্যন্ত সে অবৈধ হত্যায় লিপ্ত না হয়। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মানুষ না হক খুন দ্বারা নিজের হাতকে রঞ্জিত না করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমতের ছায়াতলে থাকে। কিন্তু যখন কেউ না হক খুন করে তখন তার উপর আল্লাহর রহমত সংকুচিত হয়ে যায় এবং তার মন থেকে শান্তি চলে যায়। সে সর্বদা অশান্তির মাঝে থাকে এবং তার ধর্মের স্বাধীনতাও খর্ব হয়ে যায়।

৩৩০১. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَوَّلُ مَا يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৩০১. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিবসে মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম যে বিষয়ে ফয়সালা হবে তা হলো রক্তপাত [হত্যা]। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** উল্লিখিত হাদীসে বলা হয়েছে সর্বপ্রথম রক্তপাতের ফয়সালা করা হবে। কিন্তু অন্য হাদীসে আছে কিয়ামতের দিবসে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব গ্রহণ করা হবে। সুতরাং বাহ্যত হাদীস দুটির মাঝে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

দ্বন্দ্ব নিরসন : কিয়ামতের দিবসে বান্দার হকসমূহের মাঝে সর্বপ্রথম রক্তপাতের হিসাব গ্রহণ করা হবে। আর আল্লাহ তা'আলার হকসমূহ থেকে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব গ্রহণ করা হবে। সবচেয়ে বিশুদ্ধ জাবাব হলো, مَنْهِيَّاتٌ বা নিষিদ্ধ কার্যাবলির মাঝে সর্বপ্রথম রক্তপাতের মকদ্দমার ফয়সালা করা হবে। আর مَأْمُوْرَاتٌ বা আদেশকৃত কার্যাবলির মাঝে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব গ্রহণ করা হবে। সুতরাং কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

وَعَنْ ٣٣٠٢ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ (رضـ) اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اِنْ لَقِيْتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ اِحْدٰى يَدَىَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَمِنِّىْ بِشَجَرَةٍ فَقَالَ اَسْلَمْتُ لِلّٰهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَلَمَّا اَهْوَيْتُ لِاَقْتُلَهُ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ أَاَقْتُلُهُ بَعْدَ اَنْ قَالَهَا قَالَ لَا تَقْتُلْهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ قَطَعَ اِحْدٰى يَدَىَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَا تَقْتُلْهُ فَاِنْ قَتَلْتَهُ فَاِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَقْتُلَهُ وَاِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهٖ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَ كَلِمَتَهُ الَّتِىْ قَالَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৩০২. **অনুবাদ :** হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি কোনো কাফেরের মুখোমুখি হই এবং আমরা পরস্পরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হই, আর তরবারি দ্বারা আমার হাতে আঘাত করে এবং হাত কেটে ফেলে। এরপর সে আমার নিকট থেকে দূরে সরে কোনো গাছের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বলে উঠে, আমি আল্লাহর জন্য মুসলমান হয়ে গেছি। [অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করলাম] অন্য রেওয়ায়েতে আছে, যখন আমি তাকে হত্যা করতে উদ্যত হই তখন সে বলে উঠল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু; সুতরাং একথা বলার পরও কি আমি তাকে হত্যা করতে পারি? তিনি বললেন, তুমি তাকে হত্যা করো না। হযরত মেকদাদ (রা.) আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো আমার একটি হাত কেটে ফেলেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, [এতদসত্ত্বেও] তুমি তাকে হত্যা করো না। কেননা তুমি যদি তাকে হত্যা কর তাহলে সে ঐ জায়গায় পৌঁছে যাবে যেখানে তুমি তাকে হত্যা করার পূর্বে ছিলে। আর তুমি ঐ জায়গায় পৌঁছে যাবে যেখানে সে ঐ কালিমা পড়ার পূর্বে ছিল। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِنْ قَتَلْتَهُ فَاِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَقْتُلَهُ : কালিমা পড়ার পর সে ব্যক্তিকে হত্যা করা হারাম হয়ে গেছে। এখন যদি [কালিমা পড়ার পর] তুমি তাকে হত্যা কর তাহলে তোমার খুন হালাল হয়ে যাবে, যেমন কালিমা পড়ার পূর্বে তোমার খুন হালাল ছিল। তবে উভয়ের মাঝে পার্থক্য আছে, তা হলো কাফেরের খুন হালাল ছিল ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে, আর হত্যাকারীর খুন হালাল হবে কেসাস গ্রহণের জন্য। কিন্তু এক্ষেত্রে কেসাস গ্রহণ করা হবে না বরং দিয়ত ওয়াজিব হবে। কেননা সে তাকে কাফের ধারণা করে হত্যা করেছে।

وَعَنْ ٣٣٠٣ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رضـ) قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اُنَاسٍ مِنْ جُهَيْنَةَ فَاَتَيْتُ عَلٰى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَذَهَبْتُ اَطْعَنُهُ فَقَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَطَعَنْتُهُ فَقَتَلْتُهُ فَجِئْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَقَتَلْتَهُ وَقَدْ شَهِدَ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا فَعَلَ ذٰلِكَ تَعَوُّذًا

৩৩০৩. **অনুবাদ :** হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে জুহাইনা গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে [জিহাদ করার জন্য] প্রেরণ করলেন। অতঃপর আমি যখন তাদের এক ব্যক্তির মুখোমুখি হলাম এবং তরবারি দ্বারা আঘাত হানতে উদ্যত হলাম তখন সে বলে উঠল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কিন্তু আমি তাকে আঘাত করলাম ও হত্যা করে ফেললাম। এরপর আমি নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসলাম এবং ঘটনা অবহিত করলাম। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি কি তাকে ঐ অবস্থায় হত্যা করলে যখন সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দ্বারা সাক্ষি প্রদান করেছিল?

قَالَ فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةِ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِىِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قَالَهُ مِرَارًا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য এরূপ বলেছে। তখন নবী করীম ﷺ [অত্যন্ত রাগ করে] বললেন, তুমি তার অন্তর চিরে দেখলে না কেন? -[বুখারী ও মুসলিম] হযরত জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রা.) হতে বর্ণিত রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কিয়ামত দিবসে যখন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" তোমার নিকট [অভিযোগ নিয়ে] আসবে তখন তুমি কি উত্তর দেবে? এ বাক্যটি তিনি বেশ কয়েকবার উচ্চারণ করলেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মৌখিক কালিমা পাঠই মুসলমান হওয়ার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং কেউ মুখে কালিমা উচ্চারণ করলে তাকে মুসলমান মনে করতে হবে। সে প্রকৃতপক্ষে মনেপ্রাণে ঈমান এনেছে কিনা তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। এখানে হযরত উসামা (রা.)-এর ইজতেহাদী ভুল হয়েছে, এজন্য তার উপর দিয়ত বা রক্তপণ ওয়াজিব হবে। কিন্তু নবী করীম ﷺ অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কারণ বিষয়টি পরিপূর্ণ তদন্ত করার পর তার ব্যাপারে ফয়সালা করা উচিত ছিল। কিন্তু উসামা (র.) কোনো তদন্ত না করে নিজের ইজতিহাদের উপর আমল করেছেন।

وَعَنْ ٣٣٠٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاِنَّ رِيْحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৩৩০৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুআহিদ [যার নিরাপত্তার ব্যাপারে মুসলমানরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে]-কে হত্যা করবে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। যদিও জান্নাতের সুঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব হতে পাওয়া যায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا : "মুআহিদ" ঐ কাফেরকে বলা হয় যে ইসলামি সরকারের সাথে যুদ্ধবিগ্রহ ও ফিতনা-ফ্যাসাদ না করার অঙ্গীকার করেছে, সে জিম্মি হোক বা জিম্মি না হোক। এ হাদীসে "মুআহিদ"-কে হত্যা করার উপর কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল যে অমুসলিমের সাথে ইসলামি সরকারের চুক্তি হয়েছে এবং সরকার তাকে নিরাপত্তা দিয়েছে তাদের জানমালও মুসলমানের ন্যায় সংরক্ষিত। তাকে হত্যা করা জঘন্যতম অপরাধ।

قَوْلُهُ اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا : এ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী জান্নাতের সুঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব হতে পাওয়া যায়। কিন্তু এর বিপরীত কোনো রেওয়ায়েতে সত্তর বছর, কোনো রেওয়ায়েতে একশত বছর, কোনো রেওয়ায়েতে পাঁচশত বছর আবার কোনো রেওয়ায়েতে এক হাজার বছরের কথা রয়েছে। সুতরাং বাহ্যত রেওয়ায়েতগুলোর মাঝে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

দ্বন্দ্ব নিরসন : প্রকৃতপক্ষে রেওয়ায়েতগুলোর মাঝে কোনো বিরোধ নেই। কেননা যার যার আমল ও মর্যাদা অনুযায়ী এ ব্যবধান হবে। হাশরের মাঠে কেউ এক হাজার বছরের দূরত্ব থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে। কেউ পাঁচশত বছরের দূরত্ব থেকে, কেউ একশত বছরের দূরত্ব থেকে আবার কেউ সত্তর বছরের দূরত্ব থেকে, কেউ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে। সুতরাং উল্লিখিত عدد [গণনা] দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট সীমা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং দীর্ঘ দূরত্ব বুঝানো উদ্দেশ্য।

وَعَنْ ٣٣٠٥ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَدّٰى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهٗ فَهُوَ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدّٰى فِيْهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسّٰى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهٗ فَسَمُّهٗ فِىْ يَدِهٖ يَتَحَسَّاهُ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهٗ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهٗ فِىْ يَدِهٖ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِىْ بَطْنِهٖ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৩০৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিজেকে পাহাড়ের উপর থেকে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের মাঝে সর্বদা ঐরূপভাবে নিজেকে নিক্ষেপ করতে থাকবে। আর যে বিষপান করে আত্মহত্যা করেছে, সেও সর্বদা জাহান্নামের মধ্যে এরূপভাবে নিজ হাতে বিষপান করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কোনো ধারালো অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করেছে সে ব্যক্তির হাতে ঐ ধারালো অস্ত্র থাকবে, যার দ্বারা সে জাহান্নামের মধ্যে সর্বদা নিজের পেটকে ফুঁড়তে থাকবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : দুনিয়ার মধ্যে যে ব্যক্তি যে জিনিসের মাধ্যমে আত্মহত্যা করবে, আখিরাতে তাকে ঐ জিনিসের শাস্তিতে লিপ্ত করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি হালাল মনে করে আত্মহত্যা করবে সে সর্বদা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। অথবা এখানে خَالِدًا مُخَلَّدًا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দীর্ঘকাল পর্যন্ত সে জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।

কবীরা গুনাহকারীর হুকুমের মাঝে ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ :

عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ : মু'তাযিলাদের মতে কবীরা গুনাহকারী সর্বদা জাহান্নামে দগ্ধ হবে।

দলিল : উল্লিখিত হাদীসে خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا বাক্য সুস্পষ্টভাবে এর প্রমাণ বহন করে।

عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ওলামায়ে কেরামের মতে কবীরা গুনাহকারী ব্যক্তি ইসলাম থেকে খারিজ হবে না। সুতরাং সদাসর্বদা সে জাহান্নামে থাকবে না। কেননা বহু আয়াত ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, গুনাহগার মুসলমানকে শাস্তি দেওয়ার পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। সুতরাং এ হাদীসের মর্ম হলো–

১. দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে।
২. এতবড় জঘন্য পাপের শাস্তি এটাই ছিল; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে একত্ববাদী মুসলমানের সম্মানার্থে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন। অধিকন্তু ইমাম তিরমিযী (র.) স্বীয় কিতাবের মাঝে এ ধরনের দুটি রেওয়ায়েত এনেছেন; কিন্তু সেখানে خَالِدًا مُخَلَّدًا শব্দ নেই।
৩. যে ব্যক্তি হালাল মনে করে আত্মহত্যা করবে সে সর্বদা জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

وَعَنْهُ ٣٣٠٦ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَّذِىْ يَخْنُقُ نَفْسَهٗ يَخْنُقُهَا فِى النَّارِ وَالَّذِىْ يَطْعَنُهَا يَطْعَنُهَا فِى النَّارِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৩৩০৬. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি [গলায়] ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে, জাহান্নামেও সে অনুরূপভাবে ফাঁসি দিতে থাকবে। আর যে বর্শা মেরে আত্মহত্যা করে, দোজখেও সে অনুরূপভাবে নিজেকে বর্শা মারবে। –[বুখারী]

وَعَنْ ٣٣٠٧ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهٖ جُرْحٌ فَجَزِعَ فَاَخَذَ سِكِّيْنًا فَحَزَّبِهَا يَدَهٗ فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتّٰى مَاتَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى بَادَرَنِىْ عَبْدِىْ بِنَفْسِهٖ فَحَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৩০৭. **অনুবাদ :** হযরত জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের আগেকার লোকদের মাঝে একলোক [কোনোভাবে] আহত হয়েছিল। সে উক্ত জখমের ব্যথা সহ্য করতে পারেনি। তখন সে একটি ছুরি নিয়ে নিজের হাতটি কেটে ফেলল। এরপর আর রক্তক্ষরণ বন্ধ হলো না। অবশেষে সে মৃত্যুবরণ করল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমার বান্দা নিজেকে হত্যা করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করল। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ : আমি তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছি। হাদীসে বর্ণিত লোকটি আত্মহত্যাকে হালাল মনে করেছিল। আর হারামকে হালাল মনে করা কুফরি। সুতরাং সে কাফের হয়ে যাওয়ার কারণে জান্নাতকে হারাম করা হয়েছে। অথবা সে প্রথম পর্যায় জান্নাতে প্রবেশকারীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে। তার অপরাধের শাস্তি ভোগ করর পর সে জান্নাতে যাবে।

وَعَنْ ٣٣٠٨ جَابِرٍ (رض) اَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِىَّ لَمَّا هَاجَرَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى الْمَدِيْنَةِ هَاجَرَ اِلَيْهِ وَهَاجَرَ مَعَهٗ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهٖ فَمَرِضَ فَجَزِعَ فَاَخَذَ مَشَاقِصَ لَهٗ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهٗ فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتّٰى مَاتَ فَرَاٰهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِىْ مَنَامِهٖ وَهَيْئَتُهٗ حَسَنَةٌ وَرَاٰهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ فَقَالَ لَهٗ مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ فَقَالَ غَفَرَ لِىْ بِهِجْرَتِىْ اِلٰى نَبِيِّهٖ ﷺ فَقَالَ مَا لِىْ اَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ قَالَ قِيْلَ لِىْ لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا اَفْسَدْتَ فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৩০৮. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যখন মদিনায় হিজরত করলেন তখন তুফাইল ইবনে আমর দাউছীও হিজরত করে নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসলেন। তার স্বগোত্রীয় এক লোকও হিজরত করে তারে সাথে এসেছিল। লোকটি অসুস্থ হয়ে পড়ল। এতে লোকটি অসহ্য হয়ে ছুরি নিয়ে নিজের হাতের গিরা কেটে ফেলল। এতে এমনভাবে রক্তক্ষরণ হলো যে, সে মৃত্যুবরণ করল। অতঃপর তুফাইল ইবনে আমর তাকে স্বপ্ন দেখলেন যে, তার অবয়ব ও বেশভূষা খুবই সুন্দর; কিন্তু তার হাত দুখানা কাপড় দিয়ে আবৃত করা। হযরত তুফাইল (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার প্রতিপালক তোমার সাথে কেমন আচরণ করেছেন? সে বলল আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর নবী ﷺ -এর নিকট হিজরত করার বিনিময় ক্ষমা করে দিয়েছেন। হযরত তুফাইল (রা.) আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার! আমি তোমার হাত দুখানা আবৃত দেখছি কেন? সে বলল, [আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে] আমাকে বলা হয়েছে, তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে যা নষ্ট করেছ আমি কখনও তা সুস্থ করব না। হযরত তুফাইল (রা.) উক্ত ঘটনা নবী করীম ﷺ -এর নিকট বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তার হাত দুখানাকেও ক্ষমা করে দাও। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল কোনো মানুষ তার শরীরের কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নষ্ট বা অকেজো করতে পারবে না। তা নষ্ট বা অকেজো করা তার জন্য হারাম। হিজরত করার কারণে আল্লাহ তা'আলা উক্ত মুহাজির সাহাবীকে মাফ করে দিয়েছেন। মুহাজির যদি কোনো গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে নবী করীম ﷺ -এর ক্ষমা প্রার্থনার দ্বারা উক্ত মুহাজিরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

وَعَنْ ٣٣٠٩ اَبِىْ شُرَيْحِ الْكَعْبِىِّ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثُمَّ اَنْتُمْ يَا خُزَاعَةُ قَدْ قَتَلْتُمْ هٰذَا الْقَتِيْلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَاَنَا وَاللّٰهِ عَاقِلُهُ مَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِيْلًا فَاَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ اِنْ اَحَبُّوْا قَتَلُوْا وَاِنْ اَحَبُّوْا اَخَذُوا الْعَقْلَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالشَّافِعِىُّ) وَفِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ بِاِسْنَادِهِ وَصَرَّحَ بِاَنَّهُ لَيْسَ فِى الصَّحِيْحَيْنِ عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ وَقَالَ وَاَخْرَجَاهُ مِنْ رِوَايَةِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَعْنِىْ بِمَعْنَاهُ.

৩৩০৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ শুরাইহ কা'বী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি [মক্কা বিজয়ের ঐতিহাসিক ভাষণে] বলেছেন, অতঃপর হে খোযাআ গোত্র! তোমরা এই হোযাইল গোত্রের লোকটিকে হত্যা করেছ। আল্লাহর শপথ! আমি তার দিয়ত [রক্তপণ] আদায় করব। এরপর যে কেউ কোনো লোককে হত্যা করবে তখন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের দুটির মধ্যে যে কোনো একটির এখতিয়ার থাকবে। যদি তারা হত্যাকারী থেকে কেসাস নিতে চায় তাহলে কেসাসস্বরূপ তাকে হত্যা করবে। আর যদি দিয়ত [রক্তপণ] গ্রহণ করতে চায় তাও করতে পারবে। [তিরমিযী ও শাফেয়ী] শরহে সুন্নাহর কিতাবে এ রেওয়ায়েত ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর সনদে বর্ণিত আছে। রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করার পর শরহে সুন্নাহের মুসান্নিফ ইমাম বাগবী (র.) বলেন, এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে আবূ শুরাইহ থেকে বর্ণিত নেই। তবে বুখারী ও মুসলিমে এ রেওয়ায়েতটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। অর্থাৎ সম অর্থে বর্ণিত আছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** হযরত নবী করীম ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন যে ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেছিলেন এ হাদীসটি তার শেষাংশ। প্রথমাংশ হরমে মক্কা-এর পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

ঘটনার বিবরণ : জাহেলিয়াতের যুগে হোযাইল গোত্রের লোকেরা খোযাআ গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। মক্কা বিজয়কালে খোযাআ গোত্রের লোকেরা ঐ প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হোযাইল গোত্রের একটি লোককে হত্যা করে। তখন এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মাঝে এক বড় ধরনের ফিতনার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। তাই নবী করীম ﷺ উক্ত ফিতনাকে প্রতিহত করার জন্য হোযাইল গোত্রের নিহত ব্যক্তির দিয়ত [রক্তপণ] নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দেন। এরপর এ সম্পর্কিত শরয়ী বিধান বর্ণনা করলেন। যদি কেউ অন্যায়ভাবে অন্য কাউকে হত্যা করে তাহলে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের দুটি এখতিয়ার থাকবে। হত্যাকারীকে হত্যা করবে অথবা দিয়ত গ্রহণ করবে। এ মাসআলার মাঝে ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে।

নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের দুটি এখতিয়ারের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ :

مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاِسْحَاقَ وَشَافِعِىْ وَاَحْمَدَ وَابْنِ سِيْرِيْنَ وَقَتَادَةَ (رحـ) وَغَيْرِهِمْ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), ইসহাক, শাফেয়ী, আহমদ, ইবনে সীরীন, ও হযরত কাতাদাহ (র.) প্রমুখের নিকট নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের হত্যাকারীর ইচ্ছা ও মতামত ব্যতীত উল্লিখিত দুটির যে কোনো একটির এখতিয়ার রয়েছে। অর্থাৎ কেসাস নেবে অথবা দিয়ত নেবে।

দলিল : فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ شُرَيْحٍ مَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِيْلًا فَاَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ اِنْ اَحَبُّوْا قَتَلُوْا وَاِنْ اَحَبُّوْا اَخَذُوا الْعَقْلَ - : এটি আমাদের উল্লিখিত হাদীসের অংশবিশেষ। এখানে দুটির মাঝে যে কোনো একটির এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে।

وَمَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَنَخْعِى وَحَسَنْ بَصَرِىْ (رح) : ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম নাখয়ী ও হাসান বসরী (র.)-এর নিকট নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের জন্য কেসাস গ্রহণ করাই নির্ধারিত। তবে হ্যাঁ তারা ঐ সময় দিয়ত গ্রহণ করতে পারবে যখন হত্যাকারী এতে রাজি হয়।

তাঁদের দলিল :

১. قَوْلُهُ تَعَالٰى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى .(مَائِدَه اٰيَة ـ ١٧٨)
এ আয়াত দ্বারা قَتْلِ عَمَدْ-এর মধ্যে কেসাস ওয়াজিব হওয়া নির্ধারিত। আল্লাহ তা'আলা قَتْلِ عَمَدْ-এর বিপরীত قَتْلِ خَطَا-এর মধ্যে দিয়তের উল্লেখ করেছেন। সুতরাং বুঝা গেল خَطَا-এর বিপরীত عَمَدْ-এর মধ্যে দিয়ত ওয়াজিব হবে না; বরং নির্দিষ্টভাবে কেসাসই ওয়াজিব হবে।

২. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اَلْعَمَدُ قَوَدٌ اَىْ مُوْجِبُهُ. (رَوَاهُ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ)
অর্থাৎ قَتْلِ عَمَدْ-এর জন্য কেসাসই ওয়াজিব ও প্রযোজ্য।

৩. عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْعَمَدُ قَوَدٌ وَالْخَطَاءُ دِيَةٌ. (طَبْرَانِىْ)
اَلْعَمَدُ-এর মাঝে اَلِفْ لَامْ جِنْسِىْ সুতরাং جِنْسِ عَمَدْ-এর হুকুম কেসাস হওয়াই প্রমাণিত হয়।

دَلِيْلِ عَقْلِىْ : রক্তপণস্বরূপ যে মাল দেওয়া হয় এর মাঝে এবং নিহত ব্যক্তির মাঝে কোনো সামঞ্জস্য হতে পারে না। কেননা মানুষ হলো মালিক আর মাল হলো তার নিয়ন্ত্রণাধীন বস্তু। সুতরাং قَتْلِ عَمَدْ-এর ক্ষেত্রে দিয়ত নয়; বরং কেসাসই ওয়াজিব হয়। কেননা কেসাস নেওয়ার মাঝে সামঞ্জস্য বা পুরোপুরি বদলা পাওয়া যায়। এতে اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ-এর উপর পরিপূর্ণভাবে আমল হয়ে যায়। হ্যাঁ যদি হত্যাকারী দিয়ত তথা রক্তপণস্বরূপ মাল দিতে রাজি হয় তাহলে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের জন্য মাল নেওয়া জায়েজ হবে।

তাঁদের দলিলের জবাব :

১. হাদীসে বাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের এখতিয়ার আছে তারা হত্যাকারীকে হত্যা করবে অথবা "দিয়ত" গ্রহণ করবে যদি তাদেরকে "দিয়ত" দেওয়া হয়।

২. আয়াতের মাঝে كُتِبَ শব্দ কেসাস ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বহন করে। সুতরাং خَبَرِ وَاحِدْ-এর মাধ্যমে كِتَابُ اللّٰهِ-এর উপর زِيَادَتِىْ [অতিরিক্ত] করা জায়েজ হবে না। –[হেদায়া– ৪/৫৪৩, মেরকাত- ৭/৫৪]

وَعَنْ ٣٣١٠ اَنَسٍ اَنَّ يَهُوْدِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيْلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هٰذَا اَفُلَانٌ اَفُلَانٌ حَتّٰى سُمِّىَ الْيَهُوْدِىُّ فَاَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَجِئَ بِالْيَهُوْدِىِّ فَاعْتَرَفَ وَاَمَرَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৩১০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, এক ইহুদি একটি মেয়ের মাথা দুটি পাথরের মাঝে রেখে ছেঁচে ফেলল। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করা হলো, কে তোমার সাথে এমন করেছে? অমুক না অমুক? অবশেষে যখন সেই ইহুদির নাম উল্লেখ করা হলো মেয়েটি তখন মাথা দিয়ে ইশারা করে সম্মতি জানাল। অতঃপর সেই ইহুদিকে উপস্থিত করা হলো। সে তার অপরাধ স্বীকার করল। সুতরাং নবী করীম ﷺ তার মাথাটিও পাথর দ্বারা ছেঁচে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তার মাথাটিও পাথর দ্বারা ছেঁচে দেওয়া হলো। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মাসআলা : ১. ইহুদি হত্যার কথা স্বীকার করার পর তার থেকে কেসাস গ্রহণ করা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, স্বীকারোক্তি বা সাক্ষী-প্রমাণ ব্যতীত কেসাস নেওয়া জায়েজ হবে না।

২. কোনো পুরুষ কোনো নারীকে হত্যা করলে ঐ নারীর বদলায় পুরুষকেও হত্যা করা হবে। যদি ভারী পাথর দ্বারা হত্যা করা হয় তাহলে কেসাস ওয়াজিব হবে কি হবে না? এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

ভারী পাথর দিয়ে হত্যা করার হুকুমের মাঝে ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে :

مَذْهَبُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَنَخْعِي وَزُهْرِي وَابْنِ أَبِي لَيْلَى (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম মালেক, ইমাম আবূ ইউসূফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম নাখেয়ী, ইমাম যুহরী ও ইবনে আবী লায়লা (র.) প্রমুখের মতে, ভারী পাথর বা বড় লাঠির মাধ্যমে হত্যা করলেও قَتْل عَمْد -এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এতে কেসাস ওয়াজিব হবে।

তাঁদের দলিল :

১. فِي حَدِيثِ الْبَابِ : فَجِيءَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ .

২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضـ) وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُؤَدِّي وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

এখানে তরবারি ও পাথরের মাঝে কোনো পার্থক্য বর্ণনা করা হয়নি।

مَذْهَبُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَحَسَنٍ وَشَعْبِيِّ وَابْنِ مُسَيَّبٍ وَعَطَاءٍ وَطَاؤُسٍ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও হাসান, শা'বী, ইবনে মুসাইয়্যাব, আতা এবং তাউস (র.) প্রমুখের নিকট এটা قَتْل عَمْد -এর মাঝে গণ্য হবে না; বরং قَتْل شِبْه عَمْد -এর অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং এতে দিয়ত ওয়াজিব হবে; কেসাস ওয়াজিব হবে না।

তাঁদের দলিল :

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَاءِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا . (أَبُو دَاوُدَ ، نَسَائِي ، مِشْكُوة . جـ٢ صـ ٣٠٣)

অর্থাৎ قَتْل خَطَا যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো قَتْل شِبْه عَمْد যে হত্যা লাঠির মাধ্যমে করা হয়েছে। এর জন্য দিয়তস্বরূপ একশত উট দিতে হবে। যার মধ্যে চল্লিশটি উট গাভীন হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) فِي خُطْبَةِ فَتْحِ مَكَّةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أَلَا أَنَّ دِيَةَ الْخَطَاءِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ . (أَبُو دَاوُدَ وَنَسَائِي وَابْنُ مَاجَةَ وَأَحْمَدُ وَشَافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ فِي مَسَانِيدِهِمْ)

উল্লিখিত হাদীস দুটি দ্বারা জানা গেল লাঠি দিয়ে হত্যা করলে তা شِبْه عَمْد -এর অন্তর্ভুক্ত হবে। এখানে মুতলাক লাঠির কথা বলা হয়েছে। সুতরাং ছোট বড় সব লাঠি এর মাঝে গণ্য হবে। সুতরাং ছোট, হালকা ইত্যাদি শর্তারোপ করা অবাস্তব এবং নাজায়েজ। সুতরাং লাঠি পাথর বা এ জাতীয় বস্তু দ্বারা হত্যা করলে দিয়ত ওয়াজিব হবে; কেসাস ওয়াজিব হবে না।

তাঁদের দলিলের জবাব :

১. ঐ ইহুদি এ ধরনের কাজ ইতঃপূর্বেও বহুবার করেছে। এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তাই নবী করীম ﷺ বারবার এ জঘন্য অপরাধের কারণে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

২. মেয়েটির অলঙ্কারের লোভে ইহুদি তাকে عَمْدًا [ইচ্ছাকৃতভাবে] দুই পাথরের মাঝে মাথা রেখে হত্যা করেছিল। আর ইমাম আযম (র.)-এর বিশুদ্ধ মতেও এটাই। তা হচ্ছে যদি হত্যাকারী প্রাণহরণ করার উদ্দেশ্যে آلَةٌ مُثَقَّلَةٌ غَيْرُ مُحَدَّدَةٍ [ভারী নয় এমন ধ্বংসকারী অস্ত্র] এর মাধ্যমে হত্যা করে তাহলে এতেও কেসাস ওয়াজিব হবে।

৩. ভারী পাথর এবং বড় লাঠি যেভাবে হত্যার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপভাবে হত্যা ব্যতীত অন্য কাজেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তরবারি ও বর্শা এর বিপরীত। এগুলো শুধু হত্যার কাজেই ব্যবহৃত হয়।

৪. হাদীসে বাবের হুকুম উল্লিখিত হাদীস দ্বারা মনসূখ হয়ে গেছে।

أَخْذُ الْقِصَاصِ بِمِثْلِ فِعْلِ الْقَاتِلِ অর্থাৎ হত্যাকারীর ন্যায় হুবহু হত্যা করে কেসাস গ্রহণ করা।

হুবহু হত্যাকারীর ন্যায় হত্যা করে কেসাস গ্রহণ করার ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ :

مَذْهَبُ الشَّوَافِعِ وَمَوَالِكَ : শাফেয়ী ও মালেকীগণের মতে, হত্যাকারী যেভাবে হত্যা করেছে হুবহু ঐভাবে হত্যা করে কেসাস নিবে।

তাঁদের দলিল :

١. عَنْ أَنَسٍ (رضـ) أَنَّ يَهُوْدِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيْلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هٰذَا أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ حَتّٰى سُمِّيَ الْيَهُوْدِيُّ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَجِئَ بِالْيَهُوْدِيِّ فَاعْتَرَفَ وَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

٢. وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ. (اَلنَّحْلُ اٰيَة ١٣٦)

٣. فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ. (اَلْبَقَرَةُ : ١٩٤)

٤. فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلِهَا. (اَلشُّوْرٰى : ٣٩)

مَذْهَبُ اِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, হত্যার বদলায় হত্যাকারীকে হত্যা করবে। কিন্তু হত্যাকারী যেভাবে হত্যা করেছে অনুরূপভাবে হত্যা করবে না। অর্থাৎ কেবল হত্যার ক্ষেত্রে বদলা হলেই কেসাস হয়ে যাবে।

দলিল : ১. উল্লিখিত আয়াতগুলো দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা (র.)ও দলিল দিয়েছেন। এগুলোর সারমর্ম হলো, قَاتِلْ [হত্যাকারী] যা করেছে তার চেয়ে অতিরিক্ত করো না। আর তা কেবল জানের বেলায় জান হরণ করার দ্বারাই হতে পারে। নির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি দ্বারা বদলা (مُمَاثَلَتْ) হয় না। কারণ কেউ এক আঘাতে মারা যায়, আবার অনেকে একাধিক প্রচণ্ড আঘাত ব্যতীত প্রাণত্যাগ করে না। সুতরাং হত্যাকারী যদি এক আঘাতে হত্যা করে আর কেসাস গ্রহণের সময় হত্যাকারীকে এক আঘাতে মারতে না পারে তাহলে তাকে উপর্যুপরি আঘাত করে হত্যা করতে হবে। আর এটা হত্যাকারীর উপর বাড়াবাড়ি করা হবে। সুতরাং এ কেসাস بِمِثْلِ مَاعْتَدٰى عَلَيْكُمْ-এর নির্দেশ মোতাবেক হবে না।

২. قَوْلُهُ تَعَالٰى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى. (اَلْبَقَرَةُ : ١٧٨) এ আয়াতে কারীমার মাঝে আল্লাহ তা'আলা فِى الْقَتْلٰى [নিহত ব্যক্তিদের] বলেছেন فِى الْقَتْلِ বলেননি। সুতরাং কেউ কাউকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করলে অথবা পানিতে ডুবিয়ে মারলে, তাকেও ঐভাবে হত্যা করা জায়েজ হবে না।

৩. قَوْلُهُ تَعَالٰى اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ অর্থাৎ কেসাস হলো জানের বদলায় জান নেওয়া। প্রাণহরণ করার পদ্ধতির মাঝে مُمَاثَلَتْ [বাড়াবাড়ি]-এর নাম কেসাস নয়।

৪. قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا قَوَدَ اِلَّا بِالسَّيْفِ (اِبْنُ مَاجَةَ، طَحَاوِىْ) এ হাদীসের উদ্দেশ্য এটাই হওয়া প্রবলতর যে, তরবারির মাধ্যমেই কেসাস নেবে।

৫. তরবারি দ্বারা হত্যার মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যায়। কিন্তু হত্যাকারী যদি আগুনে পুড়িয়ে নির্দয় আচরণ করে তাহলে এটা চরম অন্যায় ও জঘন্য অপরাধ। নবী করীম ﷺ বলেছেন– قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. (مِشْكٰوة صـ٣٥٧) অর্থাৎ 'যখন তোমরা কাউকে [কেসাসস্বরূপ] হত্যা কর তখন উত্তমভাবে হত্যা কর।' সুতরাং এতে বুঝা যায় হত্যার জন্য তৈরিকৃত তরবারি বা এ ধরনের বস্তুর মাধ্যমে হত্যা করতে হবে।

তাঁদের দলিলের জবাব : আমাদের দলিলের হাদীসটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার উপর প্রযোজ্য। এটা কোনো সর্বসম্মত বিধানের উপর প্রযোজ্য নয়। নবী করীম ﷺ ইহুদির সাথে এ আচরণ سِيَاسَةً [রাষ্ট্রীয় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য] করেছেন।

وَعَنْ ٣٣١١ قَالَ كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ وَهِيَ عَمَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَا وَاللّٰهِ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللّٰهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الْأَرْشَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৩১১. অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার ফুফু রুবাইয়ি' এক আনসারী বালিকার সামনের দাঁত ভেঙ্গে দিল। বালিকার কওমের লোকেরা নবী করীম ﷺ-এর দরবারে ফরিয়াদ নিয়ে উপস্থিত হলো। তখন নবী করীম ﷺ কেসাস গ্রহণ করার আদেশ দিলেন। তখন আনাস ইবনে মালেকের চাচা আনাস ইবনে নযর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা হতে পারে না। আল্লাহর কসম! রুবাইয়ের দাঁত ভাঙ্গতে দেওয়া যাবে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আনাস! আল্লাহর নির্দেশ হলো কেসাস গ্রহণ করা। অতঃপর কওমের লোকেরা কেসাসের দাবি প্রত্যাহার করতে রাজি হয়ে গেল এবং দিয়ত গ্রহণ করতে সম্মত হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার কিছু বান্দা এমনও আছেন যারা আল্লাহর নামে কসম করে কিছু বললে আল্লাহ তা'আলা তা পূরণ করে দেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত রুবাইয়ি' (রা.), হযরত আনাস (রা.) ও হযরত মালেক (রা.) এরা তিনজন ভাইবোন ছিলেন। তাঁদের পিতার নাম ছিল নযর। মালেকের ছেলের নামও ছিল আনাস। অর্থাৎ চাচা ও ভাতিজার একই নাম ছিল। এ হাদীসে যে রুবাইয়ের কথা বলা হয়েছে, তিনি প্রথম আনাস অর্থাৎ হযরত আনাস ইবনে মালেকের ফুফু ছিলেন। আর দ্বিতীয় আনাস অর্থাৎ হযরত আনাস ইবনে নযরের ভগ্নি ছিলেন।

হযরত আনাস ইবনে নযরের এ কথা বলা যে, لَا وَاللّٰهِ لَا تُكْسَرُ নবী করীম ﷺ-এর হুকুমের বিরোধিতার শামিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি নবী করীম ﷺ-এর ফয়সালা অস্বীকার করে একথা বলেননি; বরং তিনি এখানে আল্লাহ তা'য়ালার দয়া ও অনুগ্রহের আশা করেছেন। অর্থাৎ তাদেরকে যেন কেসাসের পরিবর্তে দিয়তের উপর রাজি করানো হয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তার আশা পূর্ণ করেছেন। ফলে বালিকার কওমের লোকেরা কেসাসের পরিবর্তে দিয়ত গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন।

وَعَنْ ٣٣١٢ أَبِيْ جُحَيْفَةَ (رضـ) قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ لَيْسَ فِي الْقُرْاٰنِ فَقَالَ وَالَّذِيْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْاٰنِ إِلَّا فَهْمًا يُعْطٰى رَجُلٌ فِيْ كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيْفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيْفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيْرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَذُكِرَ حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا فِيْ كِتَابِ الْعِلْمِ .

৩৩১২. অনুবাদ : হযরত আবূ জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নিকট এমন কিছু আছে কি? যা কুরআনে নেই। তখন তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম! যিনি খাদ্য-শস্য অঙ্কুরিত করেছেন এবং প্রাণের অস্তিত্ব দিয়েছেন। কুরআনে যা কিছু আছে তাছাড়া অন্য কিছু আমাদের কাছে নেই। তবে ঐ জ্ঞান আছে যা কিতাব বুঝার জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দিয়ে থাকেন। হ্যাঁ আমাদের নিকট এমন কিছু আছে যা সহীফার মধ্যে [লিখিত লিপি] রয়েছে। আমি আরজ করলাম, সহীফার মধ্যে কি লেখা আছে? তিনি বললেন, দিয়তের বিধান, কয়েদিদের মুক্তিপণ এবং এই নীতি যে, কেসাসস্বরূপ কোনো মুসলমানকে কোনো কাফেরের বদলায় হত্যা করা যাবে না। -[বুখারী] 'কোনো ব্যক্তিকে জুলুম ও নির্যাতনমূলক হত্যা করা যাবে না।' এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে একটি হাদীস 'ইলম অধ্যায়'-এ বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হযরত আবূ জোহায়ফা কর্তৃক হযরত আলী (রা.)-কে উক্ত প্রশ্ন করার কারণ : শিয়া সম্প্রদায় মনে করে নবী করীম ﷺ আহলে বাইতের নির্দিষ্ট কয়েক জনকে বিশেষ করে হযরত আলী (রা.)-কে এমন কিছু গোপন ইলম শিক্ষা দিয়েছেন যা অন্য কারো নিকট প্রকাশ করেননি। হযরত আলী (রা.) শপথ করে বলেছেন এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা; বরং আমার নিকট এ কুরআনই আছে যা অন্যদের নিকট রয়েছে। এর চেয়ে বেশি কিছু নেই। তবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন বুঝ ও জ্ঞান দান করেছেন যার দ্বারা আমি কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝতে পারি। আর এটা আমার উপর সীমাবদ্ধ নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা করেন তাকে এ জ্ঞান দান করে থাকেন।

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ : কোনো মুসলমান যদি কোনো حَرْبِيٌّ [অমুসলিম রাষ্ট্রের] কাফেরকে হত্যা করে তাহলে সকলের ঐকমত্য অনুযায়ী কেসাসস্বরূপ উক্ত হত্যাকারী মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না। আর যদি কোনো মুসলমান কোনো জিম্মি কাফেরকে হত্যা করে তাহলে হত্যাকারী মুসলমানকে কেসাসস্বরূপ হত্যা করা যাবে কিনা? এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

জিম্মি কাফেরকে হত্যার বদলায় মুসলমানকে কতল করার ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে ইখতিলাফ :

مَذْهَبُ اِمَامِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِىِّ وَاَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ (رحـ) وَغَيْرِهِمْ : হযরত ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, হযরত ইসহাক, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) প্রমুখের নিকট জিম্মি কাফেরকে হত্যা করার বদলায় মুসলমান হত্যাকারীকে হত্যা করা যাবে না। এটা হযরত ওমর, হযরত ওসমান ও হযরত আলী (রা.) হতেও বর্ণিত আছে।

দলিল : ١. فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

এ হাদীসটি عَامٌّ [ব্যাপক অর্থ প্রকাশকারী] কাফের হরবী অথবা জিম্মি কাফেরকে হত্যার পরিবর্তে মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না।

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ وَشَعْبِىِّ وَنَخْعِىِّ وَغَيْرِهِمْ : হানাফী এবং ইমাম শা'বী ও ইমাম নাখয়ী (র.) প্রমুখের নিকট কাফের জিম্মিকে হত্যা করার বদলায় মুসলমান হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে।

দলিল :

١. رَوٰى اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) عَنْ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَتَلَ النَّبِىُّ ﷺ مُسْلِمًا بِمُعَاهِدٍ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَا اَحَقُّ مَنْ وَفٰى بِذِمَّتِهٖ وَرَوٰى اَبُوْ دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ قَتَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ (وَفِىْ رِوَايَةٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ) مُسْلِمًا بِكَافِرٍ قَتَلَهٗ غِيْلَةً . وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَا اَوْلٰى وَاَحَقُّ مَنْ اَوْفٰى بِذِمَّتِهٖ . (الطَّحَاوِىُّ)

٢. اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَتَلَ بِذِمِّىٍّ . (دِرَايَة)

٣. عَنْ عَلِىٍّ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَا اِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا قُتِلَ بِهٖ . (اِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ)

دَلِيْلٌ عَقْلِىٌّ : মুসলমান ও জিম্মি উভয়ই দারুল ইসলামের অধিবাসী। ইসলামী সরকার তাদের জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেওয়ার কারণে উভয়ে مَعْصُوْمُ الدَّمِ [পবিত্র রক্তের অধিকারী] হয়ে গেছে। সুতরাং সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে একজনের বদলায় অপরজনের থেকে কেসাস গ্রহণ করা উচিত।

বিরুদ্ধবাদীদের দলিলের জবাব : উল্লিখিত হাদীসে কাফির দ্বারা হরবী কাফের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কেনো কাফের নিরাপত্তা নিয়ে ইসলামি রাষ্ট্রে প্রবেশ করল। অতঃপর কোনো মুসলমান তাকে হত্যা করে ফেলল।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٣١٣ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَزَوَالُ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَوَقَفَهٗ بَعْضُهُمْ وَهُوَ الْاَصَحُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ)

৩৩১৩. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো মুসলমানকে হত্যা করার চেয়ে এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহ তা'আলার কাছে অতি সহজ। –[তিরমিযী ও নাসায়ী। আর মুহাদ্দেসীনদের কেউ কেউ এ হাদীসটিকে মওকুফ বলেছেন, এটাই সহীহ কথা। তবে ইবনে মাজাহ এ হাদীসটি হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : একজন মুসলমানের খুন আল্লাহ তা'আলার নিকট এ পৃথিবীর চেয়ে বেশি মূল্যবান। আল্লাহ তা'আলা আসমান-জমিন ও এতদুভয়ের মাঝে যা আছে সবকিছু মানুষের খেদমতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং একজন মানুষের মূল্য এ আসমান-জমিনের চেয়েও অধিক।

وَعَنْ ٣٣١٤ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِشْتَرَكُوْا فِيْ دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللّٰهُ فِي النَّارِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৩৩১৪. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যদি আসমান ও জমিনের সকল বাসিন্দারা সম্মিলিতভাবে একজন মুমিনকে হত্যা করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা সকলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। -[তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন এ হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْ ٣٣١٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَجِيْئُ الْمَقْتُوْلُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ نَاصِيَتُهٗ وَرَأْسُهٗ وَأَوْدَاجُهٗ تَشْخَبُ دَمًا يَقُوْلُ يَا رَبِّ قَتَلَنِيْ حَتّٰى يُدْنِيَهٗ مِنَ الْعَرْشِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩৩১৫. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, কিয়ামত দিবসে নিহত ব্যক্তি তার হাত দিয়ে হত্যাকারীর ললাটের কেশগুচ্ছ এবং মাথা ধরে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার রগসমূহ হতে রক্তক্ষরণ হতে থাকবে; আর সে বলবে, আমার রব! এই ব্যক্তিই আমাকে হত্যা করেছে। একথা বলতে বলতে সে আরশের নিকটবর্তী হয়ে যাবে। -[তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : দুনিয়ার বুকে যে ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে কতল করা হয়েছে সে জুলুমের প্রমাণস্বরূপ প্রবাহিত রক্তসহ আরশে আযীমের নিকট এসে তার ফরিয়াদ পেশ করার সুযোগ পাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আদল ও ইনসাফের সাথে এ অন্যায় খুনের ফয়সালা করে নিহত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করবেন।

وَعَنْ ٣٣١٦ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ (رض) أَشْرَفَ يَوْمَ الدَّارِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدٰى ثَلٰثٍ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ كُفْرٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقُتِلَ بِهٖ فَوَاللّٰهِ مَا زَنَيْتُ فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَلَا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ فَبِمَ تَقْتُلُوْنَنِيْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَلِلدَّارِمِيِّ لَفْظُ الْحَدِيْثِ)

৩৩১৬. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুনাইফ বর্ণনা করেন। হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) অবরোধের দিন ঘরের ছাদের উপর চড়ে [বিদ্রোহীদেরকে] বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি। তোমরা কি জান না? নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো মুসলমানের খুন তিন কাজের কোনো একটি ব্যতীত হালাল নয়। বিবাহের পর ব্যভিচার করা। ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফরি করা বা মুরতাদ হওয়া। অন্যায়ভাবে কোনো লোককে হত্যা করা। এ তিনটির কোনো এটি করলে তাকে কতল করা যাবে। আল্লাহর কসম! আমি জাহেলি যুগেও ব্যভিচারে লিপ্ত হইনি এবং ইসলামের মধ্যেও না। আমি যেদিন থেকে নবী করীম ﷺ -এর হাতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করেছি সেদিন হতে কখনও মুরতাদ হইনি। আর আমি এমন কোনো লোককে হত্যা করিনি, যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন। তাহলে তোমরা কেন আমাকে হত্যা করতে চাও? -[তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, আর দারেমী শুধু মূল হাদীস উল্লেখ করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَوْمَ الدَّارِ : [ঘরের দিন] দ্বারা একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তা হলো মিসর ইত্যাদি এলাকার বিদ্রোহীরা মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর প্রমুখের নেতৃত্বে তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা.)-কে তার বাসগৃহে অবরুদ্ধ করে রাখে। তখন তিনি বিদ্রোহীদেরকে লক্ষ্য করে উপরিউক্ত কথাগুলো বলেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের কাছে খলিফার আবেদন উপেক্ষিত হয়। অবশেষে তিনি বিদ্রোহীদের হাতেই শাহাদাত বরণ করেন।

قَوْلُهُ وَلِلدَّارِمِيِّ لَفْظُ الْحَدِيْثِ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইমাম দারেমী হাদীসের মাঝে হযরত ওসমান (রা.)-এর ঘটনা বর্ণনা করেননি। তিনি কেবল মূল হাদীস অর্থাৎ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ الخ উল্লেখ করেছেন।

٣٣١٧ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رض) عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৩১৭. অনুবাদ : হযরত আবুদ্দারদা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মুমিন অন্যায়ভাবে কোনো লোক হত্যা না করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে নেক কাজের মাঝে দ্রুতগামী থাকে। কিন্তু যখনই সে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করল তখনই সে থেমে যাবে। −[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মুমিনকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বরাবর নেকের কাজ ও কল্যাণকর কাজ করার তাওফীক দেওয়া হয়। ফলে সে অতিদ্রুত এ পথে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু যখন সে অন্যায়ভাবে খুন করে তখন তা বন্ধ হয়ে যায় এবং সে আল্লাহর রহমত ও মদদ থেকে বঞ্চিত হয়।

٣٣١٨ - وَعَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ)

৩৩১৮. অনুবাদ : হযরত আবুদ্দারদা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক গুনাহের ব্যাপারে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না, যে ব্যক্তি মুশরিক অবস্থায় মারা যায়। অথবা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করে। [আবূ দাউদ। আর ইমাম নাসায়ী এ রেওয়ায়েত হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا الخ : বাহ্যত এ হাদীস দ্বারা মনে হয় শিরক-এর ন্যায় অন্যায়ভাবে কতলের গুনাহও ক্ষমার যোগ্য নয়। এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে।

مَذْهَبُ الْخَوَارِجِ : খারেজী সম্প্রদায় বলেন, مُرْتَكِبُ كَبِيْرَةٍ [কবীরা গুনাহকারী যেমন− হত্যাকারী] কাফের হয়ে যায় এবং সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।

مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ : মু'তাযিলা সম্প্রদায় বলেন, مُرْتَكِبُ كَبِيْرَةٍ ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যায়, কিন্তু কুফরীর মাঝে প্রবেশ করে না। তবে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামি হবে।

খারেজী ও মু'তাযিলাদের দলিল :

١. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا .

٢. قَوْلُهُ تَعَالَى : مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا . (اَلنِّسَاءُ - ٢٣)

مَذْهَبُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে مُرْتَكِبُ كَبِيْرَةٍ [কবীরা গুনাহকারী] ঈমান থেকে খারিজ হয় না। যদি সে তওবা ব্যতীত মারা যায় তাহলে সে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল থাকবে। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তার উপর রহম করে ক্ষমা করে দিতে পারেন, অথবা গুনাহের শাস্তি ভোগ করার পর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

দলিল : ١. قَوْلُهُ تَعَالٰى : ان الله لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা শিরক ব্যতীত অন্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন।

٢. وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّهٗ قَالَ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ (رضـ) وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. (بُخَارِيْ وَمُسْلِمٌ)

এ ছাড়া ঐ হাদীস যে সকল হাদীসের মাঝে কেবল ঈমান গ্রহণের কারণ জান্নাতের সুসংবাদ শুনানো হয়েছে।

বিরুদ্ধবাদীদের দলিলের জবাব :

১. যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে হালাল মনে করে হত্যা করে তাকে ক্ষমা করা হবে না। কারণ সে কাফের হয়ে গেছে।
২. যদি কোনো মুমিনকে এজন্য হত্যা করে যে সে মুমিন, তাহলে তার হত্যাকারীকে ক্ষমা করা হবে না।
৩. خُلُوْد [চিরস্থায়ী জাহান্নামি হওয়া] দ্বারা উদ্দেশ্য হল দীর্ঘকাল পর্যন্ত সে জাহান্নামে জ্বলবে। হত্যাকারীর "খুলূদ" ও কাফেরের "খুলূদ"-এর মাঝে পার্থক্য আছে– তা হলো কাফেরের "খুলূদ" হলো চিরস্থায়ী। এজন্য কুরআনে কারীমের মাঝে কাফেরের খুলূদের সাথে اَبَدًا শব্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। পক্ষান্তরে হত্যাকারীর "খুলূদ" চিরস্থায়ী নয়। এখানে اَبَدًا শব্দ বৃদ্ধি করা হয়নি।

٣٣١٩ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُقَامُ الْحُدُوْدُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقَادُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৩৩১৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, মসজিদের মাঝে দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা যাবে না। আর সন্তানকে হত্যা করার কারণে পিতা হতে কেসাস নেওয়া যাবে না। –[তিরমিযী ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** যদি পিতা তার সন্তানকে হত্যা করে তাহলে পিতার থেকে কেসাস নেওয়া যাবে না। আর যদি সন্তান পিতা-মাতা অথবা দাদা-দাদির মাঝে কাউকে হত্যা করে তাহলে সকলের ঐকমত্য অনুযায়ী ঐ সন্তান থেকে কেসাস নেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যদি পিতামাতার থেকে কেউ তাদের সন্তানকে হত্যা করে অথবা দাদা-দাদির মাঝে যদি কেউ তাদের দৌহিত্রকে হত্যা করে তাহলে এর মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

পুত্র হত্যার কারণে পিতা থেকে কেসাস গ্রহণ করার ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ :

مَذْهَبُ اِمَامِ مَالِكٍ (رحـ) : হযরত ইমাম মালেক (র.) বলেন, যদি পিতা তার সন্তানের দিকে তরবারি নিক্ষেপ করে যার দ্বারা সন্তান মারা যায়, তাহলে কেসাস নেওয়া যাবে না। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে জবাই করে হত্যা করে তাহলে কেসাসস্বরূপ পিতাকে হত্যা করা হবে।

দলিল : قَوْلُهٗ تَعَالٰى اِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

এ আয়াতের হুকুম আম [ব্যাপক] হত্যাকারী পিতা হোক বা অন্য কেউ হোক।

مَذْهَبُ اِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ (رحـ) وَغَيْرِهِمْ : হযরত ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.) প্রমুখের নিকট পিতা দাদা প্রমুখ যদি তাদের সন্তানকে ইচ্ছাকৃতভাবে জবাই করে বা হত্যা করে তবুও তাদের থেকে কেসাস নেওয়া যাবে না।

দলিল :

١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُقَامُ الْحُدُوْدُ فِى الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقَادُ بِالْوَالِدِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

٢. اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِرَجُلٍ اَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ اِنَّ اَوْلَادَكُمْ مِنْ اَطْيَبِ كَسْبِكُمْ كُلُوْا مِنْ كَسْبِ اَوْلَادِكُمْ ـ (اَبُوْ دَاوُدَ ـ مِشْكٰوة ـ جـ٢ صـ٢٩١)

এ ধরনের আরও হাদীস এবং কুরআনের আয়াত রয়েছে যেখানে সন্তানকে তার পিতার সাথে সমন্ধযুক্ত করা হয়েছে। এ কারণে কেসাসের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে।

٣. نَهَى النَّبِيُّ ﷺ حَنْظَلَةَ بْنَ اَبِىْ عَامِرٍ عَنْ قَتْلِ اَبِيْهِ وَكَانَ كَافِرًا مُشْرِكًا مُحَارِبًا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَلَوْ جَازَ لِلْاِبْنِ قَتْلُ اَبِيْهِ فِىْ حَالٍ لَكَانَ اَوْلَى الْاَحْوَالِ بِذٰلِكَ هٰذَا الْحَالُ وَلٰكِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ ذٰلِكَ كَيْفَ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا (الاية) وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ (الاية) اِعْلَمُوْا اَنَّ الْوَالِدَةَ كَالْوَالِدِ وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ كَالْوَالِدَيْنِ ـ

دَلِيْلِ عَقْلِىْ : সন্তানের পৃথিবীতে জন্ম লাভ করার মাধ্যম পিতামাতা। পিতামাতা না হলে সন্তানের কোনো অস্তিত্বই লাভ করত না। সুতরাং সেই পিতামাতা থেকে কেসাস নেওয়া কখনও যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। এ ছাড়া পিতামাতা যেভাবে আদর-সোহাগ ও ভালোবাসা দিয়ে সন্তানকে তিল-তিল করে বড় করে এটাও পিতামাতা থেকে কেসাস নেওয়া অমানবিক বলে প্রমাণ করে।

বিরুদ্ধবাদীদের দলিলের জবাব :

১. ইমাম মালেক (র.) কর্তৃক পেশকৃত দলিল দ্বারা যদিও এটা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক নিহত ব্যক্তির বদলায় তার হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। কিন্তু ঐ হুকুম عَام اِجْمَاعٌ দ্বারা এ সুরতের সাথে مَخْصُوْص [সীমাবদ্ধ] যে, হত্যাকারী পিতা না হয়ে অন্য কেউ হবে। সুতরাং হত্যাকারী পিতা হলে কেসসা নেওয়া যাবে না।

২. ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুবী (র.) বলেছেন, لَا يُقَادُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ হাদীসটি কুরআনের আয়াতের মোতাবেক হয়ে এমন প্রসিদ্ধতা লাভ করেছে যে, সকল উম্মত এটাকে সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেছে। সুতরাং এ হাদীসটি পবিত্র কুরআনের নির্দেশের জন্য مُخَصِّصْ [নির্দিষ্টকারী] অথবা نَاسِخْ [রহিতকারী] হতে পারে। –[হেদায়া ৪/৫৪৭, মিরকাত ৭/৬২]

وَعَنْ ٣٣٢٠ـ اَبِىْ رِمْثَةَ (رض) قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَعَ اَبِىْ فَقَالَ مَنْ هٰذَا الَّذِىْ مَعَكَ قَالَ ابْنِىْ اِشْهَدْ بِهِ قَالَ اَمَا اِنَّهُ لَا يَجْنِىْ عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِىْ عَلَيْهِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ) وَزَادَ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ فِىْ اَوَّلِهِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَبِىْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَاٰى اَبِى الَّذِىْ بِظَهْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ دَعْنِىْ اُعَالِجُ الَّذِىْ بِظَهْرِكَ فَاِنِّىْ طَبِيْبٌ فَقَالَ اَنْتَ رَفِيْقٌ وَاللّٰهُ الطَّبِيْبُ ـ

৩৩২০. অনুবাদ : হযরত আবূ রিমসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি [একদিন] আমার পিতার সাথে নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথে এটা কে? আমার পিতা বললেন, আমার পুত্র। এ ব্যাপারে আপনি সাক্ষী থাকুন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, সাবধান! তার অপরাধের শাস্তি তোমার উপর এবং তোমার অপরাধের শাস্তি তার উপর বর্তাবে না। –[আবূ দাউদ ও নাসায়ী] আর শরহে সুন্নাহ-এর মাঝে হাদীসের শুরুতে কিছু অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে। আবূ রিমা বলেন, আমি আমার পিতার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গেলাম। তখন আমার পিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিঠে যা ছিল [মহরে নবুওয়াত] তা দেখে বললেন, আমাকে অনুমতি দান করুন। আপনার পিঠে যে বস্তুটি আছে আমি এ চিকিৎসা করে দেই। কেননা আমি একজন চিকিৎসক। হুজুর ﷺ বললেন, তুমি হবে সেবক আর আল্লাহ তা'য়ালা হলেন চিকিৎসক।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ ابْنِى اِشْهَدْ بِه : সে আমার পুত্র এ ব্যাপারে আপনি সাক্ষী থাকুন। এ কথার উদ্দেশ্য হলো, যদি আমি কোনো অপরাধ করি তাহলে আমার পরিবর্তে আমার পুত্র আর যদি আমার পুত্র কোনো অপরাধ করে তাহলে তার পরিবর্তে আমি শাস্তি ভোগ করব। জাহেলি যুগে এমনই রেওয়াজ ছিল। কিন্তু নবী করীম ﷺ তা খণ্ডন করে বলে দিলেন, ইসলামি বিধানে এ সুযোগ নেই। বরং যার যার অপরাধের জন্য তাকেই শাস্তি ভোগ করতে হবে।

قَوْلُهُ فَقَالَ دَعْنِى اُعَالِجُ الخ : নবী করীম ﷺ -এর পৃষ্ঠদেশে মোহরে নবুওয়ত ছিল। তিনি মোহরে নবুওয়তের হাকীকত বুঝতে না পেরে এটাকে কোনো রোগ মনে করেছেন, তাই তিনি চিকিৎসা করার অনুমতি চেয়েছেন। নবী করীম ﷺ এর ব্যাখ্যা না দিয়ে একটি জরুরি বিষয় বলে দিয়েছেন যে, রোগ ভালো করার মালিক তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলা মানুষ কেবল সেবা-যত্নই করতে পারে।

وَعَنْ ٣٣٢١ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقَيِّدُ الْاَبَ مِنْ اِبْنِهٖ وَلَا يُقَيِّدُ الْاِبْنَ مِنْ اَبِيْهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ)

৩৩২১. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রা.) তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত শুরাকা ইবনে মালেক (রা.) করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়েছি [এবং দেখেছি] তিনি পুত্র থেকে পিতার কেসাস নিতেন, কিন্তু পিতা হতে পুত্রের কেসাস নিতেন না। –[তিরমিযী, তবে তিনি এ হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন।]

وَعَنْ ٣٣٢٢ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ) وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِيْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى وَمَنْ خَصٰى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ .

৩৩২২. অনুবাদ : হযরত হাসান বসরী (রা.) হযরত সামুরা (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার গোলামকে হত্যা করবে [তার বদলে] আমরা তাকে হত্যা করব। আর যে কেউ তার গোলামের কোনো অঙ্গ কর্তন করবে আমরা তার অঙ্গ কর্তন করে দেব। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী। আর নাসায়ী অন্য রেওয়ায়েতের মাঝে এ কথাটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, যে কেউ তার গোলামকে খাসি করবে আমরাও তাকে খাসি করে দেব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যদি কেউ তার গোলামকে হত্যা করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে– কথাটি ভীতি প্রদর্শনস্বরূপ বলা হয়েছে, যাতে কোনো মনিব তার গোলামকে হত্যা করার মনোবৃত্তি না রাখে, তবে এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

গোলামের হত্যা করার বদলায় মনিবের থেকে কেসাস গ্রহণ করার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ :

مَذْهَبُ النَّخْعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ (رحـ) : ইমাম নাখয়ী ও ইমাম ছাওরী (র.)-এর নিকট যদি কোনো মনিব তার গোলামকে হত্যা করে ফেলে তাহলে গোলামের বদলায় মনিবকেও হত্যা করা হবে।

দলিল :

عَنْ سَمُرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

مَذْهَبُ جُمْهُوْرِ الْاَئِمَّةِ : জমহুর ইমামগণের মতে গোলামকে হত্যা করার বদলায় তার মনিব থেকে কেসাস নেওয়া যাবে না।

দলিল :

১. عَنْ عُمَرَ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا يُقَادُ الْمَمْلُوْكُ مِنْ مَوْلَاهُ وَالْوَلَدُ مِنْ وَالِدِهِ ـ (نَسَائِىْ)

২. মনিব তার গোলামের মালিক হওয়ার কারণে কেসাস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। আর বিধান হলো, وَالْحُدُوْدُ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ সুতরাং মনিবের থেকে কেসাস গ্রহণ করা যাবে না।

বিরোধীদের দলিলের জবাব :

১. উক্ত হাদীস ভীতি প্রদর্শনের উপর প্রযোজ্য।

২. গোলাম দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি যে কখনও গোলাম ছিল পরে আজাদ করে দেওয়া হয়েছে। সাবেক অবস্থা অনুযায়ী এখানে গোলাম বলে দেওয়া হয়েছে।

৩. اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ এ আয়াত দ্বারা উক্ত হাদীস মনসুখ হয়ে গেছে।

৪. এ হাদীসের রাবী স্বয়ং হাসান বসরী (র.)-এর ফতোয়া এর বিপরীত। সুতরাং এ হাদীস যঈফ।

অন্য কারো গোলাম হত্যা করার মাসআলা : যদি কোনো আজাদ ব্যক্তি অন্য কারো অধিকারভুক্ত গোলাম হত্যা করে ফেলে তাহলে তার থেকে কেসাস নেওয়া হবে কিনা? এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে–

مَذْهَبُ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ : জমহুর ওলামায়ে কেরামের নিকট কেসাস নেওয়া হবে না। اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ এ আয়াতের মাফহুমে মুখালিফ [বিপরীত উপলব্ধি] দ্বারা বুঝা যায় গোলামের বদলায় আজাদ ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না।

দলিল :

১. قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

২. كُتِبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى (اَلْاٰيَةَ)

এ আয়াত দুটি আম [ব্যাপক] নিহত ব্যক্তি আজাদ হোক বা অপরের গোলাম হোক সবই এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং অপরের গোলামকে হত্যা করলেও কেসাস ওয়াজিব হবে।

বিরোধীদের দলিলের জবাব :

১. জমহুর ওলামায়ে কেরাম কেবল মাফহুমে মুখালিফের মাধ্যমে দলিল দিয়েছেন। পক্ষান্তরে হানাফী আলেমগণ সরাসরি আয়াতের মাধ্যমে দলিল দিয়েছেন। সুতরাং তা প্রাধান্য পাবে।

২. اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ আজাদের বদলায় আজাদের বিধান দ্বারা قِصَاصُ الْحُرِّ بِعَبْدِ غَيْرِهِ তো নাকচ হয় না। لِاَنَّ تَخْصِيْصَ الشَّئِ بِالذِّكْرِ لَا يَدُلُّ عَلٰى نَفْيِ مَا عَدَاهُ –[মেরকাত ৭/৬৪, হেদায়া ৪/ ৫৪৬]

٣٣٢٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ اِلٰى اَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوْلِ فَاِنْ شَاءُوْا قَتَلُوْا وَاِنْ شَاءُوْا اَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِىَ ثَلٰثُوْنَ حِقَّةً وَثَلٰثُوْنَ جَذَعَةً وَاَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً وَمَنْ صَالَحُوْا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৩৩২৩. **অনুবাদ :** হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (র.) তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে খুন করবে তাকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক ও ওয়ারিশদের হাতে ন্যস্ত করা হবে। তারা ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করতে পারে অথবা ইচ্ছা করলে তার থেকে দিয়ত [রক্তপণ] গ্রহণ করতে পারে। আর দিয়ত হলো [একশটি উট] ত্রিশটি হিক্কা,[১] ত্রিশটি জাযয়া এবং চল্লিশটি খালেফাহ। আর যদি ওয়ারিশগণ এর চেয়ে কম উট গ্রহণ করতে রাজি হয়ে যায় তাও হতে পারে। –[তিরমিযী]

টীকা : ১. 'হিক্কা' বলা হয়, যে উটের বয়স তিন বছর পূর্ণ হয়ে চতুর্থ বছরে পড়েছে। 'জাযয়া' বলা হয় যে উটের বয়স চার বছর পূর্ণ হয়ে পঞ্চম বছরে পড়েছে। 'খালেফাহ' বলা হয় যে উটনীর গর্ভে বাচ্চা রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَتْل عَمْد -এর দিয়ত [রক্তপণ]-এর পরিমাণ : شِبْه عَمْد -এর দিয়তও شِبْه عَمْد : مِقْدَارُ دِيَةِ الْمُغَلَّظَة -এর অনুরূপ دِيَة مُغَلَّظَة দিতে হবে। অর্থাৎ একশত উট দিতে হবে। তবে কয় প্রকারের উট দেবে তা নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

مَذْهَبُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ (فِيْ رِوَايَةٍ) وَمُحَمَّدٍ (رح) : ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট তিন প্রকারের উট দিতে হবে। যার মধ্যে ত্রিশটি হিক্কা, ত্রিশটি জাযয়া এবং চল্লিশটি খালিফাহ হবে।

দলিল : حَدِيْثُ الْبَابِ [এ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হাদীস]

مَذْهَبُ اِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَبِيْ يُوْسُفَ وَمَالِكٍ وَاَحْمَدَ (رح) : ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে চার প্রকারের উট দিতে হবে। পঁচিশটি বিনতে মাখায,[১] পঁচিশটি বিনতে লাবূন, পঁচিশটি হিক্কা, পঁচিশটি জাযয়া।

দলিল :

১. عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ (رض) قَالَ كَانَتِ الدِّيَةُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعًا خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ جَزَعَةً وَخَمْسًا وَعِشْرِيْنَ حِقَّةً وَخَمْسًا وَعِشْرِيْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَخَمْسًا وَعِشْرِيْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ . (اَلْمُغْنِيْ لُمْعَاتْ)

২. قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ (رض) فِيْ شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرِيْنَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ جَزَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ بَنَاتَ لَبُوْنٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ بَنَاتَ مَخَاضٍ . (اَبُوْ دَاوُدَ)

قَالَ مُلَّا عَلِيْ قَارِيْ هٰذَا وَاِنْ كَانَ مَوْقُوْفًا اِلَّا اَنَّهُ فِيْ حُكْمِ الْمَرْفُوْعِ لِاَنَّ الْمَقَادِيْرَ لَا تُعْرَفُ بِالرَّأْيِ .

বিরোধীদের দলিলের জবাব : তাদের দলিল হিসেবে পেশকৃত এ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হযরত আমর ইবনে শোয়াইব (রা.)-এর হাদীসের মাঝে সাহাবায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে। যদি এ হাদীস সহীহ হতো তাহলে সাহাবায়ে কেরাম মতবিরোধ করতেন না। সুতরাং এখন সায়েব ইবনে ইয়াযীদ এবং ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করাই উত্তম।

٣٣٢٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَؤُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعٰى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ اَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلٰى مَنْ سِوَاهُمْ اَلَا لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُوْ عَهْدٍ فِيْ عَهْدِهِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ)

৩৩২৪. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, [কেসাস এবং দিয়তের ক্ষেত্রে] সকল মুসলমানের খুন সমপর্যায়ের। একজন সাধারণ মুসলমানও 'আমান' [নিরাপত্তা] দিতে পারে। যদি দূরে কোনো বিচ্ছিন্ন সেনাদল গনিমতের মাল হাসিল করে তাহলে [সেনাপতির] নিকটবর্তী পুরো বাহিনীও এর হকদার হবে। আর অমুসলিমদের মোকাবিলায় এক হাতের মতো। সাবধান! কোনো কাফেরের বদলায় কোনো মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না। আর যে ব্যক্তি চুক্তিতে আবদ্ধ আছে চুক্তি বহাল থাকা পর্যন্ত তাকেও হত্যা করা যাবে না। –[আবূ দাউদ ও নাসাঈ। আর ইবনে মাজাহও হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।]

টীকা : ১. 'বিনতে মাখায' বলা হয়, যে উটের বয়স এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে। বিনতে লাবূন, যে উটের বয়স দুই বছর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ : অর্থাৎ কেসাস এবং দিয়তের ক্ষেত্রে সকল মুসলমান এক বরাবর। ধনী-দরিদ্র, আমির-ফকির, নারী-পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

قَوْلُهُ يَسْعٰى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ : অর্থাৎ কোনো সাধারণ মুসলমান যেমন কোনো গোলাম অথবা নারী কোনো কাফেরকে নিরাপত্তা দেয় তাহলে সকল মুসলমানের তা রক্ষা করা কর্তব্য।

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ اَقْصَاهُمْ : এর দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে–

১. যদি দারুল হরব [অমুসলিম রাষ্ট্র] থেকে দূরে বসবাসকারী কোনো মুসলমান কোনো কাফেরকে নিরাপত্তা দেয় তাহলে দারুল হরবের নিকট বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য উক্ত নিরাপত্তা অগ্রাহ্য করা বৈধ নয়।
২. যদি ইসলামি সেনাদল দারুল হরবে প্রবেশ করে, আর সেনাপতি কোনো ক্ষুদ্র বাহিনীকে কোনো দূরবর্তী স্থানে পাঠিয়ে দেয় এবং তারা গনিমতের মাল হাসিল করে তাহলে এ গনিমত কেবল তাদেরই প্রাপ্য হবে না; বরং পুরো বাহিনী এ মালের অংশীদার হবে। এ সুরতে মাফউল মাহযূফ থাকবে। اَىْ يَرُدُّ الْغَنِيْمَةَ عَلَيْهِمْ

وَعَنْ ٣٣٢٥ أَبِىْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اُصِيْبَ بِدَمٍ اَوْ خَبْلٍ وَالْخَبْلُ الْجُرْحُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ اِحْدٰى ثَلٰثٍ فَاِنْ اَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ بَيْنَ اَنْ يَقْتَصَّ اَوْ يَعْفُوَ اَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ فَاِنْ اَخَذَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا عَدَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيْهَا مُخَلَّدًا اَبَدًا ـ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

৩৩২৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ শুরায়াহ খোযায়ী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি না-হক খুন অথবা জখমের কারণে ব্যথিত হয়। [যার আপনজনকে না-হক খুন করা হয়েছে অথবা কোনো অঙ্গ কেটে দেওয়া হয়েছে] তখন তার তিনটির যে কোনো একটি এখতিয়ার থাকবে। তবে যদি সে চতুর্থ কোনেটির ইচ্ছা করে তখন তার হাত ধরে ফেল। তিনটি জিনিস এই– কেসাস গ্রহণ করবে অথবা ক্ষমা করে দেবে অথবা দিয়ত গ্রহণ করবে। আর এ তিনটির কোনো একটি গ্রহণ করার পর যদি সে সীমালঙ্ঘন করে [অর্থাৎ অন্য কোনোটি চায়] তাহলে তার জন্য জাহান্নাম। সেখানে সে সর্বদা অবস্থান করবে। –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : خَالِدًا مُخَلَّدًا এ বাক্যের মাঝে কঠিন ভীতি প্রদর্শন ও সতর্ক করার জন্য দুটি তাকীদ আনা হয়েছে। "জাহান্নামে সর্বদা থাকবে" -এর অর্থ পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সে مُكْثٌ طَوِيْلٌ তথা দীর্ঘ সময়ের জন্য জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে। ঈমানের সাথে মৃত্যু বরণ করলে শাস্তি ভোগ করার পর সে নাজাত পাবে।

وَعَنْ ٣٣٢٦ طَاؤُسٍ (رضـ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ فِىْ عِمِّيَّةٍ فِىْ رَمْىٍ يَكُوْنُ بَيْنَهُمْ بِالْحِجَارَةِ اَوْ جَلْدٍ بِالسِّيَاطِ اَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَاءِ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ

৩৩২৬. **অনুবাদ :** হযরত তাউস (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি গণ্ডগোলের মাঝে নিহত হয়। যেমন– পাথর মারামারি অথবা চাবুক ছোড়াছুড়ি বা লাঠালাঠি দ্বারা গোলমাল হয়েছে [কে হত্যা করেছে তা নির্ণয় করা সম্ভব না হয়] তখন সেটাকে قَتْلُ خَطَأٍ ধরা হবে। আর এর রক্তপণও قَتْلُ خَطَأٍ [ভুলবশত হত্যা] অনুযায়ী হবে। আর যাকে

قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ دُوْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَغَضَبُهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয় তখন কেসাস ওয়াজিব হবে। আর যে ব্যক্তি কেসাস গ্রহণ করার মাঝে বাধা সৃষ্টি করবে তার উপর আল্লাহর লানত ও গজব রয়েছে। তার ফরজ ও নফল কোনো ইবাদতই কবুল করা হবে না।

–[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** দু দলের পাথর ছোঁড়াছুড়ি ও লাঠালাঠির মাঝে পতিত হয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তাহলে তা قَتْل خَطَأ -এর হুকুমে হবে। আর এর দিয়ত হবে قَتْل خَطَأ -এর দিয়তের অনুরূপ।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, এখানে পাথর ইত্যাদি শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি; বরং এগুলো ছাড়া যদি কোনো ভারী বস্তুর আঘাতে নিহত হয় তাহলেও কেসাস ওয়াজিব হবে না; বরং قَتْل خَطَأ -এর দিয়ত ওয়াজিব হবে। তাঁর পরিভাষায় এটাকে قَتْل شِبْه عَمْد বলা হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উল্লিখিত বস্তু তথা পাথর এবং লাঠি সাধারণ অর্থের উপর প্রযোজ্য হবে। হালকা হোক বা ভারী হোক এর মাঝে কোনো ব্যবধান নেই।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী এবং সাহেবাইনের মতে উল্লিখিত অবস্থায় লাঠি ও পাথর হালকা তথা ভারী না হওয়া শর্ত। কেননা যদি এমন কোনো বস্তুর আঘাতে হত্যা করা হয় যার দ্বারা সাধারণত মানুষ মরে যায়, তাহলে তা তাদের নিকট قَتْل عَمْد [ইচ্ছাকৃত হত্যা]-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

হত্যার প্রকারসমূহ ও তার হুকুম : ফুকাহায়ে কেরামের নিকট কতল বা হত্যা পাঁচ প্রকার। যথা–

١. قَتْل عَمْد، ٢. قَتْل شِبْه عَمْد، ٣. قَتْل خَطَأ، ٤. قَتْل جَارِي مَجْرَائِے خَطَأ، ٥. قَتْلٌ بِالسَّبَب.

১. قَتْل عَمْد **[ইচ্ছাকৃত হত্যা] :** জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ব্যক্তিকে অস্ত্র, হাতিয়ার বা এমন কোনো বস্তুর মাধ্যমে হত্যা করা, যার দ্বারা অঙ্গপ্রতঙ্গে বিচ্ছিন্ন করা যায়। যেমন – তরবারি, ছুরি, বন্দুকের গুলি, কামানের গোলা, বোম, ককলেট ইত্যাদি।

হুকুম : ১. হত্যাকারীকে কেসাসস্বরূপ হত্যা করা হবে।

২. যদি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশরা ক্ষমা করে দেয় অথবা দিয়ত [রক্তপণ] গ্রহণ করতে রাজি হয় তাহলে হানাফীদের নিকট কোনো কাফফারা ওয়াজিব হবে না। তবে শাফেয়ীদের নিকট কাফফারা ওয়াজিব হবে।

৩. হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ তথা উত্তরাধিকার হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে।

৪. হত্যাকারী দীর্ঘকাল পর্যন্ত জাহান্নামের শাস্তির উপযোগী হবে।

২. قَتْل شِبْه عَمْد **[ইচ্ছাকৃত হত্যার সাদৃশ গ্রহণ করে] :** ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে شِبْه عَمْد বলা হয়, এমন হাতিয়ারের মাধ্যমে হত্যা করা, যা হত্যা করার জন্য তৈরি করা হয়নি এবং যার দ্বারা গোশ্ত ও চামড়া কাটা যায় না। যেমন– পাথর ও লাকড়ি ইত্যাদি। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এমন পাথর-লাকড়ি অথবা কোনো এমন হালকা বস্তুর মাধ্যমে হত্যা করা সাধারণত যার দ্বারা মানুষ মারা যায় না।

হুকুম : ১. কাফফারাস্বরূপ মুমিন গোলাম বা মোমেনা দাসী আজাদ করতে হবে।

২. হত্যাকারীর عَاقِلَة [অভিভাবকগণ]-এর উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে।

৩. ওয়ারিশ হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে।

৪. পরকালে শাস্তির উপযোগী হবে।

৩. قَتْل خَطَأ **[ভুলবশত হত্যা] :** এটা আবার দু-ধরনের হতে পারে, **প্রথম প্রকারের উদাহরণ :** যেমন দূর হতে কোনো একটি বস্তুকে শিকার মনে করে তীর বা গুলি লাগিয়েছে। অথচ সে একজন মানুষ ছিল। অতঃপর সে মারা গেল।

দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ : কোনো ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুকে তীর নিক্ষেপ করল অথবা গুলি করল। তীর বা গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কোনো মানুষের গায়ে বিদ্ধ হলো অথবা হঠাৎ সেখানে দিয়ে লোক যাওয়ার কারণে সে গুলি বা তীরের সামনে পড়ে মারা গেল।

হুকুম : ১. দিয়ত এবং কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে।

২. ওয়ারিশ হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে।

৩. দিয়ত তিন বছরে عَاقِلَة [অভিভাবকগণ] আদায় করবে।

৪. সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে গুনাহগার হবে।

৪. قَتْل جَارِىْ مَجْرَاىِٔ خَطَا [ভুলবশত হত্যার স্থলাভিষিক্ত] : যদি হত্যাকারীর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো লোক নিহত হয়, যেমন ঘুমের ঘোরে কেউ কারো উপর পতিত হলো এবং যার উপর পতিত হলো সে মারা গেল। এর হুকুম قَتْل خَطَا -এর হুকুমের অনুরূপ।

৫. قَتْلُ بِالسَّبَبِ [কারো মৃত্যুর কারণ হওয়া] : যেমন কোনো লোক অপরের মালিকানাধীন জমিতে গর্ত খনন করল অথবা কোনো পাথর রেখে দিল, অতঃপর কোনো লোক পাথরে আঘাত পেয়ে অথবা গর্তে পতিত হয়ে মারা গেল।

হুকুম : ১. عَاقِلَه [অভিভাবকগণ]-এর উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে।

২. কাফফারা ওয়াজিব হবে না এবং নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ হওয়া থেকেও বঞ্চিত হবে না। [ওয়ারিশ হওয়ার সুরতে]

وَعَنْ ٣٣٢٧ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا اُعْفِىْ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ اَخْذِ الدِّيَةِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤدَ)

৩৩২৭. **অনুবাদ :** হযরত জাবির (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দিয়ত [রক্তপণ] গ্রহণ করার পরও [হত্যাকারীকে] কতল করল আমি তাকে ক্ষমা করব না। [বরং তাকেও কেসাসস্বরূপ হত্যা করব।]

وَعَنْ ٣٣٢٨ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَىْءٍ فِىْ جَسَدِهٖ فَتَصَدَّقَ بِهٖ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهٖ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيْئَةً. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩৩২৮. **অনুবাদ :** হযরত আবুদ্দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার দেহে কোনো জখম করা হয়, আর সে জখমকারীকে ক্ষমা করে দেয় তখন আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার গুনাহ মাফ করে দেন। -[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٣٢٩ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (رضـ) اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً اَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوْهُ قَتْلَ غِيْلَةٍ وَقَالَ عُمَرُ لَوْ تَمَالَاَ عَلَيْهِ اَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيْعًا. (رَوَاهُ مَالِكٌ وَرَوَى الْبُخَارِىُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ)

৩৩২৯. **অনুবাদ :** হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা.) হতে বর্ণিত, একবার হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এক ব্যক্তির বদলে পাঁচ অথবা সাত ব্যক্তিকে হত্যা করলেন। তারা সকলে মিলে গোপনে ঐ লোকটিকে হত্যা করেছিল। এরপর হযরত ওমর (রা.) বললেন, যদি ঐ লোকটিকে সমস্ত সান'আবাসী মিলে হত্যা করত তাহলে আমিও কেসাসস্বরূপ তাদের সকলকে হত্যা করতাম। -[মালেক। বুখারী এ হাদীসটি হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে অনুরূপভাবে রেওয়ায়েত করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَهْلُ صَنْعَاءَ : صَنْعَاء একটি প্রসিদ্ধ শহর। হাদীসে উল্লিখিত লোককে যারা হত্যা করেছিল তারা সকলেই ছিল সান'আর অধিবাসী। এ কারণেই হযরত ওমর (রা.) সান'আর কথা উল্লেখ করেছেন। অথবা আরবদের নিকট কোনো বস্তুর আধিক্য বুঝানোর জন্য প্রবাদ স্বরূপ "সান'আ" ব্যবহার করা হতো। কেননা সান'আবাসীরা সংখ্যায় ছিল বিপুল। এ হাদীস এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, যতলোক হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকবে তাদের সকলকে কেসাসস্বরূপ হত্যা করা হবে।

وَعَنْ ٣٣٣٠ جُنْدُبٍ (رض) قَالَ حَدَّثَنِيْ فُلَانٌ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَجِيْءُ الْمَقْتُوْلُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَقُوْلُ سَلْ هٰذَا فِيْمَ قَتَلَنِيْ فَيَقُوْلُ قَتَلْتُهُ عَلٰى مُلْكِ فُلَانٍ قَالَ جُنْدُبٌ فَاتَّقِهَا ـ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

৩৩৩০. অনুবাদ : হযরত জুনদুব (রা.) বলেন, আমাকে অমুক লোক বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, নিহত ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে তার হত্যাকারীকে ধরে নিয়ে আসবে। অতঃপর বলবে, [আল্লাহ তা'আলার নিকট] এ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করুন, সে আমাকে কেন হত্যা করেছে? তখন সে [হত্যাকারী] বলবে, আমি অমুক লোকের শক্তিতে তাকে হত্যা করেছি। রাবী হযরত জুনদুব (রা.) বলেন, সুতরাং তোমরা হত্যাকারীর সহযোগিতা হতে বেঁচে থাক। –[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : قَتَلْتُهُ عَلٰى مُلْكِ فُلَانٍ : অমুকের রাজত্বকালে আমি তাকে হত্যা করেছি। বাহ্যত মনে হচ্ছে নিহত ব্যক্তির প্রশ্ন ও হত্যাকারীর উত্তরের মাঝে কোনো সামঞ্জস্য নেই। কেননা নিহত ব্যক্তি হত্যার স্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেনি বরং সে হত্যার কারণ জানতে চেয়েছে।

এর জবাবে আলেমগণ বলেছেন– قَتَلْتُهُ عَلٰى مُلْكِ فُلَانٍ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমি অমুক আমির বা অমুক বাদশাহ অথবা অমুক দুনিয়াদার ব্যক্তির সময়কালে তার সাহায্যে কিংবা তার প্ররোচনায় হত্যা করেছি।

وَعَنْ ٣٣٣١ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَعَانَ عَلٰى قَتْلِ مُؤْمِنٍ شَطْرَ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللّٰهَ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أٰيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৩৩৩১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অর্ধেক শব্দ দ্বারাও কোনো মু'মিনের হত্যার ব্যাপারে সহয়তা করল সে এমন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে যে, তার কপালের মধ্যে লিখা থাকবে أٰيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ [অর্থাৎ আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ]। –[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَنْ أَعَانَ عَلٰى قَتْلِ مُؤْمِنٍ شَطْرَ كَلِمَةٍ : অর্থাৎ যে ব্যক্তি অর্ধেক শব্দ দ্বারাও কোনো মুমিনের হত্যার ব্যাপারে সহায়তা করল, যেমন اُقْتُلْ [হত্যা কর] এ শব্দটি পূর্ণভাবে না বলে শুধু اُقْ উচ্চারণ করল। অথবা কোনো মুমিনকে হত্যা করার জন্য ইঙ্গিত করল।

وَعَنْ ٣٣٣٢ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْاٰخَرُ يُقْتَلُ الَّذِيْ قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِيْ أَمْسَكَ ـ (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

৩৩৩২. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি কেউ কাউকে ধরে রাখে এবং অন্য কেউ তাকে হত্যা করে, তাহলে হত্যাকারীকে কতল করা হবে এবং যে ধরে রেখেছিল তাকে গ্রেফতার করা হবে। –[দারাকুতনী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হত্যা করার সময় যে ধরে রেখেছিল তাকে গ্রেফতার করবে। তবে গ্রেফতারের পর কতদিন শাস্তি হবে তা বিচারকের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। এ ধরনের শাস্তি "হদ" [শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত দণ্ডবিধি] নয়; বরং শরিয়তের পরিভাষায় এটাকে 'তাযীর' বলা হয়। যার প্রয়োগ ব্যবস্থা কাজি বা বিচারকের বিবেচনাধীন। কিন্তু অন্য এক হাদীসে আছে, হত্যাকাণ্ডে সহায়তাকারী থেকেও কেসাস গ্রহণ করা হবে। এর জবাবে বলা যায় হয়তোবা এ হাদীসটি 'মানসূখ' বা রহিত হয়ে গেছে।

بَابُ الدِّيَاتِ
পরিচ্ছেদ : দিয়ত

اَلدِّيَةُ-এর অর্থ ও তার নেসাব : دِيَةٌ বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার, অর্থ– রক্তমূল্য দেওয়া।

শরিয়তের পরিভাষায় 'দিয়ত' ঐ সম্পদকে বলা হয়, যা নিহত ব্যক্তির জানের বদলে অথবা কারো কোনো অঙ্গহানি করার বদলে দেওয়া হয়। এটা কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। তবে দিয়তের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে।

اَلدِّيَةُ-এর নেসাবের মাঝে ইমামগণের মতবিরোধ :

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ : হানাফীদের মতে, দিয়ত-এর নেসাব তিনটি– ১. একশত উট, ২. একহাজার দিনার, ৩. দশ হাজার দিরহাম। وَزْنُ سَبْعَةٍ হিসেবে অর্থাৎ দশ দিরহাম সাত মিসকাল স্বর্ণের সমপরিমাণ হবে। আর وَزْنُ سِتَّةٍ অর্থাৎ দশ দিরহাম ছয় মিসকাল স্বর্ণের সমপরিমাণ হিসেবে বারো হাজার দিরহাম হবে।

مَذْهَبُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট দুইশত জোড়া কাপড়, একহাজার ছাগল এবং দুইশত মহিষও এ নেসাবের অন্তর্ভুক্ত।

উল্লিখিত বস্তুসমূহের পরিবর্তে যদি তার মূল্য আদায় করে দেয়, তবুও সকলের ঐকমত্য অনুযায়ী জায়েজ হবে।

اَلدِّيَةُ-এর প্রকারসমূহ : দিয়ত দু প্রকার : ১. دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ ২. دِيَةٌ مُخَفَّفَةٌ

১. **দিয়তে মুগাল্লাযা :** দিয়তে মুগাল্লাযা-এর মাঝে কেবল উট ওয়াজিব হয়। আর এটা শুধু قَتْل-এর দু প্রকারের মাঝে আদায় করতে হয়– ১. قَتْل شِبْه عَمْد ২. قَتْل عَمْد-এর মাঝে যদি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ কেসাসের পরিবর্তে দিয়ত গ্রহণ করতে সম্মত হয়। পূর্বে এ আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

২. **দিয়তে মুখাফফাফা :** দিয়তে মুখাফফাফা যদি স্বর্ণের মাধ্যমে আদায় করে, তাহলে একহাজার দিনার দেবে। আর যদি রৌপ্যের মাধ্যমে আদায় করে, তাহলে দশহাজার দিরহাম দেবে। আর যদি এ ক্ষেত্রেও উট দিয়ে আদায় করতে চায়, তাহলে পাঁচ প্রকারের একশত উট দেবে। বিশটি 'ইবনে মাখায', বিশটি 'বিনতে মাখায' বিশটি 'বিনতে লাবূন', বিশটি 'হিক্কা' ও বিশটি 'জাযয়া'।

قَتْل خَطَأ، قَتْلُ جَارِىْ مَجْرَائے خَطَأ، قَتْلُ بِالسَّبَبِ এ তিন প্রকারের মাঝে 'দিয়তে মুখাফফাফা' ওয়াজিব হয়। উল্লেখ্য, দিয়তে মুখাফফাফা হোক বা মুগাল্লাযা হোক তিন বছরের মধ্যে আদায় করতে হবে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٣٣٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هٰذِهٖ وَهٰذِهٖ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৩৩৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, এটা আর তা সমান। অর্থাৎ কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি সমান। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যদি কেউ কারো উভয় হাত অথবা উভয় পায়ের সকল অঙ্গুলিসমূহ কেটে ফেলে, তাহলে সে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে বিফল হয়ে পড়ে। এজন্য শাস্তিস্বরূপ কর্তনকারী

ব্যক্তির উপর পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে। প্রতি আঙ্গুল কর্তনের বদলায় পূর্ণ দিয়তের এক দশমাংশ ওয়াজিব হবে। এদিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির দিয়ত এক সমান। যদিও কনিষ্ঠা অঙ্গুলিতে তিনটি জোড়া রয়েছে, আর বৃদ্ধাঙ্গুলিতে দুটি জোড়া রয়েছে।

وَعَنْ ٣٣٣٤ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جَنِيْنِ اِمْرَأَةٍ مِنْ بَنِيْ لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِأَنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيْهَا وَزَوْجِهَا وَالْعَقْلُ عَلٰى عَصَبَتِهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৩৩৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী লিহইয়ান গোত্রের জনৈক মহিলার গর্ভস্থ ভ্রূণ হত্যা করার ব্যাপারে ফয়সালা দিয়েছিলেন। যে ভ্রূণটি নিহত হয়ে তার পেট থেকে পড়ে গিয়েছিল। [তার বদলায়] একটি দাস বা দাসী দিয়তস্বরূপ আদায় করতে হবে। কিন্তু যে মহিলার উপর দাস বা দাসী আজাদ করা ওয়াজিব করেছিলেন সে মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ফয়সালা করলেন যে, তার মিরাস তার সন্তান এবং স্বামী পাবে, আর দিয়ত তার আসাবাদেরকে আদায় করতে হবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ الخ :

ঘটনার বিবরণ : দুই মহিলা পরস্পরে ঝগড়ায় লিপ্ত হলো। তাদের মাঝে একজন ছিল গর্ভবতী। গর্ভবতী মহিলাকে অপর মহিলাটি একটি পাথর নিক্ষেপ করল। ঘটনাক্রমে পাথরটি তার পেটের উপর গিয়ে পড়ল। পাথরের আঘাতে গর্ভবতী মহিলার ভ্রূণ নিহত হয়ে পড়ে গেল। অতঃপর পাথর নিক্ষপকারী মহিলার عَاقِلَة [অভিভাবক] দের উপর একটি غُرَّة তথা একটি দাস বা দাসী প্রদান করার ফয়সালা দেওয়া হলো। আর যদি ঐ বাচ্চাটি জীবন্ত ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মারা যেত, তাহলে পূর্ণ দিয়ত আদায় করতে হতো। ছেলে হলে একশত উট আর মেয়ে হলে পঞ্চাশটি উট দিতে হতো। কেননা মেয়েদের দিয়ত ছেলেদের অর্ধেক।

جَنِيْن **-এর অর্থ :** মহিলাদের ভ্রূণ যতক্ষণ পর্যন্ত পেটে থাকে তাকে جَنِيْن বলা হয়, আর যদি জীবন্ত ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে وَلَد বলা হয়। আর যদি মৃত অথবা অসম্পূর্ণ ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে তাকে سِقْط [সীনের নীচে কাসরাহ এবং কাফ সাকীন করে] বলা হয়।

قَوْلُهُ اِمْرَأَةٍ مِنْ بَنِيْ لِحْيَانَ : এর পরবর্তী হাদীসে আছে- اِمْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ সুতরাং রেওয়ায়েত দুটি পরস্পর বিরোধপূর্ণ মনে হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রেওয়ায়েত দুটির মাঝে কোনো বিরোধ নেই। কেননা "লেহইয়ান" হলো হুযায়ল গোত্রের একটি শাখা।

اَلْغُرَّةُ **-এর বিশ্লেষণ :** غُرَّة : কোনো কোনো ঘোড়ার কপালে যে শুভ্র অংশ থাকে তাকে غُرَّة বলা হয়। অতঃপর প্রত্যেক শুভ্র রঙের দাস-দাসীকে غُرَّة বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সকল ফুকাহায়ে কেরামের নিকট এখানে সাধারণ দাস-দাসী উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে ফুকাহায়ে কেরামের নিকট এখানে غُرَّة দ্বারা দিয়তের কুড়িভাগের এক ভাগ তথা পাঁচটি উট বা পাঁচশত দিরহাম অথবা পঞ্চাশ দিনার উদ্দেশ্য। এর থেকে যে কোনো একটি প্রদান করলে দিয়ত আদায় হয়ে যাবে। যেমন বর্ণিত আছে-

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِي الْجَنِيْنِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ قِيْمَتُهُ خَمْسُ مِأَةٍ وَعَنِ النَّخْعِيِّ (رحـ) اَلْغُرَّةُ خَمْسُ مِأَةِ دِرْهَمٍ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَوَّمَ الْغُرَّةَ خَمْسِيْنَ دِيْنَارًا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ (رحـ) فِيْ نَصْبِ الرَّايَةِ . (جـ ٤ صـ ٢٨١)

قَوْلُهُ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ : উল্লিখিত ইবারত দ্বারা বুঝা যায়, ভ্রূণ হত্যাকারী মহিলা পরে মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু এর পরবর্তী হাদীসে আছে- فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِيْ بَطْنِهَا অর্থাৎ মহিলাটি মারা গেল এবং তার পেটের ভ্রূণও নিহত হলো। সুতরাং হাদীস দুটির মাঝে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

দ্বন্দ্ব নিরসন :

১. গর্ভবতী মহিলা ও তার পেটের ভ্রূণ উভয়ই মৃত্যুবরণ করার পর হত্যাকারী মহিলাও মারা যায়। এ অর্থের সময় قَضٰى عَلَيْهَا দ্বারা قَضٰى عَلٰى عَاقِلَةِ الْجَانِيَةِ উদ্দেশ্য। মুযাফ মাহযূফ মানার কারণ হলো, غُرَّةٌ সর্বদা عَاقِلَة -এর উপর ওয়াজিব হয়। আর بَنِيْهَا وَزَوْجِهَا وَعَصَبَتِهَا -এর মাঝে هَا যমীর جَانِيَة [হত্যাকারী মহিলা]-এর দিকে ফিরবে।

২. আর যদি দ্বিতীয় রেওয়ায়েত অনুযায়ী গর্ভবতী মহিলাকে নিহত হওয়া সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে قَضٰى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ -এর অর্থ হবে– قَضٰى لَهَا بِالْغُرَّةِ অর্থাৎ عَلٰى এখানে لَامٌ -এর অর্থ দেবে।

৩. হাদীস দুটির ঘটনা দুজন ভিন্ন ভিন্ন মহিলার ব্যাপারে সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ ঘটনা দুটি এক নয়।

قَوْلُهُ بِاَنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيْهَا وَزَوْجِهَا وَالْعَقْلُ عَلٰى عَصَبَتِهَا : অর্থাৎ جَانِيَة [হত্যাকারী মহিলা]-এর মিরাস পাবে তার স্বামী ও সন্তানেরা, আর দিয়ত আদায় করবে عاقلة [অভিভাবক]। এখানে আসাবা দ্বারা উদ্দেশ্য عَاقِلَة। এ বাক্যটি এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, দিয়ত عَاقِلَة দের উপর ওয়াজিব হলেও তারা মিরাস পাবে না; বরং শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত ওয়ারিশগণই কেবল তার মিরাস পাবে। পরবর্তী হাদীসে তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে– وَرِثَهَا وَلَدُهَا وَمَنْ مَعَهُمْ। এখানে শুধু স্বামী ও সন্তানের কথা বলা হয়েছে। কারণ ঐ মহিলার ওয়ারিশ কেবল তারাই ছিলেন।

عَاقِلَة -এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ : عَقْل -এর অর্থ– বাঁধা, বেঁধে দেওয়া। আরবদের মাঝে রেওয়াজ ছিল, হত্যাকারীর ওয়ারিসগণ নিহত ব্যক্তির বাড়ির আঙ্গিনায় দিয়তের উট নিয়ে বেঁধে দিত। এ কারণেই دِيَةٌ -কে عَقْل বলা হয়। আর দিয়ত আদায়কারী আসাবাদেরকে عَاقِلَة বলা হয়। অথবা عَقْل অর্থ– বাধা দেওয়া, নিষেধ করা। আর দিয়তের কারণে মানুষের জীবন মূল্যহীন চলে যাওয়া থেকে হেফাজত করা হয়, এজন্য রক্তমূল্যকে عَاقِلَة বলা হয়। অবশ্য কারা عَاقِلَة -এর অন্তর্ভুক্ত হবে এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

مَذْهَبُ الْاِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর নিকট عَاقِلَة হলো তার গোত্র এবং তার আত্মীয়স্বজন।

তাঁদের দলিল :

١. اِنَّ الْعَقْلَ كَانَ عَلٰى عَشِيْرَةِ الْقَاتِلِ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا نَسْخَ بَعْدَهُ.

٢. عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَقْلَ قُرَيْشٍ وَعَقْلَ الْاَنْصَارِ عَلَى الْاَنْصَارِ (اِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ، اَلدِّرَايَةُ)

مَذْهَبُ اِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট একই পেশা অবলম্বনকারী ও সহকর্মী হলো عَاقِلَة যেমন– কেউ কোনো অফিসে চাকুরি করে তাহলে ঐ অফিসের সকলেই তার عَاقِلَة হবে। দলিল–

اِنَّ عُمَرَ (رضـ) لَمَّا دَوَّنَ الدَّوَاوِيْنَ جَعَلَ الْعَقْلَ عَلٰى اَهْلِ الدِّيْوَانِ وَكَانَ ذٰلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ مِنْهُمْ وَلَيْسَ ذٰلِكَ بِنَسْخٍ بَلْ هُوَ تَقْرِيْرٌ مَعْنًى لِاَنَّ الْعَقْلَ كَانَ عَلٰى اَهْلِ النُّصْرَةِ وَقَدْ كَانَتْ بِاَنْوَاعٍ كَالْقَرَابَةِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ. (اَلدِّرَايَةُ)

অর্থাৎ হযরত ওমর (রা.) তার শাসনামলে প্রতিটি বিভাগের জন্য দেওয়ান তথা অফিস প্রতিষ্ঠা করেন। আর অফিস স্টাফের উপর "দিয়ত"-এর দায়িত্ব অর্পণ করেন। সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে তিনি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কোনো সাহাবী বিরোধিতা করেননি। আর এ সিদ্ধান্ত নবী করীম ﷺ -এর নির্দেশকে রহিত করেনি; বরং নবী করীম ﷺ -এর নির্দেশের ব্যাখ্যা দিয়েছে। কেননা দিয়ত তো প্রত্যেকের সাহায্যকারীদের উপর আরোপিত হয়। নবী করীম ﷺ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর যুগে সাহায্যের কারণ বিভিন্ন ছিল। যেমন– হত্যাকারীর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক অথবা দাসত্ব সংশ্লিষ্টতা ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু দেওয়ান বা অফিস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সাহায্য ও সহযোগিতা অর্থগতভাবে অফিস স্টাফদের উপর আরোপিত হয়ে গেছে। এর উপর ভিত্তি করে মাশায়েখগণ বলেন, বর্তমান যুগে যদি সাহায্য ও সহায়তার পেশার উপর নির্ভরশীল হয়। তাহলে একই পেশায় নিয়োজিত লোকদের উপর দিয়ত ন্যস্ত করা হবে। অবশ্য বর্তমান যুগে ট্রেড ইউনিয়ন [শ্রমিক জোটসমূহ] এবং রাজনৈতিক পার্টিসমূহের মাঝে সাহায্য-সহায়তা পাওয়া যায়। সুতরাং যদি কোনো পার্টির সদস্যকে অন্য কোনো পার্টির লোকে হত্যা করে, তাহলে এর দিয়ত পার্টির উপর ন্যস্ত হবে।

একই পেশায় নিয়োজিত লোকদের উপর দিয়ত ন্যস্ত হওয়ার কারণ :

১. কোনো হত্যাকারীর হত্যাকাণ্ড ঘটানোর ক্ষেত্রে বাহিরের শক্তির অনেক দখল থাকে। সে মনে করে যদি আমাকে এ অপরাধে পাকড়াও করা হয়, তাহলে আমার সহকর্মী, কলিগ বা আমার পার্টি আমাকে সহযোগিতা করবে। এ কারণেই দিয়ত তাদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে, যাতে সহকর্মীরা এ ধরনের অপরাধ থেকে তাকে বিরত রাখে।

২. হত্যাকাণ্ডের রক্তমূল্য স্বরূপ বিপুল সম্পদ আদায় করতে হয়। আর অধিক সংখ্যক লোকের উপর এটা আদায় করার দায়িত্ব থাকলে সহজে উসুল করা সম্ভব হয়। অধিকন্তু প্রত্যেকে মনে করে যদি আমার দ্বারা কোনোদিন এ ধরনের কাজ সংঘটিত হয়, তাহলে এরা আমাকে সহায়তা করবে। সুতরাং আমিও সহায়তা করি।

আর যদি হত্যাকারীর জন্য এমন কোনো সাহায্যকারী দল না থাকে তাহলে বায়তুল মাল তথা সরকারি কোষাগার থেকে দিয়ত আদায় করতে হবে। যদি বায়তুল মালের ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে হত্যাকারীর সম্পদ থেকে দিয়ত আদায় করানো হবে।

তাঁদের দলিলের জবাব : হযরত নবী করীম ﷺ ও আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর যুগে গোত্র এবং দায়িত্ব গ্রহণকারী আত্মীয়দের উপর দিয়ত আদায় করা আবশ্যক ছিল। এটা দেওয়ান বা অফিস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগের হুকুম ছিল। আর হযরত ওমর (রা.)-এর সিদ্ধান্তের উপর তো সাহবায়ে কেরামের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

وَعَنْ ٣٣٣٥ قَالَ اقْتَتَلَتْ اِمْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِىْ بَطْنِهَا فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ اَوْ وَلِيْدَةٌ وَقَضٰى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلٰى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৩৩৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ল গোত্রের দুই মহিলা পরস্পর লড়াই করল। তাদের একজন অপরজনের উপর পাথর নিক্ষেপ করল। ফলে সে ও তার গর্ভস্থিত ভ্রূণ নিহত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফয়সালা দিলেন যে, গর্ভস্থিত ভ্রূণের দিয়ত হলো একজন দাস বা দাসী। আর নিহত মহিলার দিয়ত হত্যাকারিণী মহিলার "আকেলা" [অভিভাবক] দেরকে আদায় করতে হবে। আর হত্যাকারিণী মহিলার [মৃত্যুর পর] সন্তান এবং তাদের সাথে যে সকল উত্তরাধিকারী রয়েছে তারা মিরাস পাবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنِ ٣٣٣٦ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رضـ) اَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ فَرَمَتْ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى بِحَجَرٍ اَوْ عَمُوْدِ فُسْطَاطٍ فَاَلْقَتْ جَنِيْنَهَا فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْجَنِيْنِ غُرَّةً عَبْدًا اَوْ اَمَةً وَجَعَلَهُ عَلٰى عَصَبَةِ الْمَرْاَةِ هٰذِهِ رِوَايَةُ التِّرْمِذِيِّ وَفِىْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ قَالَ ضَرَبَتِ الْمَرْاَةُ ضَرَّتَهَا بِعَمُوْدِ فُسْطَاطٍ وَهِىَ حُبْلٰى فَقَتَلَتْهَا قَالَ وَاِحْدٰهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ قَالَ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُوْلَةِ عَلٰى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِىْ بَطْنِهَا .

৩৩৩৬. **অনুবাদ :** হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত, একবার দুই মহিলা, যারা পরস্পরে সতিন ছিল [মারামারি করল]। একজন অপরজনকে পাথর অথবা তাঁবুর খুঁটি নিক্ষেপ করল। যার কারণে তার গর্ভস্থিত ভ্রূণ পড়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ গর্ভের ভ্রূণের বদলায় একটি গোররা অর্থাৎ একটি দাস বা দাসী দেওয়ার ফয়সালা দিলেন। আর এটা হত্যাকারিণী মহিলার আসাবাদের উপর ওয়াজিব করলেন। এটা তিরমিযীর রেওয়ায়েত। আর মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে, হযরত মুগীরা (রা.) বর্ণনা করেন, এক মহিলা তার সতিনকে তাঁবুর খুঁটি দ্বারা আঘাত করল। সে ছিল গর্ভবতী। আর আক্রমণকারিনী তাকে মেরেই ফেলল। হযরত মুগীরা (রা.) বলেন, তাদের একজন ছিল লিহইয়ান গোত্রের মেয়ে। রাবী বলেন, এটার রক্তপণ হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিহত মহিলার দিয়ত হত্যাকারিণীর আসাবাদের উপর ওয়াজিব করলেন। আর গর্ভস্থিত ভ্রূণের দিয়তস্বরূপ গোররা অর্থাৎ একটি দাস বা দাসী দেওয়ার রায় দিলেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٣٣٧ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَا اِنَّ دِيَةَ الْخَطَاءِ شِبْهِ الْعَمَدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْاِبِلِ مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهَا اَوْلَادُهَا . (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ) وَرَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ عَنْهُ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَفِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ لَفْظُ الْمَصَابِيْحِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

৩৩৩৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সাবধান! ভুলবশত হত্যা, যা ইচ্ছাকৃত হত্যার সাদৃশ্য অর্থাৎ চাবুক অথবা লাঠির দ্বারা হত্যা করা হয়। তার দিয়ত একশত উট। তার মাঝে চল্লিশটি হতে হবে গর্ভবতী। −[নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী] আর আবূ দাউদ এ হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর এবং ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর শরহে সুন্নাহে মাসাবীহ এর ভাষ্যে হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে।

٣٣٣٨ - وَعَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ اِلٰى اَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانَ فِىْ كِتَابِهٖ اَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا فَاِنَّهُ قَوْدُ يَدِهٖ اِلَّا اَنْ يَرْضَى اَوْلِيَاءُ الْمَقْتُوْلِ وَفِيْهِ اَنَّ الرَّجُلَ يَقْتُلُ بِالْمَرْاَةِ وَفِيْهِ فِى النَّفْسِ الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْاِبِلِ وَعَلٰى اَهْلِ الذَّهَبِ اَلْفُ دِيْنَارٍ وَفِى الْاَنْفِ اِذَا اُوْعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْاِبِلِ وَفِى الْاَسْنَانِ الدِّيَةُ وَفِى الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِى الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِى الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِى الصُّلْبِ الدِّيَةُ وَفِى الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِى الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِى الْمَامُوْمَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِى الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِى الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْاِبِلِ وَفِىْ كُلِّ اِصْبَعٍ مِنْ اَصَابِعِ

৩৩৩৮. অনুবাদ : হযরত আবূ বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযম তাঁর পিতা [মুহাম্মদ] থেকে তিনি তাঁর দাদা [আমর] থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়ামানবাসীদের নিকট [এক নির্দেশনামা] লিখে পাঠান। উক্ত নির্দেশনামায় লেখা ছিল− যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নাহক কোনো মু'মিনকে হত্যা করে তবে উহা তার হাতের অর্জিত কেসাস [সুতরাং উক্ত খুনের বদলে তাকেও হত্যা করা হবে] তবে যদি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ রাজি হয়ে যায়। [অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ মাফ করে দেন অথবা রক্তমূল্য গ্রহণ করতে রাজি হয়ে যায়। তখন হত্যাকারীকে কতল করা হবে না।] আর উক্ত নির্দেশ নামায় এটাও ছিল যে, নারীর বদলে পুরুষকে হত্যা করা যাবে। তাতে এটাও ছিল যে, জানের দিয়ত হলো একশত উট। আর যদি কেউ স্বর্ণের মাধ্যমে দিয়ত আদায় করতে চায়, তাহলে তা হবে একহাজার স্বর্ণ মুদ্রা। আর যদি কারো নাক মূল হতে কেটে ফেলা হয়, তার দিয়ত হলো একশত উট। সমস্ত দাঁতের বদলায় পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে। উভয় ওষ্ঠের বদলায় পূর্ণ দিয়ত, উভয় অন্ডকোষের বদলায় পূর্ণ দিয়ত, লিঙ্গ কাটলেও পূর্ণ দিয়ত। মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেললে পূর্ণ দিয়ত, উভয় চোখ ফুড়িয়া দিলে বা তুলে ফেললে পূর্ণ দিয়ত, এক পা কেটে ফেললে অর্ধেক দিয়ত। আর মস্তকের খুলি জখম করলে এক তৃতীয়াংশ দিয়ত। পেটের মধ্যে জখমের আঘাত পৌঁছলেও এক তৃতীয়াংশ দিয়ত। আর যদি এমন আঘাত করা হয়, যার

الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِى السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ - رَوَاهُ النَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ وَفِى رِوَايَةِ مَالِكٍ وَفِى الْعَيْنِ خَمْسُوْنَ وَفِى الْيَدِ خَمْسُوْنَ وَفِى الرِّجْلِ خَمْسُوْنَ وَفِى الْمُوْضِحَةِ خَمْسٌ -

দরুন হাড্ডি স্থানচ্যুত হয়ে যায়, তাহলে পনেরোটি উট ওয়াজিব হবে। আর হাত ও পায়ের প্রতিটি আঙ্গুলের দিয়ত হলো দশটি উট এবং প্রতিটি দাঁতের দিয়ত পাঁচটি উট। –[নাসাঈ ও দারেমী] আর ইমাম মালেকের রেওয়ায়েতে আছে– এক চোখের দিয়ত পঞ্চাশটি উট এবং পায়ের দিয়ত পঞ্চাশটি উট এবং এক হাতের দিয়ত পঞ্চাশটি উট। আর এমন জখম করা, যার দরুন হাড্ডি প্রকাশ হয়ে যায় তার জন্য পাঁচটি উট ওয়াজিব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উল্লিখিত হাদীসের মাঝে নবী করীম ﷺ দিয়ত সম্পর্কে একটি নীতিমালা বর্ণনা করে দিয়েছেন। তা হচ্ছে, যদি মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে কোনো একটি অঙ্গের উপকারিতা পরিপূর্ণভাবে বিনষ্ট করা হয়। অথবা মানুষের কাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্যের মাঝে কোনো একটি পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, তাহলে পরিপূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হয়। কেননা এর দ্বারা জানের ক্ষতি হয়। মানুষের সম্মানার্থে তাকে জীবন হরণের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ বিধানের ভিত্তিতে নবী করীম ﷺ ঐ সকল বিশেষ অঙ্গ, যেগুলোর ক্ষতি সাধন দ্বারা মানুষের সৌন্দর্য বিনষ্ট হয় এবং তার ইজ্জত সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়। যেমন– চোখ, মুখ, নাক, কান ইত্যাদির বিনিময়ে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব করেছেন। উল্লিখিত সূত্রের উপর ভিত্তি করে আরও অনেক মাসআলা বের হয়।

উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি নাকের নরম অংশ অথবা নাকের কোনো ছিদ্র কেটে ফেলে, তাহলে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর যদি নাকের নরম অংশের সাথে নাকের বাঁশি কাটার কারণে পৃথকভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কারণ এখানে দুটি অঙ্গের উপকারিতা এবং সৌন্দর্য নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

مَذْهَبُ الْأَحْنَافِ وَمَوَالِكِ وَحَنَابِلَةْ : আহনাফ, মালেকী ও হাম্বলীদের নিকট একটি দিয়ত ওয়াজিব হবে। কারণ حَدِيْثُ الْبَابْ -এর মাঝে পূর্ণ নাক কাটার দরুন একটি আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া একটি হাড্ডি হওয়ার কারণে এক অঙ্গ ধরে একটি দিয়ত ওয়াজিব হওয়া উচিত।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব : حَدِيْثُ صَرِيْحٌ [সুস্পষ্ট হাদীস]-এর মোকাবিলায় কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়।

একটি হত্যার জন্য চারটি দিয়ত ওয়াজিব করা : বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (র.) জনৈক হত্যাকারীর উপর চারটি দিয়ত ওয়াজিব করেছিলেন। কারণ আঘাতের কারণে নিহত ব্যক্তির চারটি অঙ্গের ক্ষতি হয়েছিল। তার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, বোধশক্তি ও বাকশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই হযরত ওমর (রা.) হত্যাকারীর উপর চারটি দিয়ত ওয়াজিব করেছিলেন।

وَعَنْ ٣٣٣٩ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (رضـ) عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَوَاضِحِ خَمْسًا خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ وَفِى الْأَسْنَانِ خَمْسًا خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ - رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّرِمِىُّ وَرَوَى التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ الْفَصْلَ الْأَوَّلَ -

৩৩৩৯. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রা.) তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কারও অঙ্গের হাড্ডি প্রকাশ হয়, এমন জখম হলে তার জন্য পাঁচটি উট এবং দাঁত ভাঙ্গার ক্ষেত্রে [প্রত্যেকটি দাঁতের জন্য] পাঁচটি উট প্রদান করার ফয়সালা দিয়েছেন। –[আবূ দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী। আর তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ কেবল এ হাদীসের প্রথম অংশটিই বর্ণনা করেছেন।]

وَعَنْ ٣٣٤٠ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৩৩৪০. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় হাত ও উভয় পায়ের অঙ্গুলিসমূহের দিয়ত এক সমান নির্ধারণ করেছেন। –[আবূ দাঊদ ও তিরমিযী]

وَعَنْهُ ٣٣٤١ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاَصَابِعُ سَوَاءٌ وَالْاَسْنَانُ سَوَاءٌ الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ هٰذِهٖ وَهٰذِهٖ سَوَاءٌ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৩৪১. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সকল অঙ্গুলি [দিয়তের ক্ষেত্রে] সমান। তদ্রূপ সকল দাঁতও সমান এবং সামনের দাঁত ও মাড়ির দাঁত সমান। এটাও তাও [বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি] সমান। –[আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ٣٣٤٢ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ ثُمَّ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهٗ لَا حِلْفَ فِى الْاِسْلَامِ وَمَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاِنَّ الْاِسْلَامَ لَا يَزِيْدُهٗ اِلَّا شِدَّةً اَلْمُؤْمِنُوْنَ يَدٌ عَلٰى مَنْ سِوَاهُمْ يُجِيْرُ عَلَيْهِمْ اَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ اَقْصَاهُمْ يَرُدُّ سَرَايَاهُمْ عَلٰى قَعِيْدَتِهِمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ اِلَّا فِىْ دُوْرِهِمْ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৩৪২. **অনুবাদ :** হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রা.) তিনি তাঁর পিতা [শুয়াইব (রা.)] থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের বৎসর এক ভাষণ দান করেন। [হাম্‌দ ও ছানার পর] সে ভাষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে লোক সকল ! ইসলামে কসম, জোট বা চুক্তি নেই। অবশ্য জাহেলি যুগে যে সকল [জনকল্যাণমূলক] চুক্তি করা হয়েছে ইসলাম তাকে আরও শক্তিশালী করে। অমুসলিমদের মোকাবিলায় সকল মুসলমান একটি হাতের ন্যায়। একজন সাধারণ মুসলমানও সকল মুসলিম জনতার পক্ষ থেকে আশ্রয় দিতে পারে। দূরবর্তী সৈন্যগণ যে গনিমত লাভ করবে, নিকটবর্তীগণও তার হকদার হবে। আর লড়াইয়ে লিপ্ত সৈন্যরা যা লাভ করবে, বসে থাকা সৈন্যরাও তার অংশ পাবে। [সাবধান!] কোনো কাফিরের খুনের বদলায় কোনো মুসলমানকে কতল করা যাবে না। একজন কাফেরের দিয়ত একজন মুসলমানের দিয়তের অর্ধেক। পশুর জাকাত এক জায়গায় বসে থেকে আদায় করা যাবে না। আর জাকাতের ভয়ে পশু নিয়ে দূরবর্তী স্থানে চলে যাওয়াও জায়েজ নেই। জনগণের নিজ বসতিতে গিয়েই জাকাত আদায় করতে হবে। অপর এক বর্ণনায় আছে, নিরাপত্তাপ্রাপ্ত [জিম্মি] ব্যক্তির দিয়ত হলো একজন স্বাধীন মুসলমানের অর্ধেক। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لَا حِلْفَ فِى الْاِسْلَامِ : حِلْفٌ-এর মূল অর্থ হলো– চুক্তি করা, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া। জাহেলি যুগে লোকেরা একে অপরের সাথে এই মর্মে চুক্তি করত যে, তারা যৌথভাবে কোথাও যুদ্ধ করবে, লুটপাট করবে। তখন ন্যায়-অন্যায়ের পরওয়া না করে একে অপরের সহযোগিতা করবে। যদি একজন মারা যায়, তাহলে অপরজন তার ওয়ারিশ হবে ইত্যাদি। নবী করীম ﷺ তার পবিত্র বাণী– لَا حِلْفَ فِى الْاِسْلَامِ দ্বারা এ ধরনের চুক্তিকে নিষিদ্ধ করেছেন।

قَوْلُهُ وَمَا كَانَ مِنْ حَلْفٍ : অর্থ হলো, জাহিলিযুগে তাদের মাঝে এ উত্তম কাজটিও পাওয়া যেত যে, তারা মজলুম ব্যক্তিকে সাহায্য করবে, আত্মীয়স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, সাধারণ মানুষের হক আদায় করবে ইত্যাদি। নবী করীম ﷺ বললেন, ইসলাম তাকে আরও শক্তিশালী করে।

قَوْلُهُ يَرُدُّ سَرَايَاهُمْ عَلٰى قَعِيْدَتِهِمْ : এ বাক্যটি মূলত প্রথম বাক্য وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ اَقْصَاهُمْ -কে আরও সুস্পষ্ট ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে।

سَرَايَا অর্থ- ঐ সকল সৈন্যদের ক্ষুদ্র দল, যারা যুদ্ধে লিপ্ত আছে এবং গনিমতের মাল হাসিল করতেছে। তাদের অর্জিত গনিমত কেবল তারাই ভোগ করবে না বরং ইসলামি সৈন্যবাহিনীর প্রত্যেকেই তার অংশীদার হবে।

قَوْلُهُ لَايُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ : কোনো মুমিনকে কোনো হরবী কাফেরের খুনের বদলায় হত্যা করা যাবে না। তবে জিম্মি কাফেরের বদলায় হত্যা করা যাবে। কাফেরের দিয়ত মুসলমানের সমান।

قَوْلُهُ دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ : কাফেরের দিয়ত মুসলমানের দিয়তের অর্ধেক।

কাফেরের দিয়তের ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ :

مَذْهَبُ اِمَامْ مَالِكٍ وَاِمَامْ اَحْمَدْ (فِىْ رِوَايَةٍ) : ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী কাফেরের দিয়ত মুসলমানের দিয়তের অর্ধেক।

দলিল : فِىْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (رضـ) : دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ

مَذْهَبُ اِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَاِمَامْ اَحْمَدَ (فِىْ رِوَايَةٍ) وَاِسْحَاقَ : ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর এক রেওয়ায়েত এবং ইসহাক (র.)-এর নিকট কাফেরের দিয়ত মুসলমানের দিয়তের ছুলুছ [এক তৃতীয়াংশ]।

দলিল :

١. عَنْ عُمَرَ (رضـ) اَنَّهُ قَالَ دِيَةُ الْيَهُوْدِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ اَرْبَعَةُ اٰلَافٍ وَدِيَةُ الْمَجُوْسِيِّ ثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ـ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّهُ قَضٰى فِى الْيَهُوْدِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ اَرْبَعَةَ اٰلَافِ دِرْهَمٍ وَفِى الْمَجُوْسِيِّ ثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ـ (مُسْنَدُ اِمَامِ الشَّافِعِيِّ)

٢. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَضَ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اَرْبَعَةَ اٰلَافِ دِرْهَمٍ (مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ـ دَارَقُطْنِيْ زَيْلَعِيْ)

مَذْهَبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَالثَّوْرِيِّ وَحَمَّادٍ وَنَخْعِيْ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَلْقَمَةَ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা, ছাওরী, হাম্মাদ, নাখয়ী, আতা, মুজাহিদ, আলকামা (র.) প্রমুখের নিকট মুসলমানদের ন্যায় কাফেরেরও পূর্ণ দিয়ত দিতে হবে। অবশ্য এ ইখতিলাফ জিম্মি কাফেরের ক্ষেত্রে। হরবী কাফেরের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে কোনো দিয়ত নেই।

দলিল : ١. قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهِ ـ (نِسَاءُ ـ ٩٢)

মুফাসসিরীনদের এক জামাতের মতে, بَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ -এর যমীর এখন হত্যাকৃত কাফেরের দিকে ফিরেছে, যে জিম্মি অথবা চুক্তিবদ্ধ। সুতরাং এর দ্বারা কাফের জিম্মি এবং চুক্তিবদ্ধ কাফেরের দিয়ত মুসলমানের দিয়তের সমান হওয়া প্রমাণিত হয়।

٢. عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دِيَةُ كُلِّ ذِيْ عَهْدٍ فِيْ عَهْدِهِ اَلْفُ دِيْنَارٍ (كَذَا فِى الْهِدَايَةِ وَاَخْرَجَهُ ـ اَبُوْ دَاوُدَ فِيْ مَرَاسِيْلِهِ)

মুসলমানের দিয়ত একহাজার দিনার। অনুরূপভাবে নবী করীম ﷺ কাফেরের দিয়তও একহাজার দিনার স্থির করেছেন। সুতরাং উভয়ের দিয়ত এক সমান প্রমাণিত হলো।

٣. عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ كَانَ عَقْلُ الذِّمِّيِّ مِثْلُ عَقْلِ الْمُسْلِمِ فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَزَمَنِ اَبِيْ بَكْرٍ (رضـ) وَزَمَنِ عُمَرَ (رضـ) وَزَمَنِ عُثْمَانَ (رضـ) ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ فِيْ مَرَاسِيْلِهِ وَمُحَمَّدٌ فِيْ اٰثَارِهِ)

دَلِيْلٌ عَقْلِيٌّ : لِاَنَّ الذِّمِّيَّ حُرٌّ مَعْصُوْمُ الدَّمِ فَتَكْمُلُ دِيَتُهُ كَالْمُسْلِمِ ـ

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে তাঁদের দলিলের জবাব :

১. মালেকী ও শাফেয়ীদের পেশকৃত রেওয়ায়েতের চেয়ে আমাদের রেওয়ায়েত অধিক প্রসিদ্ধ ও শক্তিশালী। কেননা তার উপর সাহাবায়ে কেরাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল পাওয়া যায়।

২. কুরআনের আয়াতের মোকাবিলায় خَبَرُ وَاحِدٌ দলিলযোগ্য নয়।

৩. قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمْوَالُهُمْ كَاَمْوَالِنَا وَدِمَائُهُمْ كَدِمَائِنَا

এ সহীহ হাদীস দ্বারা তাদের পেশকৃত হাদীসগুলো মনসুখ হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ : جَلَبٌ অর্থ– সরকারি জাকাত উসুলকারীর কোনো স্থানে গিয়ে ক্যাম্প করা আর লোকদেরকে তাদের পশুপাল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে জাকাত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া। এমনটি করা যাবে না। বরং বাড়ি বাড়ি গিয়ে পশুর জাকাত আদায় করতে হবে।

جَنَبٌ অর্থ– নিজ পশুপাল নিয়ে জাকাত আদায়কারীর অবস্থান থেকে দূরবর্তী কোনো স্থানে চলে যাওয়া। আর জাকাত উসুলকারীকে সেখানে গিয়ে জাকাত আদায় করতে বলা। এমনটিও করা যাবে না। কেননা এতে জাকাত আদায়কারী সমস্যায় পড়ে যাবে।

٣٣٤٣ - وَعَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ (رح) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ دِيَةِ الْخَطَاِ عِشْرِيْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرِيْنَ اِبْنَ مَخَاضٍ ذُكُوْرٍ وَعِشْرِيْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَعِشْرِيْنَ جِذْعَةً وَعِشْرِيْنَ حِقَّةً. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ) وَالصَّحِيْحُ اَنَّهُ مَوْقُوْفٌ عَلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَخِشْفٌ مَجْهُوْلٌ لَا يُعْرَفُ اِلَّا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَرُوِىَ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَدٰى قَتِيْلَ خَيْبَرَ بِمِائَةٍ مِنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ وَلَيْسَ فِىْ اَسْنَانِ اِبِلِ الصَّدَقَةِ ابْنَ مَخَاضٍ اِنَّمَا فِيْهَا ابْنُ لَبُوْنٍ.

৩৩৪৩. **অনুবাদ :** হযরত খিশফ ইবনে মালেক (র.) হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ভুলবশত হত্যার দিয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ [একশত উট] নির্ধারণ করেছেন। তার মধ্যে বিশটি বিনতে মাখায [মাদি], বিশটি ইবনে মাখায [নর], [অর্থাৎ যে সকল বাচ্চা উট এক বছর পূর্ণ করে দ্বিতীয় বছরে উপনীত হয়েছে], বিশটি বিনতে লাবূন, [যে সকল উষ্ট্রী দু-বছর পূর্ণ করে তৃতীয় বছরে উপনীত হয়েছে।] বিশটি জাযআ, [যে সকল উষ্ট্রী চার বছর পূর্ণ করে পঞ্চম বছরে উপনীত হয়েছে।] আর বিশটি ছিল হিক্কা [যে সকল উষ্ট্রী তিন বছর পূর্ণ করে চতুর্থ বছরে উপনীত হয়েছে।] –[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী] আর এটাই সহীহ যে, এ হাদীসটি হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উপর মাওকূফ [অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উক্তি, নবী করীম ﷺ -এর বাণী নয়।] এ হাদীস বর্ণনাকারী খিশফ একজন অপরিচিত রাবী। এ হাদীস ছাড়া অন্যকোনো রেওয়ায়েত তার থেকে পাওয়া যায় না। শরহে সুন্নাহের মাঝে বর্ণিত আছে, যে লোকটি খায়বারে নিহত হয়েছিল নবী করীম ﷺ তার দিয়তস্বরূপ জাকাতের উট থেকে একশত উট আদায় করেছিলেন। আর জাকাতের উটের মাঝে এক বছরের কোনো উট ছিল না; বরং দুই বছরের ছিল।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভুলবশত হত্যার দিয়তের মাঝে আলেমগণের মতবিরোধ : ভুলবশত হত্যার দিয়ত যে পাঁচ প্রকারের একশত উট এতে কারো কোনো দ্বিমত নেই। তবে তার প্রকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে।

مَذْهَبُ الشَّوَافِعِ وَمَوَالِكِ وَلَيْثٍ (رحـ) : শাফেয়ী, মালেকী এবং লাইছ (র.)-এর নিকট বিশটি ইবনে মাখায-এর স্থলে বিশটি ইবনে লাবূন হবে।

দলিল :

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَدَّى قَتِيْلَ خَيْبَرَ بِمِائَةٍ مِنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ وَلَيْسَ فِيْ اَسْنَانِ اِبِلِ الصَّدَقَةِ اِبْنَ مَخَاضٍ اِنَّمَا فِيْهَا اِبْنُ لَبُوْنٍ (شَرْحُ السُّنَّةِ مِشْكوٰة ـ جـ٢ صـ٣٠٣)

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জাকাতের উটের মাঝে কোনো উট ইবনে মাখায ছিল না; বরং ইবনে লাবূন ছিল। অর্থাৎ যেগুলোর বয়স দু বছর শেষ হয়ে তৃতীয় বছরে পড়েছে। সুতরাং খায়বারের হত্যার দিয়তের ন্যায় অন্যান্য হত্যার দিয়তও ইবনে লাবূন হওয়া উচিত।

مَذْهَبُ اِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَحْمَدَ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, বিশটি ইবনে মাখায, ইবনে লাবূন নয়।

দলিল :

عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ دِيَةِ الْخَطَاءِ عِشْرِيْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرِيْنَ اِبْنَ مَخَاضٍ ذُكُوْرٍ وَعِشْرِيْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَعِشْرِيْنَ جَذْعَةً وَعِشْرِيْنَ حِقَّةً . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

বিরোধীদের প্রতি উত্তর :

১. 'ইবনে মাখায', 'ইবনে লাবূন' থেকে কম এবং সহজ। সুতরাং এটা ভুলবশত হত্যার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা ভুলবশত হত্যাকারী প্রকৃতপক্ষে মাজুর ও অপারগ।

২. উপস্থিত ক্ষেত্রে ইবনে মাখায ছিল না, তাই যার পরিবর্তে ইবনে লাবূন দিয়েছেন। শরহে সুন্নাহের হাদীসও তার প্রমাণ বহন করে।

৩. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) উচ্চতর ফকীহ ছিলেন তাই তাঁর হাদীস প্রাধান্য লাভ করা উচিত।

প্রশ্ন : সাহেবে মাসাবীহ আহনাফের দলিলের উপর দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।

১. এ হাদীস ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উপর মওকুফ।

২. এ হাদীসের রাবী غَيْرُ مَعْرُوْفٍ [অপ্রসিদ্ধ] তার থেকে এ হাদীস ছাড়া অন্য কোনো হাদীস বর্ণিত নেই।

উত্তর : ১. এ হাদীসটি মওকুফ মেনে নেওয়া হলেও কোনো অসুবিধা নেই। কেননা تَقَادِيْرُ [পরিমাণ] এর ক্ষেত্রে مَوْقُوْفٌ হাদীসও مَرْفُوْعٌ এর হুকুমে।

২. খিশফ ইবনে মালেক হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) ও ওমর (রা.) এবং তাঁর পিতা মালেক থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। সুতরাং তিনি مَعْرُوْفٌ [প্রসিদ্ধ] রাবী।

١. لِاَنَّ اَقَلَّ الْمَعْرُوْفِ اَنْ يَرْوِيَ عَنِ اثْنَيْنِ قَالَ التُّوْرِبِشْتِيْ وَالْعَجَبُ مِنْ مُؤَلِّفِ الْمَصَابِيْحِ كَيْفَ يَشْهَدُ بِصِحَّتِهِ مَوْقُوْفًا ثُمَّ طَعَنَ فِي الَّذِيْ يَرْوِيْهِ (اَيْ خِشْفٍ) عَنْهُ ـ

٢. وَنَقَلَ الْخَطَّابِيُّ (رحـ) عَنِ الْبُخَارِيِّ (رحـ) اَنَّ سَمَاعَ خِشْفٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَسْعُوْدٍ لَا يَجْعَلُهُ مِنَ الْمَشْهُوْرِيْنَ قَالَ مُلَّا عَلِيٌّ قَارِيْ (رحـ) لَا يَجْعَلُهُ مِنَ الْمَشْهُوْرِيْنَ لٰكِنْ يُخْرِجُهُ مِنَ الْمَجْهُوْلِيْنَ . (مِرْقَاة جـ٧ صـ٨١)

وَعَنْ ٣٣٤٤ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَتْ قِيْمَةُ الدِّيَةِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَمَانَ مِائَةِ دِيْنَارٍ اَوْ ثَمَانِيَةَ اٰلَافِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ اَهْلِ الْكِتَابِ

৩৩৪৪. অনুবাদ : হযরত ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে দিয়তের মূল্য ছিল আটশত দিনার [স্বর্ণমুদ্রা] অথবা আট হাজার দিরহাম [রৌপ্যমুদ্রা]। আর ঐ সময় আল্লাহর কিতাব তথা ইহুদি খ্রিস্টানদের দিয়ত

يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ فَكَانَ كَذٰلِكَ حَتّٰى اسْتَخْلَفَ عُمَرُ فَقَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ اِنَّ الْاِبِلَ قَدْ غَلَتْ قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلٰى اَهْلِ الذَّهَبِ اَلْفَ دِيْنَارٍ وَعَلٰى اَهْلِ الْوَرِقِ اِثْنَىْ عَشَرَ اَلْفًا وَعَلٰى اَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَىْ بَقَرَةٍ وَعَلٰى اَهْلِ الشَّاءِ اَلْفَىْ شَاةٍ وَعَلٰى اَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَىْ حُلَّةٍ قَالَ وَتَرَكَ دِيَةَ اَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيْمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

ছিল মুসলমানের দিয়তের অর্ধেক। আমর ইবনে শুয়াইবের দাদা বলেন, এরূপ চলে আসতেছিল। কিন্তু যখন হযরত ওমর (রা.) খলিফা নিযুক্ত হন, তখন জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে বলেন, এখন উটের দাম অনেক বেড়ে গেছে। রাবী বলেন, তাই হযরত ওমর (রা.) দিয়তের পরিমাণ স্থির করলেন, স্বর্ণের মালিকের উপর একহাজার দিনার, রৌপ্যের মালিকের উপর বারো হাজার দিরহাম, গরুর মালিকের উপর দুইশত গাভি, ছাগলের মালিকের উপর দুই হাজার বকরি ও কাপড়ের মালিকের উপর দুইশত জোড়া কাপড়। বর্ণনাকারী বলেন, জিম্মিদের দিয়ত নবী করীম ﷺ -এর সময়কালে যা ছিল হযরত ওমর (রা.) তা পরিবর্তন না করে তাই বহাল রাখলেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : দিয়তের ভিত্তি শুধু উটের উপর, না এর সাথে অন্য কিছু শামিল আছে, এ ব্যাপারে ইখতেলাফ রয়েছে।

দিয়তের ভিত্তির উপর ওলামাগণের মতবিরোধ :

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدُ (فِىْ رِوَايَةٍ) وَابْنِ الْمَنْذُوْرِ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ (র.)-এর এক রেওয়ায়েত ও ইবনুল মানযূর (র.)-এর নিকট দিয়তের ক্ষেত্রে উটই আসল বস্তু। আর স্বর্ণ রৌপ্যের যে পরিমাণ বলা হয়েছে, তা ঐ সময় একশত উটের মূল্য হিসেবে করে বলা হয়েছিল। অতএব, উটের মূল্য কমবেশি হওয়ার কারণে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের পরিমাণের মাঝেও পার্থক্য হতে পারে।

দলিল :

فِىْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ دِيَةَ الْخَطَاءِ شِبْهُ الْعَمَدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْاِبِلِ الخ ـ سُنَنُ اَرْبَعَةٌ ـ (مِشْكٰوةُ ـ جـ٢ صـ٣٠٣)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, দিয়তের ভিত্তি ও বুনিয়াদ উটের উপর।

مَذْهَبُ اَبِىْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَاَحْمَدَ (فِىْ رِوَايَةٍ) : ইমাম আবূ ইউসূফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আহমদ (র.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী, দিয়তের বুনিয়াদ ছয়টি জিনিসের উপর। যথা– উট, স্বর্ণ [দিনার], রৌপ্য [দিরহাম], গরু, ছাগল, কাপড়।

مَذْهَبُ مَوَالِكٍ : মালেকীদের মাযহাব হলো, যদি হত্যাকারী গ্রামের বাসিন্দা হয় তাহলে দিয়তের বুনিয়াদ হবে উট। আর যদি হত্যাকারী স্বর্ণের মালিক হয়। যেমন– পশ্চিমা দেশে বসবাসকারীরা হয়ে থাকে, তাহলে তার দিয়তের বুনিয়াদ হবে একহাজার দিনার। আর যদি রৌপ্যের মালিক হয়। যেমন– ইরানী ও ইরাকীগণ হয়ে থাকে। তাদের দিয়তের বুনিয়াদ হবে বারো হাজার দিরহাম।

দলিল :

فِىْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ الْاِبِلَ قَدْ غَلَتْ قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلٰى اَهْلِ الذَّهَبِ اَلْفَ دِيْنَارٍ وَعَلٰى اَهْلِ الْوَرِقِ اِثْنَىْ عَشَرَ اَلْفًا وَعَلٰى اَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَىْ بَقَرَةٍ وَعَلٰى اَهْلِ الشَّاءِ اَلْفَىْ شَاةٍ وَعَلٰى اَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَىْ حُلَّةٍ الخ ـ

কেননা, কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এ হাদীসের মাঝে নিম্নের অতিরিক্ত ইবারত রয়েছে–

إِنَّ عُمَرَ (رضـ) هٰكَذَا جَعَلَ عَلٰى اَهْلِ كُلِّ مَالٍ مِنْهَا ـ (رَوَاهُ مُحَمَّدٌ فِى الْاٰثَارِ)

অর্থাৎ, হযরত ওমর (রা.) উল্লিখিত মালের মালিকদের উপর এইভাবে দিয়ত নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং হত্যাকারীর অবস্থার উপর ভিত্তি করে দিয়তের মাল শনাক্ত করা উচিত।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَحْمَدَ (فِىْ رِوَايَةٍ) وَشَافِعِىِّ (رحـ) (فِىْ رِوَايَةِ الْقَدِيْمَةِ) : ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আহমদ (র.)-এর এক রেওয়ায়েত ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কাদীম রেওয়ায়েত অনুযায়ী দিয়তের বুনিয়াদ তিনটি বস্তু। যথা– উট, স্বর্ণ ও রৌপ্য।

দলিল :

১. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَسَنٍ بَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ (رضـ) اَنَّهُ فَرَضَ عَلٰى اَهْلِ الذَّهَبِ فِى الدِّيَةِ اَلْفَ دِيْنَارٍ وَمِنَ الْوَرِقِ عَشَرَةَ اُلَافِ دِرْهَمٍ ـ (بَيْهَقِىْ ـ مِرْقَاتْ)

২. وَعَنْ اَبِىْ ضَبْعَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ فَقَالَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ فَرَضَ عُمَرُ (رضـ) عَلٰى اَهْلِ الْقُرْاٰنِ اِثْنَىْ عَشَرَ اَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَلٰكِنَّهُ فَرَضَهَا اِثْنَىْ عَشَرَ اَلْفًا ـ

উল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা স্বর্ণ, রৌপ্য ও দিয়তের বুনিয়াদি বস্তু হওয়া প্রমাণিত হয়।

বিরোধীদের দলিলের উত্তর :

১. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পেশকৃত দলিলের মাঝে শুধু উটের কথা উল্লেখ থাকা, একথা প্রমাণ করে না যে, দিয়ত কেবল উটের উপরই সীমাবদ্ধ। আর স্বর্ণ রৌপ্য দিয়তের বুনিয়াদি বস্তু নয়; বরং অন্যান্য সহীহ হাদীস দ্বারা স্বর্ণ, রৌপ্য ও দিয়তের বুনিয়াদ বা ভিত্তি হওয়া প্রমাণিত হয়। لِاَنَّ تَخَصُّصَ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ لَا يَدُلُّ عَلٰى نَفْىِ مَا عَدَاهُ

২. ইমাম আবূ ইউসূফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম মালেক (র.) কর্তৃক পেশকৃত হাদীসের মাঝে ছয়টি জিনিসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাঝে গরু, ছাগল এবং কাপড় এমন সম্পদ যা অনির্দিষ্ট ও কমবেশি হওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। উটও অনুরূপ তবে উটের ব্যাপারটি মাশহুর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর এমন হাদীস অন্যান্য মালের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নেই। সুতরাং তা কিয়াসের বিপরীত হওয়ার পরও উটকে দিয়তের বুনিয়াদি বস্তু স্থির করা হয়েছে।

৩. "جَعَلَ عَلٰى اَهْلِ كُلِّ مَالٍ مِنْهَا" দ্বারা উট, স্বর্ণ ও রৌপ্য উদ্দেশ্য নেওয়া অধিক যুক্তিসঙ্গত। কেননা এ উদ্দেশ্য নেওয়া হলে সকল হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়।

وَعَنْ ٣٣٤٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اِثْنَىْ عَشَرَ اَلْفًا ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ)

৩৩৪৫. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দিয়তের পরিমাণ বারো হাজার [দিরহাম] নির্ধারণ করেছেন। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, দারেমী]

وَعَنْ ٣٣٤٦ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَاِ عَلٰى اَهْلِ الْقُرٰى اَرْبَعَ مِائَةِ دِيْنَارٍ اَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلٰى اَثْمَانِ الْاِبِلِ فَاِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِىْ قِيْمَتِهَا

৩৩৪৬. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রা.) তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কতলে খতার [ভুলবশত হত্যার] দিয়ত মহল্লাবাসীর উপর স্থির করেছেন চারশত দিনার [স্বর্ণমুদ্রা] অথবা তার সমপরিমাণ মূল্যের রৌপ্য মুদ্রা। আর এটা উটের মূল্যের উপর হিসেব করেই নির্ধারণ করেছিলেন। সুতরাং যখন উটের মূল্য বেড়ে যেত তখন দিয়তের মূল্য

وَإِذَا هَاجَتْ رَخُصَ نَقَصَ مِنْ قِيْمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِيْنَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِيْنَارٍ وَعِدْلُهَا مِنَ الْوَرَقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ وَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَىْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَىْ شَاةٍ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ الْعَقْلَ مِيْرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيْلِ وَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

বর্ধিত করে দিতেন। আর যখন উটের মূল্য কমে যেত তখন দিয়তের মূল্য হ্রাস করে দিতেন। সুতরাং নবী করীম ﷺ -এর জমানায় দিয়তের মূল্য চারশত দিনার থেকে আটশত দিনার পর্যন্ত পৌঁছে যেত। আর আটশত দিনার সমপরিমাণ রৌপ্যমুদ্রা ছিল আট হাজার দিরহাম। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গাভীর মালিকের উপর দুইশত গাভি আর বকরির মালিকের উপর দুই হাজার বকরি [দিয়তস্বরূপ] নির্ধারণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন, দিয়তের মাল নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের হক। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফায়সালা দিয়েছেন, মহিলার দিয়ত তার আসাবাগণ হিস্যা অনুপাতে বহন করবে। আর হত্যাকারী কিছুতেই নিহত ব্যক্তির সম্পদের ওয়ারিশ হবে না। –[আবূ দাঊদ]

٣٣٤٧ - وَعَنْهُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ عَقْلُ شِبْهِ الْعَمَدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمَدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৩৪৭. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (র.) তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, শিবহে আমদ এর দিয়তও কতলে আমদ এর দিয়তের ন্যায় কঠোর হবে। তবে হত্যাকারীকে কতল করা যাবে না। –[আবূ দাঊদ]

٣٣٤٨ - وَعَنْهُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيَةِ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৩৩৪৮. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, কারও চোখ এমন জখম করা হয়েছে, যার দরুন চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে গেছে, তবে চোখ যথাস্থানে বহাল আছে। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্ণ দিয়তের এক তৃতীয়াংশ নির্ধারণ করেছেন। –[আবূ দাঊদ ও নাসাঈ]

٣٣٤٩ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْجَنِيْنِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ . رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَخَالِدُ الْوَاسِطِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَذْكُرَا أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ .

৩৩৪৯. অনুবাদ : হযরত মুহাম্মদ ইবনে আমর আবূ সালামা হতে, তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, গর্ভস্থিত ভ্রূণ হত্যা করার দরুন রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি গোররা নির্ধারণ করেছেন। তা হচ্ছে, একটি গোলাম বা দাসী অথবা একটি ঘোড়া বা একটি খচ্চর। –[আবূ দাঊদ। আবূ দাঊদ আরও বলেন, এ হাদীস হাম্মাদ ইবনে সালামা এবং খালেদ ওয়াসেতী মুহাম্মদ ইবনে আমর থেকে বর্ণনা করেন। কিন্তু তাদের একজনও ঘোড়া অথবা খচ্চরের কথা উল্লেখ করেননি।]

وَعَنْ ٣٣٥٠ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৩৩৫০. **অনুবাদ :** হযরত আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কেউ নিজেকে ডাক্তার হিসেবে প্রকাশ করে অথচ তার চিকিৎসা জ্ঞান সুপরিচিত নয়। [অর্থাৎ চিকিৎসাশাস্ত্রে তার কোনো দক্ষতা অভিজ্ঞতা নেই] তাহলে সে দায়ী হবে। −[আবূ দাউদ, নাসাঈ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যদি ভুল চিকিৎসার দরুন কোনো অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য চিকিৎসকের হাতে কোনো রোগী মারা যায়, তাহলে ঐ চিকিৎসক দায়ী হবে। তার আকেলাদের উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে; কিন্তু কেসাস ওয়াজিব হবে না। কারণ চিকিৎসক রোগীর অনুমতি নিয়েই চিকিৎসা করেছেন।

وَعَنْ ٣٣٥١ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوْا إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءُ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِمْ شَيْئًا . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৩৩৫১. **অনুবাদ :** হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, দরিদ্র সম্প্রদায়ের এক বালক ধনী সম্প্রদায়ের এক বালকের কান কেটে ফেলল। অতঃপর কান কর্তনকারী ছেলেটির অভিভাবকগণ নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আমরা গরিব ও দুঃস্থ লোক [দয়া করে আমাদের উপর দিয়ত ধার্য করবেন না।] [তাদের দরখাস্ত মঞ্জুর করে] নবী করীম ﷺ তাদের উপর কিছুই ধার্য করেননি। −[আবূ দাউদ ও নাসাঈ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকের উপর দিয়ত ওয়াজিব হয় না। তাদের দিয়ত রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে দিতে হয়। অপরাধী ছেলেটির অভিভাবকগণ যেহেতু দরিদ্র ও নিঃস্ব ছিলেন, তাই নবী করীম ﷺ তাদের উপর কিছুই আরোপ করেননি।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٣٥٢ عَلِيٍّ (رض) أَنَّهُ قَالَ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمَدِ أَثْلَاثًا ثَلٰثٌ وَّثَلٰثُوْنَ حِقَّةً وَثَلٰثٌ وَّثَلٰثُوْنَ جَذَعَةً وَأَرْبَعٌ وَّثَلٰثُوْنَ ثَنِيَّةً إِلٰى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَاتٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ فِي الْخَطَأِ أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ وَخَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ بَنَاتِ مَخَاضٍ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৩৫২. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, শিবহে আমদ-এর দিয়ত তিন প্রকারের উট দ্বারা আদায় করতে হবে। তেত্রিশটি হিক্কা, [যে উটের বয়স তিন বৎসর পূর্ণ হয়ে চতুর্থ বৎসরে পড়েছে।] তেত্রিশটি জাযয়া, [যে উটের বয়স চার বছর পূর্ণ হয়ে পঞ্চম বৎসরে পড়েছে।] চৌত্রিশটি ছানিয়্যা থেকে বাযিল, [ষষ্ঠ বৎসর হতে নবম বৎসর পর্যন্ত বয়সের উট।] তবে এ সকল উট গর্ভবতী হতে হবে। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, কতলে খাতার দিয়ত চার প্রকারের উট দ্বারা আদায় করতে হবে। পঁচিশটি তিন বৎসরের, পঁচিশটি চার বৎসরের, পঁচিশটি দুই বৎসরের আর পঁচিশটি এক বছরের উষ্ট্রী হতে হবে। −[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٣٥٣ مُجَاهِدٍ (رحـ) قَالَ قَضٰى عُمَرُ فِىْ شِبْهِ الْعَمَدِ ثَلٰثِيْنَ حِقَّةً وَثَلٰثِيْنَ جِذْعَةً وَاَرْبَعِيْنَ خَلْفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ اِلٰى بَازِلِ عَامِهَا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৩৫৩. অনুবাদ : হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা.) শিবহে আমদ কতলের দিয়তে ত্রিশটি তিন বছরের উট, ত্রিশটি চার বছরের উট এবং চল্লিশটি গর্ভবতী উষ্ট্রী যেগুলোর বয়স পঞ্চম বছর হতে নবম বছরের মধ্যে রয়েছে– এমন সব উট আদায় করার ফয়সালা দিয়েছেন। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٣٥٤ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِى الْجَنِيْنِ يُقْتَلُ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ وَلِيْدَةٍ فَقَالَ الَّذِىْ قَضٰى عَلَيْهِ كَيْفَ اَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا اَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا هٰذَا مِنْ اِخْوَانِ الْكُهَّانِ . رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِىُّ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ عَنْهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ مُتَّصِلًا .

৩৩৫৪. অনুবাদ : হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একটি গর্ভস্থিত ভ্রূণ, যা তার মায়ের পেটে থাকাবস্থায় হত্যা করা হয়েছে। তার দিয়তস্বরূপ একটি গোলাম বা দাসী প্রদান করার ফয়সালা দিলেন। যার উপর দিয়ত ওয়াজিব করা হয়েছিল সে বলে উঠল, আমি কি কারণে এমন লোকের দিয়ত আদায় করব? যে পান করেনি, কিছু খায়নি এবং কথাও বলেনি এবং কাঁদেওনি। এ ধরনের অপরাধ তো শাস্তিযোগ্য নয়। তার কথা শুনে নবী করীম ﷺ বললেন, এ লোকটি তো গণক সম্প্রদায়ের ভাই। –[মালেক ও নাসাঈ হাদীসটি "মুরসাল" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আবূ দাউদ সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব থেকে তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে মুত্তাসিল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "কাহেন" বা গণক ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে গায়েব জানার দাবি করে এবং লোকদের নিকট গায়েবের সংবাদ বলে এবং মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য মিথ্যা ও বানোয়াট কথা খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে বলে। হাদীসে আলোচিত ব্যক্তিও যেহেতু তার গলদ মতবাদকে ছন্দাকারে সুন্দর বাক্যে প্রকাশ করেছে, তাই নবী করীম ﷺ তাকে গণকদের ভাই বলেছেন। তবে সুন্দর বাক্যে সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলা দূষণীয় নয়; বরং প্রশংসনীয়।

قَوْلُهُ قَضٰى فِى الْجَنِيْنِ يُقْتَلُ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ الخ : সকল ওলামাদের ঐকমত্য অনুযায়ী গর্ভস্থিত ভ্রূণ পুরুষ হোক বা মেয়ে হোক যদি মৃত বের হয়, তাহলে হত্যাকারীর অভিভাবকদের উপর একটি গুররা [যার মূল্য হবে পাঁচশত দিরহাম] ওয়াজিব হবে। আর যদি ভ্রূণ জীবিত বের হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করে, তাহলে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে।

প্রহৃত মহিলা ও ভ্রূণ নিহত হওয়া সম্পর্কিত চারটি সুরত :

১. যদি মা জীবিত থাকে আর ভ্রূণ জীবিত বের হয়ে মৃত্যুবরণ করে, অতঃপর মাও মারা যায়, তাহলে ভ্রূণ ও মায়ের পূর্ণ দিয়ত আদায় করা ওয়াজিব।

২. যদি মা জীবিত থাকে এবং ভ্রূণ মৃত বের হয়, অতঃপর মা মারা যায়, তাহলে হত্যাকারীর উপর মায়ের পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর ভ্রূণ হত্যার জন্য গুররা ওয়াজিব হবে।

৩. যদি মা মৃত্যুবরণ করে এবং ভ্রূণ জীবিত বের হওয়ার পর মারা যায়, তাহলে মা ও ভ্রূণ উভয়ের জন্য পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে।

৪. যদি মা মারা যায় এবং ভ্রূণ মৃত বের হয়, তাহলে হত্যাকারীর উপর মার দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর ভ্রূণের ব্যাপারে ইখতেলাফ রয়েছে।

مَذْهَبُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ (رح) : ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ (র.) বলেন, উল্লিখিত সুরতে ভ্রূণের জন্যও গুররা ওয়াজিব হবে।

দলিল : প্রকৃতপক্ষে গর্ভস্থিত ভ্রূণ ঐ আঘাতে মারা গেছে, যে আঘাতে তার মা মারা গেছে। সুতরাং এটা যেন এমন হয়ে গেল যে, মা জীবিত থাকাবস্থায় মৃত ভ্রূণ গর্ভপাত করেছে। সুতরাং তৃতীয় সুরতের ন্যায় এখানেও গুররা এবং দিয়ত উভয়টি ওয়াজিব হবে।

অথবা চিকিৎসকদের মতানুসারে বলা যেতে পারে, পেট থেকে বের হওয়ার সময় ভ্রূণের মাঝে জীবন ছিল। কেননা, জীবন না থাকলে পেট থেকে বের হওয়া সম্ভব হতো না। সুতরাং বের হওয়ার সময় অথবা বের হওয়ার পর মৃত্যু হয়েছে। এ কারণেই মৃত্যু পতিত হওয়ার পরও তাকে জীবিত সাব্যস্ত করা হয়েছে।

مَذْهَبُ الْأَحْنَافِ وَالْمَوَالِكِ : হানাফী ও মালেকী আলেমগণ বলেন, ভ্রূণের জন্য কিছুই ওয়াজিব হবে না।

দলিল : ভ্রূণ নিহত হওয়ার দুটি কারণ : ভ্রূণ হয়তো বা আঘাতের কারণে মারা গেছে অথবা মায়ের মৃত্যুর কারণে মারা গেছে। যদি আঘাতের কারণে মারা যায় তাহলে গুররা ওয়াজিব হবে। আর যদি মায়ের মৃত্যুর কারণে ভ্রূণ মারা যায়। অর্থাৎ মায়ের মৃত্যুর কারণে ভ্রূণের শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যায়, তাহলে বিষয়টি সন্দেহযুক্ত হওয়ার কারণে জরিমানা আরোপিত না হওয়া উচিত।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : চিকিৎসকদের কথা সন্দেহযুক্ত। তাদের কথা ও নির্দেশনার মাঝে ভুল হতে পারে। সুতরাং তাদের কথা দলিলযোগ্য নয়।

بَابُ مَا لَا يُضْمَنُ مِنَ الْجِنَايَاتِ
পরিচ্ছেদ : যে সকল অপরাধের জন্য জরিমানা দিতে হয় না

اَلْجِنَايَاتُ : শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো جِنَايَةٌ অর্থ– অপরাধ, নিয়ম বহির্ভূত কাজ ইত্যাদি। এখানে ঐ সকল অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে অপরাধে কোনো জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٣٥٥ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৩৫৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, পশুর আঘাতের কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। খনির মধ্যে [মারা গেলে] ক্ষতিপূরণ নেই। আর কূপের মাঝে [পতিত হয়ে মারা গেলেও] কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ : عَجْمَاءُ অর্থ- بَهِيْمَةٌ - চতুষ্পদ প্রাণী।

جُرْحٌ : جِيْم -এর উপর فَتْحَةٌ দিয়ে পড়লে মাসদার আর ضَمَّةٌ দিয়ে পড়লে ইসম।

جُبَارٌ : جِيْم -এর উপর ضَمَّةٌ -এর সাথে অর্থ– বাতিল, মাফ, অর্থাৎ যার কোনো ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা নেই।

যদি কারো জানোয়ার অন্য কাউকে পা দ্বারা পিষে ফেলে অথবা গুঁতা দিয়ে জখম করে বা দাঁত দিয়ে কেটে আহত করে ফেলে বা অন্যকোনভাবে ক্ষতি করে তাহলে হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কিন্তু এর মাঝে কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে। যদি জানোয়ারের সাথে কোনো রাখাল বা চালক থাকে তখন ঐ পশু ক্ষতি করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর যদি জানোয়ারের সাথে কোনো রাখাল বা চালক না থাকে তখন ক্ষতি করলে এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে।

জানোয়ারের সাথে রাখাল না থাকাবস্থায় কোনো ক্ষতি করলে তার ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ :

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও মালক (র.) প্রমুখের মাযহাব : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.)-এর নিকট যদি রাত্রিকালে ক্ষতি করে তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর যদি দিনে ক্ষতি করে তাহলে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। দলিল–

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رضـ) قَالَ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ فَدَخَلَتْ حَائِطًا فَاَفْسَدَتْ فِيْهِ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلٰى اَهْلِهَا وَاَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلٰى اَهْلِهَا وَاَنَّ عَلٰى اَهْلِ الْمَوَاشِىْ مَا اَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ . (اَبُوْ دَاوُدَ، اَحْمَدُ، اِبْنُ مَاجَةَ)

এ হাদীস দ্বারা রাত্রে ক্ষতিসাধন করলে মালিকের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়।

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) প্রমুখের মাযহাব : ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, রাত এবং দিনের ক্ষতিপূরণের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। যদি মালিকের পক্ষ থেকে কোনো সীমালঙ্ঘন না হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। আর যদি মালিকের পক্ষ থেকে কোনো সীমালঙ্ঘন অথবা তার রক্ষণাবেক্ষণের মাঝে ক্রটির কারণে ক্ষতি সাধিত হয়, তাহলে এর জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব হবে।

দলিল–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

এ হাদীসটি মুতলাক এবং আমি [ব্যাপক] এখানে রাত-দিনের মাঝে কোন পার্থক্য বর্ণনা করা হয়নি।

বিরোধীপক্ষের দলিলের জবাব : আমাদের পেশকৃত হাদীস مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ আর আইম্মায়ে ছালাছা কর্তৃক পেশকৃত হাদীস হলো মুরসাল। এমনকি শাফেয়ীগণ তাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে না। আর কিছু কিছু আলেম এ হাদীসকে মওকুফ বলেছেন। সুতরাং এ হাদীস আমাদের পেশকৃত হাদীসের মোকাবিলায় কিভাবে দলিলযোগ্য হবে?

قَوْلُهُ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ : খনির মধ্যে দেবে যাওয়া মাফ অর্থাৎ খনির মধ্যে মৃত্যুবরণ করলে কোনো ক্ষতিপূরণ নেই।

مَعْدِنٌ ঐ খনিজ পদার্থকে বলা হয় যা আল্লাহ তা'আলা জমিনের সৃষ্টি করেছেন। مَعْدِنٌ তিন প্রককার। যথা–

১. যে সকল পদার্থ আগুনে গলানোর দ্বারা গলে যায়। যেমন– স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি।

২. যে সকল পদার্থ আগুনে গলানোর দ্বারা গলে না। যেমন– সুরমা, ইয়াকুত পাথর ইত্যাদি।

৩. তরল বা বাষ্প জাতীয় পদার্থ। যেমন– তেল, গ্যাস ইত্যাদি।

যদি কোনো লোক কারও খননকৃত খনিতে যায় অথবা খনির উপর দাঁড়ায় আর খনি দেবে ঐ লোক মারা যায় অথবা যদি কোনো শ্রমিককে খনি খনন করার কাজে নিয়োজিত করা হয় আর সে খনির মধ্যে মারা যায়, তাহলে এ সকল অবস্থায় মালিককে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

قَوْلُهُ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ : কূপের মধ্যে পড়ে যাওয়া মাফ। অর্থাৎ কূপের মধ্যে পড়ে মৃত্যুবরণ করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। যেমন কোনো লোক তার জমিতে অথবা কোনো খাস জমিতে কূপ খনন করল, অতঃপর কোনো লোক ঐ কূপের মধ্যে পড়ে মারা গেল, তাহলে কূপ খননকারীর উপর কোনো ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। আর যদি অপরের জমিতে মালিকের অনুমতি ব্যতীত কূপ খনন করে আর সে কূপের মাঝে কেউ পড়ে মারা যায় তাহলে কূপ খননকারীর অভিভাবকদের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। আর কূপ খননকারীর মাল থেকে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

وَعَنْ ٣٣٥٦ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ (رضـ) قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَكَانَ لِيْ أَجِيْرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوْضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ أَيَدَعُ يَدَهُ فِيْ فِيْكَ تَقْضِمُهَا كَالْفَحْلِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৩৫৬. অনুবাদ : হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাথে [তাবূক যুদ্ধে] বড় কষ্ট স্বীকারকারী সেনাদলের সাথে ছিলাম। আমার সাথে এক চাকর ছিল। সে জনৈক ব্যক্তির সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। তাদের মাঝে একজন অপরজনের হাত কামড়ে ধরল। অতঃপর যার হাত কামড়ে ধরা হয়েছিল সে তার হাতখানা দংশনকারীর মুখ থেকে জোরপূর্বক বের করে আনল। ফলে তার সামনের দুটি দাঁত পড়ে গেল। তারপর সে [মকদ্দমা নিয়ে] নবী করীম ﷺ -এর দরবারে গেল; কিন্তু নবী করীম ﷺ তাঁর দাঁতের জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ ধার্য করলেন না। আর বললেন, তুমি কি চাও যে, সে তার হাতখানা তোমার মুখে রাখবে আর তুমি নর উটের মতো চাবাতে থাকবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ : عُسْرَةٌ অর্থ– কষ্ট, দরিদ্র, অভাব, অনটন, কঠিন। جَيْشٌ অর্থ– সৈন্য, সেনা, সেনাবাহিনী, সেনাদল। সুতরাং جَيْشُ الْعُسْرَةِ অর্থ হলো– কষ্ট স্বীকারকারী সেনাদল। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাবূক অভিযানে অংশগ্রহণকারী বাহিনী। মদিনা শরীফ থেকে ৭ শত কিলোমিটার দূরে সিরিয়ার একটি প্রসিদ্ধ স্থান হচ্ছে তাবূক। তাবূক অভিযান ছিল মুসলমানদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা। তখন সারা আরবে দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটন চলতেছিল। মদিনার অবস্থাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। তার

উপর ছিল প্রচণ্ড গরম। আবার ফল পাকার মৌসুম। তাই এ সময় বাগান ও ফসল রেখে চলে যাওয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ। পথও ছিল বন্ধুর, দুর্গম ও দীর্ঘ। সব মিলিয়ে এক কঠিন অবস্থায় নবী করীম ﷺ তাবূক অভিযানে বের হয়েছিলেন। এ সকল কারণে তাবূক অভিযানকে جَيْشُ الْعُسْرَةِ বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَالَ أَيَدَعُ يَدَهُ فِيْ فِيْكَ : সে কি তার হাতখানা তোমার মুখে রাখবে .... একথা বলে নবী করীম ﷺ তার দাঁতের ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব না হওয়ার কারণে প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা সে তার হাতকে রক্ষা করার জন্য দংশনকারীর মুখ থেকে টেনে বের করতে বাধ্য ছিল। তাই এজন্য কোনো ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

শরহু সুন্নাহের মাঝে বর্ণিত আছে এমনিভাবে যদি কোনো নরপশু কোনো নারীর সাথে কামভাব পূর্ণ করতে চায়, আর সেই নারী তার ইজ্জত বাঁচানোর জন্য ঐ নরপশুর উপর হামলা করে, ফলে লোকটি মারা যায় তাহলে ঐ নারীর উপর কোনো ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট একবার মকদ্দমা আসল। এক বনের মাঝে একটি মেয়ে কাঠ কাটতেছিল। তখন এক নরপশু তার পিছু নিল এবং তার সাথে কামভাব পূর্ণ করতে চাইল। মেয়েটি তার ইজ্জত লুণ্ঠিত হতে দেখে একটি পাথর উঠিয়ে নিক্ষেপ করল। এতে ঐ নরপশু মারা গেল। হযরত ওমর (রা.) রায় দিলেন– "এ কতল আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর কসম এ কতলের জন্য কোনো রক্তমূল্য দিতে হবে না।"

সারকথা, যদি কোনো দস্যু মালামাল লুট করে নিতে চায় অথবা খুন করতে চায় বা পরিবারের লোকজনকে বিপদাপন্ন করতে চেষ্টা করে তাহলে তার প্রতিরোধ করা বৈধ ও জায়েজ। তবে প্রথমত তাকে লুটপাট ও খুন থেকে বিরত থাকতে আহ্বান করা হবে। এরপরও যদি সে কর্ণপাত না করে তাহলে তার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য তাকে হত্যা করলে কোনো রক্তমূল্য ওয়াজিব হবে না।

٣٣٥٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৩৫৭. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষা করার জন্য নিহত হয় সে শহীদ। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : যদি কেউ তার মালসম্পদ হেফাজত করা অবস্থায় অন্য কারো দ্বারা নিহত হয় তাহলে সে শহীদ হবে। এমনিভাবে যদি কেউ তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করতে গিয়ে অন্য কারো দ্বারা নিহত হয় তাহলে সেও শহীদ হবে।

٣٣٥٨ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ أَخْذَ مَالِيْ قَالَ فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِيْ قَالَ قَاتِلْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِيْ قَالَ فَأَنْتَ شَهِيْدٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ هُوَ فِي النَّارِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৩৫৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে আরজ করল– ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি কোনো লোক এসে জোরপূর্বক আমার মাল ছিনিয়ে নিতে চায় তখন আমি করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তাকে তোমার মাল দিও না। লোকটি বলল, যদি সে আমার সাথে লড়াই করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমিও তার সাথে লড়াই কর। লোকটি বলল, যদি সে আমাকে হত্যা করে ফেলে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে তুমি হবে শহীদ। লোকটি বলল, যদি আমি তাকে কতল করে ফেলি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে হবে জাহান্নামি। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٣٥٩ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوِ اطَّلَعَ فِيْ بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৩৫৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন– যদি কেউ তোমার অনুমতি ছাড়া তোমার গৃহের দিকে উঁকি মারে আর তুমি তাকে কোনো কঙ্কর নিক্ষেপ কর এবং এতে তুমি তার চক্ষু ফুঁড়ে দাও, তাহলে তোমার কোনো অপরাধ নেই। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইমাম শাফেয়ী (র.) এ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে বলেছেন, কঙ্কর নিক্ষেপ করে চোখ নষ্ট করার কারণে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কিন্তু ইমাম আযম (র.)-এর নিকট ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা, এ হাদীসের মূল উদ্দেশ্য হলো এমন কাজ থেকে লোকদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করা। সত্যিকারে চোখ নষ্ট করা উদ্দেশ্য নয়।

وَعَنْ ٣٣٦٠ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِيْ جُحْرٍ فِيْ بَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِيْ لَطَعَنْتُ بِهِ فِيْ عَيْنَيْكَ إِنَّمَا جُعِلَ الْاِسْتِيْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৩৬০. অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরজার ছিদ্র দিয়ে উঁকি মারল। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর [হাতে] একটি শলাকা ছিল। তার দ্বারা তিনি মাথা চুলকাতে ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– আমি যদি নিশ্চিতভাবে জানতাম যে, তুমি [ইচ্ছাকৃতভাবে] আমার দিকে তাকাচ্ছ, তাহলে আমি এর দ্বারা [শলাকা দ্বারা] তোমার চোখ ফুঁড়ে দিতাম। কেননা অনুমতি গ্রহণের বিধান এ চোখের কারণেই দেওয়া হয়েছে। [যাতে গাইরে মাহরাম বা কারও ছতরের উপর দৃষ্টি না পড়ে।] –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٣٦١ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (رض) أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ فَقَالَ لَا تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا يُنْكَأُ بِهِ عَدُوٌّ وَلٰكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৩৬১. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি একবার এক ব্যক্তিকে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে দেখে বললেন, কঙ্কর নিক্ষেপ করো না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন, এভাবে কোনো শিকারকে মারা যায় না এবং কোনো শত্রুকেও ঘায়েল করা যায় না; বরং এটা কখনো দাঁত ভেঙ্গে দেয় এবং চোখ ফুঁড়ে দেয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٣٦٢ أَبِيْ مُوْسٰى (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِيْ مَسْجِدِنَا وَفِيْ سُوْقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلٰى نِصَالِهَا أَنْ يُصِيْبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهَا بِشَيْءٍ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৩৬২. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ আমাদের মসজিদে এবং আমাদের বাজারে আসে বা সেখানে দিয়ে অতিক্রম করে আর তার সাথে তীর থাকে, তাহলে সে যেন অবশ্যই তীরের ফলক ধরে রাখে, যাতে তা দ্বারা কোনো মুসলমানের কোনো ক্ষতি না হয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٣٦٣ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُشِيْرُ اَحَدُكُمْ عَلٰى اَخِيْهِ بِالسِّلَاحِ فَاِنَّهُ لَا يَدْرِىْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِىْ يَدِهٖ فَيَقَعُ فِىْ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৩৬৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের মাঝে কেউ যেন তার [মুসলমান] ভাইয়ের প্রতি হাতিয়ার দিয়ে ইঙ্গিত না করে। কেননা, সে জানে না হয়তোবা শয়তান তার হাতিয়ার দ্বারা ঐ ব্যক্তির উপর আক্রমণ করিয়ে দিতে পারে, ফলে সে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهُ ٣٣٦٤ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَشَارَ اِلٰى اَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ فَاِنَّ الْمَلٰئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتّٰى يَضَعَهَا وَاِنْ كَانَ اَخَاهُ لِاَبِيْهِ وَاُمِّهٖ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৩৩৬৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি লোহার অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত করল, তা হাত হতে ফেলে না দেওয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা তাকে লানত করতে থাকে। যদিও ঐ লোকটি তার সহোদর ভাই হয়। –[বুখারী]

وَعَنْ ٣٣٦٥ ابْنِ عُمَرَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَزَادَ مُسْلِمٌ وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا)

৩৩৬৫. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন– যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। –[বুখারী। মুসলিম (র.) আরও অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে ব্যক্তি [বিক্রয়ের সময় পণ্যের দোষ গোপন রেখে] আমাদের সাথে প্রতারণা করল সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।]

وَعَنْ ٣٣٦٦ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৩৬৬. **অনুবাদ :** হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে আমাদের উপর তরবারি উত্তোলন করল সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٣٦٧ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمٍ مَرَّ بِالشَّامِ عَلٰى اُنَاسٍ مِنَ الْاَنْبَاطِ وَقَدْ اُقِيْمُوْا فِى الشَّمْسِ وَصُبَّ عَلٰى رُؤُوْسِهِمُ الزَّيْتُ فَقَالَ مَا هٰذَا قِيْلَ يُعَذَّبُوْنَ فِى الْخَرَاجِ فَقَالَ هِشَامٌ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يُعَذِّبُ الَّذِيْنَ يُعَذِّبُوْنَ النَّاسَ فِى الدُّنْيَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৩৬৭. **অনুবাদ :** হযরত হিশাম ইবনে ওরওয়া তাঁর পিতার থেকে বর্ণনা করেন, হিশাম ইবনে হাকিম একবার শাম দেশে "নিবতী" সম্প্রদায়ের কিছু লোকদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন। তাদেরকে রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে মাথার উপর যায়তুনের গরম তেল ঢালা হচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাদেরকে এ শাস্তি দেওয়া হচ্ছে কেন? বলা হলো, খারাজ [সরকারি খাজনা] না দেওয়ার কারণে তাদেরকে এ শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। হযরত হিশাম বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল লোকদেরকে শাস্তির মাঝে লিপ্ত করবেন যারা দুনিয়ার মাঝে মানুষকে শাস্তি দেয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : اَنْبَاطٌ ইহুদি ও নাসারা সম্প্রদায়ের একদল লোক। তারা যে স্থানে বসবাস করত তাকে 'আনবাত' বলা হতো। তারা ছিল গ্রাম্য চাষী।

দুনিয়ার মাঝে কেউ যদি অন্য কাউকে অন্যায় ও নাহকভাবে শাস্তি দেয়। যেমন রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে মাথার উপর গরম তেল ঢালা। তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও পরকালে তাকে ঐ শাস্তিতে লিপ্ত করবেন।

وَعَنْ ٣٣٦٨ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ اِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ اَنْ تَرٰى قَوْمًا فِىْ اَيْدِيْهِمْ مِثْلَ اَذْنَابِ الْبَقَرِ يَغْدُوْنَ فِىْ غَضَبِ اللّٰهِ وَيَرُوْحُوْنَ فِىْ سَخَطِ اللّٰهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ يَرُوْحُوْنَ فِىْ لَعْنَةِ اللّٰهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৩৬৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি তোমার দীর্ঘায়ু হয় তাহলে তুমি অতি সত্বর ঐ সকল লোকদেরকে দেখতে পাবে যাদের হাতে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে। তাদের সকাল হবে আল্লাহর ক্রোধের মাঝে আর তাদের বিকাল হবে আল্লাহ তা'আলার কঠিন অসন্তোষের মাঝে। আর অন্য রেওয়ায়েতে আছে, তাদের বিকাল হবে আল্লাহ তা'আলার লানতের মাঝে। -[মুসলিম]

وَعَنْهُ ٣٣٦٩ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَاَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوْسُهُنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَايَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَاِنَّ رِيْحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৩৬৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, দোজখিদের দু-দল এমন হবে যাদেরকে আমি দেখি নাই। তাদের একদল লোকের হাতে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে। যার দ্বারা তারা লোকদেরকে অন্যায়ভাবে মারবে। আর দ্বিতীয় দল হবে ঐ সকল নারীদের যারা কাপড় পরিধান করার পরও থাকবে উলঙ্গ। তারা পুরুষদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করবে। আর তারা নিজেরাও পুরুষদের দিকে আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথার চুল বুখতী উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায় হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। যদিও তার ঘ্রাণ অনেক অনেক দূর হতে পাওয়া যাবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ : কাপড় পরিধান করার পরও সে সকল নারীরা থাকবে উলঙ্গ। যেমন-

১. এমন মিহি ও পাতলা কাপড় পরিধান করবে যে, তাদের ভিতরের অংশও দৃষ্টিগোচর হবে।

২. সটকার্ট পোশাক পরিধান করবে। শরীরের কিছু অংশ আবৃত থাকবে আর কিছু অংশ থাকবে উন্মুক্ত। যেমন বর্তমানে উপরে ও নিচে খোলা রেখে সর্ট ব্লাউজ পরিধান করা হয়।

৩. বক্ষদেশ উন্মুক্ত করে উড়না গলায় ঝুলিয়ে রাখে।

৪. এমন আঁটসাঁট পোশাক পরিধান করবে যে, শরীরের উঁচু-নিচু ভাঁজগুলো স্পষ্ট হয়ে থাকে।

مُمِيْلَاتٌ : ১. ঐ সকল তরুণীরা উদ্দেশ্য যারা তাদের পোশাক ও অলঙ্কারের দ্বারা পরপুরুষকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করে।

২. যে সকল নারীরা পুরুষদেরকে ব্যভিচারের প্রতি আহ্বান করে।

مَائِلَاتٌ : ১. যে সকল নারীদের হৃদয় মন পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

২. যে সকল নারীরা শারীরিকভাবে অন্যপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

৩. যে সকল নারীরা পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য হেলেদুলে পথ চলে।

قَوْلُهُ رُءُوْسُهُنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ : তাদের মাথার চুল বুখতী উটের হেলেপড়া কুঁজের ন্যায় দুলতে থাকে। এর দ্বারা ঐ সকল তরুণী ও যুবতীরা উদ্দেশ্য যারা ফ্যাশন করে মাথার চুল বাঁধে। আর যেভাবে বুখতী উট মোটাতাজা হওয়ার কারণে তার কুঁজ এদিক-ওদিক হেলতে থাকে। তদ্রূপভাবে ঐ সকল নারীদের মাথার সন্ধিস্থল এদিক-সেদিক দুলতে থাকে। নবী করীম ﷺ -এর যুগে এ ধরনের নারীদের অস্তিত্ব ছিল না; কিন্তু নবী কারীম ﷺ মু'জিযাস্বরূপ এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, বর্তমানে যা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

قَوْلُهُ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ : জান্নাতে প্রবেশ না করার সম্বন্ধ নারীদের প্রতি করা হয়েছে। কিন্তু যদি কোনো পুরুষ এ ধরনের পাপাচারে লিপ্ত হয় তাহলে তার হুকুমও এমন হবে।

কাজি ইয়ায (র.) বলেন, এ কথার দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, ঐ সকল নারীরা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না; বরং সতীসাধ্বী নারীরা যখন জান্নাতে যাবে তখন তারা জান্নাতে যেতে পারবে না। তাদের নিজ নিজ অপরাধের সাজা ভোগ করার পর এক সময় জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি পাবে।

অথবা, এর দ্বারা যুবতী তরুণীদেরকে কঠিনভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

٣٣٧٠ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَاتَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فَاِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৩৭০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের মাঝে কেউ কোনো লোককে মারধর করে, তাহলে চেহারায় যেন না মারে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে তার আকৃতিতেই সৃষ্টি করেছেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ : অর্থাৎ, আদমকে তার আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। এর বিশ্লেষণ হলো—

১. আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে তার সিফাতের উপর সৃষ্টি করেছেন। আর আদমকে তার সিফাতে জালালী ও সিফাতে জামালীর প্রকাশস্থল বানিয়েছেন।

২. আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে ঐ বিশেষ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, যা তিনি কেবল মানুষের জন্যই মনোনীত করেছেন। এ ব্যাখ্যাকালে আল্লাহ তা'আলার দিকে "আকৃতির" সম্বন্ধ মানুষের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য করা হয়েছে। যেমন نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ -এর মাঝে আল্লাহ তা'আলা "রূহ"-এর সম্বন্ধ তাঁর নিজের দিকে করে মানুষের মর্যাদা ও ফজিলত প্রকাশ করেছেন।

৩. আবার অনেকে বলেছেন— صُوْرَتِهٖ -এর যমীর প্রকৃতপক্ষে আদমের দিকে ফিরবে অর্থাৎ আদমকে ঐ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন যা আদমের জন্য নির্দিষ্ট ও অপরাপর সৃষ্টিকুল থেকে ভিন্নতর ছিল।

قَوْلُهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ : অর্থাৎ "চেহারা মারধর করবে না"। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে সমস্ত সৃষ্টিকুলের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষের দেহের মাঝে তার চেহারাকে বানিয়েছেন সবচেয়ে সুন্দর ও মর্যাদাবান। মানুষের রূপ-সৌন্দর্যের প্রকাশস্থল হলো তার চেহারা। সুতরাং চেহারার উপর মারধর বা কোনো আঘাত করা থেকে বিরত থাকা উচিত। চেহারা ব্যতীত শরীরের অন্যান্য স্থানে মারার অনুমতি রয়েছে তবে এটা নির্দেশ নয়। অর্থাৎ ছেলে-সন্তান, স্ত্রী ও খাদেমদের যদি আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য মারতে হয় তাহলে মুখমণ্ডল বাদ দিয়ে অন্যস্থানে মারার অনুমতি রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٣٧١ اَبِيْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَشَفَ سِتْرًا فَاَدْخَلَ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ اَنْ يُّؤْذَنَ لَهُ فَرَاٰى عَوْرَةَ اَهْلِهِ فَقَدْ اَتٰى حَدًّا لَا يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَّأْتِيَهُ وَلَوْ اَنَّهُ حِيْنَ اَدْخَلَ بَصَرَهُ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَفَقَأَ عَيْنَهُ مَا عَيَّرْتُ عَلَيْهِ وَاِنْ مَرَّ الرَّجُلُ عَلٰى بَابٍ لَا سِتْرَ لَهُ غَيْرَ مُغْلَقٍ فَنَظَرَ فَلَا خَطِيْئَةَ عَلَيْهِ اِنَّمَا الْخَطِيْئَةُ عَلٰى اَهْلِ الْبَيْتِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৩৩৭১. অনুবাদ : হযরত আবূ যর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, অনুমতি দেওয়ার পূর্বে যে ব্যক্তি ঘরের পর্দা সরিয়ে অন্দরের দিকে দৃষ্টিপাত করল এবং গৃহকর্তার স্ত্রীকে দেখে ফেলল সে নিজের উপর শরিয়তের শাস্তি ওয়াজিব করে ফেলল। কেননা, এভাবে আসা এবং অন্দরের দিকে তাকান তার জন্য জায়েজ নেই। আর সে যখন অন্দরের দিকে দৃষ্টিপাত করেছে তখন যদি ঘরের কোনো পুরুষ এসে তার সামনে উপস্থিত হয় এবং তার চক্ষু ফুঁড়ে দেয় তাহলে আমি আঘাতকারীকে কোনো তিরস্কার করব না। আর যদি কেউ এমন ঘরের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে যে ঘরের দরজার উপর কোনো পর্দা নেই এবং দরজাও বন্ধ নয় তখন সেই দিকে দৃষ্টিপাত করলে কোনো অপরাধ হবে না। কেননা এমতাবস্থায় অপরাধ গৃহবাসীদের উপর। −[ইমাম তিরমিযী (র.) রেওয়ায়েত করার পর বলেছেন এ হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْ ٣٣٧٢ جَابِرٍ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَتَعَاطَى السَّيْفَ مَسْلُوْلًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৩৩৭২. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাপ ব্যতীত উন্মুক্ত তরবারি হাতে রাখতে নিষেধ করেছেন। −[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٣٧٣ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৪৭৩. অনুবাদ : হযরত হাসান বসরী (র.) হযরত সামুরা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিতাকে দুই আঙ্গুল দিয়ে চিরতে নিষেধ করেছেন। −[আবূ দাউদ]

[আঙ্গুলের সাহায্যে কাপড়, চামড়া ও ফিতা ইত্যাদি চিরতে গিয়ে আঙ্গুল আহত হতে পারে, তাই এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।]

وَعَنْ ٣٣٧٤ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ اَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৩৩৭৪. অনুবাদ : হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার দীন হেফাজত করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ। যে ব্যক্তি তার জান বাঁচাতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ। যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষা করতে গিয়ে মারা যা সে শহীদ। যে ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজন হেফাজত করতে গিয়ে মারা যায় সেও শহীদ। −[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসাঈ]

وَعَنْ ٣٣٧٥ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ السَّيْفَ عَلٰى اُمَّتِىْ اَوْ قَالَ عَلٰى اُمَّةِ مُحَمَّدٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَحَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ الرِّجْلُ جُبَارٌ ذُكِرَ فِىْ بَابِ الْغَصَبِ .

৩৩৭৫. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে। তার মধ্যে একটি দরজা সে সকল লোকদের জন্য যারা আমার উম্মতের উপর তরবারি উত্তোলন করেছে অথবা বলেছেন উম্মতে মুহাম্মদীর উপর। -[তিরমিযী (র.) রেওয়ায়েত করে বলেছেন, হাদীসটি গরীব। আর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস "জানোয়ারের আঘাতে মারা গেলে ক্ষতিপূরণ নাই।" গসব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।]

بَابُ الْقَسَامَةِ
পরিচ্ছেদ : সম্মিলিত শপথ

اَلْقَسَامَةُ : قَافٌ -এর উপর যবর সহকারে قَسَمٌ থেকে নির্গত। অর্থ— কোনো নিহত ব্যক্তির খুনের উপর কসম করা। অথবা قِسْمَةٌ থেকে নির্গত। অর্থ— নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ কিংবা مُدَّعٰى عَلَيْهِ [বিবাদীদের] উপর কসমকে ভাগ করে দেওয়া।

হেকাম ইবনে উতবা, আবূ কেলাবা, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ, কাতাদাহ, মুসলিম ইবনে খালেদ এবং ইবরাহীম ইবনে উলাইয়্যাহ (র.) প্রমুখদের নিকট "কাসামাহ" বৈধ নয়। পক্ষান্তরে এতদ্ভিন্ন সকল ওলামায়ে কেরাম কাসামাহ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে একমত। তবে "কাসামাহ"-এর পারিভাষিক অর্থের ব্যাপারে তাদের পরস্পরের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

قَسَامَةٌ [কাসামাহ]-এর অর্থের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ :

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ (র.) ও হেজাজের ওলামায়ে কেরামের নিকট কাসামাহ দ্বারা উদ্দেশ্য : যদি কোনো বড় শহরের কোনো দূরবর্তী মহল্লায় অথবা কোনো গ্রামে বা কোন বস্তিতে কোনো মানুষের লাশ পাওয়া যায় আর হত্যাকারীকে তা জানা না যায়; কিন্তু নিহত লোকটি ওয়ারিশগণ কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট কিছু লোককে অভিযুক্ত করে তাদেরকে হত্যাকারী হওয়ার দাবি করে। এমতাবস্থায় নিহত লোকটির ওয়ারিশগণ অর্থাৎ বাদীপক্ষের পঞ্চাশজন লোক কসম করে বলবে অমুক ব্যক্তি বা ঐ সকল লোকেরা [উদাহরণস্বরূপ] আমার ভাই অথবা আমার পুত্রকে عَمَدٌ অথবা شِبْهُ عَمَدٍ বা خَطَاءٌ হিসেবে হত্যা করেছে। তবে এখানে শর্ত হলো "لَوْثٌ" [ক্লু] পাওয়া যেতে হবে।

لَوْثٌ [ক্লু] দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নিহত লোকটির ওয়ারিশদের নিকট কোনো আলামত প্রকাশিত হওয়া। যেমন— মহল্লাবাসী ও নিহত লোকটির মাঝে কোনো শত্রুতা ও দুশমনি ছিল। মহল্লাবাসীদের থেকে কারো তলোয়ারে রক্তের দাগ রয়েছে অথবা প্রথমে তারা জড়ো হয়েছিল পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অথবা কোনো একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কিংবা যাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় যেমন— মহিলা, গোলাম, কাফের, ফাসেক ও ছোট বাচ্চারা সাক্ষ্য দেয়। এখানে যদি قَتْلِ عَمَدٍ -এর দাবি হয় তাহলে مُدَّعٰى عَلَيْهِمْ [অভিযুক্তদের] উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর যদি قَتْلِ شِبْهِ

عَمَدْ অথবা قَتْل خَطَاءْ -এর দাবি হয় তাহলে عَاقِلَةْ [অভিভাবকদের] উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর যদি নিহত লোকটির ওয়ারিশরা কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে مُدَّعٰى عَلَيْهِمْ [অভিযুক্তদের] কসম করতে হবে। তাদের থেকে যদি পঞ্চাশজন লোক কসম করে তাহলে তারা দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর নিহত লোকটির ওয়ারিশরাও কিছু পাবে না।

আর যদি لَوْثْ [ক্লু] না পাওয়া যায় তাহলে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশরা কসম করবে না; বরং مُدَّعٰى عَلَيْهِمْ [অভিযুক্তদের] থেকে পঞ্চাশজন লোক কসম করে বলবে নিশ্চয় তারা হত্যা করেনি। কসম করার পর তারা দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি তারা কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে নিহত লোকটির ওয়ারিশরা কসম কর বলবে অমুক ব্যক্তি বা অমুক দিল হত্যা করেছে। যদি কসম করে নেয় তাহলে لَوْثْ [ক্লু] পাওয়ার সময় যে হুকুম জারি হবে এখানেও সেই হুকুম জারি হবে। কেননা, مُدَّعٰى عَلَيْهِمْ [অভিযুক্তদের] অস্বীকার করা لَوْثْ [ক্লু] এর স্থলাভিষিক্ত ধরা হবে।

আর যদি নিহত লোকটির ওয়ারিশরা কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে مُدَّعٰى عَلَيْهِمْ [অভিযুক্তরা] দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর নিহত লোকটির ওয়ারিশদেরকে তাদের পক্ষ থেকে কোনো কিছু দেওয়া ওয়াজিব হবে না।

হানাফী, নাখয়ী, শা'বী, ছাওরী (র.) এবং অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেঈনদের নিকট কাসামাহ বলা হয় : যদি কোনো গোত্র বা মহল্লা অথবা তার নিকটবর্তী স্থানে কোনো লাশ পাওয়া যায়, আর নিহত লাশের মাঝে কোনো আঘাত বা জখম বা গলা টিপার আলামত পাওয়া যায়, কিন্তু কে হত্যা করেছে তা জানা না যায়। আর ওয়ারিশরা মহল্লাবাসীরা হত্যা করেছে বলে দাবি করে, তাহলে মহল্লাবাসীদের পঞ্চাশজন লোক থেকে কসম নেবে। তারা এভাবে কসম করবে, আল্লাহর কসম! আমি তাকে হত্যা করিনি এবং তাকে কে হত্যা করেছে তাও আমি জানি না। তারা যদি কসম করে নেয় তাহলে عَاقِلَةْ [অভিভাবকদের] উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে। قَتْل عَمَدْ -এর দাবি হোক বা قَتْل خَطَاءْ -এর দাবি হোক বা قَتْل خَطَاءْ -এর দাবি হোক এতে কোনো ব্যবধান নেই। আর যদি তারা কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে হত্যা করার কথা স্বীকার করা অথবা কসম করা পর্যন্ত তাদেরকে বন্দি করে রাখা হবে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের উপর কসম প্রয়োগ করা যাবে না।

সারকথা, "কাসামাহ"-এর মাঝে جُزْئِ اِخْتِلَافْ [ছোটখাট মতভেদ] বহু রয়েছে তবে بُنْيَادِىْ [মূল] اِخْتِلَافْ তিনটি।

১. مَذْهَبُ الْاَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَالْحِجَازِيِّيْنَ : আইম্মায়ে ছালাছা এবং হেজাজবাসীদের নিকট নিহত লোকটির ওয়ারিশদের দাবি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হলো, নির্দিষ্ট কোনো একজন অথবা নির্দিষ্ট কিছু লোকের প্রতি হত্যার অভিযোগ আনতে হবে।

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ وَغَيْرِهِمْ : আহনাফ প্রমুখদের নিকট নির্দিষ্ট কোনো একজন অথবা নির্দিষ্ট কিছু লোকের প্রতি হত্যার অভিযোগ আনা জরুরি নয়।

আইম্মায়ে ছালাছার দলিল : ইবনে কুদামা (রা.) বলেন, এটা حُقُوْقُ الْعِبَادِ [বান্দার হক] থেকে একটি হকের দাবি করা হচ্ছে। সুতরাং অন্যান্য حُقُوْق -এর ন্যায় مُدَّعٰى عَلَيْهِ [বিবাদী] নির্ধারণ করা ব্যতীত কারো উপর দাবি করা গ্রহণযোগ্য না হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আহনাফের দলিল : বাবের প্রথম হাদীস– عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَسَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّهُمَا حَدَّثَا الخ

এ হাদীসের মাঝে আব্দুর রহমান ইবনে সাহল, হুয়াইয়েসা এবং মুহাইয়েসা (রা.) এ তিন আনসারী সাহাবী, আবদুল্লাহ ইবনে সাহল [যাকে খায়বারে ইহুদিদের বাগানে নিহত অবস্থায় পাওয় গিয়েছিল] এর ব্যাপারে খায়বারে ইহুদিদের উপর হত্যাকারী নির্দিষ্ট করা ব্যতীত মকদ্দমা দায়ের করেছিলেন। নবী করীম ﷺ তাদের দাবি সঠিক ও গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করে বলেছেন–

اِسْتَحِقُّوْا قَتِيْلَكُمْ اَوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ بِاَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْرٌ لَمْ نَرَهُ قَالَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُوْدُ فِىْ اَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ الخ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

আর মুসলিমের রেওয়ায়েতে এভাবে আছে–

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسُوْنَ مِنْكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيَدْفَعُ بِرُمَّتِهِ قَالُوْا : اَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُوْدُ بِاَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ .

এটাতো স্পষ্ট যে, উল্লিখিত আনসারী সাহাবীগণ বলেছেন, হত্যাকারীকে শনাক্ত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং এ দাবি যদি অগ্রহণযোগ্য হতো তাহলে مُدَّعٰى عَلَيْهِ অর্থাৎ ইহুদিদেরকে কসম করতে বলার কোনো কারণ থাকতে পারে না। কেননা কসম দাবি শুদ্ধ হওয়ার অংশ।

আইম্মায়ে ছালাছার দলিলের জবাব : আমাদের দলিল হিসেবে পেশকৃত হাদীস صَرِيْحٌ [সুস্পষ্ট] সুতরাং حَدِيْثٌ صَرِيْحٌ-এর মোকাবিলায় কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়।

২. مَذْهَبُ الْاَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ : আইম্মায়ে ছালাছার নিকট প্রথমত নিহত লোকটির ওয়ারিশদের থেকে পঞ্চাশজন লোক কসম করবে।

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ وَغَيْرِهِمْ : আহনাফ প্রমুখদের নিকট শুধু মহল্লাবাসী অর্থাৎ مُدَّعٰى عَلَيْهِمْ কসম করবে। নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের উপর কোনো অবস্থাতেই কসম বর্তাবে না।

আইম্মায়ে ছালাছার দলিল : উল্লিখিত রেওয়ায়েত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, প্রথমে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের অর্থাৎ বাদীদের থেকে কসম নেওয়া হবে।

আহনাফের দলিল :

ক. রাফে' ইবন খাদীজ থেকে বর্ণিত এ অধ্যায়ের ২য় হাদীস।

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رض) قَالَ اَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ مَقْتُوْلًا بِخَيْبَرَ فَانْطَلَقَ اَوْلِيَاءُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ .... قَالَ فَاخْتَارُوْا مِنْهُمْ خَمْسِيْنَ . فَاسْتَحْلَفُوْهُمْ فَاَبَوْا فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

অর্থাৎ নবী করীম ﷺ বললেন, আচ্ছা যাও! তোমরা ইহুদিদের মধ্য থেকে পঞ্চাশজন মানুষ নির্বাচন কর এবং তাদের থেকে কসম নাও। কিন্তু নিহতের ওয়ারিশগণ ইহুদিদের থেকে কসম নিতে অস্বীকার করলেন। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, ظَاهِرُ حَدِيْثٍ হানাফীদের মতামতের উপর সুস্পষ্ট দলিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, কাসামাহ এর মাঝে প্রথমে مُدَّعٰى عَلَيْهِمْ [বিবাদীদের] থেকে কসম নেওয়া হবে।

খ. মাশহুর হাদীস– اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ وَفِىْ رِوَايَةٍ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ . (بُخَارِىْ)

এ হাদীসটি একটি সর্বস্বীকৃত কানুন। এখানে উম্মতে মুহাম্মদিয়ার জন্য একটি নিয়ম ও বিধান নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। হানাফীগণ সবসময় اَحَادِيْثُ اُصُوْلِيَّةٌ-এর উপর তাদের মাযহাবের ভিত রচনা করেন আর اَحَادِيْثُ جُزْئِيَّةٌ-এর মধ্যে তাবীল করে থাকেন।

গ. ইসলামি শরিয়তে কোনো জিনিসকে প্রত্যাখ্যান বা প্রতিরোধ করার জন্য কসম নেওয়া হয়। কোনো জিনিস প্রমাণ বা সাব্যস্ত করার জন্য কসম নেওয়া হয় না। কেননা কোনো কিছু প্রমাণ বা সাব্যস্ত করা স্বীকারোক্তি অথবা দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এখন যদি নিহতের ওয়ারিশদের উপর কসম আবশ্যক করা হয় তাহলে এর অর্থ হয় কসমকে হত্যা সাব্যস্তকারী স্থির করা, যা সর্বস্বীকৃত কানুনের স্পষ্ট বিরোধিতা।

ঘ. ইমাম ত্বাহাবী (র.) বলেন, নবী করীম ﷺ -এর ইন্তেকালের পর হযরত ওমর (রা.) সাহাবায়ে কেরামের সামনে অনুরূপভাবে হুকুম জারি করেছেন, কিন্তু কেউ এর বিরোধিতা করেনি। এটাও একপ্রকারের اِجْمَاعٌ [ইজমা]।

আইম্মায়ে সালাসার দলিলের জবাব :

ক. আইম্মায়ে ছালাছার হাদীসের মাঝে إِضْطِرَابٌ "ইযতিরাব" রয়েছে। কেননা এক রেওয়ায়েতে আছে– حَلَّفَ الْاَنْصَارُ قَبْلَ تَحْلِيْفِ الْيَهُوْدِ আর দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে আছে–

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَحْلِفِ الْاَنْصَارَ وَاِنَّمَا طَلَبَ مِنْهُمُ الْبَيِّنَةَ فَلَمَّا اَبَوْا عَرَضَ عَلَيْهِمُ الْاَيْمَانَ ـ (بُخَارِىْ)

এভাবে মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা এবং মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকের মাঝেও বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। এ সকল রেওয়ায়েতের মাঝে গভীর দৃষ্টি দিলে বুঝা যায় যে, কসম নেওয়ার মাঝে যেভাবে إِضْطِرَابٌ [ইযতিরাব] রয়েছে তদ্রূপভাবে কসমের উদ্দেশ্য অর্থাৎ দিয়ত ওয়াজিব হবে না কেসাস ওয়াজিব হবে তার মধ্যেও إِضْطِرَابٌ রয়েছে।

খ. মুহাক্কিক ওলামাগণ বলেন, নিহতের ওয়ারিশদের নবী করীম ﷺ -এর কসম পেশ করা শরয়ী হুকুম হিসেবে ছিল না; বরং তাদের অন্তরে যা কিছু গোপন ছিল তা প্রকাশ করা এবং অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দলিল পরিপূর্ণ করার জন্য ছিল। যার ব্যাখ্যা তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিমের লেখক নিম্নোক্ত ইবারতের মাধ্যমে করেছেন–

فَاِنَّ الْاَنْصَارَ كَانُوْا اَتَوْ عَلٰى يَقِيْنٍ بِاَنَّهُمْ عَلٰى حَقٍّ فِىْ مُطَالَبَةِ الْيَهُوْدِ بِالْقِصَاصِ فَسَاَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ اَتَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا ؟ تَذْكِيْرًا لَهُمْ بِاَنَّهُمْ لِيَثْبُتُوْا عَلٰى عِلْمٍ يَصِحُّ مِنْهُ الْحَلْفُ فَكَيْفَ يُطَالِبُوْنَ الْيَهُوْدَ بِالْقِصَاصِ؟ فَاِنَّ الْقِصَاصَ اِنَّمَا يَجِبُ اِذَا شَهِدَ الشُّهُوْدَ بِالْقَتْلِ عَلٰى يَقِيْنٍ مِنْهُمْ بِاَنَّهُمْ عَايَنُوْا ذٰلِكَ فَكَانَ عَرَضَ الْاَيْمَانِ عَلَيْهِمْ اُسْلُوْبًا حَكِيْمًا يَسْكُنُ بِهٖ جَائِشُ الْاَنْصَارِ لَا لِاَنَّ ذٰلِكَ مُقْتَضَى الْقَسَامَةِ الْمَشْرُوْعَةِ ـ

গ. এটা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সুতরাং اَحَادِيْثُ اُصُوْلِيَّةٌ قَوِيَّةٌ [মজবুত ও শক্তিশালী হাদীস] এর বিপরীত হওয়ার কারণে এটা দলিলযোগ্য হবে না।

৩. আইম্মায়ে ছালাছা مَفْهُوْمُ قَسَامَةٍ [কাসামার ভাষ্য] বর্ণনার ক্ষেত্রে একমত কিন্তু مُوْجِبُ قَسَامَةٍ [কাসামার কারণে কি ওয়াজিব] এ ব্যাপারে তাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ وَالشَّوَافِعِ : হানাফী ও শাফেয়ীদের নিকট عَمَدٌ [ইচ্ছাকৃত] ও خَطَأٌ [ভুলবশত] উভয় অবস্থায় দিয়ত ওয়াজিব হবে। এমন অভিমত হযরত মুআবিয়া (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.) এবং ইসহাক, শা'বী, নাখয়ী ও ছাওরী (র.) থেকেও বর্ণিত আছে।

مَذْهَبُ الْمَوَالِكِ وَالْحَنَابِلَةِ : মালেকী ও হাম্বলীদের নিকট قَتْلِ عَمَدٍ [ইচ্ছাকৃত হত্যা]-এর ক্ষেত্রে কেসাসের বিধান প্রয়োগ করতে হবে। এমন অভিমত ইবনে যুবাইর (রা.), ওমর ইবনে আব্দুল আযীয, আবূ ছওর এবং ইবনুল মানযূর (র.) প্রমুখদের থেকেও বর্ণিত আছে। তবে ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) তাঁর মতকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

হানাফী ও শাফেয়ী প্রমুখদের দলিল :

١. فِىْ حَدِيْثِ رِجَالٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَجَعَلَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيَةً عَلٰى يَهُوْدٍ لِاَنَّهٗ وَجَدَ بَيْنَ اَظْهُرِهِمْ ـ (اَبُوْ دَاؤُدَ)

٢. عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَدَاَ بِالْيَهُوْدِ بِالْقَسَامَةِ وَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَيْهِمْ لِوُجُوْدِ الْقَتِيْلِ بَيْنَ اَظْهُرِهِمْ ـ (مُسْنَدُ الْبَزَّازِ، حَاشِيَةُ اَبُوْ دَاؤُدَ)

এ হাদীসটি দিয়ত ওয়াজিব হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

মালেকী ও হাম্বলী প্রমুখদের দলিল :

١. فِىْ حَدِيْثِ الْبَابِ اِسْتَحِقُّوْا قَتِيْلَكُمْ اَوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ بِاَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ ـ (الخ)

اِسْتَحِقُّوْا قَتِيْلَكُمْ -এর অর্থ হলো- اِسْتَحِقُّوْا قِصَاصَ قَتِيْلِكُمْ অর্থাৎ তোমরা পঞ্চাশজন কসম করে তোমাদের নিহত ব্যক্তির কেসাসের হকদার হতে পার।

٢. عَنْ اَبِىْ لَيْلٰى (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ . (مُسْلِمٌ، اَبُوْ دَاوُدَ)

মালেকী ও হাম্বলী প্রমুখদের দলিলের জবাব :

১. মালেকী ও হাম্বলী প্রমুখগণ اِسْتَحِقُّوْا قَتِيْلَكُمْ -এর মাঝে قِصَاصْ -কে মুযাফ মাহযূফ তথা উহ্য মনে করেন। কিন্তু এটা কাসামাহ সংক্রান্ত সকল সহীহ হাদীসের বিপরীত। কেননা, সহীহ হাদীসের মাঝে স্পষ্টভাবে দিয়ত দেওয়ার কথা উল্লেখ আছে। সুতরাং এ مُجْمَلْ [সংক্ষিপ্ত] হাদীসকেও مُفَصَّلْ হাদীসের উপর প্রয়োগ করে دِيَّةً শব্দকে উহ্য ধরা হবে। অর্থাৎ اِسْتَحِقُّوْا دِيَّةَ قَتِيْلِكُمْ অধিকন্তু ইমাম আবূ দাউদ (র.) تَرْكُ الْقَوْدِ بِالْقَسَامَةِ নামে 'বাব'ও কায়েম করেছেন। সে বাবের অধীনে উল্লিখিত সকল হাদীস কেসাস বর্জন করার দলিল।

২. আবী লায়লা (রা.)-এর হাদীসের سِيَاقْ ,سَبَاقْ [বর্ণনা ও ভাষ্য] এর উপর যদি গভীরভাবে চিন্তা করা হয় তাহলে বুঝা যায় اِسْتِحْقَاقِ دَمْ দ্বারা উদ্দেশ্য দিয়ত, কেসাস উদ্দেশ্য নয়। কেননা এ হাদীসের শুরুতে আছে—

اَمَّا اَنْ يَدُوْ صَاحِبَكُمْ وَاَمَّا يُؤْذِنُوْا بِحَرْبٍ يَعْنِىْ اَمَّا اَنْ يَدْفَعُوْا اِلَيْكُمُ الدِّيَةَ بِمُقْتَضَى الْقَسَامَةِ وَاَمَّا يَعْلَمُوْا اَنَّهُمْ مُمْتَنِعُوْنَ مِنْ اِلْتِزَامِ اَحْكَامِنَا فَيَنْتَقِضُ عَهْدُهُمْ وَيَصِيْرُوْنَ حَرْبًا لَنَا فِيْهِ دَلِيْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ فِىْ اَنَّ مُوْجِبَ الْقَسَامَةِ الدِّيَةُ .

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٣٧٦ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَسَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ (رض) اَنَّهُمَا حَدَّثَا اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ اَتَيَا خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِى النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ اِبْنَا مَسْعُوْدٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَتَكَلَّمُوْا فِىْ اَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَكَانَ اَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ كَبِّرِ الْكُبْرَ قَالَ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ يَعْنِىْ لِيَلِىَ الْكَلَامَ الْاَكْبَرُ فَتَكَلَّمُوْا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِسْتَحِقُّوْا قَتِيْلَكُمْ اَوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ بِاَيْمَانِ خَمْسِيْنَ

৩৩৭৬. অনুবাদ : হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ এবং সাহল ইবনে হাছমা (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সাহল এবং মুহাইয়েসা ইবনে মাসউদ খায়বারে আসলেন। তারা খেজুর বাগানে এসে পরস্পর পৃথক হয়ে গেলেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে সাহল [কোনো ঘাতকের হাতে] নিহত হলেন। তখন আব্দুর রহমান ইবনে সাহল [আব্দুল্লাহর ভাই] এবং মাসউদের দু-পুত্র হুয়াইয়েসা এবং মুহাইয়েসা (রা.) [আব্দুল্লাহর চাচাতো ভাই] নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং তাদের ভাইয়ের ব্যাপারে মকদ্দমা দায়ের করলেন। যখন আব্দুর রহমান কথা বলা শুরু করলেন আর তিনি ছিলেন সবার ছোট, তখন নবী করীম ﷺ বললেন, বড়কে সম্মান কর [তোমাদের মাঝে যে বড় তাকে কথা বলতে দাও]। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ [এ হাদীসের এক রাবী] বলেন, নবী করীম ﷺ -এর কথার অর্থ হলো, যে বয়সের বড় সেই কথা শুরু করার অধিক হকদার। অতঃপর তারা তাদের ভাইয়ের হত্যার ব্যাপারে আলোচনা করল। এরপর নবী করীম ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে পঞ্চাশজন কসম করলে তোমাদের নিহত ব্যক্তির অথবা বলেছেন তোমাদের সঙ্গীর

مِنْكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْرٌ لَمْ نَرَهُ قَالَ فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُوْدُ فِيْ اَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ فَفَدَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ تَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا وَتَسْتَحِقُّوْنَ قَاتِلَكُمْ اَوْ صَاحِبَكُمْ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ بِمِائَةِ نَاقَةٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

দিয়ত [রক্তমূল্য] পাবার হকদার হতে পারবে। তারা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা এমন জিনিস যা আমরা দেখি নাই। [সুতরাং কিভাবে কসম করব?] তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তাহলে ইহুদিদের থেকে পঞ্চাশজন কসম করে অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তারা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারাতো কাফির [তাদের কসমের কি গ্রহণযোগ্যতা আছে] তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে তাদের হত্যার দিয়ত পরিশোধ করে দিলেন। আরেক রেওয়ায়েতে আছে তোমরা পঞ্চাশবার কসম করে তোমাদের নিহত ব্যক্তির অথবা বলেছেন তোমাদের সঙ্গীর রক্তমূল্যের হকদার হতে পার। তারপর রাসূল ﷺ নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে দিয়তস্বরূপ একশত উট আদায় করে দিলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বড়কে সম্মান করা ও অগ্রাধিকার দেওয়া ইসলামের অনুপম শিক্ষা। উক্ত হাদীসের মাঝে নবী করীম ﷺ كَبِّرِ الْكُبْرَ বলে তাদের মাঝে প্রবীণ ব্যক্তিকে সম্মান করার আদেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ তাকে সর্বাগ্রে কথা বলার সুযোগ দিতে বলেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল মজলিসের মাঝে প্রবীণ ব্যক্তিরাই সবার পূর্বে কথা শুরু করার হকদার। এ হাদীস দ্বারা আরও বুঝা গেল যে, বয়সে যে বড় হবে তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে হবে। তার সামনে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার বজায় রেখে কথা বলতে হবে।

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِيْ এ পরিচ্ছেদে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ নেই।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٣٧٧ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رض) قَالَ اَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ مَقْتُوْلًا بِخَيْبَرَ فَانْطَلَقَ اَوْلِيَاءُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اَلَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلٰى قَاتِلِ صَاحِبِكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ اَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّمَا هُمْ يَهُوْدُ وَقَدْ يَجْتَرِءُوْنَ عَلٰى اَعْظَمَ مِنْ هٰذَا قَالَ فَاخْتَارُوْا مِنْهُمْ خَمْسِيْنَ فَاسْتَحْلِفُوْهُمْ فَاَبَوْا فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ مِنْ عِنْدِهِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৩৭৭. অনুবাদ : হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একবার] আনসারীদের একলোক খায়বার অঞ্চলে নিহত হয়। [তার হত্যাকারী কে তা জানা যায়নি] তার অভিভাবকগণ নবী করীম ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি অবগত করল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমাদের এমন দুজন সাক্ষী আছে কি যারা তোমাদের সাথির ঘাতক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেখানে তো কোনো মুসলমান উপস্থিত ছিল না, তবে ইহুদিরা ছিল। আর তারাতো এর চেয়ে জঘন্য কাজ করার দুঃসাহস রাখে। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তাহলে তোমরা তাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশজন লোককে বাছাই করে তাদের থেকে কসম নাও। কিন্তু তারা ইহুদিদের নিকট থেকে কসম নিতে অস্বীকার করলেন। সুতরাং নবী করীম ﷺ নিজের পক্ষ থেকে দিয়ত পরিশোধ করে দিলেন। –[আবূ দাউদ]

بَابُ قَتْلِ اَهْلِ الرِّدَّةِ وَالسُّعَاةِ بِالْفَسَادِ
পরিচ্ছেদ : মুরতাদ এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে হত্যা করা

رِدَّةٌ ও اِرْتِدَادٌ অর্থ– ফিরিয়ে দেওয়া, প্রত্যাবর্তন করা। তবে সাধারণত এ শব্দ দুটি ইসলাম ত্যাগ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। اَهْلُ الرِّدَّةِ অর্থ– মুরতাদেরা।

تَعْرِيْفُ الْمُرْتَدِّ **[মুরতাদের সংজ্ঞা]** : মুরতাদ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসরামকে ত্যাগ করে। হযরত আল্লামা তাফতাযানী (র.) বলেন, যদি কোন মুসলমান কুফরি কাজে লিপ্ত হয় তাহলে তাকে মুরতাদ বলা হবে। কেননা সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে।

হাফেজ ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেন, মুরতাদ কেবল ঐ ব্যক্তিকেই বলা হয় না, যে তার ধর্ম পরিত্যাগ করে অথবা পরিষ্কার ভাষায় আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -কে অস্বীকার করে বরং দীনের জরুরি বিষয় বা অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো একটি বিধান অস্বীকারকারীকেও মুরতাদ বলা হবে।

حُكْمُ الْمُرْتَدِّ **[মুরতাদের হুকুম]** : যদি কোনো লোক মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে প্রথমত তাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা হবে। ইসলামের প্রতি তার কোনো সন্দেহ-সংশয় থাকলে তা দলিল প্রমাণের মাধ্যমে নিরসন করা হবে। তবে এটা ওয়াজিব নয়। আর তাকে তিনদিন পর্যন্ত জেলখানায় বন্দি করে রাখা হবে। যদি সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। অন্যথায় তাকে হত্যা করে দেওয়া হবে। কিছু কিছু ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, যদি সে সুযোগ চায় তাহলে সুযোগ দেওয়া হবে। নচেৎ তাকে সুযোগ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট তিনদিন সুযোগ দেওয়া ওয়াজিব।

اَلسُّعَاةُ **-এর অর্থ ও হুকুম :** سُعَاةٌ শব্দটি سَاعِىْ -এর বহুবচন অর্থ– বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী। এখানে উদ্দেশ্য ডাকাত ও ছিনতাইকারী। মুরতাদের শাস্তির ন্যায় তার শাস্তিও কতল করা। হযরত আবূ বকর রাযী এবং ফখরুদ্দীন রাযী (র.) প্রমুখগণ বলেন– اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ এ আয়াত ডাকাতদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ডাকাত মুসলমান হোক বা কাফির হোক কোনো পার্থক্য নেই। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, এ আয়াত মুরতাদদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তবে প্রথম অভিমতটিই অধিক বিশুদ্ধ। কারণ মুরতাদকে সর্বাবস্থায় হত্যা করা ওয়াজিব। তার হত্যা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাও ডাকাতি করার উপর মওকুফ নয়।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٣٧٨ - عَنْ عِكْرِمَةَ (رض) قَالَ أُتِىَ عَلِىٌّ بِزَنَادِقَةٍ فَاَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ اَنَا لَمْ اُحْرِقْهُمْ لِنَهْىِ رَسُوْلِ

৩৩৭৮. **অনুবাদ :** হযরত ইকরিমা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কতিপয় নাস্তিককে হযরত আলী (রা.)-এর দরবারে উপস্থিত করা হলো। তিনি তাদেরকে পুঁড়ে ফেললেন। এ সংবাদ যখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট পৌঁছল তখন তিনি বললেন, যদি আমি হতাম তাহলে তাদেরকে

اللّٰهِ ﷺ لَا تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللّٰهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهٗ فَاقْتُلُوْهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

পোড়াতাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ নিষেধাজ্ঞার কারণে যে, তোমরা আল্লাহর শাস্তি [আগুন] দ্বারা কাউকে শাস্তি দিয়ো না। অবশ্য আমি তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী অনুযায়ী হত্যা করতাম। [তিনি বলেছেন,] যে ব্যক্তি তার দীনকে পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

زَنَادِقَةٌ-এর পরিচয় : শব্দটি বহুবচন, একবচন زِنْدِيْقٌ অর্থ– নাস্তিক, মুলহিদ।

আল্লামা তাফতাযানী (র.) বলেন, যে নবী করীম ﷺ -এর নবুয়তী এবং শিয়ারে ইসলাম তথা নামাজ রোজা ইত্যাদির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার পরও এমন কিছু আকিদা-বিশ্বাস রাখে যা সর্বসম্মতক্রমে কুফরি তাহলে তাকে যিনদীক বলা হয়।

যে মৌখিকভাবেও প্রকাশ্যে ইসলাম এবং ঈমান-এর অনুসারী কিন্তু নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি অবধারিত বিষয়গুলোর এমন ব্যাখ্যা দেয় যা কুরআন হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনা বিরুদ্ধ। এ ধরনের লোক মুসলমান নয়। কুরআনের পরিভাষায় এদেরকে বলা হয় মুলহিদ। যেমনি আল্লাহ তা'আলা বলেন– إِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ اٰيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا আর হাদীসের পরিভাষায় তাদেরকে বলা হয় যিনদীক। কারো কারো মতে সবধরনের ধর্মবিরোধী মুশরিকদেরকেও যিনদীক বলা হয়, যারা নাস্তিক তাদেরকেও যিনদীক বলা হয়।

যিনদীক দ্বারা উদ্দেশ্য : আমাদের আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত زِنْدِيْقٌ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যেমন–

১. কারো কারো মতে **যিনদীক দ্বারা মুরতাদ সম্প্রদায়** উদ্দেশ্য। কেননা উক্ত হাদীসে যিনদীকদেরকে জ্বালিয়ে দেওয়ার কথা উল্লিখিত আছে। আর আবূ দাউদের রেওয়ায়েতে আছে– إِنَّ عَلِيًّا (رض) أَحْرَقَ نَاسًا اِرْتَدُّوْا عَنِ الْاِسْلَامِ
অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) এমন কতিপয় লোকদেরকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং বুঝা গেল যিনদীক দ্বারা মুরতাদ উদ্দেশ্য।

২. কাজি ইয়ায (র.) বলেন, যিনদীক মূর্তিপূজক সম্প্রদায়ের একটি দল যাদেরকে ثَنْوِيَةٌ [ছানুবিয়্যাহ] বলা হয়। তারা দুই স্রষ্টায় বিশ্বাসী। নূর সৃষ্টিকারী হলো خَالِقُ خَيْرٍ আর অন্ধকার সৃষ্টিকারী হলো خَالِقُ شَرٍّ
আরও বলা হয়, মূর্তিপূজকদের একটি সম্প্রদায় যারা মজূসী যরদুশতের রচিত কিতাব زَنْدٌ [যন্দ]-এর অনুসারী। সেখান থেকেই زِنْدِيْقٌ শব্দটির উৎপত্তি।

৩. চরম ফ্যাসাদ ও হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার দলকে سَابِئَةٌ বলা হয়। এ সায়েবা সম্প্রদায়ের এক দল হলো যিনদীক। সে সকল যিনদীকরাই মুখে ইসলামের কথা বলে মুসলমানদেরকে বিপথগামী করার জন্য হযরত ওসমান (রা.)-এর প্রতি বিদ্রোহ করিয়ে তাঁকে শহীদ করে দেয়। এরপর এ যিনদীক সম্প্রদায় 'শিয়া'দের সাথে মিশে তাদেরকে পদভ্রষ্ট করে। এমনকি শিয়াদের একটি গ্রুপ হযরত আলী (রা.)-কে প্রভু মনে করতে শুরু করে। হযরত আলী (রা.) তাদেরকে গ্রেফতার করে তওবা করতে আহ্বান করেন। কিন্তু তারা তওবা করতে অস্বীকার করে। তাই হযরত আলী (রা.) একটি গর্ত খনন করে সেখানে আগুন জ্বালান এবং তাদেরকে সেই গর্তে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন।

৪. যিনদীক দ্বারা ঐ সকল "মুলহিদে দাহরী" উদ্দেশ্য যারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং প্রাকৃতিক নিয়মে সবকিছু সৃষ্টি হওয়ার দাবি করে। তারা بَقَاءُ دَهْرٍ-এ বিশ্বাসী এবং আখেরাতে অবিশ্বাসী।

قَوْلُهٗ لَا تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللّٰهِ : আগুন দিয়ে পুড়িয়ে শাস্তি দেওয়া একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্ধারিত, তাই কাউকে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

হযরত আলী (রা.) এ ক্ষেত্রে নিজস্ব ইজতেহাদের উপর আমল করেছেন এবং বিশেষ উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করে তাদেরকে জ্বালিয়ে দিয়েছেন, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এহেন অপরাধ করার দুঃসাহস না পায়।

অথবা, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস হযরত আলী (রা.)-এর জানা ছিল না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত শোনার পর তিনি সাথে সাথে তা মেনে নিয়েছেন। যেমন– শরহুস সুন্নাহের মাঝে রয়েছে।

فَبَلَغَ ذٰلِكَ عَلِيًّا (رض) فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رض) ـ

وَعَنْ ٣٣٧٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا اِلَّا اللّٰهُ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৩৭৯. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ আগুন দ্বারা শাস্তি দিতে পারে না। –[বুখারী]

وَعَنْ ٣٣٨٠ عَلِيٍّ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ حُدَّاثُ الْاَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْاَحْلَامِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ اِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَاَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَاِنَّ فِيْ قَتْلِهِمْ اَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৩৮০. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি তিনি বলেছেন, অতিসত্বর শেষ জমানায় এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা হবে বয়সে তরুণ এবং নির্বোধ। তারা লোকদেরকে সবচেয়ে উত্তম কথা বলবে কিন্তু তাদের ঈমান তাদের ঈমান তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না। তারা দীন হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা তাদেরকে যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর। কেননা যারাই তাদেরকে হত্যা করবে কিয়ামতের দিবসে তারা পুরস্কৃত হবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ : অর্থাৎ তারা [খারেজী সম্প্রদায়] লোকদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম কথা বর্ণনা করবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআনে কারীমের আয়াত। কেননা সৎকর্মশীলদের জবানে সাধারণত কুরআনের আয়াতই থাকে।

আর মাসাবীহ এর মাঝে مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ قَوْلِ শব্দকে خَيْرُ -এর পূর্বে আনা হয়েছে। অর্থাৎ তারা সর্বোত্তম মানুষের কথা বর্ণনা করবে। তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস।

خَوَارِجُ : প্রকাশ থাকে যে, খারেজী সম্প্রদায় হলো, মুসলমানদের মাঝে একটি বাতিল ফিরকা। হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফতকালে তাদের আবির্ভাব ঘটে। তাদের বুনিয়াদি আকিদা হলো, কবীরা গুনাহ তো দূরের কথা সগীরা গুনাহে লিপ্ত হলেও কাফের হয়ে যাবে। ইসলামের নামে এরা চরমপন্থি দল, তারা অসংখ্য মুসলমানদেরকে খুন করেছে। তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে মুসলমান মনে করে না। ইসলামের মাঝে এরা বিশৃঙ্খলা ও ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী দল।

وَعَنْ ٣٣٨١ أَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ أُمَّتِىْ فِرْقَتَيْنِ فَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ يَلِىْ قَتْلَهُمْ أَوْلَاهُمْ بِالْحَقِّ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৩৮১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মাঝে দুটি দল সৃষ্টি হবে। তাদের মধ্য হতে আরও একটি দল সৃষ্টি হবে। যাদেরকে প্রথম দুটি দলের মাঝে যে দল হকের অধিক নিকটবর্তী হবে সে দল হত্যা করবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "فِرْقَتَيْنِ" : দুটি দলের একটি হলো হযরত আলী (রা.) ও তাঁর অনুসারীদের দল। আর দ্বিতীয়টি হলো হযরত আমীরে মুআবিয়া ও তাঁর অনুসারীদের দল। তাদের মাঝ থেকে খারেজী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছে। আর হযরত আলী (রা.) এ পথভ্রষ্ট খারেজী সম্প্রদায়কে হত্যা করেছেন এবং তাদের ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলাকে প্রতিরোধ করেছেন। বলাবাহুল্য, হযরত আলী (রা.)-ই ছিলেন হকের অধিক নিকটবর্তী।

وَعَنْ ٣٣٨٢ جَرِيْرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِىْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৩৮২. **অনুবাদ :** হযরত জারীর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজের [ভাষণে] বলেছেন, [সাবধান!] তোমরা আমার পরে কাফিরের দলে ফিরে যেও না যে, পরস্পরে কাটাকাটি করবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِىْ كُفَّارًا الخ : আমার ইন্তেকালের পর তোমরা কাফেরদের ন্যায় আচরণ করবে না যে, পরস্পরে খুনাখুনি ও রক্তারক্তি করবে। কেননা, পরস্পরে কাটাকাটি, খুনাখুনি কাফেরের স্বভাব। তাই মুসলমানের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া কাফেরের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণকারী কাজ। জাহিলি যুগে রক্তপাত হত্যা ও খুন-খারাবি মামুলি বিষয় ছিল। বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে নবী করীম ﷺ তাকে খুব কঠোর ভাষায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

وَعَنْ ٣٣٨٣ أَبِىْ بَكْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ حَمَدَ أَحَدُهُمَا عَلٰى أَخِيْهِ السِّلَاحَ فَهُمَا فِىْ جُرُفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهٗ دَخَلَاهَا جَمِيْعًا وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ

৩৩৮৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ বাকরা (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যখন দুজন মুসলমান পরস্পরে মুখোমুখি হয়ে একজন অপর ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র উত্তোলন করে তাহলে তারা উভয়ে দোজখের কিনারায় গিয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর যদি একজন অপরজনকে হত্যা করে তাহলে তারা উভয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আরেক রেওয়ায়েতে হযরত আবূ বাকরা (রা.) থেকেই বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যখন দুজন মুসলমান তরবারি নিয়ে পরস্পর মুখোমুখি হয় তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্ত উভয়ই জাহান্নামি হয়।

وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ قُلْتُ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ اِنَّهٗ كَانَ حَرِيْصًا عَلٰى قَتْلِ صَاحِبِهٖ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

আমি আরজ করলাম হত্যাকারীর বিষয়টিতো পরিষ্কার; কিন্তু নিহত ব্যক্তির ব্যাপারটি এমন হলো কেন? [সে অত্যাচারিত হয়েও কেন দোজখে যাবে?] নবী করীম ﷺ বললেন, কেননা সেও তার সঙ্গীকে হত্যা করার প্রচেষ্টায় ছিল। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ : হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয় জাহান্নামে যাবে। ওলামায়ে কেরাম বলেন, এ হুকুম ঐ সময় যখন দুজনের একজনও হকের উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকে। হ্যাঁ যদি তাদের মাঝে একজন হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে যে অন্যায়ের উপর থাকে তাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, অন্তরে গুনাহের কাজের সংকল্প করাও গুনাহ। নিহত ব্যক্তি যেহেতু তার সাথিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার সংকল্প করেছিল এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি দেবেন। এটাই বেশির ভাগ ওলামায়ে কেরামের অভিমত।

وَعَنْ ٣٣٨٤ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ فَاَسْلَمُوْا فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَّاْتُوْا اِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَا فَفَعَلُوْا فَصَحُّوْا فَارْتَدُّوْا وَقَتَلُوْا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الْاِبِلَ فَبَعَثَ فِىْ اٰثَارِهِمْ فَاُتِىَ بِهِمْ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ اَعْيُنَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتّٰى مَاتُوْا وَفِىْ رِوَايَةٍ فَسَمَّرُوْا اَعْيُنَهُمْ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَمَرَ بِمَسَامِيْرَ فَاُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُوْنَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتّٰى مَاتُوْا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৩৮৪. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর দরবারে "উকল" গোত্রের কিছু লোক আসল। অতঃপর তারা ইসলাম গ্রহণ করল। কিন্তু মদিনার আবহাওয়া তাদের জন্য উপযোগী হলো না। সুতরাং নবী করীম ﷺ তাদেরকে সদকার উটের স্থানে গিয়ে তার দুধ ও প্রস্রাব পান করার নির্দেশ দিলেন। ফলে তারা তাই করল এবং সুস্থ হয়ে গেল। কিন্তু তারা মুরতাদ হয়ে গেল এবং তারা রাখালদেরকে হত্যা করল ও উটগুলো হাঁকিয়ে নিল। [রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সংবাদ শুনে] তাদের পেছনে লোক প্রেরণ করলেন। অতঃপর তাদেরকে ধরে আনা হলো। এরপর তাদের দু হাতও দু পা কেটে ফেললেন এবং তাদের চোখ ফুঁড়ে দিলেন। তারপর [রক্ত বন্ধ হওয়ার জন্য] তাদের ক্ষতস্থান দাগালেন না, যাতে তাদের মৃত্যু হলো। অন্য আরেক রেওয়ায়েতে আছে, লোকেরা তাদের চোখে লৌহ শলাকা প্রবিষ্ট করাল। আরেক রেওয়ায়েতে আছে নবী করীম ﷺ লৌহ শলাকা আনার নির্দেশ দিলেন। তারপর তা গরম করা হলো এবং তাদের চোখের উপর মুছে দেওয়া হলো। এরপর তাদেরকে উত্তপ্ত মাটিতে ফেলে রাখলেন। তারা পানি চাইল কিন্তু তাদেরকে পানি পান করানো হয়নি। অবশেষে তারা এ অবস্থায় মারা গেল। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ : তিন থেকে দশজনের দলকে نَفَرٌ [নফর] বলা হয়। عُكْلٌ [উকল] একটি গোত্রের নাম। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে عُكْلٌ -এর পরিবর্তে عُرَيْنَةٌ [উরাইনাহ] শব্দ এসেছে। আর বুখারীর كِتَابُ الْمَغَازِيْ -এর- بَابُ قِصَّةِ بَابُ اَبْوَابِ الْاِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ এর- كِتَابُ الْوُضُوْءِ আর "مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ" উল্লিখিত আছে। عُكْلٌ وَعُرَيْنَةٌ এ- وَمَرَابِضِهَا বর্ণিত আছে। اِنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً শব্দে বর্ণিত হয়েছে। অন্য আরেক রেওয়ায়েতে مِنْ عُكْلٍ اَوْ عُرَيْنَةَ এ-

মুহাদ্দিসীনে কেরাম এর সমাধানে বলেন, প্রকৃতপক্ষে সে দলে সর্বমোট আটজন লোক ছিল। চারজন ছিল "উরাইনাহ" গোত্রের আর তিনজন ছিল "উকল" গোত্রের অথবা এর বিপরীত ছিল। আর একজন প্রবল ধারণা মতে অন্যকোন গোত্রের ছিল। সুতরাং রেওয়ায়েতগুলোর মাঝে কোনো বিরোধ নেই।

مَعْنَى قَوْلِهِ فَاجْتَوُوا الْمَدِيْنَةَ : মদিনার আবহাওয়া তাদের জন্য অনুকূল হলো না। ফলে তারা অসুস্থ হয়ে গেল। তাদের পেট ফুলে উচু হয়ে গেল। গায়ের রং ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

قَوْلُهُ فَيَشْرَبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَا : "তারা যেন উটের দুধ ও প্রস্রাব প্রাণ করে।" অর্থাৎ নবী করীম ﷺ তাদেরকে শহরের বাহিরে সদকার উটের চারণভূমিতে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে তারা ঐ সকল উটের দুধ ও প্রস্রাব পান করে। এ বাক্যটির সাথে দুটি মাসআলা সম্পৃক্ত।

এক. যে সকল প্রাণীর গোশ্‌ত খাওয়া হয় সেগুলোর প্রস্রাব পবিত্র না অপবিত্র।

দুই. تَدَاوِيْ بِالْمُحَرَّمِ তথা হারাম বস্তুর মাধ্যমে চিকিৎসা করার হুকুম।

১. যে সকল প্রাণীর গোশ্‌ত খাওয়া হয় সেগুলোর প্রস্রাবের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ :

مَذْهَبُ اِمَامْ مَالِكٍ وَمُحَمَّدٍ وَاَحْمَدَ فِىْ رِوَايَةٍ وَزُفَرَ وَنَخْعِيِّ وَزُهْرِيِّ (رحـ) : হযরত ইমাম মালেক, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম আহমদ (র.)-এর এক রেওয়ায়েত ও ইমাম যুফার, নাখয়ী, যুহরী (র.) প্রমুখদের মতে যে সকল প্রাণীর গোশ্‌ত খাওয়া হয় সেগুলোর প্রস্রাব পবিত্র।

তাঁদের দলিল :

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ فَاَسْلَمُوْا فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَاْتُوْا اِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَا .

যদি উটের প্রস্রাব পবিত্র না হতো তাহলে নবী করীম ﷺ উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশ দিতেন না।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَاَبِىْ يُوْسُفَ وَالثَّوْرِيِّ وَابْنِ حَزْمٍ ظَاهِرِيِّ (رضـ) : ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম ছাওরী ও ইবনে হাযাম যাহেরী (র.)-এর নিকট তা নাজাসাতে খফীফা।

তাঁদের দলিল :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ . (اِبْنُ مَاجَةَ دَارَقُطْنِىْ مِشْكٰوةٌ جـ١ صـ٤٢)

এ হাদীসের ব্যাপকতার মাঝে যে সকল প্রাণীর গোশ্‌ত খাওয়া হয় সেগুলোর প্রস্রাবও অন্তর্ভুক্ত।

বিরোধীপক্ষের দলিলের জবাব : নবী করীম ﷺ -কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, তাদের চিকিৎসা একমাত্র উটের প্রস্রাব পান করার মধ্যেই ছিল। এ কারণে তারা অপারগ ছিল। আর অপারগ লোকদের জন্য অপবিত্র বস্তু ব্যবহার করা জায়েজ হয়ে যায়।

২. হারাম বস্তুর মাধ্যমে চিকিৎসা করার হুকুম : হারাম বস্তুর মাধ্যমে চিকিৎসা করা জায়েজ আছে কিনা এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। যদি হারাম বস্তু ব্যবহার করা ব্যতীত জীবন বাঁচানো অসম্ভব হয় তাহলে সকলের ঐকমত্যে জরুরত অনুযায়ী تَدَاوِيْ بِالْمُحَرَّمِ জায়েজ আছে। আর যদি জীবন বাঁচানো অসম্ভব না হয়; বরং রোগমুক্তির জন্য তা ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট জায়েজ নেই। আর ইমাম মালেক (র.) উক্ত হাদীসের দ্বারা تَدَاوِيْ بِالْمُحَرَّمِ -কে জায়েজ সাব্যস্ত করেন।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) প্রমুখ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, নবী করীম ﷺ ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, তাদের চিকিৎসা কেবল উটের দুধ ও প্রস্রাব পান করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ কারণে নবী করীম ﷺ তা ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন এটা ব্যাপকভাবে জায়েজ হওয়ার প্রমাণ বহন করে না।

قَوْلُهُ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ اَعْيُنَهُمْ : "তাদের হাত ও পা কেটে দিলেন এবং চোখ ফুঁড়ে দিলেন।" অন্য আরেক রেওয়ায়েতে আছে তাদের চোখে গরম শলাকা বিঁধিয়ে দেওয়া হলো ইত্যাদি।

প্রশ্ন : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ. শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটাকে "মুছলা" বলা হয়। এ হাদীসের মাঝে নবী করীম ﷺ "মুছলা" করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং আমাদের আলোচিত হাদীসের মাঝে নবী করীম ﷺ কিভাবে "মুছলা" করার আদেশ দিলেন?

উত্তর :

১. এটা "মুছলা" হারাম করার পূর্বের ঘটনা।

২. ঐ সকল পাষণ্ডরা উটের রাখাল সাহাবীদের সাথে যে ধরনের অমানবিক আচরণ করেছিল নবী করীম ﷺ ও কেসাসস্বরূপ তাদের সাথে সে ধরনের আচরণ করেছেন।

৩. ঐ সকল হতভাগারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। অধিকন্তু তারা রাখাল সাহাবীদেরকে হত্যা করেছে এবং ডাকাতি করেছে। সুতরাং মুসলিম শাসকের জন্য জায়েজ আছে তাদেরকে যে কোনো প্রকারের শাস্তি দেওয়া।

قَوْلُهُ وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُوْنَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتّٰى مَاتُوْا : তাদেরকে উত্তপ্ত মাটিতে ফেলে রাখলেন। তারা পানি চাইল কিন্তু তাদেরকে পানি পান করানো হয়নি। "حرة" এমন পাথুরে ভূমিকে বলা হয় যেখানে বড় বড় কালো পাথর উঠে থাকে। মদিনা শরীফের উত্তর ও দক্ষিণে এমন ভূমি রয়েছে। সেখানে তাদেরকে ফেলে রাখা হয়েছিল। তারা পানি পান করতে চেয়েছিল কিন্তু তাদেরকে পানি দেওয়া হয়নি। অবশেষে এ অবস্থায়ই তারা মৃত্যুবরণ করেছে। এখন প্রশ্ন হলো তাদেরকে পানি কেন দেওয়া হলো না?

কোনো কোনো আলেম এর জবাবে বলেছেন, নবী করীম ﷺ তাদেরকে পানি না দেয়ার হুকুম দেননি; কিন্তু ডাকাতদের প্রতি লোকদের অত্যন্ত ঘৃণা ও ক্রোধের কারণে পানি দেওয়া হয়নি। অন্যথায় সকল ওলামায়ে কেরাম একথার উপর একমত যে যতবড় অপরাধী হোক না কেন পানি চাইলে তাকে পানি দেওয়া হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٣٨٥ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ اَنَسٍ)

৩৩৮৫. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সদকা দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করতেন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে বিকলাঙ্গ করতে নিষেধ করতেন। -[আবূ দাঊদ। ইমাম নাসাঈ এ হাদীস হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।]

وَعَنْ ٣٣٨٦ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَاَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا

৩৩৮৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, [একবার] আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এক সময় তিনি হাজত পূর্ণ করতে গেলেন। এ সময় আমরা দুটি বাচ্চাসহ একটি "হুম্মারা" দেখতে

فَرْخَانِ فَاَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَتَفَرَّشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ فَجَعَ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوْا وَلَدَهَا اِلَيْهَا وَرَاٰى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا قَالَ مَنْ حَرَّقَ هٰذِهِ فَقُلْنَا نَحْنُ قَالَ اِنَّهُ لَا يَنْبَغِيْ اَنْ يُّعَذِّبَ بِالنَّارِ اِلَّا رَبُّ النَّارِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

পেলাম। [লাল ঠোঁটবিশিষ্ট একপ্রকার ছোট পাখি] আমরা তার বাচ্চা দুটি ধরে আনলাম। অতঃপর হুম্মারা [পাখি]টি এসে তার দুই ডানা মাটির উপর চাপড়াতে লাগল। এরপর নবী করীম ﷺ আসলেন। [পাখিটিকে তড়পাতে দেখে] তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে এর বাচ্চাগুলি এনে একে ব্যথিত করেছে। তার বাচ্চাগুলি তাকে ফেরত দিয়ে দাও। এরপর নবী করীম ﷺ পিঁপড়ার একটি বস্তি দেখলেন। আমরা তা জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে এটা জ্বালিয়েছে। বললাম, আমরা। তিনি বললেন, অগ্নির প্রভু ব্যতীত অন্য কারো জন্য অগ্নি দ্বারা শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْحُمَّرَةُ : ح -এর উপর পেশ এবং مِيْم -এর উপর তাশদীদ ও যবরের সাথে চড়ুই পাখির মতো ছোট লাল রঙের একটি পাখি। হাদীসের শেষ বাক্যের মর্ম হলো আগুনের মাধ্যতে কাউকে শাস্তি দেওয়া শুধু আল্লাহ তা'আলার জন্যই নির্দিষ্ট। কেননা এটা সবচেয়ে বড় আজাব। সুতরাং কাউকে আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়ার অধিকার কোনো মানুষের নেই।

পিপীলিকা মারার মাসআলা : যদি পিপীলিকা আগে কষ্ট দেয় অর্থাৎ পিপীলিকার কোনো ক্ষতি করার পূর্বেই যদি কামড় দেয় তাহলে সেগুলো মারা যাবে। অন্যথায় পিপীলিকা মারা যাবে না। এমনিভাবে পিপীলিকার টিলা আগুন দিয়ে জ্বালানো নিষেধ। পিপীলিকা পানির মধ্যে ফেলে মারাও নিষেধ। যদি একটি পিপীলিকায় কামড় দেয় তাহলে সেটিকেই মার যাবে অন্যগুলিকে মারা যাবে না।

وَعَنْ ٣٣٨٧ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ وَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَيَكُوْنُ فِيْ اُمَّتِيْ اِخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ قَوْمٌ يُحْسِنُوْنَ الْقِيْلَ وَيُسِيْئُوْنَ الْفِعْلَ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَا يَرْجِعُوْنَ حَتّٰى يَرْتَدَّ السَّهْمُ عَلٰى فُوْقِهٖ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ طُوْبٰى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوْهُ يَدْعُوْنَ اِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ وَلَيْسُوْا

৩৩৮৭. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ও আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অচিরেই আমার উম্মতের মাঝে মতবিরোধ ও দলাদলি সৃষ্টি হবে। একদল এমন হবে যে, তারা খুব চমৎকার কথা বলবে কিন্তু তাদের আমল মন্দ হবে। তারা কুরআন শরীফ পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না। আর তারা দীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেভাবে তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। তারা দীনের দিকে ফিরে আসবে না যতক্ষণ না তীর ধনুকের দিকে ফিরে আসে। [অর্থাৎ নিক্ষিপ্ত তীর যেভাবে ধনুকে ফিরে আসে না অনুরূপভাবে তাদেরও দীন ইসলামের দিকে ফিরে আসা অসম্ভব।] তারা মানুষ এবং জীবজন্তুর মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্টতর। সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে তাদেরকে হত্যা করবে এবং তারা যাকে হত্যা করবে। [কারণ তাদেরকে যে হত্যা করবে সে হবে গাজী আর তারা যাকে হত্যা করবে সে হবে শহীদ।] তারা

مِنَّا فِي شَيْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا سِيْمَاهُمْ قَالَ اَلتَّحْلِيْقُ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

লোকদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকবে। অথচ কোনো কিছুতেই তারা আমাদের তরিকার উপর হবে না। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের সাথে যুদ্ধ করবে সে তার দলের মাঝে আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে প্রিয়ভাজন হবে। সাহাবীগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পরিচয় চিহ্ন কি? তিনি বললেন, মাথা মুণ্ডানো। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا سِيْمَاهُمْ قَالَ التَّحْلِيْقُ : সাহাবীগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পরিচয় চিহ্ন কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মাথা মুণ্ডানো। এখানে নবী করীম ﷺ খারেজী সম্প্রদায়ের আলামতের মাঝে একটি আলামত মাথা মুণ্ডানো বলেছেন। তখনকার দিনে আরবদেশে মাথা মুণ্ডানোর রেওয়াজ ছিল না। বরং বেশির ভাগ মানুষই মাথায় চুল রাখত। এ হাদীসের মাঝে মাথা মুণ্ডানোকে মন্দ আমল বলা বা হেয় করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা মাথা মুণ্ডানো আল্লাহর নেক বান্দাদের আমল। বর্তমান যুগের কিছু বিপথগামী আলেম মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে খারেজী সম্প্রদায়ভুক্ত বলে থাকে। নিঃসন্দেহে এটা ভিত্তিহীন অন্যায় কথা।

وَعَنْ ٣٣٨٨ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ اِلَّا بِاِحْدٰى ثَلَاثٍ زِنًا بَعْدَ اِحْصَانٍ فَاِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُوْلِهِ فَاِنَّهُ يُقْتَلُ اَوْ يُصَلَّبُ اَوْ يُنْفٰى مِنَ الْاَرْضِ اَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৩৮৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে মুসলিম একথার সাক্ষ্য দেয় যে, "আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোনো মা'বূদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল" তার খুন হালাল নয়। তবে তিনটি কাজের যে কোন একটি পাওয়া গেলে খুন হালাল হয়ে যায়। ১. বিবাহ করার পর জেনা করলে পাথর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করা হবে। ২. যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হয় [লুটপাট ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।] তাকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা দেশান্তর করা হবে। [অথবা বন্দি করে রাখা হবে]। ৩. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে তার বদলায় তাকে কতল করা হবে। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "زِنًا بَعْدَ اِحْصَانٍ" : اِحْصَانٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্বাধীন, স্বজ্ঞান, প্রাপ্তবয়স্ক, বিবাহিত, মুসলমান। সে যদি জেনায় লিপ্ত হয় তাহলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে।

ডাকাত, দস্যু ও লুটেরাদের সম্পর্কে তিনটি শাস্তির কথা বলা হয়েছে। ১. হত্যা করা। ২. শূলীতে চড়ানো। ৩. বন্দি করে রাখা। এ তিনটির ক্রমধারা হলো, লুটেরা যদি কাউকে হত্যা করে কিন্তু মাল নিতে না পারে তাহলে লুটেরাকে কতল করা হবে। আর যদি মাল নেয় এবং হত্যাও করে তাহলে লুটেরাকে শূলীতে চড়ানো হবে। ইমাম মালেক (র.) বলেন, জীবন্ত শূলীতে চড়ানো হবে যাতে সে মারা যায়। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কতল করে লাশ শূলীতে ঝুলিয়ে রাখা হবে। যাতে অন্যরা উপদেশ গ্রহণ করে।

তৃতীয় শাস্তি বন্দি করে রাখা। এজন্য হাদীসের শব্দ يُنْفَى فِى الْاَرْضِ এসেছে। এ বাক্যের অর্থ– ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট তাকে একের পর এক শহর থেকে অন্য শহরে বিতাড়ন করা হবে। তাকে এক শহরে বেশি দিন থাকতে দেওয়া হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট এ বাক্যের অর্থ হলো, তাকে বন্দি করে রাখা হবে। এ শাস্তি ঐ সময় হবে যখন লুটতরাজ না করে এবং হত্যাও না করে; বরং পথিকদেরকে ভয় দেখায় বা ধমকায় অথবা নিরাপত্তাকে আশঙ্কাযুক্ত করে।

এ হাদীসের এ অংশ [দস্যুদেরকে শাস্তি দেওয়ার বিধান] প্রকৃতপক্ষে কুরআনে কারীমের এ আয়াত থেকে নির্গত।

اِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ـ

এ আয়াত হিসেবে এ হাদীসের মাঝে اَوْ يُقَطَّعَ يَدُهٗ وَرِجْلُهٗ مِنْ خِلَافٍ ও হওয়াও উচিত -এর পূর্বে اَوْ يُنْفٰى فِى الْاَرْضِ ছিল, যাতে হাদীসটি পুরোপুরিভাবে আয়াতের সাথে মিলে যায়। তবে এখানে প্রবল সম্ভাবনা আছে যে, এখানে ঐ বাক্যগুলি ছিল কিন্তু বর্ণনাকারী থেকে ভুলবশত বাদ পড়ে গেছে অথবা সংক্ষিপ্ততার জন্য রাবী ইচ্ছা করে ঐ শব্দগুলো ছেড়ে দিয়েছেন।

"اَوْ يُنْفَوْا" : اَوْ হরফটি কুরআন ও হাদীস উভয়ের মাঝে اِظْهَارُ تَفْصِيْلٍ অর্থাৎ বিশ্লেষণের জন্য এসেছে। কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন اَوْ হরফটি تَخْيِيْر তথা এখতিয়ারের জন্য এসেছে। অর্থাৎ শাসকের এখতিয়ার আছে যে, তিনি উল্লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঐ সকল শাস্তি থেকে যে শাস্তি দেওয়া ভালো মনে করেন তা দস্যু বা ডাকাতকে দিতে পারবেন।

وَعَنْ ٣٣٨٩ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَسِيْرُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ اِلٰى حَبْلٍ مَعَهٗ فَاَخَذَهٗ فَفَزِعَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ)

৩৩৮৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে আবী লায়লা [তাবেঈ] বলেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবীগণ বলেছেন যে, তারা নবী করীম ﷺ -এর সাথে রাতে সফর করতেছিলেন। [একরাতে] তাদের মাঝে একজন ঘুমিয়ে পড়ল। তখন এক ব্যক্তি একটি রশির দিকে অগ্রসর হলো যা ঘুমন্ত লোকটির সাথে ছিল। সে তা হাতে নিল। তখন ঘুমন্ত লোকটি ভীষণ ভয় পেল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোনো মুসলমানের জন্য হালাল নয় যে, সে অন্যকোনো মুসলমানকে ভয় দেখাবে। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٣٩٠ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَخَذَ اَرْضًا بِجِزْيَتِهَا فَقَدِ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهٗ وَمَنْ نَزَعَ صِغَارَ كَافِرٍ مِنْ عُنُقِهٖ فَجَعَلَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ فَقَدْ وَلَّى الْاِسْلَامَ ظَهْرَهٗ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ)

৩৩৯০. অনুবাদ : হযরত আবুদ্দারদা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি কোনো খারাজী জমিন ক্রয় করল সে যেন তার হিজরতকে বাতিল করে দিতে চাইল। আর যে ব্যক্তি কোনো কাফেরের অপমান ও যিল্লত তার ঘাড় হতে নিজের ঘাড়ে টেনে আনল সে ইসলামকে তার পেছনে নিক্ষেপ করল।

–[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : যদি কোনো মুসলমান কোনো জিম্মি থেকে খারাজী জমি ক্রয় করে তাহলে তার জিম্মা হতে খারাজ রহিত হবে না; বরং তাকেও খারাজ দিতে হবে। এভাবে ঐ মুসলমান দারুল ইসলামে হিজরত করার কারণে যে সকল হক ও ইজ্জতসম্মানের অধিকারী হয়েছিল তা থেকে সে যেন বের হয়ে গেল। আর এক কাফেরের যিল্লত [খারাজ]-কে সে নিজের গলায় ঝুলিয়ে নিল।

قَوْلُهُ وَمَنْ نَزَعَ صِغَارَ كَافِرٍ مِنْ عُنُقِهِ الخ : হাদীসের এ অংশ প্রকৃতপক্ষে প্রথম অংশের বয়ান। তার বিশ্লেষণ হলো, যে মসুলমান কোনো কাফেরের খারাজ [টেক্স] নিজের জিম্মায় নিয়ে নিল সে যেন ইসলাম প্রদত্ত ইজ্জত ও সম্মানকে কুফরের যিল্লত ও অপমানের বিনিময়ে বিক্রি করে দিল। এভাবে সে কুফরিকে ইসলামের বদল স্থির করল।

وَعَنْ ٣٣٩١ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَرِيَّةً اِلٰى خَثْعَمَ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُوْدِ فَاَسْرَعَ فِيْهِمُ الْقَتْلَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَاَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ اَنَا بَرِيْءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مُقِيْمٍ بَيْنَ اَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ قَالَ لَا تَتَرَا اٰىْ نَارَاهُمَا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৩৯১. **অনুবাদ** : হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একবার] রাসূলুল্লাহ ﷺ খাশয়াম গোত্রের মোকাবিলায় এক বাহিনী প্রেরণ করলেন। উক্ত গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক আত্মরক্ষার জন্য সিজদায় রাত হয়ে পড়ল। [তাদের সিজদার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে] তড়িৎবেগে তাদেরকে হত্যা করা হলো। অতঃপর নবী করীম ﷺ -এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছল। তখন তিনি মৃত্যু ব্যক্তির ওয়ারিশদেরকে অর্ধেক দিয়ত আদায় করার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, যে সকল মুসলমানরা মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে আমি তাদের থেকে দায়িত্বমুক্ত। সাহাবীগণ আরজ করলেন, কেন হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, কেননা তাদের উচিত ছিল এতদূরে অবস্থান করা যাতে একে অপরের আগুন পর্যন্ত দেখতে না পায়। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُوْدِ : মুসলিম সেনাবাহিনীকে দেখে তারা সিজদায় রত হয়েছিল। একথা বুঝানোর জন্য যে তারাও মুসলমান। প্রকৃতপক্ষে তারাও মুসলমান ছিল। যদিও কাফেরদের সাথে বসবাস করত। কিন্তু মুসলিম সেনাবাহিনী ধারণা করেছিল তারা জান বাঁচানোর জন্য এরূপ বাহানা করতেছে। তাই তাদেরকে হত্যা করেছে।

فَاَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ : নবী করীম ﷺ তাদের মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে জানার পরও তাদের ওয়ারিশদেরকে অর্ধেক দিয়ত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ তারা ইসলাম গ্রহণ করার পরও মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে তারা যেন নিজেদের হত্যার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। নবী করীম ﷺ তা এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, যে সকল মুসলমান কাফের মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে তাদের উপর আমার কোনো দায়িত্ব নেই।

قَالَ لَا تَتَرَا اٰىْ نَارَاهُمَا : "তারা যেন পরস্পরে একে অপরের আগুন পর্যন্ত দেখতে না পায়।" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মুসলমান ও কাফের এত দূরে দূরে অবস্থান করবে যে, যদি উভয় পার্শ্বে আগুন জ্বালানো হয় তাহলে মুসলমানদের আগুন যেন কাফেররা দেখতে না পায় এবং কাফেরদের আগুনও যেন মুসলমানরা দেখতে না পায়।

وَعَنْ ٣٣٩٢ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْإِيْمَانُ قَيْدُ الْفَتْكِ لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৩৯২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ঈমান কোনো লোককে হঠাৎ হত্যা করা হতে বিরত রাখে। সুতরাং কোনো মুমিন যেন কোনো লোককে হঠাৎ হত্যা না করে।

وَعَنْ ٣٣٩٣ جَرِيْرٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৩৯৩. **অনুবাদ :** হযরত জারীর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যখন কোনো গোলাম শিরক [দারুল হরব]-এর দিকে ভেগে যায় তখন তার খুন হালাল হয়ে যায়। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যদি গোলাম দারুল হরবে ভেগে যায় তাহলে তার খুন হালাল হয়ে যায়। অর্থাৎ এ ধরনের গোলামকে কেউ হত্যা করলে হত্যাকারীর উপর কোনো দিয়ত ওয়াজিব হবে না। কারণ সে মুশরিকদের নিরাপত্তা গ্রহণ করেছে আর ইসলামকে পরিত্যাগ করেছে।

وَعَنْ ٣٣٩٤ عَلِيٍّ (رض) أَنَّ يَهُوْدِيَّةً كَانَتْ تَشْتِمُ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيْهِ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتّٰى مَاتَتْ فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ ﷺ دَمَهَا . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৩৯৪. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, এক ইহুদি মহিলা নবী করীম ﷺ -কে গালমন্দ করত এবং তার দোষ-ত্রুটি বের করে তাঁকে তিরস্কার করত। জনৈক ব্যক্তি তার গলা চেপে ধরল এমনকি সে মরেই গেল। নবী করীম ﷺ তার খুন মাফ করে দিলেন। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٣٩٥ جُنْدُبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৩৩৯৫. **অনুবাদ :** হযরত জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– জাদুকরের শরয়ী শাস্তি হলো তাকে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করা। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : জাদু করা হারাম। এ ব্যাপারে সকল ওলামায়ে কেরাম একমত। তবে জাদুকরের শাস্তির ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, জাদুকরকে কতল করা হবে। যদি তার জাদু কুফরি হয় আর সে তওবা না করে।

ইমাম মালেক (র.) ও কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কেরামের মতে, জাদু কুফরি কাজ ও জাদুকর কাফের। জাদু শিখা ও শিখানো কুফরি। জাদুকরকে হত্যা করা হবে তাকে তওবা করার জন্য আহ্বান করা হবে না। চাই সে কোনো মুসলমানের উপর জাদু করুক বা জিম্মির উপর জাদু করুক।

হানাফীগণ বলেন, যদি জাদুকরের আকিদা এমন হয় যে, কাজের নিয়ন্ত্রক ও স্রষ্টা শয়তান, সে আমার জন্য যা ইচ্ছা করে তা করে দেয় তাহলে সে কাফের। আর যদি এমন আকিদা রাখে যে, জাদু শুধু একটি খেয়াল ও ধারণা তাহলে সে কাফের হবে না। তবে সে অবশ্যই ফাসেক। আর জাদু শিখা হারাম।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٣٩٦ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اُمَّتِىْ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهٗ ـ (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

৩৩৯৬. অনুবাদ : হযরত উসামা ইবনে শারীক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আমার উম্মতের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে তাকে কতল করে দাও। –[নাসাঈ]

وَعَنْ ٣٣٩٧ شَرِيْكِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ كُنْتُ اَتَمَنّٰى اَنْ اَلْقٰى رَجُلًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَسْاَلُهٗ عَنِ الْخَوَارِجِ فَلَقِيْتُ اَبَا بَرْزَةَ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فِىْ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِهٖ فَقُلْتُ لَهٗ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِاُذُنَىَّ وَرَاَيْتُهٗ بِعَيْنَىَّ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَالٍ فَقَسَّمَهٗ فَاَعْطٰى مَنْ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهٖ وَلَمْ يُعْطِ مَنْ وَرَاءَهٗ شَيْئًا فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ وَرَائِهٖ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا عَدَلْتَ فِى الْقِسْمَةِ رَجُلٌ اَسْوَدُ مَطْمُوْمُ الشَّعْرِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ اَبْيَضَانِ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَضَبًا شَدِيْدًا وَقَالَ وَاللّٰهِ لَا تَجِدُوْنَ بَعْدِىْ رَجُلًا هُوَ اَعْدَلُ مِنِّىْ ثُمَّ قَالَ يَخْرُجُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ كَاَنَّ هٰذَا مِنْهُمْ يَقْرَءُوْنَ

৩৩৯৭. অনুবাদ : হযরত শারীক ইবনে শিহাব [তাবেঈ] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, আমি নবী করীম ﷺ -এর কোনো সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করব, আর তাঁর নিকট খারেজীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। অবশেষে এক ঈদের দিন হযরত আবূ বারাযা (রা.)-এর সাথে তাঁর বন্ধুদের উপস্থিতিতে সাক্ষাৎ করলাম। অতঃপর তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে খারেজীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি আমার দুই কানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি এবং আমি আমার দুই চোখ দিয়ে [ঐ ঘটনা] দেখেছি। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে কিছু মাল আসল। নবী করীম ﷺ তা বিতরণ কর দিলেন। যে তাঁর ডানদিকে ছিল তাকে দিলেন এবং যে তাঁর বামদিকে ছিল তাকেও দিলেন। কিন্তু যে তার পেছনে ছিল তাকে কিছুই দিলেন না। অবশেষে তাঁর পেছনে বসা লোকদের থেকে একজন দাঁড়িয়ে বলল, হে মুহাম্মদ! বণ্টনের ক্ষেত্রে তুমি ইনসাফ করনি। সে ব্যক্তি কালো বর্ণের ছিল এবং তার মাথা ছিল মুণ্ডানো। তার গায়ে ছিল দুটি সাদা চাদর। [তার কথা শুনে] নবী করীম ﷺ প্রচণ্ড রাগ হলেন। আর বললেন, আল্লাহর কসম! আমার পরে তোমরা আর কাউকে আমার চেয়ে বেশি ইনসাফগার পাবে না। এরপর বললেন, শেষ জমানায় একটি দল বের হবে। যেন এ ব্যক্তি তাদের মধ্য থেকে একজন। তারা কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের

الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ سِيْمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ لَا يَزَالُوْنَ يَخْرُجُوْنَ حَتّٰى يَخْرُجَ اٰخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ ـ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

গলদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না। তারা ইসলাম থেকে এভাবে বের হয়ে যাবে যেভাবে তীর শিকার ভেদ করে চলে যায়। তাদের পরিচয় চিহ্ন হল তাদের মাথা মুণ্ডানো হবে। ঐ দলের লোক সর্বদা বের হতে থাকবে। অবশেষে তাদের সর্বশেষ দলটি বের হবে মাসীহে দাজ্জালের সাথে। [অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে, যখন তিনি কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় পৃথিবীতে আগমন করবেন।] সুতরাং তোমরা যেখানেই তাদেরকে পাও কতল করে ফেল। কেননা, তারা মানুষ এবং জীবজন্তুর মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। –[নাসাঈ]

وَعَنْ ٣٣٩٨ اَبِىْ غَالِبٍ رَاٰى اَبُوْ اُمَامَةَ رُءُوْسًا مَنْصُوْبَةً عَلٰى دَرَجِ دِمَشْقَ فَقَالَ اَبُوْ اُمَامَةَ كِلَابُ النَّارِ شَرُّ قَتْلٰى تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَاءِ خَيْرُ قَتْلٰى مَنْ قَتَلُوْهُ ثُمَّ قَرَءَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ اَلْاٰيَةَ قِيْلَ لِاَبِىْ اُمَامَةَ اَنْتَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ لَمْ اَسْمَعْهُ اِلَّا مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلٰثًا حَتّٰى عَدَّ سَبْعًا مَا حَدَّثْتُكُمُوْهُ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

৩৩৯৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ গালেব (র.) [তাবেঈ] হতে বর্ণিত, একবার হযরত আবূ উসামা (রা.) দামেশকের সদর দরজায় [খারেজীদের] কিছু ঝুলন্ত মস্তক দেখলেন। তখন আবূ উমামা (রা.) বললেন, এরা হলো জাহান্নামের কুকুর। আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট নিহত লোক এরা, আর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নিহত লোক তারা যাদেরকে এরা হত্যা করেছে। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন, "সেই দিন অনেক মুখমণ্ডল শুভ্র হবে এবং অনেক মুখমণ্ডল কালো হবে।" আবূ গালিব (র.) হযরত উমামা (রা.)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি একথা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন? আবূ উমামা (রা.) একবার, দুবার কিংবা তিনবার নয় বরং সাতবার শোনার কথা উল্লেখ করে বললেন, যদি আমি না শুনতাম তাহলে তোমাদের নিকট বর্ণনা করতাম না। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। তবে তিরমিযী এ হাদীসকে "হাসান" বলেছেন।]

—ঃ চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত ঃ—